একবিংশ বর্ষ
প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যা
শ্রাবণ ১৩৪৮

পরিচয়-এর কুড়ি বছর

হিরণকুমার সান্যাল

কথকের কৈফিয়ৎ

পরিচয়-এর প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছিল বঙ্গাব্দ ১২৩৮ সনের শ্রাবণ মাসে। বাংলাদেশে কুড়ি পেরোলেই বুড়ি; অতএব প্রবীণা পরিচয়-পত্রিকা আত্ম-জীবনী প্রকাশ করবার অধিকার অর্জন করেছে।

এ ক্ষেত্রে গণেশ হবার দাবি সর্বাগ্রে সম্পাদকের। কিন্তু পরিচয়-এর প্রথম সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বর্তমান সম্পাদক সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—এই দুই জনের মাঝখানে সম্পাদকীয় ব্যবধান প্রায় বছর দশেক। মাঝামাঝি সময়টাতে আরো জনপাঁচেক সম্পাদকের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটেছে। এই নানা হাতবদলের মধ্য দিয়ে পরিচয় যদি কোনো [illegible]

স্রষ্টা, একমাত্র যাঁর নামে বর্তমান বাংলা সাহিত্যের পুরো কুল-পরিচয়, এই ইতিবৃত্তের আদিপুরুষ তিনি।

পরিচয়-এর জন্মকালে রবীন্দ্রনাথ সবে সত্তর পেরিয়েছেন, এই উপলক্ষে ঘটা করে জয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্‌যোগ করছেন সানুচর অমল হোম, সারা বাংলা-দেশ উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা করছে এই উৎসবের, আর যাঁর জন্যে আয়োজন তাঁর অক্লান্ত সতেজ কলম মাসের পর মাস পুস্তকের ও পত্রিকার মাধ্যমে নতুন নতুন সৃষ্টি উপহার দিচ্ছে বাঙালী পাঠককে। সুতরাং প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের রচনা, অন্তত সংক্ষিপ্ত একটি বাণী, বহন ক'রে পরিচয়-পত্রিকার আবির্ভাব ঘটলে প্রচলিত প্রথা বজায় থাকত। তা' যে থাকেনি তার কারণ সুধীন দত্ত ও তাঁর সহযোগিবৃন্দ সংকল্প করেছিলেন যে সম্পাদকীয় ভিক্ষাপাত্র হাতে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হবেন না। অন্তত প্রথম সংখ্যা প্রকাশের সময়ে তাঁরা এই সংকল্প পালন করেছিলেন। কিন্তু তবু ইতিহাসের পরিহাসে রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখ অনিবার্য হয়ে পড়ল পরিচয়-এর জন্মবৃত্তান্তের একেবারে সূচনাতে।

অতঃপর কথকের উত্তমপুরুষে অধঃপতন ছাড়া এই আখ্যায়িকার অগ্রসর অসম্ভব।

সভা ভঙ্গ হবার পর জানলাম যুবকটি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মশায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আর দেখলাম পদার্থ-বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয়।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে রবীন্দ্রনাথ চীন জাপানের পথে রওনা হলেন পরে মার্কিন ও ইওরোপে যাবার সংকল্প নিয়ে। কবির যাঁরা সঙ্গ নিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন অপূর্ব চন্দ ও সুধীন দত্ত। শুনলাম চন্দ সাহেব এ যাত্রায় কবির সেক্রেটারির কাজ করবেন—এই জন্যে সরকার থেকে তাঁর ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। সুধীন দত্তের বিদেশ যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল স্বাস্থ্য-সংস্কার ও বোধ করি দুধের সাধ ঘুধে মেটানো। প্রমথ চৌধুরী মশায়ের মুখে শুনেছিলাম হীরেনবাবু নাকি তাঁকে আক্ষেপ করে বলেছিলেন তাঁর ছেলে চিররুগ্ন হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে বিদেশে হাওয়া-বদলের ব্যবস্থা খুবই প্রশস্ত সন্দেহ নাই। পুত্রের মানসিক স্বাস্থ্যের খবর তিনি হয়তো রাখতেন না। প্রাক-পরিচয় যুগের সুধীন দত্ত সম্বন্ধে আমিও প্রায় অজ্ঞ, কিন্তু তাঁর ঐ যুগের অন্তরঙ্গ বন্ধুরা আমার অনুমান আশা করি সমর্থন করবেন।

বৈদেশিক বৈদ্যের কারিকুরিতে সুধীন দত্তের দেহ অচিরাৎ রোগমুক্ত হয়েছিল। সুস্থদেহে তিনি দেশে ফিরলেন বিদেশী ছাঁচে-ঢালা মনের ওপর বিদেশী সমাজ ও সংস্কৃতির পালিশ লাগিয়ে ও মাতৃভাষাকে নতুন ছাঁচে ঢেলে সাহিত্য সৃষ্টির সংকল্প নিয়ে। সন তারিখের হিসেব ধরলে হয়তো সুধীন দত্তের মনে এই সংকল্পের উদয় হয়েছিল দেশে ফেরার পর। কিন্তু এর মূলে ছিল নিঃসন্দেহ বিদেশী প্রভাব। ভারতবর্ষের আরো বহু যুবকের মতন সুধীন দত্তও স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন স্বর্গলব্ধ মন্দারমালিকার সুরভি স্মৃতি বহন ক'রে। এই স্মৃতি মলিন হয়ে এলেও তাঁর মননশীল চিত্তে বিদেশিনী সরস্বতীর (বৈদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বারোয়ারি সরস্বতী নয়) জ্যোতির্ময় টীকা ছিল অনির্বাণ, তারপর একদিন তা দেদীপ্যমান হয়ে উঠল পরিচয়-পত্রিকার পাতায়।

পরিকল্পনা

সরল ভাষায় বলা যেতে পারে, বিদেশ ঘুরে আসার কিছুদিন পরে সুধীন দত্তের বাসনা হল একটি পত্রিকা প্রকাশ করার। মননশীল হলেও সুধীন দত্ত কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জিত নন, তাই একথা তিনি বিলক্ষণ বুঝতেন যে একক চেষ্টায়

স্বর্গ লুণ্ঠন করে মন্দারমালিকার আহরণ সম্ভব হলেও, প্রমাণসই একটি পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ লোকবল ছাড়া অসম্ভব। কিন্তু সেই সময়ে লোকবল বলতে সুধীন দত্তের ছিলেন শুধু বন্ধু গিরিজাপতি ভট্টাচার্য—সুধীন দত্তের মতনই স্বর্গলব্ধ মন্দারমালিকার স্মৃতি-সৌরভে আকুল, আক্ষরিক ও আলংকারিক উভয় অর্থে। কেননা, পৌরাণিক মন্দারের আধুনিক সংস্করণ সুগন্ধি প্রসাধনী তৈরি করার খাস ফরাশি কৌশল শেখার মূল উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি সুধীন দত্তের কয়েক বছর আগে বিদেশ ঘুরে এসেছিলেন—সুধীন দত্তের মতনই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক জাহাজে যাত্রা করে। পরিচয়-গোষ্ঠীতে বহুকাল এই জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল যে বিদেশের স্বর্গবাসান্তে দেশে ফেরার প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গিরিজাবাবুর আর একবার সাক্ষাৎ ঘটে ও তখন কবি ওঁর আচরণ লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "চোখের জল ফেলতে ফেলতে দেশ ছেড়ে এসেছিলে, আবার দেখি সেই চোখের জল ফেলতে ফেলতে দেশে ফিরছ।"

এই ধরনের কথাবার্তা কবির মুখে অনেকেই শুনেছে। গিরিজাবাবুর সমবয়সী আর একটি যুবক প্রবাসের মায়াজালে এমনি জড়িত হয়েছিলেন যে আত্মীয়স্বজন শত চেষ্টাতেও তাঁকে ঘরমুখো করতে না পেরে শেষকালে নিরুপায় হয়ে তাঁকে ফিরিয়ে আনবার বরাত দিয়েছিলেন কবির উপর। কবি নাকি তাতে বলেছিলেন, "উর্বশীর কাজ কি আর দুর্বাশা মুনিকে দিয়ে হয়?" অবশ্য, এ সব কথা সত্যি কিনা আমি হলপ করে বলতে পারি না, কেননা, কাকে লক্ষ্য করে কবি কখন কি বলেছিলেন, তার হিসেবনিকেশ আমি কি করে রাখব? কিন্তু একথা নিশ্চিত জানি যে পরিচয়-প্রকাশের দুঃসাহসিক কাজে সুধীন দত্ত নামেন একরকম তাঁরই ভরসায়। ভরসার অতিরিক্ত গিরিজাবাবু দিয়েছিলেন পত্রিকা চালানোর উপযোগী লোকবল সংগ্রহ করে ও এই লোক-বলের বলিষ্ঠতম লোক ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ রায়। সত্যেন বোসের মুখে নীরেন রায়ের নাম এর আগেই সুধীন দত্তের কানে পৌঁছেছিল ও ফলে তাঁর ধারণা হয়েছিল পত্রিকার কাজে তাঁকে পাওয়া বিশেষ দরকার। তারপর যথাসময়ে গিরিজাবাবুকে তিনি বায়না দিলেন সশরীর নীরেন রায়কে হাজির করতে।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

আজ বাংলাদেশে সত্যেন বোসের নাম কে না জানে? কিন্তু বিশ বছর আগে তিনি এত সুপরিচিত ছিলেন না। কলকাতা সায়েন্স কলেজে কিছুদিন

ছেলে পড়ানোর পর তিনি ঢাকায় গিয়েছিলেন সেখানকার নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের রীডার হয়ে। দেখতে দেখতে সেখানে তাঁর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল বিভাগ থেকে বিভাগে, কেননা বিজ্ঞান-সংক্রান্ত যে-কোন বিষয়ে ছাত্র বা অধ্যাপকদের যা-কিছু প্রশ্ন মনে আসত তার সমাধান করতে সত্যেন বোসের জুড়ি আর কেউ ছিল না। ঢাকায় থাকার সময়ে তিনি সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে কিছু গবেষণা করেছিলেন, তার ফলে তাঁর নাম আইনস্টাইনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে ইওরোপ-আমেরিকার বৈজ্ঞানিক মহলে।

কিন্তু শুধু এইটুকু বললে সত্যেন বোস সম্বন্ধে কিছুই প্রায় বলা হয় না। তাঁর যথার্থ পরিচয় দিতে গেলে মনে পড়ে যে-সব বিরাট বরফের চাপ সমুদ্রে ভেসে বেড়ায় তাদের কথা। এগুলির দশভাগের এক ভাগ থাকে জলের উপর, বাকী ন'ভাগ নিচে। সেই রকম বৈজ্ঞানিক সত্যেন বোসের যেটুকু সাধারণের চোখে পড়ে, সেটুকু তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্বের সামান্য অংশমাত্র; গোটা মানুষটির পুরো খবর জানে শুধু অন্তরঙ্গ বন্ধুরা। তাঁরা সাক্ষ্য দেবেন যে সত্যেন বোসের জন্ম সহজাত মনীষা ও দরদী মন নিয়ে। তাই যেমন অনায়াসে তিনি আয়ত্ত করতে পারেন যে-কোনো বিষয়ের দুরূহ বিদ্যা, তেমনি সহজে তিনি পরকে করতে পারেন আপন। হয়তো তাঁর উচিত ছিল সব কিছু ছেড়ে গবেষণার গভীর জলে অকল্পিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সন্ধান। যথেষ্ট সম্বল না নিয়ে এই জাতীয় দুঃসাহসিক সন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়ার ফলে যারা হাবুডুবু খায় তাদের অনেককে তিনি টেনে তুলেছেন প্রমাণগ্রাহ্য সিদ্ধান্তের শক্ত ডাঙায়। কিন্তু তাঁর কোষ্ঠীতে লেখা ছিল না বিজ্ঞান অনুশীলনের বদ্ধ কুঠুরিতে আটকে থাকা, তাই জীবনের অনেকটা সময় তিনি কাটিয়েছেন আড্ডা থেকে আড্ডায়, দিনের পর দিন, সকাল থেকে রাত, মানুষের প্রবল টানে আর সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত চর্চার দুর্নিবার আবেগে।

•

নীরেন্দ্রনাথ রায়

সবুজপত্রের যুগে বীরবলের বৈঠকখানায় সত্যেন বোসের যাতায়াত ছিল ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হারীতকৃষ্ণ দেব প্রভৃতির সঙ্গে। ঐ বৈঠকখানার সাহিত্যিক আড্ডায় যাঁদের হাতেখড়ি হয় তাঁদের মধ্যে ছিলেন সত্যেন বোসের সাকরেৎ নীরেন রায়। তখন তিনি কলেজের ছাত্র, কিন্তু সত্যেন বোসের

মতন সদ্‌গুরুর সদ্‌গুণে তাঁর ঐ বয়সেই সুযোগ ঘটেছিল জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা দুর্গম মহলে অবাধ আনাগোনার।

কলেজের জীবন যতই মধুর হোক, মেধাবী ছাত্রের পক্ষে এর মেয়াদ বড়ই অল্প। নীরেন রায়ের বেলাতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। একটির পর একটি ডিগ্রির দেউড়ি পেরিয়ে তিনি যৌবন পেরোবার আগেই বাহাল হলেন অধ্যাপকের আসনে ও কোমর বেঁধে লাগলেন পরীক্ষা-পাশ-প্রয়াসী পার্সেন্টেজ-প্রার্থী ছাত্রদের মধ্যে ইংরেজী সাহিত্যের সম্পদ ও সৌন্দর্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যানে। এইভাবে এক যুগ কাটার পর গিরিজাবাবুর দৌত্যে তাঁর ডাক পড়ল সুধীন দত্তের দরবারে। পেশার চাপে সাহিত্যিক নেশার ঘোর তখনো তাঁর কাটেনি, আর কোমর বাঁধার অভ্যাস তো তাঁর জন্মগত। ফলে, দেখতে দেখতে জমে উঠল পরিচয়-এর উদ্যোগপর্ব।

[ক্রমশ]

"সারা সংসার হমারা হৈ"

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১৯৪০ সালের শেষ। নাগপুরে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের বার্ষিক সম্মেলন চলেছে। তখনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী অধ্যায় সমাপ্ত হয় নি। সংগ্রামোন্মুখ জনতাকে রাশ টেনে রাখবার জন্য গান্ধীজী উদ্ভাবন করেছেন ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ; কর্তৃপক্ষকে নোটিস দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে যুদ্ধের বিরুদ্ধে একা অহিংস প্রতিবাদ জানিয়ে মাল্যভূষিত হয়ে কয়েক মাসের জন্য জেলযাত্রা করছিলেন কংগ্রেসের ছোট বড় কর্তারা। ছাত্রেরা ঐ অভিনয় বরদাস্ত করতে পারে নি; তারা মিছিল করে ঘুরছিল নাগপুরের রাস্তায় রাস্তায়, হাজার কণ্ঠে আওয়াজ উঠছিল, যুদ্ধ বরবাদ। যুদ্ধে আমাদের সমর্থন নেই— "ন-এক পাই, ন-এক ভাই!"

মিছিলের একদিক থেকে হঠাৎ শোনা গেল উত্তর প্রদেশ আর পাঞ্জাবের ছেলেমেয়েদের গান—

মজ্‌দুরোঁনে মুল্‌কোঁ মুল্‌কোঁ অব্‌ ঝণ্ডা লাল উঠায়া হৈ
জো ভুখা থা জো নংগা থা অব্‌ জস্‌সা উস্‌কো আয়া হৈ।
রোকে তো কোই হম্‌কো জরা-সারা সংসার হমারা হৈ
সারা সংসার হমারা হৈ, সারা সংসার হমারা হৈ॥

আমার পাশে ছিলেন ডক্টর আশ্‌রফ। হেসে আমায় বললেন, "মনে পড়ছে কি, বন্নে-ভাই হাইড পার্ক থেকে ফিরে এক সন্ধ্যায় এই গান লিখেছিল?"

বললাম, মনে পড়ছে বই কি। এ-সব ঘটনা সহজে ভুলবার নয়। তখন ১৯৩১ কি ১৯৩২ সাল। লণ্ডনে প্রবাসী ক'জন ভারতীয় ছাত্র প্রায়ই এক-জোট হ'ত। সাম্যবাদী আন্দোলনের সংস্পর্শে থেকে তারা দেশে ফিরে কাজ করে যাওয়ার জন্য সাধ্যমত নিজেদের তৈয়ার করার চেষ্টা করত। তাদের মধ্যে প্রমুখ ছিল বন্নে-ভাই; বন্ধুদের মধ্যে সজ্জাদ জহীরের এই নামেই পরিচিতি। হাইড্‌ পার্কে ইংরেজ শ্রমিকদের মিছিল আর রাস্তায় তাদের উপর পুলিশের হাম্‌লা দেখে ফিরে তৎক্ষণাৎ সে যে-গান রচনা করেছিল তাই আমরা শুনলাম নাগপুরের পথে।

হম্ ছুনিয়া নয়ী বনায়েঙ্গে, হম্ বস্তী নয়ী বসায়েঙ্গে,
রাজা, অংগ্রেজো, ধনিকো হম্ মিলকর মার ভগায়েঙ্গে···

বারবার কানে আসতে লাগল বন্নে-র গানের ধুয়ো : "সারা সংসার হমারা হৈ, সারা সংসার হমারা হৈ—"।

দেশে ফিরে সজ্জাদ কালবিলম্ব না করে কায়মনোবাক্যে সাম্যবাদী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। কথাটা শুনতে গুরুগম্ভীর শোনাচ্ছে, কিন্তু এ হ'ল অবিকল সত্য। কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন সর্বভারতীয় নেতা সে হয়েছিল ; দেশভাগের সময় সে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক নির্বাচিত হয়। আজ রাওলপিণ্ডি ষড়যন্ত্র মামলায় হঠাৎ সমরবিভাগ মারফৎ একটা ওলটপালট ঘটিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রকে উৎখাত করার এক হাস্যকর ও শস্তা-নাটুকে অভিযোগে তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

বন্দিশালায় তার সঙ্গীদের মধ্যে আছেন নানাধরনের লোক। কিন্তু তাঁদের মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন উর্দু কবি ফয়েজ্ আহ্মদ ফয়েজ্। ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌয়ে যখন প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন হয়, তখন তাঁকে দেখেছিলাম। তারপর বহুদিন তাঁর সন্ধান পাই নি ; শুধু জানতাম যে উর্দু ভাষায় প্রগতিশীল লেখকদের মধ্যে তিনি একজন প্রধান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সামরিক প্রচার বিভাগে যোগ করি তিনি যোগ দেন, অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও-তে কিছুকাল তিনি ছিলেন। তার পর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রাক্তন কংগ্রেস-নেতা মিঞা ইফ্তিখারউদ্দীন যখন লাহোরে 'পাকিস্তান টাইমস্' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন তখন সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন ফয়েজ আহ্মদ ফয়েজ্। পাকিস্তানী পরিস্থিতিতে প্রগতিশীল পত্রিকা হিসাবে 'পাকিস্তান টাইমস্'-এর সুখ্যাতি শুনেছি। আর উর্দু ভাষায় যাঁরা প্রধান কবি— জোশ মলিহাবাদী, সাগর নিজামী, মজাজ্, মখ্দুম মহিউদ্দীন, পরভেজ, আলি সর্দার জাফরী—তাঁরা ভারতের বাসিন্দা বলে ফয়েজ্ই সম্ভবত ছিলেন পাকিস্তানের সেরা উর্দু কবি। হঠাৎ একদিন কয়েকজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়—পাঞ্জাবের নির্বাচনে মুসলিম লীগের জয় সুনিশ্চিত করার জন্যই হিটলারী কায়দায় রাষ্ট্রে বিপদ আসন্ন বলে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে দেওয়া হয়। হিটলার যেমন ১৯৩২ সালে লোক লাগিয়ে 'রাইখস্টাগ' ভবনে আগুন লাগিয়ে কমিউনিস্ট চক্রান্তের ভিত্তির

তুলেছিল, তেমনই যেন হিটলারী শিক্ষায় লায়েক হয়ে লিয়াকৎ আলী প্রমুখ কর্তৃপক্ষীয়েরা পাকিস্তানী ফৌজ-রূপ বাঘের ঘরে কমিউনিস্ট ঘোগের বাসা খুঁজে বার করল।

সজ্জাদের কথাই এখানে বলব, কারণ তার কথাই বিশেষ করে জানি। তবে এত কথা মনে পড়ে, তার সম্বন্ধে ভাবতে গেলে, যে বাছাই করা একটুও সহজ লাগছে না।

তাকে প্রথম দেখি অক্সফর্ডে ১৯১৯ সালে। সে গিয়েছিল ১৯২৮-এ, আর অক্সফর্ডে যাওয়ার আগে ফরাসী ভাষা ভালো করে শেখার জন্য কিছুকাল কাটিয়েছিল সুইটসারল্যণ্ডে। 'বন্নে' ছিল সকলের প্রিয়পাত্র; তার সঙ্গে পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হতে তাই বিলম্ব ঘটে নি।

অক্সফর্ডে ভারতীয় ছাত্রদের মজলিসে ১৯২৯ সালের শেষভাগে 'বন্নে' ছিল সম্পাদক। মহ্‌মুদ সাহেবজাদা ছিল কোষাধ্যক্ষ, আর বোম্বাইয়ের মোরেস ছিল সভাপতি। মোরেস এখন বোধ হয় "টাইমস অব ইণ্ডিয়া"-র সম্পাদক, (যদি অবশ্য কোন কারণে ডালমিয়াজীর প্রসাদ থেকে সে বঞ্চিত না হয়ে থাকে)। আর মহ্‌মুদ দেশে গিয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দেয়, ১৯৩৮ সালে 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট' সাপ্তাহিকের সম্পাদকমণ্ডলীতে থাকে। 'বন্নে' সে-যুগে সুবক্তা ছিল না, আটকে গেলে ছেলে-বেলা-থেকে-বিলাতের-ইস্কুলে-পড়া মহ্‌মুদ কথা যুগিয়ে দিত; আমরা হাসতাম, কিন্তু খুব ভালোই লাগত সকলের। নানাপ্রকৃতির লোকের সঙ্গে প্রকৃত বন্ধুত্ব স্থাপনের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল বন্নে-র। আর বিশেষ করে যাদের সঙ্গে রাজনীতি ব্যাপারে তার মনের মিল হত, তাদের সঙ্গে হৃদয়ের বন্ধনও হত অটুট।

'বন্নে'-র মত মজলিসী মানুষ দেখেছি কম, দেশে কিম্বা বিদেশে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে জমিয়ে বসা তার কাছে একটা সহজ স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। নানা প্রকৃতির লোককে শুধু সহ্য করা নয়, তাদের কথা শ্রদ্ধা নিয়ে শোনার ক্ষমতা ছিল তার অসামান্য। তার ব্যবহারে শুধু যে হৃদ্যতা থাকত, তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে থাকত একটা ধীর, স্থির ভাব। গুরুতর কোন বিষয় আলোচনার সময় তাড়াহুড়ো করে কোন কথা বলা তার অভ্যাস ছিল না, নীরবে অপরের বক্তব্য শুনে গিয়ে সাধারণত বেশ কিছু সময় নিয়ে তবে সে মন স্থির করত। তার সব কাজেই যেন থাকত শান্ত, অচঞ্চল, দ্রুবগতি এক ছন্দ, কিন্তু সে-ছন্দের কোথাও গলদ থাকত না।

লক্ষ্ণৌয়ে প্রগতি লেখক সংঘের সর্বভারতীয় সম্মেলনে (১৯৩৬) 'বন্নে' সংঘের প্রথম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়। ঐ সংঘের পরিকল্পনা যখন প্রথম কয়েকজন লণ্ডন-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রের মাথায় আসে, তাদের মধ্যে সে বোধ হয় ছিল সবচেয়ে আগ্রহশীল। দেশে ফেরার পর নিছক রাজনীতির হাজার দাবি থাকা সত্ত্বেও প্রগতি লেখক সংঘের জন্য সে প্রচুর পরিশ্রম করেছিল, সংঘের প্রকৃতই সে ছিল প্রাণস্বরূপ। ভারতবর্ষের প্রায় সব প্রদেশেই সে লেখকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। তার চরিত্রমাধুর্য ও আন্তরিকতা মতনির্বিশেষে সবাইকে আকৃষ্ট করত। যেখানেই যখন একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এসেছে, তখন তাই 'বন্নে'-র উপস্থিতি সবাই চেয়েছে।

১৯৩৬-৪১ সালে কমিউনিস্ট পার্টির যখন প্রকাশ্যে কাজ করা প্রায় অসম্ভব ছিল, তখন কিছুকাল 'বন্নে' ছিল কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টিতে। কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কাজ করার কিছুটা সম্ভাবনা তখন ছিল, উত্তর প্রদেশ কংগ্রেসের সেক্রেটারী তখন হন 'বন্নে'-র পুরানো সহকর্মী ও বন্ধু জইন আহ্‌মদ। এলাহাবাদে 'বন্নে'-দের বাড়ি তখন জমজমাট হয়ে থাকত; আজ যিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী সেই শ্রীমোহনলাল গৌতম প্রভৃতি আরও অনেকে আসা-যাওয়া করতেন। নেহরুজী তখন প্রায়ই বেশ ভালো ভালো কথা বলতেন, মনে আছে ১৯৩৬ সালে আনন্দ-ভবনে বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন যে স্বাধীনতার লড়াই আর সোশালিজ্‌মের লড়াই দু'টো আলাদা ব্যাপার নয়—ঘটনাটা এমন নয় যে দুটো লাড্ডু রয়েছে, একটা আগে খেয়ে তার পর দ্বিতীয় লাড্ডুটার দিকে নজর দিতে হবে। যাই হোক সেই যুগে 'বন্নে' এবং তার সাথীরা উত্তর প্রদেশে রাজনীতি-সচেতন মহলে যে কাজ করেছিল, তার দাম খুব বেশী।

আশৈশব বিলাসের মধ্যে সে মানুষ হয়েছিল। তার বাবা স্যর ওয়াজীর হাসান লক্ষ্ণৌয়ে আওধ চীফ কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন; কংগ্রেস এবং লীগের ঘাটে জল খেয়ে শেষে স্বতন্ত্রভাবে রাজনীতির সঙ্গে কিছুটা সংস্পর্শ রেখেছিলেন। লক্ষ্ণৌ এবং এলাহাবাদে তাঁর বাসভবনে সর্ববিধ ব্যবস্থা ছিল রাজসিক; এক সময় নাকি সেখানে রেওয়াজও ছিল যে রাত্রে একপ্রস্থ ইংরেজী খানার পর আবার মোগলাই খানা পরিবেশণ করা হবে। 'বন্নে'-র মা ছেলের বন্ধুবান্ধবদের খাওয়াতে খুব ভালোবাসতেন। ১৯৩৬

সালে তাঁর এক ছেলে কংগ্রেসী (হুসেন জহীর), এক ছেলে লীগওয়ালা (আলী জহীর), আর এক ছেলে (বন্নে) কমিউনিস্ট, বন্নে-কে নিয়েই তাঁর মুশকিল ছিল, কখনও সে জেলে, কখনও সে ঘুরে বেড়াচ্ছে বা কোথায় রয়েছে তার পাত্তা নেই। আজ পাকিস্তানী জেলে তিনি ছেলের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি নাকি পাচ্ছেন না।

উর্দু লেখক হিসাবে 'বন্নে' রীতিমত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, রাজনীতির দাবি একটু কম কঠোর হলে হয়তো সে সাহিত্য-সেবাকেই তার মুখ্য কর্ম বলে গ্রহণ করত। "লণ্ডন মে এক রাত" নামে যে-উপন্যাস সে লিখেছিল, উর্দু সাহিত্যে তার স্থান নিঃসন্দিগ্ধ। অন্য ভাষাতেও এর তরজমা হওয়া দরকার, হিন্দীতে সম্ভবত হয়েছে। বিলাতে প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের জীবন আর আনন্দ নিরানন্দ নিয়ে এমন দরদী লেখা প্রায় নেই বলা চলে। একবার আমায় সে বলেছিল, 'জানো, আমার ঐ বইটার চরিত্রগুলোর মধ্যে যাকে বলা যায় সবচেয়ে মিষ্টি ('sweet'), দেশী বিদেশী ছেলেমেয়ে সবাই যাকে ভালোবাসে, তাকে আমি বাঙালী করেছি'। লণ্ডন দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় শহর, সঙ্গে সঙ্গে আবার সেটা হল loneliest city—সেখানে যত নিজেকে একা মনে হতে পারে এমন আর হয়তো কোথাও নয়। সেখানকার সাময়িক বাসিন্দা ভারতীয় ছাত্রদের নিয়ে রচিত কাহিনী 'বন্নে'-র একটা স্মরণীয় কীর্তি।

কিন্তু লেখক-পরিচিতির চেয়ে অনেক বড় পরিচিতি হল তাঁর চরিত্র, তার একাগ্র, অনাড়ম্বর কর্মোন্মাদনা। বিভিন্ন বয়সের বহুজনকে সে আকৃষ্ট করতে পারত। বন্ধুদের অনাবিল অন্তরঙ্গতা দিয়ে সে একান্ত আপন করতে পারত। আমাদের চিরলাঞ্ছিত জন্মভূমির মর্মবেদনাকে অনুভব করে যেন ভারতের প্রতি তৃণখণ্ডের প্রতি সে অখণ্ড মমতা [illegible]

কথা কও

ফয়েজ্ আহ্মদ ফয়েজ্

কথা কও, কারণ এখনও অবাধে মুখ খুলতে পার তুমি,
তোমার জিভ তো আজো তোমার স্ববশ, কথা কও,
খাড়া হয়ে আজো দাঁড়াতে পারে তোমার দেহ,
কথা কও, এখনও, এখনও স্বাধীন তোমার জীবন।
ছাখো ছাখো, কেমন করে কামারের হাপরে
লাফাচ্ছে লকলকে আগুন আর ইস্পাত গনগনে লাল :
হাঁমুখ ব্যাদান করছে কুলুপগুলো,
আলিঙ্গন বিস্তার করছে শৃঙ্খল।
সময় সংক্ষেপ যদিও তবু কথা কও, কেননা এখনও সময় আছে
তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তোমার জিভ ভবিষ্যতে প্রতারণা করার আগে,
সত্য জীবন্ত থাকতে কথা কও,
কথা কও, যা বলার আছে বল, কথা কও।

অনুবাদ : মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

অগ্নি-বুদ্বুদ

বিমলচন্দ্র ঘোষ

মনোতুরঙ্গ আজিকে বল্‌গাহারা
তামাটে মেঘের নিথর পাথুরে পথে,
ক্ষুরের দাপটে দুরাশার ধ্রুবতারা
ছোটে উদ্দাম ব্যথায় অগ্নি-রথে।

পাঁজরের হাড় একে একে খসে পড়ে
দুর্ভাবনায় তপ্ত মাথার খুলি,
পায়েব তলায় দাঁড়াবার মাটি নড়ে
ক্ষ্যাপা-তুরঙ্গ দুপাশে ওড়ায় ধুলি।

লোহা দিয়ে মোড়া দাসত্বে এলোমেলো
প্রতি পদপাতে বিদ্যুৎশিখা জ্বলে,
জীবনের পথে কারা গেল কারা এল
ছায়া পড়ে নাকো অন্ধ-চোখের জলে।

আশে পাশে রাঙা মিছিলের ছায়া কাঁপে
অসংখ্য কোটি আগুনের বুদ্বুদ,
বজ্রশিখায় স্বর্গের সিঁড়ি মাপে
নরকে লুকায় যমের ভয়দূত।

কে বলে হায় তোর

পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

কে বলে হায় তোর হৃদয়ে কুলকুল যমুনা বয়ে যায়,
কে বলে হায় তোর দু পায়ে ঝলমল শিউলী কুমকুম।
দু চোখে মেঘ মেঘ আকাশে রামধনু। দু ঠোঁটে ভোরবেলা
বাজায় বীণ্‌ তায়। কে বলে বল তোর হৃদয়ে নিশিদিন
বাউল গান গায়।

আমি যে দিনভোর শুকিয়ে হাড়মাস মাঠে ও মিলে খাটি।
আমি যে ঘর গড়ি। দুহাতে ধান বুনি। কোদালে মাটি কাটি।
শুকিয়ে দেহমন দুহাতে নাও বাই। মাথায় মোট বই
শহরে রাজপথে। আমি যে কোনদিনই জীবনে এতটুকু
পাইনি শান্তিকে।

আমি যে ছেলেবেলা অনেক রাজপুরী গড়েছি মনে মনে।
আমি যে কতবার পক্ষীরাজে চড়ে দেখেছি সেই দেশ।
সেখানে সোনা আর রূপোর ফুল ফোটে, মানিক ধুলোময়
আমি যে বহুকাল অনেক কামনায় গড়েছি মহাদেশ
বুকের মাঝখানে।

সহসা একি হল! আকাশে চেয়ে দেখি মেঘেরা পুড়ে খাক্।
তারারা হাসে নাকো। পাহাড়ী ঝর্ণারও দুহাতে হাতকড়া।
নদীরা খসে গেল বালির পথে পথে। মিলের কালো ধোঁয়া
সাপের মত বেঁকে ছড়ালো গাছে গাছে। বিষের বাঁশী যেন
বাজলো ফুলে ফুলে।

কে বলে বল মাগো হৃদয়ে কুলকুল পদ্মা বয় তোর।
আমি তো বুকচাপা কান্না শুনি শুধু প্রতিটি ঢেউয়ে ঢেউয়ে।
আমি তো দেখি শুধু আমার রাজপুরী কারা যে ভেঙে দেয়।
কারা যে কেড়ে নেয় হৃদয় ছিঁড়ে খুঁড়ে সুখের সব গান
বুকের ভালবাসা।

কে বলে হায় তোর দু ঠোঁটে ভোরবেলা বাজায় বীণ্ তার।
আমি যে দেখি তোর সারাটা দিনমান ব্যথায় থরো থরো,
আমার প্রাণে তাই ঝড়ের পাখা নড়ে। তোকে যে বাঁচাবোই
সুখের শাখা ভরা সোনার ফুলে ফুলে। আমার দেশ তুই।
তোকে যে বাঁচাবোই।

তক্ষক

রঘুনাথ ঘোষ

আশ্চর্য উজ্জ্বল চোখ হিংস্র হিরণ্ময়
চিত্রিত সোনার অঙ্গ বিচিত্র খোলসে
দ্বিখণ্ড লোলুপ জিহ্বা শান্ত সদাশয়
পিচ্ছিল নখরকান্তি তপ্ত রক্ত শোষে।

অতিকায় প্রাসাদের কঙ্কাল গহ্বরে
সহস্র লালসালুব্ধ বিলাসী জীবন
অলস আরামে পুষ্ট দীর্ঘ অবসরে
বর্ধমান কামনায় জোগায় ইন্ধন।

লক্ষ লক্ষ লখীন্দর পরীক্ষিৎ আজ
ওদের বিষের তাপে নির্জীব অসাড়
বিষাক্ত দংশনে নীল মানব-সমাজ
পঙ্গু জীর্ণ মৃতপ্রায় অস্থিচর্মসার।

জর্জরিত মানুষের পথভ্রষ্ট মন
হতাশায় দিন কাটে জাগে সদা ভয়
আসে বুঝি অতর্কিতে বীভৎস মরণ,
আমি জানি ভয় নেই—জাগে জন্মেজয়।

বেহুলা অতন্দ্র আজ সতর্ক প্রহরী
কঙ্কালে জীবন জাগে দীর্ঘ সাধনায়
নৃত্যছন্দে লেলিহান অগ্নির লহরী
সচকিত সুর-সভা, ইন্দ্র শিহরায়।

পণবদ্ধ জন্মেজয় অচল অটল
পিতৃহত্যা প্রতিশোধে চিতা-বহ্নিমান

ভীত ত্রস্ত অহিকুল আকুল চঞ্চল
ভেঙে যায় সুখস্বপ্ন স্বর্গ অভিমান।

প্রাণ নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পালায় তক্ষক
কোথাও নিস্তার নেই স্বর্গে বা পাতালে
সর্বভুক বৈশ্বানর স্বয়ং ভক্ষক
যজ্ঞকুণ্ডে জন্মেজয় পূর্ণাহুতি ঢালে।

ত্রিলোকে আগুন জ্বলে ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বক্
পাতালে বাসুকী জ্বলে স্বর্গেতে তক্ষক।

এই পথ

সুশীলকুমার গুপ্ত

মুমূর্ষু হাতের মত যে ধূসর নাগরিক পথ
হারিয়ে উজ্জ্বল আশা, জীবনের বলিষ্ঠ শপথ
প্রসারিত মরণের মুখে,—
সেই পথে জীবিকার ছিন্ন থলি ভ'রে নিতে ঝুঁকে
সকালে—বিকেলে যাই আমি,
বাংলার কেরানী-কবি, বাস্তহারা সংসারের স্বামী।

এ-পথে নির্বাক আলোপোস্টগুলি জ্বালে না আশ্বাস,
মৃতের মনের মত থমথমে ভুতুড়ে আকাশ ;
নক্ষত্রের ঝাঁপি গেলে খুলে
তির্যক আলোক-রশ্মি সাপগুলি নাচে ফণা তুলে।
তৃষ্ণার্ত জিহ্বায় চাটে ধোঁয়া-পাতা-ধুলো শুষ্ক বায়ু,
ভাঙাচোরা মানুষেরা বেচে দিয়ে মুঠো মুঠো আয়ু
রেখে যায় করুণ স্বাক্ষর,
ট্রাফিকের শব্দে কাঁদে বঞ্চিতের ব্যথিত অন্তর।
জানলা-সার্শিতে পথে নেই দীপ্ত প্রাণের ইশারা,
মোড়ে মোড়ে চোরা মৃত্যু, শাসনের নির্মম পাহারা ;

তপ্তশানে শুকায় কঙ্কাল,
ভিক্ষাপাত্রে মনুষ্যত্ব, পণ্যশালে ফাঁকির জঞ্জাল।

এই পথে একদিন গোধূলি-ছায়ায় চেয়ে দেখি—
একি !······
অনেক আগুন-রাঙা পতাকারা স্বার্থঠায় ডানা
সমুদ্র পাখীর মত ; পথের ছুঁ'ক্তটে দেয় হানা
দুরন্ত প্রাণের নীল ঢেউ,
রক্তাক্ত মেঘের চোখে বিদ্যুতের বহ্নি আলে কেউ ;
খুলে দেয় বোবা শানে শাপমুক্ত গানের নির্ঝর,
ছাড়া পায় বাতাসের বুকে বন্দী আগুনের ঝড়,
দুর্নিরীক্ষ্য নক্ষত্রের বাণী
ট্রামের লাইনে তারে ক্ষিপ্তবেগে করে কানাকানি।
মনে হয়—এই পথে লেখা আছে মহা ইতিহাস,
নূতন প্রাণের সূর্য, মহাদেশ, উজ্জ্বল আকাশ
জেগে আছে এ-পথের বাঁকে ;
সময়ের ভোর থেকে এই পথ জীবনের ডাকে
এশিয়ার মাঠে হেঁটে, পার হ'য়ে রুশের প্রান্তর,
চীনের প্রাচীর ঘুরে, কোরিয়ার জ্বলন্ত নগর,
বান-ডাকা নদী, খনি, দ্বীপ, ক্ষেত, পাহাড়-জঙ্গলে
এইখানে এলো আজ চলে।

তখন রক্তের স্রোতে সমুদ্রের দুরন্ত জোয়ার,
স্বপ্নের অরণ্যে ঝড়, মরু-মনে মেঘের সঞ্চার,
চেতনায় বিদ্যুৎ ঝিলিক,
বলে উঠি, "বেঁচে আছি, এ-পথেরও আমি পদাতিক।"

ধ্রুবপদ

সুধীরচন্দ্র রায়

ধনদৌলতে অমৃত নেই, তাই ঋষির পত্নী স্বামীর সঙ্গে বনে গেলেন। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। প্রজার অভিযোগে সীতাকে নির্বাসন দিলেন রাজা রামচন্দ্র। পতিতপাবন সীতারাম। মানুষের সমস্ত দুঃখ দূর করতে হবে, তাই সর্বস্ব ত্যাগ করলেন সিদ্ধার্থ।—শরণং গচ্ছামি। কটিবস্ত্র ধারণ করলেন ব্যারিস্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। জাতির জনক।

"আহা তা বেশ"—ধুয়া।

হাওড়ার যাত্রীঘরে বিহার-প্রত্যাগত রিফিউজী দল। রাষ্ট্রের সর্বনাশ করবার জন্যে ওরা উঠে পড়ে লেগেছে। এল পাকিস্তান ছেড়ে জীবনের ভয়ে। জাতির কলঙ্ক এই সব ভীরুর দল। মূর্খ-ও ওরা। জানে না ধর্ম বলে সত্যিকার কিছু নেই। রাজনীতির চাপে কতবার কত জাতির ঐতিহ্য আর সংস্কার পালটে গেছে। এরা সেই নীরব নির্দেশটা মাথা পেতে নেয় নি। তবু দয়াধর্ম করে বিহারের ক্যাম্পে তাদের পাঠান হয়েছিল। কিন্তু বিহারের গাছে এই কলম লাগল না, জুড়ল না। ফিরে এল। সমাজকে আর ভাষাকে এখনও ওরা বড় বলে মনে করে। জীবনের বিনিময়ে এরা জাতির শত্রুতা করতে চায়।

বড় রিফিউজী একটা দোকান করেছে এই যাত্রীঘরেরই মেজের উপর। আহা দোকানের কি ছিরি! একখানা খবরের কাগজ, তার উপর সেরখানেক চিড়ে, পোয়াটেক বাতাসা, গোটা কয়েক ল্যাংড়া আম, আর এক ছড়ি কলা সাজিয়ে দোকান। দোকান আর দোকানীর অবস্থা দেখলে চোখে এক ফোঁটা জল-ও আসে না। বাঁচবার ভাণ করে কিইবা লাভ। যে-খবরের কাগজটা পেতে দোকান করেছে, যদি চোখ থাকত, তবে দেখতে পেত সরকার কত টাকা এদের জন্যে বরাদ্দ করেছেন। তবু তাদের বাঁচান যাচ্ছে না। অদৃষ্টের এই পরিহাসের বিরুদ্ধে কিইবা করবার আছে।

বড় বসে আছে যেন বজ্রাসনে। এপাশে একটি শিল্পী উদ্বাস্তদের একেবারে খাঁটি বাস্তব চেহারা আঁকবার জন্যে তুলি নিয়ে বসে। ও পাশের বুড়ো রিফিউজীর বসবার ধরনটা তার তুলির আওতায় এখন। পায়ের রগ-

শিরা ফুটে বেরিয়েছে, চামড়ায় ময়লা জমে জমে ফেটে উঠেছে, হাতের শিথিল মাংসপেশীর জড়ীভূত চেহারা, স্তম্ভিত ওষ্ঠ, আর জট-পাকানো চুলের বেপরোয়া অগ্নিমূর্তি—সবকিছু শিল্পীর নজরের একেবারে কেন্দ্রে এসে পড়েছে। ছবিটা ভালো দামে বিকোবে। শিল্পীর এ এক চূড়ামণি যোগ।

ট্রেনের যাত্রীরা সম্ভ্রম করে পরশ বাঁচিয়ে চলছে। চলনে বলনে সহানুভূতির খই। জামের মতো গালের চেহারা করে হিন্দুস্থানী পুলিসটা দেখছে বিরূপ বিবস্ত্র রিফিউজী মেয়েটার শোবার ভঙ্গি।

এখানে এদের দোকান করায় কেউ বাধা দেয় নি। দেশবাসী জানে, আজ এরা যে ঘরছাড়া এর জন্তে তারাও দায়ী। ধার্মিক আকর্ষণও আছে। অন্ত ধর্মের পুঁথি পড়লেও যে এ ধর্মের লোকের সর্বনাশ হয়। সেক্ষেত্রে অন্ত ধর্মের দেশে এদের থাকতে বলা যায়ই বা কি করে! আর কিছু না হোক, সংখ্যার দিক দিয়েও যে সর্বনাশ। বাঁচুক মরুক, জন্মাক না জন্মাক, সংখ্যার হিসেবটা ঠিক রাখা তো দরকার। কাজেই ওদের দোকান করতে দাও।

ঝড়ু দোকান করেছে। বাণিজ্যেই লক্ষ্মী বাস করে। খরিদ্দারও কম নয়। ঐ উদ্বাস্তরাই। দূর থেকে কিছু আনার চেয়ে নিজেদের লোকের কাছ থেকেই তারা কেনা পছন্দ করে। ঝড়ু এদের সঙ্গে ব্যবসা করে আরামও পায়। কারও নাক সিঁটকানোর উপায় নেই, অথচ ওদের ঠকান যায় বেশ।

পাঁচু রিফিউজীর পাঁচ বছরের মেয়েটা দশটা পয়সা নিয়ে এল চিড়ে আর কলা কিনতে। ঝড়ু তাজ্জব ব'নে যায়। পাঁচুর অনেক পয়সা হয়েছে তো!

—এতো পয়সা কুথায় পালি রে?

ঝড়ুর চোখ চিকচিক করে উঠল। মেয়েটার কাছ থেকে কোন কথাই পাওয়া গেল না। আট পয়সার জিনিস অথচ দশ পয়সার বুঝ দিয়ে মেয়েটাকে বিদায় করল। ঝড়ু ভাবল। পাঁচুকে ঠকিয়ে কোন অন্যায় করা হয় নি তো? না কোন অন্যায়ই নয়। যাদের পয়সা আছে তাদের কাছ থেকে পয়সা বের করে নিতে না জানলে তারা এমনি এমনি দেবে না। পাঁচুর অনেক পয়সা। দশ পয়সা।

কিন্তু পেল কোথায়? হাবার মা-কে দোকানে বসিয়ে রেখে চলল ঝড়ু পাঁচুর খোঁজে।

নেংটি পরে বসে আছে পাঁচু তার অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে। ঝড়ুর পরনের কাপড়টা এখনও ভালোই। পাঁচুর অসহায় অবস্থা বুঝতে পেরে ঝড়ু দূর থেকেই সাড়া দিয়ে বলে,

—ইজ্জত সামলাও পাঁচু, আমি আসতেছি।

পাঁচু টেনেটুনে কাপড়টা ঠিক করল। বউকে ফিসফিসিয়ে বলে,

—পাছ ফিরে বসো ভালার মা, ঝড়ো রেফুজী আসতেছে।

ভালার মা ছেঁড়া ন্যাকড়াগুলো জড়ো করে পিছন ফিরে বসল। অন্যান্য বয়স্থা মেয়েরা মেঝের কাত হয়ে পড়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। আধ-হাতের ব্যবধানে তৈরি হয়ে গেল অন্তঃপুর আর বৈঠকখানা। ঐ ধারের শিল্পী কিন্তু এমন সুযোগ নষ্ট করল।

কটিবস্ত্র ধারণ করলেন ব্যারিস্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। জাতির জনক॥

"আহা তা বেশ"—ধুয়া।

—নাখোপতি কেমুন করে হলে গো? ঝড়ু জিজ্ঞেস করে।

—সে কথা আর কয়ো না। খুব বিহেনে উঠ্‌বা, বুঝলে? ভগমান মিলেয়ে দিতি পারেন। কালকে শেষ রাত্তিরি হারান রেফুজীর তো হয়ে গেল। বিহেন না হতি হতি মড়া-ফেলানে গাড়ী আস্তে ভীড়ে গেল। গাড়ীডা দেহে মনটা দমে গেল। হারার হলিউ এদ্দিন ছিলাম এক সাথে। আ'লো এহেনে বাঁচবার জন্তি—তা মরেই গেল!

ঝড়ু-পাঁচু নিজেদের কথাটা একবার ভাবে। যেন গ্রামে মহামারী লেগেছে, আজ হোক কাল হোক তাদেরও তো অমনই যেতে হবে। ভয়ে সহানুভূতি থম থম করতে থাকে। যাত্রীদের যাতায়াত যেন নেই, কুলিদের হাঁকডাক, টিকিট-বাবুদের ঘরের খটাং খটাং শব্দ, ভোঁতা চেহারার বোঁচা ইঞ্জিনের প্রচণ্ড শাসানি কিছু যেন নেই এ জগতে। পাঁচু আবার বলে,

—গেলাম মড়া-গাড়ীতে পজ্জন্ত। নিজিগোরে লোক, আমরা শেষ-দেখা না দেহ্‌লি কিডাই বা দেখবি। চোখ ঝাপসা হয়ে আ'লো। আর পারলাম না দাঁড়াতি। ফিরে আসতিই, ঐ টিকিট-ঘরের নীচেই, বুঝলে, পয়হা দশটা ঝকঝক ক'রে উঠল। চোখের ঝাপ্সা তহন কাটে গেছে। তা নিলাম কুড়েয়ে। ভগমান যতি দিলেনই, তা নিতি আপত্য কি?

ঝড়ু ঠ্যাঙ দুটো জড়ো করে বসেছিল। হাঁটু দুটোকে জোর-জোর নাড়াতে থাকে। কেরানীদের রেশার্স-টিকিট নিয়ে আলোচনার মতো এদের আলোচনা। ঝড়ু ঈর্ষার বশে বলে বসে,

—কিছুক ও পয়সা নিজের জন্নি খরচ ক'রে ভালো কর নাই গো! ওজা হারানের আত্মা তার সম্পত্তির জন্নি তুমার হাতে তুলে দিছে।

পাঁচু অবধূত-সন্ন্যাসীর মতো বলে,

—খাওয়ার ব্যাপারে খটকা লাগায়ো না ঝড়ু। এহেনে থাকতি পারল না বলেই আত্মা তার খাঁচাছাড়া হয়ে গেল। সে আত্মা আর এহেনে আসবি নে। ওড়া-পাখী কি খাঁচায় আবার আসে? পয়সা জুটিছে জ্বালার ক্ষিদের তাড়নায়, বুঝলে না?

ব'লেই পাঁচু যাত্রীদের নিঃশেষিত সিগারেটের ফেলে-দেওয়া টুকরো মেঝে থেকে তুলে মুখে দিয়ে ধরাল। ঝড়ু লোভার মতো বলে,

—আও আমি ধরায়ে দেই।

পাশ দিয়ে যাচ্ছিল যাত্রী। সিগারেটের এই কাড়াকাড়ি দেখে সে আস্ত একটা সিগ্রেট ছুঁড়ে দিয়ে গেল।

তাদের চোখে জল নেই। ঘন ঘন চোখের পাতা নাড়াতে থাকে। কৃতজ্ঞতা জানাতে এছাড়া তাদের আর কোন উপায় নেই। ভগবানের অসীম করুণা। যার ভাবা নেই তার জন্যে শেষ দিয়েছেন।

—দেখলে? স্বজাতির ব্যাভারই আলাদা। পাকিস্তানে এমুন হতিপারত?

ঝড়ু পাঁচুর কথায় সায় দিয়ে একটান সিগ্রেট টেনে মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল, না, এমন হতে পারত না।

সিগারেটের মৌতাত তখন এসে গেছে। মুখ আর মন তখন খোলতাই। ঝড়ু বলে, আমি ভাবতেছি আর এট্টা কথা—

—কি, কও।

—ভাবতেছি ঐ রাঙু রেফুজী এক বচ্ছর আগেও শেয়ালদা স্টিশানে হাবার মার দিকি ফ্যালফ্যাল করে তাকায়ে থাকত, আজ তাকায় না ক্যান্?

পাঁচু হাসতে হাসতে বলে,

—তহনও ট্যাকের জোর ছিল তো! তাই নারকেল তেল, মাথার কাঁটা, কাঁকই দিয়ে ভালোবাসা জানাত। বুঝলে, এট্টা কথা ঠিক জানবা— ট্যাকের জোর থাকলিই পরের বৌ-বিটির দিক চোখের জোর পড়ে।

—ক্যান্, তা হয় ক্যান্ ?

—এত বচ্ছর ঘর করলে আর ইয়েই বুঝলে না ? বলি ভালোবাসাডা কি ? না—তা কিচ্ছুই না—সেডারে আনাত্তি হয়। ভালোবাসা হয় না—তা আনাত্তি হয়। তা আনাত্তি হলিই দ্রব্য চাই। আর দ্রব্য কিনত্তি হলি—পয়সা চাই।

—ধ্যেৎ, আমি বিশ্বেস করি নে। ভালোবাসা কি জান ? সেডা প্রেম।

—ও তুমার প্রেমেরই ঘরোয়া নাম পিরীত গো। তয়, একথা ঠিক—বিশ্বেস না করলি থাকা যায় ভালো।

বড়ু এতক্ষণ ধরে এক বিষয়ে আলোচনা করতে চায় না। তার এ প্রশ্ন যে কারণে জেগেছিল, সেই কারণটার দিকেই আর একটু এগোবার জন্যে কবির দৃষ্টি নিয়ে বলে,

—কিন্তুক যাই বল, শিয়ালদা ছিলাম ভালো।

পাঁচু চোখ কুঁচকে বলে, কও ভালোডা দেহ্লে কি করে কও।

—ভালো না ! কলকাতা আসি নাই কোনদিন, তা আসা হল। কত কি ঘটনা। গাঁয়ে আছে এ সব ? কয়দিন তো সব দেখতি দেখতিই কাটে গেল। তারপর বাবুগোরে সেই দুধের টিন নিয়ে ঘোরাঘুরি ; লরী গাড়ী নিয়ে যুরঘুর করা ; মেমসাহেবের বিস্কুট বিলেনো। সব যেন এলাহি কাণ্ড। আমার তো রাত্তিরি ঘুমই আসত না। কখুন সকাল হবি, কখুন সকাল হবি—সেই প্রত্যাশা। তাছাড়া, তহনও তো আশা-ভরসা ছিল। কিন্তুক আজ, আজ মাড়োগোরে ভাশ থিকে ফিরে আসে—এহন কনে যাবো তাই-ই তো ভাব্যে পাইনে।

শিয়ালদা বড়ুর ভালো লাগত কারণ তখনও বিনা পয়সায় অনেক জিনিস জুটত। এমন কি তার বৌয়ের মাথার তেল, চুলের কাঁটা পর্যন্ত রায়া রিফুউজী এনে দিত। এমন করে মরা-মন তাদের হয় নি। নিজদের সম্বন্ধে এমন অনাস্থা আসে নি। হোক অবৈধ, তবু ভালোবাসা ছিল। হোক দুর্দশাগ্রস্ত, তবু মানুষ তাদের মানুষ বলে স্বীকার করত। হোক বাস্তুহারা, তবু তাদের অভাব মেটাবার জন্যে লোকের ব্যগ্রতা ছিল।

পাঁচু সিগ্রেট টানতে টানতে সায় দিল।

বড়ু আবার বলে, আচ্ছা কত্তি পার, জানদার বাবুরা হাওড়ায় তেমুন করে আসে না ক্যান্ ?

পাঁচু দার্শনিকের মতো বলে, সুখির দিন কি আর ফিরে আসে রে ভাই! যে দিন যায়, তা আর ফিরে আসে না।

—আরে ওতো হলো শাস্তরের কথা, তুমার কুথা কি তাই কও।

পাঁচু সটান হয়ে বলে, শুনবা?

—শোনবো, কও।

—চটবা না তো?

—চটপো ক্যান্, আমি কি মন্ত্রী যে নিজির কথা ছাড়া আর কারু কথা কানে তোলবো না? তুমি কও।

—শোন। দাবা খেলা দেহিছ?

—দেহিছি।

—মুনায়ে হাতি মারা দিয়েও ঘোড়া বাঁচায়, জান?

—হুতি পারে।

—সেই ঘোড়া আবার খাওয়া গেলি, 'এ-হে-হে-হে' করে শুনিছ?

—তা শুনিছি।

—কিন্তুক ওসব আপশোস তাদের মনের থে' আসে না। তারা আবার তহন ব'ড়ে-র দিক তাকায়। ঘোড়ার ব'ড়ের উপের তহন তাগোরে জবর মায়া।

—কিন্তু তাতে হলো কি? আমি তো দাবা-খেলতি চাচ্ছি নে।

—তুমি চা'বা ক্যান্? তোমায় নিয়ে খেলতেছে। আসল কথা কি জান, খেলুড়ের কিছুরই উপের মায়া নেই, সে চায় জিততি। আমাগোরে উপরও কারু মায়া নাই, ওরা আমাগোরে নিয়ে জিততি চায়। তা এখুন তো আপোসী সময়, এহন 'আহা-উহ' কেউ করবি নে। আবার ভোটের সময় আসুক—দেখো।

—ক্যান্, তহন কি হবি?

—ওই বক্রী হিঁদু মছুলমান আবার মরবি। আগুন জলবি, তেজ বাড়বি, মানুষ রুখে যাবি আর ভোটের ঘরে কাগজ ফেলবি। আজকালকার বুদ্ধই তো এইটে।

বঙ্কু তবু তার অভাব-সমস্যার সমাধান করতে পারল না। তাই সে হতাশ হয়ে বলে, কিন্তুক ওতে আমাগোরে লাভডা হলো কি?

—আমাগোয়ে লাভ হলো-কচু আর কাঁচকলা।

নিঃশেষিত সিগারেটটা পাঁচু ছিঁড়ে তার মধ্যেকার তামাক চিবোতে থাকে। ধোঁয়ায় তার নেশা জমে নি।

ধনদৌলতে অমৃত নেই, তাই ঋষির পত্নী স্বামীর সঙ্গে বনে গেলেন, আর ঋষি বলেন, অন্নং ন পরিচক্ষীত। তদ্‌ব্রতম্‌। ন কঞ্চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত। তদ্‌ব্রতম্‌। ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।।

"আহা, তা বেশ"—ধুয়া।

ঝড়ু দোকানে ফিরে এল।

—ওহ্‌, সব কলা গুলেই বেচিছ হাবার মা?

—খদ্দের পালাম তাই বেচে দিলাম। তোমার চিঁড়েও আধসের বেচিছি।

—ঠহ নাই তো?

—হিসেব ন্যাও না ক্যান্‌?

ঝড়ু হিসেব করে দেখল, হাবার মা বেশ লাভেই বিক্রী করেছে। ঝড়ু খুশি হয়। কিন্তু হঠাৎ হাবার মার মুখের দিকে তাকিয়ে ঝড়ু হেসে ফেলে।

—হাসলে যে? হাবার মা বলে।

চুরি চাকতি পার নাই হাবার মা। ক্ষুধার মুহি কলা-চিড়ে-মাখা লাগ্যে আছে।

শঙ্কিত-লজ্জিত হাবার মা। কিন্তুক ক্ষুধার পয়সা তো ঠিকই আছে!

—পয়সা তুমি পা'লে কুথায়?

—ভিক্ষের পাইছিলাম খানা কয়েক। ক্ষুধার চিড়ে-কলা আমি খাইচি প্যাটের জ্বালায়, কিন্তুক পয়সা ঠিকই দিছি।

ঝড়ুর বৈষয়িক বুদ্ধি জেগে ওঠে, এ কৈফিয়ৎ কৈফিয়ৎ নয়। ভিক্ষের পয়সা হাবার মার একার নয়। আজ ঝড়ুর বৌ-যে ভিক্ষায় বেরোয় এতে ঝড়ুরও অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। ঝড়ুর মর্যাদা, ঝড়ুর অক্ষমতার জোর ঘোষণা সব কিছুর জন্যে ঝড়ুকে প্রস্তুত থাকতে হয়। ঝড়ুর বৌয়ের হাতের ছায়া ঝড়ুরই হাত। নিশ্চয়, ঝড়ুও ভিক্ষা করেছে। এমন কি হাবাও ভিক্ষা করেছে। সেই ভিক্ষার পয়সায় একা খাওয়ার অধিকার নেই হাবার মার। গেরস্থালীর নিয়ম মানেনি হাবার মা। গম্ভীরভাবে ঝড়ু বলে,

—হাবার মা, তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী থিকে খারিজ হয়ে গেলে যে! তুমি অলক্ষ্মী।

—ক্যান্?

—শাস্তরে তাই কয়। জান, ঐ পয়সাও থাকত, আবার চিড়ে-কলা বিক্রীর পয়সাও জমত। তুমি গেরস্তের ধর্ম্ম মান নাই।

—কিন্তুক প্যাটের জ্বালায়—

হাবার বাপ হাবার মাকে ধমক মারে,

—প্যাটের জ্বালা প্যাটের জ্বালা। বলি প্যাটের জ্বালা আমার চে'ও কি তোমার বেশী। আর বেশী হলিই কি তুমি আর একজনের সাথে রাত্তির-বাস করবা? অমন প্যাট কাচি বাধায়ে কাট্যে ফেলাও হাবার মা।

ঝড়ু গোঁ হয়ে বসে।

হাবার মা প্রত্যুত্তর করে না। ক্ষুধা না মিটলে সেও তারস্বরে ঝগড়া করত। কিন্তু দুদিন পর আজ সে পেটপুরে খেয়েছে। তাই সে স্বামীর কথায়ও শান্ত থাকে। অপরাধ সে করেছে, শান্ত থাকাই উচিত।

দোষ তো তারই। পারে নি, পারে নি সে স্বামী-পুত্রকে খাইয়ে-পরিয়ে নিজে খাবার অপেক্ষা করতে। সে জানে অপেক্ষা করলে সে খেতে পেত না। আজ দুদিন তো এমনি করেই তার একার অনাহার গেছে। না-খেয়ে শুকিয়ে সে মরতে পারত। কিন্তু পেটে যে আরেকটা শত্রু এসেছে তাকে তো দেখতে হবে। সে তো পৃথিবীর এই হাহাকার দেখতে পাচ্ছে না। শুষ্ক চোখে হাবার মা তাকিয়ে থাকে।

ঝড়ু রাগে সমস্ত দোকানটা পা দিয়ে উলটিয়ে দেয়। ছিঁড়ে গেল কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রীর ঘোষণা-পত্র। ছিঁড়ে গেল আরও কত অভিনব সংবাদ। ছিঁড়ে গেল, দেশে নাচ-গানেরও উৎসাহ দিতে হবে বলে কংগ্রেসের প্রিয়তম অঙ্গীকার। প্রজার অভিযোগে সীতাকে নির্বাসন দিলেন রাজা রামচন্দ্র। পতিত পাবন সীতারাম।

"আহা, তা বেশ"—ধুয়া।

সন্ধ্যার অন্ধকার, ত্রিশঙ্কু। উপরের লাথি, নীচের হুকুম। বিদ্যুতের আলো সমস্ত শক্তি কাজে লাগিয়েছে, যেন কারখানার ইঞ্জিনের বড় চাকাটা মানুষের মতো কয়েকটা লোক বুক দিয়ে ঠেলছে। জ্বলছে ট্রাম-বাসের

বিপজ্জনক মাথায় মণি। আর নিনের তান করছে মানুষের ব্যস্ত চলন। কাকের কর্কশ ধ্বনিও আছে, মানুষের নীরব তির্যক বিদ্রূপ পরস্পরের প্রতি। গাড়ীর চালকেরা ঠায়ে দাঁড়িয়ে আর বসে দ্রুত ধাবমান কেরানীদের ভাবে, ছেলেমি আর গেল না—স্থিরতা এদের এল না; করণিকেরা ভাবে, ঐ রকম পেরেক ঠোকা পদার্থগুলো কি মানুষ?

বহুদূর দেশ থেকেও আসছে মানুষ। দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার ছায়ামাত্র যাদের কপালে পড়ে নি। আসছে তারা দেবসভা থেকে।

হিন্দুস্থানী মেয়েরা পাতি নেবুর ঝুড়ি নিয়ে রাস্তার উপরই বিক্রী করতে বসে গেছে। লে-লে বাবু দো-পয়সা। বাচ্চারাও জুটেছে উপার্জন করতে।

লোভীর মতো ঝড়ু এদের দেখে। কত সুন্দর এদের গৃহস্থালী। চারদিক থেকে এরা আয় করে। আর বাঙালী ঘরের বৌ, ইস্কুলের ছেলে হাত গুটিয়ে বসে স্বামী বা পিতার পকেটের দিকে তাকিয়ে থাকে। পকেটমার সব। বাঙালীরা পারে না। পারে না কেন—পারতে হবে। সৃষ্টির গোড়ার দিকে ফিরে যেতে হবে। স্নেহ-প্রীতি-মর্যাদা-শিক্ষা মানুষ হওয়া সব কিছু মিথ্যা। খাওয়া-খাওয়া-খাওয়া। খাওয়ার জন্যেই কাকডাকার সঙ্গে সঙ্গে জেগে ট্রাম-বাস খেয়ে-যাওয়া রাত্রি পর্যন্ত কাজ করতে হবে। রাত্তিরের যে সময়টা হাতে থাকল, ব্যয় কর সে সময়টা নর-নারীর পারস্পরিক যৌন-স্ফূর্তিতে। পত্নী বলে কিছু নেই, স্বামী বলে কিছু নেই। বংশবৃদ্ধি ক'রো না, ওতে জাতির অভাব বাড়ে। শুধু ভোগ আর উপার্জন।

কিন্তু ভালোবাসা। ঝড়ু বউকে যে ভালোবাসে। তাই তো এ সব সে করতে দিতে ইচ্ছে করে না। ঝড়ুর বউও ঝড়ুকে ভালোবাসে। তাই কেউ হাত ছুঁয়ে দিলে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। ভালোবাসা। একটা মন আরেকটা মনের জন্যে সব দিক থেকে রিক্ত হয়ে প্রস্তুত থাকে।

ধ্যেৎ, ভালোবাসা এমনভাবে হয় নাকি? ভালোবাসে ঐ ফিনফিনে ধুতি আর শাড়ী পরা গাড়ীর যাত্রীরা। তাদের ভালোবাসাকে ঐ ফার্স্ট ক্লাশের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ঘরে দয়া করে দয়া বিলোতে আসে। দয়া করে তারা গরীবের ঘরের মেয়েকে বাইজী বানায়, সিনেমায় ঢোকায়, ভালো ভালো পাড়ায় বড় বড় বাড়ীতে আশ্রয় দেয়। হাবার বাবা বা মা ভালোবাসতে পারে না। হাবার মা-ও নেবু বেচুক। নেবু বেচতে হবে।

বেচে-ও তো। আজ চিড়ের দোকানে বসে ছিল। হাত পেতে ভিক্ষেও চায়। তবে? না ও-রকমে হবে না। খুঁৎখুঁতে মন নিয়ে চলবে না। আজ হাবার মাকে এসব করতে দেয় ঝড়ু এই আশায় যে, একদিন সুদিন আসবে সেদিন এমন করবে না। জীবনের এই যাত্রাকে তারা চায় না। ভূমিকম্পে বাড়ী ভেঙে গেছে, মেয়েরা পথে বেরিয়ে পড়েছে। তার মানে এ নয় ঐ মেয়েরা অন্তঃপুরিকা নয়; কাপড়ের কন্ট্রোল হয়েছে, ঘরের মেয়েরা উলঙ্গ তার মানে এ নয় যে ওরা আব্রুহীন। ঝড়ুদেরও সেই অবস্থা। কিন্তু এই ভরসা ভাঙতে হবে। একেবারে আত্ম-ঈভ হয়ে দিল্লী মেইলের কাছে প্লাস্টিকের-খেলনা তাদের বিক্রী করা চাই। তার মানেই, স্বাবলম্বন।

—ঝ'ড়োদা নাকি?

ঝড়ু পিছনে তাকিয়ে দেখে পালঙের মতিলাল রিফুউজী।

—হ্যাঁ, তুমি কম্‌ থে?

—এই পাঠের মন্দির থে' তাইসা উঠলাম শুশুকের মতো।

সাদা দাঁত ফাঁক করে মতিলাল হাসে হা হা হাসি।

ঝড়ু জিজ্ঞেস করে, তা আছ কেমন?

—আছি ভালোই। বেলুড়ের কাছে চায়ের দোকান দিছি। তা উপায় মন্দ না। চাউলের থিকা চা'র কাটতি কম না।

—কিন্তু টাকা পা'লে কুথায়?

—জান না? শিয়ালদা চাদ্দিন পইড়া থাকলাম। হঠাৎ দেখা হইয়া গেল রাজেনদার সাথে। রাজেনদা কইল, 'তুই পইড়া আছস ক্যান, চল্‌ আমার লগে।' গেলাম। সেই রাজেনদাই কেমন কইরা জানি না মাস মাইনা চল্লিশ টাকা জোগাড় কইরা দিল।

—কামডা কি?

—কাম আবার কি? সেবার স্বদেশী আন্দোলনে মাস কয়েক জ্যাল খাইটছিলাম। সেই কারণেই সরকার থিকা নির্যাতিত কর্মীদের লিগা এই মাসোহারা বন্দোবস্ত কইরা দিছে। আমিও দেইখালাম, যথা লাভ। লক্ষ্মী আইবার চাইতাছে, আসুক। কি ভাবতাছ কি?

—ভাবতেছি, যে শালাগোরে মাগ-ছাওয়াল নাই, তাগোরেই এমনভাবে টাকা জুটে যায়।

—তাই-ই তো কয় ঝ'ড়োদা। যার অভাব নাই তার লগেই তো ঐ

লম্মীঠাইকরানের ভাব জমে! তা তোমরা আছ কেমন, বৌদি আর পোলাডার আছে কেমন?

ঝড়ু নিঃসহায়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। রাগও যে ছিল না, এমন নয়। মতিলাল হেসে বলে, তুই বেলা রামধুন গাইয়ো, বুঝলা না? রামধুন গাইলে হক্কল সাইরা যাইব।

—সিডা আবার কি?

—কেত্তন, কেত্তন। নিমাই গাইছিলেন কেষ্ট ঠাকুরের, আর রামধুনে গায় কি কইরা মাহুষে মাহুষে ভালো থাইকবার পাইরবো—সেই গাওনা। গান্ধীজীর নাম শুইনছ?

ঝড়ু ধমকের স্বরে বলে, ও নাম আর তোমরা মুখে আ'নো না।

—ক্যান্?

—তুমরা কংগ্রেসীরা তাঁর কথা মান না, কেবল নামই গাও। তিনি বলিছিলেন কি জান? বলিছিলেন, থাণ্ডড় মিয়ে যেদিন মুখী হর্তি পারবি সেইদিনগে স্বরাজ হলো বুঝতি হবি।

—কইচিলেন ঠিকই। কিন্তু ভাশের স্বরাজের চেহারা তিনি আঁচ কইরতে পারেন নাই। তিনি জাইনতেন না যে ঐ থাণ্ডর মেয়েই মন্ত্রী অইলে খাঁটি পুরুত-ঠাকুর অইয়া যায়।

ঝড়ু মতিলালকে বেশ করে নিরিখ করে। পরে বলে,

—তুমি তো কংগ্রেসী না।

—কেমন কইরা জান্‌লা?

—তুমি জাইত মান না।

—আহ, তাইলে সইত্য কথাডা কওনই লাগে। ও কোনতাই আমি না। খাওনের লগে আমার সব সম্বন্ধ। খাইবার ভাও আমি রিফুইজী অইয়া প্লাটফর্মে বসুম। খাইবার না দাও, ঐ জজ-সাহেবের মাইয়াডার লইরাও আমি ঘর করুম না। আমার জাত আছে। কেডা কয় আমার জাইত নাই? আমার জাইত আছে ক্যাশ বাক্সে।

ঝড়ু এবার রেগে বলে, তয় পাকিস্তান ছাড়লে ক্যান্?

—ছাইড়ছি কি শখ কইরা? মুসলমান গেরস্তরা কইল, পাকিস্তান তো আইল—পাইলাম কি? তা দারোগাবাবুরা কয়, জমি কাইড়া খা। দুর্জনের তো অভাব নাই সংসারে, তাগোই হইল সুবিধা, ব্যস্, হিঁদু বইলা

আমার খাওয়ার জমিডাও গেল, বিধ্‌বা বোনডাও গেল। তাইত চইলা আসলাম। বোন গেল যাউক গা, বোনের অপছন্দ হইলে একদিন না একদিন বিষ খাইয়া মইরবোই, কিন্তুক খাইত না থাইকলে তো সে ঠাঁইয়ে থাকন যায় না।

ঝড়ু কোমরে হাত ঠেকিয়ে বলল,

—তুমি একটা অসুর। বুনের জন্যি মায়া নাই? উরা যে নিয়ে গেল, কষ্ট হয় না?

—কষ্ট তো অয়। কিন্তুক কষ্ট বাইড়বো তো যে নিয়ে গেল তারই। এই দুর্বৎসরে মেয়েমানুষ পোষা কি সোজা কথা? ও ছাইড়া দিতেই অইব, আর ছাইড়া দিলেই সে অইব বিষকন্যা। শক্তির জাত, ধ্বংস ওয়া কইরবই। আর বোনডারে এহানে আইনলেই কি রাইখতে পাইরতাম? গালে থাবা মাইরা দালালেরা কাইড়া নিত না?

ঝড়ু বিরক্তিভরে মতিলালের সঙ্গ ত্যাগ করে। এরা গুণ্ডা। মায়া নেই দয়া নেই, বিবেক নেই—কিছু নেই।

—চললা নাকি ঝড়ু ভাই—মতিলাল ছাড়ে না।

—অয়, মাথা ধরিছে।

—ডাক্তারে কয়, প্যাটে দানা না থাইকলে মাথা ধরে। মাথা ধরনের ওষুধ নি জান? মাথা দিয়া ঠোকর মাইরা যাও ষাঁড়ের নাকাল। ভাও হজুরেরে চুসাইয়া। মুনিষ-মুন্নী-কল-কারখানা কিছু মাইনো না।

মানুষের সমস্ত দুঃখ দূর করতে হবে, তাই সর্বস্ব ত্যাগ করলেন সিদ্ধার্থ। সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

"আহা, তা বেশ"—ধুয়া।

ভালো লাগেনা মতিলালদের কথা। এরা গুছিয়ে নিয়েছে, তাই এত কথা বলতে পারে, কাজের কথা বলে।

কিন্তু যার ঘর ভেঙে গেল, ছেলে-বউর সম্বন্ধে ভাবনারও যার সময় নেই, সে কি করে শুনবে এদের কথা?

ঝড়ু অমানুষের মতো হয়ে গেছে। একা একা থাকতে চায়। একা একা খাওয়ার বস্তু সংগ্রহ করতে চায়? ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করতে ভালো লাগেনা কেন সে আর কয়জনের ভাত যুগিয়ে যাবে? এদিক দিয়ে

মতিলাল ঠিক কাজ করেছে। কিন্তু মতিলাল বিয়ে থা করে নি। বড়ুর পক্ষে তো অমন ভাবে চলা মানায় না। বন্দী সে, কিন্তু একা নয়।

নিজদের প্লাটফর্মের আস্তানায় এসে দেখে একজন মোটা-সোটা লম্বা-চওড়া মানুষ বক্তৃতা দিচ্ছে। খুব জমিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে। আমাদের উপনিষদে বলে, "অন্নকে উপেক্ষা করবে না, অন্নকে বর্ধিত কর। হে উদ্বাস্তু ভাই-বোনেরা তোমরাও সেই উপনিষদের উপাসকের মতো বল, 'অন্নং ন পরিচক্ষীত, অন্নং বহু কুর্বীত।' আর হে আমার দেশবাসী তোমরা বল, বাসের জন্য সমাগত কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করব না, ন কঞ্চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত। কেউ হয়ত প্রশ্ন করবেন, কিন্তু অন্ন কোথায়? অন্ন যে সরকারের গুদামে পচছে। আমি বলব, যে-কোন উপায়ে আপনারা অন্ন সংগ্রহ করুন, যয়া কয়া চ বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ।

হাতে তালি পড়ল না। বাংলার ডিমস্থিনিসের বক্তৃতায়ও হাতে তালি পড়ল না। মানুষের অন্তরাত্মা কেমন করে যেন টের পেয়ে গেছে, এথেন্সের ডিমস্থিনিস ম্যাসিডনের ফিলিপের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিচ্ছে, আর কিছু নয়।

তাই বক্তৃতার পর আবার যে-কে-সেই। পড়ে থাকল কেবল উদ্বাস্তুরাই। বাগ্মীর গলার মালা থেকে একটা ফুলও ছিঁড়ল না।

হাবার মা হাবাকে নিয়ে কাত হয়ে আছে। বড়ু আসতেই হাবার-মা উঠে বসে। আজ সে বড়ুকে অবাক করে দেবে। ওবেলা পুরুষের যে-রাগ হয়েছিল! হাবার-মা বড়ুর কাছে আসে। গায়ে হাত দেয়। বুকে আলগোছে হাত বুলিয়ে দেয়।

—এ বেলা খিচোড়ী রাঁধিছি, আসো, খাও।

—খিচোড়ীর চাল-ডাল পা'লে কুথায়?

—একজন টিকিট-বাবু চায়টে দিয়ে গেলেন।

বড়ু চড়া গলায় বলে উঠে,

—তা সে শালা তুমারই বা এত সব দিতি গেল ক্যান?

সংকুচিত হয় হাবার মা। মানুষের সব তাতেই রাগ।

—ছিঃ ওকথা বলতি নাই। তারা বাবু। কত বড় মন। খালি আমারই কি দিছে? অনেকেরই দিছে।

বড়ুর সুর নেমে আসে। বড় বেশী রেগে গিয়েছিল। আরে ছোঃ,

হাবার মাকে এখন আবার কে নজর দেবে ? এ রকম দয়াধর্ম মাঝে মাঝে অনেকেই তো করে।

বড়ু মন ভিজে যায়।

রাত্রি এখান থেকে নির্বাসিত। বেগুনী আলো যাত্রীদের মুখের উপর পড়েছে। মায়ালোক। এখানকার সবাই সুন্দর কেবল তাদের জীবনটাই কুৎসিত। ঐ সব নরনারীদের কাপড়ে মুখে আলো পড়ে মোহের সৃষ্টি করেছে। হাবার মার রূপও নেই, কাপড়ও নেই। তাদের দেখানোর মতো কিছু নেই।

আর হাবার মা যদি তার কাছ থেকেও মিষ্টিমুখ না পায়, বাঁচবে কি করে সে ? আজ বড়ু কথা দিয়ে তাদের সৌন্দর্য জাগাবে।

—তুমি আমার লক্ষী হাবার মা। তোমারে আমি মন দিকে গাল দেই নে। আমি গাল পাড়ি আমার কপালেরে।

হাবার মার চোখে মমতার লহরী খেলে যায়। আকাশকে যদি না ঢাকতে পার তবে নিজের চোখটাকেই পাতা দিয়ে ঢাক, তা হলেই, জ্যোতির্ময়কে না জেনেও তোমার দুঃখের অবসান ঘটবে। হাবার মার চোখের পাতা সে সুখের ভারেই বুজে এল। এমন ভালো কথা সে অনেকদিন শোনে নি। ধীরে ধীরে চোখের পাতা খুলে বলে,

—কপালেরে দুষলে কি হবি হাবার বাপ। কপালে তো ঘটে নাই। মান্‌ষি ঘটাইছে। যার যার ঘর ঠিক রাখ্যে আমাগোরে ঘর পুড়াইয়ে দিল। আমাগোরে পাঁঠা পাইছে। নিজগোরে পাপের ভয় দেবতার কাছে আমাগোরে বলি দিল। কপালেরে দুইষ না হাবার বাপ, কপালেরে দুইষ না।

বড়ু তৃপ্তির সঙ্গে আজ হাবার মার রান্না খেল। আজ একবার তাকিয়েও দেখল, হাবার মার জন্যে খিচুড়ী আছে তো।

ধন-দৌলতে অমৃত নেই, তাই ঋষির পত্নী স্বামীর সঙ্গে বনে গেলেন আর ঋষি বলেন, অহমন্নম্ অহমন্নম্ অহমন্নম্। অহমন্নাদঃ অহমন্নাদঃ অহমন্নাদঃ।

"আহা, তা বেশ"—ধুয়া।

হাবার মা বড়ু ঘুম কাতুরে। এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে হাবাকে বুকে জড়িয়ে। বেগুনী আলো তার মুখে এসে পড়েছে। মন্দ দেখা যায় না হাবার মা-কে মাজলে ঘষলে…। লোভ হয় হাবার মাকে দেখে। কিন্তু এত মানুষ জন। থাক।

ঝড়ু ঘুরে শোয়।

কিছুই করতে পারল না সে এদের জন্য। তারই উপর নির্ভর করেছে ঐ অতটুকু ছেলেটা। এই বউটা কত দুঃখই না সহ্য করে। তাদের বিশ্বাস একদিন না একদিন সে সক্ষম হবে এই বিপদের দিন কাটাতে।

তাদের এ বিশ্বাস সে রাখতে পারবে না। ভেঙে গেল তার সব কিছু। তার জীবন আছে কিন্তু সে কৃতী নয়। কৃতী নয় বলেই তো তার বউ ছেলে এমনভাবে প্লাটফর্মে শুয়ে আর অন্যেরা আজ দালান কোঠার ভিতরে। সে অক্ষম, তিনজনের ভার বইতে সে অক্ষম।

সে হিন্দু। সে সমাজে বিশ্বাসী। কিন্তু কি দিল তার ধর্ম, কি দিল তার সমাজ? প্রাণ নিয়ে সে নিজেই পালিয়ে এসেছে, দারিদ্র্যের সঙ্গে সে নিজেই লড়াই করছে। হাঁ, মরলে গাড়ী আসবে বটে।

সমাজ থেকে সে নির্দেশ পেল না—এই রকম করলে সে বাঁচতে পারবে। তার সমাজে কত বড় বড় কৃতী লোক। সবাই উপায় বাৎলালো, ক্যাম্পে থাক। সে মানুষ, সে মরদ, সে কাজ করতে চায়। তাকে কাজ দাও, সে গৃহস্থ হবে, সে ক্যাম্পে থাকবে না, কাজ করবে সে। কিন্তু কাজ কোথায়? সমাজ ধর্ম মুখ ভেঙচে বলল, কাজ কোথায়? তার চেয়ে তোমরা ক্যাম্পে থাক, আমরা তোমাদের উপকার করি।

উঠে পড়ল ধীরে ধীরে ঝড়ু। আর একবার ফিরে তাকায় তার ঘুমন্ত স্ত্রীপুত্রের দিকে। যার সঙ্গে সুখদুঃখ নিয়ে আজ সাত বছর ঝগড়া করেছে সেই মালতীর দিকে। হ্যাঁ হাবার মার নামও একদিন ছিল মালতী। ঝড়ু নামটা ছোট্ট করে নিয়েছিল, মালা। সেই মালতী আজ বিপদের দিনেও তার গলা জড়িয়ে ধরেছে।

আরও একবার দেখল।

হাবার মার আঁচলে বাঁধা কয়েক আনা পয়সা। নেবে না কি টিকিট কেনার জন্যে খুলে? না থাক। পড়ে-থাকা একখানা কাগজের টুকরোয় দোকানের ভাঙা পেন্সিলটা দিয়ে একটা ছত্রও লিখল সে। কলাই করা থালাখানা দিয়ে চাপা দিল কাগজটাকে।

হাবার হাতখানায় কি মালতীর শরীরের চাপ পড়েছে। বাব্বা মালার বা গতর! না খেয়েও গতর কমল না!

আর একবার নির্নিমেষ তাকিয়ে দেখে।

হাত পাঁচেক গিয়েছে। হাবার হাতখানাকে কি চাপ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসবে? একবার পেছন ফিরে দেখবে নাকি, মালা খুরে শুয়েছে কি না?

প্রজার অভিযোগে সীতাকে নির্বাসন দিলেন রাজা রামচন্দ্র। পতিত পাবন সীতারাম।

"আহা, তা বেশ"—ধুয়া।

সকালবেলা বড়ুকে আর দেখতে পায় না হাবার মা। কোথায় গেল মানুষটা। না বলে তো কখনো যায় না সে।

কাগজখানা হাতে পড়ল। লেখা আছে, 'চলিলাম। আর আসিব না। কাঁদিও না।'

স্থির হয়ে গেছে মালতী।

না কাঁদবে না সে। আজ থেকে তাকেই উপায় বের করতে হবে।

কার জন্যে করবে সে? হাবার জন্যে, নিজের জন্যে। তাকিয়ে দেখে, চার বছরের ছেলেটা নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে। থাকুক।

মালতী বেরিয়ে পড়ে। রামা রেক্সাজীকে একবার নাড়া-চাড়া ক'রে দেখবে? না, কি হবে? সাময়িক দুর্বলতা ঘটিয়ে চিরকালের মতো দুর্বল কাউকে সে করতে চায় না। বড়ও তো রামা-রই আরেকটা দিক। পার্থক্যের মধ্যে, সমাজ তাদের দুর্বলতাকে মস্ত ঢাকা দিয়ে গিলটি করে দিয়েছিল।

ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড-টার কাছে আসে সে। তার শরীরে জৌলুষ আছে না কি? এত লোকে হাঁ ক'রে কি দেখছে? জানে না এরা এ দেখার মূল্য কতখানি দিতে হয়। তখন হা হতাশ করবে বড়ুরই মতো। পারে নাই, বড়ু শেষ-সংগ্রাম করেও পাষাণ-সমাজে এতটুকু স্থান করে নিতে পারেনি। পশুর সবই আছে মানুষে, বাড়তি আছে প্রবঞ্চনা। না, হাবার জন্যে সে ভাববে না। দুর্দম আর দুর্দান্ত হয়ে উঠুক। মানুষের ঘর থেকে কেড়ে খেতে শিখুক হাবা। জিতে নিক বঞ্চিতেরা ঠগী-দস্যুদের থলি। হোক ধনঞ্জয়। কাঁদবে না মালতী।

কিন্তু পেটের শত্রুটা? যতদিন তার নাড়ীর সঙ্গে আছে, ততদিন থাকুক তারপর পৃথক যখন হবে, পৃথকই করে দেবে। কাঁদবে না মালতী।

মা গঙ্গার বুকে ঝাঁপ দেবে না সে। সদম্ভে হাওড়ার পুলে উঠে দুপায়ে ভর করে দাঁড়াল। কিছু একটা করবেই সে, যতদিন না শকুনের ঠোঁটে তুলে দিতে পারছে মানুষের বাচ্চাটাকে। অজ্ঞাত কোন এক শকুন্তলা।

ঋষি বলেছিলেন, যয়া কয়া চ বিধয়া বহন্নং প্রাপ্নুয়াৎ। আর বলেছিলেন, অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।

"আহা, তা বেশ"—ধুয়া।

(পূর্বানুবৃত্তি)

সমরেশ বসু

(৭)

বনলতার বাবা নসিরাম তামাক খাওয়া শেষ করে হুঁকোটি রেখে প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করার জন্য উঠে দাঁড়াল। বৃদ্ধ হয়েছে নসিরাম। কোমর খানিকটা বেঁকে গিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে শরীরটা। এক গলা কন্ঠির মালা তেলে আর জলে কালো হয়ে উঠেছে। কপালে গায়ে কুঞ্চিত চামড়ায় বাসি তিলকের ছাপ।

আগে নসিরাম খুব শান্ত ধীর ছিল। হাসিখুশি গান কথকতা—সমস্ত কিছুতে সৌম্য। কিন্তু আজকাল তার মেজাজ সর্বদাই খানিকটা ক্ষিপ্ত। কথা বলে অল্প, হাসে না মোটেই। বেশী গোলমাল সইতে পারে না। একমাত্র গানের সময় যা একটু প্রফুল্ল থাকে সে। ইদানীং তার সাধনার রূপ-রসটা কেটে গিয়ে কঠোর হয়েছে বলা চলে।

তার প্রৌঢ়া সেবাদাসী হরিমতী উঠোন নিকোচ্ছে। হরিমতীর বালিকা মেয়ে স্নান করে ঠাকুরঘরের দাওয়ায় বসে গাঁথছে ফুলের মালা। ষণ্ডামার্কা বৈরাগী প্রাণেশ সমস্ত দেহটি তেলে ডুবিয়ে এবার শুরু করেছে মর্দন। আর মাঝে মাঝে হরিমতীর মেয়ে রাধার দিকে চোরা চোখে দেখছিল। রাধা অবশ্য মাত্র বালিকা, তবু প্রাণেশের-চোখের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রাখবার চেষ্টার মধ্যেও যেটুকু ফুটে উঠছিল—সে ভাবগতিকটুকু রসের। আর এও সে জানে রাধাকে দেখে তার বুকে এ রসের সঞ্চার টের পেলে কেউ রক্ষা রাখবে না আর। বিশেষ করে হরিমতী যদি টের পায়, আর হরিমতীর খাণ্ডার বলে সুনাম আছে, তাতে কোন্ না সে একটা পোড়া কাঠ দিয়েই প্রাণেশের এ রসের ভাণ্ড পিটিয়ে ভাঙবে।

তবু এ চোখকে নিয়ে বড় জ্বালা প্রাণেশের। হাজার ফেরাও চোখ, তবু ঠাকুরঘরের এই জলে ধোয়া ধবধবে ফুলটির দিকেই নজর যাবে তার।

সরযূ এল স্নান শেষ করে, কাঁখে জল-ভরা কলসী নিয়ে। সরযূ প্রায় বনলতারই সমবয়সী, নসিরামের সর্বশেষ সেবাদাসী। এ আখড়ার মধ্যে সে খানিকটা অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করেছে তার কথায় ব্যবহারে। বৃদ্ধ নসিরামের সঙ্গে মিল তো তার নেই-ই, তা ছাড়া, আখড়ার ভাব-গাম্ভীর্যকে তার তরল হাসিঠাট্টায় বড় ক্ষুণ্ণ করে সে। কিন্তু বাল-কৃষ্ণের সেবার দায়িত্বপূর্ণ কাজ-গুলো প্রায় সবই তাকে করতে হয়। ভোগ রান্না থেকে ঠাকুরের শয়ন পর্যন্ত সরযূর কাজ। এত কাজ তবু এরই ফাঁকে ফাঁকে কথা হাসি গানে ভরপুর।

সরযূকে ঢুকতে দেখেই নসিরামের কোঁচকানো ভ্রূ কুঁচকে উঠল আরও। বলল হরিমতীকে লক্ষ্য করে, পোহর বেলা না কাটলে কি ঠাকুরের ঘুম ভাঙানো হবে না? আর কখন খোলা হবে দরজা ঠাকুরের—শুনি?

সরযূ ভেজা কাপড়ে ছপ ছপ শব্দ করে ঘরে ঢুকে যায়।

রাধার তাড়া পড়ল। এখুনি তাকে কুটনো কুটতে যেতে হবে—ভোগের। প্রাণেশও তেলের বাটি রেখে উঠল লাফ দিয়ে।

হারমতী সরযূর দিকে তাকিয়ে একবার ঠোঁট বাঁকাল। কিন্তু কাজ থামল না তার।

এমনি সময় কানে গেল বনলতার গুনগুনানি: সো হরি বিহু ইহ রাতিয়া।

সকলেই একটু তাজ্জব হল, তাকাল বনলতার দিকে। কিন্তু কাজ থামল না কারুর।

নসিরাম বলল, বাসি কাপড় ধুয়ে এলি, নাইলি না?

—না, শরীরটা কেমন গম্ গম্ করছে।

অর্থাৎ গরম গরম ভাব। নসিরাম শঙ্কিত হয়। নিজের বলতে তো তার আর কেউ নেই এক মেয়ে বনলতা ছাড়া। আজকাল এও একটা চিন্তা হয়েছে তার। কেউ-ই তার আপন নয়, সবাই পর। নরহরিকে সে খানিকটা বিশ্বাস করে, কিন্তু নরহরির হাবভাব আখড়া রক্ষা করবার পক্ষে মোটেই সুবিধাজনক নয়। বনলতার হাতেই এ সমস্ত কিছু একদিন তাকে তুলে দিয়ে যেতে হবে। বনলতা তার একমাত্র সম্বল। বলল,

—তবে আর এত বিহানে উঠলি কেন, খানিক বেলা বিছানায় থাকলেই পারতিস।

—সে মোর সয় না। বলে এক লহমায় চারিদিকে চোখ বুলিয়ে বনলতা বেরিয়ে যায় আবার ভেজা কাপড়টা টাঙানো বাঁশে মেলে দিয়ে। এসে উঠল গোবিন্দদের বাড়ীতে।

পিসির তখন নিকনো শেষ হয়েছে। ওদিকে বকবকানির ধ্বনিটাও হয়েছে উচ্চ।

—হায় মোর মরণ নাই, যম কি কালা গো। এ ঘরে নাকি মানুষ থাকে। না লোক না জন, এ আখড়াতে মানুষ থাকে কি করে—বলতো? শরীলে নাকি সয় এ সব আর। মরবার দিনও মোরে কাঠ ঠেলতে হবে চুলোয়। কালা মুয় কালা মিনসে (অর্থাৎ স্বামী) চোখে কি দেখতে পাও না।

বলতে বলতে ক্ষেপে উঠল পিসি। দেখলও না বনলতা এসেছে।

—হক করলাম আজ ও ছাই পুঁথিমুথি সব যদি না পুড়িয়ে শেষ করি। ঢং। চাষার ছেলে হবে পণ্ডিত, সৃষ্টিছাড়া যত অকাজ কুকাজ। বিয়ে নাই সাদি নাই, নাই একটা ছাওয়াল পাওয়াল, ঘরভরা মরণ পুঁথি। শ্মশানে-মশানে কালে ছুঁ বলে মারল বাপটাকে, হায় পোড়াকপাল, এটারও কোনদিন যে কি হবে। মরতে মরতেও না জানি কি দেখে যেতে হবে আমারে। পাপ, পাপ করেছি অনেক এ পিথিমিতে, মরা যম সব শোধ তুলবে। না খাবে আমারে, না খাবে এ চোখজোড়া।

এবার খিল খিল করে হেসে উঠল বনলতা। বলল, কি হল গো পিসি?

এই এক মেয়ে। জলে যায় দেখলে পিসির সর্বাঙ্গ। বলে কত কথা, ভাল করে দেব তোমার গোবিন্দেরে, ঘরমুখো করে তবে ছাড়ব তোমার ভাইপোরে। পিসি ভাবে, বলে তোরই সেই মুখ ঘুরিয়ে দিল গোবিন্। হ্যাঁ, পিসিরও আছে আতঙ্ক এই সোয়ামীর পর সোয়ামী খাগীর সম্বন্ধে, বিশ্বাস করে বজ্র ঝরে ওর নিঃশ্বাসে, শেষ টান আছে এ ভাইনি ছুঁড়িটার, শুষে শুষে খায় ও। তবু পিসি যে ওকে আস্কারা দিয়েছিল, সে খালি ছুঁড়ি যদি পারে তার সেই ভাইপোর এ পাথুরে ধর্মজ্ঞানে ফাটল ধরাতে। তারপর ভাইপোরে কেড়ে নিয়ে ঘর জমাতে কতক্ষণ। কিন্তু তা হবার নয়। সবাই হার মেনেছে। মনের আর সে চিলে ভাব নেই বনলতার প্রতি, বিশ্বাস করে না আর পিসি তাকে। মুখেই ফুটোফুটি, কথার বেলা তো দেখা যায় গোবিন্দের একটু দর্শন লাভই যেন ছুঁড়িকে পাগল করে।

সময়ে সময়ে গুলিয়েই যায় পিসির কাছে গোবিন্দের মত বনলতাও। কারুরই কোন ধারা ধরা পড়ে না। সব যেন কেমন।

পিসি জবাব দিল না বনলতার কথার।

বনলতা জিজ্ঞাস করল, পিসি কোথা চললে।

—যমের দক্ষিণ দোরে।

—ছি, ছি, তা কেন যাবে। বলে গম্ভীর গলায়, কিন্তু হাসে মুখ টিপে। আবার বলে, সামনে তোমার সুদিন, ভাইপোর বউ আনবে, শুয়ে বসে খেয়ে আরাম করে মরবে।

বড় খুশি হয় পিসি, বড় আনন্দ পায়। কথাতেই তার আনন্দ, জীবনের এইটুকুই সম্বল। এইটুকুই যে তাকে বনলতা ছাড়া আর কেউ দেয় না। সেই জন্যই তো বনলতার প্রতি পিসি কঠিন হলে নরম হতে দেরী লাগে না বেশী। হতে পারে ডাইনি, কথাগুলোতো ভাল বটে। বলে, ফুলচন্দন পড়ুক তোর মুখে, মরবার আগে আমি যেন তাই দেখে যাই; কিন্তু এ ছোঁড়ার ধম্মোজ্ঞান যেন রোগ, না সারবার ব্যামো গো। সেই এসে ছোট্ট-বেলাটি থেকে দেখছি এই ধারা।

কিন্তু বনলতা তো জানে গোবিন্দকে। সাধক গোবিন্দ, নিষ্ঠুর গোবিন্দ কি এক প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে যেন টান দিয়েছে তাকে। ধর্ম আর জ্ঞান মিলিয়ে সে যে কিসের টান—তার হদিস জানে না বনলতা। শুধু বোঝে—পিসির আর তার—তাদের সকলের থেকে বহুদূরে—এক দুর্ভেদ্য বর্মে আবৃত, গোবিন্দ যে পাথুরে ধর্মের গায়ে বনলতার উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলা মাথাটা ঠোকর খায় বার বার, ক্ষতবিক্ষত হয় মাথাটা।

তবু পিসির মনগড়া কথাই বলে সে হেসে, তা একটা সোন্দর কন্নেটন্নে কিছু দেখাও না কেন ভাইপোরে? পিসি অমনি হাতের ন্যাতা ও বালতি রেখে বনলতার কাছে এসে, চোখগুলোকে বড় বড় করে বলে ফিস্‌ফিসিয়ে, দেখে আসছি। টুকটুকে ছোট্ট এক কন্নে, পয়সাও দেবে মেলা, সচ্ছল মানুষের মেয়ে। দিনক্ষণ দেখে একদিন নেমন্তন্ন করব ভাবছি। হ্যাঁ, সে মেয়ে পাবে বোধ হয় ভোলাতে মোর গোবিনেরে।

—কে গো? বনলতাও তেমনি ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করে।

চকিতে সন্দেহের ছায়া ঘনিয়ে এল পিসির চোখে। অমনি মুখখানি ভার করে সরে গিয়ে বলে, সব কথা শুনতে চাওয়া কেন বাপু? সে আমি মরে গেলেও বলব না।

—হ্যাঁ, সেই ভাল পিসি, সব কথা সবাইকে বলতে নাই। আমারই বা কি কাজ বাপু শুনে, অ্যাঁ ?

চকিতে কি অদ্ভুতভাবে মুখ টিপে হেসে তাকানোটুকু করে বনলতা, সাধ্য কি পিসি টের পায় একটুও।

—হ্যাঁ, সেই ভাল। বলে পিসি বালতি নিয়ে ডোবার দিকে যেতে যেতে ফিরে বলল, ডোবাটার ধার যা পেছল হইছে, সঙ্গে একটুক আয়ত লতি।

বনলতা হাসল। ডোবার ধারে গেল সে পিসির সঙ্গে। দিব্যি শুকনো খটখটে ডোবার ধার। নীচের ঢালু অংশটুকুও সিঁড়ি-কাটা।

পিসি বলল, রাজপুরের দয়াল ঘোষকে চিনিস তো ? বুড়ো দয়াল ? বনলতা বুঝল এ কিসের ইঙ্গিত। তবু সে মাথা নেড়ে চুপ করে রইল।

অনেক দ্বিধা কাটিয়ে পিসি বলল, সেই দয়াল ঘোষের নাতনির সঙ্গেই —বুঝলি ? কথাবার্তা খানিক করে আসছি। বলিস নে যেন কাউকে।

না না। সে তো খুব ভাল কথা গো পিসি। হাসি চেপে বলল বনলতা।

বনলতারও একবার মনে হল, দেখাই যাক না একবার পরীক্ষা করে। গোবিন্দের পরীক্ষা হয়ে যাবে—মেয়েটিকে দেখে সে কি বলে।

গোবিন্দের পরীক্ষা! পরমুহূর্তেই যেন বজ্রাঘাতের মত শক লাগল বনলতার বুকে। ছি ছি, একি সে ভাবছে। গোবিন্দের পরীক্ষা। কোন পরীক্ষার বেড়ার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে আজও গোবিন্দ ? সে তো বহুদূরে উদ্দাম ঝড়ের বেগে ডানা মেলে দেওয়া পাখী। কোথায় সে থামবে, আর কি নিশ্চয়তা আছে তার নাগাল পাওয়ার।

বাইরে থেকে হরেরামের হাঁক শোনা গেল, —কই গো, গোবিনের পিসি কোথা গেলা ?

—ঐ এসেছে মুখপোড়া। বোঝা গেল পিসি এই হাঁকের জন্য প্রতীক্ষা করে ছিল। বলল, বস, যাই। বলে—সে টুকটুক করে দ্রুত নেমে গেল ডোবার ধারে।

বনলতা বলল, পেছল যে, অত তাড়াতাড়ি যেও না। বলে মুখে কাপড় চেপে হাসে।

—আর পেছল। গেলেই বাঁচি।

সরে এসে প্রাণভরে একটু হাসল বনলতা। তারপর বাড়ীর সামনে হরেরামের কাছে এসে দাঁড়াল।

হরেরাম একটা কাঁথা মুড়ি দিয়ে, উঠোনের একধারে গুটিসুটি বসেছে। ক্লান্ত থমথমে মুখটা বের করে রেখেছে শুধু। কোটরে-ঢোকা চোখ দুটো লাল টকটকে।

বনলতা জিজ্ঞেস করল, কি গো, অমন করে বসে আছো যে? অসুখ-বিসুখ করেছে নাকি?

—আর বল কেন লতাদিদি। ধুঁকে ধুঁকে বলল হরেরাম, শালার জ্বর আর ছাড়তে চায় না গো! দু'দিন ধরে পেটে নাই কিছু। তার মধ্যে আবার—

—তো এলে কেন?

—এলাম, গোবিন বললে কি জন্যে নাকি ডাকছে ওর পিসি। ভ্যালা যন্ত্রণা এক হয়েছে মোর, ছাড়তেও পারি না, রাখতেও পারি না। বলে একের জ্বালা সয় না, এর আবার—

কথা বলতে আরম্ভ করলে আবার জ্বরের ঘোরে কথা বলতেই ইচ্ছা করে হরেরামের।

বনলতা বলল, কি বাধা ছাড়ার কথা বলছ?

—ওই তোমার গে—গোবিনের জমি। বিরক্তি দেখা যায় জ্বরো থমথমে মুখটায় হরেরামের। বলে, লাভ তো কিছু নাই—কিন্তু কি করব! তবু যা হোক—খিচুলিটা মাস দুয়েকের খোরাকিটা হয়, কিন্তু সে দেখতে গেলে চলে না। ভাগে খাটি বাবুদের জমিতে, আর হুই পচ্চিম থেকে এ্যাকেবারে পুবে যেতে লাগে গোবিনের মাঠে যেতে। একলা মানুষ, পারি না। অথচ কাজের সময়, চুপ করে বসে থাকাও তো যায় না। সেই আমার ছুটতেই হয়।

হরেরাম ভাগচাষী আধিয়ার। নিজের জমি নাই তার, ভূমিহীন চাষী। বংশপরম্পরায় এ অবস্থা ছিল না তার। বাপ মরার পরও কিছুদিন ছিল খালের ধারের সাত বিঘা জমি। কিন্তু এই নয়নপুরের আরও বহু চাষীর মত একদিন দেখা গেল—বাবুদের বাড়ির সেই লাল কাপড়ের মলাটের মোটা মোটা রাক্ষুসে খাতাগুলোর পেটে হরেরামের খালের ধারের জমিটুকু লেখা হয়ে গেল। আর এ লেখা হয়ে যাওয়া যে কী ভীষণ, কি সাংঘাতিক, তা নয়নপুরের ঘরে ঘরে জানা আছে। আজও জানছে, জানবে ভবিষ্যতে।

গোবিন্দের পিসি প্রথমেই হামলে পড়ল এসে। —বলি, দেখা নাই কেন, দেখা নাই কেন তোর আর—অ্যাঁ? কি করলি না করলি, ধান কেমন হল না হল—

বনলতা বলল : ওর যে জ্বর হইছে গো। আসবে কেমন করে?

—ও চঙের জ্বর ঢের দেখছি। পিসি গরম হয়েই বলে, গত বছর, ক'আটি বিচুলি দিয়ে তো নিস্তার পেলি, আর যে বিচুলিগুলান্ রইল, তার কি করলি।

হরেরাম নিস্তেজ গলাতেই বলল, তার কি করব বল? একলা মানুষ পারি না। দরিদ্দের ঘর, পড়ে রইছে, খরচ হয়ে গেছে তেমনি।

—মরে যাই আর কি? ভেংচে উঠল পিসি। —মোর সোয়ামীও আধিয়ার ছিল রে, মোর সোয়ামীও ছিল। এমন হ্যাচড়া বিত্তি দেখি নাই কভু। বিখেন তো বিখেন। ন্যায়ের কাম করে করে মানুষটা মরে গেল। দরিদ্দ তো কি, জোচ্চোরি করবে তাই বলে?

হরেরাম চুপ করে রইল। বনলতা বুঝল, হরেরাম গত বছরের বিচুলিটা গোলমালই করে ফেলেছে। তাই অমন অপরাধীর মত চুপচাপ। কিংবা হয় তো গ্রাহ্যই করছে না পিসির কথায়।

কিন্তু এ চুপ করে থাকাতে পিসি দমল না। বলল, এবার আমি সেই বিচুলি চাই, নয়তো টাকা মেটাতে হবে। হ্যাঁ, বলে দিলাম।

হরেরাম নির্বিকারভাবে বলল, ও নিয়ে আর গোলমাল কেন বাপু। ছেড়ে দাও না। এ বছর তোমার সব কড়ায় গণ্ডায় মেটাব।

—কিছু শুনবো না আমি। বলতে বলতে পিসি আবার গোবিন্দের প্রসঙ্গে চলে এল। —সেই হতচ্ছাড়াই তো যত গোলমালের রাজা। দেখল না বলেই তো গেল। বলে চাষার ছেলে, কাস্তে কুড়োল না ধরলে এমনিই হয়। আমি কোন কথা শুনবো না। বজ্জাতেরা মজা পেয়ে খুব লুটছ, না?

হরেরাম উঠে দাঁড়িয়ে বলল, নেও বাপু অসুখ শরীরে আর গালমন্দ শুনতে পারব না এখন।

—তা পারবি কেন? জমিতে এবার একটুকুন সারও তো দিস্‌নি, না এট্টুখানি পাঁক, না গোবর। তবে কি তোর রূপ দেখে ভাগে দিয়েছি। রাগছিস, গালমন্দ শুনবি না?

—ঘাট হয়েছে বাপু, ঘাট হয়েছে। কাঁথাশুদ্ধ হাত দুটো কপালে ঠেকাল হরেরাম,—এই শেষ, আসছে বছর তোমরা অন্য কাউকে দেওগে জমি, ও আমি আর পারব না।

গোঙাতে গোঙাতে চলে গেল হরেরাম। এদিকে তার ওই কটি কথাতেই

ঘৃতাহুতি পড়ল আগুনে। পিসি শুরু করল সারা উঠোনময় দাপাদাপি, গালা-গালি আর শাপমন্যি। আর এ শাপমন্যি যদি সোজাসুজি কাজ করে, তবে হয়েরাম নিশ্চয়ই এতক্ষণ ধরে যেতে যেতে পথেই মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মরে গেছে।

আখড়ার খোল করতালের ধ্বনির সঙ্গে নসিরামের বৃদ্ধ গলায় গান শোনা গেল।...

জাগোহে জাগোহে, সখা জাগোহে, প্রাণনাথ জাগো হে, বাল-নীলমণি জাগোহে, জাগাও জগৎ হে, জাগাও জগৎ, মনকৃষ্ণ হে, জাগাও ভক্তহৃদয় হে।

বনলতা ঢুকলো গোবিন্দের ঘরে।

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কতগুলো বই। এলোমেলো বিছানা। ময়লা কাঁথার বালিশটার কাছেই নেভানো প্রদীপটা যেন বুড়িয়ে-যাওয়া জীর্ণ কালো তেলের গাদে আর কালিতে ঝুলে পড়ছে। তা সত্বেও ঘরটা অপরিষ্কার মনে হয় না। সমস্ত ঘরটাতেই সাধকের গাম্ভীর্য যেন অবিচলভাবে ফুটে রয়েছে, যেখানে বনলতার প্রবেশ খানিকটা অনধিকার বলে মনে হল। আশ্চর্য, ঐ ঘরে ফুলের গন্ধও আছে, ঠিক তাদের বালকৃষ্ণের ঘরের মতই নির্মল আর পবিত্র গন্ধ।

বনলতা অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে দু'একটা বইয়ের গায়ে একটু হাত বুলায়, অক্ষর তো সে চেনে না। এ যেন গোবিন্দের সাধনার বস্তুগুলোর গায়ে হাত বুলিয়ে গোবিন্দের মনটাকে স্পর্শ করার বাসনা। সে যেন জানতে চায় এ ঘরের আত্মাটার সঙ্গে যোগাযোগের পথের নিশানাগুলো কোথায়, তার সাধনা যেন এ ঘরের সঙ্গে একাত্মবোধের সাধনা।

জীবনের এ গতি পাল্টানোর দিনক্ষণগুলো মনে নেই বনলতার। কিন্তু এটা খানিকটা সে বুঝতে পারছে, জীবনটা তার গতি পাল্‌টে অন্য কোন দিকে চলেছে। বোধ হয়, ঝড়ের বেগে সেই ডানা মেলে দেওয়া পাখীটার মত, সেও শূন্যে অসীমে, গন্তব্যহীন কোন একটা পথের পথিক হয়ে পড়েছে। সে জানে না, এ ঝড় তাকে নিয়ে কোথায় ফেলবে, ভেড়াবে কোন কিনারায়। ও মন অনিশ্চয়তার পাড়ি জমিয়েও আজ আর বুঝি ফিরে যাওয়ার উপায় নেই বনলতার। বুকের অদৃশ্য ঝড়ে ডালপালা কাঁটা অনুক্ষণ ক্ষতবিক্ষত করেছে তাকে, তবুও একেবারেই অপরিতৃপ্ত জীবনের এই যেন শান্তি, এই ঘরের বিক্ষিপ্ত বস্তুগুলোকে হাত বুলানোও একটা তৃপ্তি।

অথচ এক এক সময় বনলতা কি দারুণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, জীবনটাকে দুহাতে দলে মুচড়ে ইচ্ছে করে ভেঙে ফেলতে, তছনছ করতে। কেননা, সে তো চায় আসুক জীবনের দুঃখ পীড়ন নিষ্পেষণ। ভাঙুক ঘর, পড়ুক জল, ভাঙুক বাঁধ, ডুবুক মাঠ, ফাটল ধরুক মাঠে জ্যৈষ্ঠের রোদে আর নিঃশ্বাসে, আসুক তার এই বিস্তৃত গর্ভ থেকে নাড়ি ছিঁড়ে খুঁড়ে সন্তান ; আসুক জীবনের পথে অমা সব সংকট, সব দুঃখ, সব অপমান, ক্লেশ, সবই বুক পেতে নেবে বনলতা ; সব সব সব, বনলতার সমস্ত বলিষ্ঠ দেহ দিয়ে সে সব নেবে, ঠেকাবে, ক্ষয় করবে নিজেকে পলে পলে।

কিন্তু হায়, কালনাগিনীর বিষাক্ত মসৃণ গা থেকে জীবনের সে রূপটাই যে ঝরে যায় বার বার। জীবনের সেই খোলা সংগ্রামের দিকটা এল না তার। শিউরে উঠল বনলতা। দুহাত দিয়ে মুখটা চেপে ধরে অত্যন্ত আতঙ্কের সঙ্গে সে চোখ দিয়ে লেহন করল নিজের দেহটাকে। ইচ্ছে করল, প্রাণটাকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে এখুনি আছড়ে শেষ করে দেয় ঘরের মেঝেটাতে। বড় অসহ্য হয়ে ওঠে এক এক সময় তার প্রাণটাকে জড়ানো রংবেরং এর ইন্দ্রিয়-গুলোর বিচিত্র খেলা সইতে। ইচ্ছে করল, এই মুহূর্তে লাফিয়ে উঠে ঘরের মাচাটা ধরে ঝুলে পড়ে ধ্বসিয়ে দেয় ঘরটা, ভেঙে ফেলে তছনছ করে।

হ্যাঁ, এমনি তার জীবনের ঝড়ের বেগ, এমনি অসহ্য হয়ে ওঠে।

ক্রমশ

স্যার সৈয়দ আহ্‌মেদ খাঁ

এল. আই. ইউয়েরোভিচ

(২)

এইবার সৈয়দ আহ্‌মেদের রাজনীতিক মতবাদের আলোচনায় আসা যাক। তাঁর মূল রাজনীতিক সূত্র ছিল : 'সদাশয়' ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রতি আনুগত্য এবং উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা।

সৈয়দ আহ্‌মেদ কিন্তু মনে করতেন, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ক্রমাগত একটার পর একটা ভুল করে ভারতীয়দের ক্ষুব্ধ করে তুলেছে, তাদের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে—এবং তার ফলেই ১৮৫৭-৫৯ সালের বিদ্রোহের উৎপত্তি। এই সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থই রচনা করেন। বিদ্রোহের কারণ নির্ধারণ করতে গিয়ে সৈয়দ আহ্‌মেদ এই সঠিক সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছিলেন যে, বিদ্রোহের জন্ম রুশিয়া বা ইরানের প্ররোচনায় নয়, অস্তমিত মুঘল-মহিমার পুনরুজ্জীবনের আকাঙ্ক্ষায়ও নয়, ব্রিটিশের অযোধ্যা রাজ্য জবর-দখলের জন্যও নয়, সৈন্যদলে নতুন বুলেট প্রচলনের জন্যও নয়। সৈয়দ আহ্‌মেদ মনে করতেন বিদ্রোহ কোনও পূর্ব-পরিকল্পিত চক্রান্তের ফল নয়, এবং বিদ্রোহের আরম্ভটা সৈন্যদলে হলেও চরিত্রগতভাবে এ-শুধু সেনা-বিদ্রোহই ছিল না। বিদ্রোহের উৎস ছিল আরো গভীরে, আরো নির্বিশেষ ছিল তার রূপ। এই অভ্রান্ত বিশ্লেষণের শেষে কিন্তু তিনি এক সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, এবং আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী, সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলেন। তিনি লিখলেন, "বিদ্রোহের প্রধান কারণ ছিল বড়লাটের আইন পরিষদে ভারতীয়দের যোগ না-দেওয়া। তার ফলে জনসাধারণ গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় ঠিকমতো বুঝতে পারত না আর গভর্নমেন্টও জনসাধারণের অভিমত জানতে পারত না। এই দুই ঘটনাই বিষম ক্ষতির কারণ হয়েছিল।" মুসলিম উচ্চ শ্রেণীর প্রতিনিধিরা ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করুক—লেখকের এই ইচ্ছাই এখানে স্বচ্ছভাবে ফুটে বেরয়।

ভারতীয় সৈন্যদল সম্বন্ধে সৈয়দ আহ্‌মেদের মতামত উদ্ধৃতির যোগ্য। তিনি লিখেছেন, "ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সমর বিভাগের পরিচালন সব সময়েই

সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু হয়ে আছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, নাদির শাহ্ যখন আফগানিস্তান আর ইরান জয় করেন তখন তিনি দুটি বাহিনী গঠন করেন—একটি আফগানী আর একটি ইরানী। ইরানী সৈন্যেরা হুকুম তামিল করতে গররাজি হলে আফগানী সৈন্যদের দিয়ে তাদের দমন করা হত; আর আফগানীরা বেঁকে বসলে ইরানীদের তাদের বিরুদ্ধে লাগানো হত! ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কিন্তু ভারতে তা করে নি। হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের বিপক্ষ, তাদের তারা একই দলে রেখেছে। প্রত্যেক রেজিমেণ্টে হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যদের পরস্পর মেলামেশার ফলে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বোধ গড়ে উঠেছে।" হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যের পৃথক রেজিমেণ্ট গড়বার পরামর্শ দিয়ে সৈয়দ আহ্মেদ লিখেছেন, "...তাহলে হিন্দু-মুসলমানে এই ধরনের একতা ও সৌভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হত না। এবং আমার মনে হয় তাহলে সম্ভবত মুসলিম রেজিমেণ্টের মধ্যে নতুন বুলেট ব্যবহারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বা অস্বীকৃতি উঠত না।"

দেখা গেল, সেই ১৮৫৭ সালেই সৈয়দ আহ্মেদ খোলাখুলিভাবে ব্রিটিশকে হিন্দু-মুসলিম বিরোধের সুযোগ নিতে পরামর্শ দিচ্ছেন, এমনভাবে সৈন্যদল গঠন করার পরামর্শ দিচ্ছেন যাতে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের বিরোধী হয়।

মুসলিম সামন্ততান্ত্রিক উচ্চ শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে, এবং ব্রিটিশ শাসন সে-শ্রেণীর স্বার্থসাধনের সহায়ক বলে, সৈয়দ আহ্মেদ ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের প্রতি মুসলমানদের বিশ্বস্ততা প্রতিপাদন করার জন্য, বিদ্রোহে মুসলমানদের অংশ গ্রহণের যে যুক্তিযুক্ত (এবং হিন্দুদের চেয়েও অনেক বেশি) কারণ ছিল এই কথাটা বোঝাবার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, সাধারণ মুসলিম জনতা বরাবরই ব্রিটিশের অনুগত ছিল; কয়েকজন মুসলিম বিদ্রোহীর আচরণকে তিনি একান্ত বাধ্য মোসাহেবের ঢঙে 'হীন ও বিরক্তিকর' বলে নিন্দা করেছিলেন। ১৮৬০ সালে 'ভারতের রাজভক্ত মুসলমানেরা' নামে তিনি যে-একটি পুস্তিকা লেখেন তাতে ছিল, "সেই ভীষণ পরীক্ষা আর বিপদের দিনে যদি জনতার কোনো অংশ তাদের ধর্ম, রীতি আর আদর্শের প্রবর্তনায় খ্রীষ্টানদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত থেকে থাকে, তবে তারা হল মুসলমান। যে-মুসলমানেরা বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল আমি তাদের পক্ষে

নই; তারা গুরুতরভাবে অপরাধী, তাদের আচরণ বিরক্তিজনক, সর্বাংশে ক্ষমার অযোগ্য।"

সেই একই কারণে সৈয়দ আহ্‌মেদ ভারতের ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৭১ সালে ইংরেজ আমলা-ঐতিহাসিক হাণ্টারের ওয়াহাবী আন্দোলন সম্বন্ধে একটি বই প্রকাশিত হয়। হাণ্টার সাহেবের অনেকগুলি মন্তব্যের প্রতিবাদ করে 'পায়োনীয়র' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন।

ওয়াহাবী আন্দোলনের চরিত্র সম্বন্ধে সৈয়দ আহ্‌মেদ হাণ্টারের সঙ্গে একমত নন। হাণ্টার এ-আন্দোলনকে ব্রিটিশ-বিরোধী, এবং সঙ্গে সঙ্গে সামন্তবাদ-বিরোধী, বলে বর্ণনা করেছেন—যদিও প্রথম দিকে ওয়াহাবীরা শিখদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল। সৈয়দ আহ্‌মেদ ওয়াহাবীদের মুসলমান সমাজের বাইরের লোক বলে আখ্যাত করেন; ওয়াহাবী বিপদ নিয়ে বাড়াবাড়ি করার জন্য তিনি হাণ্টারকে তিরস্কার করেন। মওলবীরা ফতোয়া দিয়েছিলেন যে ইংরেজের বিরুদ্ধে 'ধর্ম-যুদ্ধ' চালানো বিদ্রোহীদের পক্ষে 'ফরজ'। সৈয়দ আহ্‌মেদের মতে এ-সব ফতোয়া জারির কারণ হল মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষ নয়, তার কারণ হল ব্রিটিশের উত্তেজিত মস্তিষ্কের কল্পনা, যাতে তারা মনে করত মুসলমানেরা ব্রিটিশ শাসনের বিরোধী। এইভাবে তথ্যের বিকৃতি ঘটিয়ে সৈয়দ আহ্‌মেদ ব্রিটিশ শাসনের প্রতি মুসলমান সমাজের আনুগত্য প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন।

মুসলমান সমাজ বলতে সৈয়দ আহ্‌মেদ শুধু উপরতলার মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলমানকে বুঝতেন। 'ভারতের বিদ্রোহের কারণ' গ্রন্থে তিনি মুসলমান সমাজ বলতে চেয়েছেন সেই সব মুসলমান জমিদারদের যাদের জমি ইংরেজের নতুন আইনে হিন্দু মহাজন ও ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যাচ্ছে, আর সেই সব মুসলমান আমলাদের যাদের চাকরি ইংরেজ ও শিক্ষিত হিন্দুদের দখলে চলে যাচ্ছে। তাঁর কাছে বাংলার কৃষক ও কারিগরদের, গুজরাটের মুসলমান ব্যবসায়ীদের যেন কোনো অস্তিত্বই ছিল না। মুসলমান কৃষকদের যে বিরাট ওয়াহাবী আন্দোলন, তাঁর চোখে তা ছিল মুসলিম সমাজের সঙ্গে সংশ্রবহীন এক দল ধর্মান্ধের মাতামাতি মাত্র। ইংরেজদের দলে টানবার জন্য সৈয়দ আহ্‌মেদ মুসলিম উচ্চ শ্রেণীর ব্রিটিশ-ভক্তি প্রমাণের চেষ্টা করেছিলেন; ইংরেজদের তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে যদি তারা তাদের কয়েকটি

সুযোগসুবিধা দেয়, যথা, জমির মালিকানা, চাকরিতে শরিকানা, শিক্ষাবিস্তারে সহায়তা—তাহলে উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের তারা খাঁটি বন্ধুরূপেই পাবে।

সামাজিক মাপকাঠিতেও তিনি হিন্দু-মুসলমানে ভেদরেখা টানেন: "হিন্দুরা কৃষক, কারিগর, ব্যবসায়ী আর মুসলমানেরা জমিদার আর আমলা।"

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সৈয়দ আহমেদের রাজনীতিক চিন্তাধারায় চরম পরিণতি লক্ষ্য করা গেল; তখন থেকে তাঁর সমস্ত কাজকর্মের লক্ষ্য হল মুসলমানদের কংগ্রেসের থেকে দূরে সরিয়ে রাখা, মুসলমানদের হিন্দু-বিরুদ্ধপক্ষরূপে স্থাপন (তাঁর বিচারে মুসলমানেরা অন্যান্য সব ভারতীয়দের থেকে বিচ্ছিন্ন পৃথক এক সত্তা), দেখানো যে হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থ অভিন্ন নয়। তিনি কংগ্রেসের দুটি মূল দাবিরই বিরোধিতা করলেন, যথা, (১) প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভাগুলির বিস্তৃতিসাধন—সেগুলিতে অন্তত অর্ধাংশ সদস্যের নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রবর্তন, (২) সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার কেন্দ্র ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতে নিয়ে আসা।

প্রথম প্রশ্নটির সম্পর্কে সৈয়দ আহ্মেদের বিচার ছিল এই যে, যে-নির্বাচন-প্রথায় ভারতের সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের সমান অধিকার স্বীকৃত, সে-প্রথায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানেরা এক-চতুর্থাংশ ভোট মাত্র পাবে। আর যদি তাদের প্রতিনিধিদের পৃথক ব্যবস্থা করা হয়, সে-ক্ষেত্রেও রাজনীতিক, আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে পশ্চাৎবর্তিতার জন্য হিন্দুদের তুলনায় তারা অসুবিধাজনক অবস্থাতেই থাকবে। অতএব, এই ব্যাপারে তিনি উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের স্বার্থের পক্ষে, তথা সর্বভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের বিপক্ষে, দাঁড়ালেন। শুধু তাই নয়। তিনি বললেন, ভারত এখনো সমগ্রভাবে প্রতিনিধি-শাসনের যোগ্য হয়ে ওঠে নি; তিনি লিখলেন, "ইংল্যাণ্ডকে প্রতিনিধি-শাসন প্রবর্তনের জন্য অনুরোধ করার সময়ে ইংল্যাণ্ড ও ভারতের সামাজিক ও রাজনীতিক বৈশিষ্ট্যগুলির কথা একান্তই মনে রাখা প্রয়োজন। ইংল্যাণ্ডে জাতিগত ও ধর্মগত কোনো পার্থক্য নেই, সেখানে প্রতিনিধি-শাসনের কোনো অসুবিধাও তাই নেই। কিন্তু যে-ভারতবর্ষে জাতিভেদ ও ধর্মগত পার্থক্য আর বিরোধ আজও বর্তমান, শিক্ষা যে-দেশে সকলের মধ্যে সমানভাবে বিস্তার লাভ করে নি, সেই দেশে নির্বাচননীতির প্রবর্তন, আমার মতে, প্রচুর অনিষ্ট ঘটাবে। যতদিন পর্যন্ত সামাজিক ও

রাজনীতিক চিন্তাধারার মধ্যে জাতিভেদ এবং জাতি-ও-ধর্মগত বিরোধ প্রতিফলিত হতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত নির্বাচন-নীতি সফলভাবে কার্যকরী হতে পারে না।"

ভারতে বুর্জোয়া শ্রেণী সেদিন উদীয়মান, কংগ্রেস তার মুখপাত্র। তার বিরুদ্ধে আর্থনীতিক ক্ষেত্রে দুর্বল, সামন্ততান্ত্রিক মুসলিম উচ্চ শ্রেণীর স্বার্থের ধ্বজা তুলে সৈয়দ আহ্‌মেদ সাম্প্রদায়িক পার্থক্য, আভ্যন্তরীণ বিরোধ ও জনগণের বিভিন্ন অংশের অসমান বিকাশের দোহাই পাড়ছেন!

ভারতের ইংরেজ শাসকেরাও অবিকল এই-সব যুক্তিই খাড়া করত। তারাও যৎসামান্য রাজনীতিক অধিকার দান করে বলত, ভারত এখনও উপযুক্ত হয় নি, তার রাজনীতিক অগ্রগতি ও স্বাধীনতা লাভের পথে বাধা তার জীবনের সর্বস্তরে অনৈক্য। আমরা বেশ ভালোভাবেই জানি, ভারতে তার বিভেদ-নীতিকে আড়াল করে রাখার জন্য ইংরেজ এ-যুক্তি আজও ব্যবহার করে থাকে, এখনও তারা সৈয়দ আহ্‌মেদের রচনাবলীকে কাজে খাটায়।

তাঁর এই কংগ্রেস-বিরোধিতার কারণ কি?

কংগ্রেসের জাতীয়-বুর্জোয়া চরিত্রটি তিনি প্রথম থেকেই ধরতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, যে শিক্ষিত হিন্দুরা কংগ্রেসের সমস্ত রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তারা উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে; তাদেরই হাতে মুসলমান জমিদারদের জমি চলে যাচ্ছে। সুতরাং, কংগ্রেস সামন্ততান্ত্রিক মুসলমান জমিদার শ্রেণীর শত্রু, তাদের দাবি-দাওয়ার প্রতিবন্ধক। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর দু বছর পর্যন্ত স্যার সৈয়দ আহ্‌মেদ প্রকাশ্য রাজনীতিতে অবতীর্ণ হন নি। কিন্তু যখন দেখা গেল, কংগ্রেসের প্রত্যেক অধিবেশনে দাবিগুলি ক্রমে ক্রমে তীব্রতর হয়ে উঠেছে—স্বশাসনের দাবি, সকল জাতি ও ধর্মের সমমর্যাদার দাবি, সামরিক খাতে বরাদ্দ হ্রাসের, শুল্ক-প্রাচীর গঠনের, ভারতীয় শিল্পকে উৎসাহ দানের দাবি—তখন সৈয়দ আহ্‌মেদ বেরিয়ে এসে ঘোষণা করলেন, কংগ্রেসের দাবির সঙ্গে মুসলমানের স্বার্থের মিল নেই।

বলা বাহুল্য, ভারতে ইংরেজ শাসন ও ইংরেজ আমলাদের মতামত সৈয়দ আহ্‌মেদের চিন্তাধারাকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল। আলিগড় কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ বেক ছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু, তাঁর উপর

সাহেবের যথেষ্ট প্রভাবও ছিল। সেই বেক সাহেব কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রথম বৎসরে লিখেছিলেন, "এই সব আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য, যে গণতান্ত্রিক শাসন এ দেশের ঐতিহ্য ও প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন তার প্রবর্তনে বাধা দেওয়ার জন্য মুসলমান ও ইংরেজদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। সুতরাং, আমরা গভর্নমেন্টের প্রতি আনুগত্য ও ইঙ্গ-মুসলিম সহযোগিতার স্বপক্ষে।"

সৈয়দ আহ্‌মেদের রাজনীতিক মতামত ও কার্যকলাপ সংক্ষেপে বর্ণনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছই:

প্রথমত মুসলমান বলতে সৈয়দ আহ্‌মেদ মুসলমান জমিদার ও আমলাদের উপরতলার এক সংকীর্ণ গণ্ডীকে বুঝতেন।

এবং সেই কারণেই, কংগ্রেসের বুর্জোয়া চরিত্র উপলব্ধি করে, নবজাত অধিকতর প্রগতিশীল অংশের চাপে আর্থনীতিক ক্ষেত্রে দুর্বল ও পশ্চাৎপদ মুসলিম উচ্চ শ্রেণীর ক্ষমতাচ্যুতির সম্ভাবনায় সন্ত্রস্ত হয়ে, তিনি সক্রিয়ভাবে কংগ্রেস-পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত, কখনো কখনো হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কথা বললেও মূল নীতি হিসাবে তিনি বরাবরই ভারতীয় মুসলমানদের, জাতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক দুই অর্থেই, সম্পূর্ণ পৃথক এক সত্তা হিসাবে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন।

মুসলিম সামন্ত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা ও অধিকার সম্প্রসারিত করতে গিয়ে, মুসলমানদের স্বতন্ত্র ও হিন্দুবিরুদ্ধ জাতি হিসাবে প্রমাণ করতে গিয়ে সৈয়দ আহ্‌মেদ ভারতে মুসলিম সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তিনিই ছিলেন এর প্রবক্তা।

সমাপ্ত

অনুবাদ গল্প

আশা

ভারী বুটের আওয়াজ আর তালা খোলার শব্দ সেলের আবহাওয়াটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে দিল, দুর্বহ একটা দেহ যন্ত্রণায় গোঙাতে গোঙাতে মাটির উপর মুখ থুবড়ে পড়ল। 'বি' গ্যালারীর ২৬নং সেল।

> "যারা পুলিসী অত্যাচারে অত্যাচারিত—দ্বিতীয় বিশ্ব শান্তি কংগ্রেস তাদের অভিবাদন জানাচ্ছে। শান্তির সৈনিকদের উপর জুলুমের বিরুদ্ধে শান্তি কংগ্রেস তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে।
>
> শান্তি কংগ্রেসের দাবি—এই মুহূর্তে পুলিশরাজের কবল থেকে সমস্ত বন্দীর মুক্তি চাই।"

স্পেনের বন্দীশালা। কারো কাছে এটা যমালয়ের দক্ষিণ দুয়ার, তবে বেশীর ভাগ লোকের কাছেই জীবন এখানে তিল তিল যন্ত্রণায় ভরা অবহান মৃত্যুযাত্রা। ঘৃণার নিঃশ্বাস ছাড়ছে দেওয়ালগুলো—ভেতরে যারা সেই যন্ত্রণার ভুক্তভোগী আর বাইরে যারা সেই অত্যাচারের সাক্ষী তাদের প্রত্যেকের ক্রুদ্ধ ঘৃণায় ভরা দীর্ঘশ্বাস।

ঐ অন্ধকার দালানটা দেখলেই দাঁতে দাঁত চেপে বসে যতক্ষণ পর্যন্ত না রক্তের স্বাদ লাগে মুখে। ঘৃণার যদি ধ্বংস করার ক্ষমতা থাকত তাহলে অনেক আগেই এই গ্রেনাইট পাথরগুলো যেত গুঁড়িয়ে।

১৯৪৯-এর ডিসেম্বরের এই সকালবেলায় জেলখানার কশাইগুলো যে মেয়েটিকে এই বিরাট লোহার গরাদের আড়ালে কয়েদ করেছে তার নাম এন্টোনিয়া। আর পাঁচটি মেয়ের মতই অতি সাধারণ ওর নাম। কিন্তু অপরাধটা নিশ্চয়ই রীতিমত গুরুতর। কব্জি দুটো ওর হাতকড়াতে বাঁধা, জামাকাপড় শতছিন্ন, মারের চোটে কেটে গেছে সর্বাঙ্গ। ধাক্কা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে জেলের প্রহরীরা ওকে ঢুকিয়ে দিল এই ঘৃণিত দুর্গের ভেতর, যেখান থেকে একজনও প্রাণ নিয়ে ফিরেছে কিনা সন্দেহ।

প্রথম দরজাটা পেরিয়ে ভয়ে দিশাহারা হয়ে মেয়েটি চারদিকে তাকাতে

মার্চ ১৯৫১-এর "পীস" পত্রিকায় প্রকাশিত এক অজ্ঞাতনামা লেখকের গল্প থেকে।

লাগল। সবাই যা ভাবে মেয়েটি নিশ্চয়ই তাই ভেবেছিল—না মরলে বা মরণরোগে না ধরলে এই নরককুণ্ড থেকে রেহাই নেই।

ও স্বপ্নেও ভাবেনি যে ওকে কয়েদ করে রাখা হবে। সারা জীবনে ও তো কারো কোন ক্ষতিই করেনি। বরং ভারী লাজুক প্রকৃতির মেয়ে ও। ছোট ছেলেটিকে বুকের কাছে নিয়ে ঘুমিয়েছিল, এমন সময় পুলিস ওকে বিছানা থেকে হিঁচড়ে টেনে তুলল। জানাল 'রাজনৈতিক অপরাধে' ওকে গ্রেপ্তার করা হল। ও কিন্তু রাজনীতির কিছুই বোঝে না, ওসব নিয়ে কোনদিনই মাথা ঘামায়নি।

অবশ্য এটা ঠিক যে ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে লড়াই করে ওর স্বামী গত বছর অবধি বন্দী ছিল। কিন্তু ও বেচারা 'ফ্যাসিজম' কাকে বলে তাই-ই জানে না। স্বামী আর দু'বছরের ছেলেটিকে নিয়েই ওর জীবন।

শয়তান পুলিসগুলোর মধ্যে একজন অভিযোগ করল যে মেয়েটি নাকি রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করেছে। আর একজন বলল, তুমি বাজারে মেয়েদের একটা প্রতিবাদ সভা করবার চেষ্টা করেছিলে।

'কী বলছ'! মেয়েটি অবাক হয়ে বলল, 'আমি তোমাদের কথা একবর্ণও বুঝতে পারছি না'।

ওর গালে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে পুলিসটা গর্জন করে উঠল, 'চুপ কর কুত্তামাগী'।

মেয়েটি তখনও পর্যন্ত মনেই করতে পারল না যে বাজারে কী হয়েছিল। হয়ত বা খিদের জ্বালা, জিনিসপত্রের চড়া দাম, সংসারের নানান দুঃখকষ্টের অভিযোগ সে কোন সময় করেছে। স্বামীকে আর কচি ছেলেটাকে পেট ভরে খেতে দিতে না পারার দুঃখটাই ওর সবচেয়ে বেশী বাজে।

এখন মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে ও উপলব্ধি করল—আরও কত যন্ত্রনা ওকে সইতে হবে। ওর কাছে তো এখন সব কিছুই শেষ হয়ে গেছে। সেলের ভেতরের গুমোট আবহাওয়ায় যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল, মনে হল এখনি যেন মারা যাবে। শিউরে ভাবল এন্টোনিয়া—আর মাসখানেকের মধ্যেই তার দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হবে।

না, তার সন্তান এই কয়েদখানায় জন্মাতে পারে না, কিছুতেই না। এত বড় বর্বর অপরাধ কোন পুরুষই করতে পারে না।

কিন্তু অপরাধটা শেষ অবধি ঘটল। সেলে ঢোকার পর থেকে সেইদিন প্রথম তাকে বাইরে আনা হল। জেল হাসপাতাল, ঠিক সেলের মতই অন্ধকার নোংরা। সেখানে তার পরিচয় হল আর সব সমদুঃখভাগিনী অত্যাচারিতা সঙ্গিনীদের সঙ্গে।

নবজাতা কন্যা। গরাদের ভেতরে কী যন্ত্রণাময় সেই জন্মদান। মেয়েটি জন্মাবার পর অন্য সব বন্দী মেয়েরা ঠিক করল ওর নাম রাখা হবে 'এস্-পাবান্জা', স্পেন দেশের ভাষায় যার মানে 'আশা'। তার মা প্রথমে ভাবল ওরা বুঝি ঠাট্টা করছে। যাদের জীবনে এই সমাধিঁ তাদের আর আশা কোথায়? একমাত্র পথ মৃত্যু, তাতে যদি এই অসহ্য অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

ঠিক পাশের খাটিয়াটায় ছিল যক্ষারোগাক্রান্তা এক বৃদ্ধা। ১৯৩৭ সাল থেকে সেই হতভাগিনী তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে; যে কেউ দেখলেই বলবে ওর মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এসেছে, কিন্তু মরতে সে চায় না, এখনও তার জীবনে কত আশা।

বৃদ্ধা তার নোংরা বিচালিগাদার ওপর ভর দিয়ে উঠে বসে এন্টোনিয়াকে বলল, 'বোন, তুমি ভুল করছ, জীবনকে ভালোবাসতে হবে নিবিড়ভাবে। বাইরের মুক্ত জনসাধারণের চেয়ে আমরা যারা কয়েদখানায় বন্দী, তারা অনেক বেশী করে ভালোবাসব, আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে জীবনকে আঁকড়ে থাকব। যে মৃত্যু প্রতি মুহূর্তে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, তাকে আমরা হার মানাব। আর তা করতে হলে আমাদের আশা চাই, বিশ্বাস চাই। দেখছ তো অত্যাচারীরা ঐ পাথরের দেওয়াল আর মোটা মোটা গরাদের বেড়াজালেও নতুন জীবনের আবির্ভাব এই গোরস্থানের মধ্যেও ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। তবুও ওরা জীবনকে ঘৃণা করে। ওরা তোমাকে ঘৃণা করে, আমাকে ঘৃণা করে, এমন কি ঐ যে সদ্যোজাত শিশু, ওকেও ঘৃণা করে। নিজের মৃত্যু কামনা করে ওদের পাশবিক এই অত্যা-চারের পথ সহজ করা ছাড়া তুমি আর কী করতে পার? আশা নিয়েই

তো বাঁচব আমরা। আর তাই আমার মনে হয় এই নবজাতাকে 'আশা' বলেই ডাকা উচিত।'

ছোট্ট আশার জন্মাবার খবরটা শত শত বন্দীদের মাঝখানে তখনি ছড়িয়ে পড়ল। প্রত্যেকের কাছেই আশা হয়ে দাঁড়াল একটা বহুমূল্য কিছু। কেউ বুঝতেই পারল না কেমন করে এরি ভেতর আশার জন্তে ছোট্ট একটি পালকের তোষক এসে পৌঁছল। সেলের ভেতর চুল বাঁধার ফিতে কেউ চোখেও দেখেনি, কিন্তু এখন সেসব যেন কোন গুপ্তস্থান থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল, তার সঙ্গে আশার ছোট্ট ছোট্ট পোষাক তৈরির নানারকম সরঞ্জাম।

নবজাতার আবির্ভাব মায়ের দিনগুলিকে কিছু কম দুর্বহ করে তোলেনি। তখনও তাকে আরও ৬০ দিন ঐ সেলে থাকতে হয়েছিল। কেউ জানত না কোথা থেকে বাচ্চার জন্তে বোতলভরা দুধ হাজির হত। জেল কর্তৃ-পক্ষের তরফে নিশ্চয়ই দুধ বিলির ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু বন্দীদের নানা রকম নিজস্ব উপায় ছিল, যার ফলে বাচ্চার খাওয়ার অভাব একটা দিনও হয়নি।

কয়েদখানার মধ্যে জন্মেও সাধারণ ছেলেমেয়েদের অনেক আগেই ছোট্ট আশার প্রচুর খেলনা জুটে গেল। প্রত্যেকটি সেলেই ওর জন্তে খেলনা তৈরি হতে লাগল—ছেঁড়া ন্যাকড়া সুতা কাঠের টুকরো ইত্যাদি দিয়ে—যে মমতা আর যত্ন তাতে জড়িয়ে রইল তাইতেই সেগুলি অমূল্য হয়ে উঠল। ছোট তোষকের বিছানার পাশেই খেলনাগুলো জেলের নোংরা দেওয়ালের ভয়াবহতাকে যেন যুদ্ধ ঘোষণা করল।

বছরের পর বছর যায়। এন্টোনিয়ার মেয়াদ পাঁচ বছর। আশার বয়স এখন সাড়ে তিন। সেল আর জেলখানার উঠোনটুকুর বাইরে সে কোনদিন যায় নি। মুক্তির কোন অর্থই সে বুঝত না। তার কাছে মুক্তির অর্থ জেলের আঙিনায় খেলা করা আর ঐ শিশুমনের আনন্দ জেলখানার একটা কুঠুরি থেকে অন্য কুঠুরিতে ছুটোছুটি করে ছড়িয়ে দেওয়া।

প্রত্যেকটি বন্দী মেয়েই যেন ওর নিজের মা; কিন্তু তা সত্ত্বেও ওর স্মৃতি থেকে সেই সব নিষ্ঠুর, করুণ দৃশ্যগুলো মুছে দিতে তারা পারেনি। প্রথম দিনের ঘটনাটা বীভৎস। একটি বন্দী মেয়েকে তার নিজের সেলে ফিরতে দেখেছিল, রক্তে তার মুখ ভেসে যাচ্ছে। সবাই ছুটে এসে তাকে সেবা করতে লাগল।

আর একদিন তাকে আর সব বন্দী মেয়েদের সঙ্গে বাইরের উঠোনে জোর করে টেনে আনা হয়েছিল। জেলখানার লোকরা, যাদের ও 'পাজী লোকগুলো' বলেই জানে, তারা ওদের সবাইকে ধাক্কা মারতে মারতে লম্বা বারান্দাটা দিয়ে নিয়ে গিয়ে উঠোনের এক কোণে জড়ো করল। তারপর একদল প্রহরী লাঠি হাতে ওদের সবাইকে ঘিরে দাঁড়াল।

এমন সময় তারা আর একটি মেয়েকে এনে একটা থাম্বার সঙ্গে বেঁধে তার উপর বর্ষণ শুরু করল কিল, চড়, ঘুষি। মারের চোটে মৃতপ্রায় মেয়েটির সর্বাঙ্গ যখন রক্তে ভাসতে লাগল তখন তারা থামল। অন্য সব মেয়েরা এই দৃশ্য দেখে তীব্র করুণ স্বরে আর্তনাদ করতে লাগল। শেষ অবধি ছোট্ট আশা এত ভয় পেল যে, মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। কিন্তু মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগে ক্রমশ লুপ্ত চেতনার মধ্যেও টের পেল যে, সেই লোকগুলো এবার তার মাকে আর তার বন্ধুদের মারতে শুরু করেছে।

সেলের ভেতর জ্ঞান হতে যখন প্রথম চোখ খুলল তখন তাকে বলা হ'ল যে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু ও স্পষ্ট দেখল মায়ের আর কয়েকটি মেয়ের ক্ষতবিক্ষত মুখ থেকে তখনও রক্ত ঝরছে। আর কতকগুলি মেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তীব্র যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে।

আশা এখন আরও একটু বড় হয়েছে। এখনও সে চারদিকের আরও কতকগুলো ব্যাপারে কেমন হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। কিছুতেই ওর মাথায় ঢোকে না কেন মাঝে মাঝে রাত্রিবেলা সমস্ত বন্দীরা সমস্বরে কী এক অদ্ভুত গান গেয়ে ওঠে। আর প্রতিবার একই প্রক্রিয়ায় পুনরাবৃত্তি ঘটে। ভোর-বেলা জেলার এসে তার একটি বন্ধুকে ধরে নিয়ে যায়। লম্বা বারান্দাটা দিয়ে যাবার সময় সে আবার গান শুরু করেছে শোনা যায়, সঙ্গে সঙ্গে সবাই মিলে তার সঙ্গে সমস্বরে গেয়ে ওঠে। আর সেলের দরজায় লাথি মারতে থাকে।

ভয় পায় আশা—কিছুক্ষণ পরেই বাজ পড়ার মত প্রচণ্ড আওয়াজ শোনা যায়। পরক্ষণেই বহুদূরে একটা চীৎকার হঠাৎ থেমে যায়। 'জিন্দাবাদ'—কথাটা দিয়েই সেটা শুরু হয়—তাই ঐ কথাটা ওর স্মৃতিতে একেবারে গাঁথা আছে।

আশা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না, প্রত্যেকবার এই একই ব্যাপার ঘটে যাবার পরে প্রথম যে মেয়েটি যাবার পথে গান গেয়ে ওঠে সে কেন আর

ফিরে আসে না। সবাই ওকে বলে সেই বন্ধুটি জেলখানা থেকে চলে গেছে। এখন সে অন্য সব লোকদের সঙ্গে থাকবে যাদের আশা চেনেই না। কিন্তু ও অবাক হয়ে ভাবে, 'আমাদের বন্ধু যদি জেলখানার চেয়ে ভালো জায়গায় গিয়ে থাকে তবে সবাই মিলে এত কাঁদে কেন?'

একদিন আশা দেখে সবাই জড়ো হয়ে একটা ছুটির দিন নিয়ে আলোচনা করছে। সব মেয়েরাই বলছে, ১৪ই এপ্রিল* আসতে আর বেশী দেরী নেই। তার মানে ও কিছুই বুঝল না তবুও ভারী খুশি হয়ে উঠল, বেশ একটা উৎসব হবে ভেবে। উৎসবের আয়োজনের মধ্যে ও চঞ্চল হয়ে উঠল।

শেষকালে উৎসবের দিন এল। আশা মনের আনন্দে ঘুমোতে ঘুমোতে উৎসবের স্বপ্ন দেখছিল, যেখানে ও হাসতে আর খেলা করতে পারবে। কিন্তু আচমকা একটা সুতীক্ষ্ণ আর্তনাদে ওর ঘুম ভেঙে গেল। ভীরু চোখ দুটো মেলে দেখল তখনও চারদিক অন্ধকার। তারপর বুঝতেই পারল না ইতিমধ্যে ওকে কখন উঠোনে আনা হল। চারদিকে চেয়ে মাকে সে কোথাও দেখতে পেল না, কিন্তু অবাক হয়ে দেখল কালকের দেখা কাপড়ের টুকরো-গুলো একটা জানলা থেকে ঝুলছে। কাপড়গুলো একসঙ্গে সেলাই করে জুড়ে লাল-হলদে-বেগুনি রঙের একটা পতাকা করা হয়েছে।

আশা বুঝতেই পারল না সবাই মিলে একটা লেখা কাগজ আর ঐ সুন্দর জিনিসটার দিকে দেখিয়ে দেখিয়ে এত উল্লাস করছে কেন? এটাও বেশ সুন্দর লাগল আশার। এতক্ষণে তবু ওর ধারণা হল উৎসব বলে কাকে।

কিন্তু হঠাৎ আশা দেখতে পেল লোকগুলো বন্দীদের ধরে ধরে মারছে। ওর মাকে আর অন্য আটজনকে মারতে মারতে নিয়ে গেল। ওদের সবাইকে আশা চেনে। জেলের একেবারে ভেতর দিকে ওদের নিয়ে গেল। ওদের চীৎকার শোনা যেতে লাগল। এইবার সে শুনতে পেল সেই কথাটা যেটা এতদিন মাঝখানে হঠাৎ থেমে যেত। 'গণতন্ত্র জিন্দাবাদ'—চেঁচিয়ে উঠল অনেকের সঙ্গে ওর মা। এই গণতন্ত্র জিনিসটা কি একবার যার নাম করলেই ওদের হাতে এত মার খেতে হয়?'

প্রথমটা আশা চেঁচিয়ে উঠতে গেল, ভাবল একবার বলে, মা তো ঐ রঙীন জিনিসটা জানলায় বাঁধেনি। কিন্তু মা যে বারণ করে দিয়েছে 'একটি

---

* স্পেনের প্রজাতন্ত্র ঘোষণার বার্ষিক স্মরণোৎসব।

কথাও বলবে না'। আশা তো বুঝতেই পারে না কেন যে মা সত্যি কথা বলতেও বারণ করে। কিন্তু আশা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। ওর চোখ পড়ল মায়ের দিকে, কী এক অদ্ভুত আনন্দের আলো মায়ের সমস্ত মুখে। ভোরের হাওয়ায় ভাসছে সেই সুন্দর রঙীন টুকরোটা। আর জল-ভরা চোখে মা চেয়ে আছে সেই দিকে।

আশার কাছে রবিবারের দিনটা সব চেয়ে ভালো। এতটুকু ছোট্ট থেকে দেখে আসছে যে ঐ দিন বন্দীদের সবার কাছেই কত লোক দেখা করতে আসে। কিন্তু তাকে দেখতে কেউই আসে না। মার কাছে শুনেছে অনেক দূরের দেশে তারও বাবা আছে, ভাই আছে, কিন্তু তাদের যথেষ্ট পয়সা নেই বলে তারা আসতে পারে না। আশা অবশ্য যারা দেখা করতে আসে তাদের কাউকেই দেখেনি। কিন্তু ওর কল্পনায় আঁকা হয়ে আছে, বড় বড় লোক—তাদের মস্ত পকেট জিনিসপত্রের ভারে ঝুলে রয়েছে। অবশ্য এইরকম মনে হবার কারণও আছে। প্রত্যেক রবিবারেই ওর যেসব বন্ধুদের দেখা করার লোক আসে তারা ওকে অনেক মিষ্টি খাবার, আরও কত সুন্দর সুন্দর জিনিস এনে দেয়। এত রাশি রাশি জিনিসও পায় যে, সেসব পরের রবিবার পর্যন্ত চলে।

একদিন তারও দেখা করতে আসার মতই ব্যাপার ঘটেছিল। সেদিন ভোরবেলা যে লোকটা ওদের চিঠি বিলি করে সে ওকে একটা কাগজের বাক্স এনে দিল। খোলা আর ছেঁড়া কাগজের ডালাটার ভেতর থেকে সুন্দর সুন্দর কী সব দেখা যাচ্ছে। মা যখন বাক্সটা নিল, ওর মনে হল বাক্সটা ওর জন্যে নয়, লোকগুলো ভুল করেছে। কিন্তু মা বললেন ওটা তারই। ফ্রান্স থেকে এসেছে।

'ফ্রান্স? সেটা আবার কী?' অবাক হয়ে আশা জিজ্ঞেস করল।

'ফ্রান্স একটা দেশ। এখান থেকে অনেক অনেক দূরে সেই দেশ।' মা বলল, 'ঠিক যে কোথায় তা আমি জানিনা অবশ্য, কিন্তু আমি বরাবর বলতে শুনেছি যে ফ্রান্সের শ্রমিক আর জনসাধারণ আমাদের আর আমাদের বন্ধুদের খুব ভালোবাসে। বহু স্পেনের লোক সেখানে থাকে, আমাদেরই মত স্পেন দেশের লোক—'

'কিন্তু ওরা তো আমাদের চেনে না', আশা প্রতিবাদ জানাল।

'চেনেই না তো জিনিস পাঠাতে যাবে কেন?'

শেষ পর্যন্ত যখন দেখল যে বাক্সটা সত্যিই ওর, তখন খুলে ভেতরের

জিনিসগুলি একে একে বার করতে শুরু করল। কী আশ্চর্য! ছোটো জামা, চকোলেট, মিষ্টি আর একটা মস্ত পুতুল—সত্যিকারের পুতুল।

উপহারগুলো যখন আশা কেবলই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে, মা কিন্তু তখন কোন একটা জামা থেকে পড়ে-পাওয়া একটা লেখা কাগজ নিয়ে পড়ছেন। একটু পরে মা ডাকলেন, মায়ের চোখে জল টল টল করছে, 'জান আশা, স্পেনের অত সব মেয়েরা তোমাকে এতসব উপহার পাঠিয়েছে। তারা ঠিক আমার আর যাদের এখানে দেখছ তাদেরই মত, ওরাও আমাদের কথা ভাবে। ওরা লিখেছে তোমাকে যদিও তারা চেনে না, তবুও তোমাকে ওরা খুব ভালোবাসে, আর তাই এইসব উপহার তোমাকে পাঠিয়েছে। আজ থেকে তুমি আরও অনেক নতুন 'মা' পেলে আশা। তুমি ঠিক বুঝবে না, কিন্তু তোমার মত স্পেনের প্রত্যেকটি ছোট্ট ছেলেমেয়ের হাজার হাজার 'মা' আছে।'

আশা সত্যিই খুব ভালো বুঝল না কথাটা। তবে একটা কথা ওর কেবল মনে হতে লাগল। সেই নতুন পাওয়া মায়েদের ওরও তো কিছু পাঠানো উচিত। কিন্তু ওর যে কিছু নেই। শেষ পর্যন্ত একটা কথা তার মাথায় এল। মাকে ডেকে বলল, 'মা শোন, ওরা আমাকে কত ভালোবাসে, আমিও একটা কিছু করব ওদের জন্যে। আমি এবার লিখতে শিখব তারপর আমি ওদের একটা চিঠি লিখব—ঠিক বড়দের মতন।'

আশার ইচ্ছে ছিল চিঠিটা মস্ত বড় হয়, কিন্তু অত ধৈর্য ওর কোথায়? মাত্র কয়েকটা কথা লিখতে শিখেই এক টুকরো কাগজে মায়ের সাহায্যে তার নতুন মায়েদের চিঠি লেখা হল:

'আমিও তোমাদের খুব ভালোবাসি। এখানে তোমাদের কথা আমি অনেক শুনেছি। আমি তোমাদের 'ছোট্ট মেয়ে' শুনে আমার খুব ভালো লেগেছে। আমার অনেক ভালোবাসা আর চুমো নিও।'

দুমাস পর একদিন সন্ধ্যেবেলা আশাকে আর তার মাকে খবর দেওয়া হল যে দুটি লোক বাইরে তাদের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

'দুজন লোক!' বিস্ময়ে মা চেঁচিয়ে উঠল, 'অসম্ভব! আমার স্বামী তো কই এখানে আসার কথা জানায়নি? তাছাড়া এখানে আর কাউকেই তো আমি চিনি না।'

কিন্তু আশা ভয় পেল। ভীষণ ভয় পেল সে। যত পুরুষ ও দেখেছে,

তাদের সকলেই 'বড় পাজী'—শুধুই মাকে আর অন্য বন্ধুদের মারে আর যন্ত্রণা দেয়। আশা নিজেই একাধিকবার মার আর লাথি খেয়েছে, আর মুখে তাকে ওরা যা বলেছে আশা শুনেছে সেসব নাকি তারী অসভ্য কথা। মায়ের আর তার সঙ্গে যে দুজন লোক দেখা করতে এসেছে তারাও নিশ্চয়ই ওদের ধরে মারবে।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মার হাতটা শক্ত মুঠোতে ধরে একটা মস্ত ঘরে এল আশা। ঘরটা মাঝখানে লোহার গরাদ দিয়ে দুভাগ করা। গরাদের ওধারে অনেক লোক। দুজন লোক ওর নজরে পড়ল। আশ্চর্য! তারা একেবারে অন্য ধরনের, ওর দিকে কেমন স্নেহভরা চোখে চেয়ে আছে আর হাসছে।

পরস্পরকে সম্বোধন করার পর লোক দুজন নীচু গলায় বলল একটা কারখানার শ্রমিকদের পক্ষ থেকে ওরা এসেছে। 'কারখানা' কাকে বলে আশা জানেই না, তবু কোন প্রশ্ন না করে চুপ করে রইল। ওদের মধ্যে অল্প-বয়সী ছেলেটি আশাকে একবারটি গরাদের ওধারে এনে দেবার জন্য প্রহরীকে জানাল। এই নিয়ে বহুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর ওরা আশাকে যেতে দিতে রাজী হল। আশা কিন্তু তাতে বিশেষ খুশি হল না, কিন্তু লোকটি তাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমো খেল, আশা দেখল লোকটির চোখে প্রায় জল এসে গেছে। এত জোরে তাকে কোলের ভেতর আঁকড়ে ছিল যে ওর বেশ কষ্ট

হচ্ছিল, কিন্তু আশার একটুও ভয় করছিল না। ও বুঝতে পেরেছিল এরা ভালো লোক, তাই যখন তার ফ্রকের পকেটে এক টুকরো কাগজ গুঁজে দিল, তখন টের পাওয়া সত্ত্বেও ও চুপ করে রইল।

তাদের আনা খাবার ইত্যাদির জন্য মা তাদের ধন্যবাদ জানালেন, আর বেশী পরিমাণে আনতে পারেনি বলে তারাও ক্ষমা চাইল। তারপর মায়ের সঙ্গে আশা সেলে ফিরে গেল।

এতক্ষণে আশা সেই কাগজের টুকরোটার কথা মাকে বলল। সব মেয়েরা ছুটে এল সেটা পড়বার জন্য। রীতিমত উত্তেজিত ভাবে আলোচনা শুরু হয়ে গেল। মনে হল সবাই ভারী খুশি হয়েছে, কিন্তু আশা তো ভাবতেই পারল না ঐটুকু একটা কাগজ পেয়ে কেন তারা এত খুশি? মাত্র কয়েকটা কথা টুকরো টুকরো ভাবে ও ধরতে পারছিল। 'ওয়াবশ', 'শান্তি সেনা', 'নিপীড়িতের মুক্তি'। এসবের অর্থ কিছুই ওর বোধগম্য হল না। তবে এটা বেশ বুঝল যে আজ তার জন্তেই তার সব বন্ধুদের এত আনন্দ আর খুশি। আশা নিজেকে মস্ত বড়, আরও আরও বড় ভাবতে লাগল, অনেক গল্পে যেসব বীরদের কথা শুনেছে, নিজেকে তাদেরই একজন মনে হতে লাগল।

পরদিন দেখল সমস্ত বন্দীরা লুকিয়ে লুকিয়ে একটা কাগজে কি সব লিখছে। তাকে সবাই বলল এটা কালকের যে চিঠিটা লোকটি তার হাতে পাঠিয়েছে, সেই চিঠির উত্তর। আশা বলল, 'আমিও তাকে লিখতে চাই। কিন্তু কি লিখতে হবে আমি জানি না।'

তখন মা এসে আশার হাত ধরে ধীরে ধীরে লেখাতে লাগলেন, "আমরাও এখানে মরতে চাই না। এত অত্যাচার এত দুঃখ সহ্য করা সত্ত্বেও আমরা জীবনকে ভালোবাসি। আমরা বাঁচতে চাই, কারণ ভবিষ্যতের উপর আমাদের অনেক আশা, অনেক বিশ্বাস। কারণ প্রত্যেকটি মানুষ যারাই আমাদের মত চিন্তা করে তারা কেউই চুপ করে থাকবে না। আমিও বন্দীদের মধ্যেকার ছোট্ট মেয়ে—আমাকে ওই বলেই সবাই ডাকে—আমিও শান্তি চাই, আমার বাবাকে, আমার দাদাকে দেখতে পাব বলে, এই ভীষণ জায়গা থেকে বাইরে যাব বলে। যে মাঠ-ঘাট আমি কোনদিন দেখিনি, সেইখানে আরও অনেক ছোট ছেলেমেয়ের সঙ্গে অন্য সমস্ত ছোট্ট মেয়েদের মতই একটি ছোট্ট মেয়ে হয়ে খেলা করব বলেই শান্তি চাই।"

'তুমি কি এইসব চাও?' মা ওকে জিজ্ঞাসা করলেন।

'নিশ্চয়!' আশা দৃঢ়স্বরে জানাল, 'আর এই যদি শান্তি হয় তবে ফ্রান্সের যেসব মেয়েরা আমাকে উপহার পাঠিয়েছে আমিও তাদেরই মত। আমিও তাহলে শান্তি ভালোবাসি যদিও কাকে 'শান্তি' বলে জানি না।

অনুবাদ—শান্তা বসু

রামমোহন

[পূর্বানুবৃত্তি]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

তৃতীয় অঙ্ক

—এক—

[কলকাতায় রামমোহনের মানিকতলার বাড়ি। সময় : আনুমানিক ১৮১৬ সাল। বিলেতি কেতায় সাজানো একটি বসবার ঘর। রামমোহন—একা পায়চারী করতে করতে একখানা সংবাদপত্র পড়ছেন। তাঁর মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা]

রামমোহন ॥ আশ্চর্য কুসংস্কার! এত ভালো ইংরেজি শিখেছে—শাস্ত্রের ওপরেও প্রচুর দখল, তবু কী অসাধারণ অন্ধতা। (কাগজটা টেবিলে ফেলে দিলেন)

[দ্বারকানাথ ঠাকুর, ডেভিড হেয়ার, অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালীনাথ মুন্সী প্রবেশ করলেন]

আরে—আরে, কী সৌভাগ্য। একেবারে সব দিক্‌পালদের আবির্ভাব। প্রিন্স্ দ্বারকানাথ—মিস্টার ডেভিড্ হেয়ার—তার ওপর আবার এক জোড়া জমিদার : অন্নদা বাঁড়ুয্যে আর কালী মুন্সী। বসুন—বসুন সব—

[সকলে বসলেন]

(রামমোহন ডাকলেন) রাধাপ্রসাদ—রাধাপ্রসাদ—

[রামমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ প্রবেশ করলেন—বয়েস আন্দাজ কুড়ি-বাইশ]

রাধাপ্রসাদ ॥ ডাকছেন বাবা?

রামমোহন ॥ দেখছ না—কারা সব এসেছেন? শিগ্‌গির খবর দাও ভেতরে। হরিকে বলো, এদের জন্যে জলখাবার নিয়ে আসুক।

[রাধাপ্রসাদ চলে গেলেন]

দ্বারকানাথ ॥ আঃ—এখন আবার এসব উৎপাত বাড়াচ্ছেন কেন?

রামমোহন ॥ ভাখো দ্বারকানাথ, তোমার সব ভালো—কেবল এইটেই দোষ।

আরে, দিনরাত যে মানুষ এত খেটে মরে—সে তো পেটের জন্যেই। প্রাণ খুলে খেতে না পারলে বেঁচে সুখ আছে নাকি! বুঝলে ব্রাদার—দিনে অন্তত বারো সের দুধ না হলে আমার চলে না।

ডেভিড্ হেয়ার ॥ (হেসে উঠলেন) রায় মহাশয় সত্যই সুপারম্যান!

রাম ॥ কথাটার মধ্যে তোমার মৌলিকত্ব নেই—ওটা অনেক আগেই আমার ভাগনে ঘোষণা করেছিল। তারপর হেয়ার—আজকাল মাগুর মাছ খাচ্ছ কেমন?

অন্নদা ॥ হঠাৎ মাগুর মাছ! ব্যাপার কী?

হেয়ার ॥ আপনি জানেন না অন্নদাবাবু? রায় মহাশয় একদিন আমাকে ইনভাইট্ করিয়া মাগুর মৎস্যের ঝোল খাওয়াইল। সেই হইতে লোভ লাগিয়া গেল। আজকাল প্রায়ই কিনিয়া খাইতেছি—ওঃ লাভলি!

কালী ॥ তবু তো হেয়ার সাহেব গঙ্গার ইলিশ খাননি—খেলে দিনরাত গঙ্গার ধারেই বসে থাকতেন—আর উঠে আসতেন না।

[হেয়ার হা হা করে হেসে উঠলেন]

হেয়ার ॥ তা যা বলিয়াছেন। বাংলা দেশকে এতদিন সাইকলজিক্যালি ভালোবাসিয়াছি—এবার মনে হইতেছে, ফিজিওলজিক্যালি-ও তাহার প্রেমে পড়িব।

দ্বারকা ॥ (টেবিল থেকে কাগজটা তুলে নিলেন) এটা আবার কী! ম্যাড্রাস কুরিয়র দেখছি!

রামমোহন ॥ হাঁ—ওতে মাদ্রাজের শঙ্কর শাস্ত্রীর একটা লেখা বেরিয়েছে। আমার 'বেদান্ত ভাষ্য'কে তুলোধুনো করে দিয়েছে একেবারে। তাছাড়া ক্যালকাটা গেজেটে আমাকে যে প্রশংসা করেছিল তাও বরদাস্ত করতে পারেনি। প্রমাণ করে ছেড়েছে, আমি একটি মূর্তিমান নির্বোধ!

দ্বারকা ॥ আপনি চুপ করে যাবেন নাকি?

রামমোহন ॥ আমাকে তো জানোই। একটি সাক্ষাৎ লড়ায়ে মুর্গী। ঝগড়ার গন্ধ পেলে মন একেবারে উৎসাহে আকুল হয়ে ওঠে! শাস্ত্রীজী এখনো জানেন না—কোথায় খোঁচা দিচ্ছেন! এমন জবাব দেব যে দেব্‌তাটি একেবারে পাকাপাকি মৌন অবলম্বন করবেন।

অন্নদা ॥ আপনার ঐ তর্কের জন্যেই লোকে এমন করে চটে যায়।

কালী ॥ সেদিন প্রকাশ্য সভায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীকে অমন করে জব্দ করলেন—ওদের দলবল এখন আপনার নামে যা নয় তাই বলে বেড়াচ্ছে।

হেয়ার ॥ ভেরি ব্যাড্‌।

রামমোহন ॥ সব চাইতে আশ্চর্য কি, জানো হেয়ার? তর্ক হল বাঙালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য—ন্যায় শাস্ত্রের চরম উন্নতি বাঙালীরই হাতে। সেদিন এ ছিল তার আর্ট। আর আজ এমন অধোগতি হয়েছে যে বিচারে হেরে গেলে রাগে-হিংসেয় খুন করে বসতে চায়।

দ্বারকানাথ ॥ অধঃপতনটা সব দিক থেকেই হয়েছে বলে ন্যায়-তর্কও জাত হারিয়েছে।

হেয়ার ॥ ভারতবর্ষের কথা ভাবিয়া আমার অত্যন্ত বেদনা জাগে, রায় সাহেব। এত বড় দেশ—এত বড় জাতি—আজ তারা কোথায় নামিয়া দাঁড়াইয়াছে!

রামমোহন ॥ বিদেশী হয়েও আমাদের জন্যে তুমি যা করছ হেয়ার, তার ঋণ দেশ কখনো শুধতে পারবে না। তোমার দিকে তাকালেই বুঝতে পারি, আজ ব্রিটেন এত বড় হয়েছে কেন!

হেয়ার ॥ (লজ্জিত) ছিঃ ছিঃ—এসব বলিয়া আমাকে লজ্জা দেওয়া কেন? আমি নিতান্তই ক্ষুদ্র—সামান্য একজন ঘড়ির ব্যবসাদার মাত্র।

অন্নদা ॥ (সকৌতুকে) কিন্তু হেয়ারের ঘড়ির ব্যবসায় এবার কেল পড়বে। এ দেশের ছেলেদের লেখাপড়া শেখাতে গিয়ে লালবাতি জ্বলবে ওর দোকানে।

দ্বারকা ॥ (ম্যাড্রাস কুরিয়ারখানা পড়ছিলেন, নামিয়ে রাখলেন) তাছাড়া হেয়ারের অবস্থাও দাঁড়িয়েছে চমৎকার। না ঘরকা, না ঘাট্‌কা। ওর স্বজাতিরা ওকে নেটিব্‌ঘেঁষা নাস্তিক বলে উড়িয়ে দেয়, আবার দেশী লোকের ঘরে উঠলে তারা কলসীর জল ফেলে।

হেয়ার ॥ (হেসে উঠলেন) ভালোই তো, আমি মাঝখানে থাকিব। ইওরোপ আর ভারতের মাঝখানে সেতু রচনা করিব।

রামমোহন ॥ ব্রাদার, কথাটা ঠাট্টা করে বললে বটে, কিন্তু নিজেই জানো না আজ কত বড় একটা সত্য তুমি উচ্চারণ করলে। আমি তোমায় বলছি, দিন আসবে। কাল হোক, পরশু হোক, পঞ্চাশ বছর পরে হোক।

তোমার দেশ সেদিন তোমায় চিনবে কিনা জানি না, কিন্তু সারা ভারতবর্ষ তোমার নামে মাথা নোয়াবে!

হেয়ার॥ (বিব্রত) ওসব এখন থাকুক। যে ব্যাপারের জন্ত আমরা আসিয়াছি। বাবু বৈদ্যনাথ মুখার্জির চেষ্টায় কাজ হইয়াছে। কাল সুপ্রীম কোর্টের চীফ্ জাস্টিস্ স্যার এডোয়ার্ড হাইড্ ঈস্টের সঙ্গে দেখা হইল। দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে তিনিও খুবই আগ্রহী। শীঘ্রই শহরের সমস্ত বিশিষ্ট লোককে লইয়া তাঁহার গৃহে একটা মিটিঙের ব্যবস্থা করিতেছেন। তোমার সঙ্গে আলোচনা করিয়া খুব খুশি হইয়াছেন তাহাও বলিলেন।

দ্বারকা॥ ওদিকে রাধাকান্ত দেবের দলবল আবার বাগড়া না দেয়। ওঁরা তো আবার সংস্কৃতওলাদের চাঁই। ইংরেজি শিখলে নাকি জাত যাবে।

অন্নদা॥ রাধাকান্ত দেব কিন্তু একটু প্রভাবিত হয়েছেন মনে হয়। বিহারী চৌবের বাড়িতে সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীকে বিধ্বস্ত করবার পরে রামমোহন রায়ের পাণ্ডিত্যের খুব প্রশংসা করে বেড়াচ্ছেন।

কালী॥ ও মুখেই—কাজে বিরোধিতা তো সমানে চালিয়ে যাচ্ছেন। তা নয়, আসলে হয়তো সায়েবদের খুশি করতে চান।

দ্বারকা॥ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতেরা সবাই মত দিচ্ছে শুনলাম। এমন কি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার পর্যন্ত রাজী হয়েছেন।

রামমোহন॥ এটা অপবাদ হচ্ছে অন্নদা। আর সকলের সম্পর্কে যা খুশি বলতে পারো, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় খাঁটি মানুষ। হোন রক্ষণশীল, কিন্তু তাঁর চরিত্রে যেমন ফাঁক নেই, তেমনি বিদ্যাতেও নয়। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র সঙ্গে আমার মত না মিলতে পারে, কিন্তু 'রাজাবলি'র মতো বইয়ের যিনি স্রষ্টা, তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

দ্বারকা॥ (মাথা নাড়লেন) ঠিক।

রামমোহন॥ বৈদ্যনাথবাবু কাজের মতো কাজ করেছেন একটা। হাওয়া যেন একটু অনুকূলে বইছে—আশা পাচ্ছি। ভালো কথা হেয়ার, তোমার কি এর মধ্যে অ্যাডাম সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

হেয়ার॥ হাঁ, কাল আমার দোকানে আসিয়াছিলেন। আসিয়াই শত মুখে তোমার প্রশংসা! অমন গোঁড়া পাদ্রী অ্যাডাম—তিনি যেভাবে তোমার

প্রেজ্ঞ. করিলেন, আমার খুব আশ্চর্য লাগিল। হয়তো বা একদিন তোমার ডিসাইপল হইয়াই বসিবেন—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[একজন বেয়ারা প্রবেশ করল। সেলাম করে রামমোহনের সামনে গিয়ে দাঁড়ান, একখানা চিঠি দিলে, আবার সেলাম করে বিদায় নিলে।

খাম খুলে চিঠি পড়লেন রামমোহন। প্রসন্নতায় ভরে উঠেছে তাঁর মুখ।]

দ্বারকা ॥ কার চিঠি দাদা ?

রামমোহন ॥ নিমন্ত্রণপত্র। তোমরাও পাবে।

কাশীনাথ ॥ কী রকম ?

রামমোহন ॥ বৈদ্যনাথবাবু লিখছেন। কাল বিকেলে হাইড্‌ ইস্ট্ সাহেবের কুঠিতে একটা সভা বসছে। শহরের গণ্যমান্য সবাই আসছেন—এ দেশের ছেলেদের জন্যে ইংরেজি কলেজ করবার একটা প্ল্যান চক্ আউট করা হবে।

অন্নদা ॥ খুব ভালো খবর।

রামমোহন ॥ আনন্দে আমার বুক ভরে উঠছে অন্নদা। কতদিন ধরে স্বপ্ন দেখেছি আমি! দেশের বুক থেকে মোহের জাল কেটে যাচ্ছে—সরে যাচ্ছে কুসংস্কারের রাত্রি! পৃথিবীর দশ দিক থেকে আসছে জ্ঞানের আলোকবন্যা। লোকাচারের নাগপাশ ছিঁড়ে জেগে উঠছে একটা সুস্থ সবল নতুন জাতি। এ বুঝি তারই সূচনা!

হেয়ার ॥ হাঁ, ইহা তাহারি সূচনা। তুমি ঠিকই বলিয়াছ রায়!

[রামমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র যুবক রাধাপ্রসাদ ঘরে ঢুকলেন]

রাধাপ্রসাদ ॥ ভেতরে খাবার দেওয়া হয়েছে বাবা। আপনারা চলুন।

দ্বারকা ॥ ডোবালে দেখছি! এই অসময়ে আবার খাওয়া!

রাধা ॥ বেশি কিছু নয় কাকা, সামান্য জলযোগ।

দ্বারকা ॥ সামান্য তোমার বাবার পক্ষে, আমাদের পক্ষে প্রাণান্তকর।

[রাধাপ্রসাদ হেসে ফেললেন]

রামমোহন ॥ ভাখো দ্বারকানাথ, তোমার ওসব জমিদারী বুলি ছাড়ো। যতই যা করো, বামুনের ছেলে তো বটে! অগস্ত্যের ট্র্যাডিশন ভুলে যাচ্ছ কেন? খাওয়ার ব্যাপারে তোমার অন্তত চক্ষুলজ্জা করা উচিত নয় বেরাদার। চলো হেয়ার। ওঠো হে কাশীনাথ, অন্নদা—

হেয়ার ॥ হাঁ-হাঁ হট্ মীল ডাকিতেছে, দেরী করিলেই ঠকিতে হইবে।

কালীনাথ ॥ হেয়ারের জন্তে মাগুর মাছের ঝোল আছে তো রাধু?

[সকলে হাসলেন]

রাধাপ্রসাদ ॥ (হেসে) না।

হেয়ার ॥ না থাকিলে অন্ত কমপেন্‌সেশন্ আছে, সে আমি জানি। চলো, চলো:—

রামমোহন ॥ রাধাপ্রসাদ, ওদের নিয়ে যাও, আমি আসছি—

[সকলে রাধাপ্রসাদকে অনুসরণ করে চলে গেলেন। রামমোহন কিছু কাগজপত্র গোছানো শেষ করলেন, তারপর বেরোতে যাবেন, এমন সময় :
বছর ষোলো-সতেরোর নন্দকিশোর বসু এবং তাঁর বালিকা স্ত্রী প্রবেশ করলেন। নন্দকিশোরের স্ত্রী কাঁদছেন।
রামমোহন চমকে উঠলেন।]

রামমোহন ॥ খবর কিহে নন্দকিশোর? এটি কে?

নন্দকিশোর ॥ (বিবর্ণ মুখে) আমার—আমার স্ত্রী।

রামমোহন ॥ (মৃদু ভর্ৎসনাভরা গলায়) এরই মধ্যে বিয়ে করে বসেছ তা হলে! আঃ—এই বাল্যবিবাহের পাপ দেশ থেকে কবে যে যাবে! তা হয়েছে কী? কাঁদছে কেন মেয়েটি?

(মেয়েটি রামমোহনের পায়ের কাছে বসে পড়ল, কাঁদতে লাগল)

মেয়েটি ॥ আমায় ওরা তাড়িয়ে দেবে বাবা। আমার মুখ দেখবে না!

রামমোহন ॥ বটে—বটে! ব্যাপার কিহে নন্দকিশোর? অনর্থক এই কচি মেয়েটার ওপর এরকম বীরত্ব কেন?

নন্দকিশোর ॥ (বার কয়েক খাবি খেলেন) আপনাকে বলতে লজ্জা হয়, কিন্তু ভারী বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেছে একটা।

মেয়েটি ॥ (কেঁদে চলল) কিন্তু আমার কী দোষ? কী করেছি আমি? কেন ওরা আমায় তাড়িয়ে দেবে?

রামমোহন ॥ (আশ্বাস দিয়ে) কেউ তোমায় তাড়াতে পারবে না মা— তোমায় কোনো ভয় নেই। নন্দ, লজ্জা করলে চলবে না। খুলে বলো সব।

নন্দকিশোর ॥ কথাটা হল—ইয়ে—বাবা বেজায় চটে গেছেন। বিয়ের আগে ফর্সা মেয়ে দেখিয়ে শেষে কালো—

রামমোহন ॥ বুঝেছি, আর বলতে হবে না। ফর্সা মেয়ে দেখিয়ে কালো মেয়ে বিয়ে দিয়েছে। (একটু চুপ করে থেকে) কিন্তু কে দায়ী এই ছলনার জন্যে? এই মিথ্যে কার সৃষ্টি? নন্দকিশোর, নিজেদের অপরাধ ঢাকতে গিয়ে আর একজনকে অপরাধী কোরো না।

নন্দকিশোর ॥ (মাথা নিচু করে রইলেন) তবু কালো মেয়ে—

রামমোহন ॥ কালো মেয়ে! (উত্তেজিত হয়ে উঠলেন) কালো মেয়ে বলেই তার দাম কানাকড়ি! শোনো নন্দকিশোর। স্ত্রীর পরিচয় মাত্র একটা ফর্সা চামড়ায় নয়—সে পরিচয় জীবনের মধ্যে। আমার কথা শোনো—মাথায় করে নিয়ে যাও ওকে। হয়তো দেখবে এই স্ত্রীই এমন সন্তানের জননী হবে—যার মধ্যে দিয়ে তোমারই নাম থাকবে উজ্জ্বল হয়ে।

মেয়েটি ॥ বাবা!

রামমোহন ॥ (মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে, সস্নেহে) সব ঠিক হয়ে যাবে মা, ঘরে যাও। কিছু হলে আমি দেখব। যাও নন্দ, মা লক্ষ্মীকে ঘরে নিয়ে যাও—

[মেয়েটি তাঁর পায়ে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করল]

কল্যাণী হও মা, স্বামীর জীবনের জয়লক্ষ্মী হও। নিয়ে যাও নন্দ—

[নন্দ স্ত্রীকে নিয়ে বিদায় নিলেন। রামমোহন তাকিয়ে রইলেন]

কালো মেয়ে—তাই তার দাম নেই! সমাজ! আশ্চর্য!

[ভেতর থেকে হেয়ারের কণ্ঠ ভেসে এল]

হেয়ার ॥ কই রায় মহাশয়, আমাদের খাওয়াইতে বসিয়া হোস্ট-এরই সাক্ষাৎ নাই!

রামমোহন ॥ (হঠাৎ যেন সজাগ হয়ে উঠলেন) হাঁ—হাঁ—আমি আসছি—

—দুই—

[সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইডু ঈস্টের কুঠি। এই কুঠির একটি হলঘর। দুধারে গদি-দেওয়া চেয়ার আর এই দুটি সারি পেছনে প্রেক্ষাগৃহের দিকে মুখ করে একখানা বড় টেবিল ও উঁচু চেয়ার। দুধারের চেয়ারগুলিতে কলকাতার সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি আসীন। তাঁদের মধ্যে রামমোহন, হেয়ার প্রভৃতিকে চিনতে পারা যাচ্ছে।
স্যার এডওয়ার্ড ও তাঁর পেছনে বৈদ্যনাথ মুখুজ্যে ঢুকলেন। সকলে উঠে দাঁড়ালেন। বৈদ্যনাথের হাতে কিছু কাগজপত্র।]

বৈদ্যনাথ। লেট মি ইনট্রোডিউস, লর্ডশিপ। রাধাকান্ত দেব—

[তক্ষণ রাধাকান্তের সঙ্গে ঈস্ট করমর্দন করলেন]

মতিলাল শীল—

[কৃষ্ণবর্ণ, কুরূপ মতিলালের সঙ্গে করমর্দন]

তারাচাঁদ দত্ত—তারিণীচরণ মিত্র—জয়কৃষ্ণ সিংহ—রামকমল সেন—পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (মৃত্যুঞ্জয় হ্যাণ্ডশেকের পর নমস্কারও করলেন একটা) পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন—দ্বারকানাথ ঠাকুর—রামমোহন রায়—অন্নদাচরণ ব্যানার্জী—কাশীনাথ রায়—ডেভিড্ হেয়ার—

[করমর্দন শেষ করে ঈস্ট বড় চেয়ারখানায় আসন নিলেন। তারপর বুক পকেট থেকে ঘড়ি বের করে সময় দেখলেন]

ঈস্ট্। তাহা হইলে—উইথ ইওর পারমিশন—আমরা কার্য আরম্ভ করিতে পারি ?

বৈদ্যনাথ। আরো দু-চারজন যদি আসেন—

রাধাকান্ত। মোটামুটি সবাই এসেছেন। আর অপেক্ষা করা যায় না। (নিজের সোনার ঘড়ি দেখলেন) চারটেও বেজে গেছে।

মৃত্যুঞ্জয়। হাঁ, দেরি করে লাভ নেই। বলুন বৈদ্যনাথবাবু।

(বৈদ্যনাথ ঈস্টের টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন)

বৈদ্যনাথ। আজকের এটা অবশ্য ফরমাল মিটিং নয়। এখানে আমরা ঘরোয়া ভাবেই জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব। নিজেদের ভেতরে একটা সেট্‌ল্ করে নিয়ে পরে আমরা কোম্পানিকে যুক্ত করতে পারি।

রামমোহন। বেশ, বলুন সেটা।

ঈস্ট্। (দাঁড়িয়ে উঠে) আমি বুঝাইয়া বলিতেছি। এ দেশীয় বালকদের ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য একটি উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়া সকল দিকেই বাঞ্ছনীয়। দেশীয় লোকেরা এতদিন ওয়েস্টার্ন এডুকেশন-এ বাধা দিয়াছেন বলিয়াই এ পর্যন্ত তাহা সম্ভব হয় নাই। রিসেন্টলি আপনারা অনেকেই উৎসাহিত হইয়াছেন বলিয়া আমি এই মিটিং কল করিতে সাহসী হইয়াছি। এ জন্যে আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাইব বাবু বৈদ্যনাথ মুখার্জিকে। তাঁহার চেষ্টাতেই এই আয়োজন।

বৈদ্যনাথ। আমি কিছুই করতে পারতাম না—যদি রামমোহন রায় আর হেয়ার সাহেব আমাকে সবরকমে উৎসাহ আর উপদেশ না দিতেন।

ঈস্ট্। হাঁ, রায়ের সঙ্গে I had very long discussions! He is the brightest man in this country—I think! (রাধাকান্ত, জয়কৃষ্ণ প্রভৃতি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। তারাচাঁদের ললাটে ভ্রূকুটি ফুটে উঠল)

মৃত্যুঞ্জয়। তাতে আর সন্দেহ কি! ওঁর মতো বিচক্ষণ লোক এখন এ দেশে দুর্লভ।

তারাচাঁদ। (হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে—বিরক্তভাবে) রামমোহনের প্রশস্তি বন্ধ করে সভার কাজটা চালিয়ে গেলেই কি ভালো হয় না বিদ্যালঙ্কার মশায়?

[ঘর স্তব্ধ হয়ে গেল। সব চাইতে বেশি অপ্রতিভ হলেন ঈস্ট]

ঈস্ট্। Why—of course! But every one must get his due! (একটু চুপ করে) Any way, এখন কিভাবে আমরা proceed করিব?

রাধাকান্ত। প্রথমে প্রতিষ্ঠানের একটা নাম—

বৈদ্যনাথ। Provisionally the Hindoo College-ই ঠিক করা হয়েছে।

ঈস্ট্। (হেসে) যাহাতে আপনারা misunderstand না করেন। Western education মানেই যে Christianity preach করা নয়—সেটা আমরা clear রাখিতে চাই।

রাধাকান্ত। (শুকনো গলায়) Thank you!

বৈদ্যনাথ। প্রথম হল finance-এর প্রশ্ন। কলেজ শুরু করতে যে টাকাটা গোড়াতেই দরকার হবে, তার কী ব্যবস্থা করা যাবে?

রামমোহন। কোম্পানির কাছ থেকে শিক্ষা বাবদ যে টাকাটা আমাদের পাওয়ার কথা ছিল তার কী হবে?

ঈস্ট্। You see Mr. Roy, টাকাটা কিভাবে যে দেওয়া হইবে—the process is not yet clearly defined. So it may take months, if not years!

রামমোহন। তা হলে ও জন্যে অপেক্ষা করে আর লাভ নেই। দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে।

বৈদ্যনাথ। সেই জন্যেই আজ আরো বিশেষ করে সকলকে ডাকা। কার কাছ থেকে কী সাহায্য পাওয়া যাবে—

রাধাকান্ত। You mean donations?

ঈস্ট্। Yes—yes donations! (হাসলেন) Generous donations from leading citizens like you!

দ্বারকানাথ। একটা হিসেব করুন তাহলে।

বৈদ্যনাথ। হিসেব আমি করেই রেখেছি। (কাগজপত্র উল্টে) আপাতত—এই লাখখানেক টাকার মতো হলেই শুরু করে দেওয়া যাবে। তারপর চাপ দেওয়া যাবে কোম্পানিকে।

রামমোহন। সে দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। কোম্পানির টাকা আদায় করা যাবেই।

রাধাকান্ত। (ঘড়ি দেখে—অধৈর্যভাবে) সময় নষ্ট করে কী হবে বৈদ্যনাথ বাবু? কোম্পানির টাকা আদায়ের দায়িত্ব নেবার লোকের অভাব হবে না। (একবার বাঁকা চোখে রামমোহনের দিকে তাকিয়ে নিলেন) নিন—চাঁদা ধরুন।

ঈস্ট্। চাঁদা ধরিবার কিছু নাই। এ তো আর জোর করিয়া লওয়া যাইবে না। যাঁহার যেভাবে ইচ্ছা, তিনি সেইভাবেই দিবেন। এবং যাঁহারা চাঁদা দিবেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে লোক লইয়াই অর্গানাইজিং কমিটি গঠিত হইবে।

রাধাকান্ত। আমি দশ হাজার টাকা দেব।

ঈস্ট্। (হাসলেন) Thank you very much.

(বৈদ্যনাথ একটা কাগজে লিখে নিতে লাগলেন)

বৈদ্যনাথ। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর?

দ্বারকানাথ। লিখুন দশ হাজার—

বৈদ্যনাথ। বাবু মতিলাল শীল?

মতিলাল। পাঁচ হাজার।

বৈদ্যনাথ। বাবু জয়কৃষ্ণ সিংহ?

জয়কৃষ্ণ। পাঁচ হাজার।

বৈদ্যনাথ। বাবু রামমোহন রায়?

তারাচাঁদ। (হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন) আমি আপত্তি করছি। রামমোহন রায়ের কাছ থেকে কোনো চাঁদা নেওয়া চলতে পারে না।

দ্বারকানাথ। } তার অর্থ?
হেয়ার। } What do you mean?

[কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন উঠলেন ; একটা চাপা উত্তেজনায় কাঁপছেন।]

কাশীনাথ। মাননীয় বিচারপতি বাহাদুর, অস্মদ্দিগের বক্তব্য এই যে পরম অধর্মাচারী ম্লেচ্ছ বাবু রামমোহন রায় এই কলেজের সহিত সংযুক্ত হইলে সনাতনধর্মসেবী নৈষ্ঠিক আর্যসন্তানগণ ইহাকে বর্জন করিতে বাধ্য হইবেন।

ঈস্ট্। (হতবাক্) Strange।

হেয়ার। (চেঁচিয়ে উঠলেন) Highly objectionable।

কাশীনাথ। }
অন্নদাচরণ। } (দাঁড়িয়ে উঠে সমস্বরে) অত্যন্ত অন্যায়। অত্যন্ত আপত্তিকর।

রামমোহন। আঃ— কী হচ্ছে হেয়ার! কাশীনাথ, অন্নদা, তোমরাও স্থির হয়ে বোসো। ওঁরা কী বলছেন, বলতে দাও।

বৈদ্যনাথ। (হতভম্বের মতো) এক্ষেত্রে এজাতীয় আপত্তির কি কোনো অর্থ আছে ?

মৃত্যুঞ্জয়। (মাথা নেড়ে) নিশ্চয় না। তর্কপঞ্চানন মহাশয়, শাস্ত্র নিয়ে আমাদের পুরনো তর্কের স্থান এটা নয়। রামমোহনের সমস্ত মতামত আমিও সমর্থন করি না। কিন্তু এ তো শিক্ষার ক্ষেত্র। এখানে এসব অনাবশ্যক কথা তোলার কী প্রয়োজন ?

রাধাকান্ত। পুরনো তর্ক নয়। অনাবশ্যক কথাও নয় বিদ্যালঙ্কার মশাই। আপনি নিজেই জানেন রামমোহন রায় এই দুবছর ধরে সনাতন ধর্মের বিরোধিতা করে আসছেন। তাঁর বেদান্ত, বেদান্তসার, উপনিষদের ব্যাখ্যা—হিন্দুর চরম অপমান। ব্যক্তিগত ভাবেও তিনি যা ইচ্ছে করেন, হিন্দুদের কোনো কিছু মানেন না। তাঁর পাণ্ডিত্যে আমাদের সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি ভ্রষ্টাচারী। তিনি যদি এই প্রতিষ্ঠানে থাকেন, তাহলে আমাদের সরে না দাঁড়িয়ে উপায় নেই।

হেয়ার। This is senseless।

রামমোহন। আঃ, থামো না হেয়ার। ওঁরা তো অন্যায় কিছু বলছেন না। হিন্দুধর্ম বলতে ওঁরা যা বোঝেন, তা তো আমি সত্যিই মানি না। তোমাকেও কোনো মিশনারী ধার্মিক বলে স্বীকার করবে না হেয়ার।

দ্বারকানাথ। তাই বলে—

মতিলাল। হাঁ, সেই জন্যেই উনি থাকলে আমাদের আপত্তি আছে।

ঈস্ট্। I do not know what Rammohan's religion is। কিন্তু

আমি একজন Christian—rather a very sincere Christian—আমি যদি সাধ্যমতো আপনাদের কিছু সাহায্য করিতে চাই, তবে আপনারা নিশ্চয়ই আপত্তি করিবেন না ?

তারাচাঁদ ॥ না, না, কক্ষনো না।

ঈস্ট ॥ Why ?

রাধাকান্ত ॥ আপনি টাকা দিলে আমরা আন্তরিক খুশিই হবো। কিন্তু রামমোহনের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। হিন্দুর ছেলে হয়ে যেভাবে তিনি আমাদের মাথা হেঁট করে দিয়েছেন, সেজন্য সমাজ তাঁকে ক্ষমা করতে পারে না।

দ্বারকানাথ ॥ (উত্তেজিত) বেশ, তাই যদি হয়, তাহলে আমরাও সবাই সরে দাঁড়াচ্ছি। শিক্ষার ক্ষেত্রে যেখানে এমন দলাদলি, সেখানে আমরাও কোনো সম্পর্ক রাখতে চাই না।

রামমোহন ॥ (দাঁড়িয়ে উঠে) বোসো দ্বারকানাথ। এমন মারাত্মক ভুল কেন করছ ? কেন শুধু আমার জন্যে দেশের ক্ষতি করবে—কেন জ্ঞানের দরজা বন্ধ করে দেবে ? তা হতে পারে না। আলো চাই, দিকে দিকে বিদ্যার বন্ধনমোচন হোক। এত বড় কল্যাণের চেয়ে আমার অর্গানাইজিং কমিটিতে থাকাটাই কি বড় কথা হল ? কী আমি ? কতটুকু আমার সামর্থ্য ? আমি সরে গেলে যদি সবাই দ্বিধাহীন হয়ে শিক্ষার প্রসারে এগিয়ে আসেন; তার চেয়ে আনন্দের কথা আর কী আছে ? সেই আনন্দের অংশ নিয়েই এ সভা থেকে আমি বিদায় নিলাম। Good night Sir Edward—

[বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধতা।]

হেয়ার ॥ (স্তব্ধতা ভাঙলেন) Disgraceful !

মৃত্যুঞ্জয় ॥ ছিঃ — ছিঃ —ভারী অন্যায় হল। ভারী অন্যায় হল !

ঈস্ট ॥ At last I meet a man—a real man in India !

ক্রমশ

শান্তির স্বপক্ষে

ভারতের ও বাংলার বহু বিশিষ্ট লেখক-শিল্পী-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি সংস্কৃতির সর্ববিভাগের কর্মীরা একযোগে নীচের এই বিবৃতিটি প্রচার করেছেন। যাঁরা এখনও এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর দেন নি, সেইসব শিল্পী-সাহিত্যিকদের জন্যে এটি এখানে মুদ্রিত হল। "পরিচয়"-এর লেখক-পাঠকরা এই বিবৃতিতে নিজেরা সই দিন এবং অন্যদের সই সংগ্রহ করে এই দাবির পেছনে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তুলুন।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শান্তি-চুক্তির জন্য

(১) আমরা ভারতের লেখক, শিল্পী, গায়ক, বৈজ্ঞানিক, নাট্যকার, এবং সাংবাদিকরা পাকিস্তান ও আমাদের দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি লক্ষ্য করিয়া গভীরভাবে বিচলিত বোধ করিতেছি।

(২) আমরা খুব ভালো করিয়া, জানি, কাশ্মীর-সমস্যাসহ উভয় দেশের মধ্যে যত রকমের সমস্যাই থাকুক না কেন, শান্তিপূর্ণভাবে তাহার সমাধান করা যায় এবং করিতে হইবে।

(৩) অতীতের অভিজ্ঞতার ফলে আমরা এই ভাবিয়া অত্যন্ত আশঙ্কিত হইতেছি যে, ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্কের আরো বেশী অবনতি ঘটিলে সীমান্তের উভয় অংশের জনসাধারণের উপর তাহার কী ভীষণ ফল ফলিতে পারে।

(৪) এই গুরুতর মুহূর্তে ভারত ও পাকিস্তান সরকারকে একটি শান্তিচুক্তি নিষ্পন্নের জন্য আমরা চাপ দিতে চাই।

(৫) আমরা এই অভিমত ব্যক্ত করিতে চাই যে, ভারত ও পাকিস্তানের জনসাধারণের সুখ এবং সমৃদ্ধির ভিত্তি হইল, উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বাধামুক্ত সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক যোগাযোগ এবং সৌভ্রাত্রমূলক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা।

এই সম্পর্কে আমরা দুই বাংলার ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক নিবিড় বন্ধনের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের উপর বিশেষ জোর দিতে চাই।

(৬) তাই আমরা উভয় রাষ্ট্রের সহকর্মী, লেখক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক এবং সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের আহ্বান করিতেছি, আপনারা দুই দেশের মধ্যে শান্তির আদর্শকে দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ করুন এবং সক্রিয়ভাবে তুলিয়া ধরুন। আপনাদের আমরা শান্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির অনুরোধ করিতেছি। আপনারা উভয়ে উভয়ের দেশে সাংস্কৃতিক ও শুভেচ্ছা মিশন প্রেরণ করুন। আপনারা দুই দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ ভাবে সমস্ত সমস্যা সমাধানের বিষয় আলোচনার উদ্দেশ্যে একটি সম্মেলনে মিলিত হউন।

(৭) ভারত এবং পাকিস্তান উভয়ে উভয়ের প্রতি শান্তির শপথ গ্রহণ করুক।

কেন শান্তি চাই

দেশবাসীর সামনে আজ বড় সমস্যা জেগে উঠেছে—শান্তিতে জীবন যাপনের সমস্যা যে কত বড় তা আজ আমরা প্রত্যেকেই মর্মে মর্মে অনুভব করছি। সামনের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে উঠেছে,—সেই অন্ধকার-জাল ছিঁড়ে ফেলে মানুষ আজ প্রার্থিত আলোর রাজ্যে পৌঁছাবার জন্ম ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

বহুকাল আগে প্রথম মহাযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পরেও আমরা সুযোগ পেয়েছিলাম যাতে প্রথম মহাযুদ্ধের ধাক্কা সামলে উঠতে পারি। এ কথা সত্য, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যেমন ব্যাপকভাবে স্থান নিয়েছিল, এ রকম আর কোন যুদ্ধই স্থান নিতে পারে নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এশিয়াকে এবং ভারতবর্ষকেও বিশেষভাবে জড়িয়েছিল। এই মহাযুদ্ধে কেবল যে বহু ভারতীয় যোগদান করেছিল তা নয়, ভারতবর্ষ যুদ্ধের বহু রসদ যুগিয়েছে, বহু ব্যয়ভার গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। ভারতবর্ষে বৈদেশিক সৈন্যবাহিনী বহুস্থানে ঘাঁটি করে বসেছে, তাদের অত্যাচারে আমরা আহার্য হারিয়েছি, ঘর হারিয়েছি এবং কেবল তাই নয়,—অনেক ছেলেমেয়েকে হারিয়েছি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে এসেছে দুর্ভিক্ষ এবং সেই দুর্ভিক্ষে কমপক্ষে পঁয়ত্রিশ লক্ষ লোক জীবন হারিয়েছে। কত জনপদ আজ শ্মশান হয়ে গেছে—মিলিটারীর প্রয়োজনে আমাদেরই অর্থে আমাদেরই বুকের উপর-আবার কত কেন্দ্র গড়ে উঠেছে এবং তাদের সব খরচ আমরাই যুগিয়েছি। আজ আবার

জেগেছে তৃতীয় মহাযুদ্ধের বিভীষিকা এবং এই বিভীষিকা ভয়ালভাবে ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জের আজও আমরা সামলে উঠতে পারি নি। এই কয়েকটা বৎসর আগে কত সুন্দর সুসজ্জিত ভবন দেখেছি, আজ দেখছি সেখানে বিধবা ও নাবালক ছেলেমেয়েদের,—কোন রকমে তারা জীবন যাপন করছে মাত্র। বিগত যুদ্ধে সুস্থ সবল যুবক কত যোগদান করেছিল, তাদের মধ্যে কতজনই বা ফিরতে পেরেছে। আমাদের মাঠে আজও প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয় নি যা আমাদের ক্ষুধা মেটাতে পারে। বাংলায় দুর্ভিক্ষ, মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষ, বিহারে দুর্ভিক্ষ,—চারি দিকেই আজ আমরা মৃত্যুর করাল ছায়া দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা অর্থাৎ দেশের মেয়েরা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছি তৃতীয় মহাযুদ্ধের কল্পনায়।

পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হলে ভারতকেও বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়তে হবে। সকল দেশ যোগ দিলে ভারত নিরপেক্ষ দর্শকরূপেও দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। ভারতের কাঁচা ও পাকা মাল—তার উৎপাদন আজও প্রচুর হতে পারে নি। আশা ছিল ক্রমোন্নতির দ্বারা কোন রকমে নিজেদের অভাব মিটিয়ে নিতে পারব। যুদ্ধের প্রয়োজনে তা দিতেই হবে, জন দিয়ে শুধু সাহায্য করা নয়—ভারতের বুকে বৈদেশিককে ঘাঁটি করতে দিতে হবে—এবং কয়টা বৎসর পূর্বে আমরা যেমন সব দিক দিয়ে লাঞ্ছিত নির্যাতিত হয়েছি সেই রকমই হতে হবে।

আজও অভাব অভিযোগ অশান্তি ক্রমে বেড়ে চলেছে, একটা সমস্যার সমাধান না হতে আরও পাঁচটা সমস্যা জটিল হয়ে উঠছে।

ভারতের মেয়েরা আমরা অনেক দুঃখ, অনেক নির্যাতন সয়েছি, এবং সয়েছি বলেই আর যাতে যুদ্ধ না হয়, দেশের প্রত্যেকে যেন শান্তিতে বাস করতে পারে, আমরা একান্তভাবে তাই চাচ্ছি। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সহযোগিতা আমরা সর্বান্তঃকরণে চাচ্ছি এবং শান্তি-প্রচেষ্টা যাতে কোন দিক দিয়ে ব্যাহত না হয় সেই কামনা করছি। আজ আমরা সহজে বুঝতে পারছি—তৃতীয় মহাযুদ্ধের ঘোষণা যারা করছে এবং দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যারা মনান্তর মতান্তর জাগিয়ে তুলছে—তারা কতখানি শত্রুতা করছে। আমরা বুঝতে পারছি তৃতীয় মহাযুদ্ধের ফলে তারা হবে লাভবান—কিন্তু সমগ্র মানব সমাজের কত বড় সর্বনাশ সাধিত হবে,—নিজেদের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে তারা সেদিক

দেখতে ভুলে গেছে। ভারতের শান্তি ও জনগণের স্বার্থকে বিপন্ন করে তুলছে এই শ্রেণীর স্বার্থপর কতকগুলি লোক। এদের প্রচারকার্য আমাদের মনে রীতিমত ভীতির সঞ্চার করছে,—আমরা আতঙ্কিত কণ্ঠে বলছি—সুখ না হোক, আমরা শান্তি চাই। তৃতীয় মহাযুদ্ধের কল্পনা দূর হোক, আমরা শান্তিতে কাজ করে যাব, আমাদের দীর্ঘ দিনের ক্ষতি আমরা পূরণ করে নিতে পারব।

আজ জিনিসপত্রের মূল্য অসম্ভব বেড়েছে, ঘরে ঘরে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে। তবু আমরা আশা করছি—শান্তি থাকলে আর যুদ্ধের জন্ম বিব্রত না হলে আমরা আমাদের সকল ক্ষতি সামলাতে পারব। আমরা আজ প্রত্যেক মেয়ে তাই একাগ্র চিত্তে কামনা করছি শান্তি সম্মেলনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোক,—আমাদের দেশ আমাদেরই হোক—এখানে কোন বৈদেশিক কেন্দ্র আমরা গড়তে দেব না, কোন জিনিস আমরা যুদ্ধের প্রয়োজনে দেব না।

আমরা আমাদের পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, পুত্র সব নিয়ে স্বস্তিতে শান্তিতে দিন যাপন করতে চাই।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

'চলো, বার্লিন চলো'

"বার্লিনকে আমরা শান্তির শহর করে তোলবার প্রতিজ্ঞা নিয়েছি।"—জার্মান যুব-প্রতিষ্ঠানের সভ্যরা জানান। কেন এ প্রতিজ্ঞা তারা নিয়েছে তা বোঝা যায় এক পলক বার্লিনের দিকে তাকালেই। যেদিকে তাকাও শুধু ধ্বংস-স্তূপ। আজও দেখা যায় ভাঙা বাড়ির ওপর আত্মীয়-স্বজনরা ফুল রেখে গেছে মৃত পরিজনের জন্যে—আজও যাদের মৃতদেহ ধ্বংসস্তূপের তলায় পড়ে আছে।

এই ধ্বংসের ভেতর থেকে নতুন জার্মানী তৈরি করছে জার্মানীর যুবশক্তি, জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের নেতৃত্বে। জার্মানদের সঙ্গে যতটুকু আলাপ হয়েছে সবই শহরের পূর্ব দিকে। কারণ পশ্চিমে, যেখানে মার্কিনদের রাজত্ব, সেখানে যাওয়া আমাদের অসম্ভব ছিল। সেখানে শান্তির জন্যে সই তোলে যারা, তারা জেলে যায় আর যারা গত যুদ্ধে হিটলারের সৈন্যবাহিনীতে থেকে

লক্ষ লক্ষ লোক মেরেছে তারা নতুন পদ পায় মার্কিন-পোষিত জার্মান সৈন্ত-বাহিনীতে। আমাদের পশ্চিম বার্লিনের খবর এনে দিত ওদিকের তরুণরা। তারা আসতো গোপনে, অজস্র গোয়েন্দার দৃষ্টি এড়িয়ে।

বিশ্ব-যুব-উৎসবের আর যখন মাত্র একমাস বাকি তখন একদিন শহরের আয়োজন দেখতে বেরুলাম আমরা কয়েকজন। পথে পথে, দোকানে দোকানে, ধ্বংসস্তূপের গায়ে, বাজারে, গাড়িতে—সর্বত্র দুনিয়ার তরুণদের শান্তির জন্তে মিলিত হবার আহ্বান। পথে পথে লেখা আছে লাল, কালোয়, সাদায়—"দুনিয়ার যুবশক্তি শান্তিকে জয় করবে" "চল বার্লিন চল—শান্তির উৎসবে" "পুনরস্ত্রসজ্জা বন্ধ কর" "জার্মান জার্মানদের—কোরিয়া কোরিয়ানদের" ইত্যাদি। আর এই সবের মাঝে বড় বড় হরফে লেখা "এ্যামি গো হোম" (মার্কিন ঘরে ফেরো)। একদল নীল জামা পরা "ফ্রাই ডইচ ইউগণ্ড" (স্বাধীন জার্মান যুব প্রতিষ্ঠান)-এর সভ্য আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। ওরা প্রত্যেক বাড়িতে ঢুকে ঢুকে অনুরোধ জানাচ্ছে বার্লিনবাসীর কাছে, যাতে বিশ্ব-যুব-উৎসবের সময় অন্তত একজন বিদেশী বন্ধুকে রাখার ভার নেয় এক একটি পরিবার। ২৫,০০০ বিদেশী তরুণ আসবে। তাদের থাকার আয়োজন করার ব্যবস্থা সহজ কথা নয়। তাই প্রায়ই দেখতাম গলায় নীল-রুমাল বাঁধা ছোট ছোট পাইওনিয়াররাও প্রচার করে বেড়াচ্ছে—"বিদেশী বন্ধুরা আসছে শান্তির উপহার নিয়ে, তাদের জায়গা দিতে হবে থাকবার।"

শহরের ঠিক মাঝখানে আলেকজাণ্ডার প্লাট্জ্। তারই একধারে এক বিরাট বাড়ি তুলেছে জার্মান তরুণরা—'বিশ্ব যুব প্রাসাদ'। বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব প্রতিষ্ঠানের উৎসব প্রস্তুতি কমিটির আপিস। এই প্রাসাদের ঘরে ঘরে দারুণ উদ্দীপনার মধ্যে কাজ চলছে—বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে তরুণদের বিরাট পরিকল্পনা প্রতি মুহূর্তে রূপ পাচ্ছে। চারিদিকে ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে প্রাসাদটা যেন হাত মুঠো করে দাঁড়িয়ে বলছে, 'শান্তি চাই।'

এই প্রাসাদেরই পাঁচ তলার এক ঘরে কথা হচ্ছিল জার্মান যুব প্রতিষ্ঠানের নেতা হাইন্‌ৎসের সঙ্গে। জিজ্ঞেস করলাম, "বিশ্ব-যুব-উৎসব বার্লিনে হবার তাৎপর্য কি?" উত্তরে সে ধ্বংসস্তূপের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে থেকে বললে, "ঐ লক্ষ লক্ষ মৃত মানুষ আমাদের চরম শিক্ষা দিয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখবে আমাদের দেশে বয়স্ক লোকের সংখ্যা কি ভয়ানক কম। হিটলারের

হুকুমে যুদ্ধ করতে গিয়ে আমাদের দেশ আজ প্রায় শ্মশানে পরিণত হয়েছে। আমাদের দিয়ে আবার যুদ্ধ করাতে চায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা। ওরা হিটলারের পরিণতি বড় তাড়াতাড়ি ভুলেছে। ওরা বুঝতে পারছে না আজ জার্মান মানুষের মধ্যে শান্তির আকাঙ্ক্ষা কী প্রচণ্ড। আজ আমাদের আশা আমাদের যুবশক্তি। মার্কিনদের যুদ্ধ চক্রান্ত ধায়েল করতে পারি—আমরা জার্মান তরুণরা। কিন্তু আমাদের এই কঠিন সংগ্রামে দরকার শান্তিকামী বিশ্ব যুব-শক্তির সচেষ্ট সাহায্য। আসবে হাজার হাজার বিদেশী বন্ধু উৎসবে। দেখবে যুদ্ধ কি আনতে পারে একটা দেশে। আমাদের তরুণরা মিশবে দুনিয়ার প্রাণবন্ত তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে। শিখবে তাদের দেশের খবর থেকে; বল পাবে, বুঝবে দুনিয়ার মানুষের স্বার্থ এক।" নীচে একদল নীল জামা পরা ছেলেমেয়ে ইঁট-কাঠ সরাচ্ছে আর মহা উৎসাহে গাইছে 'এ্যামি, এ্যামি গো হোম।' নতুন বাড়ি তৈরী হচ্ছে এদিকে ওদিকে—নানা এলাকায়।

মার্কিন এলাকার সীমানায় দাঁড়িয়ে যানবাহন আর লোক-চলাচল দেখছিলাম। সকালবেলা পশ্চিম বার্লিন থেকে গৃহিণীরা বাজার করতে আসে পূর্ব-বার্লিনে। এ এলাকায় খাবার শস্তা। দু' দিকের টাকা আলাদা হওয়ায় মুস্কিলে পড়তে হয় অনবরত। লোকে ধৈর্যের শেষ সীমানায় পৌঁচেছে। বড় বড় হরফে এ সীমানার পূর্ব দিকে কাঁচা অক্ষরে কারা লিখেছে—"জার্মানদের এক টেবিলে বসতে দেওয়া হোক" "জার্মানী জার্মানদের"—"শান্তি চুক্তি চাই" ইত্যাদি। পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন এক প্রফেসর। বললেন, "ভারতীয় হিসেবে তুমি নিশ্চয় সাম্রাজ্যবাদীদের দেশভাগের চরম চক্রান্তটা বোঝো। তোমাদের দেশকে যেমন ওরা ভেঙে ভোগ করছে, তেমনি আমাদের দেশেও ওদের একই ব্যবহার। একই চক্রান্তের দুটি অংশ আমরা।"

রোজা থেলমান্ (বিখ্যাত শহীদ, জার্মানীর শ্রেষ্ঠ কমিউনিস্ট নেতা আরনেস্ট থেলমানের স্ত্রী)-কে দেখলে মনে পড়ে একটা স্নিগ্ধ বটগাছের কথা। মুখে ঝড়ঝাপটার রেখা কিন্তু চোখ দুটো গভীর স্নেহে গাঢ়। কর্মরত একদল ছেলেমেয়েকে দেখিয়ে বললেন, "ঐ দেখো আমাদের নতুন যুবশক্তি। কত ত্যাগ স্বীকারের পর আজ আমরা সত্যিকারের অধিকার দিতে পেরেছি পূর্ব জার্মানীর মানুষদের। কী দারুণ উৎসাহে খাটছে এরা বিশ্ব-যুব-উৎসবের জন্যে। অথচ পশ্চিম বার্লিনে কি হচ্ছে জানো? মার্কিনরা সেখানে

আমাদের তরুণদের শেখাচ্ছে ভ্রাতৃহত্যার কলাকৌশল। যুদ্ধের সময় ফ্যাসিস্টরা যখন আমার স্বামীকে মারতে নিয়ে গেল, আমি ও আমার মেয়ে ছিলাম র‍্যাভেনস্‌বুর্গ কন্সেনট্রেশান্ ক্যাম্পে। সেখানে ৯২,০০০ মানুষ মেরেছিল হিটলার। আমাদের ওয়ার্ডের ভারপ্রাপ্ত ফ্যাসিস্টটি সময় অসময়ে ডালকুত্তা লেলিয়ে দিত আমাদের দিকে। যখন সোভিয়েট সেনা আমাদের মুক্ত করে তখন আমরা অনেকেই আধমরা হয়ে শুয়েছিলাম মরাদের ভিড়ে। দিনে এত লোক মরতো যে লাশ সরান ছেড়ে দিয়েছিল ওরা। মরা আর জীয়ন্তে ওদের কোন পার্থক্য নেই। এইসব পিশাচদের পূর্ব জার্মানীতে জন-বিচারে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জানো কি হচ্ছে পশ্চিম জার্মানীতে? এইসব জন্তুকে জেল থেকে মুক্ত করে পদস্থ কর্মচারী, পুলিস বা সেনাবাহিনীর অধিনায়ক বানান হচ্ছে। ওরা হিটলারের পরিণাম যদি ভুলে থাকে ভুলুক—কিন্তু জার্মানী আজ জাগ্রত—জার্মান যুবশক্তি আমাদের আশা—আমাদের জয় হবে—শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে"। রোজা থেলমানের উঁচু করে বাঁধা সাদা চুলের খোঁপাকে রোদ পড়ে দেখাচ্ছিল শান্তি কপোতের মত।

শহরের মাঝখান থেকে খানিক দূরে এক নিভৃত এলাকায় দূর থেকে দেখা যায় একটা বিরাট মর্মরমূর্তি। একটি তরুণ সোভিয়েট সৈন্ত খোলা তলোয়ার হাতে একটি ছোট্ট ভয়ার্ত শিশুকে রক্ষা করছে। এই মূর্তিটির চারিদিক ঘিরে যে সোভিয়েট সন্তানরা বার্লিনের বুকে হিটলার-সৈন্তের চরম পরাজয় আনতে প্রাণ দিয়েছিল, তাদের স্মৃতিস্তম্ভ।

যুদ্ধের শেষের দিকে একটি তরুণ সোভিয়েট সৈনিক অসীম সাহসের সঙ্গে লড়ে চলেছে। হঠাৎ কাছেই শোনে শিশুর আর্ত চিৎকার। মা-বাপ-হারান এক অসহায় শিশু গোলাগুলির ভয়ঙ্কর গর্জনের মধ্যে বসে কাঁদছে। ছুটে গিয়ে তরুণ সৈনিকটি বুকে তুলে নেয় শিশুটিকে। নিজের প্রাণ দিয়ে সে জার্মান শিশুটিকে বাঁচায়। যে জার্মানী হিটলারের হুকুমে ১ কোটি ৭০ লক্ষ সোভিয়েট মানুষকে খুন করায় অংশ গ্রহণ করেছিল, সেই জার্মানীর এক শিশুকে বাঁচাতে সোভিয়েট তরুণটি প্রাণ দেয়। যুদ্ধ শেষ হলে এই অনাথ শিশুটিকে মৃত তরুণটির পরিবার পোষ্য নেয়। এই তরুণটির মূর্তি আজ তাই সোভিয়েট সেনার প্রতীক হিসেবে বার্লিনের বুকে শান্তির ঝাণ্ডার মত দাঁড়িয়ে আছে।

স্মৃতিস্তম্ভের নীচে অহরহ লোক আসে।

একদল তরুণ ফুল এনেছে। সাদা আর লাল ফুলের মাঝখানে লেখা আছে—'আমাদের মুক্তিদাতার উদ্দেশে।' দলের পিছনে কালো পোষাক পরা এক বৃদ্ধা মা। করুণ চোখ মেলে চেয়ে আছেন মূর্তিটির দিকে। হয়তো যুদ্ধে গোটা পরিবারই গেছে তাঁর। জার্মানীর ঘরে ঘরে আজ অমনি করুণ শোকগ্রস্ত মায়েরা শান্তির প্রতিজ্ঞা নিচ্ছেন।

বৃদ্ধা মায়ের চোখ দুটোর ভেতর গভীর দুঃখের চিহ্ন দেখে মনে পড়ল সোভিয়েট লেখিকা ভান্দা ভাসিলেভস্কার জার্মান জাতির প্রতি বক্তৃতার কথা—"আমরা সোভিয়েট মানুষ আজ জার্মান জাতির বন্ধু, এ জন্যে নয় যে আমরা ভুলে গেছি আমাদের ভাঙা ঘর, জলেযাওয়া শহর, গ্রাম, মৃত প্রিয়জনের মুখ। আমরা জার্মান জাতির বন্ধু ও সমব্যথী কেননা আমরা হৃদয়ের সঙ্গে অনুভব করি জার্মান জাতির গভীর দুঃখ।"

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

"পরিচয়"-এ যাঁরা রচনা বা সমালোচনা পাঠাবেন, তাঁদের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন যথাসম্ভব ছদ্মনাম পরিহার করেন। স্বনামে নিজের বক্তব্যের দায়িত্ব লেখকরা নেবেন বলেই আমরা আশা করব। অনিবার্য কারণে যদি ছদ্মনাম ব্যবহার করাটা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সেক্ষেত্রে ছদ্মনাম ব্যবহারের কারণ জানিয়ে সম্পাদককে আসল নাম এবং ঠিকানা জানাতে হবে। অন্যথায় সে লেখা ছাপানো সম্ভব নয়।

পুস্তক পরিচয়

বাংলা উপন্যাসে চাষীচরিত্র

লখীন্দর দিগার ॥ গুণময় মান্না ॥ অগ্রণী বুক ক্লাব ॥ ১৩ শিবনারায়ণ দাস লেন কলিকাতা—৬ ॥ দাম চার টাকা আট আনা ॥

উপন্যাসের ঘটনাকাল ১৩৫৫ সালের ১৭ই অগ্রহায়ণ থেকে পরের বছর স্বাধীনতা দিবসের (২৬শে জানুআরি) দু-দিন পর পর্যন্ত। ইংরেজি হিসেবে ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিক থেকে ১৯৫০ সালের ২৮শে জানুআরি। উপন্যাসের পটভূমি মেদিনীপুর—বাঁকরা, হাওড়া, শ্যামগঞ্জ, ধানগাছিয়া, শীরষে, কেঁচকাপুর, আমধেড়ে ইত্যাদি গ্রামাঞ্চল।

উপন্যাসের মূল চরিত্র লখীন্দর দিগার—পাড়া-প্রতিবেশী সকলের লখীন্দ-দাদা। এই অঞ্চলের সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ ও প্রবীণ চাষী। এই চরিত্রকে কেন্দ্র করে বা এই চরিত্রের আশেপাশে ছোট বড় আরো বহু চরিত্র এসেছে—রাম, পরান, অখিল, রতন প্রভৃতি চাষী, কৃষক সমিতির নেতা গোবিন্দ ও সতীশ, শ্যামগঞ্জের জোতদার অজয় রায় ও তাঁর স্ত্রী সাবিত্রী, শীরষের জমিদার অমুতোষ সিংহ ও তাঁর মেয়ে সুলেখা, মন্দিরের পুরোহিত কৃষ্ণ ভট্টাচার্য ইত্যাদি। স্ত্রী গৌরী, দুই ছেলে সুধীর ও অধীর ও মেয়ে টুকি—এই হচ্ছে লখীন্দরের পরিবার। বাপের আমলের তিনতলা ঘর, "ওর ঘরটা সবচেয়ে উচু বলে প্রায় সমস্ত গ্রামটা দেখা যায়। এ বাড়ি তৈরি করেছে লখীন্দরের বাবা, তার সঙ্গে খেটেছে লখীন্দর।" সবচেয়ে উচু ঘরটিতে বসে সন্ধ্যের পর লখীন্দর ছোট ছেলে অধীর ও ছোট মেয়ে টুকিকে রামায়ণ পড়ে শোনায়। রাত্রিবেলা এই ঘরেই বড় ছেলে সুধীর ও লখীন্দর পাশাপাশি শোয়। খানা-তল্লাশীর সময় গ্রামের লোকেরা পুলিসের হাতে অপমানিত হয়েছে এই কথা উঠলে সুধীর বলে, "দুর দুর ওদের কথা আবার ভাবে মানুষ—নিজে ঠিক থাক বাবা, খালেই আনন্দ পাবে। বলে, নিজের লাগি শুধু বাত, খালে খাবে দুধ ভাত।" লখীন্দর জবাব দেয়, "সবাই ত আর সমান মানুষ লয় বাবা। হাতের পাঁচটা আঙুল কি সমান। তা মানুষকে ছোট মনে করতে নাই, মানুষকে নীচ

বলতে নাই, তালে মানুষ ছোট হবে নীচ হবে। মানুষের যদি তুমি ভাল না কত্তে পার, ত তাকে ঠাট্টা পরিহাস করনি। মানুষ সব ভগবান…" (পৃঃ ৪৪)। অন্যত্র লখীন্দর প্রতিবেশী ভাগচাষী মহেন্দ্রকে বলছে; "মাটিকে ভালবাসতে হয়। ই হল তমার গে বিয়া করার মতন। বউ দুটা মুখ ঝামটা দিল কি না দিল, ত তাকে তুমি ফেলে রাখবে।" (পৃঃ ৬০) বা "পুত্ত নরক থেকে উদ্ধার করে। পুত্তের মুখ দেখে সগ্‌গ সুখ হয়। সেই ছেলের জন্য তমার বুক ঢেলে দিয়ে মানুষ করতে হয়। ছেলে বেঁচে থাকলে তুমিও বেঁচে থাকলে। ছেলে ত তোমারই অংশ। আমার কুলগুরু বলেছিল, বলে, বাবা লখীন্দ, তুমি ই পৃথিবীটাকে তুমার পুত্ত মনে করবে। পুত্তের মত তাকে তমার সব দিয়ে যাবে—সব চেয়ে বেশি দিবে তমার বিদ্যা—" (পৃঃ ৬১) সুধীরকে বলতে ইচ্ছে করে লখীন্দরের, "রেষারেষি ত ছোট কাজ, উ কাজ করতে নাই। ভাল কাজ এক সঙ্গে করতে হয়। ভগমান থালে কিপা করে!" (পৃঃ ১১৫-১১৬) আর অখিলকে লখীন্দর বলে, "ছোট কাজ যদি করলে ত তমার সব সুখ নষ্ট হবে গেল। পরের উবগার যদি না করতে পার ত অনেষ্ট (অনিষ্ট) করবেনি—(পৃঃ ১১৬)।

অর্থাৎ, মানুষকে ছোট মনে করতে নেই, মানুষ সব ভগবান, পৃথিবীকে ভালবাস পুত্রের মত, মাটিকে ভালবাস স্ত্রীর মত, ছোট কাজ কোরো না, সকলে মিলেমিশে একসঙ্গে ভাল কাজ করো, পরের উপকার যদি না করতে পার তো অনিষ্ট কোরো না—এই হচ্ছে লখীন্দর চরিত্রের মূল কথা। চরিত্রের যে intrinsic goodness মানুষকে মহৎ করে তোলে লখীন্দরের মধ্যে তা পুরো মাত্রায় আছে। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যেই অবশেষে সে লড়াইয়ের মাঠে সামিল হয়। নেতাদের গরম গরম বক্তৃতা নয়, স্বার্থবোধ নয়, নেতৃত্বের মোহ নয়—মানবিক আবেদনটাই লখীন্দরের কাছে বড় কথা। সবাইকে সে আপন বলে টানে, সবার দুঃখের ভাগী হয়, শিক্ষা নেয় সবার কাছ থেকে। একটি খাঁটি চাষী চরিত্রকে সাহিত্যভাত করার এক অনবদ্য সৃষ্টির গৌরব গুণময় মান্নার, একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে হবে। বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের চরিত্রসৃষ্টি বিরল। লখীন্দর দিগারের চরিত্রের সঙ্গে কিছুটা মিল আছে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' উপন্যাসের নায়ক পাচকঠাকুরের সঙ্গে। কিন্তু 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' এ নায়কের চরিত্রের কোন পরিণতি নেই, লখীন্দর দিগার চরিত্রের সুস্পষ্ট ও বাস্তব পরিণতি আছে।

মালতী ও সুধীরের চরিত্রেও একটা বিশেষ সামাজিক সত্য পরিস্ফুট। মানুষের মন যদি ভোঁতা না হয়ে যায়, অর্থাৎ অনুভূতি-আবেগ-প্যাশন-ইমোশনের দোলা যদি তাকে নাড়া দিতে পারে, তবে সে রাজনীতির আওতায় আসুক বা না আসুক তাকে শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ে নামতে হবে। সুধীর এমনিতে আত্মকেন্দ্রিক, কিন্তু তার মনের সবচেয়ে নরম জায়গা হচ্ছে তার পিতৃস্নেহ। ধান-তোলার দিন জমিদারের গুণ্ডার লাঠির ঘায়ে লখীন্দর চোট খেয়েছে শুনে সুধীর ছুটে গিয়ে বলে, "বাবার মত লোকের গায়ে হাত দিছে, কুন শালার ঘাড়ে দুটা মাথা আছে।" (পৃঃ ১১৪) এই তীব্র আবেগ ছিল বলেই সুধীর কৃষক সভার নেতা গোবিন্দ মিত্রের সহগামী হতে পারে। আর মালতীর আবেগ আরও তীব্র, আরও একাগ্র, কিন্তু তার প্রকাশ সুধীরের মত উগ্র নয়। শুধু এক জায়গায় শুনতে পাই মালতী গোবিন্দকে বলছে "আমি খুব খারাপ মেয়ে, লয়? আমি মুখ্যু, লয়? তমার পায়ের যুগ্যি লয়।" বলে একবার হাসবার চেষ্টা করলে, তাতে ও আরো অসহায় হয়ে পড়ল। 'না হয় তুই আমার পায়ের যোগ্য নস, তাতে হল কী। সেইটে বল।' এর পর গম্ভীর হয়ে গেল মালতী। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। ও কী ভাবলে বোঝা গেল না, কিন্তু বললে, 'লোকে আমাকে খারাপ মেয়ে বলে, গোবিন্দদা আমি খারাপ লয়। তোমার পা ছুঁয়ে বলতে পারি।' গোবিন্দ এবার হো-হো করে হেসে দিল: লোকে বলল বা না বলল তাতে কী। তুই যখন খারাপ নস, তখন আরো ভাল।' এরপর আর কী বলা যেতে পারে? অতএব "মালতী গোবিন্দ চলে যাবার সময় প্রণাম করল শুধু, পায়ের ধুলো নিলে,—" (পৃঃ ২৫০) গোবিন্দর প্রতি মালতীর এই আবেগ তাকে নিয়ে গেল চরম আত্মদানের পথে, নিজের প্রাণ দিয়ে সে গোবিন্দর আন্দোলনকে সাহায্য করে গেল। রাম চরিত্রেও দেখতে পাই এই আবেগ— স্ত্রী দক্ষবালার প্রতি একনিষ্ঠ ভালবাসা। তাই দক্ষবালাকে পুলিস ধর্ষণ করেছে শোনার পরেও রাম তার "শক্ত সমর্থ ডাগর-ডোগর" বউকে দূরে ঠেলতে পারে না। এই ঘটনার অনেক দিন পরে লখীন্দর একদিন রামকে জিজ্ঞেস করে, "রাম দেখ, চারিদিকে একটা ঝড়ঝাপটা গেল। এত বড় একটা আন্দোলন হল। পুলিসে মেরে আর রাখেনি। তমার উব্রেও ত কম হয় নি। ত তবু তুমি কী করে মনে শান্তি পাচ্ছ।...', রাম জবাব দেয় "লখীন্দদাদা, তমাকে বলা হয় নি, আমি কিষক সমিতির লোক হইছি।—"

(পৃঃ ২৩৭) অর্থাৎ স্ত্রীর প্রতি রামের যে ভালোবাসা, তা মানুষের প্রতি ভালোবাসায় পরিণতি লাভ করেছে।

কিন্তু উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত জীবনের যে কটি চরিত্র উপন্যাসে এসেছে সেগুলি যেন অপেক্ষাকৃত দুর্বল। অজয় রায় ও সাবিত্রী—দুটি চরিত্রই অত্যন্ত ট্র্যাজিক কিন্তু দুই চরিত্রেরই উপযুক্ত সিচুয়েশন লেখক সৃষ্ট করতে পারেন নি। দুটি চরিত্রই যেন কিছুটা বিবৃতি হয়ে উঠেছে। অনুতোষ সিংহ ও সুলেখা, হরি মণ্ডল ও নবীন, কংগ্রেসী চাঁই দেবেন্দ্রনাথ সমাজপতি ও স্কুল-মাস্টারের বউ মিনতি প্রত্যেকটি চরিত্র সম্পর্কেই এই উক্তি কম বেশি প্রযোজ্য। মনে হয় উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের জীবনের সঙ্গে লেখক তেমন ঘনিষ্টভাবে পরিচিত নন। সুতরাং লেখককে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবেই কল্পনাশ্রয়ী লেখা স্থানে স্থানে অসংযত ও সামঞ্জস্যহীন, স্থানে স্থানে অপরিণত।

তবে কৃষক সভার নেতা গোবিন্দ মিত্রের চরিত্র অংকনে লেখক প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছেন বলা যায়। একমাত্র ত্রুটি গোবিন্দকে খুনী হিসেবে উপস্থিত করা। গোবিন্দের স্ত্রী বিয়ের আগেই কৌমার্য হারিয়েছিল এই অপরাধ ক্ষমা করা সত্ত্বেও স্ত্রীকে সে খুন করে রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে। উপন্যাসে এই ঘটনাকে যে-ভাবে সামান্য একটা ইঙ্গিত হিসেবে উপস্থিত করা হয়েছে তাতে পাঠকের কাছে গোবিন্দের দোষ স্খালন হয় না। এই ত্রুটিটুকু বাদ দিলে গোবিন্দ মিত্রের চরিত্র সত্যিকারের রাজনৈতিক নেতার চরিত্র। প্রত্যক্ষভাবে গোবিন্দ মিত্রকে আগাগোড়া উপন্যাসে খুব কমই পাওয়া যায়। শুধু কয়েকটি ইঙ্গিত ও অল্প কয়েকটি কথায় একজন রাজনৈতিক নেতার চরিত্র এমন সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলা কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়।

অপর দিকে সতীশও কৃষক সভার নেতা। লখীন্দরের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সে বলছে, "কিন্তু একথা তো তোমার বোঝার নয়। দেখ, আমরা অনেক বই পড়েছি, অনেক জ্ঞান পেয়েছি, তার থেকে বললাম কথাটা। কিন্তু হয়তো তোমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলবে না।..." (পৃঃ ২২৭)। উপন্যাসের ঘটনাকাল যা বলা হয়েছে সেই সময়ে বাংলা দেশে এই ধরনের আত্মম্ভরি নেতার অভাব ছিল না—যাঁরা কোন রকম অভিজ্ঞতার তোয়াক্কা না করে শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যাকে অবলম্বন করে বিপ্লব করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মনে হয়, সতীশের চরিত্রকে এই ধরনের উগ্র বামপন্থী নেতা হিসাবে উপস্থিত করা লেখকের উদ্দেশ্য নয় কারণ অন্য কোথাও এর পরিচয় মেলে না। সুতরাং সতীশ

চরিত্রে কিছুটা অসঙ্গতি এসেছে এবং এই জন্যেই এই চরিত্রটি পাঠকের মনে কোন দাগ কাটতে পারে না।

সতীশ চরিত্রকে যেমন উগ্র বামপন্থী নেতা হিসেবে উপস্থিত করা লেখকের উদ্দেশ্য নয়, তেমনি গোটা উপন্যাসেও এমন কোন ঘটনা স্থান পায়নি যা আজকের বিচারে উগ্র বামপন্থার পরিচায়ক। মনে রাখতে হবে যে বাংলা দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে উপন্যাসের ঘটনাকাল উগ্র বামপন্থার স্বাক্ষর বহন করছে। কিন্তু এই উগ্র বামপন্থার যুগেও বাংলা দেশের আন্দোলনে নতুন একটা চেতনা ছিল। তা হচ্ছে, শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে কৃষক আন্দোলনের একাত্মবোধ। উপন্যাসের ঘটনাকালে সব চেয়ে বড় ঘটনা ৯ই মার্চের ধর্মঘট ঘোষণা। এই ধর্মঘট ঘোষণার ফলে দেশে যে প্রচণ্ড সাড়া জেগেছিল তার ধাক্কা পৌঁছেছিল মেদিনীপুরেও। কিন্তু কৃষক আন্দোলনের এই বিশেষ দিকটি —অর্থাৎ কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের নিবিড় যোগাযোগ—উপন্যাসে একেবারেই চিত্রিত হয়নি। মনে হয় যেন মেদিনীপুরের আন্দোলন সম্পূর্ণ একক ও বিচ্ছিন্ন।

আর কৃষক আন্দোলনকে দেখানো হয়েছে দুটি বড় ঘটনার মাধ্যমে। একটি গ্রামগঞ্জের জমিদারের গুণ্ডাকে হটিয়ে দিয়ে মধু দিগারের জমির ধান মধু দিগারের খামারে তোলা। অপরটি শীরষের গবর্নমেন্টের প্রকিওরমেন্ট অফিসারকে বাধা দেওয়া। শীরষের ঘটনাকে যেন খবরের কাগজের রিপোর্টের মত মাঝখানে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় বিভিন্ন চরিত্রের উপর কি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তার অতি সামান্যই আভাস আছে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে কোন ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ যতটা না প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন চরিত্রের উপর আলোকসম্পাত। এই উক্তির দৃষ্টান্ত হিসেবে 'রোড টু ক্যালভারি' থেকে শুরু করে বহু দেশী-বিদেশী বইয়ের নামোল্লেখ করা চলে। এমন কি এই উপন্যাসেও গ্রামগঞ্জের ঘটনাকে যেভাবে উপস্থিত করা হয়েছে সেটাই এই উক্তির পক্ষে একটা দৃষ্টান্ত। অথচ শীরষের ঘটনাই উপন্যাসের প্রধান ঘটনা। এ-বিষয়ে লেখকের সচেতন হওয়া উচিত।

কতকগুলি ছোট-ছোট ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখকের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ত্রিশ পরিচ্ছেদের ধানকাটার দৃশ্যটি (পৃঃ ২৬৩—২৭১)। অনেক ঝড়ঝাপটার পর গাঁয়ের সমস্ত চাষী একসঙ্গে ধান কাটতে এসেছে, কয়েকটি ছোট-ছোট কথার ভিতর দিয়ে লেখক অপূর্ব একটি

চিত্র এঁকেছেন। সুবোধ ঘোষের যেমন একটা ক্ষমতা আছে যে বিশেষ শব্দ-বিন্যাস বা ধ্বনিব্যঞ্জনার সাহায্যে অপরূপ এক চিত্র উপস্থিত করা, গুণময় মান্না বিভিন্ন চরিত্রের ছোটখাটো কতকগুলি কথার ভিতর দিয়ে প্রায় সেই একেই সৃষ্টি করতে পারেন।

আগেই বলা হয়েছে যে উপন্যাসের পটভূমি মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চল। কিন্তু উপন্যাসে যাকে বলা হয় স্থানীয় পরিবেশ বা local colour তা শুধু একটা ভৌগোলিক সীমানাকে চিহ্নিত করে কয়েকটি গ্রামের নাম করে দিলেই হয় না। উপন্যাসের ঘটনাবিন্যাসের মধ্যে দিয়ে ও বিভিন্ন চরিত্রের জবানীতে এই পরিবেশকে বাস্তব করে তুলতে হবে। 'লখীন্দর দিগার' উপন্যাসে লেখক শুধু কতকগুলি নির্দিষ্ট জায়গার নামোল্লেখ করেছেন ও চরিত্রগুলির কথোপকথনে স্থানীয় কথ্য ভাষা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু শুধু এইটুকুতেই স্থানীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয় না। কেঁচকাপুরের মাঠ, ধানগাছিয়া, শ্যামগঞ্জ ও শীরষে—এই জায়গাগুলোর পারস্পরিক অবস্থান কি, বাকরার ফণীবাবু ও শ্যামচন্দ্রবাবু কোথা থেকে এসে কোন্ পথ দিয়ে কেঁচকাপুরের মাঠের পাশ দিয়ে বাঁকায় যাচ্ছেন ঘাটাল যাবার বাস ধরবার জন্যে সে সম্পর্কে পাঠকের কোন ধারণাই হয় না। এই প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের 'পঞ্চগ্রাম' ও 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা' উপন্যাস দুটি উল্লেখযোগ্য। দুটি উপন্যাসেই স্থানীয় পরিবেশ অত্যন্ত বাস্তব ও জীবন্ত। 'লখীন্দর দিগার' উপন্যাসের লেখক এদিক থেকে ব্যর্থ হয়েছেন।

উপন্যাসে জোরালো গল্প নেই—এটা উপন্যাসের আর একটি ত্রুটি। সাধারণ পাঠকের কাছে উপন্যাসটি যদি সমাদৃত না হয় তবে তার একমাত্র কারণ হবে গল্পাংশের অপেক্ষাকৃত দুর্বলতা। গোটা উপন্যাসে দুটি মাত্র বড় ঘটনা—শ্যামগঞ্জের ও শীরষের। তাও শীরষের ঘটনা অনেকটা রিপোর্টাজের ভঙ্গিতে এসেছে বলে পাঠকের কৌতূহল জাগ্রত করতে পারে না। শ্যামগঞ্জের ঘটনা ঘটবার আগে পর্যন্ত উপন্যাস এত ধীরগতি যে বহু পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবার সম্ভাবনা আছে।

তবুও, এই সব দোষত্রুটি সত্ত্বেও লখীন্দর দিগার বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। চাষী চরিত্র খাঁটি চাষী চরিত্র হিসেবেই চিত্রিত হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত বাংলা গল্প-উপন্যাসে বিরল। লেখক সেই দুর্লভ সাফল্য অর্জন করেছেন।

গুণময় মান্না তরুণ বয়সে প্রথম উপন্যাসেই যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন

তাতে আশা করা যায় যদি তিনি পথভ্রষ্ট না হন্ তাহলে একজন মহৎ ঔপন্যাসিক হতে পারেন। এই আশ্বাস 'লখীন্দর দিগার'-এ আছে।

অমল দাশগুপ্ত

বিদেশী কবিতার অনুবাদ

মায়াকভস্কি (কবিতা) ॥ অনুবাদ সতীন্দ্রনাথ মৈত্র ॥ কাব্যকোণ ॥
গরাদভাঙা সংগ্রামী সব জাগো ॥ পাবলো নেরুদা ॥ অনুবাদ শান্তা বসু ॥ ডাক পাবলিশার্স ॥

অনুবাদের ক্ষেত্রে আমাদের সাহিত্যের দৈন্য সর্বজনস্বীকৃত। খুব কম বাংলা অনুবাদই চোখে পড়ে যা পরীক্ষার্থীর 'বঙ্গানুবাদের' চেয়ে উঁচু পর্যায়ের। বিদেশী সাহিত্যের যা কিছু বাংলা অনুবাদ আছে, তার অধিকাংশই উপন্যাস। কারণ উপন্যাস বাজারে কাটে বেশী, আর উপন্যাস লেখা হয় গদ্যে। গদ্যানু-বাদে 'ইংরিজি' ভাষাজ্ঞানই যথেষ্ট! ইতস্তত দু' চারটে কবিতা ছাড়া কোনও বিদেশী কবির কাব্যের অনুবাদ-গ্রন্থ-প্রকাশ একেবারে বিরল ঘটনা। কবিতার সার্থক অনুবাদে কেবল ভাষাজ্ঞানই যথেষ্ট নয়; এতে প্রয়োজন পরিশ্রমের, কিছু পরিমাণে পাণ্ডিত্যের এবং সর্বোপরি প্রগাঢ় রস-বোধের। তাই সম্ভবত সহজে কেউ কাব্যানুবাদের ধার ঘেঁসতে চান না। আর এইজন্যেই সতীন্দ্র মৈত্রের 'মায়াকভস্কি' এবং শান্তা বসুর 'গরাদভাঙা সংগ্রামী সব জাগো' অনুবাদ-গ্রন্থ দুখানি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না।

মায়াকভস্কির কবি-প্রতিভা বিতর্কের উর্ধ্বে। রুশ বিপ্লবের এই মহা-কবির সঙ্গে বাঙালী রসিক মনের ভালো পরিচয়ই আছে। বাংলা সাহিত্যের অতি আধুনিক কাব্য-ধারায় তাঁর প্রেরণাও উপেক্ষণীয় নয়। সতীন্দ্রনাথ মৈত্র মায়াকভস্কির কাব্যানুবাদে প্রবৃত্ত হয়ে দুঃসাহসেরই পরিচয় দিয়েছেন।

এই অনুবাদ-গ্রন্থে মায়াকভস্কির প্রতিনিধিমূলক কবিতার অনেকগুলিই স্থান পেয়েছে। যেমন, 'আমার সোভিয়েট ছাড়পত্র', 'অভিযাত্রা', 'শিল্পী-সৈনিকদের প্রতি,' 'সজ্জিত মেঘ' ইত্যাদি। অনুবাদ হিসেবে 'আমার সোভিয়েট ছাড়পত্র' প্রায় সার্থক। কিন্তু অন্ত্যানুপ্রাসের দিকে নজর না রেখে শব্দ-ঝঙ্কারের দিকে বেশী নজর দিলে ভালো হত। মায়াকভস্কির কবিতার অন্যতম গুণ অভিনব বাক্য-বিন্যাসে এবং অসংযুক্ত অথচ ব্যঞ্জনাময়

শব্দ-নির্বাচনে। আবৃত্তির সময়ে তাঁর কবিতা যেন কৌশলী কায়দায় পা ফেলে ফেলে চলে। অনুবাদক আরও বেশী সতর্ক হলে এ গুণ সৃষ্টি করতে পারতেন; কেননা ভাষার ওপরে তাঁর দখল আছে। আর এই গুণের অভাবে 'অভিযাত্রা' ও 'গৃহাভিমুখী' একেবারে ব্যর্থ হয়েছে। পরিমিত শব্দ ব্যবহার ছাড়া অনুবাদের ক্ষেত্রে মায়াকভস্কির কবিতার ব্যর্থতা অনিবার্য। তার প্রমাণ 'সজ্জিত মেঘ' কবিতাটি। শব্দ নির্বাচনে আরো বেশী সংস্কারমুক্ত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। এই কারণে মায়াকভস্কির কাব্যের কর্কশ-সৌন্দর্য কোথাও ফুটে উঠতে পারে নি। অনুবাদকের সতর্ক হওয়া উচিত ছিল allusionএর ক্ষেত্রেও; 'Rattle-snake huge and long with at least 20 fangs poison tipped'-কে 'বিষধর কোন গোক্ষুরা সাপ' (পৃঃ ১৪) অথবা 'Giaconda'-কে 'অমূল্য-সোনা' (পৃঃ ৩৮) অনুবাদ করলে ভাব-স্মৃতির আবেদন দুর্বল হতে বাধ্য। ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও সতীন্দ্র মৈত্রের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে সাধুবাদযোগ্য।

শান্তা বসুর 'গরাদ-ভাঙা সংগ্রামী সব জাগো' পাবলো নেরুদার বিখ্যাত দীর্ঘকবিতা 'Let the Rail-splitler awake'-এর অনুবাদ। অনুবাদ হিসাবে এটি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ। শান্তা বসু কবিতাটির মর্মগত অর্থ বুঝে উঠতে পেরেছেন বলেই মনে হয় না। 'Rail-splitter'-এর বাংলা করেছেন 'গরাদ-ভাঙা সংগ্রামী' এবং তার সঙ্গে যুক্ত করেছেন বহুবচন। অথচ Rail-Splitter এখানে আব্রাহাম লিংকনের গৌরবাত্মক বিশেষণ। সোজা বাংলায় এর অর্থ 'আব্রাহাম লিংকন জাগো'। (দ্রষ্টব্য—"সোভিয়েট লিটারেচার"—১৯৫১ সংখ্যা ৪, পৃঃ ১৮৩)।

নেরুদার কবিতার ভাবানুবাদও একে বলা যেতে পারে না; কারণ বহু ক্ষেত্রেই ভাবের সঙ্গে অনুবাদের মিলই নেই। নেরুদার কাব্যের সৌন্দর্যও অনুবাদের কোথাও মেলে না। যেমন,

> "hurricanes trembling like music,
> rivers in prayer like monasteries,
> wild geese and apples, land and water,
> infinite stillness wherein the wheat is born".

এর অনুবাদ করা হয়েছে:

'…শিলাখণ্ডে তরংগ বন্ধুর নির্ঝরিণী
নিবিড় স্তব্ধতা নামে, সংগীতের মতো
তারি মাঝে নতুন অংকুর জন্ম নেয়।' (পৃঃ ৭)

একে কোন্ ধরনের অনুবাদ বলব ?

অধিকাংশ ক্ষেত্রে, syntaxতো দূরের কথা, punctuationও ধরে উঠতে পারেন নি। অথচ নেরুদার এই কবিতাটি syntaxএর দিক থেকে আশ্চর্যভাবে সরল। উচ্চারণ ও প্রতিশব্দ নিয়েও গোলমাল আছে। 'Abe'-র উচ্চারণ কখনোই 'আবে' (পৃঃ ২৯) নয়, 'Rochester'ও 'রোস্টার' (পৃঃ ২৮) নয়; 'Pine-grove' থেকে ঝাউ-বীথি (পৃঃ ৭) স্বতন্ত্র, 'oat-field-কে 'যব-ক্ষেত (পৃঃ ৯) বলা অনুচিত। 'Like the Venezuleans'-এর অনুবাদ করা হয়েছে: 'ঠিক ভেনেজুলাদের মতই' (পৃঃ ২৫)। এবং সর্বোপরি—

" Bananas must be defended there, not liberties
and Somoza will suffice for this"-এর অনুবাদ;

'বানানারাই সেখানে সমর্থিত হবে, লিবার্টিরা নয়।
সোমোজার পক্ষে তাই হবে যথেষ্ট।' (পৃঃ ১৫)।

এই ধরনের ত্রুটি ভাষা-জ্ঞানের মারাত্মক অভাবের ফলেই ঘটেছে। আর অনুবাদের ক্ষেত্রে এহেন ত্রুটি একেবারে অমার্জনীয়।

অবন্তী সান্যাল

এজেন্টদের প্রতি

নানা প্রতিকূলতায় শ্রাবণ সংখ্যার 'পরিচয়' প্রকাশে খুবই বেশী দেরি হয়ে গেল। কিন্তু ভাদ্র সংখ্যা আমরা নিশ্চিতভাবে দু' সপ্তাহের মধ্যে বার করব; কারণ তা না হলে শারদীয় সংখ্যা মহালয়ের আগে প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। এজেন্টরা যেন এই সময়-তালিকার দিকে লক্ষ্য রাখেন। শারদীয় সংখ্যার অর্ডার ১লা সেপ্টেম্বরের মধ্যে পাঠানো দরকার।

পরিচয় কার্যাধ্যক্ষ
২০শে অগস্ট, ১৯৫১

বই কেনার দণ্ড

ভারত-সরকারের অর্থসচিব সম্প্রতি পার্লামেন্টে একটি বিল উপস্থিত করেছেন যার বিষয়বস্তু হচ্ছে কতকগুলি নিত্যব্যবহার্য অত্যাবশ্যক জিনিসের ওপর থেকে বিক্রয়-কর বা সেল্‌স্‌-ট্যাক্স প্রত্যাহার করা। সরকারী পরিভাষায় যাকে "essential goods" বলা হয়, প্রস্তাবিত বিক্রয়-কর-ভার-মুক্ত সেই সব অত্যাবশ্যক জিনিসের একটি তালিকাও তিনি এই বিলের সঙ্গে পেশ করেছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, বই, পত্র-পত্রিকা, কাগজ ও সাময়িক-সাহিত্য ইত্যাদি এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত নয়।

নির্বিচারে সমস্ত জিনিসের ওপর বিক্রয় কর বসানোটাই একটা কিম্ভুত ব্যাপার। কিন্তু পৃথিবীর আরও কয়েকটি দেশে এই "একুশে আইন" সময়-বিশেষে চালু থাকলেও, স্বাধীন ভারতীয় ইউনিয়নে ছাড়া পৃথিবীর আর কোন দেশেই বই-কাগজ-সাময়িকপত্রের ওপর বিক্রয়-কর নেই। পাকিস্তানে তো নেই-ই, এমন কি, ভারতীয় ইউনিয়নেরও কয়েকটি রাজ্যে—যেমন, আসাম ও উত্তর প্রদেশে—পুস্তক-পুস্তিকা কেনার ট্যাক্স দিতে হয় না। অবশ্য ধর্মপুস্তক-ক্রেতাদের এই ট্যাক্স থেকে মুক্তি দিয়ে ভারত-সরকার নিঃসন্দেহে মস্তবড়ো উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। ধর্মপ্রাণ আর অহিংস চোরাকারবারী-শাসিত এই দেশে যদি কোন দুঃসাহসী বিজ্ঞানের বই পড়তে ইচ্ছা করেন, তাহলে তাঁকে তো সে-বই কেনার দণ্ড দিতেই হবে!

বই-কাগজ-পত্রপত্রিকার ওপর যে কিছুতেই বিক্রয়-কর ধার্য করা উচিত নয়—সে সম্বন্ধে যুক্তিবিস্তারের প্রয়োজন নিশ্চয়ই নেই। বই-কাগজের ওপর বিক্রয়-করের এই বাড়তি বোঝার ভারবাহী কারা? অগণ্য দরিদ্র সাধারণ আর নিম্নবিত্ত অভিভাবক—যাঁদের প্রত্যেককে প্রাণান্ত প্রয়াসে ছেলেমেয়েদের ইস্কুলের মাইনে আর পাঠ্য বই যোগাতে হয়; ইউনিভার্সিটি-পরিচালিত ছাত্রমেধ যজ্ঞের বলি কলেজ-শিক্ষার্থী যাঁরা পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত দামী দামী বিদেশী বই কিনে পড়েও বাইশ-পার্সেন্ট পাশের হাড়িকাঠে গলা আটকিয়ে

রুদ্ধশ্বাস ; আর, মুষ্টিমেয় পাঠক, প্রায়-নিরন্ন লেখক-শিল্পী-অধ্যাপক-সাংবাদিক সংস্কৃতিকর্মী বুদ্ধিজীবী যাঁরা এ দুর্ভাগা দেশে সংস্কৃতির ক্ষীণ শিখাটিকে প্রাণপণে জ্বালিয়ে রেখেছেন।

শিক্ষা-সংস্কৃতি-জ্ঞানবিস্তারের স্বার্থেই বই ইত্যাদির ওপর বিক্রয়-কর প্রত্যাহৃত হোক—এই আমাদের সমবেত দাবি।

নীতিরক্ষক আরক্ষ

বেশ কিছুদিন থেকে আমাদের সাময়িক-সাহিত্যে অশ্লীল আদিরসাত্মক পত্র-পত্রিকার যে বহুল প্রকাশ ও প্রচার দেখা দিয়েছে, সম্প্রতি সে সম্বন্ধে পশ্চিম-বাংলা সরকারের পুলিস-বিভাগ তৎপর হয়ে উঠেছেন। এ ধরনের ব্যাপারে —বিশেষত সাহিত্যে নীতিরক্ষার ব্যাপারে—আরক্ষ-বাহিনীর এই তৎপরতায় দেশের সাহিত্যিক আর সাহিত্যদরদীরা যে খুব একটা উৎসাহ বোধ করছেন না, তার প্রমাণ বাংলার বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিকের স্বাক্ষরযুক্ত একটি বিবৃতি। সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির ব্যাপারে পুলিসের রসজ্ঞান যে কত গভীর সে সম্বন্ধে এতদিনে দেশের লোক একেবারেই সন্দেহমুক্ত হতে পেরেছেন। আর, ব্রিটিশ-আমল থেকে আজ পর্যন্ত যে-পুলিসের ন্যায়-নীতি-পরায়ণতা দেশের লোকের কাছে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছে, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেই পরম নীতিবাগীশ পুলিসের হাত প্রসারিত হতে দেখে দেশের লোক যুক্তিসঙ্গত ভাবেই মনে করতে পারেন যে এই রামরাজত্বে জীবনের কোন বিভাগই আর পুলিসের আধিপত্য-মুক্ত থাকতে পারবে না।

কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল আর দুর্নীতিমূলক সাহিত্য যে সত্যিই ভয়ানক রকম হচ্ছে এবং এ জিনিস যে সমাজের মনে সাংঘাতিক বিষপ্রভাব বিস্তার করছে—তাতে কোন সন্দেহ নেই। কুৎসিত আর নোংরা ছবি আর রচনায় ভরা এক ধরনের সাময়িক পত্রিকা বহু বুক-স্টলে গিয়ে দাঁড়ালেই অজস্র চোখে পড়বে। সিনেমা-অভিনেত্রীদের ইঙ্গিতবহুল ছবি আর তাদের ব্যক্তিগত জীবনের মনগড়া সব চাঞ্চল্যকর খবরে ভরা ফিল্ম্-পত্রিকা ; রস-সাহিত্যের নামে ইতর মশ্‌করা আর হ্যাব্‌লামিতে ভরা বেশ কয়েকটি মাসিক আর সাপ্তাহিক, আর যৌনজ্ঞান বিতরণের নামে মানুষের একটি স্বাভাবিক আর আদিম বৃত্তিকে অস্বাভাবিক আর কৃত্রিম উপায়ে উত্তেজিত করে তুলে সেটাকে ক্রমশ বিকৃতির দিকে নিয়ে গিয়ে সেই বিকৃতিকেই আবার চরিতার্থ করে পয়সা লুটছে—এমন

কতকগুলি তথাকথিত যৌন-বিজ্ঞান-পত্রিকা।—এই শেষের ধরনের কাগজ-গুলিই সবচেয়ে মারাত্মক, কারণ এগুলির কোন-কোনটিতে সত্যিই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা দু-একটি প্রবন্ধ কচিৎ কখনও বেরিয়ে থাকে এবং সেটাকেই তারা আত্মপক্ষ সমর্থনের একটা বড়ো রকম যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করে।

বলা বাহুল্য, যৌন সমস্যার নানা দিক নিয়ে যথার্থ বৈজ্ঞানিক বিচার হওয়া নিশ্চয়ই দরকার। যৌন-সংক্রান্ত দায়িত্বশীল আর সুস্থ বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ লেখার লোকও অনেকেই আছেন, তাঁদের লেখা দু-চারটি ভাল বইও প্রকাশিত হয়েছে। এসব বইকে সত্যিকার যৌন-জিজ্ঞাসুদের কাছে যেমন পরিচিত করে দেওয়া দরকার, তেমনি বিজ্ঞানের নামে যারা অশ্লীলতার বেসাতি চালায় তাদের সমাজবিরোধী অপপ্রয়াসকে অবিলম্বে রোধ করা দরকার।

এবং এখানেই এই পুলিসী প্রয়াস সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে। মাথা ধরার দাওয়াই হিসেবে মাথাকে কেটে ফেলাই প্রকৃষ্ট উপায় হিসেবে বাংলানো যাঁদের চিরাচরিত রীতি, বিজ্ঞান-সাহিত্যে নীতিবিচারের এই নতুনপাওয়া অধিকার খাটানোর উৎসাহের আধিক্যে তাঁরা যে কী কাণ্ড করে বসবেন কে জানে! কোন-একটা অন্যায়কে বন্ধ করতে গিয়ে নির্বিচারে দোষী-নির্দোষ সকলের ওপর দমননীতি চালানোর উদাহরণ এ দেশের পুলিসী ইতিহাসে বিরল নয়। বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ বা সাহিত্যে শিশ্নতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে সমস্ত রকম বৈজ্ঞানিক আলোচনার কণ্ঠরোধ করা বা গল্পে-উপন্যাসে সমাজের বাস্তব ছবি ফুটিয়ে তুললেই অশ্লীলতার অভিযোগে তার ওপর স্টীম-রোলার চালাবার চেষ্টা হতে পারে। এ রকম দুর্লক্ষণের আভাস দেখা দিয়েছে বলেই সাহিত্যিকরা মিলিতভাবে ওই বিবৃতিটি প্রচার করেছেন। সাহিত্যিক বিচারবুদ্ধি এবং যথার্থ রসবোধ যাঁদের নেই তাঁদের পক্ষে কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' আর দামোদর গুপ্তের 'কুট্টনীমত'কে এক পর্যায়ে ফেলে কিংবা রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' আর 'কেন এ পথে এলাম'-জাতীয় বইকে একই শ্রেণীভুক্ত করে সব কিছুকেই অশ্লীল বলে চিহ্নিত করাটা বিচিত্র নয়!

তাছাড়া, এ ব্যাপারে পুলিসের বা সরকারী কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতায় সন্দেহের অবকাশ আছে। চৌরঙ্গীর ফুটপাথে আজও কুৎসিত আর অশ্লীল ছবিতে ভরা অজস্র মার্কিন পত্রিকা অবাধে বিক্রি হচ্ছে, সেদিকে তাঁদের নজর নেই কেন? এই সেদিনও পুলিসের জেদের ফলেই 'ভুলি নাই' বা '৪২'-এর

মত চলচ্চিত্র সেন্সরে আটক থেকেছে, অথচ 'জিপ্‌সী মেয়ে' বা 'অপবাদ'-এর মত ছবির প্রদর্শনী সাড়ম্বরেই হয়েছে, হিন্দী আর মার্কিন ফিল্ম্‌-এর তো কথাই নেই! আমাদের এই অতি অল্পসংখ্যক লেখাপড়া-জানা লোকের দেশে বইয়ের চেয়ে সিনেমার আবেদন যে কত সর্বাঙ্গীন তা কি পুলিস-বিভাগ জানেন না? সরকারী কর্তৃপক্ষ যদি সত্যিই অশ্লীলতার বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে চান, তাহলে বই-পত্রিকার তালিকায় সিনেমাকেও—বিশেষত হিন্দী আর মার্কিন সিনেমাকে—অন্তর্ভুক্ত করুন।

এবং সর্বোপরি, এই দুর্নীতি-বিচারের ভার তাঁরা এমন একটি বেসরকারী কমিটির ওপর অর্পণ করুন যাতে থাকবেন দেশের লোকের শ্রদ্ধাভাজন সাহিত্যিক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীরা। এঁদের সুচিন্তিত মতামত নেবার পর যদি পুলিস শাস্তিমূলক-ব্যবস্থায় অগ্রসর হন, তাহলে দেশের প্রত্যেকটি সৎ ও সুস্থ রুচিসম্পন্ন লোকই পুলিসের এই কাজকে সমর্থন করবেন।

রবীন্দ্র মজুমদার

পাঠকগোষ্ঠী

'পরিচয়'-পাঠকদের কাছ থেকে নানা বিষয়ে চিঠিপত্র পাওয়া যাচ্ছে—এটা 'পরিচয়'-এর পক্ষে খুব উৎসাহজনক। পাঠকদের সঙ্গে আমাদের লেখকদের যোগাযোগ যাতে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে তার জন্যে এই পাঠকগোষ্ঠী বিভাগটিকে আমরা সুপরিকল্পিত ও নিয়মিত ভাবে চালাতে চাই। কিন্তু পাঠকদের কাছে বিশেষ অনুরোধ—'পরিচয়'-এর সংকীর্ণ পরিসরের কথা মনে রেখে তাঁরা যেন তাঁদের বক্তব্য যথাসম্ভব সংক্ষেপে লিখে পাঠান। খুব বড়ো চিঠি হলে সেটা সংক্ষিপ্ত করে ছাপবার অধিকার সম্পাদকের থাকবে। বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে পত্র-লেখকের মতামতকে যথাসাধ্য অক্ষুণ্ণ রাখা হবে কিন্তু সেই মতামতের জন্যে সম্পাদক দায়ী থাকবেন না।

'পরদেশী দুল্‌হন্‌'-এর সমালোচনা

'পরদেশী দুল্‌হন্‌' ছবি দেখেছি। দেখে খুশি হয়ে 'পরিচয়ে'র সমালোচনা পড়তে গিয়ে বিস্মিত হয়েই এই পত্র লিখছি। সমালোচকের সিনেমা-শিল্প সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য স্বীকার করেই বলছি, এরূপ সমালোচনা 'পরিচয়ে'র পাতায় না বেরুলেই ভাল হত।

মন দিয়ে পড়েও 'পরদেশী দুলহন্' ছবিটির কোন প্রশংসা বা বিরূপ সমালোচনা প্রায় পেলাম না ; যা পেলাম তা হচ্ছে 'সাধারণ সোভিয়েট সিনেমার স্টাণ্ডার্ড' অপেক্ষা নিম্ন স্তরের একখানা ছবির জন্য সোভিয়েট সিনেমার উৎকর্ষ সম্বন্ধে যেন কেউ কিছু মনে না করেন—তার জন্য নানা যুক্তি-তর্কের অবতারণা।

পড়ে মনে হল, সমালোচক বলতে চান—সোভিয়েটে সিনেমার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক নিয়ে যে-এক্সপেরিমেণ্ট চলছে, তার ফলে এই নিকৃষ্ট ছবির উৎপত্তি। তুর্কমেনিয়ার সাংস্কৃতিক স্তর মস্কো-লেনিনগ্রাদের চেয়ে নিম্ন স্তরের, সুতরাং এই ছবিটিও সেই স্তরোপযোগী বলে নিম্ন স্তরের ; মস্কো-লেনিনগ্রাদে তৈরি ছবি হলে এত নিকৃষ্ট হত না। ভাল সোভিয়েট ছবি সেন্সর পাস করে না—নিম্ন স্তরের ছবি, এবং 'বিপদের আশঙ্কা' আছে এমন ছবি বলেই সেন্সরে পাস করা হয়েছে। এদেশবাসীর সাংস্কৃতিক চাহিদা মেটাবার মত ছবি নয় বলে এদেশে এ-ছবি দেখানো উচিত হয়নি ; ইত্যাদি।

সমালোচক যে-সব তত্ত্বের কথা উল্লেখ করেছেন এবং যে-পটভূমিকায় তাদের তুলেছেন তার অসারতা প্রমাণ করতে গেলে প্রবন্ধের দরকার। সমালোচক ছবির সমালোচনায় ছবির কথা বাদ দিয়ে তত্ত্ব-ও-তথ্যগত আলোচনা না করে ছবির তাৎপর্যটি যদি সিনেমা-রসিকদের কাছে ছবিটির মত সরল সহজ ভাবে তুলে ধরতেন, এবং সেই পটভূমিকায় দোষত্রুটিগুলি উল্লেখ করতেন, তাহলে 'পরদেশী দুল হন্'-কে সোভিয়েটের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলির একটি বলে ধরা যেত না ঠিকই, কিন্তু সাধারণভাবে সোভিয়েট সিনেমার স্টাণ্ডার্ড অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছবি বলে মনে হত না —মনে হত রীতিমত ভাল একখানা ছবি বলে।

জনপ্রিয়তার হিসাবে কলকাতায় এই ছবি মধ্যম ধরনের বলা চলে। সোভিয়েটের অনেক জগদ্বিখ্যাত ছবিও (যথা, 'স্টর্ম ওভার এসিয়া', 'ব্যাটল্-শিপ পটেমকিন', 'আইভান দি টেরিবল্' প্রভৃতি) বর্তমান অবস্থায় এতটা জনপ্রিয়তা পাবে না। তার কারণ, ঐ-সব ছবির সঙ্গে সংযুক্ত ঘটনাবলী এ দেশে এখনও ব্যাপকভাবে অজ্ঞাত এবং ঐ সব ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধি করার মত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা এখানে ব্যাপকভাবে নেই। 'পরদেশী দুলহন্'-এর মধ্যে রূপায়িত সাংস্কৃতিক পটভূমিকা ও রূপও আজ এ দেশের সাধারণের কাছে অজ্ঞাত না হলেও বাস্তবভাবে ধারণাতীত।

যুদ্ধফেরত দুই বন্ধু। পরস্পরের জীবন বাঁচানোর মধ্যে তাদের বন্ধুত্ব-বন্ধন।

সাধারণ দুজন দেশপ্রেমিক লাল ফৌজের যোদ্ধা, তুর্কমেনিয়ার যৌথ খামারে ফিরে এল। ছোট্ট একটা স্বাভাবিক ভুল বোঝার ঘটনা কাহিনী আকারে রূপায়িত হয়েছে ছবিতে, আর সেই পটভূমিকায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তুর্কমেনিয়ার যুদ্ধোত্তর জীবনের জয়যাত্রা—পাশাপাশি দুই যৌথ খামারের সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা : কার্পাসের খেতে, টম্যাটোর বাগানে ; লাল ফৌজের যোদ্ধাদের সামাজিক সম্মান ; যুদ্ধোত্তর শান্তিময় জীবনে আনন্দ-উচ্ছল কর্মজীবন, যৌথ খামারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সর্বপ্রকার কাজ ও কর্মীর পরিচয় ; যুদ্ধের ফলে মাতৃহীন সন্তানদের দায়িত্ব গ্রহণ ; লোকসংস্কৃতির পটভূমিকায় তুর্কমেনিয়ার আনন্দোৎসব। এ সবের তাৎপর্য যদি সমালোচক তুলে ধরতেন তবে দেখা যেত এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে এই রকম ছবিকে জনপ্রিয় করে তোলার দায়িত্ব রয়েছে।

সমালোচক সোভিয়েট সিনেমার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। সমালোচক তুর্কমেনিয়ার বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের কথা নিজেও জানেন, এবং বলেছেনও। এই ছবি সেখানে জনপ্রিয়। একটা নিকৃষ্ট ছবি তার নিজের দেশেও জনপ্রিয় হতে পারে না, বিশেষত সোভিয়েট নাগরিকদের দেশে।

আঙ্গিকের মারপ্যাঁচ, গল্পের স্টার্ট প্রভৃতির চমৎকারিত্বে মার্কিনী ও মার্কিন-মার্কা এ দেশী ছবি এ দেশে বহুল প্রচারের দ্বারা সিনেমা-দর্শকদের মধ্যে কম বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে নি। এই বিভ্রান্তি অতিক্রম করে সোভিয়েট সিনেমার সহজ সরল বক্তব্য, জনকল্যাণকর রূপ—এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলা এক প্রচণ্ড সাংস্কৃতিক সংগ্রাম। বিরুদ্ধবাদীরা তাই অনেক শ্রেষ্ঠ ছবিকে প্রমাণ করতে চাইবে প্রপাগাণ্ডা বলে, অনেক সরল গণজীবন-রূপায়ক ছবিকে বলবে নিম্নশ্রেণীর। সোভিয়েট, চীন ও নয়া গণতন্ত্রের দেশগুলির ছবিগুলি তাই তাৎপর্যসহ তুলে ধরতে হবে এ দেশের দর্শকদের কাছে—এবং এই সফলতা লাভে বেশ কিছুদিন সময় লাগবে। আশা করি, 'পরিচয়ে'র সিনেমা-সমালোচনা এই মূল দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখে পরিচালিত হবে।

Manoranjan Baral.
মনোরঞ্জন বড়াল

কলকাতা
Calcutta

লেখকের জবাব

পরদেশী ফুল্‌হন্‌ ছবি ও পরিচয়ের লেখা নিয়ে কয়েকটি মহলে বেশ খানিকটা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। মতানৈক্য ঘটেছে সত্যি, কিন্তু সমস্ত শিল্প-বিচারের ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে এখানেও ঠিক তেমনি যথেষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনার ভিতর দিয়ে মোটামুটি একটা বোঝাবুঝির পর্যায়ে এসে পৌঁছনো নিশ্চয়ই সম্ভব। সেদিক থেকে আমার বক্তব্য নিয়ে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে তাকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে আমার বিচারবুদ্ধি দিয়ে বোঝার এবং আমার যুক্তিগুলো অপরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি। কিন্তু মনোরঞ্জন বাবু আমার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ পরিচয়ের পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন তার অধিকাংশই ভিত্তিহীন। আমি যা বলতে চেয়েছি বলে তিনি মনে করেন তা কিন্তু আমি মোটেই বলি নি, অথবা আমার লেখা থেঁকে এই ধরনের ভুল বোঝারও কোন কারণ রয়েছে বলে আমি মনে করি না। আমি আশা করি যে আমি কী বলতে চেয়েছি তা মনোরঞ্জন বাবুর প্রতিবাদের মধ্যে না খুঁজে পরিচয়ের পাঠক সময় পেলে মূল লেখাটিই আবার পড়বেন।

সোবিয়েতের কয়েকটি জগৎবিখ্যাত ছবির জনপ্রিয়তা সম্পর্কে মনোরঞ্জন বাবু যা বলেছেন তার সঙ্গে একেবারেই একমত হতে পারছি না। তাছাড়া শিল্পের জনপ্রিয়তা একটা বিরাট কথা—এক বিরাট শিল্প-সমস্যা। এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পর্কে এক লাইনের এক রায় দিয়ে মনোরঞ্জন বাবু দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেন নি। সোবিয়েতের মত উন্নত সমাজতান্ত্রিক দেশের কোন এক বিশেষ শিল্প-সৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে তত্ত্বগত ও তথ্যগত আলোচনা মোটামুটিভাবে এসে পড়লে তাকে আমি অপরাধ মনে করতে পারি না।

সোশ্যালিস্ট রিয়লিজম্‌কে যাঁরা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য শিল্পনীতি বলে মেনে নিয়েছেন তাঁদের কাছে আঙ্গিক যে কত বড় সম্পদ তা ভুললে চলবে না। শিল্পে চমৎকারিত্ব খুবই বড় কথা। আঙ্গিকের গুরুত্ব উপলব্ধি করা আর আঙ্গিকের মারপ্যাঁচ কষা যে এক কথা নয় সেটা আমাদের পরিষ্কার জানতে হবে। ফর্মএর উপর দখল রাখা ও ফর্মালিজম্‌-এর কসরত করা—দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত। আঙ্গিকের সামান্যতম উল্লেখেই আশঙ্কিত হওয়া বা মার্কিনী স্টান্টের ধুয়া তুলে বিষয়টাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টার মধ্যে প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না।

সিনেমার দর্শক হিসেবে এবং সিনেমার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকার দরুন সুস্থ, সবল, সমাজসচেতন ছবি আমি ভালোবাসি, এবং সেই কারণেই সোবিয়েৎ সিনেমাকে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখি। সোবিয়েৎ সিনেমার প্রতি জ্ঞানে বা অজ্ঞান্তে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করব এমন ধৃষ্টতা বা সততার অভাব আমার এখনও পর্যন্ত হয় নি।

মৃণাল সেন
কলকাতা

যুব-সংগীত

(বিশ্ব-যুব-সংঘের সংগীতের অনুসরণে)

কথা—অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বরলিপি—সুরপতি নন্দী

লক্ষ যোজন দূরে জন্মভূমি
তবু লক্ষ্যের ঐক্য মহান্
শত্রুর চক্রান্তের জাল ভেদি'
গড়ি শান্তির স্বর্ণ-সোপান।
দুনিয়ার যতো দেশ জাগে
যৌবনরঞ্জিত রাগে
যুবধর্মউচ্ছল ঘোষণায় কলরোল
"সখ্যের সাম্যের জয়"॥

সমবেত : দুনিয়ার নওজোয়ান গাহি আজ মুক্তিগান একপ্রাণ
মোরা প্রাণসম্পদে চিরদিন অফুরান বলীয়ান
সবুজ ও নবীন
চিরনবীন সত্যের তাই গাহি গান॥

গম্ভীর মন্দ্রেতে কণ্ঠ বাজে
লক্ষ্যের অবিচল ঘোষণায়
বুকভরা গর্বেই পতাকায় হাতে নিই
মানবতা পথ যে চিনায়।
শান্তির দুশমন আজ যে
যুদ্ধের নয়া জাল পাতছে
মিথ্যার-কুৎসার-মৃত্যুর সেই জাল
দীর্ণ এ প্রাণবন্যায়॥

সমবেত : দুনিয়ার নওজোয়ান গাহি আজ মুক্তিগান একপ্রাণ
মোরা প্রাণসম্পদে চিরদিন অফুরান বলীয়ান
সবুজ ও নবীন
চিরনবীন সত্যের তাই গাহি গান॥

-া -া -া পা I র্সা -া র্সা -া । -া -র্সা পা র্সা I
০ ০ ০ ন্ স ০ বু ০ ০ ধ্ ও ন

র্সা -া -া -া । -া -র্সা র্রা পা I র্জা -া র্রা -র্রা ।
বী ০ ০ ০ ০ ন্ চি র ন ০ বী ন্

র্সা -া পা পা I ধা -ধা পা পা । মা -মা (রা জ্ঞা) }
স ০ ত্যে র তা ই গা হি গা ন হু নি

-া -া II
০ ০

পরবর্তী চরণের সুর পূর্বের স্থায় 'লক্ষ যোজন দূরে জন্মভূমি'র সুরের অনুরূপ।

পাঠকদের প্রতি

ললিত হাজরা, ইঅসোম বর্মা প্রভৃতি অনেকের চিঠি এ-সংখ্যায় 'পাঠকগোষ্ঠী'তে প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু স্থানাভাবে সেগুলি এ-বারে ছাপা গেল না। ভাদ্র সংখ্যায় ছাপা হবে। —সম্পাদক

পাকিস্তানের বন্দী সাহিত্যিকদের মুক্তির দাবিতে

পাকিস্তানের লেখক ও সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার করায় আমরা পশ্চিমবঙ্গের প্রগতিশীল বাঙালী, উর্দু এবং হিন্দী লেখক ও শিল্পীরা, তার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানাচ্ছি। পাকিস্তান সরকারের কাছে আমাদের দাবি: স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের নামে এঁদের বিনাশর্তে মুক্তি দেওয়া হোক।

ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্রের নামে পাকিস্তান সরকারের কাছে আমাদের আরও দাবি এই যে, সজ্জাদ জহীর ও ফয়েজ্ আহ্‌মদ ফয়েজের মত প্রগতিশীল লেখক ও সাংবাদিকদের প্রকাশ্য বিচারের জন্যে আদালতে উপস্থিত করা হোক এবং তাঁদের আইনগতভাবে আত্মপক্ষসমর্থনের পূর্ণ সুযোগসুবিধা দেওয়া হোক।

বিশেষভাবে পাকিস্তানের সমস্ত লেখক, শিল্পী ও সাংবাদিকের কাছে আমাদের আবেদন: অবিলম্বে সমস্ত বন্দী লেখক ও সাংবাদিকদের বিনাশর্তে মুক্তির দাবিতে পাকিস্তানে একটি শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলুন এবং পাকিস্তান সরকারের কাছে আত্মপক্ষসমর্থনের পূর্ণ সুযোগ-সুবিধাসহ সজ্জাদ জহীর, সিব্‌তে হাসান, ফয়েজ আহ্‌মদ ফয়েজ ও অন্যান্যদের প্রকাশ্য বিচারের জন্যে উপস্থিত করার দাবি তুলুন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, সুশীল জানা, ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, নরহরি কবিরাজ, কুমারেশ বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মদনাচরণ চট্টোপাধ্যায়, পরভেজ শহীদী, রইস আহ্‌মেদ, গোলাম কুদ্দুস, নজেফ হোসেনী, মহম্মদ আফিরউদ্দীন আনসারী, শাহ সুলতান, মুজহারুল হক, মুস্তাক আলম, শ্রীনারায়ণ ঝা, ননী ভৌমিক, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস, সলিল চৌধুরী, ক্ষিতীশ বসু, অজিত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ৭৩ জন শিল্পী ও সাহিত্যিক এ যাবৎ এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন।

একবিংশ বর্ষ
প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা
ভাদ্র, ১৩৫৮

অতিকথার কথা

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কেতু কলকাতায় গিয়ে 'বরখ' খেয়েছিল। বরখ, অর্থাৎ বরফ, সাহেবদের জল—খেলে জাত যায়, তাই কঙ্কাবতীর সঙ্গে বিয়ে বন্ধ। অতএব, পুত্র-পৌত্র-দৌহিত্র-পরিবৃত বৃদ্ধ জমিদার জনার্দন চৌধুরীর সঙ্গে কঙ্কাবতীর বিয়ে, কাঁদতে কাঁদতে রোগে পড়ে কঙ্কাবতী।

কঙ্কাবতীর কথা অনেকদিন আগেকার কথা। তবু, কঙ্কাবতীর কথা আজও বাংলার ঘরে ঘরে, বাঙালীর মুখে মুখে, আজও। আর আজও বাঙালীর মনে মনে ওই জাত আর জাত-খোয়াবার ভয়। খুব শহরে আর খুব লেখাপড়া জানা লোকের মনে হয়ত কিছুটা কম, কিন্তু সে-রকম লোক কতই বা? বেশীর ভাগের বেলায় কঙ্কাবতীর সময়েও যা আজও মোটের ওপর তাই।

অথচ, বরফ খেলে মানবদের কোন মহিমাই ক্ষুণ্ণ হয় না। গরমের সময় মনমেজাজ একটু ঠাণ্ডা হয়, এই বা। তার দরুন, একটি কচি মেয়ে এক ঘাটের মড়ার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে বাধ্য হবে কেন? আসলে, জাত আর জাত যাওয়া বলে ব্যাপারের ভিত্তিটুকু ফাঁপা, অর্থহীন। এই হল সত্যি কথা। অতিকথা, বা ইংরেজীতে যাকে বলে myth, হল এর উলটো কথা। অর্থাৎ কিনা, ভুল কথা, মিথ্যে কথা। জাত আর জাত-যাবার কথাটা যে রকম। তাই বলে, যে-কোন মিথ্যে কথাকেও অতিকথা বলা চলবে না। যেমন ধরুন, বেগুন গাছে কুমড়ো ফলে। এটা ডাহা মিথ্যে কথা। তবু অতিকথা নয়। কেন নয়? তার কারণ, প্রথমত এ-কথায় কেউই কান দেবে না। কিন্তু অতিকথাগুলো সমাজের মধ্যে চালু কথা। যে-সমাজে চালু সে-সমাজের বেশীর ভাগ মানুষ এগুলোয় কান দেয়, বিশ্বাস করে। শুধু

তাই নয়। অতিকথাগুলোর সঙ্গে একটা লাভ-লোকসানের হিসেব আছে। জাত আর জাত যাবার কথা ভাঙিয়ে একদল লোকের সংসার চলে, জমিদারের জমিদারি রক্ষা পায়, বুড়োর তরুণী ভার্যা জোটে। অতিকথাগুলো কাজে লাগে, লাভ জোটায়। মারিগুটিকার যখন প্রকোপ তখন একদল লোক মাটির সরা হাতে গৃহস্থের দোরে দোরে ঘুরে বেড়ায়। তারা ভিক্ষে চায় না, "মার দয়া"র কথা বলে পয়সা আদায় করে। গৃহস্থের মনে "মার দয়া"র ভয়টা এমনই যে এদের তাড়িয়ে দেবার সাহস হয় না। অথচ, "মার দয়া"র কথাটা তো একেবারে মিথ্যে কথা : বসন্ত রোগের কারণ হল এক-রকমের বীজাণু, বসন্ত রোগের প্রতিকার হল সময় মতো টিকে নেওয়া। অথচ, এই মিথ্যে কথার দরুন লাভটা কী বিলক্ষণ, কীরকম নগদ। মাটির সরাগুলো চালে আর পয়সায় ভরপুর। তবু এই সঙ্গেই মনে রাখতে হবে, লাভটা সব মানুষের সমান লাভ নয়। জাত আর জাত যাওয়ার ভয়,—এর দরুন একদল মানুষের যে-রকম লাভ আর একদল মানুষের সেই রকমই লোকসান। মার দয়া, এই কথাটার দরুন বেশীর ভাগ গৃহস্থের লোকসান, লাভ শুধু জনা কয়েক সরাবাহী ভেকের।

লাভ যাদের তারা নেহাতই কম দলের লোক। লোকসান যাদের তারাই হল বেশীর ভাগ মানুষ। আসলে, মানুষের সভ্যতা শুরু হবার মুখোমুখী সময় থেকেই মানুষের সমাজে একটা অদ্ভুত অন্যায় ব্যাপার চালু হয়েছে। অন্যায়টা হল, একদল মানুষের মেহনত দিয়ে তৈরি জিনিস আর একদল মানুষের ভোগে লাগা। খেতে লাঙল দিয়ে একদল লোক ফসল ফলাল, কিন্তু ফসলের অনেকখানিই উঠল কুঁড়ের বাদশা জমিদারের গোলায়। মুখে রক্ত তুলে যারা প্রাসাদ গাঁথে তাদের রাত কাটে পথের পাশে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে। যাদের মেহনত দিয়ে কারখানায় মোটর গাড়ি তৈরি হয় তাদের ভোগে মোটর গাড়ি, কিংবা মোটর গাড়ি বিক্রীর টাকা, কিছুই তো জোটে না। সব ব্যাপারেই এই রকম। একদল মানুষ মেহনত করে মরছে, কিন্তু মেহনতের ফলটা ভোগ করছে আর একদল মানুষ। যারা মেহনত করছে সংখ্যায় তারা অনেক অনেক বেশী মানুষ, যারা তাদের মেহনত লুঠ করছে দলে তারা নেহাতই নগণ্য। অর্থাৎ, বেশীর ভাগ মানুষের দশাই হল চিনির বলদের মতো, মেহনত করে মরে কিন্তু মেহনতের ফল ভোগ করতে পায় না।

কিন্তু এই সহজ সত্যি কথাটুকুকে যদি বেশীর ভাগ মানুষ স্পষ্টাস্পষ্টি চিনতে

শেখে তাহলে তো মহা বিপদ ; যারা অপরের মেহনত ভাঙিয়ে খাচ্ছে তাদের বিপদ। তাই দরকার পড়ে কতকগুলো মিথ্যে কথার, সত্যি কথাটাকে ধামা চাপা দেবার জন্যে। কিন্তু মিথ্যেটাকে বেশ কায়দা করে ছাড়তে হবে, নইলে সবাই মানবে কেন ? তার মানে, এমন ভাবে ছাড়তে হবে যাতে সবাইকার তাক লেগে যায়। যেমন ধরুন, জমিদার জনার্দন চৌধুরী যদি পাঁচজনকে ডেকে বলেন, "বাপুহে, তোমরা সবাই মুখে রক্ত তুলে খাট, সেই খাটুনীর যে-ফল তাই নিয়ে আমি একটু ফুর্তি করব," তাহলে নিশ্চয়ই পাঁচজনে তাঁর কথায় সায় দেবে না। তাই কায়দা করে বলতে হবে। গীতায় যে-রকম বলা হয়েছে : মা ফলেষু। কর্মের ওপর তোমার অধিকার, কর্মফলের ওপর নয়। একেবারে শ্রীকৃষ্ণের মুখে কথাটা বসিয়ে দেওয়া ; খোদ ভগবান বলছেন, না মেনে উপায় কি ? খাসা কথা, অতিকথা হিসেবে এর জুড়ি কম। তবুও, কথাটায় বড় বেশী পণ্ডিতী পণ্ডিতী চঙ ; তাই আরো ঘরোয়া করে, আরো সাধারণের মতো করে, মোটামুটি এই কথাটা বলবারই আরো একটা কায়দা আছে : 'হাতের পাঁচটা আঙুল সমান নয়'। তার মানে কী ? তার মানে হল, কেউ কেউ বেশী সুখভোগের অধিকারী, কেউ কেউ নয়। শুনে হকচকিয়ে যেতে হয়। অনেকেই মেনে নেয়।

ওই হল অতিকথার কায়দা।

অতিকথা শুধু আমাদের দেশেই নয়, সাহেবদের দেশেও। নমুনা দেখুন : ওদের দেশের আসল অবস্থাটা ঠিক কী রকম ? কল-কারখানার সব এত উন্নতি হয়েছে যে সেগুলোকে যদি ঠিক মতো দেশের লোকের কাজে লাগানো যায় তাহলে কারুর ঘরেই অভাব থাকবার কথা নয়। কিন্তু তা তো হয় না। কল-কারখানাগুলোকে সাধারণ লোকের অভাব মেটাবার জন্যে চালানো হয় না, চালানো হয় মালিকদের মুনাফা জোটাবার জন্যে অথচ সাধারণ লোকের মেহনত দিয়েই সেগুলো চলে। ফলে, একদিকে মালিকরা দারুণ বড়লোক আর অন্যদিকে সাধারণ লোকের অনেক অভাব। এই হল সোজা কথা, সত্যি কথা। অথচ এই কথাটাকে ধামাচাপা দেওয়া চাই, তা নইলে মালিকদের মালিকানা টিকবে না। তাই মিথ্যে কথা ফাঁদতে হবে, কিন্তু মিথ্যে কথা ফাঁদতে হবে কায়দা করে, যাতে সাধারণে হকচকিয়ে যায়, মেনে নেয়। অর্থাৎ অতিকথা চাই। তাই, মালিক তরফের একজন মহাপণ্ডিত একটা অতিকথা ফাঁদলেন। তিনি একটা ভেক হিসেব পেশ করে বললেন,

পৃথিবীতে খাদ্যের যোগান যে-ভাবে বাড়ছে তার চেয়ে ঢের বেশী হুড়হুড় করে বাড়ছে লোকসংখ্যা। তাই, মানুষের অভাব তো থাকবেই। তবু অভাব তো সবাইকার নয়। একদল লোক তো দেদার বড়লোকমী করছে, অভাব শুধু মেহনতকারীদের ঘাড়ে। এই কথা নিয়ে মেহনতকারীরা যাতে আবার হল্লা শুরু না করে তার জন্তে আরো অতিকথা চাই। তাই শোনা গেল, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। এখানে উপভোগের আয়োজন বড় কম, তাই সেটুকু নিয়ে মানুষে-মানুষে কাড়াকাড়ি। যারা বীর, যারা যোগ্য মানুষ, এই কাড়াকাড়ির ব্যাপারে তারা জিতে যায়; যারা পারে না তারা অযোগ্য বলেই পারে না, তাদের কপালে উপভোগের বদলে তো অভাব জোটাই উচিত। তার মানে কথাটা দাঁড়ায় এই যে বিয়াল্লিশ সালে আমাদের দেশে চালের কালোকারবার কেঁদে যারা চন্দননগরে ফুর্তি লুঠতে যেত তারা সবাই দারুণ বীরপুরুষ, আর যারা গাঁয়ে গাঁয়ে কালো মাটির বুক চিরে চাল আদায় করে কিন্তু যাদের তৈরি চাল লুঠ হয়ে গেল বলে যারা কলকাতায় ঠিকরে এসে ফুটপাতে মুখ থুবড়ে পড়ল, মরল, তারা সবাই দারুণ কাপুরুষ। অথচ, তাদের মেহনতেই দেশটা বাঁচে, তারা মাটিতে লাঙল দেয় বলেই আমি আপনি খেতে পাই। তাছাড়া, বিপ্লবের সময়? তখন এই অভুক্ত মানুষের মিছিলই যে শোষকের দলকে উপড়ে ফেলে দেয়, কালবোশেখীর ঝড় যেমন উপড়ে দেয় শিকড়শুদ্ধু গাছ। তখন কারা যোগ্য, কারা অযোগ্য? কারা বীরপুরুষ, কাপুরুষ কারা? তার মানে, এই কথাটা একেবারেই বাজে কথা।

কিন্তু ওই হল অতিকথার কায়দা। সত্যি কথার খোল পরিয়ে ডাহা মিথ্যে কথাকে এমন ভাবে চালু করে দেওয়া যে যারা শোষক তাদের বিলক্ষণ লাভ।

তাই যেখানেই শোষণ সেখানেই অতিকথা। যেখানেই অতিকথা সেখানেই শোষণ। আমাদের দেশে, সাহেবদের দেশেও। কেবল আমাদের দেশে এক ধরনের শোষণ, সাহেবদের দেশে আর এক ধরনের শোষণ। তাই আমাদের দেশে এক ধরনের অতি কথা, সাহেবদের দেশে আর এক ধরনের অতিকথা।

আর একটা সাহেবী অতিকথার নমুনা নেওয়া যাক। প্রথমে আসল কথা, তারপর অতিকথাটা।

ওদের দেশের কলকারখানাগুলো আজকাল এত ভাল, এমন উন্নত

হয়েছে যে ঠিক মতো কাজ চালালে এগুলোয় অনেক অনেক জিনিস তৈরি হবার কথা। কিন্তু অতো জিনিস বাজারে ছাড়লে জিনিসগুলোর দর পড়ে যাবার ভয়, কেননা বাজারে যত বেশী মালের আমদানি ততই তো মালের দর পড়ে যায়। জিনিসের দর পড়ে গেলে সেগুলো বিক্রী করে মালিকদের মুনাফা কম জুটবে, অথচ মুনাফা জোটানোই মালিকদের জীবনে পরম পুরুষার্থ। তাই মাঝে মাঝে দেখা যায় কলকারখানায় ভয়ানক বেশী জিনিস তৈরি করে মালিকরা মহা ফাঁপরে পড়েছে, বেগতিক দেখে তারা গাদা গাদা মাল নষ্ট করতে বাধ্য হচ্ছে,—হয়ত পুড়িয়ে ফেলছে, হয়ত সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তাতেও কি ছাই শান্তি আছে? মালিকদের মুনাফা জোগাতে জোগাতে দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থা কাহিল, দেশের কল-কারখানায় যা তৈরি হয় তা কেনবার মত টাকা সাধারণের ট্যাকেতে থাকে না। তাহলে উপায়? অত জিনিস নিয়ে কী করা যায়? মালিকদের কাছে শেষ পর্যন্ত উপায় মাত্র একটা : লড়াই লাগিয়ে দেওয়া। লড়াই লাগাতে পারলে লড়াইয়ের কাজে রাশি রাশি জিনিস বিক্রী হয়ে যাবে, তাছাড়া লড়াইতে জিততে পারলে হেরে-যাওয়াদের দেশে পাওয়া যাবে নতুন বাজার। দেদার মুনাফা। তাই মুনাফার খাতিরে মালিকদের পক্ষে শেষ পর্যন্ত লড়াই লাগানো ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। কিন্তু মুস্কিল আছে। লড়বে তো দেশের লোক, সাধারণ মানুষ। মালিকেরা যদি তাদের ডাক দিয়ে বলে, "বাপুহে, তোমরা একটু লড়াইতে প্রাণ-ট্রাণ দাও, নইলে যে আমার মনের মত মুনাফা জোটে না"—তাহলে নিশ্চয়ই দেশের লোক হাসিমুখে রাজি হবে না। অতএব? অতএব অতিকথা চাই। হালের ইতিহাসেই সাহেবদের দেশে তাই হরেক রকম অতিকথার চলন হতে দেখা গিয়েছে। হিটলার আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা দেশের লোককে বোঝাত : আমরা, জার্মানরা, হলুম খাঁটি আর্য, সবচেয়ে উঁচু জাত; পৃথিবীর বাকি সব জাত আমাদের গোলামী করতে বাধ্য; অতএব চল যাই, লড়াই করে বাকি সবাইকে গোলাম করে রাখি। আর্য জাত নিয়ে অতিকথা। এই অতিকথায় মেতে ওদের দেশের কত হীরের টুকরো ছেলে নিজেদের পরমায়ু বলি দিল। তবু এই অতিকথার পরমায়ু খুব বেশী দিন টিঁকলো না। মহাযুদ্ধের শকুনটা পৃথিবীজোড়া ভূরি ভোজ করে বছর কয়েক যেন ঝিমুলো। এদিকে, মালিকদের মনের মত মুনাফা জোটায় আবার ঝামেলা শুরু হল; তাই মহাযুদ্ধের ওই শকুনটাকে

আবার খুঁচিয়ে তোলা চাই। অতএব চাই অতিকথা। আজকাল এই উদ্দেশে হরেক রকম অতিকথা নিয়ে হল্লা শুরু হয়েছে। একটা নমুনা দেওয়া যাক। ফ্রয়েডের চেলা-চামুণ্ডারা বলছে: মানব মনের একেবারে গভীরে অনেক অজানা রহস্য, সেগুলোর সন্ধান আমরা পেয়েছি আর সেখানে আমরা দেখেছি অন্ধ খুনের নেশা। তাই লড়াই না করে মানুষ যাবে কোথায়? লড়াই করাটাই হল মানুষের সবচেয়ে আদিম, সবচেয়ে সহজ প্রবৃত্তির আসল বিকাশ।

দেশে বিদেশে এই রকমের হরেক রকম অতিকথা।

অতিকথাগুলোর উদ্দেশ্য মনে রাখলেই বুঝতে পারা যাবে কেন সব দেশে সব যুগে একই অতিকথা চালু হবার কথা নয়। আসল কথাকে, আসল অবস্থাকে, ধামাচাপা দেওয়াই তো অতিকথার উদ্দেশ্য। সব দেশে, সব যুগে আসল অবস্থাটা ঠিক এক রকমের নয়। তাই নানান দেশে নানান রকম অতিকথা আবার একই দেশে বিভিন্ন যুগে নানান রকম অতিকথা। সাহেবদের দেশে এক রকম, আমাদের দেশে অন্য রকম। আবার, ওদের দেশের মধ্যযুগে এক রকম, আধুনিক যুগে অন্য রকম। কিন্তু আমাদের দেশের ব্যাপারে একটা মজা আছে। আমাদের দেশে হরেক রকমের অতিকথা, কোনটা বা নতুন কোনটা বা পুরনো। কিন্তু সাহেবদের দেশে নতুন অতিকথাগুলো যে রকম পুরনো অতিকথাগুলোকে বাতিল করে দিয়েছে আমাদের দেশে তা নয়। কোনটা বা মান্ধাতার আমলের, কোনটা বা সাহেব আসবার সময় থেকে চালু, আবার কোনটা বা আনকোরা নতুন। কিন্তু সবগুলোই টিঁকে রয়েছে এক-সঙ্গে। মা-ফলেষু, যথাযোগ, মায়া-দয়া—এগুলো সব মান্ধাতার আমলের পুরনো। এ-রকম পুরনো অতিকথা আরো অনেক আছে: জন্মান্তর, জাত-যাওয়া, সিঁথের সিঁদুর, কতই না। কিন্তু যেটা সবচেয়ে আশ্চর্য কথা সেটা হল, এগুলোর পক্ষে টিঁকে থাকা। কেমন করে টিঁকে রইল? ব্যাপারটা কী? সাহেবদের দেশে তো টিকে থাকেনি, মধ্যযুগের অতিকথাগুলো বদলে নতুন যুগের নতুন অতিকথা, কিন্তু পুরনো যুগের অতিকথাগুলোকে বাতিল করে দেওয়া। আমাদের দেশে তা হয়নি। কেন হয়নি? ব্যাপারটা বুঝতে হলে উল্টো দিক থেকে বোঝবার চেষ্টা করতে হবে। উল্টো দিক মানে হল দেশের আসল অবস্থাটার দিক, যে দিকটাকে চাপা দেওয়াই অতি-

কথার আসল উদ্দেশ্য। আসলে আমাদের দেশের আসল অবস্থাটায় সে রকম বদল হয়নি যে রকম বদল হয়েছে সাহেবদের দেশে। আমাদের দেশে মেহনত করবার কায়দা আর অপরের মেহনত লুঠ করবার কায়দা মান্ধাতার আমল থেকে আজ পর্যন্ত অনেকখানিই এক রকমের : সেই ছোট ছোট জমিতে চাষ আবাদ করা, মামুলী হাতিয়ার, মামুলী জল সেচনের ব্যবস্থা। ফলে, হাড় ভাঙা খাটুনী খেটেও ফলটা জোটে সামান্য আর যেটুকু বা জোটে তাও জমিদার-পুরোহিত-রাজা-মহারাজার দল মা-ফলেষু বলে মেরে দেয়। ইতিহাসের ভাষায়, সামন্ততন্ত্রের দশা। মোটের ওপর এই দশাটা আমাদের দেশে টিঁকে আছে বহুদিন আগে থেকে আজ পর্যন্ত, আর তাই টিঁকে আছে মান্ধাতার আমলের অতিকথাগুলোও।

তারপর ইংরেজ এল। তৈরি হল কিছু কিছু নতুন কায়দার অতিকথা। কিন্তু পুরনোগুলোকে বাতিল করে দিয়ে নয়—পুরনোর ওপর নতুনের বোঝা, বোঝার ওপর শাকের আঁটি। ইংরেজ প্রভুরা কিছু কিছু উন্নতি আমদানি করেছিল আমাদের দেশে, স্রেফ্ ওদের নিজেদের মুনাফার খাতিরেই করেছিল, অনিচ্ছা সত্ত্বেই করেছিল। তবু ওদের সামনে আদর্শ ছিল আমাদের দেশটাকে কাঁচা মাল তৈরি করবার বাগান মতো করে রাখা, ইতিহাসের ভাষায় কৃষিপ্রধান সামন্ততান্ত্রিক অবস্থাটা টিঁকিয়ে রাখা। তাই টিঁকিয়ে রাখা মামুলী অতিকথাগুলোও। মহারাণীর ঘোষণা মনে আছে তো ? ধর্মবিশ্বাসের টিকিটি ছোঁয়া চলবে না। যদিও অবশ্য বন্ধ হল সতীদাহ, বন্ধ হল চড়কের বীভৎসতা। মোটের ওপর মার-দয়া আর মা-ফলেষু আর যথাযোগ সবই রইল টিঁকে। তার ওপর ছুটল নতুন অতিকথা : ইংরেজের বল, মহারাণীর রাজত্ব, 'ল এণ্ড্ অর্ডার,' ভারতের অতুল অধ্যাত্মবাদের গৌরব, হিন্দু মুসলমান। ইংরেজের বল, মহারাণীর রাজত্ব—তার মানে, সাহেবরা হল বাপরে বাপ্ সাংঘাতিক জাত, ওদের বিরুদ্ধে আমরা টঁা-ফোঁ করব কী, ওদের রাজত্বে সূর্য কখন অস্ত যায় না। 'ল এণ্ড অর্ডার,' আমাদের দেশে ওরা আইন আর শৃঙ্খলার অবতার হয়ে এসেছে। অর্থাৎ, আমাদের পায়ে ওরা যে শৃঙ্খল পরিয়েছে সেই শৃঙ্খলের কাছেই মাথা নোয়াও। আর এত যে ওরা করছে তা শুধু ওদের জাতির মহিমা, সাদা চামড়ার মানুষ ওরা, কালা আদমীদের উন্নতি করাই ওদের জীবনের পরম পুরুষার্থ—হোয়াইটম্যান্‌স্ বার্ডেন্। কিন্তু সেই সঙ্গেই ওদের পণ্ডিতেরা আমাদের শিখিয়ে দিল

ভারতের অতুল অধ্যাত্মবাদী গৌরব : সেই গৌরবের কথা ভেবে বসে বসে ঝিমোতে হবে, এ ব্যাপারে ওরা আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে চায় না যে-রকম আমাদের পক্ষে ওদের ঐহিক গৌরবের সঙ্গে পাল্লা দিতে যাওয়াটা মূর্খতা। অভ্যুদয় আর নিঃশ্রেয়স্—অভ্যুদয়টা ওদের, নিঃশ্রেয়স্টা আমাদের। তবে আর লড়াই কেন? আর লড়াই যদি করতেই হয় তাহলে হিন্দু মুসলমান। হিন্দুদের যে কষ্ট তার কারণ মুসলমান, মুসলমানদের এত যে কষ্ট তার কারণ হিন্দু, অতএব লড়ে যাও। সাহেবদের রটানো অতিকথার মধ্যে এমনতর কাজের অতিকথা আর একটিও নয় : হিন্দু আর মুসলমানের দুজনেরই সম্পদ লুঠ করে সাহেবরা, আর পাছে দেশের লোক ক্ষেপে তাই তাদের লেলিয়ে দেওয়া এর ওর বিরুদ্ধে। দেশের রাস্তায় দেশের লোকের লাস পচে, নাকে রুমাল চেপে ক্লাইভ স্ট্রীটের মহাপ্রভুরা গাড়ি হাঁকিয়ে ঘুরে বেড়ান।

এই সব হল হালের অতিকথার নমুনা। কিন্তু হালের অতিকথার মধ্যে আরো এক ধরনের অতিকথা আছে। সেগুলো সাহেবদের তৈরি নয়। স্বদেশী অতিকথা। অর্থাৎ কিনা, দিশি প্রভুদের তৈরি অতিকথা। কেননা, এই দিশি প্রভুরাও দেশের সাধারণ মানুষদের মেহনত দিয়ে তৈরি সম্পদ লুঠ করতে চায়; কিন্তু সেখানেই বিলিতি প্রভুদের সঙ্গে ঝগড়া, লুঠের মাল বখরা নিয়ে ঝগড়া। তাই দিশি প্রভুদের সমস্যা হল বিলিতি প্রভুদের ওপর চাপ দিয়ে নিজেদের কোলে খানিকটা বেশী ঝোল টানতে হবে। চাপ দিতে হলে দেশের লোক ক্ষেপাতে হয়। কিন্তু এমন কায়দায় ক্ষেপাতে হবে যাতে তারা সত্যি সত্যি ক্ষেপে না যায়। কেননা, সত্যিকারের ক্ষেপে গেলে কারুর পক্ষেই লুঠ করবার জুৎ থাকবে না—সাহেবদেরও নয়, স্বদেশীদেরও নয়। মেপেজুপে লোক ক্ষেপাবার মতো খুব কাবদাবাজ অতিকথার যোগান হল—অসহযোগ। সাহেবদের কাপড় পরব না, সাহেবদের মাল কিনব না, ওদের নোকরী করব না, ওদের ইস্কুলে পড়ব না। আমাদের দেশ আমাদের হওয়া চাই। বন্দে মাতরম্। কিন্তু তাই বলে শোষকের ওপর সত্যিকারের ক্ষেপে যাওয়া নয়। মনে রাখতে হবে, ত্যাগের আদর্শ, ব্রহ্মচর্যের মহিমা। অর্থাৎ, অসহযোগের সঙ্গে অহিংসা। মনে রাখতে হবে আমাদের দেশ রামচন্দ্রের দেশ; সেখানে রাজা আছে প্রজা আছে, রাজপ্রাসাদে হাজার নর্তকীর লীলা আছে, রাজপথে হাজার চণ্ডালের বুভুক্ষা

আছে, সবই থাকবে—কিন্তু সবই থাকবে গলায় গলায়, বাঘে-ছাগলে ভাই ভাই ভাব। ডাকসাইটে মিল মালিকের বাগানে রঘুপতি রাঘব-র ভজন, মিলের শ্রমিক সেখানে এসে ভজনের তাল দেবে। কেবল, ক্ষেপে যাওয়াটি চলবে না। অসহযোগের উলটো পিঠেই অহিংসা। চৌরিচৌরা করতে গিয়ে যদি দেশের লোক ক্ষেপে যায় তাহলে আন্দোলন গুটিয়ে নেওয়া হবে; তারপর বিলেতে গোল-টেবিল ঘিরে দিশি-বিলিতির একটা লেনদেন আপস।

কিন্তু সাধারণ মানুষ নিয়ে বিপদ এই যে একবার লড়তে শুরু করলে তাদের শক্তি ক্রমশ দুর্বার হয়ে ওঠে। তাতে বিলিতি প্রভুদেরও বুক কাঁপে, দেশি প্রভুদেরও গদি টলমল করে। তাই ঘন ঘন আপসের কথাবার্তা। দুই প্রভুতে আপস শেষ পর্যন্ত একটা চরম আপস হয়েও গেল। কিন্তু প্রভুদের মধ্যে আপস হয়ে গিয়েছে এইটুকু শুনলে দেশের লোক খুশি হবে কেন? তাদের খুশি করে দেবার জন্যে একটা লাগসই অতিকথা চাই। পনেরোই অগস্ট। স্বাধীনতা। কী দারুণ দামামা পিটিয়ে অতিকথাটা প্রচার করবার কায়দা: কত রোশনাই, খবরের কাগজে কত রোমহর্ষক গল্প; পুলিশে বন্দেমাতরম্ গান গাইল, গোরাপল্টন ভেঁপু বাজিয়ে দেশে ফিরে গেল। খাদি টুপির আড়ালে গা ঢাকা দিল সোলার টুপি। হকচকিয়ে যাবে না দেশের মানুষ? অথচ, ভেতরে ভেতরে দাসখৎ লেখা, সাধারণের কপালে যে দুর্ভোগ সেই দুর্ভোগই! এই হল, সবচেয়ে আনকোরা অতিকথা, এই পনেরোই অগস্ট।

আলোচনা করতে হবে অতিকথা নিয়ে। সাধারণ লোকের জানের দায়ে করতে হবে। মান্ধাতার আমল থেকে চালু মা-ফলেষু আর মায় দয়া। আবার একেবারে আনকোরা অতিকথা পনেরোই অগস্ট। সব রকম অতিকথা নিয়েই আলোচনা করা চাই।

আলোচনা করবার একটা কায়দা দেখিয়েছেন আমাদের দেশেরই একদল পুরনো দার্শনিক, যাঁদের নাম হল চার্বাক। কায়দাটা হল, সহজ কর্মজীবনের কোষ্টিপাথরে ঘষে দেখ, দেখা যাবে কোন কথায় কতখানি মুরোদ। বামুনেরা বলে, যজ্ঞে পশু বধ করলে সেই পশু সোজা স্বর্গে যায়; যদি তাই হয় তাহলে বামুনেরা নিজের বাপকে হাড়িকাঠে ফেলে না কেন? বামুনেরা বলে, শ্রাদ্ধের সময় পিণ্ডি দিলে সেই পিণ্ডি খেয়ে পরলোক থেকেও মানুষের পেট ভরে; যদি তাই হয় তাহলে ছেলে যখন বিদেশ যাচ্ছে তখন তার সঙ্গে চাল

চিঁড়ে বেঁধে না দিয়ে ঘরে বসে বসে তার জন্যে একটু আধটু পিণ্ডি দিলেই হয়, হাজার হোক পরলোকের চেয়ে ইহলোকের দেশান্তরটা অনেক কাছে-পিঠের ব্যাপার। এই হল চার্বাকদের কায়দা। চার্বাকরা বলেন, এই কায়দায় বিচার করলে দেখতে পাওয়া যাবে কথাগুলোর আসল উদ্দেশ্য হল একদল লোকের সংসার চালানো, লোকগুলোর না আছে খেটে খাবার গতর না বুদ্ধি, লোকগুলো নেহাতই "ভণ্ড ধূর্ত নিশাচরের" দল। নিশাচর মানে, স্রেফ চোর।

অতিকথাগুলোকে ফাঁস করবার আর একটা কায়দা হল বিজ্ঞানের আলোয় দেখা। কেননা, বিজ্ঞান হল অতিকথার যম। কেননা, বিজ্ঞান সব ব্যাপারের আসল কারণটা খুঁজে বের করে; অর্থাৎ সত্যি কথা, তাই অতি-কথার যম। মার দয়া-র অতিকথাটা ফাঁস করে চিকিৎসা বিজ্ঞান: টিকে নাও, মার দয়া হবে না। রাজনীতি আর অর্থনীতি নামের বিজ্ঞান বলে দেয় পনেরোই অগস্টের পর বিদেশী প্রভুদের সঙ্গে স্বদেশী প্রভুদের আপসটা ঠিক কেমনতর। অবশ্য মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞান অতিকথার যম বলেই আজকালকার দিনে অতিকথা ফাঁদবার একটা কায়দা হল বিজ্ঞানের নামে অতিকথা ফাঁদা; বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। তাই আজ-কালকার দিনে খুব হুঁসিয়ার থাকতে হয়, কোনটা বিজ্ঞানের কথা আর কোনটা ভেক-বিজ্ঞানের কথা তা খুব ভাল করে খেয়াল রাখতে হয়।

(পূর্বানুবৃত্তি)

সমরেশ বসু

(৮)

অহল্যা ইতিমধ্যেই ভাত নামিয়েছে উনুন থেকে। ভরত আজ সদর কাছারীতে যাবে। মামলার দিন আজ। এ-রকম মাঝে মাঝেই সে যায়।

গোবিন্দ ঢুকে অহল্যাকেই জিজ্ঞেস করল, মহী কই বৌঠান ?

অহল্যা ফ্যান গালতে গালতে আগুনের আঁচে লাল মুখটা টিপে হেসে বলল, কেন, ঘুম হয় নাই বুঝিন্ কাল রাতে ?

না হওয়ারই সামিল, বৌঠান। দেওর তোমার ভাল আছে তো ?

ভাল কি মন্দ বলতে পারি না। তারও তো তোমারই মত রাত কেটেছে। যাও, সে তার ঘরে কাজ করছে, দেখ গে।

গোবিন্দ বুঝল, মহিম সুস্থই আছে। সেদিকে তাড়াতাড়ি না করে সে জিজ্ঞেস করল, তা তোমার রাত না পোয়াতেই ভাত নামল যে ?

সদরে যাবে আজ মহীর দাদা। খানিকটা উৎকণ্ঠা দেখা দিল অহল্যার মুখে চোখে। এ মামলা করেই সব যাবে দেখছি। কাল সারা রাত ঘুমোয়নি মহীর দাদা। সকালে উঠেও থম্ ধরে বসেছিল। এই এখুনি নাইতে যাবার আগে বলে গেল, এবার মামলায় যদি হারি বড় বউ, মাঠে নামতে হবে লাঙল নিয়ে।

এতে অহল্যার দুঃখ নেই। দুঃখ তার ভরতের বিভ্রান্তিতে। যে আভিজাত্যের বীজ ভরতের বাবা চাষী দশরথ বয়ে এনেছিল এ ভিটেয়, সেই বীজেরই মহীরুহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ভরতের মনে। মাঠে লাঙল দিতে ভরত দুঃখ পাবে, মুখে নাকি তার কালি পড়বে, সম্মান হবে ক্ষুণ্ণ।

তাই অহল্যার বাপ-ভাই ভরতের বাড়িতে আসতে সংকোচ করে, জামাই তাদের ভদ্রলোক। তাদের ঘর-দোরে বিছানায় মাঠের ধুলো, গায়ে মাথায় পায়ে মাঠের ধুলো, তারা মাঠের চাষী। অহল্যার সঙ্গে তাদের সম্বন্ধই বিচ্ছিন্ন হয়নি, জাতটাই পালটে গেছে খানিক। হ্যাঁ, ভরতও কোন দিন শ্বশুর বাড়ির লোককে তেমন তোয়াজ করেনি তা কেবল ঐ মিথ্যে ভদ্রলোকী আভিজাত্যের জন্ত।

অথচ অহল্যা তো চাষীর ঘরেরই মেয়ে। বাপ-ভাইয়ের সঙ্গে মাঠে মাঠে ঘুরেছে সে জন্মের পর থেকে। কিন্তু ভরত আজ বিভ্রান্ত।

কিন্তু গোবিন্দ সম্পূর্ণ অন্ত রকম ভাবল। দুনিয়াব্যাপী মানুষের এ স্বার্থান্ধ রূপটা তার মনকে কালো করে। এইটুকুই কি জীবনের পরিধি—এই স্বার্থ আর হানাহানি? এই মামলা আর মারামারি, দৈনন্দিন জীবনের সুখটুকু কড়ায় গণ্ডায় পুষিয়ে নেওয়ার জন্ত কামড়াকামড়ি। মানুষের পবিত্রতম প্রার্থনারত চেহারাটা তো সে কখনও দেখতে পায় না। মানুষের জীবন, তার ধর্ম, তার ধর্মের ইতিহাসের নেই কোন খোঁজ। যে ঈশ্বরকে ঘিরে আর নিয়ে মানুষের জগৎ, সে ঈশ্বরকে এমন দূরে ঠেলে ফেলে দিয়ে দূরে দাঁড়ানোর এ অদ্ভুত শিক্ষা মানুষ কোথা থেকে পেল? কেন পেল?

সে জিজ্ঞেস করল, আজই বুঝি রায় বেরুবে?

না, আজ নয়। তবে দেরিও নাই আর।

মেজিস্টর বিচার করবে বৌঠান, তবে মহেশ্বরেরই হাত সবকিছুতে। তুমি তাঁকে ডাকো।

তাঁকে তো রাতদিনই ডাকছি ভাই!

যেন ডেকেও কিছু হল না। গোবিন্দ আঘাত পেল অহল্যার কথায়। ধমক দিতে ইচ্ছে করল অহল্যাকে।

তোমরা কোনদিনই ডাকনি। ছবি আর মূর্তি পুজো করেছ কেবল তোমরা, দেবতার নাম করে খেয়েছ গোগ্রাসে খাদ্য অখাদ্য, কিন্তু সেই একক মহেশ্বরকে জানবার চেষ্টা তোমরা কেউ করনি। তার রূপ দিয়েছ কোটি কোটি, গল্প বলেছ হাজার রকম, তোমরা মজে আছ জীবনের ঘৃণ্য পাঁকে। মহেশ্বরকে ডাকলে না, তার কাছে চাইলে ধান, জমি, অর্থ, ঐশ্বর্য, সুখ-শান্তি। অথচ মহেশ্বরেরই সৃষ্টি এরা। বিচিত্র মহেশ্বরের সৃষ্টি।

আর কিছু না বলে সে চলে গেল মহিমের কাছে।

মহিম তো তখন পাগল। অন্য জগতে চলে গেছে। উন্মত্ত শিশু শিবের মূর্তির গা থেকে মাটি খুঁটে খুঁটে তুলছে, ভরছে, কখনও সামনে যাচ্ছে, কখনও পেছিয়ে আসছে, কখনও মাথা নাড়ছে, অস্ফুট শব্দ উঠছে মুখ থেকে। কখনও মুখে ফুটছে হাসি, কখনও গম্ভীর, কখনও-বা একেবারেই স্থাণুর মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ছে।

আছে সর্বক্ষণের একজন মাত্র দর্শক। সে হল কুঁজো কানাই মালা। কালো কুচকুচে গায়ের রং, মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া চুল, পিঠে মস্ত বড় একটা কুঁজ। সেই কুঁজের ভারে সে অনেকখানি নত হয়ে পড়েছে। ফলে, হাত দুটো সব সময় বাতাসে দোল খাওয়ার মত দোলে। ঘাড় উঁচু করতে কষ্ট হয় বলে চোখের মণি দুটো উপরের দিকে ঠেলে উঠেছে তার। কুঁজো কানাই মালা। গাঁয়ের শিশুদের কল্পনারাজ্যের বীভৎস পথে তার গতি। অশান্ত দামাল শিশু কান্নায় বাধা না মানলে কুঁজো কানাইয়ের নাম ধরে ডাক দেয় মা, যেমন ডাকে জুজু বুড়িকে। বয়স্কদের কাছে সে জন্তুবিশেষ, ভয়েরও বটে। নয়নপুরের মেয়েমানুষ কাউকে শাপ-শাপান্ত করতে হলে বলে, আর জন্মে তুই কুঁজো কানাই হবি। পুরুষ হিসাবে মেয়েমানুষের কাছে কুঁজো কানাই যে এক মস্ত বিভীষিকা! অভিশপ্ত কুঁজো কানাই।

কিন্তু মূর্তি গড়ার সময় মহিমকেও ছাপিয়ে ওঠে তার পাগলামি। ঠেলে-ওঠা চোখ দুটোতে তার কী গভীর উত্তেজনা, আর সমস্ত রুক্ষ, শক্ত পেশীবহুল চেহারাটা যেন আবেগে থরো থরো। কখনও ঘাড় এদিকে কাত করছে, কখনও ওদিকে, কখনও এদিকে যায়, কখনও ওদিকে। যখনই তার মনোমতটি হচ্ছে তখনই একটা বিচিত্র শব্দ বেরিয়ে আসছে তার মুখ থেকে।

সত্য কথা, শিল্পীর হাত আজ কিছুটা বাঁধা পড়েছে কুঁজোর আবেগভরা দৃষ্টির মাঝে। মহিম তার এই সৃষ্টি-সঙ্গীর যাচাইয়ের চোখকে আজ আর অবহেলা করতে পারে না। কাজ করে আর জিজ্ঞেস করে, বল তো কানাইদা, কেমনটি হইল?

কুঁজো কানাই তার কুৎসিত মুখে বিচিত্র হাসি নিয়ে বলে, ভাল। কিন্তুক—

শিল্পীর পরের কাজের দিকেই ঝোঁক তার বেশি। অর্থাৎ, এর পর কী হবে?

গোবিন্দ একেশ্বরবাদী। তার ঈশ্বর নিরাকার, তাঁর কোন ঘটনাবহুল ইতিহাস নেই। তবু প্রেমিক, উন্মত্ত শিবের যে মূর্তি মহিম গড়ছে তা তাকে মুগ্ধ না করে পারল না। যে হাতে শিব সতীর মৃতদেহ জড়িয়ে ধরেছে, যে ঘৃণা ও দৃঢ়তা শিবের মুখে ফুটে উঠেছে, এই উভয় ভঙ্গির পার্থক্য গোবিন্দের সমস্ত অন্তরকে আচ্ছন্ন করে দিল। হাতের দিকে তাকালে মনে হয়, মৃত প্রিয়াকে কী আকুল আবেগেই আঁকড়ে ধরেছে। যেন ঐ হাত থেকে জগতের কোন শক্তিই প্রিয়াকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আর ত্রিনয়নের সেই অগ্নিবৃষ্টির মাঝে গোবিন্দ দেখল, কোথায় যেন অশ্রুর বাষ্প জমে উঠেছে। আহা! শেষে তার সমস্ত আবেগ জমে উঠল বন্ধুর প্রতিভার প্রতি; মহিমের এই গভীর অনুভূতি ও দৃষ্টির তল খুঁজতে সে আকুল হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, মহিমের প্রতি তার বন্ধুত্বের যে টান ক্রমাগত বেড়েই চলেছে, সে বুঝি তার এই আকুলতা, মহিমের হাত আর চোখকে এতখানি শক্তি ও দৃষ্টি দিয়েছে যে মন, সেই মনটাকে স্পর্শ করার আকুলতা।

সে ডাকল, মহী।

জবাব পাওয়া গেল না। তখন মহিমকে ডাকা বুঝি ঐ মাটির মূর্তি ক্ষিপ্ত শিবকে ডাকারই সামিল। একটা মস্ত দোমড়ান গাছের শুঁড়ির মত ফিরে ইশারায় ডাকতে বারণ করল কুঁজো কানাই। তারপর গোবিন্দের একটা হাত ধরে খানিক ঘুরে টেনে নিয়ে গিয়ে তার মাথাটা হাত দিয়ে ধরে নিজের মুখের কাছে নামিয়ে নিয়ে এল কানাই। কয়েকটা দাঁতে বিচিত্র হেসে ফিসফিস করে বলল, ভগমানের বেবস্তোম। নইলে মায়ের এমন খুনে বাপের বাড়িতে আসতে কেন সাধ হবে, বল?

কুঁজোর কথার মাথা ধরতে পারল না গোবিন্দ। বলল, কি বলছ?

ওই গো, তোমার দক্ষ রাজার মেইয়ের কথা বলছি। সতী মায়ের কথা। বলে সে তার ঠেলে-ওঠা চোখ দুটো দিয়ে শিবের দিকে তাকিয়ে বলল, ভাং-গাঁজার মানুষ তুমি ঠাকুর, মায়ের লীলা দেখে ভুললে। আমি হইলে—

কথা শেষ না করে সে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা দোলাতে লাগল। গোবিন্দর বড় ভাল লাগল কুঁজো কানাইয়ের এই সরল হৃদয়ের আফশোস। জিজ্ঞেস করল, তুমি হইলে কী করতে?

মুই? কানাইয়ের কালো কুব্জ দেহ ঘৃণায় যেন সোজা হয়ে ওঠার জন্য কেঁপে উঠল। সমস্ত চোখ মুখ দারুণ ক্রোধের অভিব্যক্তিতে উঠল থমথমিয়ে।

মুই হইলে, অমন শউরের ঘরে বউ পাঠাইতাম না। হঁ, হক কথা বললাম। দু দিন উপোস করে আড়ি দিত বউ, তবু—

গলা বন্ধ হয়ে এল কুঁজো কানাইয়ের। গোবিন্দ দেখল তার ঠেলে-ওঠা চোখ দুটোতে দু ফোঁটা জল চক চক করছে। হায়! তবু এই বিকটদর্শন কুঁজো বউ নিয়ে ঘর করা দূরের কথা, জন্মাবধি গর্ভধারিণী মা থেকে শুরু করে কোন নারীর মিষ্টি কথাও শোনেনি। তার বুকে আজ গুমরে ওঠে কান্না শিবের বউ সতীর বিরহে। আশ্চর্য জগৎ। তার চেয়েও আশ্চর্য জগতের মানুষ। সাধকের সাধনায় জমে ওঠা মস্তিকে যেন টঙ্কার পড়ে। মানুষ! মানুষকে তার পুরোপুরি চিনে ওঠার মধ্যে কোথায় যেন মস্ত ফাঁক রয়ে গেছে। সে ভীত হয়, যখন তার নিরাকার ঈশ্বর সাধনা এমনি কোন মুহূর্তে চমকিত হয়। সেও তো মানুষ। কুঁজো কানাইও মানুষ। তবু মানুষের সমাজ তাকে মানুষ বলে মানতে বাধা পায়। অথচ কুঁজো কানাইয়ের আশার আর দশজনেরই মত। আর সেই মানুষের সঙ্গে তার সাধনার যেন এক মস্ত গরমিল। মানুষ তার কাছে বড় কিঞ্চিৎ।···না না, মানুষের জন্ম তো সে মঙ্গল কামনা করে দিবারাত্রি তার ঈশ্বরের কাছে। মানুষ তো তাঁরই সৃষ্টি, সেই তাঁর এবং তাঁর সাধনার চেয়ে মহিমময় আর কি থাকতে পারে!

তবু কুঁজো কানাইয়ের এ বিচিত্র আকাঙ্ক্ষা তার পরমেশ্বরের কাছে এক বিচিত্র প্রশ্নের মত ছোট্ট একটি দাগ কেটে রাখল মনের কোণে।

সে দেবতার বহুরূপ ও তার জন্মান্তরে বিশ্বাস করে না। তবু সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলল কুঁজো কানাইয়ের কুঁজের উপর আলতো করে একখানি হাত রেখে, এ তো দেবতার লীলা ভাই কানাইদাদা, এর জন্য তুমি দুঃখ কোর না।

কিন্তু এ কথা মানবার পাত্র নয় কুঁজো কানাই। গোবিন্দর মানুষ না চেনার হাল্‌কা দুঃখতে যেন দারুণ বিদ্রূপ করেই কুঁজো কানাই আচমকা গর্জনের মত চিৎকার করে উঠল, না না না, কক্ষনো নয়।

সে চিৎকারে মহিমের সম্বিত ফিরে এল। ফিরে দেখল, বন্ধু গোবিন্দ অপ্রতিভ শঙ্কিত মুখে কানাইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। কুঁজো কানাই দুর্নিবার বেগে মাথা নেড়ে চলেছে। বুঝি ঘাড়টাই ছিটকে পড়বে ধড় থেকে, এতই তার আবেগের বেগ। ছিটকে পড়ছে লালা তার মুখ থেকে।

মহিম হাত ধরল কুঁজোর। জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে কানাইদা?

কানাই তার ঠেলে ওটা রক্তবর্ণ চোখে গোবিন্দের দিকে তাকিয়ে বলল, এটারে কয় বেদ্‌তম্‌, হাঁ তোমার দেবতার বেদ্‌তোম।

—বেদ্‌ভোম্‌? আশ্চর্য! গোবিন্দের চাপা পড়া গলা কেঁপে উঠল।

—নয়? বিকলাঙ্গ কানাই চকিতে যেন খ্যাপা জানোয়ারের মত হয়ে উঠল। বুঝি বা ঝাঁপিয়ে পড়বে গোবিন্দের উপর। তবে তোমার মুনি দেবতার এত বিবাদ কেন, জগতে এত দুঃখক্‌ কেন গো? কামু মালার সোন্দরী টুকটুকে মেইয়ে বুড়ো ডাক্তারের ঠ্যাঙানি রোজ খায় কেন?

মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে দরজার কাছে গিয়ে বুনো মোষের মত ফিরল কুঁজো কানাই। জিভ্‌ দিয়ে লালা কেটে নিয়ে বলল, তোমার সবার বড় ভগমানের বেদ্‌ভোম যদি না হইবে, তবে মোরে কেন জন্ম দিল সম্‌সারে?

বলতে বলতেই তার নিষ্ঠুর চোখ ছাপিয়ে হু হু করে জলের ধারা বইল। বলল কপালে চাপড় মেরে, এ কি লীলা তোমার ভগমানের, এ কি খেলা মোরে নিয়ে?

বলেই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে গেল সে হাত ঝুলিয়ে, তেমনি তীব্র বেগে মাথা নাড়তে নাড়তে। আর ছুচ্‌লো কুঁজটা যেন ক্লান্ত জানোয়ারের পিঠে নিশ্চল নিষ্ঠুর সওয়ারের মত তাকে জড়িয়ে নিয়ে চলেছে। তার তীব্র মাথা নাড়া যেন জগৎটাকেই অস্বীকার করার অনিরুদ্ধ বেগ।

ত্রস্ত অহল্যা এসে দাঁড়াল। মহিম ও গোবিন্দকে নির্বাক দেখে বলল, কি হইল, কুঁজো লালা অমন খেপল কেন?

গোবিন্দ বলল, ওরে আমি দুঃখুক দিইচি। কিন্তুক অজানিতে।

সকাল থেকে অহল্যার মন ভার। তবু একটু হেসে বলল, একেরে সামলানো দায়, তার তিন পাগল একত্র হইছ। দেখো বাপু, মাথার চালটাকে ভিটেয় ফেলো না।

বলে দরজার কাছ থেকেই সরে গেল সে।

মহিম বলল, ওরে দুখুক দেওয়া তো বড় চাট্টিখানি কথা নয় গোবিন। তবে ঈশ্বরের গুণের কথায় ও বড় খ্যাপা। তাই বুঝিন্‌ বলছ?

—আমি বুঝতে পারি নাই মহী ভাই।

তার ঠোঁটে কান্নার আভাস দেখা দিল। বনলতার নিষ্ঠুর সাধক আর সবার কাছে, সব কিছুতে বড় নরম। মনটা তার ফুলোর মত। রোদে হাওয়ায় ফোলে, জলে নেতিয়ে যায়। টানলে বাড়ে, টিপলে জুটি মেরে

যায়। পরমেশ্বরের দিকে ছুটে চলার সাধনাটা যেন তার বালিশের খোলের বেষ্টনীর মধ্যে আশ্রয় নেওয়া যেখান থেকে কেউই তাকে টেনে বার করতে পারবে না।

মহিম তাড়াতাড়ি বলল, বুঝেছি বুঝেছি।

ব্যাপারটাকে হালকা করে দেওয়ার জন্ত বলল, তা তুমি হঠাৎ আসলা যে সকালবেলা?

—কাল রাতে তো তুমি যাও নাই? ভাবলাম বুঝি—

—সে এক কাণ্ড গোবিন ভাই।

কাল রাতের কথা মনে হতেই সব কথা গোবিন্দকে বলার জন্ত প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠল মহিমের। বলল, কাল একটু বাবুদের, মানে ওই জমিদার বাড়ি থে ডেকে পাঠিয়েছিল। কাণ্ডখানা বড় তাজ্জবের।

সে বলে গেল সব কথা। প্রতিমা গড়ার কথা, হেমবাবু ও উমার মত দুইজন বিচিত্র অপরিচিত নরনারীর কথা। কি তার মনে হয়েছিল, কেমন করে তারা কথা বলেছিল। হ্যাঁ, সেই নাম না জানা পল্লীটাতে বসবার কথা পর্যন্ত সে বলে গেল গোবিন্দকে। উমা যে পাগলা বামুনের সহপাঠিনী, সে কথাটিও বলতে ভুলল না সে। তারপর কৈফিয়ৎ দেওয়ার মত বন্ধুকে বলল, সে কেন প্রতিমা গড়তে চাইল না। নিজের অনিচ্ছার কথা নানান্‌খানা বলে সে শেষে বলল:

—আর তা কি আমি পারি গোবিন ভাই? অর্জুন পাল মশাই বংশ বংশ বাবুদের পিত্তিমে গড়ে আসছে। আর পালমশাই আমার গুরুজন। ছোটকাল থে তার কাজ দেখেই যে প্রাণে আমার সাধ হইছিল। সে কথা আর কেউ না জানুক, আমি আর আমার গুরু তো জানি। পাল পাড়ায় যে আমার কত মান। আমি কি তা পারি?

এত কথাতেও গোবিন্দের মুখের কোন ভাব পরিবর্তন না দেখে বলল মহিম, শরীল কি তোমার খারাপ হইছে?

গোবিন্দ বলল, না, মনটা বড় খারাপ হইছে মহী ভাই। তবে তুমি পিত্তিমে গড়ার ভার না নিয়ে ভালই করছ। অন্তান্ত কথার কোন জবাব না দিয়ে সে বলল, সন্ধ্যেবেলায় আসছ তো। আমি এখন যাই। এসো কিন্তু।

সাধকের মণ্ডলে কানাই কুঁজোর শেষ কথা প্রচণ্ড কলরব তুলে দিয়ে

গেছে। বেব্‌ভোম্‌ যদি না হয়, তবে মোরে নিয়ে ভগমানের একি খেলা। ভগবানের বিভ্রম! তা হলে ভগবান ভগবান কেন?

যেতে যেতে হঠাৎ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে বলল, হ্যাঁ, বনলতা তোমারে ডাকছে।

—মোরে? মহিম বলল, তার সঙ্গে তোমার দেখা হইছে?

চকিত কুণ্ঠায় মুহূর্ত চুপ থেকে গোবিন্দ বলল, হ্যাঁ। যেয়ো কিন্তু, নইলে মোরে জ্বালাতন করবে।

মহিমের ঠোঁটে চকিতে এক ঝিলিক হাসি খেলে গেল।

পথে যেতে যেতে গোবিন্দের মাথায় হঠাৎ ভিড় করে এল, সকালের এ বিভ্রাট কি তবে প্রভাতে বনলতার দর্শন।

ক্রমশ

ভারতবর্ষ

(ভারতবর্ষের ইতিহাস অবলম্বনে রচিত একটি দীর্ঘ কবিতার একাংশ)

শেখ গোমানি দেওয়ান

ধন্য তুমি আর্যভূমি, অনার্য-ভবনে
প্রভুত্ব-গরল যেথা পশিল গোপনে
অনার্যের বৃত্তি শ্রমে আর্য পুষ্ট ক্রমে ক্রমে
রচিলা মন্দির শত দেবতার গৃহ
গেঁথে দিল ইঁট নহে, অনার্যের দেহ ।

অলক্ষ্যে জাগিল তুচ্ছ উচ্চ-অধিকার
হ'ল খণ্ড, এল তব পূর্ণাঙ্গ বিকার
জনমি সামন্তবর্গ, ধর্মে আনে উপসর্গ
প্রসবি দুর্নীতি তোমা করিল দুর্বল
বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান মানবের দল ।

হেরে ভগ্ন ছিন্ন তনু নিবারিতে শোক
গরজিল ভীমনাদে মহান অশোক
চুম্বিল সে খণ্ড শির পদে গৃহ সন্ন্যাসীর
মূর্ছা তুমি পুন দগ্ধ কালের দংশনে
কে রোধিবে আবর্তনচক্র নির্যাতনে ।

শোভিল আবার ভালে খণ্ড রাজটীকা
তবু জলে প্রতি দ্বারে সান্ধ্য দীপশিখা
মুছে দিত কত ব্যথা জাগিত প্রভাত
কনোজ হানিল শিরে নির্দয় আঘাত ।

রলকিল তীক্ষ্ণ অসি পাঠান বাহুতে
নিত্য সনাতনে যেন গ্রাসিল রাহুতে
অর্ধতন্দ্র তমোরাশি আনিল অজানা নিশি
প্রভাতে উদিল ভালে জ্যোতি সুনির্মল
ইসলামের নবরবি জ্যোতি সমুজ্জ্বল ।

অনুপম রূপে তোমা সাজাল প্রবাসী
পান্না হীরক দিয়ে মতিমুক্তা রাশি
পদ্মরাগ শোভে শিরে কে বলে এ প্রবাসীরে
হয়েছিল সত্য তব অলীক স্বপন
সেও ডুবে গেল হায় নির্মল তপন ।

অযত্ন নারকী উমিচাঁদ মীরজাফর
জন্মি তব গর্ভে তাও তোমারই পাঁজর
যাঁকে যে কলঙ্করেখা যুগে যুগে দিল দেখা
দেবতার তীর্থে তব নির্লজ্জ কুমার
তুলে দিল মানদণ্ডে মুকুট তোমার ।

উত্তরিল সিন্ধু-তটে বণিকের দল
হেরিল তোমার দেহ পুষ্ট সুকোমল
হানিল লোলুপ দৃষ্টি দংশিল তোমার কৃষ্টি
দেবতা মন্দিরে ধীরে বিলাসের গৃহ
রচিল নিঃশব্দে হায় জাগিল না কেহ ।

সন্তর্পণে অন্নপাত্র করিয়া বণ্টন
পালক পুলকে করে অবাধ লুণ্ঠন
কোহিনুর পান্না হীরে অদর্শন ধীরে ধীরে
হারাল বিজ্ঞান শিল্পী অর্ধচন্দ্র গীতা
জ্বলিল কমলাবক্ষে শ্মশানের চিতা ।

পরবাস, পরভাষ পরপণ্যভরা
হ'ল তব তনু দুঃস্থ ব্যাধিগ্রস্ত জরা
কাচের পুতুল দানে হীরকভাণ্ডার টানে
শোষণ করিল মেদ মাংস রক্তাধার
রহিল কঙ্কাল শুধু শ্মশানে তোমার ॥

দীপ জ্বালি টানে তোমা আঁধার নিবিড়ে
সতীর লাঞ্ছনা যেন লম্পট শিবিরে
শত ব্যথা বন্ধনের উঠে রোল ক্রন্দনের
করুণ ধ্বনিতে কাঁপে মর্ত্ত্য রসাতল
জাগিল স্বর্গের দ্বারে দেবতার দল ॥

কখন দেখিব তোমা সিন্ধু-আবরিনী
প্রশান্ত ললাট স্থির অটল অশ্বণী
নির্ভীক চিত্তের সনে
ধরাপূজ্য রত্নাসনে
অবিভক্ত বসুধার উন্মুক্ত প্রাচীরে
দাঁড়ায়েছে বরাভয়ে চিরোন্নত শিরে ॥

না, আমরা মরব না

রাম বসু

আমরা সেই মানুষ
পৃথিবীর গর্বিত সন্তান
মরব না
নদীর মত আবহমান কাল গান গাইব
রোদে জলে ঝড়ে ঝঞ্ঝার ভ্রূকুটিতে
আমাদের দেহ চূড়া চিরকাল উর্ধ্বমুখ
আনন্দ বেদনার বিচিত্র সংগমে
শ্রাবণ সায়াহ্ন আমাদের বুক
যূথী কেতকীর গন্ধের সাথে মৃত্যুর শোক
আজন্ম অভিশাপের শিকারী হাত
কণ্ঠনালী থেকে সরিয়ে
মানুষের অবিচলিত স্বরে সামুদ্রিক উল্লাস।
আমরা মরব না।

ভুলব না,
বুড়ি গঙ্গার পারে
ধোঁয়ার নিরেট পাথরের তলায়
খেতের বিলুপ্ত সুন্দর নিঃসঙ্গ রূপের পাশে
গোলের বাদায়
ভয়ঙ্কর জনশূন্য অরণ্যের করাতের করোগেড আওয়াজে
অজস্র মানুষ
অপরিমিত সম্ভাবনার কবরে দাঁড়িয়ে
জীবন নিলাম করছে।
ক্ষতের মত প্রত্যেক মুখে বিরক্তির তিক্ত স্বাদ
সোনার বর্ম-মোড়া শতাব্দীর বর্শায় বর্শায় ছিন্ন ভিন্ন পাঁজরা
মুখোশের আড়ালে ক্ষুধিত মৃত শিশুর পচা দুর্গন্ধ।

আমাদের দেহ ছিঁড়ে গেল অন্তর নখের আঁচড়ে
আলনায় ঝোলান কাপড়ের মত নৈমিত্তিক মৃত্যু
আর ভালবাসা মমতা আকাঙ্ক্ষা
ফুলদানির ফুলের মত ক্রমাগত শুকিয়ে যায়।

দুপুরের অকূল বাতাসে শালের অরণ্যে উত্তর সাগরের গান
ধূসর নীল পাহাড়ের সংহত উদার গাম্ভীর্য
রূপকথার বীরের মত আকাশমুখী মৌন
খণ্ড খণ্ড মেঘে মেঘে শিল্পীর অজস্র ভাস্কর্য
স্তব্ধ ঊর্মিল রিক্ত গেরুয়ার সবুজ পাড়ের পাশে
বিষণ্ণ বন্ধুর মত নিঝুম বসতি গ্রাম
বাইশ বছরের নারীর মত উন্মুখ প্রকৃতি
সম্পূর্ণ সৌন্দর্যে প্রতীক্ষায় ধ্যানমগ্ন।

কে দেখবে?
জীবিকার জোয়াল ঘাড়ে মানুষ কাঁদে-পড়া মহিষ
দুর্ভাবনার কালি-পড়া চোখে অতিকায় আতঙ্কের ছায়া
মধ্যরাতে সেতারের আলাপে বিরক্তিকর বিড়ম্বনা
ভালবাসার প্রাসাদ কোটরের মাকুনিতে ধ্বংসের স্তূপ
তারি পাশে শ্রষ্ট সবুজ ডালে ডালে ফেনিয়ে ওঠা অন্ধকারে
কূরচক্ষু সময়ের চক্রান্ত—
কে বুঝবে?

শুধুমাত্র বাঁচার আদিম আকাঙ্ক্ষা বোবার ভাষার মত
নিজেকে ছড়িয়ে দেবার ইচ্ছার স্রোত
বালিয়াড়ির প্রান্তশায়ী সর্পিণী নদীর মত
পাথরের ধাক্কায় ঝংকারে বেজে ওঠে
রূপ রস বর্ণ গন্ধের পিপাসা
তারি দুর্নিরোধ্য টানে
বারবণিতার নিরাসক্ত বুকে

বিসর্জনের সঙ-এ
খিদার পুষ্ট সিনেমা লাইনে
মদ মাদলের ঘোরে
পচা জলে তৃষ্ণা মেটায়।

যৌবনের গতি হারিয়ে গেল গোলক ধাঁধায়
ডালে ডালে বিনুনী-করা অন্ধকারে রাতকানা পাখীর কান্না
সর্বনাশের গুহা গহ্বরে শোঁ শোঁ করা জন্তুর মত ঝড়ের আওয়াজ
তখন নিরপরাধ স্বপ্নের টুঁটি কেটে নির্বিকার দস্যু
দাদায় টহলদারী খুনীর মত
যন্ত্রণার খোঁটে খোঁটে জোঁকে খাওয়া জীবন
একটানা অনুভূতিহীন নিরুপদ্রব
তখন নিরাপত্তা, ধর্ম, যুদ্ধ
পতিতার মত অন্ধকারে শঙ্খিনীর মত হেসে ওঠে।

না, আমরা সইব না
এই গ্লানি সইব না
না, আমরা বইব না
এই প্রাণের কলঙ্ক বইব না।
ধুলোর জন্মের আনন্দ অধিকারে মানুষ মরতে চায় না
যন্ত্রণায় নীলকণ্ঠ পাখী গলায় অবিরাম গান গায়
চৈত্রের ঘূর্ণি পাহাড়ের গা ঘেঁসে বিদ্যুতের মশাল হাতে ছুটে আসে
অজস্র শুকনো পাতা কালো কালো পাখীর মত আকাশ ঢাকে
লাল মাটির রুক্ষ তরঙ্গ হীরাধার বর্শা তোলে
শালের কচি কচি পাতার পিছনে পলাশের দাউ দাউ আগুন
ক্রোধের মত দিগন্ত ঢাকে
রিক্ততার ধূ ধূ করা পাহাড়ের মাথায় টকটকে কুসুম পাতা
স্বপ্নের মত ধক্ ধক্ করে
তারই পায়ে মহুয়ার উদার মদিরতা
আকাঙ্ক্ষার মত বাহু মেলে দেয়।

কেন তবে মৃত্যুকে স্বীকার করব ?
এই মাটির অপরূপ রূপের আগুনে
কতবার যৌবন স্নান করে ভুলে গেছে
রমণীর কুটিল ভ্রূকুটি সপ্রশংস হিংসায় সুন্দর হয়েছে
একটা মাত্র কথার আবেগে থরথর করে উঠেছে কোটি কোটি গ্রহ উপগ্রহ।
কেন তবে হত্যাকে স্বীকার করব ?
কি আশ্চর্য সুন্দর স্বচ্ছ তপ্ত ভালবাসায়
প্রেয়সীর হাত ধরে তারার নীচে দাঁড়ান
কি উদার আনন্দ শিশুর চোখে চোখ থুয়ে
আকাশের অতলতা পাওয়া
কি মহান উল্লাস ধানের কাঁচা সবুজে দাঁড়িয়ে
বাঁচবার অধিকার বর্শা তুলে ধরা
কেন তবে ক্লান্তিকে স্বীকার করব
যখন জীবনের অধিকার গানের মত তন্ময়তা
যখন স্বপ্নের স্বাদ আদিগন্ত পূর্ণিমার রাত।

কৃপণের মত একে একে মাটি খুঁড়ে দেখব
পুরাতন মুখরেখা প্রতিরোধের মত সুন্দর
বল্লমের ফলায় গেঁথে রাখব মানুষের অনাদিকালের গর্ব
হাঁ-মেলা মৃত্যুর সামনে সারিবন্দী আমরা
পৃথিবীর গর্বিত সন্তান
আকাশ-ছোঁয়া অবয়ব তুলে ধরি
মাটি পাথরের তল থেকে ভালবাসার গান মোচড় দিয়ে উঠে আসে
আর অদম্য প্রাণশক্তিতে পেশী-তরঙ্গিত কাঁধে
অর্জুন গাছের পাতা ফাঁক করে
বাতাস আচমকা হাত রাখে।
না, আমরা মরব না।

গল্প

জীবনায়ন

সুলেখা সান্যাল

ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে মাথার মধ্যে ঘুরে উঠেছে অনেকদিনই, কিন্তু আজ যে শেষ পর্যন্ত অতজোড়া চোখের সামনে পড়ে গিয়েই লজ্জা পেতে হবে একথা মনে হয়নি। শহরতলীর ট্রাম—ধুলোয় অন্ধকার করে চলে ভাঙা-চোরা রাস্তা দিয়ে, রাশি রাশি ধুলো নাকে-মুখে ঢোকে, চুলগুলোয় ধুলোর গুঁড়ো লেগে থাকে, রাস্তার দুপাশে কাঁচা ড্রেন, নোংরা আর ভ্যাপসা গন্ধে সমস্তক্ষণ নাক জ্বালা করে—যতক্ষণ না স্টেশনের ধারে এসে থেমে যায় ট্রামটা।

একখানা ট্রাম—লোক বেশি ছিল না, যারা ছিল সিট ছেড়ে উঠে এল। হাত ধরে তুলল একটা আধাবয়সী হিন্দুস্থানী মেয়ে—বাজার থেকে শাকসব্জী বেচে ফিরছিল।

গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, কেয়া হুয়া—বুখার? ঘাবেগা কিধার?

দু'একজন রিক্সা ডেকে দেবার প্রস্তাব করল।

বুখার! একটু ম্লান হেসে উপেক্ষার ভঙ্গিতে সীমা ট্রাম ছাড়িয়ে এগিয়ে চলল—কয়েক জোড়া সহানুভূতিভরা অনুসরণকারী চোখের সামনে থেকে সরে না যাওয়া পর্যন্ত এ লজ্জা যাবে না, তবু ভাগ্যি দু'একজন কাজিল ছেলে নেই ওর মধ্যে।

চলতে চলতে গায়ের মধ্যে কেমন শিউরে শিউরে ওঠে, আশ্চর্য মেয়েটা কি বুঝল না কিছুই! তা না বুঝুক—কিন্তু এই ধুলো আর আঁশটে গন্ধের মধ্য দিয়ে কষ্টকর প্রাত্যহিক যাত্রা তার শেষ তো হবে না—আসতে তাকে হবেই শেষমুহূর্ত পর্যন্ত, মাথা ঘুরে বারে বারে পড়ে গেলেও, ট্রামের চাকায় পিষে গেলেও।

আজ বড় বেশি করে—সমস্ত সত্তা দিয়ে সীমা অনুভব করছে এই নতুন মানুষটার আগমন—অনেকগুলো বছর পরে ভয়াবহ দুঃখের আর যন্ত্রণায় ভরা দিনে কেন এই আসার চেষ্টা। দু'চোখ জলে ভরে আসে। তার আর আনন্দের ভালবাসার জিনিস—প্রাণের জিনিস!

ডাক্তার বলেছে সম্পূর্ণ রেস্ট নিতে। প্রেসক্রিপশন দিয়েছে দামী ওষুধ

আর তালিকা দিয়েছে ভাল খাবারের। এ সময় এসব না হলে নাকি ভয় আছে বেবী সম্পর্কে। বেবী! ডাক্তার অনেকবার বলেছে মিষ্টি করে, সীমা ঠোঁট বাঁকিয়ে উপেক্ষা দেখান সত্ত্বেও অভিনন্দন জানিয়েছে।

দুঃখে আর বিরক্তিতে গা জলে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না—বিরক্তিতে শেষে বাইরে বসে থাকা আনন্দকে না ডেকেই উঠে চলে এসেছিল।

আনন্দর চাকরি নেই আজ কত মাস, নেই তো নেই-ই। অজস্র বেকারের মধ্যে নগণ্য একটা সংখ্যা। অনেকদিন পর্যন্ত গোটা দুই ছেলে পড়ানর কাজ ছিল—আজকাল তাও নেই। সীমার ইস্কুল আর টিউশনি মিলিয়ে আশিটা টাকায় তাই সংসার চালাতে হয়—চলে না, জোর করে চালাতে হয়। অতিকষ্টে পাওয়া একতলা স্যাঁতসেঁতে দুখানা ঘরের ভাড়া পঁচিশ টাকা। মাসের প্রথম কটা দিন ডালের সঙ্গে ঝিঙে-ডাঁটার একটা তরকারি ওরা খায় তারপর তাতেও টান পড়ে। ডালের সঙ্গে কাঁচা লংকা মেখে খেয়ে সীমা ইস্কুলে পড়াতে যায়।

তবু এটুকু এখনও পাওয়া যাচ্ছে—সীমা ভয়ে ভয়ে থাকে কোন দিন টিউশনি থেকে জবাব হয়ে যাবে তার।

আনন্দ কাগজ দেখে, রোজ একখানা করে দরখাস্ত করে, উত্তর কোনটার আসে, কোনটার আসে না—কিন্তু চাকরি একটাও হয় না। কাগজখানাও ধার করে আনতে হয়, পড়ে নিয়ে বক্স্ নম্বরটা রেখে ফেরত দিয়ে দেয়। দুপুরে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায় চাকরির খোঁজে। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম রেজেস্টারী করা আছে দেড় বছরের ওপর।

সব শুনে আনন্দ বলে, আসুক না, বাঁচবেই ঠিক, যেমন করে কুলি-মজুরের ছেলেরা বাঁচে আমাদের দেশে এখন। এই অভাবে বিষাক্ত কালো দেশটা থেকে প্রাণ ওরা ঠিক আদায় করে নেবে, তবে সে বেশি দিন নয়।

কথাগুলো শুনে নয়, কিন্তু ওর হাসি দেখে সীমা ক্ষেপে গিয়েছিল সেদিন।

রোজ একটু একটু জ্বর হচ্ছে, সমস্ত সংসার আর পৃথিবীর ওপর চরম বিরক্তিতে মন ভরে থাকে, ঠিক এমনি সময় আনন্দর হাসি হাসি মুখখানা যেন গায়ে বিষ ছিটিয়ে দিল, এত স্বার্থপর আর নিষ্ঠুর ও। ওকেই না সীমা ভালবেসে বিয়ে করেছিল, তখন তো এমন ছিল না, এত নির্লিপ্ত আর উদাসীন!

মনটা যখন বিষিয়ে থাকে তখনই রাগ হয়ে যায়, এতদিন দারিদ্র্য, অভাব-অভিযোগেও যে রাগ হয়নি, শুধু ডাল ভাত কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিনের পর দিন খেয়েও এ রাগ হয়নি, এখন হয়। নিজের ওপর আক্রোশে রাগে চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে। তুলতুলে ছোট্ট একটি শিশুর উষ্ণ স্পর্শের জন্যে কেন অমন করে ব্যাকুল হল তার মন, যে-মন নিয়ে তাকে কামনা করেছিল সে মন অনুতাপে এখন জ্বলে-পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে। ফুটফুটে সুন্দর একটা মুখ তার পঁচিশ বছরের প্রথম মাতৃত্ব। কিন্তু কোন অধিকার নেই সীমার এ মাতৃত্বের, যদি ক্ষমতা না থাকে মানুষের মত বাঁচিয়ে রাখবার।

বিশ্রাম নিতে হবে, ভাল খেতে হবে, মনটাকে ভাল রাখতে হবে, এর কোনটাই কি সম্ভব! শহরতলীর ঐ ধুলো আর নোংরা গন্ধের মধ্যে দিয়ে দশটা থেকে পাঁচটা হাজিরা তাকে দিতেই হবে, এর মধ্যে বিশ্রাম নিতে চাইলে একেবারেই বিশ্রাম নিতে হবে সীমাকে, ক'টা টাকা আর আসবে না মাসের শেষে। আনন্দের বেকারত্বের অবসান কি হবে—হলই বা বিদ্বান আর বুদ্ধিমান ছেলে, চাকরী নিয়ে কে আর বসে আছে যেখানে ছাঁটাই-ই চলছে স্কুল-কলেজে, অফিসে-কারখানায় দিনরাত। এই দেড় বছরের চেষ্টায় আর প্রতীক্ষায় তাহলে কি কোথাও ডাক পড়ত না তার!

বিদ্যা-বুদ্ধির মর্যাদার কথায় তাই আজকাল হাসি পায় সীমার—আনন্দেরও।

এর মধ্যে সীমার মনে হঠাৎ এক শিশুকে কেন্দ্র করে স্বপ্ন জেগে উঠল কেন—ভেবে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ব্যঙ্গের হাসি ফোটে ঠোঁটে। বাড়ির দরজা পর্যন্ত ক্রমে ঠোঁটের সে তিক্ততাটুকু ফুরিয়ে গিয়ে অবশিষ্ট থাকে একটা ঘোলো নির্বোধ অভিব্যক্তি। এখন আবার গিয়ে রাত্রের রান্নার ব্যবস্থা করতে হবে—তারপর আছে এক গাদা পরীক্ষার খাতা দেখা। মুক্তির কোন উপায় নেই।

আনন্দ বাড়ি নেই, ওকে বাড়িতে না দেখলে কেমন একটা আশায় ভরে ওঠে মন—হয়তো ও বাড়ি ফিরবে কোন ভাল খবর নিয়ে। যোগ্যতার মূল্য নেই—আনন্দের মত ছেলের মূল্য নেই এ দেশে, কি দেশ, কি দিন!

বিষাক্ত দিনগুলো কাটবে কবে ভেবে বুকের মধ্যেটা একটা দীর্ঘশ্বাসের ঝড় ওঠে—একি বাঁচা, জীবন কি এই। ভালবাসবার, সুখী হবার সব অধিকারই কি করে চলে গেল—কেন গেল? ছোট একটা ঘর আলো করা

শিশুর আগমনে কেন মুখর হয়ে উঠতে পারছে না তারা ; কেন চঞ্চল হয়ে উঠছে না তার অভ্যর্থনার প্রস্তুতিতে ; ভয়ে, নিরাশায়, বিরক্তিতে কুঁকড়ে, মুষড়ে যাচ্ছে কেন মনটা সারা দিনরাত ?

হঠাৎ মনে হল সীমার মনের এই অনুভূতিগুলো যেন আনন্দের মনের মধ্যেও আজকাল ওঠা-পড়া করছে—তাই বড় বেশি খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে ও।

শাশুড়ী চুপ করে' বারান্দার এক পাশে বসে থাকেন অবসর সময়ে। ছেলের ওপর রাগ হয়—ও কিছু করছে না কেন। বলেন, তুই কি বসেই দিন কাটাবি খোকা, চাকরি-টাকরি করবিনে কিছুই। বৌমার চেহারা দেখছিস—ও আর কত পারবে ?

—চাকরি। মুড়ি-মুড়কী বুঝি ? পয়সা দিলেই কিনতে পাওয়া যায়। ব্যঙ্গের হাসিতে মুখ ভরিয়ে আনন্দ সরে যায় সামনে থেকে।

সুখদার চোখে জল আসে—ছেলে আজকাল ওমনিই করে কথা বলে।

ওদের দুজনের চিন্তাক্লিষ্ট মুখটা চোখে পড়ে, নিজেকে একটা অসহায় ভার মনে হয়।

রুদ্ধ কান্না ঠেলে আসে গলা পর্যন্ত। তবু বৌ তাঁর ভাল মেয়ে—কখন ভুলেও অপমান করেনি কোনদিন কথায় কাঁকে, ইঙ্গিত করেনি গলগ্রহ বলে। তাই লেখা-পড়া জানা মেয়ের ওপর অদ্ভুত এক শ্রদ্ধা আছে সুখদার। বড় ভাল মেয়ে সীমা।

বড় কষ্ট হয় তাঁর, কোনদিন কি ভেবেছিলেন খোকার বউ যাবে চাকরি করতে। তার টাকায় কেনা চালের গ্রাস মুখে তুলতে হবে তাঁকে।

ক'টা বছরের মধ্যে একটা নাতির মুখ দেখলেন না তিনি, বৌকে নিয়ে ঘর-সংসার করবেন, বুড়ো বয়সে ছেলের রোজগারে সুখে-শান্তিতে থাকবেন, ওদের সুখী দেখে মরতে পাবেন এর সব আশাই যে তলিয়ে যাচ্ছে। সবগুলো দুঃখ মিলে অসহ কষ্ট হয়, কতদিন ভাত খান না দুপুরে—নিজের মৃত্যুকামনা করেন।

আজও তাই করেছিলেন।

ভাতের হাঁড়িতে হাত দিয়েই সীমা বলে, মা—আজও বুঝি খাননি। রোজ রোজ উপোস করে কি কাণ্ডটা যে করছেন—এক বেলা খাওয়া, শুধু দুটো ডালভাত, তাও যদি না খান তবে বাঁচবেন ক'দিন বলুন তো ?

যত রুদ্ধ কষ্ট ফেটে পড়ে সীমার সহানুভূতিতে—হাউমাউ করে কাঁদতে থাকেন; কান্নার ফাঁকে ফাঁকে ছিটকে ছিটকে বেরিয়ে আসে মনের কথা-গুলো, বাঁচতে কি তিনি চান! সবই যে উল্টো হয়ে গেল জীবনে, ভেবেছিলেন শেষ বয়সে শান্তিতে থাকবেন, নাতিকে নিয়ে আদর করবেন, তা নয় বউ চলল কত মাইল দূরে চাকরি করতে আর ছেলে বসে তাই দেখছে।

গালাগালি দেন আনন্দকে—অপদার্থ, লক্ষ্মীছাড়া ছেলে তাঁর।

সীমা সুখদার গায়ে হাত বুলিয়ে চুপ করায়, উনি কি ইচ্ছে করে বসে আছেন চাকরি পাওয়া যে কি কষ্ট, দেখছেন তো আজ ক'টা বছর ধরে কত চেষ্টা করছেন। ওঁর মত ছেলে নইলে কি বসে থাকে। আমাদের বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্ব নেবার যে কেউ নেই।

সুখদা চোখ মুছে খানিকক্ষণ সীমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন—অনেকদিন পরে ভাল করে ওকে লক্ষ্য করেন—বড় মায়া হয়। কি চেহারা হয়েছে মেয়েটার খেটে খেটে, তবু চেহারার অদ্ভুত এক পরিবর্তন চোখ এড়ায় না, চোখের দৃষ্টি কেমন তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, বলেন, দেখি, আমার আরও একটু কাছে সরে এসো তো। রোদ পড়ে আসা বেলার একটা ধূসর ছায়া পড়েছে বারান্দায়—আবছা আলোয় তাঁরই হয়তো চোখের ভুল হয়েছে, ভাল দেখতেও পান না আজকাল চোখে, তবু মনে হয় ভুল তিনি করেননি, বুঝেছেন ঠিক।

হাত ধরে আরও কাছে আনবার চেষ্টা করে বলেন, লজ্জা কি মা, আর একটু কাছে এস।

সীমা হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আসছি মা, ভাতটা বসিয়ে আসি। পালিয়ে যায় রান্নাঘরে, কান্নার বেগে ঠোঁট দুটো বেঁকে বেঁকে যায়, ঠিক ধরেছে সন্ধানী চোখ দুটো।

বারান্দা থেকে সুখদা বারে বারে ডাকেন, সাড়া দেয় না, তারপর এক সময় উঠে ঘরে গিয়ে বিছানার মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে।

সারা বারান্দা জুড়ে অন্ধকার নামে, সুখদা নির্বোধের মত বসে থাকেন অন্ধকারে। সীমার পালিয়ে যাওয়ার রহস্য ধরবার মত সূক্ষ্মবুদ্ধি তাঁর নেই, তাই রাগ হয়। বড় অবাধ্য আজকালকার লেখা-পড়া জানা মেয়েগুলো!

অনেকক্ষণ পরে লণ্ঠন ধরিয়ে নিজেই দিয়ে আসেন সীমার ঘরে—রান্নাঘরে গিয়ে ভাতের হাঁড়িটা নামিয়ে রাখেন, আবার ঘরে ঢুকে সীমার মাথার কাছে

দাঁড়িয়ে থাকেন এক মুহূর্ত। এমন অসময়ে ঘুমোয় না বৌমা—ওঠ, একটু চা করে দেব? শরীরটায় কি কিছু আছে।

দাঁতে দাত চেপে ও পড়ে থাকে বিছানায়—শব্দ করে না।

সুখদা খুশি খুশি মুখে ঘর ছেড়ে আসেন সন্তর্পণে—ঠিকই ধরেছেন তিনি। তবু বুকের মধ্যেটা ভয়-নিরাশায় দোল খায়। বিশ্বাস করেও খুশি হতে পারেন না। বড় অন্ধকার—দরজার চৌকাঠে একটা গুঁতো খেয়েও ব্যথাটা অনুভবই করতে পারেন না, এত ভাল লাগে মনটা।

সুখদা চলে গেলে সীমা উঠে বসে—চুপচাপ বসে থাকে, তারপর নিঃশব্দে রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে। উনুনের আগুনটা গেছে নিভে—ভাতের সঙ্গে যা হোক একটা কিছু রান্না করা দরকার কিন্তু খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আগুনটা জ্বালাবার বদলে নিভিয়েই দেয় কি মনে করে। তারপর রান্নাঘরের দরজাটার কাছে নিঃশব্দে ভূতের মত বসে থাকে। ওদিকে ছোট্ট বারান্দাটুকুতে অনেকদিন পরে হাল্কা আর খুশি মুখ নিয়ে সুখদা, আর তার কয়েক হাত দূরেই রাজ্যের ব্যথা আর বিরক্তির ছাপ মুখে নিয়ে সীমা—বসে থাকে দুটো মন।

রাত্রে হারিকেনের আলোয় আনন্দ শুয়ে শুয়ে বই পড়ে—একতলার স্যাঁত্‌সেতে এতটুকুও রোদের মুখ না দেখা একটা মাত্র জানলার ঘরটায় কেমন ভ্যাপ্‌সা গন্ধ। ঐ একটা জানলার পাশেই গরুর খাটাল—খুললে দুর্গন্ধ আর মশার গুঞ্জন ওঠে।

জানলাটা খুলে দিয়ে হাত দুটো জড়ো করে বাইরের অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সীমা, বুকের ভেতরটায় অন্ধকার জমছে, সমস্ত পৃথিবী জুড়েই বুঝি অন্ধকার। পাশের বস্তিটায় বিচিত্র সুরের কলরব—ঝগড়া আর ছোট ছেলে-মেয়ের কান্না, ওরই মধ্যে সারাদিন পরে সমস্ত দুঃখকষ্টকে অবজ্ঞা করে একদল হিন্দুস্থানী ঢোল ও করতাল বাজিয়ে গান করে। খানিকক্ষণ বসে থেকে কেমন একটা অসহায় শিরশিরে ভাব জাগে মনে। জলে ডুবে-যাওয়া মানুষের মত খাবি খায় বুকের ভেতরটা। আনন্দ একমনে বই পড়ে, শুয়ে থাকা আনন্দর দিকে তাকিয়ে চোখ ফেরাতে পারে না সীমা, স্বাস্থ্যটা এখনও ভেঙে চুরমার হয়নি—এখনও চওড়া বুকটা নিঃশ্বাসের তালে ওঠা-নামা করে। শুধু ডাল আর ভাত দুবেলা—ভাল খাওয়া নেই বলে এক্‌সারসাইজ করা ছেড়ে দিয়েছে। একদৃষ্টে ওর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে সীমা নিজের শিরা বার

করা রোগা হাতটা চোখের সামনে তুলে ধরে, সারা শরীরটায় একবার চোখ বোলায়, মরে যাবে নাকি!

জ্বালা ধরে যায় সারা শরীরে, নির্বোধ একটা রাগে গজরাতে থাকে বুকের ভেতরটা, জানলা ছেড়ে এগিয়ে এসে একটানে বইটা ছিনিয়ে নেয় হাত থেকে।

আনন্দ উঠে বসে হাসে, হল কি তোমার? ক্ষেপে উঠলে কেন?

—না, ক্ষেপব কেন। মরে যাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তোমাদের জন্যে খাটব তাহলেই খুব ভাল হবে।

—আরে, একেবারে ঝগড়া শুরু করলে যে, হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে আনন্দ বলে, আমি কি ভাবিনি তোমার কথা? অবস্থা দেখছ না, হাল-চাল দেখছ না। দেখছ না—চেষ্টার কি মূল্য পেতে হয়, কি মূল্য দেয় এ দেশটা প্রতিভার আর বিদ্যার—সে কি তুমি বোঝ না?

বোঝে সব সীমা—তাইতো একটু পরেই চোখ ভরে জলও আসে।

ওর খোলা চুলের মধ্যে, পাংশু মুখে হাত বুলিয়ে আনন্দ বলে, একটা কাজ কর সীমা—ভাবছি কাল থেকে। দিন কয়েকের ছুটি নিতে পারবে? তাহলে পরশু তোমাকে নিয়ে যাব আমার এক বন্ধু ডাক্তারের কাছে। শক্ত কাঠের মত সীমা চুপ করে থাকে।

—আমাদের বাঁচবার সমস্ত পথ যে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বিদ্যা—পরিশ্রম, দরজায় দরজায় ফিরি করে বেড়াও, বলবে বসে খাব না—পরিশ্রম দেব, সাধনা দেব, আবিষ্কার করব, সৃষ্টি করব, তার পরিবর্তে আমাকে যথার্থ মূল্য দাও, একথা বলে বলে তোমার নিজেরই গলা চিরে যাবে। তোমার আনন্দ-কামনাগুলো তাই ভবিষ্যতের জন্যে তুলে রাখ। তুমি চাকরি করছ—তাই বেঁচে আছি, একথা সত্যি—চরম সত্যি। তোমার জীবনটা শুকিয়ে কাঠ করে দিতেই তো এই দিনের সৃষ্টি। একটা ছোট্ট সুন্দর জীবন্ত প্রাণকে এখানে এনে শুকিয়ে মেরে লাভ কি—ওরা থাক পরের জন্যে। আপাতত আমি যে ব্যবস্থা করেছি যদি রাজি থাক—তবে পরশু চল…

সীমা হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরল, চুপ কর, মা শুনলে আর রক্ষে নেই। ছুটি আমি নিতে পারব দশ দিনের, উইদাউট্ পে'তে।

ঝর ঝর করে জল ঝরে পড়ে চোখ দিয়ে—কান্নাভরা চোখ তুলে আনন্দের

মুখের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত এক হাসি হেসে বলে, কেন তুমি অমন করে দুঃখের র্ণনা করলে, তাইতেই তো মনটা বেশি খারাপ লাগছে।

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আনন্দর চোখ দুটোও হঠাৎ করকর করে।

দরজার পাশ থেকে একটা ছায়া নিঃশব্দে সরে যায় ভূতের মত।

শুকনো হাড়েও কেমন একটা অমঙ্গলের আশঙ্কায় কদিন থেকে বিষিয়ে উঠছিল সুখদার মন, মনটা কান্নার ভারে গুমরে গুমরে উঠছিল, ছেলে-বউ-এর দরজায় দাঁড়িয়ে লুকিয়ে কথা শোনার লজ্জা ভুলে নিজের ঘরে ঢুকে হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন।

আনন্দ আর সীমা চমকে উঠে এল, সুখদা আজ আলোও জ্বালেননি ঘরে, ফিরে গিয়ে নিজেদের হারিকেনটাই নিয়ে এল আনন্দ।

মাটিতে মাথা কুটে কাঁদছেন, আনন্দ গিয়ে কাছে দাঁড়াতেই কান্নার বেগ থাড়ল—আসিস্‌নে, কাছে আসিস্‌নে আমার। আমাকে মেরে ফেল তার চেয়ে, তোদের অসাধ্যি কিছু নেই, খুনী তোরা—পাগলের মত ছটফট করছেন।

বিমূঢ় আনন্দকে সীমা হাত ধরে বাইরে নিয়ে এল, যা শুনতে পেয়েছেন, বুঝছ না ?

বিরক্তির ভঙ্গিতে মাথা-ঝাঁকানি দিয়ে আনন্দ ঘরে-গিয়ে ঢোকে, কি যে কাণ্ড। দেখছেন ভাত জুটছে না। শখ হলেই হল!

সীমা অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে—মনটা কেমন বিষণ্ণ আর শূন্য লাগছে। পাশের বাসায় ছোট্ট কোন বাচ্চা কাঁদছে, বোধহয় খিদে পেয়েছে, কিংবা মাকে কাছে পেতে চায়, চায় কারুর আদর পেতে, তাই কাঁদছে, কিন্তু বড় মিষ্টি আর নরম। কাউকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে এই মুহূর্তে—ছোট্ট একটা তুলতুলে নরম শরীর, পাতলা ঠোঁট, টানা-টানা ঘুমভরা চোখ—মিষ্টি করে আদর করা, গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে সীমার।

সুখদার সামনে যাবার মত সাহস আর তার নেই—নিজের ঘরে ঢোকে।

আনন্দ বসে আছে জানলার ওপর নিস্তব্ধ হয়ে—গিয়ে কাছে দাঁড়াতেই হাত চেপে ধরে, ভয় পাচ্ছ ?

সীমা বলে, না।

কষ্ট হচ্ছে ?

সীমা বলে, না। বাঁচতে আমাদের হবেই। পরের আশা আছে বলেই তো এবার মরতে পারছি।

সকালে দরজা খুলতেই মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল সুখদার সঙ্গে। সারা-রাত বোধহয় ঘুমোননি—ফোলা ফোলা চোখ দুটো, জলের ধারা শুকিয়ে আছে শীর্ণ মুখে।

হাতছানি দিয়ে বারান্দায় ডেকে নিয়ে এসে বললেন, আনন্দ ওঠেনি ?

—না।

ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বাক্সের ডালাটা খুলতে খুলতে বললেন, তোমাকে একটা জিনিস দেব সীমা, ডাক্তারকে দিতে হলেও টাকা তো লাগবে, এটা বেচে দিও। বার করলেন ছোট্ট দুটো সোনার বালা—চোখ মুছে বললেন, আনন্দর হাতের। লুকিয়ে রেখেছিলাম অভাবের গ্রাস থেকে। এত যে অভাব—কতদিন হাঁড়ি চড়েনি, শুধু ভাত নুন দিয়ে খেতে দেখেছি ছেলে-বৌকে চোখের সামনে, তবু বার করিনি। রেখেছিলাম ওরই ছেলে-মেয়ের জন্যে। বিক্রি করে দিও।

সীমার বুকের ভেতরটা আবার কান্নায় গুমরে ওঠে, হাত দুটো শক্ত মুঠ করে দাঁড়িয়ে থাকে—নেবে না।

শেষে সুখদা ওর আঁচলে বেঁধে দিলেন, আর আমি কাঁদব না বৌমা। সত্যিই তো—খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ তো করবে তোমরা, আমি তো কেবল সুখের ভাগী, দুঃখের ভাগ তো নিতে পারব না। দেখো আর আমি চোখের জল ফেলব না।

বালা দুটো হাতে নিয়ে আনন্দ বলে, ভালই হল, কাজে লাগবে।

সীমা বলে, ও দুটো মা কেন রেখেছিলেন জান ত—নাতির মুখ দেখবেন বলে।

আনন্দ হেসে বলে, তোমার মনটার কথা যে বললে না। দেখি মুখ, মুখটা তুলে ধরে বলে, কই হাস।

সীমা হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলে, আনন্দর সারা মুখে ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে। বলে, থাক্ সীমা, দরকার নেই। ভাতের ফ্যান খেয়েও কি বাঁচবে না ?

—ভাতই যদি না জোটে তবে ফ্যান জুটবে কি করে ! না, না, পাগল হয়েছ তুমি। ওকথা বললে আমি কুরুক্ষেত্র বাধাব।

সুখদা অবিশ্রান্ত ঘর-বার করেন। শূন্য বাড়ির বোঝা তাঁর বুকেও চেপে বসেছে। অসহ্য যন্ত্রণায় বুকের ভেতরটা কেমন করছে—কখন ওরা আসবে। মাঝে মাঝে দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিয়ে দেখেন।

কি নিষ্ঠুর! অস্ফুট স্বরে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দু-তিনবার উচ্চারণ করেন। একটা ট্যাক্সি সামনের রাস্তা ধরে আসতে আসতে ওঁরই দরজার কাছে এসে থেমে যায় শব্দ করে—আনন্দ দরজা খুলে নেমে পড়ে দুহাতে ঝাঁকুনি দিয়ে ডাকে—মা, ও মা।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে একবার তাকিয়ে সুখদা চমকে সামলে ওঠেন।

—এনেছিস ওকে।

—ভাখ না, সারা রাস্তা কাঁদতে কাঁদতে এসেছে। তুমি এসে হাত ধরে নিয়ে যাও।

সীমা দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াতেই ওর ক্লান্ত, ফোলা চোখের দিকে তাকিয়ে এক সেকেণ্ড কেমন স্তব্ধ হয়ে যান সুখদা—তারপর ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরেন দুহাতে, সমস্ত ক্ষোভ আর মনের জ্বালা চলে গেছে—মুছে গেছে মন থেকে।

বিছানায় শাশুড়ীর কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে গুমরে গুমরে কাঁদে সীমা, সুখদার চোখ দিয়ে জল পড়ে না এক ফোঁটাও, সীমার দুঃখে বুকের ভেতরটা ব্যথায় টনটন্ করে।

তাঁর ছেলে—আদরের একমাত্র ছেলে, সীমা, লক্ষ্মী, ভাল বউ তাঁর—ওদের যে সব গেল। এই দিন, এই দেশ—কেন এমন হল! আর কত না খেয়ে থাকবে ওরা—কতদিন আর শুকিয়ে থাকবে ওদের জীবন! আনন্দ কি নিষ্ঠুর—! অমন ভাল ছেলে, সীমার মত অমন ভাল মেয়ে—ওরা তো অমন নিষ্ঠুর ছিল না, ছিল না এমন হৃদয়হীন, কে যেন, কি যেন, ওদের নিষ্ঠুর করে তুলছে, ওদের মনগুলো তাই শুকিয়ে যাচ্ছে মুখের সঙ্গে সঙ্গে।

অদ্ভুত এক মমতায় বুকের ভেতরটা ভরে উঠল। আনন্দকে ডাকলেন, খোকা, আয় আমার কাছে বোস্ একটু, ওকে জায়গা করে দিলেন সীমার মাথার কাছে। সীমার রুক্ষ চুলে হাত বুলিয়ে বললেন, কেঁদ মা বউমা, এ দিন কি থাকবে ভেবেছ—আকাল-মহামারীর মতো এও একদিন চলে যাবে। সুখে-শান্তিতে আবার সংসার করবে। ভয় কি!

অভিভূতের মত সীমা সুখদার সেবা নেয়—চোখে চোখ পড়লেই অপরাধীর মত হাসে, সোজাসুজি তাকাতে পারে না।

রামমোহন

[পূর্বানুবৃত্তি]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

—তিন—

[আরো কয়েক বছর পরের কথা।
রামমোহনের আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়ির একটি কক্ষ। ঘরখানি ইওরোপীয় রুচি অনুসারে প্রায় আধুনিক ভাবে সাজান। বৃদ্ধা তারিণী মেঝেতে একখানা হরিণের চামড়ার আসনে বসে মালা জপ করছেন। মধ্যবয়সী উমা একটু দূরে মাথায় অনেকখানি ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে আছেন।]

উমা। আপনার পায়ে ধরে মিনতি করছি মা, একটু জলটল কিছু মুখে দিন।

তারিণী। কেন মিথ্যে অনুরোধ করছ মেজ বৌ। বলেছি তো, আমি কিছু খাব না।

উমা। আজ বারো বছর পরে ছেলের বাড়িতে আপনি পা দিলেন। এত দিনেও কি আপনার রাগ পড়েনি মা? আজো কি আপনি ক্ষমা করতে পারেন নি।

তারিণী। ক্ষমা। জেনে শুনেও কেন একথা জিজ্ঞেস করছ বউমা। ক্ষমা করবার আমি কে। সে তো আমার কাছে কোন অপরাধ করেনি। তার অপরাধ ধর্মের কাছে। ধর্ম যদি তাকে ক্ষমা না করে—আমি কী করে করব?

উমা। (কাতর কণ্ঠে) আপনার কি পাষাণের প্রাণ মা? নিজের সন্তান—

তারিণী। শুধু সন্তান নয় মেজ বৌ। আর সকলকে নারায়ণ টেনে নিয়েছেন, শিবরাত্রির সলতে বলতে ওই একা। তুমিও তো মা। বোঝো না, সন্তানের জন্যে মায়ের বুক কেমন করে? কেমন করে ভুলব—দশ মাস ওকে আমি পেটে ধরেছি—কেমন করে ভুলব বৌমা ও আমার কত দুঃখের ধন?

উমা। তবু কেন এমন করে কঠোর হচ্ছেন মা? আপনি তো জানেন মা, আপনার আশীর্বাদের উনি কতবড় কাঙাল? আপনার উদ্দেশ্যে প্রণাম না করে উনি কোনদিন জলগ্রহণ পর্যন্ত করেন না।

তারিণী। জানি—সব জানি। কিন্তু কোন উপায় নেই। সমাজ ধর্ম সংসারের বিরুদ্ধে সে দাঁড়িয়েছে। সে যেই হোক, কেমন করে তাকে স্বীকার করব? সন্তানের চেয়ে ধর্ম বড়, তারও চেয়ে বড় আমার স্বামীর আদেশ।

উমা। মা।

তারিণী। না, দোষ ওরও নয়। এ হতই—কেউ আটকাতে পারত না। বাবার অভিশাপ। বাবার অভিশাপ তো মিথ্যে হতে পারে না।

উমা। (সবিস্ময়ে) কিসের অভিশাপ মা?

তারিণী। ওর ছ'বছর বয়েসের সময় ওকে বাপের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম। একদিন দেখি—দরদালানে বাবা পুজো করছেন আর মোহন তাঁর পাশে বসে পুজোর বেলপাতা চিবিয়ে খাচ্ছে। যেমন ভয় হল, তেমনি রাগ হল। একি অনাচার! অসাবধান বলে বাবাকে যা নয় তাই গালাগাল করলাম। আগুনের মতো মানুষ আমার বাবা—সইতে পারলেন না। অভিশাপ দিয়ে বললেন, যে সন্তানের জন্যে মেয়ে হয়ে আমি তাঁকে অপমান করেছি—সে সন্তান বড় হয়ে ম্লেচ্ছ হবে!

(উমা বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইলেন)

জানতাম—আমি জানতাম। বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন শ্যামাকান্ত ভট্টাচার্য—তাঁর কথা মিথ্যে হবে না। না—ওর দোষ নয়। এ আমারি পাপ—আমারি অপরাধ। বড় হয়ে যেদিন মোহন এ অভিশাপের কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল—সেদিন—সেদিনই বুঝতে পেরেছিলাম। বুঝেছিলাম পিতৃশাপ ফলতে শুরু করেছে। আমার শাস্তি আমি পাচ্ছি—মোহন শুধু নিমিত্ত মাত্র।

(রামমোহন প্রবেশ করলেন। উমা ঘোমটা টেনে সরে দাঁড়ালেন)

রাম। এ কী! মা! মা!

(ছুটে প্রণাম করতে গেলেন। তারিণী পা সরিয়ে নিলেন)

তারিণী। থাক বাবা। তোমার ও কাপড়ে আমায় ছুঁয়ো না।

(রামমোহন স্তব্ধ হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ)

রামমোহন। বুঝেছি। আমার প্রণাম তুমি নেবে না।

(তারিণী কোন জবাব দিলেন না)

নাই নিলে, কিন্তু আমার মনের প্রণাম তো তুমি ঠেকাতে পারবে না।
(তারিণী মাথা নিচু করলেন, তাঁর ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল)
আজ বারো বছর তোমায় দেখিনি। এর মধ্যে কত বুড়ো হয়ে গেছ তুমি! মাথার চুল শাদা হয়ে গেছে। তোমায় যে চিনতেই পারা যায় না।

তারিণী। বয়েস বাড়লেই লোকে বুড়ো হয় বাবা—চুলও পাকে। তুমিও অনেক বদলে গেছ। শুনেছি দেশজোড়া নাম হয়েছে তোমার। মিত্র যত বেড়েছে—শত্রু বেড়েছে তার হাজারগুণ।

রামমোহন। সত্যের জন্তে যে দাঁড়ায়—শত্রু তার বেশিই থাকে মা।

তারিণী। সত্য। তোমার কাছে যা সত্য—অন্তের কাছে তা সর্বনাশ। আমিও তাদেরই দলে। তুমি তো জান মোহন, আমিও তোমার শত্রু। জগমোহনের বড় ছেলে গোবিন্দকে দিয়ে তাই তোমার বিরুদ্ধে মামলা করেছিলাম—সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছিলাম—

রামমোহন। কিন্তু কোন দরকার ছিল না মা! তুমি আদেশ করলে ও আমি এমনিই গোবিন্দকে ধরে দিতাম। আর যে সম্পত্তি তোমরা আমায় দিতে চাওনি—আমি তো তা দাবিও করিনি। তার প্রায় সবই আমি গুরুদাসকে দিয়ে দিয়েছি। আমার নিজের শক্তি আছে—সামান্ত শিক্ষাও আছে—নিজের জীবিকা উপার্জন করবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। ও সব কথা থাক মা। (মৃদু হাসলেন) কিন্তু আমি জানি—বাইরে তুমি আমার যত শত্রুতার ভানই কর—মনে মনে রোজই আমায় আশীর্বাদ করে চলেছ।

তারিণী। না মনে মনেও তোমায় আমি আশীর্বাদ করিনি মোহন! প্রতি মুহূর্তে অভিশাপ দিয়েছি—সর্বনাশ কামনা করেছি।

রামমোহন। মায়ের অভিশাপ সন্তানকে লাগে না মা। তা আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়ায়।

তারিণী। জানি না। কিন্তু এতদিন পরে হঠাৎ তোমার কাছে কেন এসেছি—সে কথা তো তুমি জিজ্ঞাসা করলে না।

রামমোহন। সন্তানকে দেখতে এসেছ—এর আর কী জিজ্ঞাসা করব মা?

রামমোহন ॥ হাঁ—কাজ! অফুরন্ত—অজস্র কাজ! দিনরাত কেন চুরাশি ঘণ্টা হয় না, কেন জীবনটাকে বাড়িয়ে নেওয়া যায় না হাজার বছর? (পায়চারি করতে করতে) জান উমা—আমার মরতে ইচ্ছে করে না। কাজের কি শেষ আছে? যেদিকে তাকাই—সেইদিকেই অন্ধকার! চারদিক থেকে শাস্ত্র বিচারের নামে আসছে কুৎসা—বইয়ের পর বই লিখে তার জবাব দিতে হচ্ছে। ক্রীশ্চানদের সমালোচনা করেছি বলে তারা চটে লাল হয়েছে, কয়েকটা কড়া উত্তর দিয়ে পাদ্রী সাহেবদের মুখ বন্ধ করতে হচ্ছে। ওদিকে অ্যাংলো হিন্দু স্কুলের দায়িত্ব। খবরের কাগজের ওপর সরকারী আইনের দাপট—সেটা বন্ধ করতে হলে লড়াই করতে হবে সরকারের সঙ্গে। ভূমি-স্বত্ব আইনের সংস্কার চাই—জুরীর বিচার চাই—রাষ্ট্র-শাসনের ব্যবস্থা সভায় দেশীয় প্রজার প্রতিনিধি চাই—নারীর আইনগত মর্যাদা চাই—উমা—উমা! প্রাচীরের পর প্রাচীর ভাঙতে হবে—দশদিক থেকে আলো আনতে হবে—আনতে হবে মুক্তি। উমা, আমি মরব না—যতদিন কাজ শেষ না হয়—বাঁচতে চাই—বাঁচতে চাই—হাজার বছর, দশ হাজার বছর—

[নেপথ্যে চিৎকার :
বাঁচাও—আমায় বাঁচাও—]

কে? কে?

[একটি মেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে রামমোহনের পায়ে আছড়ে পড়ল]

কে তুমি মা? কী হয়েছে?

মেয়েটি ॥ ওরা আমায় মেরে ফেলবে—আমায় পুড়িয়ে মারবে—বাঁচাও আমায়—

রামমোহন ॥ কোন ভয় নেই—এখানে তোমার কোন ভয় নেই। কিন্তু কে পুড়িয়ে মারবে? কারা তারা?

মেয়েটি ॥ ওই যে—নিমতলার শ্মশান থেকে আমার পিছে পিছে ছুটে আসছে। না—না—মরতে চাই না আমি, আমি সতী হতে চাই না—পুড়ে মরতে পারব না আমি!

উমা ॥ সতী! পালিয়ে এসেছে!

রামমোহন। হাঁ—সতী। উমা—এর নাম ধর্ম। এই হত্যার নাম সমাজ! এর পরিণাম স্বর্গ!

মেয়েটি ॥ আমায় বাঁচাও বাবা—

রামমোহন ॥ বাঁচাব বই কি মা! আমার আশ্রয়ে যখন এসেছ তখন কেউ আর তোমায় ছুঁতে পারবে না। উমা, ওকে নিয়ে যাও—দোতলার কোণের ঘরটায় রেখে দাও। আর আমি এখুনি বেরুচ্ছি একবার—

উমা ॥ সে কি! এমন অসময়ে কোথায় যাবে? বিশ্রাম করলে না, খেলে না—

রামমোহন ॥ সময় নেই—সময় নেই উমা! জীবনে একটা মুহূর্ত নষ্ট করলে চলবে না। বৌদির চিতার কাছে দাঁড়িয়ে একদিন যে শপথ নিয়েছিলাম, প্রায় ভুলতে বসেছিলাম তার কথা। আজ বুঝেছি—একটি মুহূর্ত বিলম্বের অর্থ একটি করে নারী হত্যা! আমি এখনি যাব দ্বারকানাথের কাছে—সেখান থেকে রাজা মথুরানাথ মল্লিকের বাড়ি, তারপরে যেতে হবে রাজনারায়ণ সেনের ওখানেও। সব কাজ ফেলে আগে সতীদাহ আমায় বন্ধ করতে হবে—বন্ধ করতেই হবে—

ক্রমশ

লেখকদের প্রতি

লেখা পাঠাবার সময় দয়া করে ছাপাখানায় কম্পোজিটরদের কথা মনে রাখবেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্ধকার ঘুপচি এক কোণে দৈনিক আট-দশ ঘণ্টা ঠায় বসে বসে আপনাদের লেখা থেকে তাদের অক্ষর গাঁথতে হয়। তাদের দৃষ্টিশক্তির প্রতি একটু মমতা যেন আপনাদের থাকে।

প্রুফ সংশোধকদের কথা। আপনাদের লেখা অযত্নকৃত হলে ভুল সংশোধন করতে করতে তাদের নাজেহাল হতে হয়, একই লেখার প্রুফ বার বার দেখে তবে তাকে সম্পূর্ণ নির্ভুল করতে হয়। তাতে সময়ের যে অপব্যয় হয় তার পরিমাণ নেহাৎ সামান্য নয়।

চারটি সহজ সরল নিয়ম মেনে চললে এই অসুবিধাগুলি দূর হয়:

॥ ১ ॥ কাগজের এক পীঠে লেখা; ॥ ২ ॥ মার্জিন রেখে লেখা, এবং লেখার উপর সমস্ত সংযোজন মার্জিনের উপর করা; ॥ ৩ ॥ বড়, স্পষ্ট অক্ষরে লেখা; ॥ ৪ ॥ ভাল, উজ্জ্বল কালিতে লেখা।

শান্তির স্বপক্ষে

যৌবনের উৎসব

প্রদ্যোৎ গুহ

নাগরদোলা নেই, পাঁচমিশালী হৈ-হল্লা নেই আছে শুধু বাঁশ দড়ি আর ত্রেরপলের কিম্ভূতকিমাকার একটা মণ্ডপ, গুটিকয় চায়ের দোকান, বইয়ের দোকান গোটা ছয়েক আর ভলান্টিয়ার ক্যাম্প। রবাহূত আরও কিছু লোক স্টল খুলে বসেছে মণ্ডপের এলাকার বাইরে আর এসেছে কয়েকটা পানবিড়ি-ওয়ালা, চিনাবাদামওয়ালা, লিপটনের চা আর কাশী বিশ্বনাথ সেবা সমিতির জলের গাড়ি। তবু তার আকর্ষণও কম নয়। একদল বে-ওয়ারিশ বাচ্চা ছেলে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মণ্ডপের আনাচে-কানাচে। ভিতরে ঢোকবার কড়ি জোগাবার সাধ্য নেই, ভলান্টিয়ারদের দাক্ষিণ্যেও আস্থার অভাব অগত্যা তাঁবুর ছিদ্র খুঁজতে হয়। আর এই ছিদ্র দিয়ে ছিটেফোঁটা যা একটু দেখা যায় তাতেই এরা খুশি।

খুশি দেখাচ্ছে সকলকেই। রথচারী আর পদচারী, ছেঁড়া নোংরা কাপড়ের ছেয়ে রঙ, আর ঝলমলে শাড়ির রেশমী ঝিলিক, সযত্নপ্রসাধিত কোমল মুখশ্রীর পাশাপাশি রুক্ষ রোদে-পোড়া গুমোটে মুখ, দামী সিগারেটের খোশবু আর শস্তা বিড়ির ধোঁয়া একাকার হয়ে মিশে গেছে কিন্তু হাসছে সবাই।

আমাদের এই কুড়িতে-বুড়িয়ে-যাওয়া দেশে এত লোককে একসঙ্গে হাসতে দেখি না অনেকদিন। ট্রামে বাসে আজকাল শুধু গম্ভীর স্তিমিত মুখ। রুটিন-মাফিক আনন্দ করতে সিনেমায় যায় মানুষ, খেলার মাঠে ছোটে, সিনেমা নায়িকার হালচাল সম্পর্কে আলোচনায় মুখর হয়, হাসির কথা না হলেও হেসে ওঠে—কিন্তু তাতে প্রাণ নেই। আর সে আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ীও হয় না। যতই লোকে এড়াতে চেষ্টা করুক, বারে বারে এসে পড়ে কতগুলি অস্বস্তিকর কথা—"চালের দাম চুয়াত্ত উঠল—রেশমের কাপড়টা ছেড়ে দিতে হল—যা দাম ছোঁওয়া যায় না"—মুহূর্তে অসহ্য গুমোটে আব-

হাওয়া ভারী হয়ে ওঠে। চিন্তার সর্পিল বলিরেখায় কুৎসিত দেখায় ক্লান্ত মুখগুলি।

কিন্তু এখানে কোন যাদুস্পর্শে প্রাণের রুদ্ধধারা যেন মুক্তি পেয়েছে।

উপচে-পড়া মণ্ডপে যখন অনুষ্ঠান চলেছে তখনও বাইরে ভিড়ের কমতি নেই। জটলা হচ্ছে এখানে সেখানে। ভিড় ভোলা বাগচীর চায়ের দোকানেই বেশি।

কেমন শান্ত দেখাচ্ছে এখন ভোলাদা'কে। সদাহাস্যময় ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ভাঙা দাঁতটাকে দেখা যায়।—পুলিস-দাক্ষিণ্যের নিদর্শন। মজুর এলাকায় কাজ করেন ভোলাদা। অর্ধেক দিন ভাল করে খাওয়া জোটে না। রোদে-পোড়া তামাটে চেহারা। এখন নির্বাপিত অগ্নিগিরির মত শান্ত। হাসি মুখে পয়সা গুনে নিচ্ছেন। বকেয়া পয়সা ফেরত দিতে ভুল হচ্ছে প্রায়ই, অর্থাৎ, প্রাপ্যের চেয়ে বেশি ফেরত দিচ্ছেন। চারিদিকে হাজারো তাগাদা।

দেখি এক কাপ চা—

কি আশ্চর্য! অনেকক্ষণ ধরে যে দাঁড়িয়ে আছি আমি—

কই দিন তো একটা সিগারেট—

না চা-টা পাওয়ার আশা নেই দেখছি—

মণ্ডপের মধ্যে দর্শকদের হাততালিতে চঞ্চল হয়ে উঠেছে কেউ বা।

কি জানি একটা 'মিস্' করলাম—

চায়ের আশা পরিত্যাগ করে মণ্ডপের দিকে ধাওয়া করে কেউ বা। তবু ভিড় কমে না।

কেউ বা ভিড় জমিয়েছে বইয়ের স্টলগুলির সামনে, সিগারেটওয়ালাকে ঘিরে, চিনাবাদামওয়ালার চারপাশে। কেউ বা ভিড় করেছে প্রদর্শনীতে। আঁকা পোস্টার খান কয়, কিছু ফটোগ্রাফ, কিছু সোভিয়েট ও চীনা পোস্টার। এলোমেলো করে সাজান। সব মিলিয়ে কোন বক্তব্য ফুটে ওঠে না।

কেউ বাইরে দাঁড়িয়ে গল্প করছে শুধু—ভিতরে যাবে না। হয়ত গরম, হয়ত বা পয়সা নেই। তবু রোজ আসা চাই।

কি ব্যাপার? বাইরে দাঁড়িয়ে? ভেতরে যাবেন না?

না একটু কাজ আছে—এখুনি চলে যাব—

কিন্তু চলে যায়নি সে। শেষ ট্রাম অব্দি ঘুরে বেড়িয়েছে মণ্ডপের চারপাশে। পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হলে উজ্জ্বল মুখে অভ্যর্থনা জানিয়েছে।

ভেতরে যাবেন না ?

না একটু কাজ আছে, এখুনি চলে যাব—

কিন্তু যায়নি সে। কোন একটা আকর্ষণী শক্তি রোজ তাকে টেনে এনেছে পার্ক সার্কাস ময়দানে।

ভিড়ের মধ্যেই কোন এক চায়ের দোকানে জমিয়ে বসে গেছে কবি পারভেজ শহীদী। নতুন লেখা কবিতা শোনাচ্ছে কাউকে।

আমরা নওজোয়ান সূর্যের কিরণের মত অন্ধকারের দেয়ালকে ভেদ করে এগিয়ে চলি—

কবিতা পড়বার সময়কার পারভেজ অন্য জগতের মানুষ। আকাশে ডানা মেলে দেওয়া পাখীর মত তখন সে কোন শূন্যে বিচরণ করে।

ভিড়ের মধ্যে চোখে পড়বে উৎপল দত্তকে। কোথায় গেছে তার ট্রাউজারের ইস্ত্রি—সার্টটা প্যান্টের উপর ঝুলছে।

নিশিতে-পাওয়া মানুষের মত কদিন ঘুরে বেড়িয়েছে লোকগুলি।

এমনি করে পাঁচটা দিন যে কোথা দিয়ে চলে গেল টেরই পাওয়া যায়নি। সারাদিন হৈ হৈ করে, রাত জেগে ক্লান্তি আসেনি। সারারাত ধরে কবিগান চলেছে, চোখের পাতা এক করেনি কেউ—তবু বিনিদ্র রাত্রির ক্লান্তি উপেক্ষা করে পরদিন আবার তারা এসে হাজির হয়েছে উৎসব মণ্ডপে। পাঁচদিন ধরে চলবার কথা ছিল উৎসব। কিন্তু তাতেও আশা মেটেনি, সকলের দাবিতে অতিরিক্ত আর একদিন উৎসবের আয়োজন করতে হয়েছে। ২৩ থেকে ২৯শে অগস্ট চলেছে উৎসব।

ভারত সরকার বার্লিন যুব উৎসবযাত্রীদের বেশির ভাগকেই ছাড়পত্র দেয় নি। কিন্তু তাতে শাপে বরই হয়েছে। বার্লিনে যেত বড় জোর কয়েক শ' লোক—কিন্তু এখানে রোজ গড়ে দশ হাজার করে লোক উৎসবে যোগ দিয়েছে। বার্লিনের পথরোধ করতে পারেনি সরকার—বার্লিনই উঠে এসেছে কলকাতায়। শান্তির আদর্শ কোন সীমানা মানে না—শান্তিকপোতের কোন পাসপোর্ট দরকার হয় না।

উৎসবের উদ্যোগ-আয়োজনে ২ শতাধিক যুব প্রতিষ্ঠান অংশ গ্রহণ করেছিলেন। আর নাচ গান অভিনয়ের ডালি সাজিয়েছিলেন শ্রীমতী রাধারানী, দেবব্রত বিশ্বাস, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, অজিত বসু, দ্বিজেন চৌধুরী, উৎপলা সেন, সুপ্রীতি ঘোষ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা, আপ্পারাও, আমেদ, ভেঙ্কটেশ, গুরবক্স সিং, এ্যাণ্টনি প্রমুখ শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ থেকে তরুণতম শিল্পী ও ক্রীড়াবিদেরা। উৎসবের ডাকে সাড়া দিতে সুদূর চট্টগ্রাম থেকে ছুটে এসেছেন পূর্ববাংলার শ্রেষ্ঠ কবিয়াল রমেশ শীল ব্যাধি এবং জরাকে উপেক্ষা করে। শেখ গোমানী আসতে পারেন নি—কিন্তু তিনি তাঁর শিষ্য দেবেন দাসকে পাঠিয়েছিলেন প্রতিনিধি হিসাবে। আর এসেছিলেন গম্ভীরা গান নিয়ে মালদহের বিশুয়া সম্প্রদায়। সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিপুরারি চক্রবর্তীর মত প্রবীণেরাও না এসে পারেন নি।

এই উৎসবের মধ্যে কিন্তু প্রত্যহের সমস্যাগুলি চাপা পড়ে যায়নি। নাচে-গানে-অভিনয়ে বারেবারে তার পরিচয় পাওয়া গেছে। গম্ভীরা গানের মধ্যে এসে পড়েছে—

"রঘুপতি রাঘব রাজারাম
একজোড়া কাপড়ের ত্রিশ টাকা দাম—"

ধরনের পংক্তি। না, এখানকার মানুষ দুঃখকে ভুলে থাকার জন্য কৃত্রিম আনন্দে মাতেনি। এখানে ঘোষিত হয়েছে মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রাণের দুর্জয় প্রতিরোধ। যে প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞা নিয়ে কবি রচনা করেন, 'মেশিন গানের সম্মুখে গাই যুঁই ফুলের এই গান'—সেই প্রতিজ্ঞাই এই আনন্দের উৎস।

তাই এ উৎসব পলায়নী বৃত্তি নয়—জীবনের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

তাই এখানে গানে, নাচে, অভিনয়ে বাস্তব সমস্যাকেই তুলে ধরা হয়েছে। বিজন ভট্টাচার্যের হিন্দু মুসলিম একতার গান, দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মশাল' নাটক কিংবা কোরিয়ার নব জাগরণের নৃত্যনাট্য সার্থক শিল্পের মাধ্যমে বাস্তব সমস্যার উপরই আলোকপাত। তাই এই উৎসবের মধ্যেই যখন ডালহৌসী স্কোয়ারে ছাত্র মিছিলের উপর পুলিসী হামলার সংবাদ এসেছে বজ্রকণ্ঠে সমগ্র জনতা তার প্রতিবাদ জানিয়েছে।

খেলাধুলা, বক্তৃতা, আবৃত্তি, অভিনয়ে অনুভব করেছি এক দৃপ্ত ঘোষণা—যৌবন পরাজয় মানবে না। যুব-সমাজ বাঁচতে চায়, বাঁচতে চায় মানুষের

মত, হাসতে চায়, খেলাধূলা করতে চায়—মানুষের আনন্দ কেড়ে নেবার চক্রান্তকে তাই তারা ব্যর্থ করবে। আর এইটাই ছিল যুব উৎসবের অন্তর্নিহিত বাণী।

কিন্তু তবু কতগুলি ত্রুটির দিকও থেকে গেছে সমগ্র অনুষ্ঠানের মধ্যে—খেলাধূলা, আবৃত্তি ও সংগীত প্রতিযোগিতা যথেষ্ট প্রাধান্য পায়নি। অথচ যুব-সমাজকে উৎসবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করাবার এইগুলোই ছিল সবচেয়ে কার্যকরী পথ। অভিনয়ে, নৃত্যে, গীতে উপযুক্ত প্রস্তুতির অভাব সর্বদাই চোখে পড়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হল, এই উৎসবের মধ্য দিয়ে যুব-সমাজের একটা বিপুল অংশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হল—এখন প্রয়োজন সে যোগাযোগকে সাংগঠনিক রূপ দেওয়া। এরই উপর উৎসবের সাফল্য নির্ভর করছে।

পুস্তক পরিচয়

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান আলোচনা

প্রাণতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব ॥ অধ্যাপক সন্তোষকুমার সামন্ত ॥ দাশগুপ্ত এণ্ড কোং ॥ তিন টাকা ॥

ফ্রয়েড ও বর্তমান চিন্তাধারা ॥ সত্যনারায়ণ লাহিড়ী, এম, এ ॥ ৩, গোপাল শাস্ত্রী লেন, কলিকাতা ॥

ভারি ভাল লাগল "ফ্রয়েড ও বর্তমান চিন্তাধারা" বইটি। বলবার কথাটুকু স্পষ্ট, বলবার কায়দায় এতটুকুও জড়তা নেই। অথচ, এই রকম একটা বিষয় নিয়ে বাংলায় বই লেখবার অনেক রকম বিপদ আছে। প্রধান বিপদ হল, পাঠক-সাধারণের চাহিদাটুকু ভুলে যাবার ভয়। নানান দিক থেকে ভুলে যাবার ভয়। লোভ লাগতে পারে পাণ্ডিত্যের জৌলুস দেখিয়ে পাঠক-সাধারণের মনে তাক লাগিয়ে দেবার, কিংবা শুকনো মতবাদগত কূট-আলোচনা তুলে নিছক আত্মতৃপ্তি খোঁজবার;—এ-জাতীয় লোভে পড়লে বইটি ব্যর্থ হতে বাধ্য। কিন্তু এর চেয়েও গুরুতর বিপদ আছে, যে বিপদের ফাঁদে পড়লে বইটি শুধু ব্যর্থ হবে না, সাধারণ পাঠকের পক্ষে ক্ষতিকরও হবে। যৌন মনস্তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এই বিপদে আমি নিজে পড়েছিলাম এবং সত্যনারায়ণবাবু সমাজ চেতনার নির্ভয়ে অনায়াসে সে বিপদ এড়িয়ে যেতে পেরেছেন দেখে এই অবসরে তাঁকে ব্যক্তিগত অভিনন্দন জানাবার আগ্রহ অনিবার্যভাবেই বোধ করেছি। বিপদটার কথা একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের মধ্যে একটা মোহ-মাদকতার দিক আছে। কেননা ফ্রয়েড বলছেন, সহজ চোখে সাধারণ সামাজিক মানুষকে যে-রকম দেখতে সেটা তার আসল চেহারা নয়; প্রত্যেক মানুষেরই মনের মধ্যে একটা গভীর অজানা প্রদেশ রয়েছে এবং সেই প্রদেশের কয়েকটি নিগূঢ় ইচ্ছে মানুষের এই সামাজিক রূপটা নিয়ে যেন পুতুলনাচ নাচাচ্ছে। যেমন ধরুন, সামাজিক ভাবে কেউ বা রাজনৈতিক, কেউ বা অস্ত্র-চিকিৎসক। কিন্তু ফ্রয়েড বলবেন, যিনি রাজনীতিক তাঁর উৎসাহটা রাজনীতি নিয়ে নয়; যিনি অস্ত্র-চিকিৎসক তাঁর আসল উৎসাহটা অস্ত্র-চিকিৎসা নিয়ে নয়। নির্জ্ঞান

মনের একেবারে জাত-আলাদা উৎসাহ মানুষগুলোর সামাজিক চেহারাকে এই রকম নানা ছাঁচে ঢালবার ব্যবস্থা করে। আপনি যদি নিজেকে জানতে চান, তাহলে ওই নির্জ্ঞান-রহস্যের একটা হদিস পেতে হবে। এই নির্জ্ঞান মনের কথাটা সত্যি কথা না অতিকথা, তা নিয়ে এক কথায় কোনো মন্তব্য করতে যাওয়াটা বিজ্ঞানসহ হবে না; বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে এ-সমস্যার সমালোচনা হওয়া উচিত। কিন্তু ফ্রয়েডের এই যে দাবি, করিকু সমাজের বাসিন্দাদের কাছে এর একটা দারুণ নেশা আছে; রহস্য-উপন্যাস পড়বার সময় সমাজের নীচের মহলটার বিকৃত আর অসুস্থ উত্তেজনার মুখোমুখি হবার যে নেশা সেই রকমের নেশাই। তাই ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব নিয়ে দীর্ঘ বর্ণনা ফাঁদবার সামাজিক ফলাফলটা মারাত্মক। জনসাধারণের মনে এই মোহ-মাদকতা জাগানো—জনসাধারণের যেটা আসল চাহিদা তার ঠিক উল্টো কাজ। জনসাধারণের আসল চাহিদা হল সমাজব্যবস্থার গ্লানি দূর করে স্বাস্থ্য, শান্তি আর প্রাচুর্যে পূর্ণ নতুন জীবনের দিকে অগ্রসর হবার চাহিদা; নিজের মনের কোণায় কী রকম বিকৃত আর গূঢ় রহস্য তার কল্পনায় মশগুল হওয়া নয়। তর্ক করে কেউ হয়ত বলবেন, নির্জ্ঞানের এই গূঢ় রহস্য হল বৈজ্ঞানিক বাস্তব, fact; অতএব জনসাধারণের মধ্যে এর প্রচার অকল্যাণকর হতে পারে না। উত্তরে বলব, প্রথমত, ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞান তত্ত্ব সত্যিই বৈজ্ঞানিক বাস্তব কি না তার বৈজ্ঞানিক মীমাংসা হওয়া দরকার; দ্বিতীয়ত, যদিই বা একে বৈজ্ঞানিক বাস্তব বলে প্রমাণ করা যায়, তাহলেও এ নিয়ে মশগুল হওয়া সামাজিক কল্যাণের পরিপন্থী: কামবিকার, অপরাধবৃত্তি প্রভৃতি নানান ব্যাপার তো আমাদের জানা আছে যা ফ্যাক্ট,অথচ যার প্রচার মানুষের মনকে বিকারমুখী করে। তাছাড়া মনে রাখতে হবে, হাল দুনিয়ার যেটা চরম অবক্ষয়ের ঘাঁটি—মার্কিন মুলুক—সেখানেই আজ ফ্রয়েডীয় মতবাদের সবচেয়ে উৎসাহী প্রচার; হাল দুনিয়ায় যে-দেশে সবচেয়ে সুস্থ জীবন—সোভিয়েট দেশ—সেখানে ফ্রয়েডীয় মতবাদ নিয়ে কোনো উৎসাহের খবর আমরা পাই না।

অবশ্য, সত্যনারায়ণবাবুর বইটি ছোট্ট বই, মাত্র ১০৬ পৃষ্ঠা। এইটুকুর মধ্যে ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞান তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক মূল্য বিচার সম্ভব নয়। লেখক সে চেষ্টা করেন নি। শুরুতে ফ্রয়েডের জীবনী এবং ফ্রয়েডীয় মতবাদের একটি ছোট্ট—অথচ স্পষ্ট—কাঠামো, দিয়েছেন; তার মধ্যে

নীতিমূলক মন্তব্যও নেই আবার মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহও নেই; শুধু বর্ণনা। এবং তারপর সোজাসুজি আলোচনা তুলেছেন ফ্রয়েডীয় মতবাদের মধ্যে সমাজতত্ত্ব এবং দার্শনিক দিকগুলি নিয়ে। পাঠক-সাধারণের পক্ষে এই দিকগুলির মূল্য-বিচারই সবচেয়ে বেশি দরকার, কেননা এর সঙ্গে সামাজিক সত্তা এবং জীবন-আদর্শ সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যুক্ত। তাই নির্জ্ঞানের রহস্য নিয়ে মশগুল হবার বদলে সোজাসুজি এই সামাজিক ও দার্শনিক দিকগুলির আলোচনা তুলে সত্যনারায়ণবাবু প্রমাণ দিয়েছেন—শুধু লেখবার কায়দায় নয়, বিষয়বস্তুর দিক থেকেও সাধারণ পাঠকের যেটা আসল চাহিদা সে সম্বন্ধেও তিনি সচেতন। এর মধ্যে চারটি পরিচ্ছেদ বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য—"ফ্রয়েডের ধর্মমত", "আদিম সমাজ-ব্যবস্থার রূপ ও প্রকৃতি", "ফ্রয়েডের দৃষ্টিতে শিল্পীর ধর্ম" এবং "মার্কসীয় দৃষ্টিতে ফ্রয়েড"। বাংলা ভাষায় ফ্রয়েডীয় মতবাদের এই দিকগুলি নিয়ে এমন স্পষ্ট আর এমন সুস্থ আলোচনা এই প্রথম। পাণ্ডিত্যের অভিমান নেই, কিন্তু ফাঁকিও নেই! আলোচনা-প্রসঙ্গে অন্যান্য চিন্তাশীলদের কথা যখন উঠেছে তখন পড়বার সময় একটুও হোঁচট খেতে হয় না। এই ছোট্ট বইটি পাঠক-সাধারণের মনে আগ্রহ জাগাবে এবং লেখকের মন্তব্যগুলি নিছক বাক্যময় উচ্ছ্বাস নয় বলেই—অত্যন্ত দায়িত্বশীল মন্তব্য বলেই—বিশেষজ্ঞ মহলে মৌলিক ও সুস্থ সমস্যার অবতারণা করবে।

শ্রীসন্তোষকুমার সামন্তর "প্রাণতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব" একেবারে উল্‌টো ধরনের বই। মলাটের ওপর বড় হরফে জানান হয়েছে লেখক একজন অধ্যাপক, ৬৯ পাতার মধ্যে দীর্ঘ ৪ পাতা পরিভাষার ফর্দ (তাও নেহাতই নৈরাশ্যজনক পরিভাষা), অতটুকু বইয়ের দাম তিন টাকা; লেখবার ঢঙ্‌টা ঘোরাল, আড়ষ্ট। পাণ্ডিত্য জাহির করবার প্রায় অধৈর্য আগ্রহ। কতকগুলো শক্ত শক্ত মতবাদ নিয়ে নাড়াচাড়া করে পাঠকদের তাক লাগিয়ে দেবার চেষ্টা। কিন্তু এ বই-এর পাঠক ঠিক কে? কার জন্যে লেখা বই? সাধারণকে আতঙ্কিত করবার এতো আয়োজন থেকেই প্রমাণ যে সাধারণ পাঠকের জন্যে বই নয়। তাহলে কি বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের জন্যে বই? তাও নিশ্চয়ই নয়: কেননা লেখকের লম্বাচওড়া মন্তব্যগুলি প্রায়ই এমন খেলো, বলবার কথাটা প্রায়ই এমন অস্পষ্ট আর ঘোলো, যে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতমহল নিশ্চয়ই এ বই নিয়ে সময়ের অপব্যয় করবে না। খুঁটিয়ে সমালোচনা করবার

দরকার নেই ; যে কোনো পাতা খুললেই লেখবার নমুনায় মন বিরক্ত হয়ে উঠবে :

> "যেমন ধরা যাক, ফ্রয়েড এবং তাঁর অনুবর্তী বহু মনস্তাত্ত্বিক সহজাত বৃত্তির কথা বলেছেন। এই সহজাত বৃত্তি অন্তঃস্থ কতকগুলি ব্যবহারিক প্রকরণ।...ইহা কোনো সাপেক্ষ প্রতিবর্ত নয়। তবে প্রতিবর্তের মতো দেহের একটি বিশেষ ধর্ম। ইহা প্রতিবর্তের চেয়ে বেশী জটিল এবং বহু কার্যের পরিবেশে সংরক্ষিত উদ্দেশ্যমূলক লক্ষণ বলে মনে হয়।..."

কিছু বুঝলেন? বইটির আগাগোড়াই এই রকম। সুকুমার রায়ের "চলচ্চিত্ত চঞ্চরী" মনে পড়ে—কিন্তু সন্তোষবাবু মনোবিজ্ঞ অধ্যাপক, পাঠকদের কাছে হাসির খোরাক যোগান সত্যিই তাঁর উদ্দেশ্য নয়।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

চলচ্চিত্র

বাংলা ফিল্ম্ '৪২

প্রযোজনা : ফিল্ম্ ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়া ॥ কাহিনী ও পরিচালনা : হেমেন গুপ্ত ॥

ছবিটির সব চেয়ে বড় প্রশংসার দিক হচ্ছে ছবির বিষয়রূপ ও বাস্তবনিষ্ঠ রূপায়ণ। ছবির গল্পাংশে ত্রুটি আছে কি নেই, '৪২-এর আন্দোলনকে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করা হয়েছে তা সঠিক কি সঠিক নয়—এসব প্রশ্ন থাকা সত্ত্বেও একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতে হবে যে বাংলা ছবিতে ঘটনার এমন প্রাণস্পর্শী রূপায়ণ বিরল। ইংরেজীতে যাকে বলে 'ভিভিড্'—এক কথায় এই ছবিটি হচ্ছে তাই। আর এটা সম্ভব হয়েছে বিশেষ করে দুজন অভিনেতার অপূর্ব অভিনয়-নৈপুণ্যের জন্যে। এই অভিনেতা দুজনের একজন মেজর ত্রিবেদীর ভূমিকায় বিকাশ রায়, অপরজন দাশু কামারের ভূমিকায় শম্ভু মিত্র, ছবির এই দুই প্রান্ত-চরিত্র এত বেশি প্রাণবন্ত যে দর্শকের মনে গভীর রেখাপাত করে।

'৪২ ছবির সঙ্গে আমাদের দেশের সেন্সর-ব্যবস্থার যে লজ্জাকর ইতিহাস জড়িত আছে তা সর্ববিদিত। সেন্সরের রাহুমুক্ত করবার জন্যই হয়ত ছবির আরম্ভে ও শেষে লম্বা বক্তৃতা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই দুই বক্তৃতায় '৪২ আন্দোলনের যে অনৈতিহাসিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়।

'৪২-এর আন্দোলন বলে যাকে চিহ্নিত করা হয় তা ছিল মূলত একটা স্বতঃস্ফূর্ত নেতৃত্বহীন গণবিক্ষোভ। এই গণবিক্ষোভ কোন সময়েই সংঘবদ্ধ গণ-আন্দোলনের রূপ নেয়নি, কি করলে নেওয়ানো যেত, আর নিলে কি হত —এসব প্রশ্ন '৪২ ছবির আলোচনা-ক্ষেত্রে অবান্তর। এই গণবিক্ষোভকে দমন করবার জন্যে পুলিসী ও মিলিটারি অত্যাচার বর্বরতার চরমে পৌঁছেছিল। কিন্তু '৪২ আন্দোলনের সবচেয়ে বড় তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, এই প্রথম জনসাধারণ সশস্ত্র প্রতিরোধের পথে পা বাড়িয়েছে। রাজনৈতিক নেতৃত্বহীনতার বিভ্রান্তি সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ এগিয়ে গেছে হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই

নিয়ে। রেলের লাইন উপড়িয়েছে, পোস্ট-আপিস, মিলিটারি ক্যাম্প পুড়িয়েছে, টেলিগ্রাফের তার কেটেছে। গণ-প্রতিরোধের এই সশস্ত্র রূপ ভারতের জাতীয় আন্দোলনে ব্যাপকভাবে এই প্রথম। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী প্রতীকের বিরুদ্ধে এমন জলন্ত ও সক্রিয় ঘৃণা ইতিপূর্বে অন্য কোন আন্দোলনে দেখা যায়নি।

পরিচালক হেমেন গুপ্ত '৪২ আন্দোলনের এই মূল তাৎপর্য ধরতে পারেন নি। ছবিতে দেখা যায় যে একদল অহিংসাব্রতী অসহায় ভাবে শুধু মার খাচ্ছে। এমন কি, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সেই ঘৃণাও কোথাও ফুটে ওঠেনি। ছবির শেষ দিকে যখন জনতা মিলিটারি ক্যাম্প দখল করতে চলেছে এবং যখন মিলিটারি রাইফেলের গুলিতে বহু লোক নিহত—তখনো শহীদদের মৃতদেহের চারপাশে জড়ো-হওয়া লোকগুলোকে কতকগুলি পুতুল বলে মনে হয়। ক্রোধ, ঘৃণা বা কোন রকম আবেগ কারও চোখে মুখে ফুটে ওঠেনি। মিলিটারি ক্যাম্প দখল করবার যে পদ্ধতি দেখানো হয়েছে তা '৪২ আন্দোলনের বাস্তব রূপ তো নয়ই, সাধারণ বিচারেও প্রায় হাস্যকর।

বাস্তব রাজনৈতিক পটভূমি নেই বলেই '৪২ ছবিটি দর্শককে উজ্জীবিত করতে পারে না। ছবিটি হয়ে উঠেছে মিলিটারি অত্যাচারের দলিলপত্র। যদি এই সীমাবদ্ধতাটুকু ধরে নেওয়া যায়, তবে নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে '৪২ ছবি অপূর্ব। সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের এমন বাস্তব রূপায়ণ অন্য কোন ভারতীয় ছবিতে হয়নি। এবং এই সীমাবদ্ধ অর্থে ছবিটি নিশ্চয়ই প্রশংসাযোগ্য।

অভিনয়ের দিক থেকে বিকাশ রায় ও শম্ভু মিত্রের অতুলনীয় অভিনয়ের কথা আগেই বলা হয়েছে। মঞ্জু দে, সুরুচি সেনগুপ্ত ও কালী সরকারের অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

কালী সরকার অভিনীত মণ্ডল চরিত্রটি মেজর ত্রিবেদী ও দাশু কামারের মতই আর একটি টাইপ চরিত্র। এক সময়ে যারা ইংরেজের হয়ে গুপ্তচরের কাজ করেছে, তারাই সুযোগ বুঝে গান্ধীটুপি চাপিয়ে 'ইংরেজ ভারত ছাড়' হাঁক ছাড়ছে—এ দৃশ্য আমাদের দেশে রূঢ় বাস্তব।

অমল দাশগুপ্ত

সংস্কৃতি সংবাদ

'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের' কয়েকটি অনুষ্ঠান

'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের' উদ্যোগে সম্প্রতি যে সব অনুষ্ঠান হয়ে গেছে তার মধ্যে 'বুধবারের বৈঠকে' শ্রীমানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ছোট গল্পের আঙ্গিক" সম্পর্কিত আলোচনা, ম্যাক্সিম গর্কীর মৃত্যু-দিবস পালন, ২২শে শ্রাবণ উপলক্ষে রবীন্দ্র-সংগীতের আসর আগের দিনের এ ধরনের অনুষ্ঠান-গুলির মত অনেকেরই বেশ ভাল লেগেছিল। কিন্তু বাঙালী সংস্কৃতি অনুরাগীদের পক্ষে বিশেষ করেই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল বর্তমান উর্দু কাব্য-জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি জোশ মালিহাবাদী ও তাঁরই সুযোগ্য অনুচর কবি সাগর নিজামীর কবিতা আবৃত্তির আসর। সেদিনকার প্রাণ মাতানো আব-হাওয়ায় হাঁফ ছাড়বার সৌভাগ্য হয়েছিল যাঁদের তাঁরাই এ কথা নিঃসংকোচে মানবেন যে উর্দু 'মুশায়রা'র কবি ও একেবারে সাধারণ মানুষের যোগাযোগ যেমন প্রত্যক্ষ ও প্রাণোজ্জ্বল, তুলনায় স্বল্পপ্রাণ আধুনিক বাংলা কবির পক্ষে তা কল্পনাতীত ঈর্ষার স্থল।

আর একটা কথা। উর্দু 'মুশায়রা' যেমন শুনবার, তেমনই দেখবার জিনিসও বটে—বিশেষ করে কবি যখন জোশের মত আশ্চর্য অভিনয়দক্ষতার অধিকারী। মালিহাবাদীর আত্মপ্রত্যয় প্রায় রাজোচিত—আসর জাঁকান স্বাভাবিক অধিকার—অপূর্ব তাঁর কণ্ঠের সুমিষ্ট গাম্ভীর্য। এরই সঙ্গে তাঁর চোখ, মুখ, হাতের ব্যঞ্জনাময় ভঙ্গিমা কখনও মূর্ত করে তোলে তাঁর প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ, বা সুতীব্র বেদনাকে, কখনও বা শানিত করে ছবির সমাজ বা অপদার্থ শাসন-ব্যবস্থার প্রতি নিক্ষিপ্ত তাঁর শ্লেষ বাণ-সন্ধানকে। কবিতাপাঠে অভ্যস্ত বাঙালীর পক্ষে ভাষাগত অপরিচয়ের ব্যবধান পেরিয়ে এ তাই এক নতুন আনন্দময় অভিজ্ঞতা।

কবিতা পড়ার পরোক্ষতা ও কবিতা শোনার প্রত্যক্ষতা লক্ষ্য করে কিন্তু আমাদের একেবারে হতাশ হবার কারণ নেই। জনসাধারণের মনের দরবারে

অক্ষরের মধ্যস্থতায় নয়, কান মারফৎ পৌঁছনোর রেওয়াজ যে বাংলা দেশেরও আছে সম্প্রতি যুবছাত্র শান্তি-সম্মেলন-উপলক্ষে কবিয়াল রমেশ শীল সে কথাই আবার আমাদের মনে পড়িয়ে দিলেন। ১৯৪৫ সালে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের তৃতীয় সম্মেলনের পর এই বোধহয় তাঁর দ্বিতীয়বার এ শহরে পদার্পণ। দেখা গেল শহুরে মানুষের চিত্ত জয় করার আশ্চর্য যাদু আজও তাঁর মুঠোর মধ্যে।

কবিগানের ঐতিহ্যের কথা বাদ দিলেও আধুনিক বাঙালী কবিরাও যে চোখ থেকে কানের দিকে ঝুঁকেছেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেল প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি কবিতার আসরে। এখানে প্রায় পনেরো-কুড়িজন তরুণ কবি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করলেন কাব্যামোদীদের সামনে। উর্দু 'মুশায়রা'র প্রচণ্ডতার পাশে যাঁদের এ আসরকে কিঞ্চিৎ ফিকে লেগেছিল, তাঁরাও মানবেন যে এ অভিজ্ঞতা ফাঁকা নয় মোটেই—যথেষ্ট সম্ভাবনায় ভরাট। এ আসরেই প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের অঙ্গ হিসাবে একটি কবি-সমিতি নির্বাচিত হল—যার কাজ হবে মাঝে মাঝে এ ধরনের আসর জমানো ও কবিতার নানা খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা। প্রবীণ, তরুণ, প্রতিষ্ঠিত, নবাগত, সব মত ও পথের কবিদের যদি এভাবে জড়ো করা যায় রস-পরিবেশনের আসরে তবে বাংলা কাব্যের রক্তহীনতা কাটাবার আশা মোটেই দুরাশা হবে না।

'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের' উদ্যোক্তাদের মধ্যে চতুর্থ সম্মেলনের পর আবার নতুন করে যে কর্মচাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে, তাতে প্রগতিশীল ব্যক্তিমাত্রই —বিশেষ করে সংস্কৃতি-অনুরাগীরা নিশ্চয়ই উৎসাহিত বোধ করবেন।

বিদেশে বাংলার সংস্কৃতি-দূত

বাংলা থেকে যে সংস্কৃতি-দূতেরা সোভিয়েট ইউনিয়নে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ডাঃ অমূল্যচরণ উকিল, শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলনাবীশ ও শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার দেশে ফিরে এসেছেন। শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীনিমাই ঘোষের মত রঙ্গমঞ্চ ও সিনেমা-শিল্পীরাও শীঘ্রই রওনা হবেন। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে এঁরা অবশ্য সৌভাগ্যবান, কারণ 'স্বাধীন' ভারত থেকে 'লৌহ যবনিকা'র অন্তরালের দেশে যাবার ছাড়পত্র পাননি অনেক বিখ্যাত সংস্কৃতিবিদই। বার্লিন যুব-উৎসবে

যোগদানেচ্ছু অনেকের মধ্যে তেমনই মাত্র তিন-চারজনের কপালে শিকে ছিঁড়েছে। এঁদের মধ্যে সুচিত্রা মিত্রের নাম রবীন্দ্রসংগীত-অনুরাগী মহলে নতুন করে করার প্রয়োজন নেই। এঁরা এখনও দেশে ফেরেননি।

ভারত ও সমাজবাদী দুনিয়ার মধ্যে এই ধরনের সাংস্কৃতিক দূত বিনিময়-চেষ্টায় বাধাদান ভারত সরকারের পক্ষে নতুন নয়। ১৯৪৯ সালে নিখিল ভারত শান্তি-সম্মেলন উপলক্ষে টিখনভ প্রমুখ যে সব বিখ্যাত সোভিয়েট সাহিত্যিক এ দেশে আসছিলেন করাচী থেকে তাঁদের ফিরে যেতে হয় 'অহিংস প্রাচীরের' ধাক্কায়। পাব্লো নেরুদার মত জগদ্বিখ্যাত কবিও যখন ১৯৫০ সালে এ দেশে আসেন, তখন তাঁর গতিবিধির উপর ভারত সরকার যে নিষেধাজ্ঞা জারী করেন তাতেও 'অহিংস' গণতন্ত্রেরই পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পায়।

তবু এত প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে যাঁরা অবশেষে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পেরেছেন একধরে দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক লেনদেন মারফৎ তাঁরা দেশবাসীর ভুল ধারণা নিরসন ও চিত্তবৃত্তির সম্প্রসারণে প্রচুর সাহায্য করতে পারবেন। দেশে ফিরে এসে এঁরা যা বলছেন, প্রতিকূল চেষ্টা সত্ত্বেও প্রতিদিনকার খবরের কাগজ নানা স্তরের মানুষের কাছে কিছুটা তা পৌঁছাচ্ছে—স্পষ্ট করে তুলছে 'লৌহ যবনিকার' রহস্য। এঁরা ও এঁদের নিমন্ত্রণকারী সোভিয়েট দেশ তাই আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

বিশ্বশান্তি-কংগ্রেস নানা জাতির মধ্যে সাংস্কৃতিক দূত-বিনিময়ের যে প্রস্তাব করেছিলেন তার প্রয়োজন ঠিক এই জন্যই। যুদ্ধ বাধাবার শয়তানী ফিকিরে যাদের চোখে ঘুম নেই তাদের কাজ হাসিলের মস্ত উপায় হচ্ছে অপরিচয়ের সুযোগে দুটো দেশের মধ্যেকার সম্পর্ক বিষিয়ে দেওয়া। সোভিয়েট ইউ-নিয়নের উদ্যোগের ফলে অন্তত কয়েকজন সৌভাগ্যবানও যে সে দেশের সত্য দেশবাসীর কাছে বয়ে আনতে পারলেন এ একটা মস্ত লাভ। এখন প্রয়োজন অনুপস্থিত লৌহ যবনিকার অন্তরালের মানুষগুলোর আরো বেশি পরিচয় পাবার ব্যবস্থার জন্য সরকারের উপর সমস্ত সংস্কৃতিবিদদের মিলিত চাপ।

পল্লীকবি নিবারণ পণ্ডিত

নিবারণ পণ্ডিত বাংলার একজন সুপরিচিত পল্লীকবি। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে তিনি একজন অগ্রণী সৈনিক। কিছুদিন আগে তিনি পূর্ব

পাকিস্তানের জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। সম্প্রতি তাঁর কাছ থেকে আমরা একটি চিঠি পেয়েছি। চিঠির কিছু কিছু অংশ নীচে দেওয়া হল :

"বর্ত্তমানে আমি পরিবারের ছোট বড় আটজন লোকসহ বাস্তহারা ও সর্বহারা হইয়া উত্তর-বঙ্গে নিম্ন ঠিকানায় আছি। আমার সব গিয়াছে ; বাড়ি ঘর, জিনিসপত্র ও আমার জীবনের লিখা সমস্ত গান কবিতা পুঁথি পুস্তক ইত্যাদি সবই গিয়াছে। যদিও স্বাধীনতা ও দাঙ্গার কল্যাণে আমার এই অবস্থা ঘটিয়াছে, তথাপি একথা ভুলিবার নয় যে আমার পাড়া প্রতিবেশী প্রায় প্রত্যেকটি মুসলমান অকথ্য লাঞ্ছনা ও সামাজিক চাপ সহ্য করিয়া আমাকে বহুদিন বিভিন্ন প্রকারে সাহায্য সহায়তা করিয়া রক্ষা করার চেষ্টা করিয়াছেন এবং অবশেষে তাঁহারা আমাকে চলিয়া আসার জন্য দুঃখিত মনে বিদায় দিয়াছেন। এখানে পৌঁছার পর সাতটি পয়সা মাত্র সম্বল ছিল। সাহায্য সহায়তা পাবার মত কোন আত্মীয়-স্বজনের সন্ধান জানা ছিল না। ঐ অবস্থায় জীবন ধারণের জন্য আমার শিশু ছেলেদের বিড়ির কাজ দেই এবং আমি "বাস্তহারার মরণকান্না" নামক একটি গানের বই ও কোচবিহারের গোলাগুলির ঘটনার উপর একটি কবিতা লিখিয়া এক নূতন বন্ধুর সাহায্যে প্রকাশ করিয়া কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার অঞ্চলের হাটে বাজারে ও রেল-গাড়িতে বিক্রি করিয়া ঐভাবে দৈনিক উপায় দ্বারা কোনমতে চলিতেছে। এ যাবৎ ছাব্বিশ হাজার বই বিক্রি হইয়াছে। দৈনিক উপায় না করিলে পরিবার চলে না।...

নিবারণ পণ্ডিত
C/o শ্রীহেমেন্দ্র সেন
পোঃ আলিপুরদুয়ার
শান্তিনগর
জিলা : জলপাইগুড়ি।"

নিবারণ পণ্ডিত একদিন তাঁর গান দিয়ে সারা বাংলা দেশে সাড়া জাগিয়ে-ছিলেন। বাংলার জনসাধারণ আজ দুঃখের দিনে তাঁর পাশে দাঁড়াবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

চিন্মোহন সেহানবীশ

পাঠকগোষ্ঠী

'পরিচয়'-পাঠকদের কাছ থেকে নানা বিষয়ে চিঠিপত্র পাওয়া যাচ্ছে—এটা 'পরিচয়'-এর পক্ষে খুব উৎসাহজনক। পাঠকদের সঙ্গে আমাদের লেখকদের যোগাযোগ যাতে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে তার জন্যে এই পাঠকগোষ্ঠী-বিভাগটিকে আমরা সুপরিকল্পিত ও নিয়মিত ভাবে চালাতে চাই। কিন্তু পাঠকদের কাছে বিশেষ অনুরোধ—'পরিচয়'-এর সংকীর্ণ পরিসরের কথা মনে রেখে তাঁরা যেন তাঁদের বক্তব্য যথাসম্ভব সংক্ষেপে লিখে পাঠান। খুব বড়ো চিঠি হলে সেটা সংক্ষিপ্ত করে ছাপবার অধিকার সম্পাদকের থাকবে। বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে পত্র-লেখকের মতামতকে যথাসাধ্য অক্ষুণ্ণ রাখা হবে, কিন্তু সেই মতামতের জন্যে সম্পাদক দায়ী থাকবেন না।

রামমোহন ও বিদ্যাসাগর

আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় "পরিচয়"-এ এল, আই, ইউয়েরোভিচ্ কর্তৃক মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে লিখিত স্যার সৈয়দ আহ্মদ খাঁ শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করে অনেক কিছুই জানতে পারলাম। এই ধরনের জীবনী-প্রবন্ধ প্রতিমাসে একটি করে থাকলে পরিচয়ের গৌরব বৃদ্ধি পাবে বলে বিশ্বাস করি।

এই প্রসঙ্গে নিবেদন—মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কোন সোভিয়েট পণ্ডিতের রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে কোন প্রবন্ধ থাকলে তার অনুবাদ "পরিচয়"-এ অনতিবিলম্বে প্রকাশ করলে বড়ই উপকৃত হব। শুধু আমি নয়—আমার মত অনেকেই উপকৃত হবেন।

খড়্গপুর থেকে শ্রীপদ্মলোচন বসু যা লিখেছেন তা আমি সমর্থন করি। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে কেউ কেউ লিখেছেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর সম্পর্কে কেউ লিখেছেন বলে মনে হয় না। শ্রীঅমিত সেন তাঁর "Notes on Bengal Renaissance" পুস্তিকায় বিদ্যাসাগর সম্পর্কে কিছু লিখেছেন। কিন্তু তা মোটেই বিশদ কিছু নয়।

ললিত হাজরা
বর্ধমান

* সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান-পরিষদের 'প্যাসিফিক ইনস্টিটিউট' ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা ও সে সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ আরম্ভ করেছেন। রামমোহন সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা সেখান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। রামমোহন সম্বন্ধে এই মূল্যবান নিবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ আগামী শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। —সম্পাদক।

পদ্য-কবিতা আর গদ্য-কবিতা

আষাঢ়ের "পরিচয়"-এ শ্রীপূর্ণেন্দু বাগচী গদ্য-কবিতার কবিত্বেই সন্দেহ করেছেন। "কবিতাগুচ্ছে"র অধিকাংশ গদ্য-কবিতাই তাঁর এবং তাঁর পরিচিত কাব্যানুরাগীদের ভাল লাগে না। আমারও লাগে না।

পূর্ণেন্দুবাবু বলেছিলেন, ওটা নূতনত্ব-বিলাসের ফল, ছন্দে অক্ষমতার ফল। 'কবিতাগুচ্ছে'র বেশীর ভাগ গদ্য-কবিতা অবশ্য সে রকম হতে পারে, কিন্তু গদ্য-কবিতামাত্রই কি তাই? বিমলচন্দ্র ঘোষের "ক্ষুধা" (গদ্য-কবিতা) পড়েন নি পূর্ণেন্দুবাবু? "ক্ষুধা" কবিতায় মুগ্ধ হতে দেখেছি এমন বহু লোককে যাঁরা গদ্য-কবিতার নাম শুনলে মারমুখো হন। "ক্ষুধা" বেরিয়েছিল "পরিচয়"-এই। সুকান্তের ওপরে লেখা সুভাষ মুখোপাধ্যায় আর ঔপন্যাসিক মানিকবাবুর গদ্য-কবিতা দুটির জনপ্রিয়তাও তাঁকে স্মরণ করতে বলি। রবীন্দ্রনাথের "পৃথিবী" তো অবিস্মরণীয়।

ছন্দে অক্ষমতা গদ্য-কবিতা লেখার মুখ্য কারণ আদৌ নয়। লোকে একদা বলত, ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে—মিল দিতে না পেরে মাইকেল অমিত্রাক্ষরের কায়দা নিয়েছেন। কথাটা, হাসির হলেও, মনে পড়ছে পূর্ণেন্দুবাবুর লেখা পড়ে। কোনো কিছুতে অক্ষমতার জন্যে কি কেউ কস্মিনকালে কাব্য-রচনা করেছে কোনো দেশে? প্রকাশের তাগিদেই আপন আপন অভ্যস্ত মাধ্যমে শিল্পীরা সৃষ্টি করেন আর্ট। অক্ষমতার কথাটা উঠছে কেন? —যদিও নানা শিল্পীর অক্ষমতা নানা দিকেই। সবাই কি রবীন্দ্রনাথের মতন পদ্যে গদ্যে সব্যসাচী? কবিতার ক্ষেত্রে পদ্য অবশ্য গদ্যের চেয়েও জনপ্রিয়। তাই পদ্যকে বাতিল করার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু বাংলা কাব্যের একটা ধারা বহুকাল যাবৎ গদ্যের খাতেই বইছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বহু গদ্য-রচনা, রবীন্দ্রনাথের লিপিকা, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম, অবনীন্দ্রনাথের পাহাড়িয়া ছন্দ বাংলা কাব্যের ইতিহাসেও একটা গৌরবের আসন দখল করেছে।

পদ্যপটুরা পদ্যই লিখুন। কিন্তু গদ্যপটুরা গদ্য কবিতা লিখবেন না কেন? 'কেবল আমি আর আমার মামা বুঝব' এমন একটা অবোধ্য উপভাষা-সৃষ্টিতে যাঁরা মশগুল, তাঁদের হাতে—কিবা গদ্য, কিবা পদ্য—সবই শালগ্রামের শোওয়া-বসার মতোই সমান। তাঁরা পদ্য লিখলেও কি পূর্ণেন্দুবাবুরা তৃষিত মরুভূমির মতো তার রসপান করতে থাকবেন?

"আবার শাঁখের ডাক আবার কি পাশের নহরে
বাঁচায় অমিতে ফের নীলোৎপল প্রাণের যন্ত্রণা।"

কিংবা "মারীচাটা মাঠে যারা মাটি কাটে..." ইত্যাদি 'পরিচয়'-এই বেরিয়েছে। ছেলেবেলায় উচ্চারণ প্রতিযোগিতার পরীক্ষায় যে জাতীয় পংক্তি বাঙালী ছাত্রেরা উদ্ভাবন করে থাকে (যেমন, 'জলে চুণ তাজা, তেলে চুল তাজা' ইত্যাদি) সেই জাতীয় কায়দাও কি প্রগতিশীল পদ্য কবিতায় চলবে? 'শহীদ ভরদ্বাজের মৃত্যুতে' কবিতা লিখেছেন যে মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় তাঁরও 'হায় রে ভালবাসা' জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় বেরিয়েছে। ক্রমাগতভাবে যতি-লঙ্ঘনের কায়দাই কি তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর 'আঙ্গিকের' সর্বস্ব করে তুললেন? মানাই গেল যে ছন্দপতন না করে যতিকে কলা দেখিয়ে, টান টান করে বাঁধা নিয়মিত মাত্রার এক দড়ি থেকে অন্য দড়ির ওপর হাটবার খেলায় তাঁর জুড়ি নেই, কিন্তু এই বহুমূল্য কায়দাটির সার্থকতা কোথায়? লোকে কবিতা পড়তে গিয়ে কি ক্রমাগত সার্কাসের খেল দেখা বরদাস্ত করবে?

"মাঠের কাঁপা কাঁপা গলায় গলা দেয় দূরের গান, দূর
দূরের গান, আরও দূরের গান···"

এই রকমই চলেছে সারা কবিতায়। ফলে পাঠকের অবস্থা হয় দীর্ঘ রেল-পথের যাত্রীর মতো। সে যেমন গন্তব্য স্থানে পৌঁছেও অহোরাত্র 'ধকো-ধুকো' ধ্বনিতে ভরপুর হয়ে থাকে, মঙ্গলাবাবুর ছন্দের প্যাঁচও পাঠককে তেমনি জড়ায়। হয়তো বাজারে গেছে গুড় কিনতে, তখনও অনিচ্ছুক ক্লান্ত মাথায় ছন্দের ঢেউ খেলে যাচ্ছে:

"গুড়ের দাম! গুড় তেলাই তবু গুড় কেনাই চাই? গুড়
নাই খেলুম! বাপ! গুড়ের দাম কিরে! গুড়ের দাম!"

পড়লে ভুলে যেতে হয় যে ছন্দের কবিতায় মানুষের তৃপ্তি আসে। ভুলে যেতে হয় নজরুল, সুকান্ত কিংবা বিমল ঘোষের সহজ পদ্য ছন্দের কথা।

অন্যতম পাঠক হিসেবে দাবি: "পরিচয়" এই ঐতিহ্যে দাঁড়ি টানুক। এ ঐতিহ্য অবক্ষয়ের সৃষ্টি। নতুন লেখকদের বিপথে নেবার ক্ষমতা ছাড়া আর কোনো ক্ষমতা এর নেই। এই ঐতিহ্যে মুগ্ধ হয়েই একদা আমরা অমর সুকান্তের পিঠ নোংরা হাতে চাপড়ে দিয়ে বলেছি, হ্যাঁ, তুমি লেখ ভাল, তবে এখন কিছুটা সেকেলে রয়ে গেছ।

পদ্যই হোক আর গদ্যই হোক, নতুন যুগের কবিতায় নতুন ঐতিহ্যের পত্তন

হয়েই গেছে—যে ঐতিহ্য পদ্যের এবং গদ্যের চিরাগত সহজবোধ্য কাঠামো-কেই আশ্রয় করেছে। "পরিচয়" সেই ঐতিহ্যকেই বহন করুক।

ইন্দ্রসোম বর্মা
কলকাতা

গদ্য কবিতা কেন

প্রশ্ন সাধারণ। আর তাই প্রয়োজন আলোচনার। বর্তমানে গদ্য-কবিতার ব্যাপকতার দিক থেকে বিচার করলে এদিকে আলো পাবার প্রয়োজনীয়তা আরও গভীর ভাবে উপলব্ধি করা যায়, কারণ, অন্য দিকে প্রায় প্রত্যেকের মনেই আজ প্রশ্ন জেগেছে গদ্য-কবিতা কেন? অমীমাংসিত প্রশ্ন নয়, তবে আমার মনে হয় মীমাংসার পথে সাহিত্যের প্রতি এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন।

সাহিত্যের একটি বিশেষ অঙ্গ অধিকার করে বসে আছে কবিতা। এই কবিতার বাহ্যিক ছাঁচ কি হবে সে বিষয়ে বিতর্ক যথেষ্ট—কিন্তু এর অন্তরের রূপ কি, সে বিষয়ে বোধ হয় সবাই একমত। কবিমন স্বভাবতই স্পর্শকাতর, —কবিতা স্পর্শাতুর কবিমনের আনুষ্ঠানিক অভিব্যক্তি। আনুষ্ঠানিক এই জন্য বলা যে এর গঠন-বিশেষ এবং গঠন-বিরোধ আছে; এদিক দিয়ে দেখতে গেলে কবিতার স্ফুরণ অন্তরের তাগিদ আর তার ছাঁচ প্রয়োজনের তাগিদ। বিভিন্ন ভাবের প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য প্রকাশের আশায় বিভিন্ন কাঠামোর উপর ভিত্তি করে চলে। ছন্দ, মাত্রা ও যতি নির্ভর করে ভাব ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন বাক্যের সমষ্টিগতরূপে। আসল কথা, কবিতার এবং কবি-ভাষার মাঝে এক ধরনের ছন্দ থাকেই, তা সে অক্ষর মিলিয়েই হোক আর না মিলিয়েই হোক। কবিমন ভাষার আশ্রয়ে শব্দময় যে ইঙ্গিত তোলে, ছন্দহারা তা নয়, শুধু প্রয়োজন ছন্দকে স্বীকার করবার মত মানসিক বৃত্তি, রসবোধের সামর্থ্য এবং কবির ভাব বিকাশের উৎকৃষ্টতার।

তাই, এই বাস্তবিকতার দিক থেকে গদ্য কবিতার উৎপত্তি হল প্রয়োজনের তাগিদে। তথাকথিত ছন্দ-বাঁধা কবিতায় সাধারণত যে সংকীর্ণতা থাকে, এ থেকে কাব্যরসকে মুক্ত করে দিয়েছে গদ্য-কবিতা। গদ্য-কবিতাকে, বলা চলে, অবান্তর অবতারণাকে সরিয়ে রেখে প্রাঞ্জল অভিব্যক্তির মাধ্যমে সর্ব-সাধারণের সাহিত্যরস সম্ভোগের প্রয়াস।

যুগের চাহিদা অনুভূতিকে এক বিশেষ বাস্তবতার ছোঁয়াচ দেয়, যার ফলে উৎপত্তি হলো গদ্য-কবিতার। তবে, সেই বাস্তবতাকে রসলোকের আওতায় এনে প্রথমে উপলব্ধি করে নিতে হবে, তারপরই কি ধরনের কবিতা হবে বা হলে ভালো হয়, নির্ণয় করা সহজ হয়ে পড়ে। সব ভাবধারাকেই এক ছাঁচে ঢেলে রস পরিবেশন করার চেষ্টা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়, একথা মনে রাখতে হবে। শুধু ছন্দ-মাত্রা খুঁজে বেড়ানো যেমন ভুল, ছন্দ বিসর্জন দিয়ে গদ্যের দিকে ঝুঁকে পড়াও তেমনই ভুল। আসল কথা, বিষয়বস্তু যেমন কবিতাকে রস দেয় আবার আঙ্গিকও ঠিক করে দেয়, তেমনিই বস্তবোধ কবিতাকে রূপ দেয় এবং তার আধার হয়। বাকি যা তা দেবার ও গ্রহণের ক্ষমতা।

ভাষাকে সেঁধে সেঁধে ভাবকে মায়াজালে আবদ্ধ না করে যদি কবিরা ভাবের সবল বিকাশের পথ করে দেন ভাষার নির্ভেজাল গাঁথুনিতে তবে গদ্য-কবিতাও সরস হয়ে বাঁচে—আমরাও শব্দের ইঙ্গিত বুঝি। গদ্য-কবিতা মানেই যদি সাধারণের পক্ষে ভিক্ষনারী বোঝা হয়, তবে আমি নাচার।

গদ্য-কবিতা সাধারণের সাহিত্য চাহিদার মুখ্য সোপান হতে পারে, যদি দাঁতভাঙা কথা, ভাবাহীন কলি, ছন্দ-বিমুখতা এবং পিওর রোমান্টিসিজমের পাল্লা থেকে মুক্ত করে বাস্তব ব্যাখ্যায় সাধারণ ভাবে গড়ে তোলা যায়। আমার মনে হয় সাহিত্যের উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনবোধকে সঠিক উপলব্ধি করতে পারলে গদ্য-কবিতাকে পূর্ণ করে তোলা যায়, মাহাত্ম্য দেওয়া যায় এবং ছন্দকে পরিস্ফুট করে সাধারণের মাঝে ব্যাপ্ত করে দেওয়া যায়—যার পর আর প্রশ্ন থাকবে না, গদ্য কবিতা কেন।

বিমল দাশগুপ্ত
পাটনা

কেন গদ্য কবিতা

ছন্দ ভাবকে ভাষার ঊর্ধ্বে নিয়ে এসে অনুভূতির স্তরে পৌঁছে দেয়—একথা সত্য বলেই মেনে নিতে হবে যে, ছন্দের রূপ কাব্যজিজ্ঞাসার উপর নির্ভরশীল। কাব্যজিজ্ঞাসার রূপান্তর ঘটলে ছন্দের পরিবর্তন অবান্তর নয়। 'উর্বশী'র ছন্দ তার ভাবরূপকে আশ্রয় করেই, তার কাব্যিক বৈশিষ্ট্যকে একটি মূলগত ঐক্যে রূপ দিয়েছে; কিন্তু 'কিনু গোয়ালার গলি' আপন ভাবের

প্রকারান্তর হেতুই অন্য রূপকে আশ্রয় করে সার্থকতা লাভ করেছে। 'উর্বশী' থেকে 'কিছু গোয়ালার গলি' রবীন্দ্রসাহিত্যে একটি বিরাট পরিবর্তন—এই পরিবর্তন রবীন্দ্রোত্তর কাব্য-সাহিত্যে একটি বিশেষ দিকের নির্দেশ দিচ্ছে।

এ যুগের কাব্যকে বিরোধ-সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হচ্ছে। এক-দিকে মানুষের নিভৃত রূপসাধনার চিরন্তন ব্যগ্র চেতনা ও অপর দিকে সংগ্রামশীল জনতার বাস্তব জীবনের উত্তরোত্তর জটিলতা—এই দুয়ের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে এ যুগের কাব্যকে পথ বেছে নিতে হয়েছে। খেটে-খাওয়া মানুষের জীবনের গতি আজ বিচিত্র—দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতের মানচিত্র—তাই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের থেকে আলাদা করে শুধু কথার জাল বুনে কাব্যে আকাশকুসুম রচনার অবকাশ ও বিলাস কারও মনে স্থান পায় না। উঁচু ইমারতের ঘর থেকে অলস দৃষ্টি মেলে দেখা অরণ্যনীল সুদূর দিগন্ত আজ কাব্যের উপকরণ নয়—নীচে চাষরত ঘর্মাক্তকলেবর চাষী আর মিলের কালিমাখা বঞ্চিত শ্রমিকরাই আজ মানব-চেতনার কাছে একটা সমস্যার সূচনা করেছে। ব্যক্তিগত রূপসাধনার বিলাসিতা ছেড়ে কবিরা আজ জনতার মাঝে স্থান করে নিতে চাইছেন, তাই 'কিছু গোয়ালার গলি'ই এ যুগের কাব্য সাধনার মন্ত্র—'উর্বশী'র রূপের ধ্যানমগ্নতা নয়। কাব্যের উপকরণের এই মূলগত পরিবর্তনের জন্যই বাহ্যিক ছন্দের রূপান্তরকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

পীযূষকান্তি সোম
কলকাতা

'পরিচয়-এর কুড়ি বছর'

শ্রীযুক্ত হিরণকুমার সান্যাল অসুস্থ। সেই কারণে তিনি এ-মাসে 'পরিচয়-এর কুড়ি বছর'-এর দ্বিতীয় কিস্তি লিখে উঠতে পারলেন না। কার্তিক সংখ্যা থেকে তাঁর লেখা আবার প্রকাশিত হতে থাকবে। —সম্পাদক

। গ্রাহক কনসেশন ।

"পরিচয়"-এর একুশ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যাঁরা গ্রাহক হবেন তাঁদের ছয় টাকার স্থলে পাঁচ টাকা বার্ষিক চাঁদার সুযোগ দেওয়া হবে ॥

যাঁরা নগদ দামে 'পরিচয়' কিনে পড়েন তাঁরা বার্ষিক গ্রাহক হলে আর্থিক দিক থেকে লাভবানই হবেন; কেননা দুটি বিশেষ সংখ্যা (শারদীয় ও নববর্ষ) নিয়ে বছরে বারো সংখ্যার দাম হয় সাত টাকা। বার্ষিক গ্রাহকেরা সে স্থলে পাঁচ টাকায় পুরো এক বছরের কাগজ পাবেন ॥

চাঁদা পাঠাবার একমাত্র ঠিকানা :

॥ পরিচয় কার্যালয় ॥

॥ ৮৩ ধর্মতলা স্ট্রীট ॥ কলিকাতা-১৩ ॥

সারা ভারত শান্তি-সংস্কৃতি সম্মেলন

লেখক ও শিল্পীদের কাছে আবেদন

মৃত্যুর চেয়ে জীবনের আকর্ষণ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক আর চিরদিনই মানুষের এই জীবনতৃষ্ণা সত্যকার শিল্পকর্মমাত্রেরই প্রধান উপকরণ। নানা-রূপে রসে শিল্পী প্রকাশ করেন, আরো তীব্র করে তোলেন এই সুস্থ মানবিক আকুতিকেই। শান্তির বাণী তাই সহজেই শিল্পীপ্রাণে সাড়া জাগায়।

আজ যখন সারা দুনিয়ায় যুদ্ধের আগুন জ্বালাবার প্রাণপাত চেষ্টা চলেছে তখন বিশেষ সাধারণ একক মানুষের সহজাত জীবনতৃষ্ণা বা নিঃসঙ্গ শিল্পীর সহজ মানবতাবোধই সর্বনাশকে ঠেকাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। আজ বিশেষ করে প্রয়োজন যৌথ সংবদ্ধ ধারাবাহিক চেষ্টার। শিল্পীকে আজ তাই সমস্ত মানুষের পক্ষে দাঁড়াতে হবে শিল্পের হাতিয়ার নিয়ে। এ কল্যাণব্রতে ছোট-বড়র ভেদাভেদ নেই, নেই দৃষ্টিভঙ্গির বা মতামতের পার্থক্যের বাছবিচার। তুলি, লেখনী, কণ্ঠ, বিদ্যা, অভিনয়দক্ষতা, শিল্পকৌশল—সবই আজ প্রয়োগ করা হবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে, মানুষের স্বপক্ষে।

বিশেষ ক'রে এ কাজ আজ জরুরী কারণ যুদ্ধ আর দূরের দুর্বিপাকমাত্র নয়। বিরামহীন যুদ্ধপ্রস্তুতি মারফৎ দেশবাসীর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা বিড়ম্বিত করেই তা ক্ষান্ত নেই। ভারত-পাকিস্তান বিরোধের সূত্র ধরে আজ সরাসরি দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধাবার চেষ্টাও চলছে অবিশ্রাম। এক্ষেত্রে কালক্ষেপের অর্থ সর্বনাশ। ভারত-পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব ন্যায়সঙ্গতভাবে মীমাংসিত হোক—উভয় রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ-সম্মেলনে। তৃতীয় কোন অভিসন্ধি-কারী রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ সর্বনাশ ডেকে আনবে

সারা ভারতের সাহিত্যিক চিত্রকর, শিক্ষাব্রতী, মঞ্চ, চলচ্চিত্র ও বেতার শিল্পী, নাট্যকার, গায়ক-শিল্পীমাত্রকেই, প্রত্যেকটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে তাই আমরা আহ্বান জানাই নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতায় নিখিল ভারত শান্তি-সংস্কৃতি সম্মেলনে যোগদান ক'রে সর্বসম্মত শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ দেখান, নবোদ্যমে সূচনা করুন মানুষের স্বপক্ষে নতুন কল্যাণব্রতী অভিযান।

নিবেদক—

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	গোপাল হালদার
মনোজ বসু	পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	সুকৃতি সেন
প্রবোধকুমার সান্যাল	রমেশচন্দ্র সেন

বুর্জোয়া জাতীয় আন্দোলনের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায়

ই. ভি. পায়েভস্কায়া
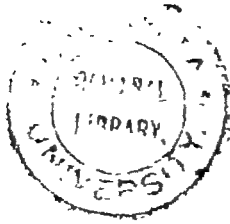
বাঙলা দেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ আরম্ভ হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক থেকে। রামমোহন রায় ছিলেন বাঙলার বুর্জোয়া মতবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে অগ্রদূত।

রামমোহনের জন্ম ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে। তাঁর জন্মভূমি বাঙলা দেশ (গ্রাম—রাধানগর; জিলা—হুগলি) ঐ সময়েই ভারতবর্ষে ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের একটি শক্ত ঘাঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে—ব্রিটিশ শাসন এদেশে টিঁকে থাকার পক্ষে অবশ্য-অপরিহার্য সৈন্যরা এবং কেরানীরাই শুধু নয়—বাঙলা দেশে পাদ্রী ও বৈজ্ঞানিকদেরও পাঠানো হতে থাকে। এমনিতে দেখলে পাদ্রীদের লক্ষ্য খ্রীষ্টধর্ম প্রচার মনে হলেও, আসলে তাঁদের প্রাথমিক কাজ ছিল নেহাতই ইহলৌকিক স্বার্থের পরিপোষক। প্রায়ই তাঁরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী অথবা প্রতিনিধি অথবা গুপ্তচরবৃত্তির সঙ্গে জড়িয়ে নিতেন তাঁদের পারত্রিক কর্তব্য। ইংরেজরা খুব ভাল করেই বুঝত যে বিজিত দেশকে পদানত রাখতে হলে, শুধু দৈহিক বলই যথেষ্ট হবে না। জনসাধারণের উপর আদর্শগত আধিপত্যের একান্ত প্রয়োজনীয়তা তারা বুঝেছিল। ভারতের ধর্ম, ইতিহাস এবং সাহিত্য সম্পর্কে ইংরেজ কর্মচারীদের ঔৎসুক্য আকস্মিক ব্যাপার ছিল না। ওয়ারেন হেস্টিংস ছিলেন

ভারতীয়দের উপর সব থেকে কড়া, বর্বর অত্যাচারী ও ভারতবিদ্বেষীদের মধ্যে অন্যতম, যদিও নিঃসন্দেহেই তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ রাজনীতিবিদ ও শাসক। তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি, কয়েকটি ভারতীয় ভাষার উপর তাঁর দখল ছিল অসামান্য এবং সংস্কৃতের উপর তিনি অত্যন্ত বেশি রকম গুরুত্ব আরোপ করতেন। ভারতকে আরও পুরোপুরি অধীন করার লক্ষ্য নিয়েই ইংরেজরা ভারতবর্ষ সম্পর্কে পড়াশুনো করত; এদেশের রীতি এবং আইন নিয়ে চর্চা করত যাতে স্থানীয় জনসাধারণকে (যাদের তারা ঘৃণাভরে 'আমাদের নেটিভ' বলে সম্ভাষণ করত) অধীনে রাখার জন্য তাদের তূণে বেশী বেশী অস্ত্রশস্ত্রর ব্যবস্থা থাকে।

ভারতবর্ষ জয় করার জন্য ইংরেজরা যত রকমের অস্ত্র ব্যবহার করেছিল, পাদ্রীরা ছিল তারই একটি। কিন্তু তা সত্ত্বেও, হয়ত বা এই জন্যই, বাঙলা দেশের শিক্ষিত মহলে খ্রীষ্টান পাদ্রীরা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন একটা মস্ত প্রভাব। তাঁরা সঙ্গে করে এনেছিলেন ইওরোপীয় বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ এবং সংস্কৃতির জ্ঞান। এ ছাড়া অন্যরকম হওয়া সম্ভবও ছিল না, কারণ "ব্রিটিশরা ছিলেন ভারতবর্ষে প্রথম এমন ধরনের বিজেতা যাঁদের সংস্কৃতি ছিল তুলনায় উন্নততর" (মার্কস-এঙ্গেলস রচনাবলী, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৩, রুশ সংস্করণ)।

শ্রীরামপুর এবং কলিকাতার মিশনারীরা রামমোহনের বিশ্বদৃষ্টিকে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ভাষাতত্ত্ববিদ এবং বাঙলা-সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধানের সংকলয়িতা উইলিয়ম কেরী, ডি. ওয়ার্ড, মার্শম্যান, য়েট্স্ ও উইলিয়াম অ্যাডাম। শেষোক্তজন রামমোহন রায় সম্বন্ধে একটি স্মারক গ্রন্থ লিখেছেন ("রামমোহন রায়ের জীবন ও কাজ সম্পর্কে একটি বক্তৃতা", কলিকাতা, ১৮৭৯)। পাশ্চাত্ত্য জীবনধারা সম্পর্কে ঔৎসুক্য রামমোহনকে টেনে নিয়ে যায় ইংলণ্ডে এবং যাবার আগেই এই অভিজাত, ধনী এবং স্বাধীন চিন্তার অধিকারী বাঙালীটিকে নিয়ে সেখানে যথেষ্ট কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদের মেয়াদ-বৃদ্ধির প্রশ্নে হাউস অব কমন্সের আলোচনায় মোগল-সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করতে ইংলণ্ডে গিয়ে রামমোহন অনেক বন্ধু পেয়ে গেলেন যাঁরা সাগ্রহে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। রাজদরবার তাঁর কাছে সহজেই অধিগম্য হল এবং পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তিনি পেলেন লর্ড

বেন্টামকে। গ্ল্যাসেনাপ-এর ভাষায় বলতে গেলে তিনিই সর্বপ্রথম সাহস করেছিলেন "সমুদ্র পেরোতে এবং বিশ্বের মানচিত্রে তাঁর জাতির স্থান করে নিতে" (এইচ, গ্ল্যাসেনাপ—Religiose Reformbewegung in heutigen Indien, লাইপজিগ, ১৯২৮, ১ম পরিচ্ছেদ। রামমোহনেরও আগে ভারতীয় মুসলমানেরা ইওরোপে গিয়েছিলেন; দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে—চতুর্দশ লুইয়ের দরবারে টিপু সুলতানের দূত প্রেরণ)।

ফরাসী 'বিশ্বকোষ-রচয়িতা'দের (যাঁদের বলা হয়ে থাকে 'এন্‌সাইক্লো-পিডিস্ট') মতামতের সঙ্গে রামমোহনের পরিচয় ছিল। তিনি বেকনের লেখা পড়েছিলেন। "চীনের সমস্যা, গ্রীসের সংগ্রাম এবং জমিদারদের অধীনে আয়ার্লণ্ডের দুরবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর ঔৎসুক্য ছিল। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে নেপল্‌সে বিপ্লবের ব্যর্থতায় তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন এবং ল্যাটিন আমেরিকার বিপ্লবকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন" (অমিত সেন—'নোটস অন্ বেঙ্গল রেনেসাঁস্', বোম্বাই, ১৯৪৬, পৃঃ ১১)। রম্যাঁ রলাঁ হয়ত একটু বাড়িয়েই বলেছিলেন যে রামমোহনের জ্ঞানের পরিধির মধ্যে "ভারতীয় পৌরাণিক গ্রন্থাবলী থেকে আরম্ভ করে তৎকালীন ইওরোপের বৈজ্ঞানিক চিন্তাভ্যাস পর্যন্ত সব কিছুই পড়ত" (আর, রলাঁ—সংগৃহীত রচনাবলী, ১৯শ খণ্ড, পৃঃ ৬১)। কিন্তু জগতের ইতিহাসে তাঁর গভীর ঔৎসুক্য, নানা বিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর বিস্তৃত পরিচিতি এবং পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান এবং বোধ সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

উপরিল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি থেকে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায় যে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা কিভাবে রামমোহনকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু তাই বলে, অধিকাংশ ইংরেজ বৈজ্ঞানিকের মত, রামমোহনের স্ব-বিরোধী এবং জটিল চিন্তাধারার কারণ হিসাবে একমাত্র ইওরোপীয় প্রভাবকে দেখানো কেবল যে সেকেলে ব্যাখ্যা তাই নয়, একান্ত অসম্ভবও বটে। রামমোহনের চিন্তার সারবস্তু, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি শেষ পর্যন্ত শুধু ভারতীয় নয়, হিন্দুই থেকে গিয়েছিল—যদিও এটা অস্বীকার করা যায় না যে ইস্‌লাম এবং মুসলিম সংস্কৃতি মোটের উপর তাঁর চিন্তাধারা গঠনে একটা বড় অংশ গ্রহণ করেছিল। তাঁর সামাজিক মর্যাদা এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে মোগল দরবারের ঘনিষ্ঠতা, তাঁর পক্ষে ইস্‌লামের চিন্তাধারা গ্রহণের পথ প্রশস্ত করেছিল। পাটনার একটি উচ্চ মুসলিম শিক্ষালয়ে তিনি শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং সংস্কৃত শিখবার

আগেই শিখেছিলেন ফারসী ও আরবী। বাঙালীদের শিক্ষা-পদ্ধতির এই ছিল তৎকালীন বৈশিষ্ট্য। মুসলমানদের প্রতি তাঁদের কোন ঘৃণা ছিল না। স্পষ্টতই মোগল-আমলে বাঙলা দেশে সাধারণত হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কোন বৈরীভাব ছিল না। অনেক পরে, ১৮৫৭ সালের সিপাহী-বিদ্রোহের পর, ইংরেজদের রাজনীতির ফল হিসাবে এর উদ্ভব হয়েছিল। যেমন, মৌলবী সৈয়দ আমীর হোসেনের কাছ থেকে গ্রান্ট্ জেনেছিলেন (নবম দশকে) যে, বাংলার মুসলমানেরা নিপীড়িত সম্প্রদায়, যদিও আগেকার কালে হিন্দু ও মুসলমানেরা খুব বন্ধুভাবেই থাকত" (ডব্লিউ, এস, গ্রান্ট—'রিপনের আমলে ভারত', ১৯০৯, পৃঃ ৯৪)।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বাঙলা দেশে শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট দিতে গিয়ে এ্যাডাম লিখেছেন: "হিন্দু ও মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক এই দেশে (অর্থাৎ বাঙলায—লেখিকা) একটা গুরুতর প্রশ্ন ছিল না। স্থানীয় ভাষার শিক্ষা-ব্যবস্থা অনুধাবন করলেই সেটা বোঝা যায়। বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় বাঙলা (অর্থাৎ হিন্দু—লেখিকা) স্কুলে ১৩ জন মুসলমান শিক্ষক ছিলেন…মুসলমান শিক্ষকদের যেমন মুসলমান তেমনি হিন্দু ছাত্রও ছিল। হিন্দু ও মুসলমান ছাত্ররা একই স্কুলে একই শিক্ষকের কাছে একই শিক্ষা লাভ করত, একত্র খেলা করত এবং সময় কাটাত" ('বাঙলা ও বিহারে দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কে এ্যাডামের রিপোর্ট,' কলিকাতা, ১৮৬৮, পৃঃ ১৭৮)।

কিন্তু জীবন থেকে বহুলাংশে বিচ্ছিন্ন অথচ রূপের দিক থেকে জটিল দর্শন-শাস্ত্রের উপর রামমোহনের পুরোদস্তুর দখল ছিল।

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের এক সুবৃহৎ অংশের কাছেই হিন্দুধর্ম ছিল শ্রেণী-গত আর জাতিগত বাধানিষেধের, বর্বর, অন্ধ বিশ্বাস ও রীতির, ক্রূরতা ও অত্যাচারের একটি শৃঙ্খলবিশেষ। বিশ্বাস ও দেশাচারের এই গোটা ব্যবস্থাটাই সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-অচলায়তন থেকেই উদ্ভূত। তার ভিত্তি ছিল বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, আত্মকেন্দ্রিক গোষ্ঠী আর ভিতরের দিকে বিভেদ, বৈষম্য ও বাধানিষেধের ধাঁধা ছিল এই ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাই আবার অন্য দিক থেকে জিইয়ে রাখছিল এই অচল, অনড় অবস্থা। মোট হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে বেশ একটা ভাল ধারণা মার্ক্স-এর এই কথায় পাওয়া যায়: "আমাদের ভুললে চলবে না যে এই গৌরবহীন, স্থাণুগতি ও স্থাস্নু জীবন (তিনি গ্রামীন্ গোষ্ঠীদের সম্পর্কেই এ কথা তুলেছেন), এই নিষ্ক্রিয় টিঁকে থাকার প্রতিঘাত হিসাবেই

উদ্ভূত হয়েছিল বন্য, লক্ষ্যহীন ও অবাধ ধ্বংসশক্তি এবং নরহত্যা পর্যন্ত হিন্দু-স্থানে ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের ভুললে চলবে না এই ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলি ছিল দাসত্ব ও জাতিভেদ প্রথার বিষে জর্জরিত, মানুষকে ভাগ্যের দাস করে রেখেছিল...এরা স্বভাবত গতিশীল সমাজ-ব্যবস্থাকে অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়তিতে পর্যবসিত করেছিল এবং এই ভাবে প্রবর্তন করেছিল বর্বর প্রকৃতিপূজার যার অবনত চরিত্রের প্রমাণ হিসাবে বলা যায় যে প্রকৃতির প্রভু মানুষ হনুমান নামক বানর এবং সবালা নামের গরুর নিকট ভক্তিভরে নতজানু হত" (মার্কস ও এঙ্গেলস্—সংগৃহীত রচনাবলী, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫১)।

কিন্তু এই হিন্দুধর্মই আবার জাতিপ্রথার প্রধান স্তম্ভ ব্রাহ্মণদের কাছে দার্শনিক ধর্মতাত্ত্বিক "জ্ঞান" দাবী করত। "এই ধর্ম ইন্দ্রিয়জ উচ্ছ্বাসের, আত্ম-নিগ্রহী সন্ন্যাসীর, লিঙ্গ ও জগন্নাথেরও ঋষির ধর্ম" (ঐ পৃঃ ৩৪৬)। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে জীবন উৎসর্গ করতে হত জ্ঞানান্বেষণে। ফলে, শিক্ষিত শ্রেণীর ভিতর সীমাবদ্ধ এবং অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি অংশের ধর্মতাত্ত্বিক প্রস্তুতি সম্ভব হত।

বস্তুবিচ্ছিন্ন চিন্তাভ্যাস পুরুষানুক্রমে চলে এসে এই স্বল্পপরিসর গোষ্ঠীর একটা ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই গোষ্ঠীর একজন হিসাবে রামমোহনের সাধারণ সূত্রে উপনীত হওয়ার ক্ষমতা ছিল এবং (তাঁর সময়ের অনুপাতে) তাঁর উপলব্ধিও নগণ্য ছিল না। হিন্দুধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থগুলি তিনি পড়ে-ছিলেন এবং সারা জীবনই তিনি বেদকে জ্ঞান ও ধর্মের অভ্রান্ত উৎস বলে মনে করতেন।

জাতিভেদ-প্রশ্নকে রামমোহন দেখতেন সুবিধা-অসুবিধার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। জাতি-ব্যবস্থা সম্পর্কিত তাঁর রচনায় তিনি বলেছেন যে, ঈশ্বরের কাছে সবাই সমান, মানুষে মানুষে কোনও প্রভেদ নেই। জাতি-প্রথা এবং হিন্দুধর্মের অন্যান্য রীতির বিপক্ষতা করে রামমোহন যে শুধু হিন্দুদের ধর্মের ভিত্তি নষ্ট করলেন (ঐ ধর্মের গোঁড়া ভক্তরা এই নিয়ে রামমোহনকে ঠিকই দোষ দিত) তাই নয়, সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ভিত্তিও দিলেন টলিয়ে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি আদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেন। কিন্তু জাতি-প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রেও নিজে ব্রাহ্মণ ও জমিদার হিসাবে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও ব্রাহ্মণের উপবীত ফেলতে পারেননি এবং তাঁর জন্য অস্পৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করতে সঙ্গে করে ইওরোপে ব্রাহ্মণ-ভৃত্য নিয়ে

গিয়েছিলেন। ১৮২৮ সালে তিনি যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার নিয়ম অনুসারেও ধর্ম-উপাসনা পরিচালনার প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অধিকার ছিল ব্রাহ্মণদেরই।

হিন্দুয়ানীর প্রধান ব্যবস্থাগুলিকেই রামমোহন সমালোচনা করেছিলেন; প্রথমত জাতি-প্রথা (উপরে যার উল্লেখ করা হয়েছে), দ্বিতীয়ত পৌত্তলিকতা। নতুন একটি ধর্ম-আন্দোলনের স্থাপনার সঙ্গে রামমোহনের নাম জড়িত, যে আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল ব্রাহ্মসমাজ। ইংরেজ পণ্ডিতেরা রামমোহনের ধর্ম এবং সংস্কার সম্বন্ধীয় কাজের উপরই বিশেষ জোর দেন। রামমোহনকে দৃষ্টান্ত করে তাঁরা খ্রীষ্টান চার্চ ও প্রোটেস্টান্ট পাত্রীদের "কল্যাণ-কর চরিত্র" দেখাতে চান। কিন্তু এইসব "আলোকদাতা ও সভ্যতার বাহক", ইংরেজরাই তাদের সময়ে হিন্দুয়ানীর সমস্ত বর্বর প্রতিষ্ঠানগুলিকেই সুদৃঢ় করেছিল। কপটভাবে তারা ঘোষণা করল যে হিন্দুদের মামলার হিন্দু-আইন অনুযায়ীই বিচার হওয়া দরকার; এবং এই ঘোষণা মারফতই জাতিপ্রথা হিন্দু-আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং অপরিবর্তনীয় হিসাবে স্বীকৃত হয়ে গেল (জে, মেইন—'হিন্দু আইন ও প্রথা সম্পর্কে একটি রচনা', ১৮৮৩, পৃঃ ৩৩)। ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকেরা হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মের পুরোহিত-মোল্লাদেরই যথেষ্ট সুবিধা দিত এবং ১৮৫৭-১৮৫৯ সালের বিদ্রোহের ফলে স্বল্পস্থায়ী বিরতির পর, গোঁড়া ইসলাম এবং গোঁড়া হিন্দুয়ানীর পুরোহিতদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করত। অর্থাৎ আইন-প্রণয়নের বিস্তৃত ক্ষেত্রে ইংরেজরা পরিষ্কার ভাবেই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হিসাবে কাজ করেছিল, যার ফলে মধ্যযুগীয় হিন্দু আইনের মর্যাদা কেবল টিঁকেই ছিল না, দৃঢ়তরও হয়েছিল। এর পরিচয় তারা এ· ছাড়াও দিয়েছিল, উচ্চশ্রেণীর যাজকদের উপর আস্থা স্থাপন করে এবং জাতিপ্রথা ও একটির এর একটি সামন্ততান্ত্রিক জের-এর প্রতি কার্যত সমর্থন দেখিয়ে।

জাতিভেদ-প্রথার মতবাদগত ভিত্তি—আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তিতত্ত্বের ব্যাপারে খ্রীষ্টান ধর্মের বিরুদ্ধতা রামমোহনকে যতটা প্রভাবিত করেছিল, ততটাই করেছিল ঐ ধর্মের একেশ্বরবাদ। কিন্তু তাঁর ধর্মাদর্শের মূল কথা শেষ পর্যন্ত ছিল গভীরভাবেই হিন্দু। এরও আগে, মুসলিম স্কুলে শিক্ষার ফলে, তিনি ইসলামের ধর্মের সঙ্গে বাল্যকাল থেকে পূর্বপুরুষদের যে ধর্মশিক্ষা

করেছিলেন তার তুলনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং তাতে হিন্দুয়ানীর মতবাদে তাঁর অন্ধ বিশ্বাস গিয়েছিল টলে।

১৭৯০ সালে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাঁর প্রথম লেখা বাংলায় প্রকাশিত হ'ল। রামমোহন লিখেছেন, 'আমার পিতার মৃত্যুর পর আমি পৌত্তলিকতার সমর্থকদের বিরুদ্ধে খুব জোরের সঙ্গে দাঁড়ালাম। মুদ্রণ-ব্যবস্থার সাহায্যে পৌত্তলিকতার সমর্থক ও তাঁদের ভ্রান্তির বিরুদ্ধে আমি দেশী ও বিদেশী ভাষায় বিভিন্ন রচনা ও পুস্তিকা প্রকাশ করলাম। আমি দেখাতে চেষ্টা করলাম যে ব্রাহ্মণদের পৌত্তলিকতা তাঁদের পূর্বপুরুষদের আচারের বিরোধী এবং তাঁদের প্রাচীন গ্রন্থমালার নীতি-বিরুদ্ধ।'

কর্মজগতে রামমোহনের প্রবেশ ১৮১৪ সালে, তাঁর অবসর গ্রহণের সময়ে (১৮১০ সালে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মৃত্যুর পর রামমোহন একজন ধনী ব্যক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন)। ১৮০৩ থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত রামমোহন ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন কর্মচারী। স্পষ্টই বোঝা যায় তাঁর ইংরেজ প্রভুদের মত, তিনিও 'অর্থাগমের নিষ্পাপ উপায়গুলি' পরিহার করেননি এবং ওয়াকেফহাল ওয়্যানের ভাষায় তিনি সেরেস্তাদারের (নিম্নতম রাজস্ব কর্মচারী—১৮২৮ সালে সারা ভারতবর্ষে এই পদে মাত্র ৩৬৭ জন ভারতীয় নিযুক্ত ছিলেন) পদে অধিষ্ঠিত থেকে 'দশ বছর সময়ের মধ্যে এতটাকা জমিয়েছিলেন যাতে তিনি বাৎসরিক দশ হাজার টাকা আয়ের এক জমিদারীর মালিক হতে পেরেছিলেন।' ওয়্যান আরও লিখেছেন, 'কিন্তু কি উপায়ে এই টাকা সংগৃহীত হয়েছিল তা জানা নেই। এইটুকু জানা আছে যে তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করা এবং কলকাতায় একটি বাড়ী কেনা (সি, জে, ওয়্যান—'ভারতের ব্রাহ্মণ, ঈশ্বরবিশ্বাসী এবং মুসলিমরা', লণ্ডন, ১৯০৭, পৃঃ ১০২)। ধনী, 'উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ' (একথা তাঁর নিজেরই) রামমোহন মোগলদের দরবার এবং বাংলার শাসক ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িত ছিলেন। সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে এক অতি উচ্চস্থানে ছিল তাঁর প্রতিষ্ঠা এবং তিনি প্রাচীন হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজস্ব সংগ্রাহকের কর্তব্যের সঙ্গে কোন রকমে মিলমিশ করেও রেখেছিলেন। এই পদে অধিষ্ঠিত থেকে, কৃষক-প্রজাদের রক্ত নিঙড়ে যে টাকা সঞ্চয় হয়েছিল তারই ফলে, তিনি তাঁর পরবর্তী জীবন মাঝারী গোছের জমিদারের অনগ্রসর চিন্তার নাগাল

থেকে বহু দূরে সামাজিক কাজকর্ম এবং গবেষণায় উৎসর্গ করতে পেরেছিলেন।

রামমোহন চেষ্টা করেছিলেন হিন্দু ধর্মকে পরবর্তীকালের পরগাছা থেকে মুক্ত করতে এবং তাকে ভারতের জাতীয় ধর্মে রূপান্তরিত করতে। নিজেকে কখনই তিনি নতুন কোন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মনে করতেন না; কিন্তু এই কাঠামোর মধ্যেই নতুনের বীজ নিহিত ছিল, যেটাকে রামমোহন নিজে পুরাতনেরই পুনরুজ্জীবন মনে করতেন। এক অদ্বৈত ঈশ্বরের কল্পনা ভারতবর্ষে মোটেই অভিনব নয়। কিন্তু রামমোহনের একেশ্বরবাদ বেদ বা ভক্তির একেশ্বরবাদ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁর একেশ্বরবাদ ব্রহ্মজ্ঞানীর ঈশ্বর-কল্পনা মাত্র। রামমোহনের কাছে এক ঈশ্বর ভারতের ঐক্যেরই প্রতীক। তিনি লিখেছেন, 'আমি পৌত্তলিকতার বিরোধী, ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধী নই' (আর্নটকে লেখা চিঠি—মূলার—জীবনীমূলক রচনা, লণ্ডন, ১৮৮৪, পৃঃ ৪৮, পরিশিষ্ট)। অন্যান্য ধর্মেও তিনি তাঁর ধারণার সমর্থনের সন্ধান করতেন। ১৮২০ সাল থেকে তিনি মনোযোগের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম পড়াশুনা করেন। কিন্তু নিজে তিনি খ্রীষ্টান হন নি। হিন্দুধর্মের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হত তাঁর মতে ভারতবর্ষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সামিল।

কর্মফলতত্ত্বের বিরোধিতা করে রামমোহন মানুষের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রকে বিস্তৃততর করেছিলেন এবং মানুষকে মুক্ত করেছিলেন ভাগ্য ও নিয়তির কবল থেকে; নিজ উদ্যম প্রকাশের সম্ভাবনার পথও কিছুটা তাঁর সামনে উন্মুক্ত করেছিলেন।

সবশেষে, রামমোহন আত্মার দেহান্তর ধারণ-তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন না।

রামমোহনের উদ্যোগে গঠিত ব্রাহ্ম-সমাজ, তাঁরই ধর্মীয় ধারণার বাস্তব ফল; এই সমাজের প্রথম সভা হয় ১৮২৮ সালের ২০শে আগস্ট। সমাজের সভ্যেরা ছিলেন রামমোহনের কাছাকাছি মানুষ কিংবা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন একজন শিক্ষিত আইনজ্ঞ এবং লবণের ঠিকাদারীতে বড়লোক হয়ে তিনি ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন (যেমন, হাণ্টার বলেছেন, তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে একটি সিল্কের কারখানা কিনে অনতি-বিলম্বেই এ্যাবটকে বিক্রি করেছিলেন,—ডব্লিউ, ডব্লিউ, হাণ্টার, 'বাংলার তথ্যমূলক বর্ণনা', ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৭০)—রামমোহন স্বয়ং ও দ্বারকানাথ ছাড়া ব্রাহ্মসমাজ তালিকায় নিম্নোক্ত সভ্যদের নাম পাওয়া যায়: ঢাকার কালীনাথ

রায়, হাওড়ার মথুরানাথ মল্লিক, অভিজাত বংশীয় ব্যবহারজীবী প্রসন্নকুমার ঠাকুর, চন্দ্রশেখর দেব এবং তারাচাঁদ চক্রবর্তী—এঁরা সকলেই হচ্ছেন বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর প্রতিনিধি। শেষোক্তজন ছিলেন সমাজের প্রথম সম্পাদক। এছাড়াও ছিলেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, যিনি রামমোহনের ইংলণ্ড যাত্রার পর সমাজের প্রধান হয়ে দাঁড়ান।

কলকাতায় (চিৎপুর রোড) নতুন উপাসনা-গৃহের উদ্বোধনের সময়, ১৮৩০ সালে যে "প্রামাণিক সনদ" প্রকাশিত হয়, তাতে সমাজের নীতিগুলি বেশ পরিষ্কারভাবেই আছে। এতে লেখা আছে, 'যাঁকে কোন নাম অথবা বিশেষণ দেওয়া অসম্ভব, সেই এক, অনন্ত, অজ্ঞেয় ও অপরিবর্তনীয়, বিশ্বের স্রষ্টা ও রক্ষাকর্তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁর উপাসনার উদ্দেশ্যে মিলনের স্থান হিসাবে এই গৃহ নির্বিশেষে সর্বসাধারণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইবে। কোন প্রতিকৃতি অথবা ঈশ্বরের কোন প্রকার প্রতিমূর্তি এস্থানে নিষিদ্ধ; এবং সর্বপ্রকার বলিদান, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব এস্থানে নিষিদ্ধ' (জে, এন, আরকুহার্ট—'ভারতে আধুনিক কালের ধর্ম-আন্দোলন', লণ্ডন, ১৯২৪, পৃঃ ৩৫)।

১৮৩০ সালে রামমোহনের ইংলণ্ড যাত্রার পর, সমাজের গুরুত্ব ধীরে ধীরে কমে যায়। প্রথম যুগের ব্রাহ্ম-সমাজ তৎকালীন ধর্মীয় অথবা সামাজিক জীবনের থেকে অনেক বেশী পরিমাণে রামমোহনের ধারণা ও কাজকর্মের প্রতিফলনই ছিল। রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ তাঁর শক্তিতেই সক্রিয়, তাঁর ধারণা অনুযায়ী সংগঠিত এবং সর্বপ্রকারেই তাঁর উপর নির্ভরশীল ছিল। সমাজের সভায় ৬০।৭০ জনের অধিক লোকের সমাগম হত না, কিন্তু তা সত্ত্বেও বাঙলা দেশে সেই সময়কার প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে সমাজ ঐক্যবদ্ধ করেছিল। ঠিক এই কারণেই ব্রাহ্মসমাজকে আমরা বাংলার জীবনে নিশ্চিতরূপে উন্নতিমূলক ঘটনা মনে করতে পারি। ব্রাহ্মসমাজের পত্তনে গোঁড়া হিন্দুদের উপর তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। এই নতুন সমাজের বিরোধিতার জন্য ধর্মসভা নামে একটি নতুন সংঘ গঠিত হ'ল। এই শেষোক্ত সংগঠনের কাজের পরিচয় পাওয়া যায় এই ঘটনা থেকে যে, সতীদাহ-প্রথা পুনঃপ্রবর্তনের প্রস্তাব করে এরা সরকারের নিকট আবেদন জানায়।

রামমোহনের ধর্ম-জিজ্ঞাসা থেকে দেখা যায় যে সম্যকরূপে উপলব্ধি না করলেও তিনি অনুভব করেছিলেন যে ধারণা, রীতি ও বিশ্বাসের এক সংগঠন

হিসাবে হিন্দুধর্ম ধ্বংসোন্মুখ! হিন্দুধর্মের এই ধ্বংস সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে তার যোগাযোগেরই ফল, যে সামন্ততন্ত্র নতুন বুর্জোয়াতন্ত্রকে অনিবার্য-ভাবেই স্থান ছেড়ে দেওয়ার উপক্রম করছিল। বুর্জোয়াদের দরকার ছিল অন্য এক ধর্মের ; জাতিভেদ-প্রথার কুসংস্কার মেনে চলা ধনতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে খাপ খায় না। ধর্ম-সংস্কারের সংগ্রামের মধ্যে ভবিষ্যত-বুর্জোয়াদের দাবি লক্ষ্য করা যায়—যেমন, বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা, কর্ম-প্রচেষ্টার স্বাধীনতা,...ইত্যাদি অর্থাৎ বুর্জোয়া স্বাধীনতা বলতে যা বোঝায় সব কিছুই। ধর্মই ছিল তখন পুরোপুরি অনুন্নত প্রাচ্য-সমাজের একমাত্র বোধগম্য মতবাদ।

এই জন্যই সামাজিক অগ্রগতির সব প্রশ্নই এখানে ধর্মের আবরণে দেখা দিত। সেই প্রশ্নসমূহের গঠনমূলক সমাধান খুব বড় একটা প্রগতিশীল ধাপ ; মধ্যযুগীয়তা এবং তার অন্ধকার ও জাতিপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামী রামমোহনের বিরাট দান এইখানেই।

সতীপ্রথা এবং সদ্যজাতা শিশুকন্যা হত্যার বিরুদ্ধে রামমোহনের যে সংগ্রাম তার তাৎপর্য শুধু বর্বরতা-বিরোধিতার দিক থেকেই নয়, তা ছিল সঙ্গে সঙ্গে নারীর পুরুষের সমকক্ষ হওয়ার অধিকার এবং মানুষ হিসাবে তার স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারের এক ধরনের স্বীকৃতি।

১৮১১ সালে রামমোহনের নিজের ভ্রাতৃবধূ শেষ পর্যন্ত মরীয়া হয়ে স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যান। রামমোহনের দিক থেকে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার এটা একটা পরোক্ষ কারণ ছিল।

"নারীর প্রাচীন অধিকার" প্রবন্ধে রামমোহন দেখিয়েছেন যে, আধ্যাত্মিক দিক থেকে নারী পুরুষের সমান তো বটেই, আইনের চোখেও তাকে সমান অধিকার দিতে হবে। উত্তরাধিকারসূত্রে তার সম্পত্তি পাবার অধিকার থাকবে।

রামমোহনের রচনাবলীর দিকে তাকালেই বোঝা যায় তিনি সাহিত্যে কত বড় ঐতিহ্যের স্রষ্টা। প্রচারমূলক লেখা, ধর্মানুসন্ধান, ব্রহ্মোপাসনা, সংস্কৃত থেকে অনুবাদ, এমন কি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ নিয়েও তিনি লিখে গেছেন।

বাংলায় গদ্য-রীতির তিনিই প্রথম প্রবর্তক। সমস্ত কারণেই তাঁকে বলা হয়, 'বাংলা গদ্যের জনক।' 'আধুনিক সাহিত্যে' রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

'রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিট্-স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জনদশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন।' রামমোহনের সৃষ্ট সাহিত্য বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ উন্নতির ভিত্তি হয়ে দাঁড়াল। সংস্কৃত ছিল অভিজাত শ্রেণীর ভাষা। সে জায়গায় বাংলা ভাষার প্রচলন করে গদ্য-সাহিত্যকে তিনি ব্যাপকতর অংশের কাছে সহজ-গ্রাহ্য ক'রে তুললেন। এ থেকে দেখা যায়, দেশের বলতে যা-কিছু তার ওপরই তাঁর অগাধ ভালোবাসা ছিল। রামমোহনের পরে যারা জন্মেছেন, তাঁদের মধ্যে এই লক্ষণটিই জাতীয়তাবোধ হয়ে ফুটে উঠেছে। বাঙালীমাত্রেরই যে জনবোধ্য মাতৃভাষার প্রয়োজন তা সমাজ-বিবর্তনের তাগিদেই অনুভূত হয়েছিল। সমাজ এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল, যখন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্যে সবাইকে মেলাতে পারে এমন একটি সার্বজনীন ভাষার দরকার হয়। লেনিন বলেছেন, 'দেশের ভেতরকার বাজারের ওপর পুরোপুরি দখল ও অর্থনৈতিক আদান-প্রদানের অবাধ স্বাধীনতার জন্যে জাতীয়তা ও ভাষাগত ঐক্য খুব জরুরী হয়ে দাঁড়াল (ভি, আই, লেনিন, রচনা সংগ্রহ, ১৭শ খণ্ড, পৃঃ ১৪৭)। অর্থাৎ ঐতিহাসিক দিক থেকে একটি দেশের ধনতান্ত্রিক বিকাশের পক্ষে একটি সার্বজনীন জাতীয় ভাষা না হলে চলে না। এর সঙ্গে জাতিগঠন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

বাঙালীর জাতি-গঠনের ইতিহাসে রামমোহনের দান বিশেষভাবে স্মরণীয়।

রামমোহনের প্রকাশনাকার্য তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এ থেকে বাংলা সংবাদপত্রই শুধু নয়, সর্বভারতীয় জাতীয় সংবাদপত্রেরও গোড়াপত্তন হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতবর্ষে ইংরেজী সংবাদ-পত্র ছাপা হতে থাকে। প্রথম যে সংবাদপত্রটি প্রকাশিত হয় তার নাম 'হিকিজ গেজেট' (১৭৮০-র ২৯শে জানুয়ারী-এর প্রথম সংখ্যা বার হয়)। শ্রীরামপুরের মিশনারীরা প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার-দর্পণ' (প্রথম সংখ্যা ১৮১৮ সালের ২৯শে মে) বার করেন। এই কাগজে হিন্দুধর্মের ওপর ক্রমাগত আক্রমণ হতে থাকায় রামমোহনকে নিজের আলাদা কাগজ বার করতে হয়। ১৮২১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে বি, ভি, বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তায় রামমোহনের এই সাপ্তাহিক মুখপত্রটি প্রকাশিত হয়। অবশ্য পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি নেওয়া হয় গোবিন্দচন্দ্র কাউর ও আনন্দগোপাল

মুখোপাধ্যায়ের নামে। পত্রিকাটির নাম ছিল 'সংবাদ-কৌমুদী'। বাংলা ভাষায় তৃতীয় সংবাদপত্র 'চন্দ্রিকা'র (এপ্রিল, ১৮২৩) সঙ্গেও রামমোহনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। হিন্দুধর্মের বর্বর প্রথার বিরুদ্ধে লেখা তাঁর রচনাগুলি এই পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও রামমোহন ফার্সী ভাষায় আরও দুটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন।

রামমোহন চার চারটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন—এটা কম কথা নয়। তাঁকে নিঃসন্দেহে বাংলা সংবাদপত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। কিন্তু শুধু সংবাদপত্র প্রকাশ করেই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না, তাকে পূর্ণ অধিকারে টিঁকিয়ে রাখার জন্তে এবং তার স্বাধীনতার জন্তে তিনি লড়েছেন। ১৮২৩ সালে সংবাদপত্রের ওপর দ্বিতীয় বিধিনিষেধের (প্রথম বিধিনিষেধ আসে ১৮১৮ সালে। সে সময়কার সেন্সরকর্তা জন অ্যাডাম প্রকাশকদের কাছে এক চিঠি দেন। তাতে বলেন, সরকারকে লোকচক্ষে হেয় করা বেআইনী বলে গণ্য হবে এবং যদি কোন আলোচনার ফলে স্থানীয় লোকের মনে ত্রাস, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব ও সন্দেহের উদ্রেক হয়, তাহলে তা ছাপানো চলবে না।) বিরুদ্ধে "ভারতীয় সংবাদপত্রের" নাম দিয়ে রামমোহন হাইকোর্টে এক দরখাস্ত পাঠান। এই দরখাস্তে তিনি সংবাদপত্রের ওপর বিধিনিষেধ আরোপের বিরুদ্ধে সমগ্র কলকাতাবাসীর প্রতিবাদের কথা জানান। এ কথা অবশ্য ঠিক যে, তাঁর প্রতিবাদ জানানোর ভাষা বড় বেশী মোলায়েম ছিল। তিনি লিখে-ছিলেন, "এর ফলে (সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হওয়ায়—অনু) ভারতবর্ষে শিক্ষাপ্রসারের পথ রুদ্ধ হবে, স্থানীয় শিক্ষিত লোকেরা ইংরেজদের প্রতি বিমুখ হবে এবং ইংরেজদের আর সহায়তা করবে না" (এন, বার্নস্ লিখিত 'ইণ্ডিয়ান প্রেস' বইতে ১২৩-১২৪ পৃঃ উদ্ধৃত)। চিঠির মধ্যে আনুগত্যের সুর থাকলেও হাইকোর্ট তা প্রত্যাখ্যান করেন। রামমোহন তখন সম্রাটের কাছে দরবার করলেন যাতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণকারী বিধিনিষেধের আইন প্রত্যাহার করা হয়। প্রিভি কাউন্সিল তাঁর এই দ্বিতীয় আবেদনটিও নাকচ করে। সংবাদপত্রের আরও বেশী স্বাধীনতার জন্তে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। সংবাদপত্রকে তিনি সংস্কৃতি ও শিক্ষা-বিস্তারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় বলে দেখতে পেয়েছিলেন।

শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রেও রামমোহনের বিরাট ভূমিকা ছিল। ভারতবর্ষে শিক্ষার প্রসার তিনি বরাবর চাইতেন। তিনি মনে করতেন এ দেশের শিক্ষার

স্তর ইওরোপের সমান হয়ে ওঠা খুবই দরকার এবং ভারতীয়দের পক্ষে বিজ্ঞান আয়ত্ত করা অত্যন্ত জরুরী কাজ।

রামমোহন দেখলেন সংস্কৃত শিক্ষা এবং দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। লর্ড আমহার্স্টকে তিনি লিখলেন, "সংস্কৃত শিক্ষা দেশকে অন্ধকারাচ্ছন্ন রাখবার শ্রেষ্ঠ উপায়।" ভারতীয় পণ্ডিতেরা শুধুমাত্র ভগবৎতত্ত্ব বিষয়ক "শিক্ষা" দিতেন; অর্থাৎ, শিক্ষা ছিল শুধুই ধর্মপ্রচার। পার্থিব জিনিসের মধ্যে কেবল ভাষা শেখানো হত, যাতে ছাত্ররা মূল ধর্মগ্রন্থগুলি পাঠ করতে পারে। হাতে-কলমে পরীক্ষা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রমাণসহ বিজ্ঞানশিক্ষার একান্ত প্রয়োজনীয়তা রামমোহনই প্রথম দেখান। তিনি দাবি করেন শিক্ষাকে ধর্ম-নিরপেক্ষ করতে হবে এবং তিনি বলেন যে ভারতীয় বিজ্ঞানের দশা হল ইংলণ্ডের প্রাক্-বেকনীয় বিজ্ঞানের মত। উপরোক্ত চিঠিতে তিনি সরকারকে ভারতবর্ষে এমন এক নতুন শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলন করবার জন্যে অনুরোধ করেন যার মধ্যে থাকবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (গণিত, রসায়ন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রকৃতি-দর্শন, ইত্যাদি)। কিন্তু ইংরেজের নীতি তখন এর সম্পূর্ণ উল্টো; ইংরেজ রাজনীতিকেরা ভারতীয়দের শিক্ষিত করে তুলতে ভয় পেতেন। তার বাস্তব কারণও ছিল। ব্যবহারিক শিক্ষাপদ্ধতির বদলে এক সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করবার প্রস্তাব এল। ভারতবর্ষে রামমোহনই বাস্তবিক প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১৬-তে ডেভিড্ হেয়ার-এর সহযোগিতায় তিনি কলকাতায় "বিদ্যালয়" নামে প্রথম ইওরোপীয় কলেজ শুরু করেন। এই শিক্ষালয়ে ইওরোপীয় এবং ভারতীয় দু-রকম ভাষাই শেখান হত। ১৮১৮-তে এই বিদ্যালয়ে মাত্র ২০ জন ছাত্র ছিল; এবং ১৮২০-তে ছাত্র সংখ্যা ৪৩৬ হয়ে দাঁড়াল। ভারতবাসীর পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার পক্ষে এই দাবিকে শুধুই ইংরেজদের অন্ধ অনুকরণ মনে করলে ভুল করা হবে। রামমোহনের দাবি দেশের পশ্চাৎপদ অবস্থার বিরুদ্ধে মস্ত আঘাত। রামমোহন তাঁর পরিকল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করবার উপায় হিসেবে সম্রাট বা গভর্নরের কাছে যে একান্ত বিনীত অনুরোধের পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন—সে কথা আলাদা। কিন্তু তখনকার বাংলা দেশের অবস্থায় এসব পরিকল্পনার কথা ভাবতে পারাটাই ছিল প্রগতিমূলক।

নিজের দেশের জমির উপর দাঁড়িয়ে এবং নিজের চাহিদা অনুসারে অজ্ঞানের অন্ধকারের বিরুদ্ধে, টুলো শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে, ধর্মমূলক সংরক্ষণ-

শীলতা ও বর্বরতার বিরুদ্ধে, মধ্যযুগীয় অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামী হিসেবেই রামমোহনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ভারতবর্ষের পেছিয়ে-পড়া দশাকে তিনি যে-ভাবে বুঝেছিলেন তার দরুণই তিনি ইংলণ্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছিলেন; তাঁর ধারণায় ইংলণ্ডের পক্ষে এই পেছিয়ে-পড়া অবস্থা দূর করা সম্ভব ছিল।

রামমোহনের নিজের ভাষাতেই, ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর চরম ঘৃণা ছিল; কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই ইওরোপীয়দের সম্বন্ধে তিনি সহনশীল হয়ে উঠলেন এবং ক্রমশ তাদের পক্ষপাতী হতে শুরু করলেন, বুঝতে শুরু করলেন যে যদিও তাদের সরকার বিদেশী শাসনব্যবস্থাই তবুও তার দরুণ স্থানীয় জনগণের অবস্থার উন্নতি খুব তাড়াতাড়িই হবে (আর্নট কে লেখা চিঠি—'বায়োগ্রাফিকাল এসেজ', ১৮-৪, পৃঃ ৪৬-৫৮, মুলার কর্তৃক উদ্ধৃত)। এই কথাগুলি থেকেই তাঁর রাজনৈতিক রূপটা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। রামোহনের সংগ্রামের মূল বিষয় ছিল সংস্কৃতি এবং শিক্ষা। হয়ত, কালেক্টারি দপ্তরের সেরেস্তাদার হিসেবে তাঁর চোখে পড়েছিল কী ভাবে শিক্ষিতরা কৃষকসাধারণের সর্বাঙ্গীণ সর্বনাশের জন্যে দায়ী। এদিকে "উন্নততর সংস্কৃতিসম্পন্ন বিজেতা" বলতে ইংরেজই প্রথম, আর তাই ভারতীয় সভ্যতার কাছে তাদের নাগাল পাওয়া অসম্ভব মনে হয়েছিল। পল্লী-সমাজকে উৎখাত করে ইংরেজরা ভারতীয় সভ্যতা ধ্বংস করল। উৎসন্নে দিল ভারতীয় শিল্প এবং ভারতীয় সমাজে যা কিছু অসামান্য তাকেই ধূলিসাৎ করল। মার্কস্ বলেছেন, "ভারতে ইংরেজ-শাসনের ইতিহাসের পাতায় ধ্বংস ছাড়া অন্য কথা খুবই সামান্য; এই ধ্বংসস্তূপ পেরিয়ে তাদের গঠনমূলক কাজ চোখে পড়তে চায় না। তবুও এই গঠনমূলক কাজের সূত্রপাত হয়েছে" (মার্কস-এঙ্গেল্‌স্ গ্রন্থাবলী—১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৩)।

রামমোহন শুধুই যে কৃষকদের সর্বনাশ হতে দেখেছিলেন তাই নয়, জনসাধারণের দুর্দশায় নিজে ধনবান হয়েছিলেন। ইংরেজ-শাসনের দরুণ কৃষকদের সঙ্গে সঙ্গে কারিগরদেরও দৈন্য দেখা দিল। রামমোহনের নিজের শ্রেণীর অন্তর্গত অনেক জমিদারও সর্বস্বান্ত হল। রমেশ দত্ত লিখেছেন, সাধারণত ঐতিহাসিকরা যে মনে করেন অমানুষ সিরাজদ্দৌলার শাসনেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে জনসাধারণের অমন দুর্গতি দেখা দিল—যে দুর্গতির কথা মেকলে অমন স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন,—তা ঠিক নয়; আসলে এই দুর্গতি

শুরু হল ইংরেজের কবলে এই প্রদেশ (বাংলা) এসে পড়বার পরই (রমেশ চন্দ্র দত্ত—'পেজান্ট্রি অব বেঙ্গল', কলকাতা, ১৮৭৪, পৃঃ ৪২)। কিন্তু ইংরেজদের এদেশ জয়ের দরুণ মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভাগ্যবানের বরাত খুলে গেল ; রামমোহন তাঁদেরই একজন। ইজারার টাকায় তিনি খুব বড়লোক হলেন। কর্ণওয়ালিসের সংস্কার মারফৎ যে জমিদাররা ইংরেজদের প্রধান স্তম্ভ হয়ে দাঁড়াল, তাঁদেরই কোঠায় পড়েন রামমোহন নিজে কিংবা দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি তাঁর জমিদার-বন্ধুরা। ইংরেজদের মধ্যেই তিনি ভারতের প্রকৃত শাসকশ্রেণীকে দেখতে পেলেন ; তাই ইংরেজদের কাছেই তিনি আবেদন জানালেন এবং তাদের ওপর ভরসা করলেন।

মোটামুটি কী দাঁড়াল দেখা যাক। সাধারণ সিদ্ধান্ত হিসেবে রামমোহনের কয়েকটি দিক যে প্রগতিশীল তা বলা দরকার। স্পষ্ট কথায়, সেগুলি হল : হিন্দুদের মধ্যযুগীয় এবং বর্বর প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষা-পদ্ধতির পক্ষে প্রচার। ভারতবর্ষ যাতে বিচ্ছিন্নতা ঘুচিয়ে বাকি পৃথিবীর সংস্পর্শে আসতে পারে, রামমোহন তার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন। ভারত-বর্ষের পক্ষে ধনতন্ত্রের পথে বিকাশ লাভ করার যে ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল তার দরুণই রামমোহন পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান, পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি, সাধারণভাবে পাশ্চাত্ত্য জীবনধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে আগ্রহান্বিত ছিলেন, এবং তখনকার বাংলা দেশের সমাজের তুলনায় উন্নত স্তরের যে সমাজ তার প্রতি আকৃষ্ট হন। বাংলা সাহিত্যের ভাষা ও বাংলা সংবাদপত্র গড়ে তোলার জন্যেও রাম-মোহনকে ধন্যবাদ দিতে হয়।

রামমোহন সাংস্কৃতিক বিকাশের যে পথ দেখিয়েছেন তা আসলে ভারতবর্ষে ধনতান্ত্রিক বিকাশেরই এক অপরিহার্য অঙ্গ। এই পথে তিনি জাতীয় সংস্কৃতির পূর্বগৌরব ফিরে পাবার সংকল্প করেছিলেন ; কিন্তু তা শুধুমাত্র জাতীয় মুক্তির অবস্থাতেই সফল হতে পারে। তবুও রামমোহনের মতে জাতীয় সংস্কৃতির এই আদর্শ সফল করবার সঙ্গে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের কোন যোগ ছিলনা। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল রামমোহন যে-স্বপ্ন দেখেছিলেন তা সফল করবার বাস্তব চেষ্টা ইংরেজ-শাসনের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে। সে-বাধা শুধুমাত্র সংগ্রামের সাহায্যেই দূর করা সম্ভব—১৮৫৩-তে মার্কস্ যেমন বলেছিলেন, "ইংরেজের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে" তবেই সে-বাধা দূর করা সম্ভব। (মার্কস্-এঙ্গেলস্ রচনাবলী, নবম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৬)।

সংস্কৃতি সম্বন্ধে রামমোহনের ধারণা আর পরবর্তীকালের উদারপন্থীদের ধারণা মূলত একই।

পরবর্তীকালের সামাজিক আন্দোলনের দুটি ধারা—উদারপন্থী নীতি আর জাতীয়তাবাদ—রামমোহনের দার্শনিক ধারণার কাছ থেকেই প্রেরণা পেয়েছে। ভারতের শাসকশ্রেণীর সঙ্গে সহযোগিতা করবার দরুণ, ইংরেজ এবং ইংরেজের সমর্থকরা রামমোহনকে এই বলে প্রশংসা করেন যে, তিনি পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা, সংস্কৃতি ও নীতিজ্ঞানকে সার্থকভাবে গ্রহণ করেছিলেন। জাতীয়তা-বাদী বাঙালীরা রামমোহনের আদর্শ এবং কর্মজীবনের অন্য দিকটা দেখেন। রামমোহনের মধ্যে তাঁরা খুঁজে পান সেই মানুষকে, যিনি বাঙালীকে সাংস্কৃতিক ও জাতীয় বিকাশের নতুন পথ দেখিয়েছিলেন।

এঁরা কেউই ভ্রান্ত নন। কেননা, তখনকার দিনে রামমোহনের পক্ষে বিকাশের এই দুই গোড়াকার ধারাকে মেলানো সত্যিই সম্ভব ছিল। ঐতিহাসিক বিকাশের সঙ্গে এর মিল রয়েছে। ইংরেজদের সঙ্গে রামমোহনের কোন অর্থনৈতিক সংঘর্ষ বাধবার কথা নয়; কেননা তিনি নিজে যে শ্রেণীর লোক ছিলেন, সেই জমিদার শ্রেণীকে ইংরেজরা জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা দিয়েছিল। তবু এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে ইংরেজ-শাসনের মধ্যে রামমোহন নির্জলা ভালো দেখেননি। ইংরেজ-শাসনকে অপরিহার্য অমঙ্গল বলেই তাঁর মনে হয়েছে—যেমনটা তাঁর সমসাময়িক অনেক বাঙালী এবং পরবর্তী অনেক বুর্জোয়া রাজনীতিকেরই মনে হয়েছিল।

সমাচার-দর্পণ

বিমলচন্দ্র ঘোষ

ছবি : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

খাতচুক্তি

বন্দরে আসে মার্কিনী গম
মুন্সীর তাই পুলকিত মন
লর্ড ক্লাইভের আদ্যিকালের
গদিতে কায়েম মুন্সী।
দেশজুড়ে চলে মহা অনশন
কী উদার- মন মুখে রামায়ণ
কোমরে গোপন চুক্তির পণ
চরকায় কাটা মুন্সী।

কাশ্মিরী কেল্লা

গুঁড়ি মেরে মুড়ি দিয়ে কাশ্মিরী শাল
পিঠে ভাগে মেতে ওঠে চতুর বিড়াল
দুই পাবে দুই মুষু ঘোরায় লাঠি
বাস্তহারার লাগে দাঁত-কপাটি।
এ বলে আমায় ভাখ্ ও বলে আমায়
বিড়াল আপন মনে কেল্লা বানায়।

জাতীয় শিল্পোন্নয়ন

ফুলে ওঠে দামোদর ভাসে ময়ূরাক্ষী
শিল্পোন্নয়নের শ্রীগোপাল সাক্ষী
দুম্‌দাম্ হাঁক ডাক হিসাবের অন্ত
পাওয়া ভার ভেঙে যায় দু'পাটির দন্ত
রাঘববোয়াল যতো আশে পাশে ঘুরছে
যে যা পায় হাসি মুখে দু'পকেটে পুরছে।

অন্ন-সমস্যা

সত্তর টাকা চালের দাম ?
খাওয়া কমান ! খাওয়া কমান !
করুণানিদান মন্ত্রীপ্রধান শোনান হাত-পা নেড়ে :
ঘাস খান বুনো ঘাস ছেঁটে খান
ঘাস খেয়ে বৃষ-মহিষের প্রাণ
তেজী বলিয়ান কচু ঘেঁচু খান পরমায়ু যাবে বেড়ে।
না খেয়ে মরুন ক্ষতি নেই তাতে
স্বর্গে যাবেন শুধু অপঘাতে
ক্ষিধের জ্বালায় সরকারী চাল খাবেন্ না যেন কেড়ে।

পরীক্ষামেধ যজ্ঞ

বাপের মুখের রক্ত ওঠা এগ্‌জামিনের টাকায়
পরীক্ষা দেয় গরীব ছেলে। কর্তারা প্যাঁচ পাকায়
পাশ করলেই বাড়বে বেকার বলেন পরীক্ষকে
বিশ্ববিদ্যা ফুটো জাহাজ ওঠাও এবার ডকে।
শিক্ষাসচিব বজ্র করেন নম্বর যায় কাটা
গরীব ছেলের গরীব বাপের হায়রে কপাল ফাটা।

ইউ. এন্. ও

সোনা ব্যাং কোলা ব্যাং বুড়ো ব্যাং কুনো,
ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর গানে মাৎ করে 'উনো'
খুদে ব্যাঙাচিরা নাচে চারিদিক ঘিরে
তিড়িং তিড়িং লেকসাকসেস তীরে
চেটে পুটে খেতে চায় কোরিয়ার মাটি
মহাচীন সোভিয়েট শান্তির ঘাঁটি।

ফুয়ারের নবজন্ম

নবযুগ ফুয়ারের কী করুণ কংগ্রেসী মণ্ডপ
বিয়ারসেলায় নয়। ট্যাণ্ডনের যাগ-যজ্ঞ-তপ
বেমালুম ভেসে গেল নিদারুণ ভাঙনের স্রোতে
কৃপাভ্রষ্ট কৃপালনী অট্টহাসি হাসে দূর হ'তে।
অহিংসার স্তম্ভ ফুঁড়ে মহামন্ত্রী নরসিংহ বেশে
গণতন্ত্রে গলা টিপে মহোল্লাসে ধরেছেন ঠেসে।
এবার নিস্তার নেই অন্তরীক্ষে বাপুজী সর্দার
হতভম্ব। চক্ষুলজ্জা ঘোচালেন প্রসন্ন ফুয়ার।

মার্কিনী ঘাঁটি

নিপ্পনে শ্যামু খুড়ো নয়া চক্রান্তে
সন্ধ্যমুক্ত মহাচীনের উপান্তে
গড়ছেন মার্কিনী শিবিরের সামুরাই
ফৌজী আওয়াজ তুলে বান্‌জাই বান্‌জাই,
শান্তির নাম শুনে রেগে জলে পুড়ছে
মাথার ওপরে শ্বেত কপোতেরা উড়ছে।

সতী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

রাস্তার ধারে একটা লোক মরে পড়ে আছে।

আগের দিন পাড়ায় কেউ তাকে মরার আয়োজন করতে ছাখে নি। তীর্থগামিনী পিসীকে হাওড়া স্টেশনে গাড়ীতে তুলে দিয়ে প্রায় রাত এগারোটার সময় নরেশ বোধ হয় শেষ বাসেই রাস্তায় প্রায় ওখানটাতেই নেমেছিল।

সে নাকি পাড়ার চেনা ঘেয়ো কুকুরটাকে ঠিক ওইখানে থাবায় মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে দেখেছিল। তাকে বাস থেকে নামতে দেখে কুকুরটা অতি কষ্টে উঠে এসে কাছে দাঁড়িয়ে লেজ নেড়েছিল। নরেশের বড় ভয় হয়েছিল, কুকুরটা পাছে কামড়ে দেয়।

কাজেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে রাত এগারোটার আগে লোকটা ঘেয়ো কুকুরটার জায়গা বেদখল করে চিৎ হয়ে শুয়ে মরে নি। শেয়াল কুকুর ছাড়া রাত্রিবেলায় কেউ তাকে মরতে ছাখেনি।

ভোরে উঠে দেখা গেল। রাত্রে কোথা থেকে এসে এইখানে শুয়ে মরেছে। কাউকে না জানিয়ে চুপি চুপি,—একা। জগতে এতটুকু অশান্তি সৃষ্টি না করে।

কোমরে এক ফালি স্তাকড়া জড়ানো। মরেও লজ্জা বজায় রেখেছে। অথবা বলা যায়, লজ্জা বজায় রেখে মরেছে।

দেহটা অত্যধিক শীর্ণ শুকনো, যাকে বলে কঙ্কালসার। মাথায় একরাশি ধুলোয় মলিন রুক্ষ চুল, মুখে ইঞ্চিখানেক গোঁপ-দাড়ি গজিয়েছে। তবে দেখে অনুমান করা যায় যে লোকটা এককালে চুলও ছাঁটত, দাড়ি-গোঁপও কামাত, দু'তিন-মাস সেটা বাদ গেছে। গলায় সুতো দিয়ে ঝোলানো আস্ত সুপারির মত কালো কাঠের সুন্দর বৈষ্ণবী খোলের মাদুলিরূপী নিদানটি পাঁজরের উপর পড়ে আছে। বাঁ হাতের কনুইয়ে তিনটি মাদুলি, মানুষকে যা রোগ দুঃখ বিপদ আপদ থেকে ত্রাণ করে।

ভূতনাথ বলে, রোগে মরেছে মনে হয় না। রোগে এমন রোগা হলে আর উঠে আসতে হত না, যেখানে শুয়েছিল সেখানেই মরত।

অভয় বলে, না মরলেও রোগেই মরেছে। যা ভাবছ তা চলবে না। এদেশে বাবা না খেয়ে কারো মরা চলবে না। আমেরিকার গম আসছে, দু'চার মণ এসেও গেছে।

বিমল বলে, না খেয়ে কেউ মরেও না। হার্টফেল করে মরে। হার্ট ফেল করে মরা ছাড়া গতি নেই মানুষের, তোমরা বলবে স্টার্ভেশন।

শচীন বলে, না বলাই উচিত। দেশের একটা মানসম্মান আছে তো? অন্য দেশে শুনলে ভাববে কি?

নরেশ ছেলেমানুষ, একটু ভাবপ্রবণ। কেউ মরেছে শুনলেই তার কষ্ট হয়, নিজের চোখে মরণ দেখলে তো কথাই নেই। সে বিরস বিষণ্ণ মুখে বলে, খুনটুন হয়নি তো?

—খুন হয়েছে বৈকি। নইলে যোয়ান বয়সে মানুষটা মরে?

—ছোরাটোরা মেরে নয়, না? তাহলে রক্ত পড়ত। বিষটিষ খাইয়েছে?

—আরে বোকা, বিষ হোক যাই হোক, কিছু খেতে পেলে কি মরত?

অল্পে অল্পে বেলা বাড়ে।

রেশন আনা বাজার করা ওষুধ কেনা ছাড়াও হাজারটা কাজে মানুষ এদিক ওদিক যায় আসে। রাস্তায় লোক চলাচল বাড়ে, বাস লরী মোটর গাড়ীর হর্নের আওয়াজ অবিরাম হয়ে ওঠে। লোকে চোখ তুলে মৃতদেহটার দিকে তাকায়, কেউ একটু দাঁড়ায়, কাছাকাছি কয়েকজন যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের প্রশ্ন করে। কেউ তাকাতে তাকাতেই চলে যায়।

সময় নেই, উপায় নেই, স্পৃহা নেই। এক মুহূর্ত দাঁড়ালে হয়তো ফসকে যাবে আজও লাইনে দাঁড়িয়ে কয়েক ঘণ্টা ধন্না দিয়ে জরুরী দরকারী জিনিষটা পাওয়া, হয়তো লেট হয়ে যাবে কাজে। অর্দ্ধপুষ্ট অপুষ্ট শরীরে আর টানা যায় না বাঁচার লড়াই, খিদের ক্লান্তিতে ঘোলাটে মনের আকাশে দুর্ভাবনার মেঘে ঢেকে গেছে সব কৌতূহল আর শ্মশান-বৈরাগ্যের ব্যথা বোধ, খেদের অবিরাম বিদ্যুৎ ঝলকানিতে জ্বলে গেছে চাক্ষুষ মরণকেও খাতির করার সাধ।

না, সত্যিকারের মরণকে নয়। সে মরণকে তুচ্ছ করার সাধ থাকলেও সাধ্য নেই। মরে তো গেলিই শেষপর্যন্ত, ডাস্টবিন ঘেঁটে ঘেঁটে খাদ্য খুঁজে খুঁজেই মরে গেলি, পুলিশের গুলি খেয়ে মরতে পারলি না বোকা হারামজাদা? তোকে নিয়ে কত হৈ চৈ করা যেত!

রেশনের দোকানে আজ অসম্ভব ভিড়। নতুন হপ্তা আজ শুরু হল। রেশন নিয়ে গেলে তবে বাড়ীতে আজ হাঁড়ি চড়বে।

নইলে পাঁচ সিকে সের চাল কেনা, নয় তো উপোস দেওয়া। মাসের এই শেষ হপ্তায় রেশন ছাড়া ক'জনেরই গত্যন্তর আছে?

ঘড়ি আর ভিড়ের দিকে তাকালে ভরসা কমে আসে। মড়াটার জন্যই যথাস্থানে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করতে দেরী হয়ে গেছে দীননাথ আর অভয়ের। মানুষটা এসে মরেছে একেবারে বাড়ীর সামনে।

—ভাত খেয়ে আজ আপিস যাওয়া ঘটবে কি অভয়?

—দেখা যাক।

লাইন দিতে হয় না, দোকানের টেবিলে কার্ডগুলিই পর পর ঘাড়ে চেপে লাইন দেওয়ার প্রতীক হয়ে স্তূপ হয়েছে। রেশন কার্ডে এঁটে বাঁধা মানুষ-গুলির এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে জটলা করা চলে।

তবে, নিরুপায় হয়ে শুধু জটলা করাই সার। আশ্বিনের সকালের উজ্জ্বল মধুর আকাশ বাতাস, প্রাণ কেন শারদোৎসবের ছোঁয়াচ আঁচ করতে পারে না কে জানে।

দেখা যায়, ছেলে কোলে একটি বৌ এগিয়ে আসছে ক্লান্ত মন্থর পায়ে। খানিক এগিয়ে থেমে দাঁড়িয়ে কি যেন বলছে পথের ধারের দোকান অথবা বাড়ীর মানুষকে। পরণের কাপড়খানা দেখে তফাৎ থেকে ভিখারিণী মনে হয় না।

রেশনের দোকানের সামনে এলে দেখা যায়, ছেঁড়া আর ময়লা হলেও পরণে তার তাঁতের রঙীন শাড়ী। বিবর্ণ বিশীর্ণ মুখে কোটরে বসা চোখ, তেলের অভাবে একরাশি ঘন চুল জট বাঁধছে। শুকিয়ে আম্‌সি বনে গেছে কোলের বছর দেড়েকের উলঙ্গ ছেলেটা, যেন নেশার ঘোরে ঢুলু ঢুলু চোখে চেয়ে আছে বড় মানুষদের ভিড়টার দিকে।

পৃথিবীতে নবাগত শিশু। খিদে পেলেই চেঁচিয়ে পাড়া মাত করার অধিকার সে যেন ত্যাগ করেছে। খিদের খিদের ঝিমিয়ে গিয়ে খিদের নেশায় ধুঁকবার অধিকার পেয়ে!

—এদিকে একটা মানুষকে দেখেছ বাবুরা? পাগলের মত দেখতে? কোমরে একটা কানি জড়িয়েছে, খুব চুল দাড়ি হয়েছে? দেখেছ, মোর সোয়ামীকে?

স্বামী আর সিঁদুর কিনা একাকার সবার চেতনায় তাই প্রথমেই স্বামীদের মনে হয় যে বৌটার কপালে আর সীঁথিতে যা লেপা আছে তা আসল সিঁদুর নয়, দেখলেই বোঝা যায় যে জল দিয়ে শানে পোড়া ইঁট ঘষে সিঁদুর বানিয়েছে—এই সিঁদুর সিঁথিতে যতটা পারে গাদা করে চাপিয়েছে, কপালের টোটাটা করেছে মস্ত। তাকালেই যেন লোকে বুঝতে পারে যে সে বৌ—গেরস্ত ঘরের বৌ।

ভূতনাথ ভাবে, হায়রে, সহরে বিজ্ঞানের এত চোখ ঝল্‌সানো বিজ্ঞাপন, সহরে এসে তোকে ইঁটের গুঁড়ো দিয়ে নিজের গায়ে এই বিজ্ঞাপন আঁটতে হয়।

একজন বলে, কোনদিকে গেছে, স্বামীকে কোথায় খুঁজে বেড়াবে?

—এদিকে কাছে কোথা আছে। না খেয়ে ধুঁকছে মানুষটা, দূরে কোথা যাবে বাবু? যাবার শাখ্যি পাবে কোথা?

সেও ধুঁকতে ধুঁকতেই কথা বলে, প্রাণহীন স্তিমিত চোখে তাকায়।

—তোমার ঘর কোথা?

—সে অনেকদূর গাঁয়ে। মানুষটারে ভাখোনি বাবু কেউ?

ভূতনাথ বলে, এগিয়ে ভাখো তো, জলের কলটার কাছে, সাদা বাড়ীর সামনে। ওরকম একজন শুয়ে আছে দেখলাম যেন।

—শুয়ে আছে, না বাবু?

—শুয়ে আছে না বসে আছে কি করে বলব বল?

—মরে যায় নি? শুধু শুয়ে আছে? না বাবু?

নরেশের সর্বাঙ্গে কাটা দেয়।

কাঁদ কাঁদ মুখে বলে সে তুমি আমার সাথে এসো। ও বোধ হয় অন্য লোক।

নরেশদের বাড়ীটা পড়বে আগে—মড়ার কাছে পৌঁছবার আগে। পাশের একটা গলির মধ্যে ঢুকেই তাদের বাড়ী।

নরেশ ভাবে, আগে বাড়ীতে নিয়ে একে কিছু খেতে দেবে। বাচ্চাটাকে একটু দুধ সে খাওয়াবেই। সেজন্য বাড়ীর লোকের সঙ্গে মারামারি করতে হলে মারামারি করবে।

কোন প্রশ্ন করে না কেন বৌটা? তার স্বামীর মত একজন রাস্তার ধারে

শুয়ে আছে শুনে ব্যাকুল হয় না কেন? লোকটা যদি সত্যি এর স্বামী হয়, মরে গেছে দেখে কিভাবে হাহাকার করে কেঁদে উঠবে, কিভাবে কপালে হাত দিয়ে বসে পড়বে নয় আছড়ে পড়বে—সেই মর্মান্তিক নাটকের কথা ভেবে তার নিজের বুকটা যে ধড়ফড় করছে!

কিন্তু দাঁড়িয়ে দেখতে হবে শুনতে হবে সব। পালিয়ে গেলে চলবে না। কাঁদাকাটার পালা চুকলে কি নাম কোথা থেকে এসেছে কি ভাবে কি ঘটেছে সব বিবরণ জেনে নিতে হবে।

গলির মোড়ে পৌছে নরেশ বলে, বাচ্চাটাকে একটু দুধ খাইয়ে নেবে এসো।

—আগে দেখে আসি। শুয়ে আছে, না? ঘুমিয়ে আছে?

ধীরে ধীরে পা টেনে টেনে সে হাঁটে। তফাৎ থেকে দেহটার পড়ে থাকার রকম আর কাছে দাঁড়িয়ে কিছু লোককে জটলা করতে দেখেও সে একটু জোরে হাঁটে না।

মানুষের শুয়ে থাকা, ঘুমিয়ে থাকা আর মরে পড়ে থাকা যেন সমান হয়ে গেছে তার কাছে।

সিধুর দোকানের সামনে রোয়াকে একজন পুলিশ উবু হয়ে বসে আছে। মৃতদেহটা সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

কাছে এসে দাঁড়ায় বৌটি। একদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। নিস্পৃহভাবে বলে, মরে গেছে, না?

—হ্যাঁ। তোমার স্বামী নয়?

বৌটি মাথা হেলিয়ে জানায় মড়াটা তারই স্বামী।

নরেশ থ' বনে থাকে। এ কেমন বৌ, অ্যাঁ? রক্ত-মাংসের জীবন্ত মানুষ তো? না, মৃত স্বামীর টানে—? গা শির্ শির্ করে নরেশের!

হঠাৎ চোখের সামনে শূন্যে মিলিয়ে না গিয়ে সকাল বেলার তাজা রোদে দেহের ছায়া ফেলে তাকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নরেশ সবে একটু স্বস্তি বোধ করতে আরম্ভ করেছে, হঠাৎ যেন প্রাণ পায় বৌটি। বাচ্চাটার দু'পা ধরে শূন্যে তুলে প্রাণপণে রাস্তায় আছাড় মারে। মাথার খুলি চূর্ণ হয়ে যায়। তারপর নিজে ঝাঁপিয়ে পড়ে চলন্ত বাসটার সামনে।

প্রমাণ হয়, কপালে আর সিঁথিতে অত করে ইঁটের গুঁড়োর সিঁদুর লাগালেও বৌটি সেকালের স্ট্যাণ্ডার্ডের খাঁটি সতী নয়, তা হলে বাসের সামনে ঝাঁপ দিতে হত না, মৃত স্বামীকে দেখে আপনা হতেই প্রাণপাখী বেরিয়ে যেত। না খেয়ে না খেয়ে মর মর অবস্থাতেও তার বদলে মরতে কিনা দরকার হল চলন্ত বাসের।

সোভিয়েট লেখকদের মধ্যে

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

সম্প্রতি সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণ উপলক্ষে সেখানকার সাহিত্যিকমণ্ডলীর সঙ্গে পরিচয় লাভের সুযোগ পেয়েছিলাম। এর আরেকটি কারণ এই যে, সোভিয়েট রাশিয়ায় আমরা ছিলাম মস্কো লেখক সংঘের অতিথি।

মস্কো, লেনিনগ্রাদ, তিব্‌লিসি, তাসখণ্ড সর্বত্র লেখক, কবি, নাট্যকার সংঘ আমাদের অভ্যর্থনা করেছেন। কেবল ভাবের আদানপ্রদান নয়, ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কৃতির সঙ্গে আদানপ্রদানের জন্যে তাঁদের আগ্রহ দেখেছি। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রেণীসংঘর্ষ বর্জিত যে নূতন সভ্যতা গড়ে উঠছে, এই সমস্ত লেখক তাকে লালন করবার ভার নিয়েছেন। অনেকের সঙ্গে আলাপ করে এঁদের মনের প্রসারতা দেখে মুগ্ধ হলাম। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এঁরা দেশবিদেশের গণ্ডি অতিক্রম করে সর্বমানবের কল্পনার কুহকমুক্ত জ্ঞানের সাধনাকে গ্রহণ করেছেন। এঁরা অনেকেই জানেন যে, ভারতের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার আবরণে অতীতের মহার্ঘ চিন্তাসম্পদ রয়েছে—মহাভারত, রামায়ণ, কালিদাস এঁরা অনুবাদ করেছেন ও করছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের চল্‌তি ভাষা, আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে এঁদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য খুব বেশি। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, প্রেমচন্দ, কিষেণ চন্দর প্রভৃতির রচনা রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ভবানী ভট্টাচার্যের ইংরেজি ভাষায় লেখা বই 'সো মেনি হাঙ্গারস্‌' রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং প্রায় লক্ষাধিক সংখ্যায় বিক্রিত হয়েছে। বড় বড় লাইব্রেরিতে, এমন কি শ্রমিকদের সংস্কৃতিভবনের পাঠাগারে ভবানীবাবুর বই দেখেছি। মুল্‌করাজ আনন্দের 'কুলি' উপন্যাসখানির অনুবাদও দেখেছি। ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি সোভিয়েট জনগণের অনুরাগ ও আগ্রহের বহু পরিচয় পেয়েছি এবং সোভিয়েটের সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক অগ্রগতি দেখে আনন্দিত হয়েছি।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভাবের আদানপ্রদানের এই আগ্রহ সম্পর্কে আমাদের ভারতীয় দূতাবাস একেবারেই উদাসীন। অবশ্য ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রদূত ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ মস্কোর বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর নিকট সমাদৃত। তিনি

সোভিয়েট মন্ত্রিমণ্ডলী ও পণ্ডিতগণের সঙ্গে মেলামেশা করেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতীয় দূতাবাসের অন্যান্য কর্মচারীরা ভারতের জাতীয় সাহিত্য সম্পর্কে গভীরভাবেই অজ্ঞ এবং স্থানীয় লেখকেরা সেই কারণেই বোধ হয় এঁদের কাছে বিশেষ কোন সাহায্য পান না। পক্ষান্তরে আমেরিকা ও বৃটেনের দূতাবাসে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়। মস্কো লেখক সংঘের প্রতিনিধিরা বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে খুবই শ্রদ্ধাশীল এবং বললেন, যদি তোমাদের প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ কিংবা অন্যান্য বেসরকারী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আধুনিক বাংলা রচনা ইংরেজি অনুবাদসহ আমাদের কাছে পাঠান, তাহলে এখানে প্রকাশের ব্যবস্থা আমরা নিশ্চয়ই করব।

এইবার সাহিত্যিক ও কবিদের সংঘের কথা বলি। এখানে সংঘে স্থান পেতে হলে তার পূর্বে একটা প্রস্তুতি আবশ্যক। তরুণ-তরুণীদের কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক রূপে তৈরি করে তুলবার জন্য এঁরা 'গর্কি লিটারারি ইন্‌স্টিট্যুট' প্রতিষ্ঠা করেছেন—কতক সরকারী সাহায্যে এবং লেখক ইউনিয়ন দ্বারা এই প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। এখানে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সাহিত্যরচনা ছাড়াও ভাষাতত্ত্ব, বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের ইতিহাস ও মার্কসীয় দর্শন প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। আমরা এখানে আমন্ত্রিত হয়ে ছাত্র ও অধ্যাপকদের সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা ছিলাম। মঙ্গোলিয়া থেকে সোভিয়েটের প্রত্যেক রিপাবলিকের ছাত্রছাত্রী এখানে দেখলাম। এছাড়া বুল্‌গেরিয়া, রুমানিয়া থেকেও শিক্ষার্থীরা এখানে আছেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৭০। এখানে পাঁচ বছর ধরে অধ্যয়ন ও শিক্ষানবিশী করতে হয়। ছাত্রছাত্রীরা বিনা ভাড়ায় রেলে, ট্রামে ও বাসে যাতায়াত করে। গুণ অনুযায়ী ২৫০ থেকে ৮০০ রুব্‌ল্ মাসিক ভাতা পায়। বাপমায়ের উপর নির্ভরশীল ছাত্রসংখ্যা অতি অল্প। সরকারী রেস্তোরাঁয় এরা সস্তা দামে খাবার পায়। ছাত্রদের আগ্রহে আমরা আত্মপরিচয় ও দেশের পরিচয় দিয়ে কিছু কিছু বললাম। মঙ্গোল, সাইবেরিয়ান, আজারবাইজান, কাজাক, রুশ, উক্রেন প্রভৃতি নানা দেশের ছাত্রছাত্রীরা ভারতের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের প্রশ্ন করল। এদের প্রশ্নের ভঙ্গি থেকে বুঝলাম এখানে পল্লবগ্রাহিতার স্থান নেই। বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিকেরা এখানে এসে নিয়মিতভাবে অধ্যাপনা করে থাকেন। বিদেশী লেখকদেরও বক্তৃতার ব্যবস্থা

আছে। এই প্রতিষ্ঠান থেকে ডিপ্লোমা পাবার পর ছেলেমেয়েরা লেখক ও সাংবাদিক সংঘের সভ্য হয় এবং তাদের কর্মজীবন আরম্ভ হয়।

সোভিয়েট সমাজে কবি, লেখক, শিল্পীদের সমাদর সর্বত্র। বুভুক্ষু সাহিত্যিকদের লেখা নিয়ে সম্পাদক বা প্রকাশকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয় না। বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক অজস্র পত্রিকা তো আছেই তার ওপর রাষ্ট্র থেকে ভাল বই প্রকাশ, বিক্রয় ও বিতরণের ভাল ব্যবস্থা আছে। সমগ্র দেশে নিরক্ষরতা দূর তো হয়েছেই, পাঠস্পৃহাও প্রবল। বহু সাহিত্যিক ফরাসি, জার্মান, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষা থেকে শ্রেষ্ঠ বই অনুবাদ করছেন এবং তা লক্ষ লক্ষ পাঠক-পাঠিকার হাতে পৌঁছে দেবার সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা আছে। একটি লাইব্রেরিতে শ্রমিক ঘরের ১৩ বছরের মেয়ে ভিক্টর হুগো-র 'নাইন্‌টি থ্রি' পড়ছে দেখলাম। মস্কোয় শিশু-সাহিত্য প্রকাশের এক বিরাট প্রতিষ্ঠান রয়েছে। লেখক সংঘ এটি পরিচালনা করেন। তাঁদের নির্বাচিত বই ছাড়া অন্য কোন রকমের বই ছেলেমেয়েদের হাতে দেওয়া হয় না। আজগুবি কল্পনা, খুন-জখম, চুরি-ডাকাতি, ডিটেক্টিভ গল্প আদৌ নেই। বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের উপযোগী প্রায় তিন শো বই বছরে প্রকাশিত হয় এবং বছরে প্রত্যেকটি বইয়ের প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ কপি বিভিন্ন পাঠাগারে পাঠানো হয়। এদের পাঠচক্রগুলিতে কেবল বিনামূল্যে পড়বার সুযোগই দেওয়া হয় না, বুঝিয়ে দেবার জন্যে শিক্ষয়িত্রীরাও থাকেন। শিশু-সাহিত্যের উন্নতির জন্য গবেষণারও ব্যবস্থা আছে।

সোভিয়েট রাশিয়ার সাংস্কৃতিক জীবনের মানদণ্ড উন্নত করবার ভার যাঁদের হাতে, তাঁরা যাতে নিরুদ্বিগ্নে স্বচ্ছল জীবন নির্বাহ করতে পারেন, সোভিয়েট রাষ্ট্র ও সমাজ সেদিকেও অবহিত। সোভিয়েট রাশিয়ায় কায়িক শ্রম ও মানসিক শ্রম—দুটোকেই সমান মর্যাদা দেওয়া হয়। উপার্জনের তারতম্যে মর্যাদার ব্যতিক্রম হয় না। এই মানসিক অবস্থাটা যে কী, তা বাইরে থেকে বোঝা কঠিন। আমরা বৈষম্যমূলক সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে বাস করি, কাজেই নির্মম প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে জীবিকার সংগ্রামটাই আমাদের নিকট স্বাভাবিক এবং অধিকাংশের জীবনের অচরিতার্থতা ও ব্যর্থতা দৈব ঘটনা মাত্র। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার অবস্থা ঠিক এর বিপরীত। এখানে দেখেছি বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার সিমোনভ তরুণ বয়সেই বিখ্যাত 'স্টালি-

রাব্রি গেজেটে-এর সম্পাদক। কী ধৈর্য ও যত্নের সঙ্গে তিনি তরুণ লেখক লেখিকাদের তৈরি করছেন।

রচনা উৎকৃষ্ট হলে প্রখ্যাত বা অখ্যাত লেখকরাও পূর্ণ মজুরী পান। মজুরীর হার মোটামুটি এইরকম।—

কবিরা প্রত্যেক লাইনের জন্ম গুণানুসারে ৮ থেকে ২০ রুব্‌ল্ (১ রুব্‌ল্= ১৵০ আনা) পান। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস বিষয়ের প্রবন্ধের মজুরী দেড় হাজার থেকে আড়াই হাজার রুব্‌ল্। সমসাময়িক বিষয়ে দৈনিক সংবাদপত্রে আলোচনার মজুরী প্রতি কলম ১০০ রুব্‌ল্। লেখক সংঘ কর্তৃক নির্বাচিত উপন্যাসের জন্ম প্রতি ১৬ পৃষ্ঠার মূল্য আড়াই হাজার রুব্‌ল্। উপন্যাসের পরবর্তী সংস্করণের মজুরী প্রথম সংস্করণের মোট মজুরীর শতকরা ৬০ ভাগ। এ ছাড়াও লেখার দরুণ ফিল্‌ম্, রেডিও, থিয়েটার থেকেও লেখকদের প্রচুর রোজগার হয়।

গুণী জ্ঞানী লেখকদের সমাদর যে কী ব্যাপক ও গভীর আমাদের দেশের মাপকাঠিতে তা বিচার করা কঠিন। সাহিত্য, ললিতকলা ও শিল্পের সাধক-জনের চিন্তার ঐশ্বর্য বিস্তারের অবাধ সুযোগ দেখে মনে হয়েছে প্রকৃত গণ-তান্ত্রিক স্বাধীনতার মর্মকথা এরাই উপলব্ধি করেছে। সেই কারণেই এরা আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক মিলনকে শান্তি ও সৌহার্দ্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এদের সাহিত্যরচনায় যুদ্ধ, হিংসা, জাতি-বিদ্বেষ, বর্ণ-বিদ্বেষের স্থান নেই। আজ মার্কিন-ইংরেজের প্রচারযন্ত্র থেকে প্রচুর বিদ্বেষ-বিষ সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে ছড়ানো হচ্ছে। অথচ সোভিয়েট লেখকদের মুখে আমেরিকার বিরুদ্ধে একটি বিদ্বেষের বাণীও শুনলাম না। বরঞ্চ, অনেকেই আমেরিকার প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করলেন। জর্জিয়ার তিব্‌লিসি শহরে সাহিত্যিকদের বৈঠকে একজন প্রবীন সাহিত্যিক জর্জিয়ান সাহিত্যে প্রাচীন ভারতীয় ভাবধারার প্রভাব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করলেন। আরেকজন প্রগতিশীল ভাবধারার বাহন ফরাসি সাহিত্যের নিকট তাঁরা যে ঋণী সে কথা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বর্ণনা করলেন।

সোভিয়েট রাশিয়ার লেখক, কবি, নাট্যকারদের ভারতের প্রতি আগ্রহ দেখে আনন্দিত হয়েছি। তাঁদের প্রত্যেক অভ্যর্থনা-সভায় তাঁরা বলেছেন, আপনারা দেশে ফিরে গিয়ে এই কথাই আপনাদের সতীর্থদের বলবেন যে, সোভিয়েটের লেখকেরা বিশ্বশান্তি ও মানবমৈত্রীতে বিশ্বাসী। যে যুদ্ধ ও

জাতিবিদ্বেষ সংস্কৃতিকে খর্ব করে ভারতীয় লেখকেরা যেন মানুষের কল্যাণের দিক থেকে তার প্রতিবাদ করেন। আমরা যখন বলেছি যে, আপনাদের মতই ভারতীয় লেখকেরা শান্তি ও বিশ্বমানবের মিলনে বিশ্বাসী, তখনই সভায় সমর্থনসূচক করতালির ধ্বনি উঠেছে। আজকের দিনে বিদ্বেষ-বিষাক্ত আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতি তার শক্তিশালী প্রচারযন্ত্র দিয়ে অধিকাংশ মানুষের মন বিষিয়ে তুলছে। এই অশুভ ও অহিতকর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে একত্র হয়ে দাঁড়াবার জন্য সোভিয়েট রাশিয়ার লেখক ও শিল্পীরা যে বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করেছেন, ভারতের তথা বাংলার পক্ষ থেকে তরুণ সাহিত্যসেবীরা তা আগ্রহের সঙ্গে ধারণ করবেন—এই আশা নিয়ে আমার অভিজ্ঞতা আপনাদের কাছে নিবেদন করলাম।

শিকারী পাখীর গান

মাক্‌সিম গর্কী

পাহাড়ের বুকে হেঁটে চলেছে এক সাপ, স্যাঁতসেঁতে ফাঁক দেখে সে শুলো,
দেহটাকে তালগোল পাকিয়ে, সাগরের দিকে চেয়ে।
ওপরে আকাশে জ্বলছে সূর্য, পাহাড়ের গরম নিশ্বাস ছড়াচ্ছে আকাশে,
নীচের পাথরে ঢেউরা করছে আঘাত।
সরু ফাঁকটি দিয়ে, অন্ধকারে জলকণা ছড়িয়ে জোরে এগিয়ে চলেছে নির্ঝর
সাগরের দিকে। পাথরের নুড়িতে খটাখট শব্দ ক'রে।
শাদা ফেনায় ভরা, ধূসর ও প্রবল, সে পাথর কেটে পড়ল সমুদ্রে, ক্রুদ্ধ হুঙ্কারে।
অকস্মাৎ সেই ফাঁকে যেখানে গুটি পাকিয়ে শুয়েছিল সাপ
আকাশ থেকে পড়ল এক শিকারী পাখী,
তার বুক চূর্ণ, তার পালকে রক্ত।
ক্ষুব্ধ একটি চীৎকারে সে মাটিতে পড়লো,
অক্ষম ক্রোধে বুক দিয়ে আঘাত করতে লাগল কঠিন পাথরে।
সাপ ভয় পেয়ে দূরে সরে গেল, তারপরই ভাবলে এ পাখীর আয়ু
আর কতটুকু, দু-তিন মিনিট হবে।
ফিরে এলো সে আহত পাখীর কাছে, সোজা তার চোখের সামনে
প্রশ্ন করলে সোঁসোঁ শব্দে :

—কি, মরতে চলেছ ?

—হ্যাঁ, মারা গেছি !

উত্তর দিল শিকারী পাখী গভীর শ্বাস টেনে।

—আমি বেঁচেছি সগৌরবে। আমি জেনেছি আনন্দ।
আমি লড়েছি সদর্পে। আমি দেখেছি আকাশ।
তুমি কখনও দেখোনি আকাশকে এত কাছে।
হায়রে হতভাগ্য !

—কি তাতে এসে গেল—আকাশ, সে ত' একেবারে শূন্য,
সেখানে কি বুকে হাঁটা যায়? আমি বেশ আছি এখানে,
কেমন নরম অথচ ভিজে।

এই উত্তর দিল সাপ মুক্ত পাখীকে, হাসলো নিজের মনে
তার এই অর্থহীন কথাতে।
পরে ভাবলে : "ওড়ো আর বুকে হাঁটো, শেষ যা তা জানাই আছে।
জমি নিতে হবে সবাইকে, ধুলো হতে হবে সকলকে।"
সেই সাহসী শিকারী পাখী হঠাৎ জেগে উঠলো,
খাড়া করলো নিজেকে খানিকটা,
ফাঁকের চারিদিকে দেখলো চেয়ে।
ক্যাকাশে পাথরের ভিতব থেকে জল চোঁয়াচ্ছে, অন্ধকার চাপা গুমোট,
আর পচা গন্ধ।
হাঁক ছাড়লো শিকারী পাখী কামনা ও বেদনার সুরে,
তার সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে :

—ও, যদি আমি একটিবারও উড়তে পারতুম আকাশে,
লড়াই করতুম শত্রুর সাথে, চেপে ধরতুম বুকের ক্ষতে,
দম আটকে দিতুম আমার রক্তে!
ও, যুদ্ধের কি আনন্দ!

সাপ ভাবলে : "ওর যখন এত শোক। হয় ত বা আনন্দের
কিছু আছে আকাশে।"
মুক্ত পাখীর কাছে সে প্রস্তাব করলে :

—"তুমি এই ফাঁকের ধার পর্যন্ত এগিয়ে চলো, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ো
নীচের দিকে। হয়ত বা তোমার পাখা তোমায় তুলে রাখতে পারবে;
তাহলে ত কিছুক্ষণ তোমার নিজের আকাশে বেঁচে থাকা হবে।

কেঁপে উঠলো শিকারী পাখী, দৃপ্ত চীৎকারে চললো সে খাড়াইয়ের প্রান্তে,
পাথরের কাদায় নখ দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে।
চললো সে এগিয়ে, ছড়িয়ে দিল পাখা, বুক ভরে নিল নিশ্বাস,
চোখ তার উঠলো জ্বলে—সে গড়িয়ে পড়লো নীচে।
ঠিক যেন একখানা পাথর, পাহাড় থেকে পাহাড়ে গড়িয়ে সে পড়ে গেল জোরে,
তার ডানা ভাঙা, তার পালক ছড়ানো।

নির্ঝরের ঢেউ তাকে ধরে নিয়ে, রক্ত মুছিয়ে, ফেনার পোষাক পরিয়ে,
বহে নিয়ে গেল সাগরে।
সাগরের ঢেউ শোকার্ত গর্জনে আছড়ে পড়লো পাথরে।
তারপর শিকারী পাখীর মৃতদেহ অদৃশ্য হয়ে গেল
সমুদ্রের বিস্তারে।

২

ফাঁকে শুয়ে সাপ অনেকক্ষণ ভাবলে পাখীর মরণের কথা,
আকাশের প্রতি আবেগের কথা।
তখন তার দৃষ্টি গেল সেই দিগন্তে
যা চিরদিন আনন্দের স্বপ্ন দিয়ে চোখকে আদর করে।
—কি দেখেছিল মৃত শিকারী পাখী এই অতল অকূল শূন্যে?
মরতে গিয়েও ওর মতো পাখীরা কেন আকাশে ওড়ার টানে
নিজের অন্তরকে মথিত করে? কি আছে ওখানে এমন উজ্জ্বল?
আমিও ত ইচ্ছে করলে এসব জানতে পারি, হোক না স্বল্পক্ষণের তরে,
যদি আমি নিজেকে তুলতে পারি আকাশে।
বলা আর—করা। কুণ্ডলী ছাড়িয়ে তুললো সে নিজেকে বাতাসে,
সূর্যের আলোয় চকমক করতে লাগলো সরু ফিতার মতো।
বুকে হাঁটতে যার জন্ম, সে কখনও উড়তে পারে?—
এ কথাটি মনে না থাকায় সে পড়লো এসে পাথরের ওপরে,
কিন্তু আঘাত পেল না। তারপর সে হেসে উঠলো।
—এই ত দেখলুম আকাশে ওড়ায় কি আনন্দ।
সে আনন্দ—আছাড় খাওয়ায়।...বোকা পাখীটা, মাটিকে না জানায়
তার ওপর টান না থাকায়, সে ঝুঁকলো উঁচু আকাশের পানে,
খুঁজলো জীবন। ঐ তপ্ত শূন্যতায় তা ত একদম ফাঁকা।
সেখানে প্রচুর আলো, কিন্তু খাবে কি, দেহধারণ হবে কিসে?
এত অহঙ্কার কিসের? এত তাচ্ছিল্যই বা কেন?
মনে হয়, এ সব হচ্ছে বাসনার মত্ততাকে ঢাকার জন্যে,
জীবনযাপনের অক্ষমতাকে লুকোবার জন্যে।

হাসি-জাগানো পাখীরা, আর তোমাদের কথা দিয়ে
আমাকে ভোলাতে পারবে না। আমি নিজে সব জেনেছি।
আমি দেখেছি আকাশ। আমি উড়েছি, ঘুরে দেখেছি,
পড়ার অভিজ্ঞতাও পেয়েছি।
আমার যে লাগেনি সে কেবল আমি ওদের চেয়ে শক্ত ব'লে—
এই আমার বিশ্বাস।
যারা মাটিকে ভালোবাসতে পারে না তারাই থাকুক ঐ ছলনা নিয়ে।
আমি সত্যকে জেনেছি। ওদের ডাকে আর আমার কোন আস্থা নেই।
আমি মাটির সৃষ্টি মাটিতেই বাঁচবো।

সে আবার কুণ্ডলী পাকালো পাথরের ওপর, নিজের সম্বন্ধে পরম তৃপ্ত।

স্বচ্ছ আলোয় সমুদ্র ঝলমল করছে, তার তরঙ্গ ভয়ঙ্কর হুঙ্কারে
আঘাত করছে তটের ওপর।
এই সিংহ-সম গর্জনে ধ্বনিত হচ্ছে গান ঐ বীর্যদৃপ্ত পাখীর বিষয়,
তার প্রতিঘাতে কাঁপছে গিরিশিখর, আকাশ শিহরিত হচ্ছে
এই ভয়াল সঙ্গীতে :

—আমরা প্রশস্তি গাহি সাহসের উন্মত্ততায়!

সাহসে উন্মত্ততা—এই ত জীবনের প্রজ্ঞান!
হে বীর শিকারী পাখী, শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামে তুমি রক্ত ঢেলেছ…
কিন্তু এমন দিন আসবে, যখন তোমার তপ্ত রক্তের প্রতিটি বিন্দু
স্ফুলিঙ্গের মতো জীবনের অন্ধকারে জ্বলে উঠবে, কত না সাহসী হৃদয়
উদ্দীপিত হবে মুক্তির প্রতি, আলোর প্রতি, তোমার এই উন্মত্ত তৃষ্ণায়।
হোক তোমার মরণ। বীর ও শক্তিমানের গানে চিরদিন তুমি হবে
জীবন্ত উদাহরণ, মুক্তির প্রতি, আলোর প্রতি, দৃপ্ত আহ্বান।

—আমরা গাহি গান সাহসের উন্মত্ততায়!

(মূল রুশভাষা থেকে) অনুবাদ : নীরেন্দ্রনাথ রায়

জননীজন্মভূমিশ্চ

সিদ্ধেশ্বর সেন

১

রক্ত আর কান্না আর রক্ত

শিশুর সরলতা, জননী,
শিশুর ব্যাকুলতা

ওই ছাখো পাহাড়ের গায়
মেঘের শাদাধবল হাতে
সফেন সমুদ্রে
ঢেউয়ের আড়ালে

তোমার ঘরে
কবাটের আড়ালে
দোলনার আড়ালে
রোদের টুকরোর মতো
লুকোচুরি খেলে
জননী, সোনার টুকরোর মতো
হীরের টুকরোর মতো

তোমার চোখের আড়ালে
চোখের পাতার আড়ালে
জননী, নিটোল অশ্রুর মতো
শালুক ফুলের 'পরে টলটলে জলের মতো
জমে থাকতে থাকতে অকস্মাৎ
ঝরে

তোমার জানলা দরজা সেলাই-কাঁটা
বেতের সাজি ভাসিয়ে
কোল খালি করা
কোল খালি করা এক কোলের উপরে

তোমার মুখপানে চেয়ে
তোমার ফোলা ফোলা চোখের দিকে
তোমার চোখের তারায়

ভয় হয় তুমি আছ
কি নেই
কি ধুয়ে মুছে
চোখের বাষ্পে মিলিয়ে, মিলিয়ে গিয়েছ

(মুখ ফিরিও না)
তুমি যা
তোমাকে যা আমি জানি
আমার সমস্ত দিয়ে যা আমি জানি
(মুখ ফিরিও না)

হে জীবনদায়িনী
অয়ি ভুবনমনমোহিনী

২

শিশুরা অনাথ
অনাথ তার অবোধ ভাইয়েদের মতো
হতাদর বোনেদের মতো

অনাথিনী অভাগিনী মা
অদৃষ্টের অন্ধ দরজায় ঝাঁপিয়ে
নাড়া দিয়ে
পথের ধুলায় নত

শিশুরা অনাথ
অবোধ
শিশুরা

কে কোথায়
হামাগুড়ি দিয়ে অন্ধকার
কচি হাতে জড়ায়
নিঃশ্বাসে
মৃত্যুকে টানে কাছে টানে
আরো কাছে টানে

মাতার প্রতীক্ষা টানে
ব্যর্থশেষ
পথের ধুলায়

শিশুরা অবোধ
অনাথ
শিশুরা

কে কোথায়
অশরীরী ছায়ায় ছায়ায় চলো
ডাকো আমাকে ডাকো
তোমাদের অতৃপ্ত কামনায় স্বপ্নের
সুরে সুরে
কে কোথায় স্বপ্নের
সীমানা দেখাও

৩

হে স্বদেশ

যেখানে রাত্রি নেই

ভোর নেই

স্বপ্ন নেই

হে স্বদেশ

যেখানে আর্তি নেই

মৃত্যু আছে

মুক্তি নেই

মিথ্যা আছে

হে স্বদেশ

যেখানে রাত্রি নেই

রাত্রিশেষও নেই

ভোর নেই

যেখানে স্বপ্ন নেই

জাগরণও নেই

হে স্বদেশ

* * *

তীব্র অসহ নিষ্ঠুর স্বদেশ

করুণ ব্যর্থ বিস্মৃত স্বদেশ

উন্মাদ উন্মত্ত

ব্যর্থ

করুণ

কান্নাভারাতুর

নিষ্ঠুর

পথের পাথরে মাথা কুটে :
রক্ত

০

নগ্ন নিরন্ন ভিক্ষুক আতুর :
কান্না

অসহায় পথেই আশ্রয়
পথে
পায়ে পায়ে দিনের সূর্য
রাত্রে
রাত্রির নক্ষত্র দিনের আড়ালে ঢেকে
পায়ে পায়ে
গ্রামের নিস্তেজ ছায়া শহরে
শহরের প্রচণ্ড ছায়া
গ্রামে নয়, ক্যাম্পে
অনাহারে :
কান্না

ক্ষুধায় মরীয়া আক্রোশে পথের পাথরে :
রক্ত

কান্না আর রক্ত আর কান্না

হে স্বদেশ
অন্ধ বিধাতাপুরুষের মতো উন্মাদ
সন্তানের পঞ্জর দু'হাতে
চণ্ডালের সাজে

রক্ত কান্না আর রক্ত

দ্বার হতে দ্বারে
ক্ষুধার বিকট ভাষা ঠোঁটে

ক্রীতদাস জীবনের ভার বয়ে বয়ে
দুর্ভিক্ষের হাত পেতে

রক্ত কান্না আর রক্ত

পায়ের শৃংখল টেনে টেনে
শিকলের করতালি বাজিয়ে

রক্ত কান্না আর রক্ত

কোমরে লোহার বেড়ী পরে
কয়েদীর দাগে বুকে হেঁটে

রক্ত কান্না আর রক্ত

হে স্বদেশ
অপমানহত হে দেশ
হে ভয়ংকর দেশ
হে ভয়াল ভ্রূকুটির দেশ

হে শ্মশান-মশানচারী দেশ

হে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের দেশ

* * *

আমার ভালোবাসার দেশ
অশথের ছায়ায় নদীর কিনারে
ডাহুকের দেশ

মেঘলা আকাশের দেশ
টইটুম্বুর সরোবরের দেশ

সাত রাজার ধন এক মাণিকের দেশ

মা-জননীর কোল ঘেঁসে যশোদা-দুলালের দেশ

বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর
স্মৃতি দিয়ে ঘেরা

জন্মজন্মান্তরের মিলন-বিরহের দেশ
আমার ভালোবাসার দেশ ॥

সীমান্ত-প্রহরী

হেমাঙ্গ বিশ্বাস

সীমান্তে তুমি প্রহরী আজ,
সীমান্তে তোমার দীপ্ত অগ্নিশিখা
সুগন্ধি শ্বেতচন্দনের চিত্রিত তিলক
মুছে ফেলেছে কে?
প্রশস্ত মঙ্গোলীয় চোয়াল তোমার
লোহার কীলকে আঁটা,
কোন প্রতিরোধে?
আজ মনে হয়,
অনেকদিন আগে
তোমাকে চিনেছিলাম
শিশুর বিস্ময়-আঁকা চোখে।
বসন্ত-পূর্ণিমায়
মণ্ডপের নিকানো চত্বরে
খিত্‌তো, খিন্‌তা খিন্‌তি, ইন্‌তা—

খোলের বোলের সাথে
রাসের চালিতে
মন্দিরার মৃদুল গুঞ্জনে
আন্দোলিত দেহে তোমার
"লোগতাগ" হ্রদের তরঙ্গ উঠেছে।
আবার দেখেছি,
মাকড়সার মতো সহজাত নৈপুণ্যে
"ফানেকের" পাড় বোনা
মাকুর তালিতে
তাঁতশালে ইন্দ্রজাল বুনে গেছ তুমি।
মধ্যাহ্ন সূর্যে,
কখনো আবার
সোনালী সুদূর উপত্যকায়
কাস্তে তোমার ঝলসে উঠেছে হাতে ;
ঠুং ঠুং কাকনের সাথে
তালে কাটা ধানের মঞ্জরী
নবান্নের আগমনী নিক্কণ তুলেছে।
পথে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে হঠাৎ শুনেছি,
ইম্ফল নদীর শানবাঁধা
অপরাহ্ন-ঘাটে
পাহাড়ী দোলনচাঁপার গান :
"চিংদা শাংপা ইকেলৈ"
(ও পাহাড়ী দোলন-চাঁপা,
একটু তুমি বসলেও না
ফুটতে না ফুটতেই ঝরে গেলে ?)
দোলন-চাঁপা বললো :
'আমার কি দোষ ভাই
দুষ্টু দমকা বাতাসটাই
আমাকে ঝরিয়ে দিয়ে গেল,'
বাতাস এসে বললো :

'আমার কি দোষ,
ও এতো নরম
ছুঁতে না ছুঁতেই ঝরে গেল।'
বুনো নীল ঝিঁঝিঁর ডাকের মতো সুর
একটানা তবু তো একঘেয়ে নয়,
অদ্ভুত ঝিম-ধরানো নেশায় বিভোর।
সেই তোমাকে জানতাম আমি
নৃত্যে কর্মে লাস্যে হাস্যে ছন্দোময়ী
শিল্পীর বিমুগ্ধ আত্মা।
আজ দেখি আরেক বিস্ময়,
পূর্বতোরণে পর্বতচূড়ায়
ক্রান্তি সূর্যে ঝলসানো
উদ্ধত বল্লম,
দুর্বার দুঃসহ তুমি।
সদ্যজাত শাবক প্রহরারতা
বাঘিনীর মতো
কালো ঘন চুলের অরণ্যে
শাণিত দুচোখে
প্রত্যাঘাত প্রস্তুত।
কে তোমার মখ্‌মলী শ্যামল প্রান্তর
সঙ্গীনে চষেছে?
তোমার দোলনচাঁপা
কার বুটে চাপা পড়ে কাঁদে?
"খুবাক" নাচের হাততালি
হাত কড়ায় বাঁধে বলো কারা?
মন্দিরার মৃদুকণ্ঠ রুদ্ধ করে কে?
চিত্রাঙ্গদা, নৃত্য ভুলে গেছ নাকি তুমি?
তুমি তো ভোলোনি
ঝাঁকে ঝাঁকে সেই যেদিন
যান্ত্রিক শ্যেনেরা উড়ে এসে

অতর্কিতে ছোঁ-মেরে আঙিনার নোটন পায়রাকে
ছিনিয়ে নিলো।
চারিদিকে বক্রপথ ধরে
লোলজিভ নেকড়েরা দল বেঁধে এলো।
মহাযুদ্ধের লোনা রক্তের আস্বাদ
ভারতবর্ষে তুমিই তো প্রথম পেলে।
এশিয়ার পরম বন্ধু নিগ্রনী বুদ্ধকে
তুমিই প্রথম চিনেছ,
তুমিই প্রথম আজকের আমেরিকা
আবিষ্কার করেছ।
অজগরের হিম-আলিঙ্গনে
রুদ্ধশ্বাস হরিণ শিশুর মতো
কামক্ষিপ্ত উলঙ্গ শ্বেত-সৈনিকের
ঘৃণিত দেহের চাপে
কুমারী নর্তকী "লাইহাপি"কে
পিষ্ট হতে দেখেছ তো তুমি।
সুরাগন্ধী নোটের তোড়ায়
মণ্ডপে কাম্বুবের নাচন দেখেছ।
ছিন্ন হৃদ্‌পিণ্ডে লাল
"লোপতাগ"-এর ঢেউ
পাহাড়ের পাথুরে গায়ে
মাথা কুটে মরেছে, কতোবার।
বিধ্বস্ত পল্লীগ্রাম ছেড়ে
প্রাকপৌরাণিক আদিম অন্ধ গুহায়
বিক্ষত দেহে তুমি আশ্রয় নিয়েছিলে।
সে কথা ভোলোনি জানি,
কবরে চাপা কঙ্কালের মতো
সে স্মৃতি বুকে ধরে
শান্তিপ্রিয় বৈষ্ণব তুমি
আজ ক্ষমাহীন প্রহরী।

দুরন্ত পাগলা হাতির
পায়ের তলা থেকে
প্রেমাস্পদ বীর "খাম্বাকে" জয়-করা
মহাকাব্যের জীবন প্রেমিকা
"থৈবী" দেবী তুমি।

মৃত্যুর মৃগয়া আর নয়
আর নয় ধ্বংসের তাণ্ডব।
সোনালী ধানের ক্ষেত থেকে
জঙলী হাতির পাল খেদিয়ে
গিরি-সংকট অবরোধ করে
তুমি দাঁড়াও;
সহোদরা জলন্ত কোরিয়ার জালা বুকে নিয়ে
ইয়ালু আর শান্ নদীর রক্ত-তরঙ্গে
দুর্ভেদ্য বাঁধের মতো
তুমি দাঁড়াও;
গহন অরণ্যচারীর বিপদ-সংকুল পথে
দীপ্ত মশালের মতো
তুমি দাঁড়াও;
সমতলে সশঙ্কিত কুটিরের চোখে
সুদূর পাহাড়-চূড়ায়
উদয় সূর্যের মতো
তুমি দাঁড়াও;
আকাশে ছড়াও
বনেলা ঝিঁঝিঁর সুরে
পাহাড়ী দোলনচাঁপার ঝিমলাগা গান—
মায়ের বুকের দোলনায়
শিশুর দু'চোখে ঝিমিয়ে আসুক
ঘুমপরীর পাখা।

বনহরিণী তুমি
বারুদগন্ধী বাতাসে ছড়াও মৃগনাভি।
কুচক্রী কালো মেঘের মুখে
মুঠো মুঠো দু'হাতে ছুঁড়ে মারো
দোল-পূর্ণিমার আবির গুলাল।
আঙিনার পায়রাকে
আকাশে ওড়াও;
শ্যেন-শকুনির ডানায় আহত দিগন্তের চোখে
শুভ্র পালকের মমতা বুলিয়ে দিক।
মৃদঙ্গে লহরী ওঠাও,
"লাইহরৌবা" নৃত্যের মুখর মুদ্রাব্যঞ্জনায়
ধ্বংসের দামামা স্তব্ধ হউক;
সে নৃত্যের ছন্দ
সমতলে লুইতের বুকে
উদ্দাম বর্ষা হয়ে নেমে আসুক:
ঝুমুর মাদল আর "বিহু"র "পেপা"য়
পায়ে পায়ে ঐকতান তুলুক:
জীবনের
সৃজনের
স্বপ্নের
শান্তির।

দুঃসহ ভাষা

মণীন্দ্র রায়

আর সে বলে না কথা। প্রতিবাদে মুখর তরল
ফোটে না ঢেউয়ের ভাষা ও-হৃদয়ে আর হাওয়া লেগে।
শুধু স্তব্ধ অন্ধকারে শাণিত স্রোতের খর জল
ভাঙে চাপ চাপ মাটি, শুধু তার উন্মাদিনী বেগে
জানায় করেনি ক্ষমা। নড়ে তাই প্রাসাদের ভিত;
খসে খিলানের বালি। (ও-কটকে গেছে যতোবার
ভয়ের ঝিলিকে পথ ছিঁড়ে দিত সঙিনের বিঁধ।)
এখন স্রোতের টানে কাঁপে বুঝি পাথরের হাড়?

আর সে বলে না কথা। চোখে শুধু কী-যে জ্ব'লে ওঠে।
(নয় সেই মাঠে-চাওয়া রাংচিতার বেড়া ঘেঁসে আঁকা
কৃষাণীর ছবি।) দেখ বুকে তার শিশু শীর্ণ ঠোঁটে
টানে—সে তো স্তন্য নয়—সে যে তার অশ্রুঝড়ে মাখা
কঠিন কড়ার, তাই বিন্দু বিন্দু ঢেলে দিয়ে নারী
ফোটায় দুঃসহ ভাষা। গড়ে তার অমিতরবারি॥

মধ্যবিত্তের সঙ্কট

বিনয় ঘোষ

প্রস্তাবনা

"যে সকল লোক পূর্বে কোন পদেই গণ্য ছিল না একণে তাহারা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে খ্যাত হইয়াছে"—ধনতান্ত্রিক সমাজের শ্রেণী-বিন্যস্ত কাঠামোয় এইভাবে 'মধ্যবিত্তের' সংজ্ঞা-নির্ধারণ প্রায় ১২২ বছর আগে বাংলাদেশের কোন পত্রিকায় করা হয়েছিল। 'সমাজবিজ্ঞানের' প্রসার তখনও কিছুই হয়নি বলা চলে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদীর দৃষ্টিতে সমাজের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর বিন্যাসের রীতি ও নীতি বিচার করার পদ্ধতিও তখন জানা ছিল না। তবু সমাজের ভিতরের ভাঙা-গড়া সচেতন মানুষ চিরদিনই লক্ষ্য করেছে এবং তার প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ থেকে সেই ভাঙা-গড়ার কার্য-কারণ ধারা ব্যাখ্যা করবারও চেষ্টা করেছে। আমাদের দেশের এক যুগসন্ধিক্ষণে সমাজের এই পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করেই বাংলাদেশের "বঙ্গদূত" পত্রিকা (১৮২৯ সালের ১৩ই জুন) নূতন "মধ্যবিত্ত শ্রেণীর" বিকাশ সম্বন্ধে এই মন্তব্য করেছিলেন। এই মন্তব্যের মধ্যে যে গভীর ইঙ্গিত রয়েছে তার গুরুত্ব যথেষ্ট। সমাজের মধ্যে একটা "মধ্য শ্রেণী" মধ্যযুগেও ছিল, কিন্তু তার মানদণ্ড ছিল কুলকৌলিন্য ও বংশমর্যাদা। নূতন যুগের ধনতান্ত্রিক সমাজের জন্মকালে কুলকৌলিন্যের এই লৌহ-প্রাচীর চূর্ণ ক'রে দিল টাকার "হেভি-আর্টিলারী"। ঠিক টাকার সচলতার মতো একটা "সচলতা" আমাদের স্থিতিশীল সমাজের মধ্যেও দেখা দিল। টাকার লড়াইয়ে যারা জয়ী হতে থাকল, তাদের পদ-মর্যাদাও বাড়তে লাগল, বংশমর্যাদার কোন বাধাই টিকল না। সমাজের মধ্যে নূতন শ্রেণীবিন্যাস শুরু হ'ল 'টাকা' ও 'ধনসঞ্চয়ের' ভিত্তিতে। উপরে ধনিকশ্রেণী, তলায় মজুরশ্রেণী, আর মধ্যিখানে মধ্যবিত্তশ্রেণী—এই হ'ল নূতন সমাজের শ্রেণীবিন্যাস। "বঙ্গদূত" পত্রিকার উক্তির তাৎপর্য এই এবং "উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে" যারা খ্যাত হ'ল তারাই "মধ্যবিত্ত"। মধ্য-বিত্তদের অনেকেই হয়ত আজ বিত্তহীন মজুরের সমকক্ষ, আরও অনেকে দ্রুত

সেই বিত্তহীনতার পথেই ধাবমান, তবু আজও তাঁরা "বিশিষ্টরূপে খ্যাত", অর্থাৎ "বিশিষ্ট ভদ্রলোক"।

"বঙ্গদূত" আরও গভীরভাবে আমাদের দেশের সামাজিক পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করেছিলেন। ১৮২৯ সালেই তাঁরা লিখেছিলেন: "দশ বৎসর পূর্বেও এ নগরে যে ব্যক্তি মাসে দুই তঙ্কা বেতন পাইত সে এক্ষণে চারি পাঁচ তঙ্কা পাওয়াতেও তুষ্ট নহে এবং ইহাতেও ঐ সকল লোকের অপ্রাপ্তি...শ্রমের মূল্য পূর্বাপেক্ষা এক্ষণে অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে এবং পূর্বে এক তঙ্কায় ১২ জন কৃষক লোক সমস্ত দিন শ্রম করিত এক্ষণে ৪ জনের অধিক এক তঙ্কায় পাওয়া যায় না—যে তণ্ডুলের মোন আট আনায় বিক্রয় হইত তাহার মূল্য এক্ষণে গড়ে দুই তঙ্কা হইয়াছে। অতএব এই প্রকার অবস্থান্তর ও রীতি পরিবর্তনের কারণ অবাধে বাণিজ্যবিস্তার ও ইংলণ্ডীয় মহাশয়দিগের সমাগম ইহাই সাব্যস্ত বোধ হইতেছে।" "সাব্যস্ত" ঠিকই "বোধ হইতেছে" এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাথমিক পত্তনকালের ছবিও সুন্দর আঁকা হয়েছে স্বীকার করতে হবে। "খোলা বাজারের" প্রতিযোগিতার জন্যে একদিকে "শ্রমের" মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে, অন্যদিকে খাদ্যদ্রব্য ও পণ্যেরও। আর বাণিজ্যে "অবাধনীতি" নীতিগত-ভাবে স্বীকার করা হলেও, কার্যত তা পালন করা হচ্ছে না। তার প্রথম কারণ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বন্ধন, দ্বিতীয় কারণ দীর্ঘকালব্যাপী আমাদের জাতীয় চরিত্রগত রক্ষণশীলতা। একদিকে সাম্রাজ্যবাদের চাপ, অন্যদিকে আমাদের সেই মধ্যযুগের মহাজনী মনোভাব—এই দুই বাধা ঠেলে আমাদের দেশে "ধনতন্ত্র" সোজা পথে এগিয়ে চলতে পারেনি, আঁকা-বাঁকা পথে 'দু পা এগিয়ে, এক পা পিছিয়ে' তাকে চলতে হয়েছে। ফলে, বাণিজ্য বা পণ্যোৎপাদনের চেয়ে মুচ্ছুদ্দিগিরি ও বেনিয়ানগিরি আমরা বেশী করেছি। "ইয়ং বেঙ্গল" আমাদের বারবার এ-সম্বন্ধে সাবধান ক'রে দিয়েছেন, এবং মুচ্ছুদ্দিগিরি, বেনিয়ানগিরি ও কেরানীগিরি ছেড়ে স্বাধীন বাণিজ্য করতে বলেছেন। "ইয়ং বেঙ্গলের" মুখপত্র "জ্ঞানান্বেষণ" উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এ সম্বন্ধে লিখেছেন: "মুচ্ছুদ্দি মহাশয় কি ইহা দেখিতে পারেন না যে তাহার ধনে নির্ধনী সাহেব ধনাঢ্য হইবেন ইহা জানিয়াও কিঞ্চিৎ সুদ পাওয়ার প্রার্থনায় মুদ্রা প্রদান করেন। এতদ্দেশীয়দিগের যে এতদ্রূপ কৃত-কার্য্যতা তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু এতদ্দেশীয় ধনিগণ বাণিজ্যাদি দ্বারা ধনাঢ্য হউন, কেরাণী প্রভৃতির কার্য্য পরিত্যাগ করুন—"। ইয়ং

বেঙ্গলের যুগোপযোগী নির্দেশ সত্ত্বেও কেরানীগিরি আমরা ছাড়তে পারিনি এবং আজও জানি কলকাতার উচ্চশিক্ষিত বিত্তশালী সুবর্ণবণিক পরিবারের লোকেরা ব্রাহ্মণের নিত্যনৈমিত্তিক "পূজা আহ্নিকের" মতো সকালে উঠে প্রতিদিন "মহাজনী" কারবার করতে বসেন। সুতরাং দু'দিকের পিছটানে ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশ আমাদের দেশে সম্ভব হয়নি, মধ্যে মধ্যে অস্বাভাবিক অবস্থার (যেমন মহাযুদ্ধ) হেঁচ্‌কা টানে হঠাৎ-অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। তার ফলে কারখানার মজুরশ্রেণীও তেমন বাড়েনি, কিন্তু চাকুরি-জীবী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিস্তার হয়েছে, বিশেষ ক'রে নূতন শিক্ষার সুযোগ যেখানে গ্রহণ করা হয়েছে সেখানে, যেমন বাংলাদেশে। প্রায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত এই হ'ল ইতিহাসের ধারা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড চাপে একটা যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছে আমাদের সমাজে বললেও অত্যুক্তি হয় না। ধনতন্ত্রের অস্বাভাবিক আঁকা-বাঁকা অগ্রগতির ফলে প্রকৃত ধনিকশ্রেণীর সীমানা আমাদের দেশে ক্রমেই সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হচ্ছিল, অর্থাৎ বাল্যকালেই উচ্চস্তরের এক-চেটিয়া সংহতি ও শাখা-বিস্তারের মধ্যে এদেশে ধনতন্ত্রের "বালপ্রৌঢ়ত্বের" লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট হয়ে উঠছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে এই "বালপ্রৌঢ়ত্ব" অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠলো। মূলধনের নিয়োগ ও বিস্তার যে-হারে বাড়ল আগের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। এখানে আমার আলোচ্য বিষয়বস্তু তা না হলেও, উচ্চস্তরে ধনতন্ত্রের এই সংহতি ও বিস্তারের সামান্য দৃষ্টান্ত আমি এখানে উল্লেখ করছি, কারণ মধ্যবিত্তের আলোচনাপ্রসঙ্গে এ-বিষয় একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয়। প্রথমে মূলধন নিয়োগের দৃষ্টান্ত দিই, কারণ ধনতন্ত্রের প্রকৃত বিকাশের ধারা এই মূলধন নিয়োগের মধ্যেই সন্ধান করা উচিত। নীচের "সারিতে" দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে "নূতন মূলধন" নিয়োগের একটা হিসাব দেওয়া হ'ল:

নূতন মূলধন নিয়োগের হিসাব

	১৯৩৯-এর পূর্বে		১৯৩৯-এর পরে
পাবলিক ইউটিলিটি :	৬ কোটি	:	৭ কোটি
পাট :	২ ,,	:	৪ ,,
লোহা-ইস্পাত :	২ ,,	:	১৩ ,,

সিমেণ্ট :	৬ কোটি	:	?
ইঞ্জিনিয়ারিং :	১ ,,	:	৯ কোটি
কেমিক্যাল :	১ ,,	:	৮ ,,
	কাপড়	:	২৬ ,,
	কয়লা	:	১৫ ,, (আট কোটি ছিল)
	কাগজ ইত্যাদি—	:	৪ ,,

লোহা-ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং, কেমিক্যাল, কয়লা ও কাপড় ইত্যাদিতে নূতন মূলধনের পরিমাণবৃদ্ধি থেকে ধনতন্ত্রের গতির দিক-নির্ণয় করা যায়। শাখা-বিস্তারের দৃষ্টান্ত হিসাবে "টাটা", "ডালমিয়া জৈন", "জে. কে. গ্রুপ" ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। উচ্চতম গণ্ডীর মধ্যে ধনতন্ত্রের এই সংহতির ফলে আমাদের দেশে পরবর্তী স্তরের ধনিকশ্রেণী কতকটা মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর উচ্চস্তর হিসাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং "প্রোলেটারিয়েটের" মতো চাকুরিজীবী বা "স্তালারিয়েট" মধ্যবিত্তের সংখ্যাও বেড়েছে যথেষ্ট। এই মধ্যবিত্তশ্রেণীই আমার আলোচ্য বিষয়বস্তু। আমার প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল এই যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে টাকার সরবরাহ যে-হারে ও যে-পরিমাণে বেড়েছে সেই অনুপাতে "কতকটা" মধ্যস্তরের ধনিকশ্রেণী সাময়িক লাভবান হলেও, সাধারণ চাকুরিজীবী মধ্যবিত্তদের আয়বৃদ্ধি হয়নি। যুদ্ধের তাগিদে "স্তালারিয়েট" মধ্যবিত্তের "সংখ্যা" বা কলেবর বেড়েছে, মূল্যবৃদ্ধি ও মোট টাকা বৃদ্ধির অনুপাতে আয়বৃদ্ধি না হওয়ার দরুণ আর্থিক অবস্থার অবনতি হয়েছে। টাকাবৃদ্ধির ফলে "কিছুটা" মধ্যস্তরের ধনিকরা এবং "বেশীর ভাগ" উচ্চতম স্তরের ধনিকরাই লাভবান হয়েছেন। মহাযুদ্ধের পর মধ্যস্তরের "ধনিকদের" সাময়িক লাভের সুযোগ চলে গিয়েছে, উচ্চস্তরের ধনিকদের সঞ্চিত মোটা মূলধনের "বড় ব্যবসায়ের" কাছে তাঁদের অনেক ব্যবসায়ই স্বল্প পুঁজির জন্যে প্রতিযোগিতায় হার মেনে যাচ্ছে। ওদিকে টাকার সরবরাহ কমেনি, অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি ঠিকই আছে, পণ্যদ্রব্যের মূল্য আরও বেড়েছে ও বাড়ছে, অথচ যুদ্ধকালীন চাকুরির তাগিদ ও সুযোগ আর নেই এবং শান্তিকালীন "পুনর্গঠন" আজও নিছক "পরিকল্পনার" স্তরে বিরাজ করছে বলা চলে। সুতরাং যে-বোঝা যুদ্ধের মধ্যেই মধ্যবিত্তকে বহন করতে হচ্ছিল, সেই বোঝা যুদ্ধ-পরবর্তীকালের বেকারসমস্যা ও আর্থিক অনটনবৃদ্ধির ফলে দ্বিগুণ থেকে চতুর্গুণ পর্যন্ত বেড়েছে। বোঝার ভারে মধ্যবিত্তের মেরুদণ্ড

হয়ে পড়ছে, সেই "বিশিষ্টরূপে" খ্যাতিও আর বজায় থাকছে না, এমন কি ভদ্রলোকের ভদ্রতাবোধ, নীতিবোধ, রুচিবোধ পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। শহরে মধ্যবিত্তের চাপ বাড়ছে বেশী, গৃহ-সমস্যা দেখা দিচ্ছে, তার থেকে বসবাস-সংকট এবং তার ফলে নৈতিক ও পারিবারিক নানারকমের জটিলতা আজ মধ্যবিত্ত-জীবনকে মেঘাচ্ছন্ন করে ফেলছে। এই সমস্ত সমস্যা ও তার সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত বিশ্লেষণ করাই এই রচনার উদ্দেশ্য। অত্যন্ত সংক্ষেপে এই বিশ্লেষণের কাজ শেষ করতে হয়েছে ব'লে রচনা সরস বর্ণনাপ্রধান না হয়ে, নীরস তথ্যপ্রধান হয়েছে। তাহলেও, সেই নীরস তথ্যের মরুভূমির মধ্যেই মধ্যবিত্ত-জীবনের বাস্তব ছবি, আশা করি, অনেক বেশী নিখুঁত হয়ে ফুটে উঠবে এবং মরুপ্রান্তে যদি কোন সুন্দর সবুজ শ্যামল-জীবনের সম্ভাবনা থাকে, তারও আভাস পাওয়া যাবে। সুতরাং প্রস্তাবনা শেষ ক'রে, মধ্যবিত্তের মরু-জীবনের তথ্যাকীর্ণ আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়া যাক। দেখা যাক, তথ্যের সাক্ষী নিয়ে, জীবনের বাইরের সীমানা থেকে ভিতরের অন্দরমহল পর্যন্ত গিয়ে, বাস্তবিকই মধ্যবিত্ত-জীবনের সংকট আজ কতখানি গভীর এবং সেই সংকটের মুক্তিই বা কোন পথে?

মধ্যবিত্তের যুদ্ধকালীন গতি

যুদ্ধের জরুরী অবস্থার চাপে অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও মধ্যবিত্তশ্রেণীর "বিভিন্ন স্তরের" মধ্যে একটা গতিশীলতার সঞ্চার হয়েছিল। ধনতান্ত্রিক সমাজে মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিভিন্ন স্তর এমনিতেই কিছুটা গতিশীল, কিন্তু যুদ্ধের কৃত্রিম তাগিদে এই গতিশীলতা অনেকটা বেড়ে যায়। আমাদের সমাজেও বেড়েছিল। আর্থিক আয়ের দিক থেকে স্তর থেকে স্তরান্তরে যাত্রা, নীচের শ্রেণী-সীমানা অতিক্রম করে মধ্যশ্রেণীতে আসা এবং মধ্যশ্রেণীর সীমানা পার হয়ে ধনিকশ্রেণীতে পৌঁছানো—এইভাবে সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিভিন্ন স্তরের একটা বিন্যাসান্তর হয়েছে আমাদের দেশে। মোটামুটি ফল হয়েছে মধ্যশ্রেণীর কলেবরবৃদ্ধি এবং সাধারণ আর্থিক অবনতি। আয়ের দিক থেকে স্তরান্তরের গতি-নির্ণয়ের চেষ্টা "আয়কর হিসাব" (All India Income-Tax Revenue Statistics) থেকে করা যেতে পারে। নীচে বিভিন্ন আয়-গোষ্ঠীতে (Income-Groups) ভাগ ক'রে সারিবদ্ধভাবে তার একটা হিসাব দেওয়া হল :

(ক)

গোষ্ঠী নং	আয়ের সীমা (বাৎসরিক)	উপার্জক ব্যক্তির সংখ্যা		
		১৯৩৮-৩৯	১৯৪৬-৪৭	১৯৪৮-৪৯
১নং	—৪,৯৯৯৲	১,৮২,২৩৪	২,৬৬,৩৮০	২,৬১,১২২
২নং	৫০০০৲—৯,৯৯৯৲	৫৫,০৩৮	১,০০,৩৪২	১১২,৭৮৩
৩নং	১০,০০০৲—১৪,৯৯৯৲	১৬,৯১৩	৩৩,২৮৩	৩৮,৬৯২
৪নং	১৫,০০০৲—২৪,৯৯৯৲	১০,৬৯১	২৩,১৩৮	২৫,৯০২
৫নং	২৫০০০৲—৪৯,৯৯৯৲	৫,৬২২	১২,৮৮২	১৫,২২৬
৬নং	৫০,০০০৲—৯৯,৯৯৯৲	১,০৯১	৩,৩২০	৪,৯২২
৭নং (ক)	১,০০,০০০৲—১,৯৯,৯৯৯৲	৪৩৬	১১০৫ ২,৫৮৮	১,৬০৮ ২,৪৫২
(খ)	২,০০,০০০৲—ও তার উপর		১,৪৮৩	৮৪৪
	মোট :	১,৭২,০২৫	৪,৪১,৯৩৩	৪,৬১,০৭৯

(খ) মোট আয়ের হিসাব

গোষ্ঠী নং	১৯৩৮-৩৯	১৯৪৬-৪৭	১৯৪৮-৪৯
১নং	৫০,৪৫,৫০,০৯১৲	৭৮,৬০,৯৪,৯৩৬৲	৮১,৮৩,৪৭,১৫১৲
২নং	৩১,১৭,৪৫,৬৮৮৲	৭০,৭৩,৫৪,২১৮৲	৭৯,৭৫,৪৬,৬৮২৲
৩নং	১৫,০৫,০৩,৭৫৮৲	৪০,৫০,৮৭,১৪৬৲	৪৭,০৭,৩৫,৫৮৯৲
৪নং	১৪,৩৫,২৭,৭১৫৲	৫৩,৮৭,৮৭,১৭০৲	৪৯,৫২,৩১,৭৬৫৲
৫নং	১১,৫০,৯৭,০৭৪৲	৪৬,৪৯,৬৩,৮৩৮৲	৬০,৬৮,১৫,৯৩২৲
৬নং	৭,০২,৯৪,৪৮০৲	২৬,১৯,৬৮,৪৬২৲	৩৭,৫৮,৫১,২১৬৲
৭নং (ক)	৯,১৫,০৩,২৩০৲	১৯,৯৮,২৭,৮০০৲	৩৬,৬২,৬৬,৮৪৩৲
অন্যান্য— (খ)	১৬,৬৩,০৪,৪৯৯৲	× ×	×
মোট :	১৫৫,৩৫,২৬,৫৩৫৲	৩৪১,৭৫,৮৮,৭১৮৲	৪১৫,৮৭,৪৩,০১৩৲

উপরের 'ক' ও 'খ' এই দুই সারির ব্যক্তি ও আয়-সংখ্যা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে আয়কর দেন এইরকম উপার্জকের সংখ্যা যুদ্ধের মধ্যে যথেষ্ট বেড়েছে, কিন্তু বৃদ্ধির ধারার মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে যেটা মধ্যশ্রেণীর 'গতিধারা' বা 'ট্রেণ্ড' বুঝবার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১নং গোষ্ঠীর সংখ্যা যেভাবে বেড়েছে, আয়ও প্রায় সেই অনুপাতে বেড়েছে, ২নং গোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে, কিন্তু আয় বেড়েছে তার অনেক বেশী, ৩নং গোষ্ঠীর সংখ্যা দ্বিগুণ থেকে প্রায় আড়াই গুণ বেড়েছে, কিন্তু আয় বেড়েছে আড়াই

থেকে তিন গুণের বেশী, ৪নং গোষ্ঠীর সংখ্যা একই হারে বেড়েছে, কিন্তু আয় বেড়েছে তিনগুণ থেকে সাড়ে তিনগুণ, ৫নং গোষ্ঠীর সংখ্যা দ্বিগুণ তিনগুণ পর্যন্ত বেড়েছে, কিন্তু আয় চতুর্গুণ থেকে পাঁচগুণেরও বেশী বেড়েছে, ৬নং গোষ্ঠীর সংখ্যা ১৯৪৮-'৪৯ পর্যন্ত চারগুণ বেড়েছে, কিন্তু আয় বেড়েছে পাঁচগুণেরও বেশী। সমাজে মোট টাকার সরবরাহ বেড়েছে ১৯৩৯-'৪০ সালের ৪৯০ কোটি টাকা থেকে, ১৯৪৬-'৪৭ সালে ২,২০০ কোটি টাকা, ১৯৪৮-'৪৯ সালে ২,৩০৪ কোটি টাকা পর্যন্ত—অর্থাৎ প্রায় পাঁচগুণ। আয়কর যাঁরা দেন তাঁদের মোট আয় বেড়েছে দ্বিগুণের কিছু বেশী। এই অসমান বৃদ্ধির কারণ কি? মোট চলতি টাকার অনেকটা অবশ্য আয়কর যাঁরা দেন না তাঁদের আয়ের মধ্যে চলে যাবে। কিন্তু তা গেলেও, এবং সেই মোট হিসাবের কথা বাদ দিলেও, টাকার সরবরাহ যেমন বাড়বে ঠিক সেই "অনুপাতে" অন্তত সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর বিভিন্ন স্তরের লোকের আয়ও বাড়া উচিত। তা যদি না বাড়ে তাহলে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির 'ধারা' অনুযায়ী বুঝতে হবে যে টাকার প্রবাহ ঠিক সমান বেগে সমাজের সমস্ত খাতে বইছে না, কোন শ্রেণীর মধ্যে এবং কোন কোন স্তরে সেটা জমে যাচ্ছে। উপরের আয়করের হিসাব থেকে এই গতিধারারই নির্দেশ পাওয়া যায়, দেখা যায় যে উপরের গোষ্ঠীর আনুপাতিক আয় বেড়েছে এবং যত উপরে ওঠা যায় তত দেখা যায় যে বৃদ্ধির হার আরও বেশী। এর অর্থ হ'ল এই যে নীচের আয়গোষ্ঠীর আয় টাকার সরবরাহের তুলনায় যা বেড়েছে তা নগণ্য, এবং আরও নীচের গোষ্ঠীতে যাঁরা আয়করের মধ্যে পড়েন না, অর্থাৎ যাঁদের বাৎসরিক আয় ২০০০৲ (১৯৩৮-'৩৯ থেকে ১৯৪৬-'৪৭) বা ৩০০০৲ (১৯৪৮-'৪৯) টাকার মধ্যে, তাঁদের কিছুই বাড়েনি। এঁরাই মধ্যবিত্তশ্রেণীর বৃহত্তম অংশ এবং এঁরাই দেখা যাচ্ছে যুদ্ধ বা মুদ্রাস্ফীতির জন্যে বিশেষ কিছুই লাভবান হননি।

এই আয়কর সংখ্যাচিত্রের আরও একটা উল্লেখযোগ্য দিক আছে। আয়কর-গোষ্ঠীর উচ্চতর স্তরেও (এক লক্ষ, দুই লক্ষ টাকা) দেখা যাচ্ছে যে টাকার সরবরাহ "অনুপাতে" আয়বৃদ্ধি পুরোপুরি হয়নি। তাহলে "আনুপাতিক" আয়বৃদ্ধি কোথায় হয়েছে এবং টাকার উচ্ছ্বসিত প্রবাহ কোন্ সাগরসঙ্গমে মিলিত হয়েছে? নিশ্চয়ই আরও উপরের স্তরে, যেখানে শুধু "আনুপাতিক" বৃদ্ধি নয়, অনেক "উপ্‌রি হারে" (টাকা সরবরাহের হারের তুলনায়) আয়বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু আয়করের হিসাবে তাঁদের প্রকৃত পরিচয় কোথায়?

তাঁরা অনেকেই পরিচয় দেননি, আত্মগোপন করেছিলেন। যুদ্ধকালীন "মগের মুল্লুকে" তাঁরা বেপরোয়া ধনলুণ্ঠন করেছেন এবং নিজেরা সবচেয়ে বড় জাদুকর ব'লে সরকারী সংখ্যা-বিজ্ঞানীদের সংখ্যার জাদুবিদ্যাজালে জড়িয়ে পড়েননি। আজ তাঁদের অনেকের রহস্য কিভাবে অনাবৃত করা হচ্ছে তা সকলেই জানেন।

সে যাই হোক্, আয়কর বিভাগের এই হিসাবের মধ্যে আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত সমাজের পূর্ণাঙ্গ "আর্থিক চিত্র" না পাওয়া গেলেও, এর মধ্যে আর্থিক আয়ের দিক থেকে মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিভিন্ন স্তরের "গতিধারার" (স্ট্যাটিস্টিকাল অর্থে 'ট্রেণ্ড') একটা হদিশ পাওয়া যায় এবং সামাজিক বিশ্লেষণের দিক থেকে এই 'গতিধারাই' অত্যন্ত মূল্যবান। এইবার আমরা মধ্যবিত্ত সমাজের আরও একটু ভিতরের দিকে এগিয়ে যাব এবং সেখানেও দেখব ঐ একই 'ধারা' বা 'ট্রেণ্ড' বজায় আছে।

মধ্যবিত্তের (চাকুরিজীবী) স্তরবিন্যাসের ধারা

মধ্যবিত্তের একটা বিশেষ স্তরের আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণ করতে হ'লে 'চাকুরিজীবী' বা 'স্যালারিয়েট' স্তরকে কেন্দ্র ক'রে করাই ভাল, কারণ তাতে গতিধারার বিশ্লেষণ নির্ভুল হবার সম্ভাবনা বেশী। এই চাকুরিজীবীর মধ্যে 'সরকারী' চাকুরিজীবীদের দৃষ্টান্ত 'নমুনা' হিসাবে নেওয়া যেতে পারে, কারণ তাঁদের অবস্থা মোটামুটি স্থির ও স্থায়ী। ১৯৫০-'৫১ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে দেখা যায় যে মোট ৩৩৫'৩৩ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের মধ্যে ১৩৭'৮৩ কোটি টাকা (৪১%) "বেতন ও এ্যালাউন্স" খাতে মঞ্জুর করা হয়েছে। নয়টি প্রদেশের বাজেটে দেখা যায় যে মোট ২৮৫ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের মধ্যে ১৩০'৩৫ কোটি টাকা ঐ একই খাতে মঞ্জুর হয়েছে। ১৯৩৮-'৩৯ সালের বাজেটের মধ্যে "বেতনের" বরাদ্দ অংশ জানা নেই, কিন্তু যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে মোট ব্যয়বরাদ্দের সঙ্গে বেতনের বরাদ্দের "অনুপাত" ঠিকই আছে ১৯৩৮-৩৯ ও ১৯৫০-৫১ সালে—তাহলেও দেখা যায় প্রদেশে বেতনবৃদ্ধি হয়েছে ৩১০%এবং কেন্দ্রে ২৭৫%। এই বৃদ্ধিও টাকার সরবরাহ-বৃদ্ধির তুলনায় "আনুপাতিক" বৃদ্ধি নয়। মোট বেতনবৃদ্ধির সংখ্যা আর শতকরা বৃদ্ধির হার দেখেই সরকারী চাকুরেদের সকলের অবস্থা বা সাধারণ অবস্থা কিছুই বুঝা সম্ভব নয়। সংখ্যার 'চালাকিতে' অবশ্য বুঝিয়ে দেওয়া যায়,

"এ্যাভারেজ" বা গড়-বৃদ্ধির কথা বলে, কিন্তু সেটা ভুল বুঝানো হবে। মনে করুন, দুটি গোষ্ঠীর (ক ও খ) আর্থিক অবস্থার তুলনা করতে হবে। 'ক' গোষ্ঠীর পাঁচজন যথাক্রমে ৭৫৲, ১০০৲, ৩৫০৲, ৬০০৲ও ৪০০০৲ টাকা আয় করে, আর 'খ' গোষ্ঠীর তিনজন যথাক্রমে ৯৫০৲, ১০৫০৲, ১০৭৫৲, টাকা আয় করে। এ ক্ষেত্রে 'ক' ও 'খ' উভয় গোষ্ঠীর লোকের গড়-আয় সমান, ১০২৫৲ টাকা। সুতরাং গড়-আয় সমান বললে দুই গোষ্ঠীর অবস্থা কিছুই বুঝা যায় না এবং 'ক' গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যক্তিগত আয়ের ব্যবধান্ যে খুব বেশী বা আর্থিক অসমতা বেশী, আর 'খ' গোষ্ঠীর অবস্থা অনেক উন্নত ও সমতা বেশী, তাও ঐ গড়-আয় থেকে বুঝা মুশ্‌কিল। তেমনি সরকারী কর্মচারীদের মোট বেতনবৃদ্ধির ক্ষেত্রেও তাই। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে বিভিন্ন স্তর আছে—আরদালি, পিওন, নন্‌-গেজেটেড স্টাফ্, গেজেটেড অফিসার ইত্যাদি। নীচের স্তরের সংখ্যা-বৃদ্ধির জন্যে মোট বেতনবৃদ্ধি হয়েছে এবং বর্ধিত বেতনের অনেকটা কর্মচারী-দের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্যে খরচ হচ্ছে। অর্থাৎ মধ্যবিত্ত কর্মচারীর সংখ্যা বেড়েছে বলেই মোট বেতন বেড়েছে, প্রত্যেক কর্মচারীর অবস্থার উন্নতি হয়েছে বা ব্যক্তিগত বেতনবৃদ্ধি হয়েছে ব'লে মোট বেতন বাড়েনি। এই হ'ল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হ'ল, নীচের বা সাধারণ কর্মচারীদের স্তরে "যে-হারে" সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে, উপরের স্তরে তার চেয়ে অনেক "বেশী হারে" হয়েছে। যেমন কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েটে (ভারত-বিভাগের আগে, সারা ভারতের জন্যে) ১৯৩৯ সালে সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট ছিলেন ৭৬ জন, আণ্ডার-সেক্রেটারী ছিলেন ৪০ জন, কিন্তু ১৯৪৮ সালে (ভারত-বিভাগের পরবর্তী ভারতের জন্যে) এই দুই অফিসারের সংখ্যা যথাক্রমে বেড়ে হয়েছে ৩৯৩ জন ও ২৪৮ জন। বৃদ্ধির হার পাঁচগুণ প্রায়, নিশ্চয়ই সাধারণ স্তরের তুলনায় অনেক বেশী। সুতরাং আমলাতান্ত্রিক কাঠামোতেও মাথাটা অসম্ভব রকম ভারি হয়েছে ক্রমে, এবং মোট বেতনের অনেকটা অংশ এইভাবে মোট কর্মচারী-সংখ্যার "বিশেষ অল্পাংশের" মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। সাধারণ আয়ের ক্ষেত্রে আয়করের হিসাব থেকে মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে স্তরবিন্যাসের যে 'গতিধারা' বা 'ট্রেণ্ড' আমরা লক্ষ্য করেছি, সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও সেই একই স্তরবিভাগের ধারা দেখা যাচ্ছে। সাধারণভাবে বিচার করলে সমগ্র মধ্যবিত্তশ্রেণীর (সকল স্তরের) অবস্থার উন্নতি বা আয়বৃদ্ধি টাকার সরবরাহ "অনুপাতে" হয়নি দেখা যায়। বিশেষভাবে বিচার করলে দেখা

যায়, মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিভিন্ন স্তরের মধ্যে উপরের একটা সংকীর্ণ স্তরে (ব্যবসায়ী ও চাকুরিজীবী দুই গোষ্ঠীতেই) আয়বৃদ্ধির "হার" অনেক বেশী, সাধারণ ও নীচের স্তরের মধ্যবিত্তদের তুলনায়।

এইবার আমরা আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে এই সাধারণ ও নিম্নমধ্যবিত্তের বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করব। বৃহত্তর সীমানা থেকে এইভাবে ধাপে ধাপে যত সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর সীমানার দিকে আমরা এগিয়ে যাব, বিশ্লেষণও আমাদের তত বিস্তৃততর হবে, এবং সাধারণ মধ্যবিত্তের মূল সমস্যাগুলির উপরেও তীব্রতর আলোকপাত করা সম্ভব হবে। সামাজিক বিশ্লেষণের এই বৈজ্ঞানিক রীতিতে "বিকৃত" চিত্র ফুটে ওঠার সম্ভাবনা অনেক কম।

সাধারণ ও নিম্ন-মধ্যবিত্তের আর্থিক অবস্থা

সাধারণ ও নিম্ন-মধ্যবিত্তের আর্থিক অবস্থার বিচার করতে হলে আবার 'নমুনা' দৃষ্টান্ত দিতে হবে। এইবার এই নমুনা 'রেল কর্মচারী' ও 'সরকারী কেরানীদের' ভিতর থেকে ঠিক করব, তার কারণ এই দুই ক্ষেত্র থেকেই একত্রে সাধারণ মধ্যবিত্তের একটা বিরাট অংশের নির্ভরযোগ্য পরিচয় পাওয়া সম্ভব হবে। রেল-কর্মচারীদের মধ্যে কেবল 'ই, আই, আর' ও 'বি, এ্যাণ্ড এ,আর' এবং সরকারী কেরানীদের মধ্যে কলকাতার কেরানীদের কথা এখানে বলা হলেও, মনে রাখতে হবে যে বিভিন্ন রেলওয়ের সাধারণ কর্মচারীদের মধ্যে বেতনের যেমন খুব বেশী তারতম্য নেই, তেমনি বিভিন্ন অঞ্চলের সরকারী কেরানীদের বেতনের মধ্যেও নেই। সবই প্রায় একই 'গ্রেডে' বাঁধা, যা সামান্য তারতম্য আছে তা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নয়। এখানে সাধারণ ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত রেলকর্মচারীদের কথা বলি :

রেল-কর্মচারীদের বেতন-তালিকা (মাসিক)

কর্মচারী	ই-আই-আর	বি এ্যাণ্ড এ, আর
পি, ডব্লু, ইন্‌স্পেক্টর :	৪০০, ৩৫০, ৩০০, ২৬০, ২৩০	৪০০, ৩৫০, ৩০০, ২৬০, ২৩০, ২০০, ১৮০, ১৬০, ১৪০
সাব—ঐ :	২০০ ১০০/১২০-১০-১৮০	১০০-১০-১২০ ৬৫-৫-৮৫

কর্মচারী		ই-আই-আর	বি এ্যাণ্ড এ, আর
স্টেশন মাস্টার	:	৩৫০, ৩০০, ২৫০, ২০০, ১৬০, ১০০-১০-১২০ ৬৫-৫-৮৫ ৩০-৩-৪৫-৫-৬০	৬৫-৫-৮৫
সহঃ স্টেশন মাস্টার	:	২৩০, ২০০, ১৮০ ৬৫-৫-৮৫ ৩০-৩-৪৫-৫-৬০	ঐ
প্যাসেঞ্জার গার্ড (ক)		১০০-১০-১২০	১০০-১০-১২০ (এক্সপ্রেস ও মেইল গার্ড)
মালগাড়ীর গার্ড	:	৫০-৩-৪৫-৫-৬০ (বি, গ্রেড)	৬০-৫-৮৫ (সি গ্রেড) ৩০-৩-৪৫-৫-৬০
পার্শেল কেরানী	:	১০০-১০-১২০	১০০-১০-১২০ ৬৫-৫-৮৫ ৩০-৩-৪৫-৫-৬০ ৩০-২-৪০
বুকিং ক্লার্ক	:	১০০-২-১২০ ৬৫-৫-৮৫	১০০-১০-১২০ ৬৫-৫-৮৫ ৩০-৩-৪৫-৫-৬০
গুডস্ ক্লার্ক	:	১০০-১০-১২০ ৬৫-৫-৮৫ ৩০-৩-৪৫-৫-৬০ ৩০-৩-৪৫	ঐ
টিকেট কালক্টর	:	৬৫-৫-৮৫ ৩০-৩-৪৫-৫-৬০ ৩০-৩-৪৫	১০০-১০-১২০ ৬৫-৫-৮৫ ৩০-৩-৪৫-৫-৬০

রেল-কর্মচারীদের এই বেতন সম্পর্কে আলোচনা করবার আগে সরকারী কেরানীদের বেতনের একটা হিসেব নেওয়া যাক। নীচের সারিতে কলকাতার বিভিন্ন সরকারী অফিসের কেরানীদের বেতনের একটা তালিকা দেওয়া হ'ল :

সরকারী কেরানীদের বেতন তালিকা (কলকাতা)

(নূতন স্কেলের বেতন)

ডাক ও তার বিভাগ : সার্কেল অফিস অপার ডিভিসন ক্লার্ক	:	৫০-৫-১৫০
ডাক ও তার বিভাগ : অন্যান্য অফিসের কেরানীদের বেতন	:	৪৫-৪৫-৩-১০-৫-১২০ (এখন অপার ডিভিসন নেই)

অ্যাকাউন্টেণ্ট জেনারেল ক্লার্ক　:　৫০-৪-১১০-৫
　　১৬০-১৬০-৫-১৮০
কাষ্টমস : অপার ডিভিসন ক্লার্ক　:　৮০-৮০-৫-১৮০
ইনকাম-ট্যাক্স : এসিস্ট্যাণ্ট　:　১৩০-৫-১৫৫
ইণ্ডিয়ান স্টোর্স ডিঃ-ক্লার্ক　:　৮০-৫-১৫০ (উচ্চ গ্রেড)
সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া : ক্লার্ক　:　১২০-১০-২৫০ (প্রথম ডিভিসন)
বোটানিকাল সার্ভে : ক্লার্ক　:　৮০-৫-১৫০ (অপার ডিভিসন)
কমার্সিয়াল ইণ্ট ও ষ্ট্যাটিটিক্স : ক্লার্ক :　১০০-৫-১৫০-১০-২৫০

"সিলেকশন গ্রেডের" কেরানী

জুনিয়ার গ্রেড　:　১৬০-৬-১৯০ (সার্কেল ও এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিস)
　১৩০-৬-১৮০ (অন্যান্য অফিস)

সিনিয়র গ্রেড　:　২০০-১০-২৫০

উপরের বেতন-তালিকা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে অধিকাংশ স্টেশন মাস্টার, সহকারী স্টেশন মাস্টার, প্যাসেঞ্জার গার্ড, গুড্‌স গার্ড, পার্শেল ক্লার্ক, বুকিং ক্লার্ক, গুড্‌স ক্লার্ক, টিকিট কলেক্টর ইত্যাদি যাঁরা রেলের মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের বৃহত্তম অংশ, তাঁদের মাসিক বেতন তিন-চারটি "স্কেলের" মধ্যে বাঁধা—যেমন ৩০।৩।৪৫।৫।৬০, ৬৫।৫।৮৫ ও ১০০।২।১২০ টাকা। ভাতা ও এ্যালাউন্সাদি মিলিয়ে যদি বেতনের ৭৫% বাড়ে তাহলেও কি তাঁদের পক্ষে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়? আপনি যদি কল্পনাপ্রবণ হন, তাহলে এবারে একটু কল্পনাশ্বের রশ্মি মুক্ত করুন। তাহলেই দেখতে পাবেন, সুদীর্ঘ জনপ্রাণীহীন মালগাড়ী, চিকোতে চিকোতে কোথা থেকে কোথায় চলেছে, কত হাজার হাজার লোকের কত সব প্রয়োজনীয় মাল বহন ক'রে, শেষের ছোট্ট কামরাটিতে যে মালগাড়ীর গার্ড আছেন তাঁর জিম্মায়। একঘেয়ে ঢিমেতালের ট্রেণের ছন্দের সঙ্গে গুড্‌স-গার্ডের ত্রিশ-তিন-পয়তাল্লিশ-পাঁচ-ষাট টাকার জীবনের ছন্দ একবার মিলিয়ে দেখলে হতবাক্ হয়ে যাবেন। তেমনি বুকিং ক্লার্কের জীবনভোর টিকিট পাঞ্চিং আর ঐ ৩০।৩।৪৫।৫।৬০-এর বিলম্বিত ছন্দের কথা মনে করুন। মনে করুন দেশান্তরে নির্বাসিত স্টেশন মাস্টার ও তাঁর সহকারীদের কথা। শিক্ষাজগতের "অনরেব্‌ল" মাস্টার মশাইদের মতো এঁরাও আমাদের সমাজের আর এক শ্রেণীর মাস্টার মশাই, সকলেই সেই "বিশিষ্ট ভদ্রলোকশ্রেণীর" মধ্যেই গণ্য। কিন্তু তাহলেও ঐ

বারোমাসারুর তিন-পাঁচের ছন্দে তাঁদের সমস্ত জীবনটা বাঁধা, যেমন স্কুলের মাস্টার মশাইদের। তবু তাঁরাই তো এতবড় একটা আসমুদ্র-হিমাচল-বিস্তৃত রেলপথে অসংখ্য গুড্‌স, প্যাসেঞ্জার, মেইল, এক্সপ্রেস ট্রেণ চালান। নিজেদের জীবন একেবারে চলে না, কতবার দৈনন্দিন জীবনের কত খানাডোবায় চাকা আটকে যায়, কেউ তার হিসেব রাখে না, কারণ তাঁরা যে "উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টের মধ্যে বিশিষ্টরূপে খ্যাত"। জীবনের চাকা একেবারেই চলে না, তবু কানে কোন দিয়ে বসে থাকতে হয়, টিকিট পাঞ্চ করতে হয়, পতাকা নাড়তে হয়, হুইসেল দিতে হয়, মালের ও পার্শেলের নিখুঁত হিসেব রাখতে হয়—অর্থাৎ ট্রেণ চালাতেই হয়, কারণ তা না হ'লে রাজার রাজত্ব চলে না, রাষ্ট্রীয় গণেশ একেবারে উল্টে যায় যে। সরকারী কেরানীরা, যাঁরা মধ্যবিত্ত সরকারী কর্মচারীদের বৃহত্তম অংশ, তাঁদের জীবনও ঐ একই সুরে ও ছন্দে বাঁধা, ৩০।৩-এর জায়গায় হয়ত ৫০।৫ বা ৮০।৫।১৫০১। বারোমাস ১০টা-৫টার ছুটোছুটি হয়রানির পর ৫১ টাকার জাদুকরী "মাত্রার" উদ্দীপনায় আবার বারোমাস ছোটা। তবু বিরাট আমলাতন্ত্রের পর্বতপ্রমাণ ফাইলের স্তূপ লিখে লিখে তাঁদেরই ভর্তি করতে হয়, সমস্ত হিসেব ও রেকর্ড তাঁদের রাখতে হয়, কেবল নিজেদের জীবনের হিসেব যায় গরমিল হয়ে, জীবনের দেনা ও দায়িত্ব বাড়ে অনেক বেশী হারে সুদে-আসলে, কিন্তু ওদিকে চার-আর-পাঁচের 'স্কেলে' সবকিছু আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।

"মাগ্‌গী ভাতা" সম্বন্ধে এখানে কোন আলোচনার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করি না। যে বেতনের তালিকা উপরে দিয়েছি তাতে মাগ্‌গী ভাতা যে-হারে দেওয়া হোক না কেন, একটা 'বিন্দুর' চেয়ে বেশী মূল্য তার নেই। বেতনের শতকরা ৫০ বা ৭৫ ভাগ, এমনকি ১০০ ভাগ পর্যন্তও যদি তাকে টেনে বাড়ানো যায়, তাহলেও মধ্যবিত্ত কর্মচারী ও কেরানীরা কোনরকমে জীবনধারণ করতে পারেন কিনা সন্দেহ। বিচারপতি রাজাধ্যক্ষ "ডাক ও তার বিভাগের নন্‌-গেজেটেড কর্মচারীদের সালিশী রিপোর্টে" তাই মাগ্‌গী ভাতা সম্বন্ধে পরিষ্কার বলেছেন :

> "মাগ্‌গী ভাতার ইতিহাসে আজ পর্যন্ত দেখা যায় না যে কোন সময় সেই উপরি ভাতার জন্যে এই শ্রেণীর স্বল্প-বেতনের কর্মচারীদের বাস্তবিকই জীবনধারণের প্রয়োজন মতো আয় করা সম্ভব হয়েছে। ১৯৩৯ সালের স্তরেও তাঁরা কখনও পৌঁছতে পারেন নি। ফলে তাঁরা ঋণগ্রস্ত হয়েছেন,

এবং যুদ্ধের মধ্যে অনেক মধ্যবিত্ত কর্মচারীর পৈতৃক ভিটেমাটি পর্যন্ত বিক্রী ক'রে বাঁচতে হয়েছে—" (১)

রেল-কর্মচারীদের ভাতা ইত্যাদি সম্বন্ধে মতামত আমি "অল্ ইণ্ডিয়া রেলওয়ে-মেন্‌স ফেডারেশনের রিপোর্ট" থেকে তুলে দিচ্ছি। রিপোর্টে বলা হয়েছে :

"যে হারে ভাতা বা এ্যালাউন্সাদি দেওয়া হয়, জীবনধারণের ন্যূনতম খরচা যোগান তার দ্বারা হয় না এবং দ্রব্যমূল্যের সূচক-সংখ্যার সঙ্গে এই ভাতার কোন সম্পর্ক নেই পরিপূরক হিসেবে।" (২)

সুতরাং 'ভাতার' দৌড় কতদূর পর্যন্ত তা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে। মূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির ঘোড়দৌড়ের সঙ্গে কোন কালেই কোন বিভাগের কর্মচারীদের "ভাতা" তাল রেখে দৌড়তে পারেনি এবং শেষ পর্যন্ত এত বেশী পিছনে পড়ে গেছে যে 'মাগ্‌গী ভাতা' না থেকে ওটা কর্তাদের "বকশিসে" পরিণত হয়েছে।

এতক্ষণ পর্যন্ত বোধ হয় আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম যে মধ্যবিত্ত কর্মচারীরা দ্বীপান্তরিত 'রবিনসন্ ক্রুসো' নন, অথবা কোন "চিরকুমারের রাজ্যেও" তাঁরা বাস করছেন না। তাঁদের যে মা-বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে "পরিবার" আছে, সেই পরিবার প্রতিপালন করার দায়িত্ব যে তাঁদেরই চাকরির উপর, একথা যেন আমাদের মনেই ছিল না। তাছাড়া শুধু খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার খরচ ছাড়াও শিক্ষার খরচ আছে, বাসা খরচ, বিবাহ ধর্মকর্মের খরচ, অসুখ-বিসুখে চিকিৎসার খরচ ইত্যাদিও আছে। এত খরচ বহন ক'রে কি ঐ তিন-চার-পাঁচ মাত্রার ছন্দে চলা সম্ভবপর ?

সুতরাং মধ্যবিত্ত জীবনের সংকটের প্রকৃত রূপ বুঝতে হ'লে আরও গভীরে, আফিস থেকে একেবারে অন্দরমহলে প্রবেশ করতে হবে। অর্থাৎ "মধ্যবিত্ত পরিবারের" স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে হবে। এখানে কলকাতা, বাংলাদেশ ও আসামের মধ্যবিত্ত পরিবারের উপরেই ঝোঁক দিয়েছি বেশী, কারণ মধ্যবিত্ত

১ Adjudication Report in the Trade Dispute between P. & T. Dept & its Non-Gazetted Employees—By Mr. Justice G. S. Rajadhyaksha, পৃঃ ৫৭, প্যারা ১৩২

২ Amplified Report of 23rd Half-yearly meeting of A. I. R. F, Appendix II & Ahmad Mukhtar: Non-Gazetted Railway Services— পৃঃ ৫২

পরিবারের গড়নের কিছুটা প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য থাকলেও, আর্থিক অবস্থার আলোচনা-প্রসঙ্গে তা আপাততঃ আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি।

মধ্যবিত্ত পরিবারের গড়ন ও আর্থিক অবস্থা

মধ্যবিত্ত পরিবারের "গড়নটা" কি রকমের দেখা যাক। কিছুদিন আগে (১৯৪৫-'৪৬ সালে) ভারত গভর্নমেণ্টের "ইকনমিক এ্যাডভাইজরের" অফিস থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন "মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের" পারিবারিক বাজেট (ফ্যামিলি বাজেট) সম্বন্ধে একটা 'তদন্ত' করা হয়েছিল। তার রিপোর্টটি সম্প্রতি (১৯৫০) প্রকাশিত হয়েছে। এই রিপোর্ট থেকেই আমি এখানে তথ্য বাছাই ক'রে দিচ্ছি (কেবল কলকাতা, বাংলাদেশ ও আসামের)। (৩)

মধ্যবিত্ত পরিবারের গড়ন (টেব্‌ল নং ৭)

	বয়স্ক পুরুষ		বয়স্ক স্ত্রীলোক		ছেলে (১৫র নীচে)		মেয়ে (ঐ)		মোট সংখ্যা
কলকাতা :	২·২	+	২·০	+	১·৬	+	১·৪	=	৭·২
বাংলা ও আসাম :	১·৯	+	১·৯	+	১·৬	+	১·৫	=	৬·৯

পরিবারের গড়ন দেখলেই আর্থিক অবস্থা জানা যায় না। আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত পরিবার সাধারণত "একজন" উপার্জকের উপরেই নির্ভরশীল। সুতরাং পরিবারের মধ্যে উপার্জকের সংখ্যা কতজন তা না জানলে আর্থিক দারিদ্র ও চাপের কথা কিছু জানা সম্ভব নয়। নীচের 'টেব্‌লে' তারই একটা হদিশ পাওয়া যাবে :

পরিবারের উপার্জক সংখ্যা (টেব্‌ল নং ৮)

	পরিবারের আয়তন	'খাইয়ে' সংখ্যা (৪)	উপার্জক সংখ্যা	উপার্জক প্রতি খাইয়ে সংখ্যা
কলকাতা :	৭·২	৫·৬	১·২৩	৪·৬
বাংলা ও আসাম :	৬·৯	৫·৩	১·১০	৪·৮

(বিহার ও উড়িষ্যার পুরো ৫)

(৩) Report on an Enquiry into the Family Budgets of Middle Class Employees of the Central Government. 'টেব্‌লগুলি' এই রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃত এবং 'টেবলের' নম্বরগুলিও রিপোর্ট অনুযায়ী দিয়েছি।

(৪) খাইয়ে-সংখ্যা "কনজাম্‌পশন ইউনিটকে" বলা হয়েছে। পরিবারের লোক-সংখ্যা ৭·২, অথচ খাইয়ে-সংখ্যা ৫·৬ হবার কারণ হ'ল এই যে একটা ষ্ট্যাণ্ডার্ড 'ইউনিট' অনুযায়ী খাদ্যটাকে মাপা হয় এবং সেটা বয়স্কদের ইউনিট। সেই হিসাবে শিশুদের "কম" হবে, সুতরাং মোট "C. U." বা "খাইয়ে-সংখ্যাও" পরিবারের লোকসংখ্যার চেয়ে কম হবে।

এই 'টেব্‌ল' থেকে পরিবারের আসল "আর্থিক গড়নের" পরিচয় পাওয়া যায়। দেখা যায় যে বাংলাদেশের ও আসামের মধ্যবিত্ত পরিবারে প্রত্যেক উপার্জকের আয়ের উপর গড়ে প্রায় পাঁচজন বয়স্ক ব্যক্তি নির্ভরশীল, কলকাতাতে সাড়ে চারজনেরও বেশী। কলকাতায় উপার্জক-সংখ্যা একজনের কিছু বেশী হবার কারণ হ'ল, শহরে পরিবারের অন্যান্য লোকেরা (মেয়েরাও) একটু-আধটু কিছু করবার সুযোগ পায়, যা শহরের বাইরে প্রথমতঃ পাওয়া মুশকিল, দ্বিতীয়তঃ সামাজিক গোঁড়ামি ও "ভদ্র পরিবারের" মর্যাদার জন্যেও করা সম্ভব হয় না সব সময়। মোটামুটি আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত পরিবারের গড়ন হ'ল এই—একজনের মুখাপেক্ষী অন্য সকলে। কেবল কলকাতা শহরে আরও প্রায় ২৫% দায়িত্ব অন্যের উপর ভাগ হয়ে যাচ্ছে তার কারণ কলকাতায় মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরাও আজ উপার্জনের ধান্দায় বেরুতে বাধ্য হয়েছেন।

এইবার মধ্যবিত্ত পরিবারের "মোট" মাসিক আয় এবং "প্রধান উপার্জকের" আয় কতটা দেখা যাক, তাহলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হবে :

মধ্যবিত্ত পরিবারের মাসিক আয় (টেব্‌ল নং ১০)

	মোট আয়	প্রধান উপার্জকের আয়	অন্যদের আয়	বাইরের আয়
কলকাতা :	২২৯৸৵০	২০৫৵০ (৮৯'২০%)	৪৵০ (১'৮%)	২০৷৵০
বাংলা ও আসাম :	১৯৮৷/০	১৬৩৷/০	৩৸০	৩৲

প্রধান উপার্জকের আয়ের উপর আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত পরিবার আজও কতটা নির্ভরশীল তা এই হিসাব থেকে বুঝা যাবে। শুধু আয় নয়, এইবার আয় ও ব্যয়ের হিসাব থেকে মধ্যবিত্ত পরিবারের আসল আর্থিক অবস্থাটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে :

মধ্যবিত্তশ্রেণীর আর্থিক অবস্থা (টেব্‌ল নং ১২)

	মোট মাসিক আয়	মোট মাসিক ব্যয়	মাসিক ঘাটতি
কলকাতা :	২২৯৸৵০	২৭৬৶/০	৪৬৷/০
বাংলা ও আসাম :	১৯৮৷/০	২৩৯৷/০	৪৲

মনে রাখতে হবে এটা "ভারত সরকারের" আয়-ব্যয়ের 'ঘাট্‌তির' হিসাব নয়, ভারত সরকারের কর্মচারীদের, অর্থাৎ হাজার হাজার মধ্যবিত্ত পরিবারের আয়-ব্যয়ের ঘাটতির হিসাব। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মাসিক ঘাটতির পরিমাণ যদি ৪১৲ টাকা থেকে ৪৬৲ টাকা পর্যন্ত হয়, অর্থাৎ গড়ে ৪৩৲ টাকা, তাহলে বছরে ঘাটতির পরিমাণ হয় ৫১৬৲ টাকা। এই হ'ল মধ্যবিত্ত পরিবারের বাৎসরিক ঘাটতির "স্কেল"—৫১৬৲ টাকা। এইবার বেতন-বৃদ্ধির "স্কেল" ও ঘাটতির "স্কেল"—দুই "স্কেলে" তুলনা করুন—

ঘাট্‌তির 'স্কেল' : ৫১৬৲ | ৫১৬৲ | ???
বেতন বৃদ্ধির 'স্কেল' : ৫৲ | ১০৲ | ???

বিচারপতি রাজাধ্যক্ষ যে "পৈতৃক ভিটেমাটি" বিক্রীর কথা বলেছেন, শেষ পর্যন্ত তাতেও 'হালে পানি' পাওয়া যায় না। পৈতৃক সম্পত্তি ছেড়ে "স্ত্রীর সম্পত্তি" অর্থাৎ গহনাগাঠি ধরে টান মারতে হয়, শিক্ষার খরচ বন্ধ করতে হয়, কন্যার বিবাহ হয় না। তাতেও যখন কুলোয় না তখন এক-বার গণৎকারের কাছে 'হাত' দেখাতে হয়, অথবা কোন সিদ্ধবাবার শরণাপন্ন হ'তে হয়, অথবা সোজা নেমে পড়তে হয় "ধর্মঘটি" মজুরদের পাশাপাশি উন্মুক্ত রাজপথে। "উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টের" মধ্যে সেই যে "বঙ্গদূতের" যুগের "বিশিষ্টরূপ", সেটা আর কোনমতেই বজায় রাখা সম্ভব হয় না। যার পৈতৃক ভিটেমাটি নেই, স্ত্রীর গহনাগাঠি নেই, পুত্র-কন্যার শিক্ষা দেওয়া হয় না, কায়-ক্লেশে খেয়েপরে বেঁচে থাকাও অসম্ভব হয়ে ওঠে, প্রতিদিন দেনার বোঝা বেড়ে যায়, বাড়ীতে ও অফিসে কাবুলিওয়ালা ও পাওনাদার ঠিক পয়লা তারিখে বেরুবার পথে পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে (রাজাধ্যক্ষের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য), সেও কি "মধ্যবিত্ত স্যালারিয়েট" শ্রেণীর মধ্যে গণ্য, না "বিত্তহীন প্রলেটারি-য়েটদেরই" একজন? মধ্যবিত্ত পাঠকরা এই প্রশ্নের কি উত্তর দেন, জানতে ইচ্ছা হয়।

আমাদের দেশের মধ্যবিত্তশ্রেণীর বৃহত্তম অংশ আজ নিঃস্ব প্রলেটারিয়েটের স্তরে নেমে এসেছে এবং দ্রুত নেমে আসছে। নিম্নের তথ্যের বিশ্লেষণ থেকে এই ইঙ্গিতই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। শুধু আর্থিক অবস্থা নয়, মধ্যবিত্তের বসবাসের অবস্থাও মজুরশ্রেণীর বস্তি-জীবনের চেয়ে উন্নততর নয়। অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবারের "গৃহ" দ্রুত "বস্তিতে" রূপান্তরিত হচ্ছে। কিভাবে হচ্ছে দেখা যাক:

মধ্যবিত্তের গৃহ (টেব্‌ল নং ১৩)

মাসিক আয়ের সারী	:	গৃহের আবর্তন
১০০৲-১৫০৲ ১৫০৲-২০০৲ ২০০৲-২৫০৲	:	২-কামরা গৃহ
২৫০৲-৩০০৲	:	৩-কামরা গৃহ
৩০০৲-উপরে	:	৪-কামরা গৃহ

এক-কামরা গৃহেও যথেষ্ট মধ্যবিত্ত পরিবার বসবাস করেন এবং তাঁদের মধ্যে শতকরা ৫০টি পরিবারে ৪।৫ জন লোক, আর বাকি পরিবারে ৬।৭ জন লোক থাকে। ২-কামরা গৃহে যাঁরা থাকেন তাঁদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৫২টি পরিবারে ৬ জনের বেশী লোক থাকে। এইবার পরিবারের গড়নের কথা ভাবুন—স্বামী-স্ত্রী, বয়স্ক পুত্র ও কন্যা কি ভাই-বোন, ছোট ছেলে-মেয়ে। ১-কামরা ঘরে কিভাবে এঁরা বাস করতে পারেন এবং ২-কামরা ঘরেই বা কিভাবে বাস-বণ্টন হতে পারে তা নিজেরাই কল্পনা করুন। এই ধরনের বসবাসের কি কোন সামাজিক, পারিবারিক ও মানসিক "প্রতিক্রিয়া" নেই? নিশ্চয়ই আছে, অত্যন্ত ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া। তার পরিচয় আমরা সমাজে ও পরিবারে যথেষ্ট পাচ্ছি। এখানে তার আলোচনার প্রয়োজন নেই। আসল বক্তব্য হ'ল—মধ্যবিত্ত পরিবারের এই 'গৃহের' সঙ্গে মজুরের 'বস্তির' পার্থক্য কোথায়? বস্তি-জীবনের সঙ্গে এই গৃহ-জীবনের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করবার দরকার আছে কি?

সুতরাং এইসব বাস্তব সত্যের একমাত্র নির্দেশ হচ্ছে এই: কোনদিক থেকেই আর মধ্যবিত্ত জীবনের "বিশিষ্টতা" বজায় থাকছে না। থাকছে শুধু সেই "বিশিষ্টতার" একটা বেদনাময় স্মৃতি, যা মনের মধ্যে থেকে থেকে উঁকি মারছে। মৃতপ্রায় "মধ্যবিত্তের" মনটা হয়ত তখন বিদ্রোহ ক'রে উঠে বলছে: "আমি কেরানী, আমি শিক্ষক-অধ্যাপক, আমি শিল্পী-গায়ক, আমি স্টেশন মাষ্টার, বুকিং ক্লার্ক, ট্রেনের গার্ড—আমি বিশিষ্ট ভদ্রলোক, ভদ্রতা আমার বজায় রাখতেই হবে"। কিন্তু বাস্তব ইতিহাসের ঘাতপ্রতিঘাতে সেই বিশিষ্টতা ও ভদ্রতা বজায় রাখা আজ কিছুতেই সম্ভব নয়। "তণ্ডুলের মোন" আজ আর "দুই তঙ্কা" নেই এবং "বঙ্গদূতের" কাল কেটে গেছে অনেকদিন।

সঙ্কট-মুক্তির দুই পথের কোন্‌টা ?

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক—তাহলে এই সঙ্কট থেকে মধ্যবিত্তের মুক্তির পথ কোন্‌টা ? মুক্তির পথ দুটি। প্রথম পথ হ'ল, এই সঙ্কটকে একটা সাময়িক "অদৃষ্টচক্র" বা "ঘটনাচক্রের" সঙ্গে বারবার জড়িয়ে কেবলই অদৃষ্টের দিকে ফিরে চাওয়া এবং অবশেষে তার কাছেই আত্মসমর্পণ করা। এই পথ চলতেই দেখা হবে গণৎকারের সঙ্গে, বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষদের সঙ্গে, আর প্রতিদিন নানা কুসংস্কারের দুর্বলতায় জড়িয়ে পড়তে হবে। দেশের হৃষ্টপুষ্ট নেতারা অনেক আশার বাণী শোনাবেন, অনেক পরিকল্পনার মন্ত্র এবং অনেক "স্বদেশী ও ভারতীয়" পন্থা। এ-পথে মুক্তির 'আশা' ঐ গণৎকারের 'আশার' মতোই, অর্থাৎ আশাও নেই, ভরসাও নেই। "বিশিষ্টতা ও ভদ্রতার" বেদনাময় স্মৃতির তাড়নায় এই পথেই হয়ত চলতে ইচ্ছা করবে, কারণ এ-পথে কোন ঝঞ্ঝাট নেই। কিন্তু পথপ্রান্তে সমস্ত 'মধ্যবিত্ত পরিবারটি' একমাত্র উপার্জকের দেহান্তের পর, হয়ত তার আগেই, ভগ্নস্তূপে পরিণত হবে। অশিক্ষিত ছেলেরা হবে "লুম্পেন প্রলেটারিয়েট", মেয়েদের জীবন হবে বিভীষিকাময় ; কেউ হবে পাগল, কেউ গুণ্ডা, কেউ সন্ন্যাসী পলাতক। "ভদ্রলোকের পরিবার" একেবারে মাটির হাঁড়ির মতো ভেঙে যাবে, কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না।

দ্বিতীয় পথ "প্রতিরোধের" পথ, সংগ্রামের পথ। "উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট" উভয়ের মধ্যে "বিশিষ্টরূপে" খ্যাতির স্মৃতিকথা ভুলে গিয়ে, জীবন্ত বাস্তব সত্যের কথা বুঝতে হবে। সেই সত্যের যে কঠোর নির্দেশ তাও প্রতিপালন করতে হবে। কি সেই নির্দেশ ? বাস্তব ইতিহাস প্রমাণ করছে যে মধ্য-বিত্ততাবোধ একটা মানসিক বিভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়, 'মধ্যবিত্ত' আর 'মজুরে' কোন পার্থক্য নেই। যে সমাজব্যবস্থার জন্যে মজুর আজ সর্বহারা, সেই ব্যবস্থার জন্যেই "মধ্যবিত্তের" বৃহত্তম অংশ রিক্ত মজুরের স্তরে নামতে বাধ্য। সুতরাং প্রতিরোধের পথ ও সংগ্রামের পথ দুজনের একই নয় কি ? এছাড়া "মধ্যবিত্তের" জন্যে স্বতন্ত্র কোন "মধ্যপথ" নেই। আর্থিক ক্ষেত্রে "মধ্যপথ" যেমন "দালালি", সংগ্রামের ক্ষেত্রেও "মধ্যপথ" তেমনি "দালালি"। এই সমাজে আর্থিক ক্ষেত্রে হয়ত দালালি করেও হঠাৎ ভাগ্য ফেরানো যেতে পারে, কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে 'দালালির' কোন ভবিষ্যৎ নেই। মজুরেরা

'মধ্যপথ' জন্ম থেকেই ঘৃণা করে, কিন্তু মধ্যবিত্তের ঐ মধ্যপথের দিকে একটা জন্মগত টান আজও আছে। এই 'টান' কাটিয়ে না ওঠা পর্যন্ত মধ্যবিত্তের মুক্তি নেই।

এই রচনার তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ :

১) Report of the Indian States Finances Enquiry Committee. 1949.

২) All-India Income-Tax Revenue Statistics 1946-'47 (Published in 1949)

৩) Monthly Abstract of Statistics, Govt of India, 1947, 1948, 1949, 1950

৪) Fiscal Commission Report, 1950.

৫) Indian Employers' Association's Publications—i) How Indian Income Groups changed Since 1938-39 (ii) Who owns the Capital ? (iii) Role of Private Enterprise in India (iv) Who Contributes to the Exchequer ?

৬) Non-Gazetted Railway Services : By Ahmad Mukhtar

৭) Adjudication Report in the Trade Dispute between the P & T Dept and its Non-Gazetted Employees : By Hon'ble Mr. Justice G. S. Rajadhyaksha.

৮) Report on an Enquiry into the Family Budgets of Middle Class Employees of the Central Government.

জননেতা

(একাঙ্কিকা)

বিজন ভট্টাচার্য

জননেতা নরেন্দ্রনাথের দপ্তরখানা। ১৯০৫ থেকে '৫০ সাল—বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে বঙ্গভঙ্গ পর্বের উত্তরকাণ্ড পর্যন্ত—দেশের রাজনৈতিক জীবনে নরেন্দ্রনাথ নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন। আজ প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করেও জননেতা তেমনি অক্লান্ত। দায়িত্বভার বেড়েছে বই কমেনি। বহু ভাবনায় মুখখানা ক্লিষ্ট—দৃষ্টি সন্ধানী। চোখে চশমা, ইজিচেয়ারে শুয়ে আপাতত কাগজপত্তর পড়ছেন।

নরেন্দ্রনাথের বাঁ পাশে ছোট্ট একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল—খাতা-পত্তর কলমদানে সাজানো গুছোনো। দেওয়ালের হুকে চার পাঁচটা বড় বড় ভারী চিঠিপত্রের ফাইল লটকান। আর একটি মাঝারি সাইজের দেয়াল আলনা—চাদরটা, তোয়ালেটা রাখবার মত।

ইজিচেয়ারের ডান দিকে সমান্তরাল খানকয়েক বেঞ্চি পাতা। লোকজন এসে বসে দরকারে। দেওয়ালে ভারতবর্ষের মানচিত্র।

পিছনের দেওয়াল ঘেঁসে র‍্যাক—সংবাদপত্রের ফাইল, খাতাপত্তর, দলিল-দস্তাবেজ, বই ইত্যাদি ঠাসা। অফিস দপ্তরে কর্মীরা সব কাজে ব্যস্ত; টাইপরাইটারটি অনর্গল টাইপ করে চলেছে—ঝড়ের বেগে। লোকজন ঘুরঘুর করছে পিছনের দিকটায়—কাজেকর্মে সবাই ব্যস্ত। একটু হালকা আর নিস্তরঙ্গ কেবল সামনের দিকটা। কিন্তু তবু ইজিচেয়ারে চুপ করে কাগজ নিয়ে আধশোয়া অবস্থায় নরেন্দ্রনাথ একাই গোটা দৃশ্যটার ভারসাম্য রক্ষা করেছেন অদ্ভুতভাবে। কারণটা হয় তো ব্যক্তিত্বই। কাগজপত্তর দেখছেন আর বাঁয়াজী স্যাণ্ডেল পরা ডান পাটা নাচাচ্ছেন। মাঝে মাঝে মুখ থেকে কাগজখানা সরিয়ে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিটা যখন চশমার কাচের ওপর নিচ দিয়ে বাইরে নিক্ষেপ করছেন, তখনই কেবল আঁচ পাওয়া যাচ্ছে নরেন্দ্রনাথের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের। কাজকর্মের ব্যস্ততা ছাড়া বাহুল্য কোন গোলমাল নেই। শুধু 'বন্দেমাতরম' সংগীতের আবহ শোনা যাচ্ছে। টাইপিষ্ট ভবানী টাইপ করা শেষ পাতাটি খুলে দশ পনেরো পাতার একটা টাইপ-কপি জননেতা নরেন্দ্রনাথের কাছে আনে। নরেন্দ্রনাথ চশমা বদলে আস্তে দেখতে থাকেন টাইপ করা কাগজগুলো।

নরেন্দ্রনাথ—ইলেকশন ম্যানিফেষ্টোটি কোথায়!…দেখি।…(উঠে পড়েন) তুমি বাকিটা শেষ করে ফেলগে।…বাংলা তর্জমাটা হয়েছে সুরেশবাবু! ..(উত্তর না পেয়ে পিছনে তাকান) সুরেশবাবু কি বেরিয়ে গেলেন নাকি।

ভবানী—(টাইপ করা থামিয়ে) না এই তো ছিলেন।···আসবেন এক্ষুনি।

নরেন্দ্রনাথ—এলে একটু ভেতরে পাঠিয়ে দিও তো ভবানী।···আর বলো বাংলা কপিটা আজই প্রেসে দিতে হবে। তুমি ওটা শেষ করে ফেল।

(প্রস্থান)

(ঝড়ের বেগে টাইপ করে চলে ভবানী)

[খাকি হাফ-প্যাণ্ট, হাফ-সার্ট, মাথায় সোলার হ্যাট, পায়ে কাদামাখা গামবুট পরা অনেক সুদর্শন কর্মচারী মিঃ দত্ত ফাইলপত্তরগুলো বগলে নিয়ে প্রবেশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে সুরেশবাবুর প্রবেশ]

মিঃ দত্ত—রায়বাহাদুর আছেন ?

সুরেশবাবু—আপনি···

মিঃ দত্ত—দেখুন আমি একটু প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে চাই। বলবেন, মিঃ মুখার্জি পাঠিয়েছেন, ডাক বাংলো থেকে আসছেন।

সুরেশবাবু—বসুন।

মিঃ দত্ত—ধন্যবাদ। (সেক্রেটারিয়েট টেবিলে ফাইল রেখে বসে সিগারেট ধরান। দু-চারটে টান মারবার পরই নরেন্দ্রনাথ আসছেন বুঝতে পেরে জুতোর তলায় সিগারেটটি ঠুকে নিভিয়ে ছাইদানে ডুবিয়ে দেন আস্তে। উঠে দাঁড়ান সসম্ভ্রমে। হাত তুলে নমস্কার করেন)

(নরেন্দ্রনাথের প্রবেশ)

নমস্কার।

নরেন্দ্রনাথ—(ঘাড় নাড়েন উত্তরে) বসুন। (সুরেশবাবুকে) বাংলা তর্জমাটা তাহলে আজই প্রেসে পাঠিয়ে দেবেন।···হুঁ···(মিঃ দত্তকে) মুখুজ্জে সাহেব আপনাকে পাঠিয়েছেন! বসুন।

মিঃ দত্ত—আজ্ঞে হ্যাঁ। (ফাইল খোলেন) মানে এই লিষ্ট্‌টা আপনাকে একবার ফাইনালি দেখিয়ে নিতে বল্লেন।

নরেন্দ্রনাথ—ও, (দেখেন)···তা এ লিষ্ট করেছে কে। আপনি!

মিঃ দত্ত—আজ্ঞে হ্যাঁ।

নরেন্দ্রনাথ—আপনিই করেছেন ? গতবারের লিষ্টটা দেখেছিলেন নতুন লিষ্ট করবার সময় ?

মিঃ দত্ত—হ্যাঁ, মানে কতকগুলো নতুন নাম এবার এনলিষ্ট্‌ করা হয়েছে—

এই হচ্ছে আপনার গতবারের লিষ্ট, এবারের লিষ্টে কতকগুলো নতুন নাম আর স্টকের উল্লেখ আছে।

নরেন্দ্রনাথ—হুঁ, মিঃ মুখার্জি এ লিষ্ট অনুমোদন করেছেন।

মিঃ দত্ত—উনি দেখলেন, দেখে আপনার কাছেই আমায় পাঠালেন।

নরেন্দ্রনাথ—অ, মতামত কিছুই জানাননি।

মিঃ দত্ত—আজ্ঞে না।

নরেন্দ্রনাথ—তা এই যে সব নতুন নাম আপনি ঢুকিয়েছেন, এগুলো কার পরামর্শমত আপনি করলেন।

মিঃ দত্ত—পরামর্শমত মানে আমি নিজেই স্থানীয় লোকের কাছে খোঁজখবর করে এবং কতকগুলো জায়গায় নিজে গিয়ে অনুসন্ধান করে জোগাড় করেছি।

নরেন্দ্রনাথ—অর্থাৎ আপনি নতুন কিছু করতে চান; কেমন।

মিঃ দত্ত—না মানে···

নরেন্দ্রনাথ—বলুন বলুন···

মিঃ দত্ত—এখানে যে কোটাটা ধরা হয়েছে, তাতে করে আগেকার লিষ্ট অনুযায়ী ধান সীজ করলে আমি দেখলুম কোন মতেই কোটা পূরণ করতে পারিনে। আর এবার ওপর থেকে এই কোটা 'ফুলফিলের' ব্যাপারে বেশ কিছুটা কড়াকড়ি করা হচ্ছে, তাই···

নরেন্দ্রনাথ—বেশ করুন গিয়ে সীজ। লিষ্ট যখন করে ফেলেছেন আপনি—

মিঃ দত্ত—তবু আপনার মতামতটা···

নরেন্দ্রনাথ—আমার মতামত—কেন জানতে চাইছেন আমার মতামত? ওপর থেকে কড়াকড়ি হচ্ছে এবং তদনুযায়ী আপনি ধান সীজ করবেন বলে লিষ্টও তৈরি করে ফেলেছেন; এর মধ্যে,···এই নিন আপনার লিষ্ট। (ছুঁড়ে দেন)

মিঃ দত্ত—আপনি স্যার অসন্তুষ্ট হলেন বলে মনে হচ্ছে।

নরেন্দ্রনাথ—বোকার মত কথা বলবেন না। কদ্দিন কাজ করছেন আপনি এই বিভাগে!···আপনি কেন আগে আমার কাছে না এসে এখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে নিজে গিয়ে লিষ্ট তৈরি করেছেন! আপনি বাইরের লোক, এখানে কার ঘরে কি আছে কি নেই, আমার চাইতে সে বিষয়ে আপনি বেশি খবর রাখেন, না!

মিঃ দত্ত—না সে তো সত্যিই।

নরেন্দ্রনাথ—তবে! নতুন কানুন তৈরি করছেন, না! নিয়ে যান আপনি আপনার লিষ্ট।......ভবানী ওটা হয়েছে টাইপ করা?

ভবানী—আর সামান্য একটু বাকি আছে। এক্ষুনি হয়ে যাবে।

নরেন্দ্রনাথ—হলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

(প্রস্থানোদ্যত)

মিঃ দত্ত—স্যর...আপনি অনর্থক ক্ষুব্ধ হচ্ছেন আমার ওপর। What I wanted was just to be sincere and honest...

নরেন্দ্রনাথ—And that in your own way.!

মিঃ দত্ত—সে তো আমি স্বীকারই করছি স্যর। নিশ্চয়ই আমার ভুলচুক হতে পারে। আর আপনার কাছে আমার আসার কারণও তো তাই। এই লিষ্টই যে ফাইনাল লিষ্ট—এ কথা তো আমি বলছি না। আপনার অনুমোদনের পরই সেই লিষ্ট আমি করব। Otherwise why I am here at all! আমায় mis-understand করবেন না, ভুল বুঝবেন না স্যর।

নরেন্দ্রনাথ—বসুন।...আপনারা ইয়ং ম্যান, নতুন চাকরিতে ঢুকেছেন, energy আছে, zeal আছে—সবটাই প্রশংসা করবার মত, But স্যর—একটা কথা আপনারা ভুলে যান যে, সব জায়গাতেই আজ একটা বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আপনার প্রত্যেকটা শুভ প্রচেষ্টার ভেতরে বাধা সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছে। এখন এটা phenomenal হতে পারে, man-made হতে পারে, resistance একটা আছেই এই evil force-এর। বিশেষ করে মফঃস্বলে, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, পরশ্রীকাতরতা ও আরও পাঁচটা কারণে এটা বেশই আছে। এখন এই সব জায়গা, যেখানকার স্থানীয় অবস্থা সম্পর্কে আপনাদের কোনই অভিজ্ঞতা নেই, সেখানে প্রথমেই আপনাদের আমাদের কাছে আসা উচিত। আমরাই আপনাদেরকে সব চাইতে ভাল ভাবে সাহায্য করতে পারব। এ রকমটি আর কেউ পারবে না। সাহায্য করার নাম করে যারা দেখবেন এগিয়ে আসছে, তারা হয় ভুল খবর দিয়ে আপনাদের হয়রানি করবে, নয় বিভ্রান্ত করবে, নয় বানচাল করে দেবে আপনার সৎ প্রচেষ্টাকে। আর আমরা করব আপনাদের সহযোগিতা। ...আপনি মতামতের কথা বলছিলেন, This is not a question of

sanction but of co-operation.* মতামতের প্রশ্ন নয়—সহযোগিতার প্রশ্ন। বুঝতে পারলেন !

মিঃ দত্ত—আজ্ঞে।

নরেন্দ্রনাথ—না কি···, come out young man। (লিষ্ট দেখেন)

মিঃ দত্ত—না অন্য কোন সংশয় নেই। আপনাদের কথা সত্যিই···

নরেন্দ্রনাথ—(খুশি হয়ে) হ্যাঁ-া-া,···তা এর আর দেখব কি, নতুন নামগুলো তো বাদই দেবেন, এ একেবারেই ভুল, বিদ্বেষবশত কেউ হয়তো আপনাকে বলেছে যে এদের সব বড় বড় স্টক আছে। খবরটা একেবারেই ভুল। আর এই লক্ষ্মীকান্ত, ত্রিলোচন আর সহায়রামের নামে যে স্টকের কথা আছে, এটা খানিকটা চাষীদেরই কো-অপারেটিভ ষ্টোর হিসেবে function করে এখানে—ধর্মগোলার মত। আর এই দাগ দিয়ে দিলাম এই কজনের নামের পাশে, আপনি দিন পনেরো পরে একবার আসবেন, ইতিমধ্যে আমি অনুসন্ধান করে সঠিক খবর আপনাকে জানাবো এই নিন।

মিঃ দত্ত—ধন্যবাদ। আচ্ছা নমস্কার—

নরেন্দ্রনাথ—(উঠে পড়েন আগে) হ্যাঁ নমস্কার—ভবানী, ওটা আমার চটপট পাঠিয়ে দাও।···সুরেশবাবু, আজকের কাগজের কাটিংগুলো রাখবেন। আমি মোটামুটি দাগ দিয়ে রেখেছি। আপনিও পড়বেন—বিতর্কের সূত্রগুলো নিয়ে আলোচনার আছে।

সুরেশবাবু—মোটামুটি হেড লাইনগুলো দেখেছি, পড়বোখন্।

নরেন্দ্রনাথ—হ্যাঁ পড়ে রাখবেন।

(প্রস্থান)

(মিঃ দত্ত উঠে দাঁড়িয়েছিলেন ভয়ে ভক্তিতে, এতক্ষণে ফাইলগুলো তুলে নেন বগলে)

সুরেশবাবু—(গামবুটের দিকে তাকিয়ে) ওঃ, জুতোর কি অবস্থা হয়েছে মশাই আপনার—হ্যাঁ !—একেবারে রাজ্যের কাদা লেপটে ধরেছে দেখছি।

মিঃ দত্ত—আর বলবেন না। শুধু জুতোর দেখলেন !—এই কাদা আবার মুখেও ছিটকে ওঠে ; উপায় নেই—চাকরি।—আচ্ছা নমস্কার।

সুরেশবাবু—নমস্কার।

ভবানী—(টাইপরাইটারে লিখে) জয় হিন্দ!

সুরেশবাবু—সেটা আবার কি।

ভবানী—ব্যস, কপি ফিনিশ।

সুরেশবাবু—অ, শেষটায়!

(সুরেশবাবুর প্রস্থান)

(নেপথ্যে 'বন্দেমাতরম'···আবহ শোনা যায়। ভবানী টাইপ করা কপিগুলো ঠিক করতে থাকে পিন দিয়ে]

ভবানী—(আবৃত্তির ঢং-এ) 'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো'—তাদের সম্পর্কে হে ভগবান তুমি কি···

(লক্ষ্মীকান্ত, সহায়রাম ও ত্রিলোচনের প্রবেশ)

লক্ষ্মীকান্ত—রাধামাধব রাধামাধব, প্রেসিডেন্টবাবু আছেন।

ভবানী—আমি এখনও আছি—কি বল্লেন। প্রেসিডেন্টবাবু।

লক্ষ্মীকান্ত—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভবানী—আছেন, বসুন, ডেকে দিচ্ছি।

(টাইপকপিসহ ভবানীর প্রস্থান)

লক্ষ্মীকান্ত—আবার বেরিয়ে না যান এর মধ্যে।

সহায়রাম—গেলেও কোথায় আর যাবেন, ধরা যাবেই।

ত্রিলোচন—না বলা যায় না; জীপগাড়ি নিয়ে একবার বেরিয়ে পড়লে···।

লক্ষ্মীকান্ত—না ঐ তো রয়েছে জীপগাড়ি।

(নরেন্দ্রনাথের প্রবেশ)

নরেন্দ্রনাথ—এই যে, তারপর!···বসো বসো···কি ব্যাপার, তিনজনে একেবারে একসঙ্গে মিলে···

লক্ষ্মীকান্ত—আপনার ঠেঙেই এলাম।

নরেন্দ্রনাথ—হ্যাঁ সে তো দেখতেই পাচ্ছি, এখন···(রমেনকে) ও চিঠিটা শেষ হয়েছে!

সহায়রাম—বেরুচ্ছিলেন নাকি প্রেসিডেন্টবাবু।

নরেন্দ্রনাথ—না, হ্যাঁ মানে বেরুতে একবার হবেই। তা এই একজনের পর একজন আসছে যাচ্ছে—একেবারে ফুরসুৎ করতে পাচ্ছিনে। তা সে যাই হোক, এখন বল দেখি কি ব্যাপার তোমাদের।

লক্ষ্মীকান্ত—ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলি ভনিতে না করে।

সহায়রাম—না। গুনিতের কি আছে, সব কথাই যখন খুলে বলি ওনার কাছে তখন…

ত্রিলোচন—হুঁ, তার আর কথা কি এট্টা।

লক্ষীকান্ত—শুনেছেন বোধ করি, কর্মকর্তারা সব এসে গেছেন ধান ধরতি। আমাদের মহেশপুর, বাঘনখ, রূপকাঠি—সব তো কর্ডন এলাকা হয়েছে। —এখন কাল থেকেই তো ধান সীজ সুরু হবে।

নরেন্দ্রনাথ—হ্যাঁ সে আর পাঁচ জায়গার মত এখানেও তো হবে; আশ্চর্য হবার কি আছে।

সহায়রাম—না সে তো হবেই, এখন…

লক্ষীকান্ত—আচ্ছা প্রেসিডেন্টবাবু, আমাদের তো ঘাটতি অঞ্চল; কর্ডন এলাকার ভিতরি পড়ে কেমন করে।

নরেন্দ্রনাথ—ঘাটতি…ঠিক বলতে পার না। পার কি?

ত্রিলোচন—কেন না।

নরেন্দ্রনাথ—দেখো, ভাবো।…খবর তো অন্যরকম।

লক্ষীকান্ত—কি রকম!

নরেন্দ্রনাথ—খবর হচ্ছে যে, তোমাদের গুদোমে যে ধান আছে তাই তো মোট কোটার প্রায় অর্ধেক ভাগ। আর বাদ বাকি সারা তল্লাট কুড়িয়ে কি আর অর্ধেক হবে না! সুতরাং ঘাটতি ঠিক বলতে পাবো না।

লক্ষীকান্ত—গুদোমের ধান মোট কোটার অর্ধেক তো হবে না। এরকম ধারা আন্দাজী হিসেব কেডা করল!

নরেন্দ্রনাথ—আচ্ছা বেশ তো অর্ধেক না হয়ে ধর সিকি ভাগই হল; তাই বা কি!

ত্রিলোচন—যাই বলুন, এখন এই গুদোমের ধান চালই কিন্তু তামাম এলাকার গেরস্তর সম্বল। গতবারের কথা ভেবে দেখবেন, সারা মুলুকে যখন এক দানা চাল নেই, সরকারী রেশনিং বরাদ্দ তাও যখন ঠিক ঠিক পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন বলতে গেলে আমাদের গুদোম থেকেই খোরাকি চলেছে মানুষের। আপনিও জানেন সে কথা। এখন এবার ফসলের যে শোচনীয় অবস্থা, তাতে করে গুদোমের ধান যদি সীজ হয়ে যায় তা হলি এ তল্লাটের মানুষ কিন্তু সব না খেতে পেয়ে মরে যাবে বল্লাম। দেশের মানুষরে বাঁচানো যাবে না কিন্তু এমন তেমন হলে।

নরেন্দ্রনাথ—তা আমি কি আর সে কথা বুঝছি নে। আমি তো জানিই! তবে কথা হচ্ছে আর সবাই কি সে কথা বুঝবে?

লক্ষ্মীকান্ত—সকলে না বুঝল, আপনি বুঝলি আবার আর কার বোঝার অপেক্ষা করব। পেটে টান পড়লে সকলে তো আপনার কাছেই ছুটে আসবে। তখন তো আপনিই বলবেন, লক্ষ্মীকান্ত যেমন করে পার ব্যবস্থা করো।

নরেন্দ্রনাথ—বুঝতে তো পারছি সব কথাই, আচ্ছা দেখি কি ভাবে কি করি। সম্বল একটা না রাখলেই বা চলবে কেন? এখনই তো রাজ্যি জুড়ে খাই-খাই পড়ে গেছে।

লক্ষ্মীকান্ত—তো তবে; আপনি তো সবই বুঝতে পারছেন বেশি কি বলব।

নরেন্দ্রনাথ—দেখি, তবে ইলেকশনের আগটা পর্যন্ত আমার কথামত কিন্তু কিছু কিছু ধান ছাড়তে হবে। বুঝতে তো পারছ অবস্থা! কিছু কিছু ছেড়ো।

লক্ষ্মীকান্ত—আপনি বল্লে ছাড়িনি, এমন কখনও হয়েছে আগে! বিশেষ এবার তো আমরা ঠিকই করে রেখেছি যে আপনার খাতিরেও ধান আমরা...

নরেন্দ্রনাথ—মনে করো না আমার স্বার্থটাই সব। এটা জেনো, যে এবার যদি না দাঁড়াতে পারি ভাল ভাবে, তাহলে নতুন সব লোকের হাতে পড়ে ব্যবসা বাণিজ্যও তোমাদের লাটে উঠে যাবে।

লক্ষ্মীকান্ত—তা আর বলে বোঝাতে হবে না আমরা বেশ বুঝতে পারছি।

ত্রিলোচন—বাপুরে সে এর ভেতরেই যা সব ধ্বনি দিচ্ছে সব—কেউ বলছে তুলে দেবো জমিদারি ব্যবস্থা, কেউ বলছে জমির প্রকৃত মালিক হবে চাষা, কেউ বলছে পাইকারদের সব ধরে ধরে মাথায় ঘোল ঢালবে—এই সব কথাবার্তা।

নরেন্দ্রনাথ—আরে রাখো, যত গর্জায় তত বর্ষে না। ও মেঘে বৃষ্টি আর হতে হচ্ছে না।

লক্ষ্মীকান্ত—এও ঠিক, তবে আবার হেলাফেলা করাও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। এবারের অবস্থা খুব টালমাটাল।

সহায়রাম—তা সে কথা যথার্থ। এমনি বলে শুনতে পাই যে এবার যদি

আকাল হয় তো মানুষ নাকি সেই পঞ্চাশ সালের মত চুপ করে মরবে না পথে ঘাটে, খুব হৈ চৈ করবে।

নরেন্দ্রনাথ—তা না খেতে পেয়ে মরতে হলে হৈ চৈ তো একটু করবেই।

সহায়রাম—না সেই কথাই বলছি বলি খুবই নাকি গণ্ডগোল করবে মরবার আগে।

নরেন্দ্রনাথ—তা করবে।—দিন ক্রমেই জটিল, ক্রমেই ঘোরাল।—কিন্তু তবু হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে তো আর চলবে না।

ত্রিলোচন—না ধরে ধরতে হবে হাল। খাবড়ালে চলবে কেন? তেজী-মন্দা—সংসারে এ আছেই।

লক্ষ্মীকান্ত—এমনিতে যে রকম কথাবার্তা সব শুনি হাটে বাজারে, তাতে করে আপনার বিপক্ষে যে কেউই ভোট দেবে না, এটা বুঝতে পারি।

নরেন্দ্রনাথ—হাটবাজারের বাইরেও বহু জায়গা আছে—সেখানকার মানুষের মন তুমি জান না। কাজেই কারকিতি বিস্তর করতে হবে। এখন এর জন্তে চাই অর্থবল, লোকবল; একটা নির্বাচন জয় করা মানে তোমার যাকে বলে গিয়ে একটা রাজ্যি জয় করা; সুতরাং...

ত্রিলোচন—আপনি দাঁড়ান, ও কিছু ভাববেন না। ঝুঁকি যেমন আপনার তেমনি আমাদের।...অর্থবল, লোকবল,—সে অভাব হবে না।

নরেন্দ্রনাথ—সেই ভরসাতেই তো দাঁড়ান; দেখি এখন...আর আমি দেখব খন ঐ ব্যাপারটা। যা দিয়ে যা হয়...

(ভগবতীচরণের প্রবেশ)

আরে কি কাণ্ড! এসো এসো; আমি ভাবলাম বলি সেই যে গেল ভগবতীচরণ কলকাতা, ফিরে এসে একবার দেখাটি পর্যন্ত করলে না—কেমনতরো কথা হল।...বসো লক্ষ্মীকান্ত।

ভগবতীচরণ—আর বলবেন না সে ঝামেলার কথা। ঐ যে কথায় বলিয়েছে না বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, তা আমারও সেই দশা করল; হয়রানির একশেষ। ইয়ার মধ্যেই দুই দুই বার কলকাতা যাইতে হইল,—খালি দৌড়ঝাপের পরই আছি। আজ ফিরছি তিনটার গাড়িতে। গদির থিকাই আপনার এখানে আসলাম, বাসায় পর্যন্ত যায় নাই।

নরেন্দ্রনাথ—ও, তারপর খবর কি বলো।

ভগবতীচরণ—খবর মানে, সাংশন হইয়ে যাবে; তবে সইটই হয়ে কাগজপত্তর

বার হতেই যা একটু সময় নিবে। তা গদিতে এসেই শুনলাম আপনি নাকি আজ কালের মধ্যেই কলকাতা যেতে পারেন তাই ভাবলাম বলি···

নরেন্দ্রনাথ—ঐ কাগজপত্তরগুলো এট্টু তাড়াতাড়ি বার করার ব্যাপারে বলছো তো!—তা সে আমি গেলেও তোমাকে তো আমার সঙ্গে যেতে হবে।

ভগবতীচরণ—না সে আমি তো যাবই; বাঃ, গরজ আমার···। তা হলে এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে।

নরেন্দ্রনাথ—বেশ কথা। এদিকে বুঝছো তো সময় হাতে খুব বেশি নেই। নড়াচড়া শুরু করতে হয়। টাকাকড়ির সমস্যা বাদেও হাতে তোমার বিস্তর কাজ। ইলেকশন কমিটির লোক হয়ে তো বসে আছো।

ভগবতীচরণ—ও সব হইয়ে যাবে। ও আপনি দাঁড়ালে আর কেউ সাহসই পাবে না নামতে।

নরেন্দ্রনাথ—এটা কিন্তু খুব ভুল কথা ভগবতীচরণ। গাঁটরি গাঁটরি কাপড়ের ভেতর দিয়ে এই সাংঘাতিক সত্যিটা আমি দেখছি তোমাদের নজরেই পড়ে না। তোমরা জান না ভগবতীচরণ যে এবার কত বাধাবিঘ্ন আসতে পারে। এই সব কথা তোমাদের সত্যিই বড় খারাপ, সমস্যার গুরুত্ব যেন বুঝেই উঠতে পারো না তোমরা; কী এক মনগড়া রাজ্যে বাস কর আমি বুঝতে পারিনে।

ভগবতীচরণ—আচ্ছা আচ্ছা, সে অবস্থা বিশেষে ব্যবস্থা একটা করা যাবে; তার জন্যে আর চিন্তা কি আছে।

নরেন্দ্রনাথ—না মানে কথা হচ্ছে...আরে কি খবর জব্বর মিঞা সাহেব,— আসুন আসুন!

(জব্বর মিঞা সাহেবের প্রবেশ)

বসুন,—তারপর! কি মনে করে!

জব্বর মিঞা—মনে করে মানে ধান তো সব সীজ করতে লেগেছে। তা ধনেখালিতে গোলা বলতে এক আমারই আছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে ক'ঘর মুসলমান আছে তারা প্রধানত আমার ঠেঙেই ধারকর্জা নেয় দুর্দিনের বাজারে। কারণ এমনিতে বেশ সম্ভাব থাকা সত্ত্বেও, বর্ধিষ্ণু হিন্দু জোতদার গেরস্থর কাছে মুসলমানরা সচরাচর এই আপনার গিয়ে ধানকর্জা

বা পয়সা কড়ির লেনদেনের ব্যাপারে যেতে চায় না। ফলে আমারই হয় মুস্কিল। দায়ে বেদায় আমার কাছেই আসে। এমতাবস্থায় আমার ঐ গোলার ধান যদি সীজ হয়ে যায়, তা হলে সাধারণ মুসলমান প্রজার খুবই মুস্কিল হয়ে দাঁড়ায়। এখন আপনার কাছে আমার এই আর্জি হয় যে মাইনরিটির স্বার্থের দিক চেয়ে আপনি যদি…

নরেন্দ্রনাথ—এখানে একটা কথা বলি প্রসঙ্গত, কিছু মনে করবেন না কিন্তু। কেননা খোলামেলা আলোচনা হওয়া ভাল। বিষয় এই যে 'মহেশদর্পণে'র গত সপ্তাহের সংখ্যায় এই মর্মে এক সংবাদ বেরিয়েছে যে মাইনরিটির স্বার্থের নাম করে আপনি নাকি এই ধানচাল ব্ল্যাক মার্কেট করেন; শুনুন...

অক্বর মিঞা—কি সর্বনেশে কথা; দোয়াই ধর্ম আপনি বিশ্বাস করুন...

নরেন্দ্রনাথ—আহা-হা-হা আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা তুলছেন কেন? ব্যক্তিগতভাবে আমি এই চিঠির কোন মূল্যই দেইনে—মিথ্যে কথা। সে কথা না। কিন্তু তবু পাঁচ কানে কথাটা উঠলেই তো ব্যাপারটা অন্য রকম দাঁড়ায় কিনা। ব্ল্যাক মার্কেট করেছে, হ্যাঁ, মাত্তর তিরিশ টাকা দাদন দিয়ে গরীব মুসলমান চাষীর সব পাটখেতগুলো কিনে রেখেছে, হ্যানা ত্যানা—, নিচে স্বাক্ষর আছে আবার আপনারই স্ব-শ্রেণীর একজন লোকের—অনৈক মুসলমান।

অক্বর মিঞা—হাই হাইরে, এই জন্যেই নিজ জাতের মঙ্গল করতে নেই। এই রকম এট্টা সর্বনেশে কথা—হাই হাইরে...

নরেন্দ্রনাথ—বাগগে আপনি অনুতপ্ত হবেন না তার জন্যে। কারণ জানবেন সংসারে ভাল লোকের কখনও শত্রুর অভাব হয় না; আর যে যত ভাল তার তত শত্রু। আমি আজ এই কথাটা মর্মে মর্মে জানতে পারছি, পঞ্চাশ বছর দেশের সেবা করে…যাগগে। তা আমার কথা হচ্ছে—আপনার স্ব-শ্রেণীর মধ্যেই এই রকম সব লোক আছে। এ বিষয়ে আপনি একটু খোঁজ খবর নেবেন তো!

অক্বর মিঞা—'অনৈক মুসলমান'—এই কথা লিখল।

নরেন্দ্রনাথ—হ্যাঁ সে ব্যক্তি যে মুসলমান সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। কারণ তার লেখার ঢং, জবান, বিশেষ করে আপনার জীবনের ব্যক্তিগত যে সব বিষয়ের অবতারণা করেছে চিঠিতে তাতে করে মনে

হয় যে আপনার স্ব-শ্রেণীর কোন ঘনিষ্ঠ লোক ছাড়া এ সব তথ্য সংগ্রহ করা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

জব্বর মিঞা—আমি আজই খবর করব তো ; হাই হাই রে, নাঃ এ কালে মানুষির ভাল করতে নেই—হাই হাই হাই হাই…।

নরেন্দ্রনাথ—আর আপনি যে কথা বল্লেন দেখি আমি সে বিষয়ে কতটা কি করতে পারি। কারণ, আপনি এটা জানবেন জব্বর মিঞা যে মাইনরিটির কোন দিক থেকে কোন অসুবিধে হয় এ আমি কোন দিক থেকেই বরদাস্ত করব না। তার জন্যে ইলেকশন থেকে যদি আমারে সরে আসতে হয় তো সেও আমি স্বীকার আছি।

জব্বর মিঞা—না সে আপনি একটু চেষ্টা করলেই হয়ে যাবে।

নরেন্দ্রনাথ—আমি চেষ্টার ত্রুটি করব না মিঞা সাহেব—একথ জানবেন।

জব্বর মিঞা—না সে কথা তো আমি জানিই। আমাদের জন্যে আপনি যা করছেন সে কথা কি আর মুখে বল্লে ফুরোবে। সেই বিশ্বাসেই তো ছুটে ছুটে আসি।

নরেন্দ্রনাথ— …তা হলে ঐ কথাই থাকল ভগবতীচরণ। আজ হল গিয়ে তোমার বুধবার, বৃহস্পতিবার শুক্রবার, কালকের দিনটা বাদ দাও, পরের দিন শুক্রবার, দুপুরের গাড়িতে চল।

ভগবতীচরণ—বেশ তাই চলেন।

নরেন্দ্রনাথ—রবিবার ছুটির দিন ; দেখা সাক্ষাৎ যা করবার ঐ দিনই সব সার যাবে…কি একটা গণ্ডগোল হচ্ছে না।

(নেপথ্যে হট্টগোল—জননেতার কাছে গ্রামবাসীরা আর্জি নিয়ে এসেছে তাদের দুঃখ লাঘবের)

খুবই হৈ চৈ হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

জব্বর মিঞা—হঁ, এট্টা হট্টগোল হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

নরেন্দ্রনাথ—অ সুরেশবাবু! কি ব্যাপার কি সুরেশবাবু?…ভবানী এট্ট দেখ তো।…সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষগুলোও হয়ে উঠেছে তেমনি বেয়াড়া ; দিনরাত খালি এ চাই, তা চাই, চাল চাই, বস্তর চাই ; যেন হাতে করে একেবারে নিয়ে বসে আছি আমি সব সময়। অথচ সুবুদ্ধি দাও, দেখবে তখনই গালমন্দ পাড়বে।

অম্বর মিঞা—একেবারে কচিবাচ্চার পানা, সমস্যা বোঝবে না, কিচ্ছু সমঝাবে না...

ভগবতীচরণ—যা বলিয়েছেন—

লক্ষ্মীকান্ত—খাঁটি কথা বয়েছেন।

নরেন্দ্রনাথ—আর খানচাল বস্ত্রের সমস্যা কি সোজা সমস্যা। অত সহজে সমাধান হয়। বড় বড় স্বাধীন দেশগুলোই বলে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। আর তারপর এখানে এট্টার পর এট্টা লেগেই আছে; অনাবৃষ্টির দরুন ফসল হল না, তোমার দোষ, রোদ্দুরে জলে গেল খেত, তোমার দোষ; পঙ্গপালে উজোড় করে দিলে খেতখামার, তোমার দোষ; হিন্দুস্থান পাকিস্থান হবার পর মুসলমান চাষীরা দেশান্তরী হয়ে হিন্দুস্থানের লক্ষ লক্ষ বিঘে আবাদী জমি পতিত রেখে গেল ফসল হল না, তোমার দোষ; লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারার সমস্যা, সেও তোমার দোষ; দিনরাত শোন তো এই অসন্তোষের কথা। আরে দুঃখু কষ্ট তো আছেই। সে কার নেই,—আমার নেই, আপনার নেই, ধনীর নেই..., কি হয়েছে কি, এত গণ্ডগোল?

ভবানী—কি সব বলছে গণ্ডগোলে বোঝা যাচ্ছে না। ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোতে গিছল নাকি সব আর্জি নিয়ে, তা তাঁকে সেখানে না পেয়ে আপনার কাছে এসেছে।

নরেন্দ্রনাথ—আবার আমার কাছে কেন। তুমি দেখ আবার ভেতরে ঢুকে না পড়ে সব হৈ চৈ করে।

(নেপথ্যে হট্টগোল)

ভবানী—আপনি যান, ওরা ভীষণ গণ্ডগোল করছে। বলছে আপনার সঙ্গে দেখা করবে।

নরেন্দ্রনাথ—আচ্ছা তুমি বল গিয়ে আমি যাচ্ছি। আচ্ছা ক্যাসাদের কথা। দেখি, চলুন যাই দেখি...আপনারা এগোন...সুরেশবাবু...

(ব্যস্তভাবে প্রস্থান)

[অন্ধকার]

[সূচনায় নরেন্দ্রনাথের অফিসে যে সব সরঞ্জাম ও আসবাব পত্র আছে এখানে অন্ধকারের ভিতর সেগুলো সব বার করে দিতে হবে। পিছনে থাকবে শুধু একটা উঁচু জায়গা—খানিকটা প্ল্যাটফর্মের মত—সেখানে নরেন্দ্রনাথ ও তার সাঙ্গ-

পাদরা এসে দাঁড়াবেন। আর জনতার ভিতরে সবাক চরিত্রগুলো দাঁড়াবেন মঞ্চের ডানে বামে ; নির্বাক ভিড়ের লোক থাকবেন মাঝখানে।

দু-তিনখানা গ্রামের লোক ভুখা মিছিল করে নরেন্দ্রনাথের দরবারে এসেছে আবেদন নিবেদন নিয়ে। অন্ধকারের ভিতরে তারা সমস্বরে আবেদন জানাচ্ছে কর্ডন রহিত কর, ধান নিও না, কণ্ট্রোল প্রথায় রেশন বরাদ্দ কর, আহার দাও, পরনের কাপড় বরাদ্দ কর।

মঞ্চ অন্ধকার ছিল, হঠাৎ হট্টগোলের ভিতরে আলোকসম্পাত হয়। অবিৎ পারে গোলমালের মাঝখানে প্রবেশ করেন নরেন্দ্রনাথ, ভগবতীচরণ, লক্ষ্মীকান্ত, জবর মিঞা প্রভৃতি।]

(নরেন্দ্রনাথের দ্রুত প্রবেশ)

১নং—সনাতনদা শক্ত থেক। বেশ ভাল করে গুছিয়ে বলা চাই, হ্যাঁ। বেশ···

২নং—হ্যাঁ, কথার মারপ্যাচের ভিতরি পড়ে খেই হারিয়ে ফেলো না যেন। যা বলবা 'পষ্ট' করে।

৩নং—না, দফাওয়ারী ভাবে এক এক করে বলে যাবা, বেতালা হয়ো না।

৪র্থ—পতিতপাবন সামলে রেখো সনাতনদারে।

(হট্টগোলের মাঝখানে নরেন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়ান)

নরেন্দ্রনাথ—চুপ করো, চুপ করো। কিছু শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না।

(শান্ত হয়ে থাকে জনতা)

···বলি গোলমাল করাটা যখন উদ্দেশ্য না, তখন খামখা এটা চাই সেটা চাই করে চেঁচালিই কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।···তাই বলি আস্তে আস্তে বল। আস্তে।···আমি তোমাদের কথা শুনতে চাইনে, এই সন্দেহ নিয়ে তো আর আসনি তোমরা আমার কাছে। সুতরাং হৈ চৈ করো না। সনাতন।

৫নং—সনাতন দা! হেই সনাতন দা!

নরেন্দ্রনাথ—থাক, তোমারে উকিল ঠাওরায়নি সনাতন। ও নিজেই বলতে পারবে।···উঠোচ্ছে।···বল সনাতন তুমি কি বলবে। তুমি, পতিত-পাবন, নরোত্তম, আর যারা তোমাদের তরফের কথা বলতে পারবে গুছিয়ে আমি বলি তারা এগিয়ে এসো চারপাঁচ জনা। আমরা একটু শান্তিতে বসে বিষয়গুলো আলোচনা করি।

(হট্টগোল—আপত্তি ওঠে)

পতিতপাবন—না প্রেসিডেন্টবাবু, ও স্বতন্ত্রভাবে চার পাঁচ জনার সঙ্গে আলাপ আলোচনার দরকার নেই। কথা আমরা প্রকাশ্যভাবেই বলব। ঢাকা চাপা যখন কিছুই নেই তখন...

সনাতন—হ্যাঁ, মানে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করে, বুঝলেন—কোন লাভ নেই। এখন আমাদের মুস্কিল যেটা, সেটা আশা করি তবু প্রেসিডেন্ট বাবু বোঝবেন। মুস্কিল এই যে, স্বতন্ত্রভাবে দুচার জনের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলে আপনারা বলেন যে, এটা হচ্ছে তোমাদের ব্যক্তিগত কথা, সকলের কথা এই রকম না। আবার প্রকাশ্যভাবে যখন সকলের সামনে কথা বলা হয়, তখন আপনারা বলেন—অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট—এভাবে কোন রকমেই আলাপ আলোচনা করা যায় না।...দুরকমের যে কোন ভাবেই কথা বলতে যাই না কেন, এই যে আমাদের বক্তব্য-বিষয় আপনারা বরবাদ করে দিতে চান টালবাহানা করে—এটা খুবই দুঃখের বিষয়। সুতরাং আমরা যা বলবার তা সকলের সামনেই বলব, এবং শান্তভাবেই বলব। তবু আশা করব যে, আপনি আমাদের সমস্যাগুলো বোঝবেন এবং সেই মত ব্যবস্থা করবেন, এই কথা।

নরেন্দ্রনাথ—(হাসি) একবার না, দুবার না, আমি বলব, একশোবার! দরকার হলে একশোবার শুনব, একশোবার বুঝব।...কে বল্লে তোমারে আমি তোমাদের কথা বরবাদ করে দিতে চেইছি। কেউ বলতে পারে!!—কেউ পারে না।...তবে হ্যাঁ, বক্তব্য শুনেও, অভাব অভিযোগ জেনেও, সমাধান সেরকম একটা করতে পারিনি। তা সে কথা স্বীকার করতে আমার কিছু মাত্র লজ্জা নেই।...পারি নি—কারণ···অক্ষমতা। অবশ্য সে অক্ষমতারও কারণ আছে। আমি পরে বলছি সে কথা। এখন আগে তোমাদের কথা শুনি। হুঁ বলো!!

সনাতন—কথা এই, যে কর্ডন করে যে ভাবে ধান সংগ্রহ করা হচ্ছে, এটা কি বলব—একেবারে যাচ্ছে-তাই। সরকার কি বলেছে যে খোরাকির ধান সীজ করবা! অথচ আমার গেরামে একধারসে সামান্য এই খোরাকির ধান সীজ করা হচ্ছে; অথচ জোতদার মহাজনের গোলায় হাত দেওয়া হচ্ছে না।...তামাম গেরামে অভাবী চাষীর ঘরে আজ এক দানা চাল নেই। তারা আজ সব না খেতে পেয়ে মরবার মুখে।···বিষয়টা কি! জোতদার মহাজনের গুদোমে যে হাজার হাজার মণ চাল, লক্ষ মণ

ধান রয়েছে এবং যে ধান-চাল যথেচ্ছ চোরাবাজারে চালান হচ্ছে, সেই ধান-চাল সীজ করা হচ্ছে না কেন।

নরেন্দ্রনাথ—সীজ করা হচ্ছে না—এটা ভুল কথা। সব ক্ষেত্রেই সীজ করা হচ্ছে, তবে যাদের একমাত্র লাইসেন্স আছে...

পতিতপাবন—আমাদের এতগুলো 'জান'এর লাইসেন্স নেই—সামান্য খোরাকির ধান ধরে রেখে, আর হাজার হাজার মণ ধান-চাল ব্ল্যাক-মার্কেট করবার সুবিধে করে দিয়ে শ' শ' 'জান' পয়মাল করবার লাইসেন্স প্রেসিডেন্টবাবু কোন্ সুবাদে দেওয়া হবে আমাদের বলবেন।

নরোত্তম—সরকারী কোন্ কানুনে এ কথা লেখা আছে আমরা জানতে চাই।

ভগবতীচরণ—আহা আইস্তা আইস্তা বাত কর ভাই।

নরোত্তম—আইস্তা আইস্তা কি গালগল্প করতে এইছি নাকি এখানে... আইস্তা আইস্তা! কায়দা শোন কথার।

নরেন্দ্রনাথ—আহা, তা খামাখা গলাবাজি করে কি কোন লাভ আছে। ব্ল্যাক-মার্কেট সরকার তো আর করতে বলছে না। এ সব হল নিজেদের ভেতরকার কেলেঙ্কারীর কথা। এখন নিজের ঘরের ভেতর যদি কোন কলঙ্কের বিষয় ঘটে, তো ঢাক ঢোল পিটিয়ে সেই লজ্জার কথা জোর গলায় জাহির করায় ইজ্জৎ বাড়ে না কমে—সেই কথাটা আমায় তোমরা বলো। জানি পাপী আছে, পাপাচারও ঘটে সংসারে—কিন্তু তার নিরসনের উপায় কি এই রকম করে!

কৃপানাথ—এখন পাপ আপনার সেই কবে কায়দায় উপায়ে নিরসন হবে, তার জন্যে বসে থাকলে তো মানষির ঘর সংসার সব উজোড় হয়ে যাবে। পাপ নিরসন করবেন আপনি কার জন্যে?

নরেন্দ্রনাথ—এটাও একটা তুমি কায়দার কথা বল্লে। এভাবে কথা বল্লে তো কোন উপায়ই নেই।

কৃপানাথ—কেন উপায় থাকবে না!...উপায় আছে। উপায় এই যে, এখুনি কর্ডন রহিত করে দেন, মানুষজন সব না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে তাদের বাঁচাবার জন্যি ঐ সব বদমাইস চোরাকারবারীগুলোর লাইসেন্স-ফাইসেন্স সব বাতিল করে দিয়ে অভাবী মানুষের সামনে চোরের গুদোম খুলে খুলে দেন, যে সব অনাবাদী জমি পড়ে আছে সেগুলোর আবাদের জন্যে দরকার মত কৃষিঋণ দেন, হাতে হাতে আবাদ হয়ে থাক সব জমি? কত কি

উপায় আছে, আর আপনি উপায় দেখছেন না ? পেটে ভাত নেই, পরনে বস্তর নেই অথচ লক্ষ্মীকান্ত আর সাধুখাঁর গুদোমের হাজার হাজার মণ চাল পাচার হয়ে যাচ্ছে চোরাবাজারে, ঐ ভগবতীচরণ আর কুণ্ডুদের গদির গাঁট গাঁট কাপড় নৌকো করে লোপাট হয়ে যাচ্ছে রাতের অন্ধকারে আপনি দেখতি পারেন না !

নরেন্দ্রনাথ—দেখতে আমি সবই পাই কৃপানাথ, কিন্তু ঐ রকম করে কথা বল্লিই তো সমাধান করা যায় না সমস্তার। তোমরা চাও রাতারাতি সত্যিকার রামরাজ্যি কায়েম হোক, বলি তা কখনও হয় ? ও রকম আল্-টপকা যদি কথা বলো তো আমিও তো বলতে পারি যে কৃপানাথ, তুমি তোমার দুখানা হাতে ধরাধামে ঐ স্বর্গটা টেনে নামাও ; কেমন—বলতে পারি নে ? তা এ হল এট্টা আজগুবি কথা। আজগুবি কথা সত্যি হয়ে ওঠে না। আসল কথা কি জানো কৃপানাথ, পাপ। মহাপাপ। নয় তো কি আর সুজলা সুফলা আমার এই জেলার আজ এই হাল হয়। সব জায়গায় সে একেবারে খাই খাই নেই নেই—সে একেবারে হা-ভাতের সংসার। এ কেন হয় !

নরোত্তম—সেই কথাই তো বলছি।

নরেন্দ্রনাথ—হ্যাঁ, সে তোমরা আর বলবে কি, আমিই তো বলে দিচ্ছি তোমরা যা বলতে চাও।

ওফিলদ্দি—হায়রে নসীব রে...

নরেন্দ্রনাথ—আঃ, কে রে !

নরেন্দ্রনাথ—তা মানব সব হয়ে উঠেছে দানব...ঐ যে সেই ছোট বেলাকার রাক্ষসের গল্পে আছে না—হাইলো মাইলো মানবির গন্ধ পাইলো, ধরে ধরে খাইলো !—তা অনেকটা সেই রকম।...কেন! এই জেলারই দয়ারাম ঠাকুর, দরগার পীর সাহেব, টুকরো-টাকরা ফলমূল, কোনদিন যদি হয় তো বড় জোর ছটাক খানেক দুধ—এই খেয়েই তো আশি-নব্বই বছর বেঁচে গেছেন। আর মানুষরে যা দিয়ে গেলেন সোণারূপোয় তার ওজন হয় না—তা এও তো আছে আমাদের দেশে।

নরোত্তম—হুঁ, কোথায় রাম-রামের ধ্বনি আর কোথায় ব্যাঙের কোঁকানি। তেনারা তো দেবতা !

নরেন্দ্রনাথ—ঠিক কথা, দেবতা, দেহধারী নরদেবতা। কিন্তু তাই বলে

আমরাও তো মানুষ! তাঁদের তুলনায় এত খেয়ে পরে আমাদের অপদেবতা হবার কোন যুক্তি আছে? অন্তত মানুষ তো আমরা হতে পারি।

কৃপানাথ—কেন দয়ারাম ঠাকুর আর পীর সাহেবের কমি কি আমরা। তেনাদের চাইতি বেশিও খাইনে, ভালো বই কারো মন্দ চিন্তে করিনে। তবু সেই ফলটা-আশটা আর দুটাক খানেক দুধই তো আমাদের কপালে জুটছে না।

নরেন্দ্রনাথ—সে কথাও আমি জানি।

কৃপানাথ—তবু জেনে শুনেও শাস্তর শোনাচ্ছেন।

নরেন্দ্রনাথ—অপব্যাখ্যা করোনা। অপব্যাখ্যা করোনা, তিল তিল করে নিজেদের আর এই রকম ভাবে মেরে ফেলোনা কৃপানাথ, আমি বলছি। ...আমি বলছি নে যে তোমরা না খেয়ে না পরে তুষ্ট থাক, সাধারণ মানুষ আমরা, আমরা তা পারবই বা কেন? কিন্তু আদর্শের বিষয়ে, বড় বড় মহাপুরুষদের জড়িয়ে এই সব ভাল ভাল কথা, যে সব কথা উচ্চারণ করলে নাকি তিনকালের কাজ হয়, সে সম্পর্কে আমাদের ভক্তিশ্রদ্ধা থাকবে না কেন! কি বলো সনাতন?

সনাতন—না সে তো থাকবেই, সে তো আর অস্বীকার করবে না কেউ। তবে প্রেসিডেন্টবাবু, দেখুন, বর্তমানের দিনে, যে কালে মানষির ঘরে ঘরে হাহাকার, এতো গালগল্প না, আপনি সবই জানেন...

নরেন্দ্রনাথ—তা জানি নে।

সনাতন— ...এই আকালের দিনি...গত দুর্ভিক্ষের সময় মানুষ তবু শাক-পাতা খেয়ে ছিল, আর এবার কি বলব বল্লি পরে ভাল শোনায় না, পুঁথির ভিটে ছাড়া মানষির কল্যাণি সেই শাকপাতা কচু ঘেচুও পাবার যো নেই, এমনি অবস্থা।

নরোত্তম—তারও দাম আপনার গিয়ে সিকে সিকে।

নরেন্দ্রনাথ—তা হবে, জিনিষপত্তর যা আক্রা...

সনাতন—হ্যাঁ, এই রকম অবস্থায় নিজিদের ঘরে নেই ধান, কারো ঠেঙে যে কর্জা পাওয়া যাবে এমন অবস্থাও কারো নেই—মহাজন লোক দুমাস আগে বিশ পঁচিশ টাকা দাদন দিয়ে পাট খেতগুলো সব কিনে রেখেছে, এখন সেই পাট তারা মণকরা নব্বই একশো টাকায় বেচবে, সুতরাং এক

কাণাকড়ির আশা এখানেও নেই—এখন বলুন, মানবি যে বাঁচবে, কি করে বাঁচে!

নরেন্দ্রনাথ—সবটা না হোক, কতকটা অসুবিধে আমি বুঝতে পারি; কিন্তু কি করব সনাতন, ব্যক্তিগতভাবে আমি আর কতটুকখানি কি করতে পারি? আমার তো সেই ব্যক্তিত্ব নেই, পরহস্তগত ব্যাপার। এখন কিছু বলতে গেলেই সেকথা আমার থাকবে না। অনেক ব্যাপার সনাতন, সে তোমারে আর কি বলব, এখন এর খোল-নলচে পালটাতে হবে। সবই দেখছি সবই বুঝছি কিন্তু কিছু করতে পারছি নে। হাত-পা বাঁধা হয়ে আছি। তবে হ্যাঁ, থাকতাম যদি আজ গদিতে, তা হলে একবার দেখে নিতাম যে কেমন করে আমার জেলার একটা লোক না খেয়ে থাকে! তা সে ভাগ্য তো আর করে আসিনি। দেখি সামনের বার তোমাদের দশজনের শুভ ইচ্ছায় দেশের দশের কল্যাণে যদি আতে উঠতে পারি...কিছু বলতে ইচ্ছে করে না সনাতন, সে কি বলব, আমি জানি বাজারে চাল আছে, কাপড় একেবারে নেই, এ মিথ্যে কথা, কিন্তু তোমরা বিশ্বাস কর সেই চাল সেই কাপড়ে হাত দেবার ক্ষমতা আমার নেই। (চোখে জল, স্বরভঙ্গ) সনাতন! চোখের ওপরে তোমরা খেতে পাবেনা, পরনে বস্ত্র পাবে না, আর আজ আমার এমনি অদৃষ্ট যে দুচোখে আমারে সেই দৃশ্য দেখতে হবে। (কেঁদে ফেলেন) অথচ আমি, আমার ক্ষমতা থেকেও আমি পঙ্গু, আমার কোন ক্ষমতা নেই। (সামলে নেন) আজ আর কিছু বলব না।

(আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে জনতা একমুহূর্তের জন্ত)

নরোত্তম—কিন্তু এ তো গেল ভবিষ্যতের কথা, এখন আমরা কি করে বাঁচি সেটা বলুন!

নরেন্দ্রনাথ—আমার ঘরবাড়ি স্থাবর-অস্থাবর নিলেম করে নাও; কি আর বলব। আশু সমস্তার তা ছাড়া কি করে আমি সমাধান করব!

সনাতন—আপনি দেশের নেতা, মাবাপ; আপনার কি আজ কোনই ক্ষমতা নেই?

নরেন্দ্রনাথ—তোমরা আমারে সেই ক্ষমতার অধিকারী করলেই আমি ক্ষমতাবান হতে পারি। তার আগে তো পারি নে সনাতন!

পতিতপাবন—তা হলি আমরা কি করব, কার কাছে যাব? প্রেসিডেন্ট

বাবু, আপনি কি বলেন তা হলে আমরা সব ঘরে পড়ে মরব? কারো ঘরে আজ একদানা চাল নেই, পরনে বস্তর নেই; অথচ চাল কাপড় যে বাজারে একেবারে নেই তাও তো না।

নরেন্দ্রনাথ—শোন সনাতন, পতিতপাবন! এখন তোমরা যেমন করে পার ধারকর্জ করে চালাও।

পুঁটিরাম—কর্জা দেবে কে?

নরোত্তম—কোথায় ধার পাব!

সৃষ্টিধর—বাজারে চাল আছে, কন্ট্রোল দরে সেই চাল আমাদের দেওয়া হোক।

নরেন্দ্রনাথ—বাজারে চাল আছে! কার ঘরে আছে!

সখিচরণ—সাধু খাঁর ঘরে চাল আছে।

নরেন্দ্রনাথ—না, সাধু খাঁর ঘরে চাল নেই।

বামাচরণ—সাধু খাঁর ঘরে যদি চাল না থাকে তো কুণ্ডুদের ঘরে চাল থাকবেই।

নরেন্দ্রনাথ—থাকবেই একথা তুমি জোর করে বলতে পার না। আর থাকলেও সে দু' দশ মণ চাল পাঁচশো লোকের ভেতরে টেনে বার করে শেষ পর্যন্ত কি অপদস্থ হব। কন্ট্রোল দরে চাল কেন পাবে না সে কথা তো নয়, আসলে বাজারেই যে চাল নেই। অবিশ্যি এর ভেতরে যদি বাজারে চাল আসে তো সেই চাল যাতে করে তোমরা পাও তার ব্যবস্থা আমি করব—স্বীকার মানলাম। ইতিমধ্যে তোমরাও সন্ধান রেখো। কি আর বলব! কার চাল কে খায় আজ! হুঁ, তবে এদিন দিন না, বুঝলে সনাতন! ...আরও দিন আছে। দেখি, মনের কথা মুখে বলে আর লাভ নেই। যদি তোমাদের ইচ্ছের সেই সুদিনের নাগাল পাই তো...

[হঠাৎ দুচার জন লোক ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হয় সভাস্থলে]

প্রাণকেষ্ট—হাই রে, সে একেবারে গন্ধমাদন পর্বত...

রামনাথ—বলব কি সে চালির পাহাড় সাধুখাঁর গুদোমের...

ওস্মিলদ্দি—সেই বট্তলার কাছে...এক নরী চাল ধরা পড়েছে।

প্রাণকেষ্ট—আরে হ্যাঁ, গুদোম থেকে চালান দিচ্ছিল, এর মধ্যি খবর পেয়ে আটকে ফেলেছে সকলে সেই চালের নরী বট্তলার কাছে।

[হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। দুদশজন ছুটে বেরিয়ে যায় ষষ্ঠীতলার দিকে]

নরেন্দ্রনাথ—আরে হঠাৎ কে একটা উড়ো খবর দিলে আর একেবারে অস্থির হয়ে উঠলে তোমরা। বলি কি হয়েছে কি ?

রামনাথ—চালের নৌকা—সাধুখাঁর—ষষ্ঠীতলায় আটকে ফেলেছে সকলে।

সনাতন—চলুন একেবারে সরজমীনে গিয়েই দেখবেন প্রেসিডেন্টবাবু। বল্লাম সাধুখাঁর ঘরে চাল আছে তা আপনি...

নরেন্দ্রনাথ—আরে কি একটা উড়ো খবর...

পতিতপাবন—কেন, খবরটা সত্যি হতি বাধা আছে ? আপনি টালিবালি করছেন কেন। আমরা তো বল্লামই সাধুখাঁর ঘরে, কুণ্ডুদের ঘরে চাল আছে।

নরেন্দ্রনাথ—চাল আছে তুমি নিজে দেখেছ ?

পতিতপাবন—কথাডা যেন আমি অবিশ্বাস করলিই আপনার সুবিধে হয়... হ্যাঁ আমি দেখেছি চাল আছে।

নরোত্তম—পিসিডেন্টবাবু, এই কথা কাটাকাটি করতে করতেই চাল কিন্তু ওদিকে সব ভাল হয়ে যাবেখন্।

নরেন্দ্রনাথ—দাঁড়াও দাঁড়াও, ভাল করে বুঝতে দাও ব্যাপারটা।

ওকিলদি—(ভারস্বরে বেতালা) চাল নে নরী পালাল।

নরেন্দ্রনাথ—আঃ, কে রে অসভ্যের মত চেঁচায়। আচ্ছা সাধুখাঁরই যে ঐ নরী সেটা জানা গেছে ?

প্রাণকেষ্ট—জানা গেছে কি বলছেন পিসিডেন্টবাবু ? আমি দেখে এলাম।

নরেন্দ্রনাথ—সাধুখাঁরে দেখলে।

প্রাণকেষ্ট—সাধুখাঁ নেই, সাধুখাঁর লোক আছে।

নরেন্দ্রনাথ—সাধুখাঁ নেই, অথচ সাধুখাঁর লোক আছে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিনে।

ওকিলদি—চাল নে নরী পালাল !!

নরেন্দ্রনাথ—আঃ কে রে ঐরকম ধারা চেঁচাচ্ছে। বার করে দাও ওরে... বদমাইস। তা ঘটনা যদি সত্যি হয় তা হলে ডেকে পাঠাই সাধুখাঁরে।

সনাতন—ডেকে পাঠাবার কি আছে পিসিডেন্টবাবু। আপনি চলুন নিজে সামনে থেকে ঐ চাল কন্ট্রোল দরে বিলি ব্যবস্থা করে দিয়ে আসুন। আপনি না গেলে অযথা একটা গণ্ডগোল হতে পারে।

নরেন্দ্রনাথ—না গণ্ডগোল হবে কেন? আর চাল যদি থাকেই যথার্থ তো আমি তো তোমাদের কথাই দিইছি যে চাল তোমরা পাবে তা সে যে চালই হোক না কেন।

পতিতপাবন—কিন্তু এই চাল আছে এই চাল নেই—চাল যদি উধাও হয় এর মধ্যি তো পাব কেমন করে সে চাল।

ওকিলদ্দি—চাল নে নরী পালাল ||

নরেন্দ্রনাথ—সে তো হারামজাদার কানটা ধরে বার করে। কে!

সনাতন—এ কি রকম ধারা কথা বলছেন পিসিডেন্টবাবু, আমরা বুঝতে পারছি নে।

নরেন্দ্রনাথ—বুঝতে তোমরা কোনদিনই পারনি; আজও পারবে না! সোজা কথা সহজ ভাবে বুঝতে যেন তোমাদের একেবারে কুড়ুল বেধে যায়। বলছি, বলি ডেকে পাঠাচ্ছি সাধুখাঁরে!

পুঁটিরাম—তা সাধুখাঁরে দিয়ে আমরা কি করব, তার মুখ দেখবার তো আমাদের দরকার নেই।

পতিতপাবন—পিসিডেন্টবাবু, চাল আমাদের চাইই চাই। মাগ ছেলেপুলে ঘরে ঘরে সব না খেয়ে আছে। কেউ দু-দিন, কেউ তিন দিন, না খেয়ে আছে সব। তাই চাল আমাদের চাই-ই। চাল আমরা নেবই। আপনি চলুন। আর আপনি যদি আমাদের কোন রকম সাহায্যই করবেন না বলে স্থির করে থাকেন তো তাও পষ্ট করে বলুন।

নরেন্দ্রনাথ—আবার ভুল বুঝছ। আমি সাহায্য করব না—এই যদি তোমাদের সংশয় জেগে থাকে মনে তো বেশ, চলো। আমি গেলেই যদি...চল

(গমনোদ্যত)

(ধ্বনি ওঠে—চল চল, বটতলা চল, ইত্যাদি)

[এমন সময় হট্টগোলের মাঝখানে স্বয়ং সাধু খাঁ প্রতিপক্ষের আর সব লোকজন ও নিজের সাজপাঙ্গ নিয়ে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হল]

নরেন্দ্রনাথ—ঐ তো, এসে গেছে সাধুখাঁ। যাক। ওঃ একেবারে বলতে বলতে এসে গেছো দেখছি। অনেকদিন বাঁচবে।

কৃপানাথ—শোন শোন কথা শোন।

সাধুখাঁ—নাঃ, আর অনেকদিন বাঁচবার সখ নেই প্রেসিডেন্টবাবু। উঃ, দেখুন

গিয়ে সে একেবারে কি হুজ্জুতি আরম্ভ করেছে অযথা লরী আটক করে।

নরেন্দ্রনাথ—কি ব্যাপার কি বলতো। হঠাৎ...

সাধুখাঁ—আরে মশাই 'রিকুইজিশন' করা চাল, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ডেলিভারী দিতে হবে, কইলি শোনবে না, বোঝালি বোঝবে না; তারপর এক্ষুনি পুলিশ এসে হৈ চৈ আরম্ভ করে দেবেখন্, তখন আপনারাই বলবেন, এই সাধুখাঁই শালা পাজী, পুলিস এনে হাঙ্গামা বাধিয়েছে।

['ও মিথ্যে কথা', 'ছিল কোথায় এদ্দিন এই চাল', 'মার বজ্জাৎটারে'...ধৈর্যচ্যুতি ঘটে মানুষের]

ওকিলদ্দি—(চিৎকার করে) চাল নে লরী পালালো—!

নরেন্দ্রনাথ—আঃ-ঃ-ঃ, চুপ কর, চুপ কর। ঘটনা সামনেই বুঝোবাঝা হবে...(সাধুখাঁকে) এমন সব কাণ্ড বাধাও!

সাধুখাঁ—দেখো এট্টা কথা বলি। অযথা হাঙ্গামা করে ঐ চাল যদি তোমরা আটকে রাখ তো ঘটনা খারাপ হয়ে যাবে।

['শোনব না, শোনব না, সাধু খাঁর কথা শোনা হবে না, প্রেসিডেন্ট বাবু বলুন—' হট্টগোল হতে থাকে]

...বেশ তো প্রেসিডেন্টবাবুই বলুন।

নরেন্দ্রনাথ—এখন, সাধু খাঁ বলছেন...

কৃপানাথ—ভবানীতে বলবেন না, আমরা চাল পাব কিনা তাই বলুন।

নরেন্দ্রনাথ—আমিই বলছি, আমিই বলছি। (সাধু খাঁর সঙ্গে তাড়াতাড়ি কানে কানে ঘটনা শোনেন) ঐ চাল মিলিটারী রিকুইজিশন করেছে; সুতরাং ঐ চালের ওপর আমাদের কারো কোন হাত নেই।

সাধু খাঁ—ছুটো কথা বলে আমি বুঝিয়ে দেই...আপনারা বিশ্বাস করুন, ঐ মালের উপর আমার কোন হাত নেই। চিঠিও হয় তো এতক্ষণে এসে গেছে পল্লীতে। দরকার হলে আমি প্রেসিডেন্টবাবুকে সে চিঠিও দেখাব।

কৃপানাথ—ও, ভবিষ্যতে চিঠি আসবে আর তুমি তখন সেই চিঠি প্রেসিডেন্ট বাবুকে দেখাবে! এসব বাজে কথা শিখলে কোথায়! চিঠি থাকে তো দাখাও আমাদের।

('ও সব মিথ্যে কথা', 'চাল চোর', 'শালা ব্ল্যাকমার্কেট'...গোলমাল চলে)

ওফিলদ্দি—চাল নে নরী পালাল—ও—ও— :

নরোত্তম—এ তল্লাটে আবার মিলিটারী কোথায়।

সাধু খাঁ—মিলিটারী কোথায় আসতে কতক্ষণ? নাকে তেল দিয়ে ঘুমোও কি না তাই কিছু জানতে পার না, যুদ্ধ র ঘনঘটা দেখছ না।

সনাতন—যুদ্ধ তো বেঁধেছে এক আমাদের পেটে, আর যুদ্ধ তুমি দেখলে কোথায়?...খালি ধোঁকাবাজির কথা।

পতিতপাবন—ঐ যে কাগজে গুপ্তচরের কথা লেখে না সনাতনদা, হই ভাখ সেই যুদ্ধ র গুপ্তচর। প্রেসিডেন্টবাবু...

পুঁটিরাম—গরু মরে আর শকুন হাসে—কথা শোন।

নরেন্দ্রনাথ—বলি তোমরা সমঝোতা করবা না হাঙ্গামা করবা। ...শোন, মিলিটারী রিকুইজিশন করা চাল, ও চাল তোমরা ছেড়ে দাও।

কৃপানাথ—কেন, ছেড়ে দেব কেন। উনি চিঠিও পান নি, আর ওঁর চালও সীজ করেনি কেউ; সুতরাং চাল থাকতে উনি আমাদের চাল দেবেন না কোন যুক্তিতে। আমরা তো আর মিনিমাঙনা চাল চাচ্ছি নে।

সাধু খাঁ—কোন যুক্তিতে...অত কৈফিয়ৎ আমি দিতে পারব না। তবে এ কথা জেনো যে এই চাল যদি তোমরা আটকাতে চেষ্টা করো...

পতিতপাবন—এই চাল কন্ট্রোলদরে আমাদের দিতি হবে তোমারে।

নরেন্দ্রনাথ—আঃহা শোন, পতিতপাবন, নাঃ, যা ইচ্ছে তোমরা করগে আমি চল্লাম।

সনাতন—প্রেসিডেন্টবাবু!

নরেন্দ্রনাথ—বলছি বলি চেঁচিও না অনর্থক। এই রকম করে কখনও কোন সমাধান হতে পারে। শোন, এখানে একটা কথা আছে...

কৃপানাথ—শোনগে খালি কথা আছে। কেন কন্ট্রোলদরে চাল দেবার কথাডা কি ফেলনা হল।

সাধু খাঁ—আসল কথা এ চাল বিক্রি হবে না। আমার কি। আমি তো এখানেও বেচব সেখানেও বেচব। সোজা কথাডা তোমরা যখন বুঝবে না তখন...হাজার বার বলছি যে রিকুইজিশন করা চাল, এ মাল সীজ হয়ে গেছে, তখন সে কথা তোমাদের কানেই ঢুকছে না।

পতিতপাবন—তোমার 'সীজ' 'রিকুইজিশন' সব বাজে কথা, মিথ্যে কথা। আসল কথা হচ্ছে, পিসিডেন্টবাবু শোনবেন, আসল কথা কলাকোপার

হাটে পঞ্চাশ টাকা দরে ঐ চাল তুমি বিক্রি করবে বলে নরী ভরতি করে পাচার করছিলে।

সাধু খাঁ—মিথ্যে কথা, জোচ্চুরি কারবার, একথা কখনও সত্যি হতে পারে না।

নরেন্দ্রনাথ—থাকগে অনর্থক...(কানাকানি করেন)

(সাধু খাঁর প্রস্থান)

পতিতপাবন— ...বদমাইসি পেয়েছ। এখন মাঝপথে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছ নরী-সমেত, তাই ঐ সব কায়দার কায়দার পদ আওড়াচ্ছ। পিসিডেন্টবাবু!

নরেন্দ্রনাথ—তা আইন তো দেখি তোমরাই নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছ; প্রেসিডেন্টবাবু আর কি করবেন।

সনাতন—এ কি রকম কথা হল পিসিডেন্টবাবু!

নরেন্দ্রনাথ—হ্যাঁ, তা এখন তাই তো হল দেখছি। সাধু খাঁ যে কথা বলছে সে কথার গুরুত্ব এই ডামাডোলের বাজারে...

(চলমান গাড়ির শব্দ ক্রমশ বাড়তে থাকে)

আমি অস্বীকার করতে পারি নে, অথচ তোমরা বলছ যে ঐ চালই তোমাদের চাই। এর সমাধান আমি কি করে করব! মাথায় আসা চাই তো!...কিছু কিছু লোক, আমি জানি, এতে করে আমারে ভুল বোঝবে, অবিচারও করবে, কিন্তু একথাও আমি জানি, যে তোমাদের মধ্যে এই খানেই—অনেক ভাল লোক আছে, যারা বোঝবে যে, যে ব্যক্তি জলে কুমীর আর ডাঙায় বাঘ, এর মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছে, হাজার আন্তরিকতা আর দরদ থাকা সত্ত্বেও, সে ব্যক্তি কতটুকখানি কি করতে পারে।...

ওস্মিলদি—চাল নে নরী...

নরেন্দ্রনাথ—আমি আবার বলব, জোর গলায় বলব এবং দাবি করেই বলব যে প্রকৃত যা করতে চাই আমি তোমাদের জন্যে, তা আমি করতে পাচ্ছি নে। কিন্তু আজ পারছি নে বলেই আমি ভেঙে পড়ব না, ভেঙে পড়লে আমার চলবে না, অন্তত আমার জেলার এই নিরন্ন মানুষের মুখের দিকে তাকিয়েই আমাকে আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে

দুঃখু কষ্টের জগদ্দল পাথর মাথায় নিয়েই লড়াই করে যেতে হবে আজ।
তারপর দশজনের ইচ্ছেয় সেই...

[দারুণ ঘর্ঘরে ধ্বসান নদীটা উধাও হয়ে যায়। জনতা বিভ্রান্ত, দিশেহারা—ছত্রভঙ্গ। একটু পরেই নদীর শব্দ ক্ষীণ হয়ে আসে। আবহাওয়া ধোঁয়াটে, অস্পষ্ট। চুপচাপ। কেউ কোথাও নেই। অথচ জননেতার বক্তৃতার বিরাম নেই। এক কোণে শুধু দেখা যায় দাঁড়িয়ে আছে ভগবতীচরণ, লক্ষ্মীকান্ত, সহায়রাম, ত্রিলোচন ও অন্যান্য কিছু।]

সুদিনের নাগাল যদি আমি পাই তখন এই দুর্দিনের কথা আমরা নিঃসন্দেহে ভুলে যাব। এ রাতও কেটে যাবে, দিন একদিন আসবেই এবং সেই বিশ্বাসেই আমি লড়াই করে যাব।...

চলে গেছে সব। চলে গেছে। ...উঃ...(কপালের ঘাম মোছেন) গোটাটাই একটা দুঃস্বপ্ন ;—ও—ো—ো—োঃ ; কে ||

(ভগবতীচরণ, ত্রিলোচন, সহায়রাম প্রভৃতির প্রবেশ)

ও, ভগবতী! লক্ষ্মীকান্তও আছ দেখছি...

ভগবতী—চলেন, একটু জিরাবেন চলেন।

লক্ষ্মীকান্ত—হাঙ্গামা বলে হাঙ্গামা,—উঃ, একটু বিশ্রাম করবেন চলুন।

[ভগবতীচরণ ও লক্ষ্মীকান্ত নরেন্দ্রনাথকে নিয়ে যেতে থাকে ভিতরে] *

—যবনিকা—

---

*প্রযোজনা সম্পর্কে দুচারটে কথা :
মাইক্রোফোনের অসুবিধা থাকলে effect music বাধ্য হয়েই পরিহার করতে হবে, তবে তা বর্জন করবার জন্যে যদি ঘটনার গতি ও বিষয়বস্তু ভাল করে বোঝা না যায়, সেক্ষেত্রে কোন সবাক চরিত্রের মুখ দিয়ে সেটি স্বল্প কথায় পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করতে হবে। যেমন নদীটার পালানোর ব্যাপারটায়—বাঁধমান নদীর শব্দ effect music হিসেবে ব্যবহার করতে হবে মাইক থাকলে ; অন্যথায় নদীটা যে ধ্বসান উধাও হয়ে যাচ্ছে সেটা পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করতে হবে, জননেতার বক্তৃতার মাঝখানেই। নরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার উপর কথাটা একটু ছেদ দিয়ে দিয়ে যেন অন্তত তিনবার বলা হয়। এখানে এতে করে নরেন্দ্রনাথের বক্তব্য যদি অস্পষ্টও হয় তো তাতেও কোন ক্ষতি হবে না। —লেখক।

কাঠখোদাই

সোমনাথ হোড়

রাধাকৃষ্ণণের দর্শন

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

মাথায় মস্ত সাদা পাগড়ি, গায়ে গলাবন্ধ লম্বা ঘি-রঙের কোট, প্রশস্ত ললাট, চোখে রোল্ডগোল্ডের চশমা, তীক্ষ্ণ নাসা, ঋজু দেহগঠন, মুখে বুদ্ধির দীপ্তি—এই হলেন স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ।' রাধাকৃষ্ণণের নাম আজ নিখিলবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। মস্কোতে ভারতীয় দূত হিসাবে তিনি অনেকখানি সাফল্যও অর্জন করেছেন। তবে রাধাকৃষ্ণণ দার্শনিক হিসাবেই বিশেষভাবে সর্বত্র পরিচিত এবং কূটনীতিজ্ঞ হিসাবে ততটা না হলেও দার্শনিক হিসাবে তিনি পাশ্চাত্যের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন পেয়েছেন। স্যার ফ্রান্সিস্ ইয়ংহাস্‌ব্যাণ্ড তাঁর "ডন ইন ইণ্ডিয়া" গ্রন্থে লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথ যেমন নবীন ভারতের কবি, তেমনি রাধাকৃষ্ণণও নবীন ভারতের দার্শনিক।"

রাধাকৃষ্ণণ বহুদিন খ্যাতির সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান দর্শনাচার্য হিসাবে কাজ করেন। পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যধর্ম বিষয়ে স্থায়ী অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। ইওরোপ ও আমেরিকায় হিন্দু জীবনবেদ ও অন্যান্য বিষয়ে তিনি যেসব ভাষণ দেন তাতে ওখানকার সুধী সমাজে তীব্র আলোড়ন ওঠে।

রাধাকৃষ্ণণের বাগ্মিতাও অনন্যসাধারণ। অনেক ইংরেজ অধ্যাপকও মন্তব্য করেছেন যে রাধাকৃষ্ণণ এমন অপরূপ সুন্দর বক্তৃতা করেন যে, এ ধরনের বাগ্মিতা তাঁদেরও ঈর্ষা, প্রশংসা ও আত্মগ্লানির বিষয়। কোনরকম লিখিত টীকাটিপ্পনীর সাহায্য না নিয়ে রাধাকৃষ্ণণ এমন নিখুঁত, কাব্যধর্মী ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা দেন যে ভারতীয়দের মধ্যে তো নয়ই, ইংরেজদের মধ্যেও এমন বক্তা বিরল।

রাধাকৃষ্ণণের রচনাশৈলীও অননুকরণীয়। রাধাকৃষ্ণণের ভাষার সৌন্দর্য, অপরূপ ছন্দোময় ইংরেজী এমনই অভিনব, যে বহু বিদেশী মনীষী অকুণ্ঠচিত্তে রাধাকৃষ্ণণের রচনাশৈলীর উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

রাধাকৃষ্ণণ প্রধানত "ভারতীয় দর্শন" রচয়িতা হিসাবে পরিচিত হলেও অন্যান্য দার্শনিক ও ধর্মমূলক গ্রন্থও তিনি লিখেছেন। যৌবনে তিনি "সাম্প্রতিক

দর্শনে ধর্মের রাজত্ব" (The Reign of Religion in Contemporary Philosophy) নামে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের সমালোচনা-মূলক গ্রন্থ রচনা করে সুধী-সমাজে পরিচিত হন। তাঁর 'ভারতীয় দর্শন' (দুই খণ্ড) ভারতীয় চিন্তাধারার সম্যক পরিচয় দিয়ে তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন করে তোলে। এ ছাড়া, রাধাকৃষ্ণণ, "কল্কি-অথবা সভ্যতার ভবিষ্যৎ," "প্রাচ্যধর্ম ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারা," "ভাববাদী জীবনবেদ" (An Idealist vew of Life), "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দর্শন" প্রভৃতি লিখেও প্রভূত খ্যাতি লাভ করেন।

গোঁড়া হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও রাধাকৃষ্ণণের শিক্ষা বরাবরই খ্রীষ্টান মিশনারী বিদ্যালয়ে হয়। রাধাকৃষ্ণণের চিন্তাধারায় যে উদারতা ও সমন্বয়ের ভাব লক্ষ্য করা যায়, বোধ হয় মিশনারী বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভই তার অন্যতম কারণ। রাধাকৃষ্ণণ যে হিন্দু কূপমণ্ডূকতা পরিহার করে, মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ সমাজের কুসংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করে এক উদার, সর্বজনীন হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যানে নিযুক্ত হলেন—বাল্যকালে মিশনারী শিক্ষার প্রভাব যে এ ব্যাপারে অনেকখানি কাজ করেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

রাধাকৃষ্ণণ পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য—উভয় দর্শনেই সুপণ্ডিত। বিশেষ করে ইংলণ্ডের নব্য-হেগেলপন্থী স্টারলিং, কেয়ার্ড, গ্রীন, ব্রাডলে, বোসাঙ্কোয়েট প্রভৃতি দার্শনিকদের চিন্তাধারার সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত। হিন্দু ষড়-দর্শনের ভিতর রাধাকৃষ্ণণ শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্তের ভক্ত। রাধাকৃষ্ণণ নিজে কোন সমগ্র সুসংহত দর্শনপ্রস্থান প্রতিপন্ন করেননি। তবে পূর্বপক্ষ খণ্ডন প্রসঙ্গে এবং বিভিন্ন দর্শনপ্রস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁর একটা বিশিষ্ট জীবনবেদ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—যে জীবনবেদে একদিকে রয়েছে ব্রাড্‌লের প্রভাব, অন্যদিকে শঙ্করাচার্যের। ভারতের প্রাচীন দর্শনের মর্মবাণী রাধাকৃষ্ণণ যেমন একদিকে গ্রহণ করেছেন, অন্যদিকে তেমনি 'অভিনব বিকাশবাদ' (Emergent Evolution)-এর মূল তত্ত্বও তাঁর চিন্তাধারায় প্রভাব বিস্তার করেছে। বিজ্ঞান, কাব্য, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র ও মরমী সাধকদের কাহিনী ঘেঁটে রাধাকৃষ্ণণ গড়ে তুলেছেন এক "গতিশীল ব্রহ্মবাদ"—যার আকর্ষণ অনেকের কাছেই অনস্বীকার্য। রাধাকৃষ্ণণ কোন সম্পূর্ণ নতুন দর্শনপ্রস্থান সৃষ্টি করেননি। সৃজনীশীল দার্শনিক হিসাবে তাই তিনি সক্রেটিস, প্লেটো, কাণ্ট, হেগেল, শঙ্কর, রামানুজের সগোত্র নন। তবুও যে, ইওরোপে ও আমেরিকায় তিনি সশ্রদ্ধ অভিবাদন পেয়েছেন, তার কারণ জীবনের সমস্যাকে তিনি বুঝতে

চেয়েছেন এক অসাম্প্রদায়িক, ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে—ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, জাতিতে জাতিতে সমন্বয়ের তত্ত্বকথা প্রচার করেছেন, জীবনকে অস্বীকার করে শুধুই আকাশকুসুম রচনা করেননি।

গতিশীল ব্রহ্মবাদ (Dynamic Idealism)

উপনিষদের মূলকথা হল যে, এক পরমাত্মা সর্বভূতে বিরাজিত। এই পরমাত্মাকে (Universal Spirit) দেখা, শোনা, মনে মনে চিন্তা করা, ধ্যান করা—প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের মূলকথা। উপনিষদের মতে প্রতিটি বস্তু বা পদার্থ আত্মা (spirit) ভিন্ন অন্য কিছু নয়। সমস্ত প্রাণী ও পদার্থের সূক্ষ্মতম কারণ এই পরমাত্মা এবং এটাই একমাত্র সত্যবস্তু। অবশ্য উপনিষদে আছে যে যদিও অনেকে মনে করেন 'অন্নই ব্রহ্ম'—অর্থাৎ 'প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বস্তুই একমাত্র সত্যবস্তু', তবুও এটা পরমতত্ত্ব নয়। ঠিক সেরকম—'প্রাণই ব্রহ্ম' বা 'মনই ব্রহ্ম' এমন কি 'বিজ্ঞানই (Self-conciousness) ব্রহ্ম', এ সমস্ত কথাও বিভিন্ন অধিকারীর বেলায় গ্রাহ্য হলেও, আসলে পরমতত্ত্ব বা ব্রহ্ম হলেন এমন একটি তত্ত্ব যিনি অনাদি অনন্ত, এক, অদ্বিতীয় চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দ দিয়ে যিনি ঘেরা —যাঁকে জানলে এই দৃশ্যমান জগতের সব কিছুই জানা হয়ে যায়, সবকিছুরই প্রাপ্তি ঘটে—অজ্ঞাত, অপ্রাপ্ত আর কিছুই থাকে না।

রাধাকৃষ্ণণ উপনিষদের এই বনিয়াদ থেকেই তাঁর আলোচনা শুরু করেছেন। রাধাকৃষ্ণণ বলেন যে, অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান, আনন্দ—এ সব-কিছুই এক পরমাত্মার, ব্রহ্মের প্রকাশ। অন্নে (matter) ব্রহ্ম প্রকাশিত। তবে প্রাণের স্তরভেদ ঘটেছে; প্রাণের লীলাচাঞ্চল্যে ব্রহ্ম প্রকাশিত হচ্ছেন উন্নততর, সত্যতর ভাবে। মনের স্তরে, ব্রহ্মের প্রকাশ আরও উন্নত, প্রকৃষ্ট ধরনের। এ ভাবে অন্ন (matter), প্রাণ (Life), মন (perceptual conciousness), বিজ্ঞান (self-conciousness) এবং আনন্দ—সবের মধ্যেই ব্রহ্ম প্রকাশিত, যদিও প্রকাশের তারতম্য অনুযায়ী জগতে অভিনব, বিচিত্র সত্তার প্রকাশ, এক স্তর থেকে অন্য স্তরে, এক ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে জগতের ক্রমাভিব্যক্তি।

রাধাকৃষ্ণণ তাঁর "ভাববাদী জীবনবেদ" গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে 'বস্তুবাদ'কে গ্রহণ করা চলে না। আগেকার আমলের "বস্তু" (matter) ছিল স্থিতিশীল অনড় পদার্থ। আজকের দিনের পরমাণবিক পদার্থ-বিজ্ঞানের দৌলতে বস্তুর এ চেহারা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। বিজ্ঞানের মতে 'বস্তু' আসলে শক্তি বা

ক্রিয়াশীলতার এক বিশেষ অভিব্যক্তি; তাছাড়া স্থানকাল-পাত্র-নিরপেক্ষ বস্তুসত্তাও অলীক কল্পনামাত্র। কাজেই আজকের বিজ্ঞানের দৌলতে বস্তু-বাদের যান্ত্রিক, নিশ্চল স্থিতিশীল জগৎ সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। এক নতুন গতিশীল, সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বস্তুজগতকে আজকাল দার্শনিকেরা বিচার করছেন।

রাধাকৃষ্ণণ দেখিয়েছেন যে বস্তু আসলে সৃজনীশীল (creative), জগতে সৃজনীশীল অগ্রগতির স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

বস্তু থেকে প্রাণের আবির্ভাব। কিন্তু প্রাণের স্তরে ধারাবাহিকতা, অংশ এবং অংশীর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক, সুষমা এবং সামঞ্জস্য এমনিই অভিনব যে প্রাণহীন জড়শক্তি দিয়ে এর ব্যাখ্যা কোনক্রমেই চলে না। জীববিজ্ঞান জীবনের প্রসঙ্গ নিয়ে নাড়াচাড়া করলেও, 'জীবনের উৎপত্তি', 'ক্রমবিকাশের রহস্য' সম্পর্কে একেবারেই নীরব। রাধাকৃষ্ণণ তাই বলেন, "ক্রমবিকাশ কোন ব্যাখ্যা হল না। ক্রমবিকাশ আদবে ঘটল কেন, পৃথিবীতে কেনই বা প্রাণ আবির্ভূত হল, সে সম্পর্কে এ মতবাদ কিছুই বলে না।" জীববিজ্ঞান শুধু তথ্য ঘেঁটেই মরে; জীবন রহস্য ব্যাখ্যা করাটা এর সাধ্যায়ত্ত নয়।

চৈতন্যের আবির্ভাব যখন ঘটে, তখন আবার নতুনের সঙ্গে, অভিনবের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ মেলে। এই অভিনব গুণের ব্যাখ্যা শুধু জড়ের চাবিকাঠি দিয়ে বা প্রাণের চাবিকাঠি দিয়ে সম্ভব নয়। রাধাকৃষ্ণণ তাই বলেন, "চৈতন্য যখন প্রাণ বা জীবনের স্তর থেকে উদ্ভূত হল, তখন চৈতন্য তো প্রাণের মতই বাস্তব সৎ। অথচ, এ স্তরে আমরা পেলাম এক অভিনবের সাক্ষাৎ যা প্রাণের চাইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

আত্মসচেতন মানুষ যখন আবির্ভূত হল পৃথিবীতে তখন চৈতন্যেরও গুণগত পরিবর্তন ঘটল, কারণ মানুষেতর প্রাণীর চৈতন্য মানুষের আত্মসচেতনতার সঙ্গে এক নয়। মানুষ প্রকৃতির সন্তান একথা ঠিক, কিন্তু বিবর্তনের ধারাপথে যখন মানুষের আবির্ভাব, তখন উল্লম্ফনের ভঙ্গীতে যেন বিবর্তনধারা একটা সম্পূর্ণ নতুন স্তরে এসে পৌঁছল। মানুষে আমরা পেলাম জৈবধর্মের সঙ্গে ভাগবত সত্তার সংমিশ্রণ। বিজ্ঞান এই অপরূপ রূপান্তরের প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারে না।"

অন্ন (জড়বস্তু), প্রাণ, মন, বিজ্ঞান—এসবের তুলনা করে রাধাকৃষ্ণণ দেখাচ্ছেন যে এই স্তরগুলি বিভিন্ন হলেও এদের ভিতর ধারাবাহিকতা

রয়েছে। এবং প্রত্যেকটি স্তরে স্পন্দিত হচ্ছে ক্রিয়াশীলতা—অগ্রগতি, যা থেকে এ সমস্ত স্তরের অন্তঃস্থিত এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব স্বীকার করার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অবশ্য এ তত্ত্বটি জড়শক্তি নয়। কারণ জড়শক্তি থেকে 'প্রাণ', 'মন' এসব তত্ত্ব উদ্ভূত হতে পারে না। রাধাকৃষ্ণণ বলেন যে তত্ত্বটি হল চৈতন্যশক্তি। এবং এ শক্তিটির প্রকাশ ঘটছে জড়, প্রাণ, মন প্রভৃতির ভিতর দিয়ে।

রাধাকৃষ্ণণ ধর্মের দিক থেকে দর্শনের সমস্যা আলোচনা করেছেন। কিন্তু তিনি হলেন সমন্বয়বাদী। তাই তিনি শঙ্করের অদ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ব্রাড্‌লের ব্রহ্মবাদ থেকে উপাদান আহরণ করে নিজস্ব ব্রহ্মবাদ করেছেন। রাধাকৃষ্ণণ শঙ্করের ভক্ত হলেও শঙ্করের মায়াবাদ সম্পূর্ণ গ্রহণ করেননি। জগৎ মূলতত্ত্ব নয় নিশ্চয়—জগৎ পরব্রহ্মেরই ছায়ামাত্র। কিন্তু তাই বলে 'ব্রহ্মে জগৎ বাধিত' শঙ্করের এ মত তিনি স্বীকার করেন না। বরং ব্রাড্‌লের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বলেন যে 'জগৎ ব্রহ্মে আশ্রিত'। রামানুজ বলতেন, "ব্রহ্ম আত্মা, জগৎ দেহ, ব্রহ্ম হল মূলসত্তা, জগৎ আশ্রিতসত্তা"—রাধাকৃষ্ণণ একথা মানেন। তবে তিনি আরও অগ্রসর হয়ে বলেন যে জাগতিক ঘটনাসমূহ পারমার্থিক তত্ত্ব না হলেও এরা কোন না কোন ভাবে ব্রহ্মাশ্রিত এবং ব্রহ্মসত্তায় সংরক্ষিত (transmuted)।

রাধাকৃষ্ণণ বলেন যে মরমী সাধকের অপরোক্ষানুভূতিতে যে তত্ত্বটি ধরা পড়ে সেটি হল 'নির্গুণ ব্রহ্ম'। আর, ভক্ত যে তত্ত্বের সাক্ষাৎ পান, সেটি হল 'সগুণ ব্রহ্ম' বা ঈশ্বর। শঙ্কর বলতেন যে ঈশ্বর পরমতত্ত্ব নয়, ঈশ্বর হল বুদ্ধিগম্য ব্যবহারিক সত্তা। ভক্তের কাছে সগুণ ব্রহ্মের ব্যবহারিক সার্থকতা আছে কিন্তু সগুণ ব্রহ্মও পরমতত্ত্ব নন। অন্যদিকে রাধাকৃষ্ণণ বলেন যে, রামানুজ যে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের কথা বলেছেন সেটি আসলে ব্রহ্মই নন, আসলে সেটি হল ঈশ্বর। রাধাকৃষ্ণণের মতে এ মত দুটির বিরোধের কোন কারণ নেই। নির্গুণ ব্রহ্ম হল আসল পরমতত্ত্ব—সাধকেরা যাঁর দর্শন পেয়ে ধন্য হন; আর সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হল বুদ্ধিগম্য পরমতত্ত্ব, ভক্ত-হৃদয়ে যার অধিষ্ঠান।

অবশ্য শঙ্কর-রামানুজ উভয়ের থেকে রাধাকৃষ্ণণের পার্থক্যও আছে। রাধাকৃষ্ণণের মতে ব্রহ্ম কূটস্থনিত্য, নির্বিকার, নিষ্ক্রিয় তত্ত্ব নন, ব্রহ্ম হলেন গতিশীল, আত্মপ্রকাশশীল। ব্রহ্ম নিজেকে ক্ষেত্র থেকে ক্ষেত্রান্তরে প্রকাশিত

করে চলেছেন। এই আত্মপ্রকাশের বিভিন্ন স্তর হল জড়, প্রাণ, মন প্রভৃতি, সেকথা আগেই বলা হয়েছে।

বুদ্ধি ও অপরোক্ষানুভূতি (Intellect and Intuition)

রাধাকৃষ্ণণ বলেন যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনের গঠনে অনেকখানি পার্থক্য আছে। পাশ্চাত্যের মনীষীরা বিজ্ঞান, তর্ক এবং মানবতার পূজারী। কিন্তু ভারতীয় চিন্তানায়কেরা তর্কের উপর অত জোর দেননি। তাঁদের মতে বুদ্ধি-অতিক্রমী কিন্তু বুদ্ধির চাইতে গূঢ় ও শক্তিশালী হল বোধ বা অপরোক্ষানুভূতি (Intuition) যা দিয়ে সংবস্তু অন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব। রাধাকৃষ্ণণ বলেন, ভারতীয় দার্শনিকেরা তাই দর্শনকে শুধু জ্ঞানের কথা বলে চিত্রিত করেননি, অন্তর্দৃষ্টির কথা বলেই চিত্রিত করেছেন।

রাধাকৃষ্ণণ বলেন জ্ঞান উৎপত্তি হয় তিন ভাবে—(১) প্রত্যক্ষ (২) বিশ্লেষণাত্মক চিন্তন ও (৩) অপরোক্ষানুভূতি বা সাক্ষাৎ প্রতীতি। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এসবের জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান। বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে ওঠে নৈয়ায়িক জ্ঞান। প্রত্যক্ষ ও নৈয়ায়িক জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োজন আছে এবং এ জ্ঞানের সাহায্যে পরিবেশের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা জন্মে। কিন্তু এই উভয়বিধ জ্ঞানই পরমতত্ত্বকে জানবার দিক থেকে অসম্পূর্ণ। ব্রাড্‌লে, বার্গসঁ—এঁরাও এ ধরণের অপরোক্ষানুভূতির কথা বলেছেন। তাঁদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে রাধাকৃষ্ণণও বলেন যে, শুষ্ক জ্ঞায়ে পরমতত্ত্বটি ধরা পড়ে না; অথচ সমগ্র মানবসত্তাটি যখন তত্ত্বজ্ঞানের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে, অন্তর্দৃষ্টি যখন খুলে যায়, তখন তত্ত্বদর্শন ঘটে, যে "দর্শন"টাই (Vision) মুখ্য কথা, নৈয়ায়িক জ্ঞানটা (logical knowing) নয়।

রাধাকৃষ্ণণ বুদ্ধি ও বোধের পার্থক্য দেখাতে গিয়ে বলছেন, "বুদ্ধি হল ব্যবহারিক উপকরণ। বুদ্ধির প্রয়োজন আছে, যদিও বুদ্ধি সত্যের সাক্ষাৎ পায় না। আবার বোধি যদিও সত্যের সাক্ষাৎ পায়, তবুও প্রয়োজনের দিক থেকে এর বিশেষ গুরুত্ব নেই। বোধি হল পরাজ্ঞান, সারসত্যের দর্শন।"

রাধাকৃষ্ণণ বুদ্ধি ও বোধির মধ্যে বিরোধ স্বীকার করেন না। বোধি হল বুদ্ধির পরিণত অবস্থা, যুক্তিবিরোধী অবস্থা মোটেই নয়। রাধাকৃষ্ণণ বলেন, যে, দর্শনের ক্ষেত্রে অন্তর্দৃষ্টিই আসল কথা। কারণ মহৎ সত্য প্রমাণের বিষয় নয়, সাক্ষাৎপ্রতীতিরই বিষয়।

রাধাকৃষ্ণণের মতে দর্শনের ক্ষেত্রে বোধির প্রয়োজন অস্বীকার করা যায়

না। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, বিজ্ঞান মনে করে যে বিশ্বজগৎ সুশৃঙ্খল, নিয়মের জগৎ। অথচ এ বিশ্বাস তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, বৈজ্ঞানিকের উপলব্ধির, সাক্ষাৎপ্রতীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। তেমনি, তর্কশাস্ত্রে, নীতি-শাস্ত্রে ধরে নেওয়া হয় যে জীবন নিরর্থক, তুচ্ছ নয়। অথচ তর্ক দিয়ে একথাটা প্রমাণ করবার উপায় নেই। কাজেই তর্ক-অতিক্রমী, তর্কের চাইতে শক্তিশালী আরও একটা ক্ষমতা মানা প্রয়োজন এবং প্রধান প্রধান দার্শনিকেরা এ ধরনের ক্ষমতা স্বীকারও করেছেন।

'সভ্যতার সংকট'

রাধাকৃষ্ণণের আধ্যাত্মিকপ্রবণতা সুস্পষ্ট হলেও ইহলৌকিক সমস্যা সম্বন্ধে তিনি উদাসীন নন। আজকের দিনের অশান্তি ও সংকটের কথা তিনি স্বীকার করেন। রাধাকৃষ্ণণ বলেন যে, মানুষ বিজ্ঞান ও শিল্পকৌশল আয়ত্ত করেছে, নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করে প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে, মানুষের সুখসুবিধা বাড়িয়েছে। এর ফলে মানুষের বুদ্ধির গৌরবই বেড়েছে। মানুষ মনে করেছে যে বুদ্ধি, যুক্তি, বিজ্ঞান—এ সবই বুঝি মানুষের প্রকৃত গৌরবের কারণ। অথচ দেখা যাবে যে "মানবাত্মা"র অগ্রগতি তো ঘটেইনি, বরং পশ্চাদ্‌গতিই ঘটছে। জীবনে আজ আর কোন উদ্দেশ্য নেই; উদ্দাম কামনাবাসনার কাছে আত্মসমর্পণ, জাতিগত বৈরী ও বিরোধ, পরস্পর হানাহানি—এ সবই যেন আজকের দিনের একমাত্র সত্য।

রাধাকৃষ্ণণের মতে সভ্যতার সংকট কাটিয়ে উঠতে হলে আধ্যাত্মিক পুনরভ্যুত্থান প্রয়োজন। আজকের দিনের যে সর্বব্যাপী নাস্তিকতা সেটাই হল সংকটের কারণ।

রাধাকৃষ্ণণ বলেন যে, ধর্মের বিকল্প কোন ব্যবস্থায় মানবাত্মার মুক্তি নেই। থিওসফি বল, 'খ্রীস্টান বিজ্ঞান' (Christian Science) বল, মানবতাবাদ, সমাজতন্ত্র, নব্যপন্থা, সাম্যবাদ—যাই বল না কেন, এর কোনটাই গোটা মানুষটিকে আনন্দ দিতে, তৃপ্তি দিতে পারে না। জগতের চারদিকে আজ অনিশ্চয়তা ও আধ্যাত্মিক শূন্যতা। নৈতিক কোন আদর্শ আজ আর নেই। মানুষ আজ তাই চারদিকে হাতড়ে বেড়াচ্ছে—খুঁজে ফিরছে পথ। রাধাকৃষ্ণণ বলেন, নিরাশার কারণ নেই। কারণ, মানবজাতি এখনও নবরূপধারণ করছে। আজ যদি আমরা আবার উচ্চ আদর্শ, উন্নত সংকল্প নিয়ে, সংঘবদ্ধ-ভাবে অগ্রসর হই, তবে অচিন্তিতপূর্ব স্বাধীনতা ও সুখের সন্ধান আমরা পেতে

পারি। আজ তাই আমাদের প্রয়োজন—মানুষের অন্তরস্থিত ভগবানের আবাহন; বক্তৃতা, কর্মসূচী, 'ইজম্'—এ সব নয়।

আজকের দিনে মার্কসবাদ পৃথিবীর জনসাধারণের চিত্ত ক্রমশই আকৃষ্ট করছে। রাধাকৃষ্ণণ 'ধর্ম ও সমাজ' গ্রন্থটিতে 'মার্কসবাদ' নিয়েও তাই আলোচনা করেছেন।

মার্কসবাদীরা শুধু অন্নবস্ত্র, ঐহিক উন্নতি নিয়ে মাথা ঘামায় অথচ রাধাকৃষ্ণণের মতে ঐহিক উন্নতির উপকরণমূল্যই শুধু আছে, চরমমূল্য নেই। তাছাড়া, মানুষের জীবনে জীবিকা, অন্নবস্ত্রের সমস্যা যেমন আছে, তেমনি সত্যশিবসুন্দরের প্রতি আকর্ষণও আছে—ধর্মবোধের প্রশ্নটাও তুচ্ছ ব্যাপার নয়। রাধাকৃষ্ণণ বলেন, মার্কসবাদীরা যে ধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেন সে শুধু ধর্মের বহিরঙ্গ দেখে, প্রকৃত ধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে তাঁরা সচেতন নন; তাই ধর্মের সারবস্তুকে না দেখে, খোলসটি নিয়েই তাঁদের সমালোচনা। তাছাড়া, মার্কসবাদীরা একদিকে বলেন যে, চরম সত্য বলে কিছু নেই, অথচ তাঁরা সমষ্টি-কল্যাণ ও অন্যান্য সামাজিক শ্রেয়কে সনাতনের সিংহাসনে বসিয়েছেন। রাধাকৃষ্ণণ তাই সিদ্ধান্ত করেছেন, "আমাদের এই যুগে 'আত্মা'কে আমরা হারিয়েছি। দেহ আমাদের বিকল হয়নি। অন্তরস্থিত পুরুষটি আজ রোগাক্রান্ত, সব দুঃখেরই উৎপত্তি সেখান থেকে।"

আজ সংকটত্রাণের পথ হল "আত্মাকে জানা", ধর্মের বিশেষ শক্তিকে জাগিয়ে তোলা—যাতে মানুষ, মনের পরিবর্তন করে নিখিলবিশ্বের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে পারে—পৃথিবীর বুকে নেমে আসে স্বর্গের সুষমা ও শান্তি।

রাধাকৃষ্ণণ ভারতীয় দর্শনের ভাববাদী ঐতিহ্যকে গ্রহণ করে, ইংরেজী পরিভাষায় যে উদার, অসাম্প্রদায়িক ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন খাড়া করেছেন তার আকর্ষণ শিক্ষিত ভারতীয় সমাজে অনেকখানি। তবে দর্শন তো শুধু পুরাতনের 'নতুন ব্যাখ্যা' নয়—দর্শন হল মতাদর্শগত সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ যা দিয়ে জনতার সংগ্রামমুখর জীবন আলোকিত হয়ে ওঠে, অথবা যা দিয়ে বাস্তব সমস্যা, বাস্তব সংকটের চেহারা দার্শনিক আবৃত করে রাখেন।

রাধাকৃষ্ণণ-দর্শন আলোচনা করলে জিজ্ঞাসু পাঠকের যে প্রশ্নগুলি সহজেই মনে আসবে সেগুলি এই।

(১) রাধাকৃষ্ণণ দর্শন ও ধর্মকে এক করে দেখেছেন। রাধাকৃষ্ণণের মতে

দর্শনের বিষয়বস্তু হল ধর্মভাব ; ভক্তদের অভিজ্ঞতা বিচার-বিশ্লেষণ—ধর্ম ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতার নবমূল্যায়ণ—এ ছাড়া দর্শনের আর কোন কাজ নেই। অথচ আজ দর্শনকে বিজ্ঞানের স্তরে না তুলতে পারলে, দার্শনিক হেঁয়ালীপনারই প্রশ্রয় দেবেন, নতুন জগতের উদ্‌গাতা হিসাবে জনসাধারণের শ্রদ্ধা পাবেন না।

(২) বিজ্ঞান নিয়ে রাধাকৃষ্ণণ যেটুকু আলোচনা করেছেন সেটুকু সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গীতে, বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা দেখাবার জন্য। ফলে, পুরনো প্রাক্‌-বৈজ্ঞানিক আমলের ধর্মীয় চিন্তাধারার জের টেনেই তিনি চলেছেন, বিজ্ঞান-নিষ্ঠ বাস্তব মূর্ত পৃথিবীর 'দর্শন' আলোচনা করেন নি।

(৩) রাধাকৃষ্ণণের দর্শন সৃজনীশীল নয়—সাবেকী। ভারতবর্ষের বর্তমান অধ্যায়ের কর্তব্য কি, ভারতবর্ষের সমস্যার মূল কোথায়, এ সব তিনি আলোচনা করেন নি। তাই এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "স্বরাজের দাবি আসলে অন্তরাত্মার স্বরাজেরই দাবি—অন্য কিছু নয়।" ভবিষ্যৎ-এর পথরেখা কেমন হবে, নতুন দর্শনের অগ্রগতিই বা কোন পথে হবে—এ সব নিয়েও তাই রাধাকৃষ্ণণ আলোচনা করেননি।

(৪) রাধাকৃষ্ণণ এমন সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন যা পরীক্ষা নিরীক্ষার বাইরে। 'সগুণ ব্রহ্ম বা নির্গুণ ব্রহ্ম', 'ব্রহ্ম ও ঈশ্বর', 'ঈশ্বর ও জীব', 'জীবের মুক্তি', এ সব প্রশ্ন সাবেকী দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয় হলেও, আধুনিককালের ভারতীয় দার্শনিক বদ্ধজলায় আবদ্ধ থাকবেন এমন অর্থ নেই। অথচ, রাধাকৃষ্ণণ তাঁর অসামান্য প্রতিভা নিয়ে নতুন সঞ্জীবনী মন্ত্রের সন্ধান দিতে পারলেন না, ধর্ম নামে যে ভ্রমাত্মক সূর্যের পিছনে মানুষ ঘুরে বেড়িয়েছে, তার পিছনেই ছুটে বেড়ালেন!

(৫) রাধাকৃষ্ণণ-দর্শনের ভাববস্তুকে প্রগতিশীল বলাও চলে না। কারণ, ভারতবর্ষের যে সব পরিস্থিতি মানুষকে পতিত, দাস, ঘৃণাস্পদ ও উপেক্ষিত প্রাণীতে পরিণত করেছে সেগুলিকে নিঃশেষ করবার দার্শনিক আহ্বান তিনি জানাননি। আধ্যাত্মিক সত্যের জায়গায় পার্থিব জীবনের সত্য স্থাপন করা রাধাকৃষ্ণণের উদ্দেশ্য নয়। তাই তিনি—আমাদের বাস্তব শক্তিকে যে বদলাতে হবে, সমাজ ও রাষ্ট্রের রূপান্তর ছাড়া যে মানবতার উদ্ধারের আশা নেই—এসব কথাকে গুরুত্ব দেন নি। রাধাকৃষ্ণণের বাণী হল, "অন্তরস্থিত পুরুষটিকে জান", "ধর্মের বিশেষ শক্তিটিকে জাগিয়ে তোল—তবেই সব সমস্যার সমাধান।"

তাই, যদিও ভারতের ইতিহাসের সাক্ষ্য হল এই যে, ভারতীয় মানবতাকে পতিত, দাস, ঘৃণাস্পদ বানাতে, ভারতীয় মানবতাকে ছিন্নভিন্ন করতে, অখণ্ড ভারতকে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত করতে, ধর্মের প্রভাব সব চাইতে বেশি—তবুও, রাধাকৃষ্ণণ মনে করেন ধর্মের পুনরভ্যুত্থান ছাড়া ভারতের মুক্তি নেই।

(৬) রাধাকৃষ্ণণ ধর্মের পুনরভ্যুত্থানে বিশ্বাসী। সেই হিসাবে তর্ক, বিজ্ঞান, প্রভৃতির উপর তাঁর তেমন আস্থা নেই। রাধাকৃষ্ণণ বলেন—বস্তু-বাদের আজ আর বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠা নেই, কেননা আধুনিক বিজ্ঞান বলে যে, বস্তু আজ 'অবস্তু'তে রূপান্তরিত হয়েছে। এডিংটন, জীন্স্-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ এরকম একটা ধারণা সৃষ্টি করেছেন ঠিকই। কিন্তু সুসান স্টেবিং তাঁর "দর্শন ও পদার্থ-বিজ্ঞানীরা" ("Philosophy & the Physicists") নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে এ ধরণের ভাববাদী সিদ্ধান্তের কোন বৈজ্ঞানিক বনিয়াদ নেই। স্টেবিং সাবেকী দার্শনিক। তবুও তিনি বলেন, "আমি মনে করি যে, অন্তত আধুনিক আণবিক মতবাদ থেকে এমন কোন যুক্তি মেলে না যাতে বলা চলে যে পদার্থ-বিদ্যার রাজ্যের সাম্প্রতিক পরিণতি প্রমাণ করে যে বস্তুবাদ মিথ্যা। এসব মতবাদ থেকে এমন কোন যুক্তিও মেলে না যাতে ভাববাদের সমর্থন হয়।"[৫]

রাধাকৃষ্ণণের বস্তুবাদ-সমালোচনা যে যুক্তিগ্রাহ্য নয় এবং এর উপর যে তিনি ভাববাদের প্রতিষ্ঠা করতে পারেন না, একটু বিশ্লেষণ করলেই সেকথাটা প্রমাণিত হয়।

প্রথমত, উনবিংশ শতাব্দীর 'বস্তু' আজ আর সত্যি নেই। আজকের 'বস্তু' আর অবিভাজ্য, নিরেট, অনড়, স্থিতিশীল বলে বিজ্ঞানে গৃহীত নয়। এটা অবশ্য পরমাণবিক স্তরের কথা। কিন্তু সাধারণ প্রত্যক্ষের স্তরে বস্তু আগেকার মতই নিরেট, অনড়ই রয়েছে। পরমাণবিক স্তরে বস্তুর চেহারা পরিবর্তিত হলেও, বৈজ্ঞানিকেরা আজও চেয়ার, টেবিল ও অন্যান্য পদার্থের বস্তুসত্তা অস্বীকার করেন না।

দ্বিতীয়ত, পরমাণবিক বস্তু আজ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে, আগেকার মত অবিভাজ্য, নিরেট আর নেই, তবুও 'বস্তু' অবস্তুতে—চৈতন্যে রূপান্তরিত হয়নি, এডিংটন, জীন্স্, রাধাকৃষ্ণণ প্রমুখ ভাববাদীরা যেটা দাবি করেন।

আজও শক্তিরূপী বস্তুর চৈতন্য-নিরপেক্ষ বস্তুসত্তা আছে এবং চৈতন্য বস্তুকে পরে জানে।

তৃতীয়ত, পরমাণবিক স্তরে বস্তুর চেহারা যে বদলে গেছে এটা সর্বজন-স্বীকৃত। স্থানকালপাত্র-নিরপেক্ষ সনাতন, নিত্যজ্ঞানও যে সম্ভব নয় এটা নিয়েও তর্কের অবসর নেই। কিন্তু এ থেকে প্রমাণিত হয় না যে "বস্তুসত্তা অলীক কল্পনামাত্র"। আমাদের চৈতন্যের বাইরে যে 'বস্তু' আছে এটা অবশ্য-স্বীকার্য সত্য। তবে বস্তুর স্বরূপ আমরা ক্রমে ক্রমে জানি এবং এভাবে ক্রমশ সত্যের দিকে অগ্রসর হই। এবং আমাদের এই জ্ঞান 'সার্থক জ্ঞান'—কারণ, এই জ্ঞানের সাহায্যে আমরা বাস্তবের সঙ্গে মোকাবিলা করি। জ্ঞানের আপেক্ষিকতা থেকে তাই বস্তুসত্তার হানি হয় না, 'বস্তু' অবস্তুতে রূপান্তরিত হল এটাও স্বীকার করা চলে না।

রাধাকৃষ্ণণ প্রমুখ দার্শনিকেরা "বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের জগতে ফাটল ধরেছে", "বিজ্ঞানের আজ সংকট"—একথা বলে, সেই রন্ধ্রপথে অতিপ্রাকৃত অতীন্দ্রিয় জগৎ থেকে নানারকম তত্ত্ব এনে হাজির করেছেন। এবং এসব তত্ত্বের পরিচয় ঘটে বোধির মাধ্যমে, এ দাবি পেশ করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল এই যে, বুদ্ধি-বিভ্রাট যদি স্বীকার করে নেওয়া যায়ও, তাহলেই অপরোক্ষানুভূতির দাবি জোরদার হয়ে ওঠে না। তাছাড়া, বোধির দাবি বিচার করবে কে? যদি বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্য বাদ দিয়ে বোধির দাবি স্বীকার করতে হয়, তাহলে নানামুনির নানামতের মত জ্ঞানের রাজ্যেও আসবে বিশৃঙ্খলা, কারণ রাধা-কৃষ্ণণের বোধি আর গান্ধীজীর অপরোক্ষানুভূতির মধ্যে কোনটা সঠিক, এটা বার করা যাবে না। আর, তাছাড়াও রাধাকৃষ্ণণ প্রমুখ দার্শনিকেরা বোধির গুণগান করতে বই লেখেন, যুক্তিতর্ক উপস্থাপিত করেন, নানাদিক থেকে অপরোক্ষানুভূতির সম্ভাব্যতা দেখান। অর্থাৎ যুক্তিতর্কের প্রাধান্য মেনে নিয়েই তাঁরা অপরোক্ষানুভূতির সমর্থন করেন। তাই যদি হয়, তবে "তর্ক অপ্রতিষ্ঠ" "বুদ্ধি সত্যের সাক্ষাৎ পায় না" একথা বলা নিরর্থক। হয় বুদ্ধি সব কিছুই জানতে, গ্রহণ করতে পারে, সত্যের সাক্ষাৎ পায়। নয়ত বুদ্ধি সর্বত্রগামী নয়; বোধিই সেখানে একমাত্র আশ্রয়। এ অবস্থায় মৌনতা ছাড়া অন্য রাস্তা আর নেই।

(৭) সাবেকী দার্শনিক মহলে ধারণা আছে যে কর্মমুখর সমাজজীবন নয়, নিঃসঙ্গতারই শুধু আনন্দ। এ সব দার্শনিকেরা নৈর্ব্যক্তিক সত্যশিবসুন্দরের 'উপাসক'; রাজনীতির চাইতে আত্মোপলব্ধি—প্রার্থনা—এ সবই এঁদের কাম্য। এঁদের দাবি হল 'অন্তরের দিকে ফের', 'অন্তরস্থিত পরমপুরুষটিকে

জানো', ধ্যানযোগে। এঁরা বহির্জগতের দিকে, সমাজের দিকে, সমাজ-জীবনের সমস্যার দিকে মুখ ফেরাতে ভয় পান। এঁদের মতে সমাজ-রূপান্তরের কথাটা বড় কথা নয়। জগৎকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে, অপরোক্ষানুভূতি দিয়ে বোঝা, ভূমার উপলব্ধি করাটাই আসল প্রশ্ন। রাধাকৃষ্ণণ এই ভাববাদীদেরই একজন। এঁদের মতে, যতই নৈর্ব্যক্তিকতায়, অবাস্তবতায় স্তরে ওঠা যাবে, ততই পরমতত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যাবে।

এ ধরনের মতবাদের ফল হল এই যে, পণ্ডশ্রম ছাড়া এদের আর কোন গুরুত্ব নেই। এ মতবাদের সমর্থকেরা যা কিছু সুখ, যুক্তিসম্মত, বিজ্ঞান সমন্বিত তার থেকে শেষ পর্যন্ত মুখ ফিরিয়ে নেন আর 'পরমতত্ত্ব', 'সর্বভূতান্তরাত্মা' নামে আলেয়ার পিছনে ছোটেন। সমাজ-সংস্কারের যতকিছু কর্মপন্থা ও আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সে সব আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁরা যোগ রাখতে পারেন না—ইতিহাসের রথকে আটকে রাখাতেই তাঁদের সব প্রতিভা নিঃশেষ হয়।

(৮) তাই দেখা যায় যে রাধাকৃষ্ণণের মত মনীষীও মার্কসবাদ সম্পর্কে সুবিচার করতে পারেন না। যে 'সত্যের সাধনা'য় এঁরা ব্যাপৃত, সেই সত্যকেও নিঃস্বার্থ, নিস্পৃহভাবে গ্রহণ করতে এঁদের বাধে। তাই রাধাকৃষ্ণণ নির্বিবাদে বলেন যে মার্কসবাদীরা শুধুই অন্নবস্ত্র, ঐহিক সুখ নিয়ে মাথা ঘামায়—অবশ্য এ সবের চরমমূল্য নেই, আছে শুধু উপকরণমূল্য। এটা অবশ্য ঠিক যে, মার্কসবাদীরা 'পরলোকের সত্য' নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে 'পার্থিব সত্য' নিয়েই মাথা ঘামায়। মার্কসবাদীরা মানবপ্রকৃতির মৌলিক সততায়, অভিজ্ঞতা, অভ্যাস এবং শিশুপালন ব্যবস্থায় সর্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাসী। মানুষের উপর বাইরের পরিস্থিতির প্রভাব, উৎপাদন ব্যবস্থার গুরুত্ব, জীবন-উপভোগের ঔচিত্য—এ সবও মার্কসবাদে স্বীকৃত। মার্কসবাদীরা ব্যবহারিক জগতকে এমনভাবে সংগঠিত করতে চায় যাতে মানুষ যা কিছু 'মানবীয়' তা অনুভব করতে পারে এবং নিজে 'মানুষের' মতই অনুভব করতে শেখে।

রাধাকৃষ্ণণ মার্কসবাদীদের নরপশুরূপে চিত্রিত না করলেও মার্কসবাদ যে "যতদিন বাঁচবে সুখে জীবনধারণ করবে, ঋণ করেও ঘি খাবে" এই ধরনেরই একটা মতবাদ, এমন ইঙ্গিত করেছেন। রাধাকৃষ্ণণ বোধ হয় জানেন না যে মার্কসবাদের আদর্শ সমষ্টিমুক্তি, ব্যক্তিমুক্তি তো বটেই। শোষণমুক্ত সমাজে সমষ্টিগত কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষ জ্ঞানে, কর্মে, প্রেমে সার্থক হয়ে উঠুক—

শিক্ষা-সংস্কৃতি, কৃষ্টির সরিক হোক—মার্কসবাদীরা এ লক্ষ্য নিয়েই কাজ করছেন। গেব্রিয়েল পেরী, ফুচিক্ ও অন্যান্য মার্কসবাদী শহীদদের জীবনকাহিনী জানলে রাধাকৃষ্ণণ স্বীকার করতেন কিভাবে মার্কসবাদীরা "আগামী দিনের সেই উজ্জ্বল উষার উদ্দেশ্যে" জীবন উৎসর্গ করে, ভাববাদীদের পুঁথির পাতার আদর্শকে প্রাণের বিনিময়ে বাস্তবে রূপ দিয়ে যায়।

তাছাড়া, 'চরম সত্য' ও 'আপেক্ষিক সত্য' নিয়ে রাধাকৃষ্ণণ যে প্রশ্ন তুলেছেন, সে প্রশ্নও বহু-আলোচিত এবং যাঁরাই লেনিন পড়েছেন, তাঁরাই এ প্রশ্নের উত্তর জানেন। রাধাকৃষ্ণণ লেনিন পড়েননি বোধ হয়, তা না হলে এ প্রশ্ন তুলে মার্কসবাদের স্ববিরোধিতা দেখাতে যাবেন কেন?

শেষ কথাটা এই যে, আজকের দিনে বহিঃপ্রকৃতি ও সমাজজীবন সম্পর্কে যে জ্ঞান সঞ্চিত হয়েছে তাতে বিজ্ঞানের উপর দাঁড়িয়ে দর্শন আলোচনা না করলে সে দর্শনের সার্থকতা সামান্য। বিজ্ঞান দেখিয়েছে যে জগৎ স্থিতিশীল নয়, গতিশীল—প্রবাহের মত। সমাজজীবনের বেলায়ও ঐ একই কথা। প্রকৃতির অন্তঃস্থলে, সমাজজীবনে বিরোধী-সংঘর্ষ সমাগম-সাম্যাবস্থা রয়েছে। কাজেই প্রকৃতিতে, সমাজে, নতুনের, অভিনবের আবির্ভাব। প্রকৃতির রাজ্যে, সমাজজীবনে, অস্পষ্ট পরিমাণগত পরিবর্তন সঞ্চিত হতে হতে, গুণগত মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয়। এ পরিবর্তন যখন সাপের চলার মত ক্রমিক ধারায় বয়ে চলে, তখন একে বলি 'ক্রমবিকাশ'; আর যখন পরিবর্তনের ধারা ব্যাঙের উল্লম্ফনের মতো উৎক্রান্তির ভঙ্গীতে প্রকাশিত হয় তখন এ পরি-বর্তনকে বলি 'বিপ্লব'।

এই পরিবর্তনের সঞ্চালকশক্তি হিসাবে কোন পরমাত্মা, চৈতন্যশক্তি, 'মনোময় পুরুষ' আমদানী করা নিষ্প্রয়োজন—কারণ, প্রকৃতির অন্তঃস্থলে বিরোধী সংঘর্ষ থাকায় জগতের গতিশীলতা অবধারিত।

বিজ্ঞানের দৌলতে আজ আরও জানা গেছে যে সমাজজীবনেও পরিবর্তন অবধারিত এবং এ পরিবর্তনের সঞ্চালকশক্তি হল উৎপাদনশক্তির বিকাশ। উৎপাদনশক্তির বিকাশের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধ্যানধারণা, ভাবাদর্শ সবেরই উৎপত্তি। আবার এ সব ভাবাদর্শও উৎপাদনশক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে। কাজেই এদের ভিতরকার সংঘর্ষ সমাগম থেকে সমাজজীবন এগিয়ে চলে, নতুন ধ্যানধারণার সৃষ্টি হয়, নতুন অর্থনীতি গড়ে ওঠে—ঘোরানো সিঁড়ির মত ইতিহাস অগ্রসর হয়—নতুন সমাজ, নতুন মানুষের ঘটে আবির্ভাব।

রাধাকৃষ্ণণ এ ধরনের বিজ্ঞাননিষ্ঠ দর্শনের কাছে যান নি। তাই আজকের দিনের ভারতের দার্শনিক—মুক্তিমন্ত্রের সাধক তিনি নন।

জুলিয়াস ফুচিকের অপ্রকাশিত চিঠি

চেকোস্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট নেতা জুলিয়াস ফুচিক গত যুদ্ধে বন্দীশালায় জার্মান ফ্যাসিস্টদের হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন। বন্দীশালা থেকে বন্ধুভাবাপন্ন এক বন্দীর সাহায্যে তিনি যেসব চিঠি পাঠিয়েছিলেন সে দেশ স্বাধীন হবার পর সেগুলি একত্র করে "ফাঁসীর মঞ্চ থেকে" (বাংলা অনুবাদ : ন্যাশনাল বুক এজেন্সী : কলকাতা) নাম দিয়ে বই বার করা হয়েছে। বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ ও শান্তি আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে এই বই এবার "বিশ্বশান্তি পুরস্কার" লাভ করে। এই বইয়ে নেই এমন কতকগুলি চিঠি ফুচিকের স্ত্রী গুস্তা ফুচিকোভার সহায়তায় কিছুদিন আগে "ম্যাসেস এণ্ড মেনস্ট্রীম" নামে প্রগতিশীল আমেরিকান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নিচে সেগুলি অনুবাদ করে দেওয়া হল।

গুস্তিনা-কে লেখা

প্রিয়তমা আমার,

হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া নদীর ঢালু পাড়ের ওপর ঠেস্ দেওয়া রোদ্দুরে দুটি ছোট্ট শিশুর মত দু'জনে হাত ধরে আর কোনদিন যে আমরা বেড়াতে পারবো, তার আশা কম। আবার কোনদিন যে আমি সুখে শান্তিতে লিখতে বসব, বন্ধুর দিয়ে আমাকে ঘিরে রাখবে বই; আবার কোনদিন যে আমি লিখব সেই সব কথা, দুজনে আমরা যা দিনের পর দিন বসে আলোচনা করেছি, পঁচিশটা বছর ধরে যত কিছু আমার মধ্যে জমা হয়েছে, অঙ্কুরিত হয়েছে যত কিছু—তার আশা কম। আমার বইগুলোকে কবর দিয়ে ওরা এরই মধ্যে আমার জীবনের একটি অঙ্গ খসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু হাল আমি কিছুতেই ছাড়বো না; হার মেনে নিয়ে জীবনের অঙ্গ অঙ্গটাকেও ২৬৭ নম্বরের এই শাদা কুঠুরীতে একেবারে নিঃশেষে মাটিতে মিশিয়ে দিতে আমি রাজী নই। তাই মৃত্যুর কাছ থেকে চুরি করে আনা এই সময়টুকুতে আমি চেক সাহিত্য নিয়ে লিখছি। সেই লেখাগুলো যে তোমাদের হাতে পৌঁছে দেবে, তার কথা যেন কোনদিন এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলে যেও না। সে ছিল বলেই মৃত্যু আমাকে পুরোপুরি গ্রাস করতে পারে নি। তার দেওয়া কাগজ-পেন্সিল আমার মধ্যে যে আবেগ জাগায়,

একমাত্র প্রথম প্রেমই তা পারে। শব্দগুলোকে বাক্যের ছাঁচে ঢালতে গিয়ে চোখ আমার খুলে যায়; আমি অনুভব করি, স্বপ্ন দেখি। মৌলিক মালমশলা ছাড়া গবেষণা ছাড়া লেখা শক্ত হবে। কাজেই যা আমার সামনে এত স্পষ্ট এবং এত কাছের জিনিস বলে মনে হচ্ছে যে হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারি—যাদের জন্যে আমি লিখছি, তাদের কাছে হয়ত সেটা অস্পষ্ট এবং অবাস্তব বলে মনে হবে। তাই সবার আগে, প্রিয়তমা আমার, আমি তোমার কাছেই লিখছি। তুমি আমার প্রথম সহযোগী, প্রথম পাঠক। আমার বলবার কথা তুমিই সব থেকে ভাল বুঝবে; সম্ভবত দাদা আর আমার পক্ককেশ প্রকাশকের সঙ্গে বসে তুমিই ফাঁকগুলো দরকারমত ভরিয়ে নিতে পারবে। আমার হৃদয় আর মগজ গিজগিজ করছে, দেয়ালগুলোই শুধু ফাঁকা। লিখছি সাহিত্য নিয়ে, অথচ এখানে চোখ বুলোবার মত একটা চটি বইও নেই। কী বিশ্রি লাগে!

সব কিছু মিলিয়ে সত্যিই ভাগ্যের এ এক অদ্ভুত পরিহাস। তুমি তো জানো আকাশ আর মাটিকে, রোদ্দুর আর হাওয়াকে কী ভালই না আমি বাসতাম। এদের বুকে জড়িয়ে যা কিছু বাঁচে—পাখীই হোক আর বন-বাদাড়ই হোক, মেঘই হোক আর মুসাফিরই হোক—সবার সঙ্গে মিশে যাবার কী দুরন্ত বাসনা ছিল আমার। তবু বছরের পর বছর একটানা দীর্ঘদিন আমি পা-ঢাকা দিয়ে থেকেছি—যেমন করে আত্মভোলা বিবর্ণ শিকড়ের দল অন্ধকার আর অবক্ষয়ের মধ্যে ডুবে থেকে জীবনের উদ্ভিন্ন মহীরুহকে তুলে ধরে। সে-ই তাদের গর্ব। সে গর্ব আমারও। কোন খেদ নেই আমার—কোন ক্ষোভ নেই। আমি লড়েছি পরিপূর্ণতার জন্যে। হাসিমুখেই লড়েছি। কিন্তু সব চেয়ে ভালবেসেছিলাম আমি তিমিরভেদী জ্যোতির্ময় আলোকে। যদি আমি তার কোলে বড় হতে পারতাম, বুক টান করে যদি পারতাম আকাশে মাথা তুলতে—কী ভালই না হত।

তবে তাই হোক।

যে মহীরুহকে আমরা কাঁধ দিয়ে ঠেলে তুলেছি, তার শাখায় শাখায় পল্লবিত হবে, মুকুলিত হবে, ফলবান হবে মানুষের এক নতুন ভাবীপুরুষ—শ্রমিক, কবি আর সেই সঙ্গে সাহিত্যসমালোচক আর ঐতিহাসিকদের সমাজতান্ত্রিক উত্তরপুরুষ। আমি যা বলে যেতে পারলাম না, কালক্রমে সেই কথাই বলে যাবে, অনেক ভালভাবে বলে যাবে এই নতুন মানুষের দল।

আমার পর্বতমালায় যদিও আর তুষার ঝরে পড়বে না, তবু আমার জীবনের ফল মধুময় হবে, পরিপক্ক হবে একদিন। *

প্যাঙ্করাটস, ২৬৭ নং সেল, ২৮শে মার্চ, ১৯৪৩

মা, বাবা, লিবা, ভেরা—প্রিয়জনেরা,

দেখেই বুঝবে, আমি ডেরা বদলেছি। আছি এখন বাউৎসেন বন্দীশালায়। ইস্টিশান থেকে আসতে দেখলাম বেশ ঝকঝকে তকতকে শহর—হৈ হট্টগোল নেই। বেশ লাগল। জেল-খানাটাও মন্দ নয়—অবশ্যই বন্দীদের পক্ষে জেলখানা যতটা ভাল লাগা সম্ভব। পেটস্‌চেক প্যালেসের সেই ভূতের তাণ্ডবের পর এখানকার আবহাওয়া বড় বেশী জুড়িয়ে-যাওয়া বলে মনে হচ্ছে। কেননা, এখানে আমরা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা সেলে বন্দী। যাই হোক হাতে কাজ থাকলে সময় কোথা দিয়ে চলে যায় তার ঠিক থাকে না। এই সঙ্গে সরকারী যে নিয়মাবলী পাঠাচ্ছি তাতে দেখতে পাবে এমন কি দু'চারটে পত্রিকাও আমি পড়তে পারি। কাজেই একঘেয়েমির অভিযোগ করতে পারি না। একঘেয়েমির কথাই যদি ওঠে, তাহলে বলব—একঘেয়েমি জিনিসটা মানুষের নিজেরই সৃষ্টি। কিছু লোক আছে যারা এমন সব জায়গায় গিয়ে বিরক্তি বোধ করে, যেখানে অন্য লোকে সুন্দরভাবে সার্থক জীবন কাটায়। আমার তো যে-কোন জায়গায় জীবন অদ্ভুত ভাল লাগে—এমন কি জেলখানাতেও। যেখানেই তুমি যাও শেখবার কিছু না কিছু পাবেই। এমন কিছু পাবে, যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে—অবশ্যই তোমার সামনে যদি ভবিষ্যৎ বলে কিছু থেকে থাকে।

তোমাদের সব খবর তাড়াতাড়ি জানাও। এই সঙ্গে সরকারী যে নিয়মাবলী পাঠালাম, সেই অনুযায়ী কাজ করো। অর্থাৎ কোন পার্শেল পাঠিও না। বড় জোড় আমার নামে ওপরের ঠিকানায় দুচারটে টাকা পাঠাতে পারো। তোমরা সবাই আমার অন্তরের অভিনন্দন নিও। আবার

*ফুচিক এখানে চেক সমালোচক এফ. এক্স. শাল্‌দা-র উক্তি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন: "আমার ফল এমন জাতের যা বেশাদিন পাকা থাকে না; দুঃখের প্রান্তর যখন কানায় কানায় কুয়াশায় ভরে যায়, তখন সেই ফল মধুময় হয়ে ওঠে। যখন পর্বতমালা প্রথম তুষারে ঢেকে যাবে, তখনই অন্ধকার বদ্ধ জলা থেকে কুয়াশা উঠে আসবে।"

আমাদের দেখা হবে, এই আশা নিয়ে তোমাদের আমি চুম্বন আর আলিঙ্গন জানাচ্ছি। তোমাদের জুলা।

বাউৎসেন, ১৪ই জুন, ১৯৪৩

আমার প্রিয়জনেরা,

সময় কী ঝড়ের বেগেই না বয়ে যায়। এখান থেকে তোমাদের প্রথম যে চিঠি লিখেছি, মনে হচ্ছে যেন এই তো সেদিন। আবার আজ টেবিলে কালিকলম নিয়ে বসেছি।...একটা মাস চলে গেছে। পুরো একটা মাস। তোমরা হয়ত ভাবতে পারো, জেলখানায় বুঝি সময় কিছুতেই কাটতে চায় না। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। বরং উল্টো। প্রত্যেকটি ঘণ্টা আঙুলে গোণা যায়। স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় একেকটি ঘণ্টা কত ছোট, কত ছোট একেকটি দিন, একেকটি সপ্তাহ—কত ছোট গোটা জীবনটা। আমার সেলে আমি একদম একা, তবু নিঃসঙ্গ লাগে না। চারদিকে আমার ভালো ভালো সব বন্ধু: বই, আমার বোতাম বানানোর কল আর ভারি ভালমানুষ সঙ্গী আমার মোটা মাটির কলসিটি। কলসিটাকে দেখলে আমার আনন্দোচ্ছল ভূপের কথা মনে পড়ে যায়। জলের চেয়ে মদ দিয়ে ভরলেই তাকে মানাত ভালো। আর আমার সেলটার একেবারে শেষ প্রান্তে আছে একটি ছোট্ট মাকড়সা। আমার এইসব বন্ধুদের সঙ্গে বসে আলোচনা করবার মত, ভাববার মত, গাইবার মত কত কিছু যে আছে, তা বললে কেউ বিশ্বাসই করবে না। বিশেষ ক'রে বোতাম বানানোর কলটা সব সময় আমার ঠিক মেজাজ বুঝে কথা বলে—আমরা পরস্পরকে খুব ভালভাবেই বুঝি। আমি যখন ওকে পালিশ করতে ভুলে যাই, শুধুমাত্র তখনই সে মাঝে মাঝে আমার ওপর বিরক্ত হয়। আর যতক্ষণ ও আমার কাছ থেকে আদরযত্ন না পাচ্ছে ততক্ষণ ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে। এ ছাড়াও আরও বন্ধু আছে আমার। সেলে নয়, বাইরে যেখানে রোজ আমরা বেড়াই, সেই উঠোনে। উঠোনটা বড় নয়; তবে পাঁচিলটার ঠিক ওপারেই প্রকাণ্ড এক বাগান। সেখানে অনেকদিনের পুরনো বড় বড় সব গাছ। আমাদের ছোট্ট উঠোনের জমি-টুকুতে হরেক রকমের ঘাস আর ফুল—এতটুকু জায়গায় এত গাছপালা জড়াজড়ি করে থাকতে কখনও দেখিনি। কখনও মনে হয় কোন পাহাড়তলীর সবুজ প্রান্তর, কখনও মনে হয় গরু-চরানোর মাঠ। প্যান্সি ফুটে আছে

এখানে ওখানে। সুন্দর সুন্দর পুতুলের মত ডেইজি ফুল, ব্লুবেল আর কালো-চোখ সুসান আর এমন কি কার্ন—তারা যেন নিছক অনাবিল আনন্দ। তাদের সঙ্গেও অনেক বিষয়ে কথা বলার আছে। এমনি করে লঘু পাখায় ভর ক'রে উড়ে যাচ্ছে দিন, উড়ে যাচ্ছে সপ্তাহ। একটা মাসও শেষ কেটে গেল।

পুরো একটা মাস কেটে গেল। তবু তোমাদের কোন চিঠি নেই। হপ্তা কয়েক আগে শিবা-র পাঠানো দশ রাইখমার্ক টাকার রসিদে সই করেছি। তাইতেই জানতে পারলাম তোমরা আমার শেষ চিঠি পেয়েছো, আমার ঠিকানাও তোমাদের অজানা নয়। এ পর্যন্ত তোমাদের কাছ থেকে কোন চিঠিই পেলাম না। হয়ত রাস্তায় খোয়া গেছে। আমাকে তোমরা চিঠি লিখো, লিখো কিন্তু, মাসে একবার তো লিখতেই পারো। তোমাদের খবরাখবর কী, কেমন ক'রে দিন কাটাচ্ছো লিখো। গুস্তিনার খবর দিও। তোমাদের সবাইকে চুম্বন আর আলিঙ্গন। আবার একদিন দেখা হবে। তোমাদের জুলা।

বাউৎসেন, ১১ই জুলাই ১৯৪৩

সোনা-মানিকেরা,

আগের মতই আছি। সময় উড়ে চলেছে। আর আমি তোমাদের কথা মত "মনের শান্তি" বজায় রেখেছি। বজায় না রাখার তো কোন কারণ দেখি না। আমি তোমাদের দুটো চিঠিই পেয়েছি। তোমাদের চিঠি পেলে মন আমার আনন্দে ভ'রে ওঠে। মানুষ চিঠির মধ্যে কত কী যে চায় কত কী যে পায়—তোমরা ভাবতেই পারো না। এমন কি যা তোমরা লেখোনি তাও। তোমাদের কাছে আমার এত কথা বলবার আছে, কিন্তু কাগজ যে কিছুতেই বড় হতে রাজী নয়। আমার হাতের লেখা নিয়ে তোমরা কত খোঁটাই না দিতে। অন্তত এখন তোমরা আমার খুদে খুদে অক্ষর দেখে খুশিই হবে। এই চিঠির অর্ধেক গুস্তিনার। কেটে নিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিও। তবে তোমরা অবশ্যই আগে পড়বে। ও চিঠি তোমাদের জন্যেও লেখা। আমার মানিকেরা, যখন তোমরা গুস্তিনাকে চিঠি লিখবে, আমার ঠিকানাটা তাকে পাঠিয়ে দিও। সে যেন আমাকে চিঠি লেখার জন্যে অনুমতি চায়। তোমাদের চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে তোমরা

ভাবছ, যে-লোকটার মাথার ওপর ফাঁসীর পরোয়ানা ঝুলছে তার বুঝি ও ছাড়া আর কোন চিন্তা নেই। ঐ এক চিন্তাতেই যেন সে নিজেকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। ঠিক বুঝছ না তোমরা। আমি একেবারে শুরু থেকেই মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। আমার ধারণা, ভেরা তা জানে। তোমরা নিশ্চয় আমাকে কখনও তা নিয়ে যন্ত্রণা পেতে দেখনি। ও বিষয়ে আমি একেবারেই মাথা ঘামাই না। যারা বেঁচে থাকল, পেছনে পড়ে রইল যারা—মৃত্যু শুধু তাদের কাছেই বড় নিষ্ঠুর। তাই আমি চাই তোমরা শক্ত হও, সাহসে বুক বাঁধো। তোমাদের সকলকে আমার চুম্বন আর আলিঙ্গন। আবার দেখা হবে। তোমাদের জুলা।

বাউৎসেন, ৮ই আগস্ট, ১৯৪৩

প্রিয় গুস্তিনা আমার,

এইমাত্র তোমাকে চিঠি লেখার অনুমতি পেয়েই লিখতে বসেছি। লিবা লিখেছে তুমি ভেরা বদলেছো। এ কথা কি তুমি ভেবে দেখেছো, প্রিয়তমা আমার—আমরা আর পরস্পর থেকে দূরে নই? ভোরবেলায় যদি তুমি টেরেজিন থেকে পায়ে হেঁটে উত্তর দিকে রওনা হও, বাউৎসেন থেকে আমি রওনা হই দক্ষিণে—তাহলে সন্ধ্যে নাগাদ আমাদের দেখা হবে। কাছাকাছি এসে দুজনে কী ছোটাই না ছুটব। আমরা এমন সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, যেখানে আমাদের পরিবারের অনেক স্মৃতি জড়ানো। তুমি আছো টেরজিনে যেখানে আমার কাকা* বিরাট খ্যাতিলাভ করেছিলেন। আর আমাকে নিয়ে যাবে ওরা বার্লিনে—যেখানে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। আমি অবশ্য মনে করি না, ফুচিক পরিবারের সবাইকেই বার্লিনে মরতে হবে। লিবা হয়ত তোমাকে লিখেছে—একা আমি একটা সেলে আছি, বোতাম বানাতে হচ্ছে আমাকে। আমার সেলের নীচের দিকের এককোণে আমার একটা ছোট্ট গাছগাছড়া আছে আর বাইরে আমার জানলার ওপর একজোড়া রবিন পাখী বেশ আরামে নীড় বেঁধেছে। কাছে, কত কাছে থেকে আমি তাদের শিশুর মত মিষ্টি কাকলি শুনি। তারা তাদের ডিম ফুটিয়ে বাচ্চার জন্ম দিয়েছে, দাম্পত্য জীবনের কতই না তাদের দুর্ভাবনা ছিল। ওদের দেখি আর তোমার কথা মনে পড়ে যায়। সেই যে তুমি মানুষের মুখের কথায়

* সুরকার জুলিয়াস ফুচিক

আমাকে পাখীর ভাষা বুঝিয়ে দিতে। প্রিয়তমা আমার, প্রহরে প্রহরে তোমার সঙ্গে আমি কথা বলি। সেইদিনের জন্তে আমি সকাতরে প্রতীক্ষা করে আছি, যেদিন মুখোমুখি বসে তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারব। তখন কত কথা জমে থাকবে দুজনে দুজনকে বলবার। প্রিয়তমা আমার, সাহসে বুক বাঁধো, শক্ত হও। তোমাদের সবাইকে আমার চুম্বন আর আলিঙ্গন। যতদিন না আবার দেখা হয়। তোমাদের জুলা।

বাউৎসেন, ৮ই আগস্ট, ১৯৪৩

প্রিয় দুলালীরা,

হয়ত তোমরা ইতিমধ্যে জেনেছো, বার্লিনে আমাকে নিয়ে আসা হয়েছে। ২৩শে আগস্ট আমি যখন তোমাদের চিঠির আশায় পথ চেয়ে আছি, তখন তোমাদের চিঠির বদলে এল বার্লিনে যাবার ডাক। ২৪শে আগস্ট পোলিৎস্ আর কট্‌বাস্ হয়ে আমি তখন বার্লিনের যাত্রাপথে। ২৫শে আগস্ট সকালে বিচার বসল। দুপুর না হতেই সব শেষ। যা ভাবা গিয়েছিল হুবহু তাই হল। এখন প্লট্‌জেন্‌সি জেলে এক সেলের মধ্যে আমি আর আরেকজন বন্ধু। আমরা কাগজের ঠোঙা বানাই আর গান গাই। আর আমাদের পালা কবে আসবে তারই অপেক্ষা করি। আর হপ্তা কয়েক আছে। কখনো কখনো সপ্তাহকে মাস বলে মনে হয়। শুকনো পাতার মত আস্তে চুপিসাড়ে আশা ঝরে যায়।

যারা কল্পনাবিলাসী, তাদের অনেকেই সেই ঝরে-পড়া দেখতে দেখতে মরীয়া হয়ে উঠত। কিন্তু তাতে গাছের কিছু যায় আসে না। এটা তো খুবই স্বাভাবিক, নেহাৎই মামুলি ব্যাপার। শীত যখন আসে গাছের মত মানুষকেও সে আগে থেকে গড়ে পিটে তৈরী করে নেয়। বিশ্বাস করো কেউই আমার অন্তরের আনন্দ কেড়ে নিতে পারেনি, কেউই নয়। আমার ভেতরকার সেই আনন্দ বিঠোফেনের সুরে সুর মিলিয়ে প্রতিদিন আমার সঙ্গে কথা কয়। মুণ্ডুটা কেটে বাদ দিলেও মানুষ কখনও খাটো হয় না। সব কিছু শেষ হয়ে যাবার পর তোমরা আমাকে যখন স্মরণ করবে শোক ক'রো না— যে আনন্দ নিয়ে আমি চিরদিন বেঁচে থেকেছি, মনে সেই আনন্দ নিয়ে আমাকে তোমরা স্মরণ করবে—অন্তরের অন্তস্তল থেকে আমি তাই চাই। লোকে যখন চলে যায়, তখন কোন না কোন সময়ে দরোজায় খিল পড়ে। খুব

ভাল করে ভেবে দেখো বাবাকে এ খবর দেওয়া, এমন কি এ সম্বন্ধে আকারে-ইঙ্গিতে কিছু বলাও ঠিক হবে কিনা। বুড়ো বয়সে তাঁকে কষ্ট না দেওয়াই বোধহয় ভাল। তোমরা নিজেরা যা ভাল বোঝো, তাই ক'রো—এখন তোমরাই হলে মা আর বাবার অনেক বেশী আপন।

গুস্তিনার খবর যা জানো লিখে পাঠাও। তাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন দিও। তাকে ব'লো যেন সে বরাবর নির্ভীক, বরাবর শক্ত থাকে; তার যে অগাধ ভালবাসা আজও আমি অনুভব করি, সেই ভালবাসা নিয়ে সে যেন নিঃসঙ্গ না থাকে। তার অজস্র যৌবন আর অনুভূতি আছে, তাই বৈধব্য বরণ করার অধিকার তার নেই। আমি চেয়েছিলাম সে সুখী হোক। আমি চাই আমার অভাবেও সে সুখী হোক। সে বলবে, তা হয় না। কিন্তু হয়। প্রত্যেকটি মানুষের জায়গা অন্যজন নিতে পারে। কাজের ক্ষেত্রে, অন্তরের হৃদয়ে। কিন্তু তাকে যেন এখনই এসব লিখো না। আগে সে ফিরে আসুক—যদি একান্তই সে ফিরে আসে। তোমরা নিশ্চয় জানতে চাও, জানতে চাও বৈকি, কেমন করে আমি দিন কাটাচ্ছি। বেশ ভালই কাটছে। এখানেও হাত আমার খালি নয়, তাছাড়া সেলের মধ্যে আমি একা নই, কাজেই সময় কেটে যাচ্ছে—আমার সঙ্গীটির মতে যেন একটু বেশী তাড়াতাড়ি কাটছে।

আমার প্রিয় স্বজনীয়া, তোমরা আমার আবেগভরা আলিঙ্গন ও চুম্বন নিও। আর—যদিও এ সময়ে শুনতে একটু কেমন কেমন লাগবে—যতদিন দেখা না হয়, তোমাদের জুলা।

বার্লিন, প্রটজেনসি ৩১শে আগস্ট, ১৯৪৩

খুঁজে-পাওয়া

রমেশচন্দ্র সেন

এ কি বলছ তুমি, দেবু? —বলিয়া হোমেন বন্ধুর দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকায়।

টেবিলের বিপরীত দিক হইতে মৃদু বেগুনী আলো আসিয়া পড়িয়াছে বন্ধু দেবকুমারের মুখে। সদ্য বার্নিশ করা টেবিলে সবিতার ছোট্ট ছবির উপর সেই আলো। মনে হয় সে মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

এ কী তবে পরিহাসের হাসি?

প্রকাণ্ড ঘর, হল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মেঝে শ্বেত পাথরে মোড়া। দক্ষিণে কালো কালো থামওয়ালা বারান্দা, তারপর একটু বাগান। সেখান হইতে হাস্নু-নো-হানার গন্ধ আসে, আসে পাতার সর্‌ সর্‌ শব্দ।

টেবিলটা ঘরের প্রায় মাঝখানে। তার দুই দিকে দুই জন, পুবে দেবকুমার, পশ্চিমে হোমেন। পুব-দক্ষিণ কোণে চামড়ার গদি মোড়া দুটা সোফা। উত্তরের দেয়ালের পাশে স্টিলের হোয়াটনটে আইনের মোটা মোটা বই। দেবকুমারের হাতের কাছে রিভলভিং কেসে কতগুলি বাঁধান ল-রিপোর্ট।

টেবিলে সবিতার ছবি ভিন্ন আর আছে রাধাকৃষ্ণণের গীতা, দোয়াতদানি, চন্দন কাঠের তৈরি দুইটি পেপারওয়েট। দেয়ালে দুখানি মাত্র ছবি, আর সেণ্ট টমাসের বড় একটা ঘড়ি।

বাহুল্যবিহীন কিন্তু সুন্দর দামী এই আসবাব যেমন গৃহস্বামীর মার্জিত রুচির পরিচায়ক, তেমনই পরিচায়ক তার ব্যক্তির। এই সুশ্রীতার পিছনে ছিল আরও একখানি হাত, আর একজনের কল্পনা। সে তার স্ত্রী সবিতা, প্রাসাদোপম বাড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া আসবাবপত্র সবই সে নিজের পছন্দমত কিনিয়াছে, তৈরি করাইয়াছে। স্বামীর সঙ্গে ক্ষুদ্র মতবিরোধ হইলে একটু মিষ্টি হাসিয়া তাকে নিজের মতে আনিয়াছে। হয়ত দু'একবার ধমকও খাইয়াছে, কিন্তু তার ঠোঁটের এই হাসিটুকু কখনও মিলাইয়া যায় নাই।

অন্তদিন মক্কেলের কলরবে ঘরখানা গমগম করে, নানা জাতির মক্কেল—বাঙালী সিন্ধী ইহুদী মাড়োয়ারী ভাটিয়া। আসে বড় বড় সাহেব কোম্পা

নীর রিটেইনার উকিলরা। পাশের ঘরে টাইপিষ্টদের মধ্যে টাইপ করার প্রতিযোগিতা লাগিয়া যায়। আর এক ঘরে কাজ করে দেবকুমারের জুনিয়ররা। আইনের বই ঘাঁটে, লালনীল পেন্সিল দিয়া নথিপত্র দাগায়।

দেবকুমার হাইকোর্টের নামী ব্যারিষ্টার, বয়স ৪১।৪২। এর মধ্যেই অভিরুচি প্রত্যাখ্যানের মতন অর্থ ও মর্যাদা সে অর্জন করিয়াছে।

আজ সবিতার প্রথম বাৎসরিক শ্রাদ্ধ তিথিতে কেরানী ও জুনিয়রদের ছুটি। মক্কেলদের আগেই জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সেনসাহেব আজ কাজ করিবেন না।

যাঁরা এই খবর জানেন না দরোয়ান কেশরী সিং সদরের ফটক হইতে তাঁদের ফিরাইয়া দিতেছে।

সকালে দেবকুমার দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গায় স্নান করিয়াছে, স্নানান্তে দেবীমন্দিরে স্ত্রীর আত্মার জন্য প্রার্থনা করিয়াছে, ভিখারীদের দিয়াছে একটি করিয়া টাকা।

সাহেবের বৌ মরে গেছে, আজ তার শ্রাদ্ধ। টাকা দিচ্ছে সেই জন্য—তার ড্রাইভারের মুখে ইহা শুনিয়া একটি ভিখারী চেঁচাইয়া উঠিল, শালা বড়লোকের বউগুলো সব অক্কা পায় না!

হোসেন ঈশ্বর মানে না, পদ্মামান পূজার্চনায় বিশ্বাস করে না, তাই সঙ্গে যায় নাই।

সন্ধ্যায় পরেশ ধর আসিয়া গান গাহিয়াছে, তখন দুজনেই বারান্দায় বসিয়াছিল। পরেশ সুকণ্ঠ, রবীন্দ্রসঙ্গীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সে অনেক গান শুনাইল, বার দুই তিন গাহিল—

হে মহাজীবন, হে মহামরণ—

আজ দেবকুমার কাহাকেও নিমন্ত্রণ করে নাই। শুধু তারা দুইজনে মৃতার স্মৃতিতর্পণ করিতেছে।

দেবকুমার বলে, এতে আর কারও অধিকার নেই। তা ছাড়া মানুষের ঝামেলা ভালও লাগে না।

গানের পর কিছুক্ষণ হইল উভয়েই ঘরে আসিয়া বসিয়াছে। চলিতেছে সবিতার কথা; তার রুচি, বুদ্ধি, তার চরিত্রের মাধুর্য। স্বর্গতার প্রশংসায় উভয়েই মুখর।

প্রথমে বেসুরো কথা বলিল দেবকুমার।

সাধনা করলে সবিতা একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী হতে পারত, বাংলার সব চেয়ে সেরা নারী শিল্পী—হোমেনের এই কথার উত্তরে সে কহিল, উঁহু।

হোমেন বলিল, এ সম্পর্কে তুমি বরাবরই তার উপর অবিচার করেছ।

অবিচার!

হ্যাঁ, তার ভিতরের শিল্পীসত্তাকে মাটি করেছ তুমি। তুমি বাধা না দিলে—হোমেন কথার মাঝপথে থামিয়া গেল।

দেবকুমার এই আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে মনে করিত স্ত্রীর শিল্প-সাধনায় বরং আনুকূল্যই করিয়াছে। তার অর্থের প্রাচুর্য ছিল সেই সাধনার অনুকূল। সে বলিল, চুপ করে গেলে যে? পুরোপুরি বলেই ফেল।

বন্ধুকে আঘাত দিয়া হোমেন সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল। তার ইচ্ছা ছিল না যে আরও আঘাত করে কিন্তু দেবকুমারের যেন জিদ চাপিয়া গেল। সে বলিল, বল, চেপে যেও না। আমি চাই আমাদের ভিতরে বোঝাপড়ায় কোন ভুল থাকবে না, ময়লা থাকবে না।

বরাবরের মতন বন্ধুদের এই বোঝাপড়াও যে কতটা টানসহ হোমেন তাহা জানিত তবুও চাপে পড়িয়া বলিল, তোমার ইচ্ছা ছিল না যে সে এক জন নাম করা শিল্পী হয়।

হাউ ফুলিশ—দেবকুমার বেশ একটু জোরেই বলিয়া উঠিল। দশ পনর সেকেণ্ড পরে আবার বলিল, তার ভিতরে স্পার্ক ছিল না, যে স্পার্কে আগুন জ্বলে। আর, আর ছিল না তোমার উপর আস্থা।

হোমেন কহিল, কি রকম?

তোমার প্রতিভা স্বীকার করা ত দূরের কথা, ছবি সম্পর্কে তোমার মতামত শুনে সে হাসত। বলত, হোম আলেয়ার পিছনে ছুটছে।

আমার—আমার কিন্তু বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। হোমেনের গলা কাঁপিয়া গেল।

দেবকুমার এবার আর একটু জোর দিয়া বলিল, শুধু অবিশ্বাস নয়, ঠাট্টাও করত।

ঠাট্টা!

হ্যাঁ, মাঝে মাঝে আমার কাছে মনের কবাট খুলে দিত কিনা—দেব কুমারের ইহা বলার পিছনে ছিল স্বামীত্বের গর্ব, হয়ত বা বন্ধুকে খোঁচা দেওয়ার আনন্দ।

হোমেন বলিল, কি বলত সে ?

বলত, আলখাল্লা পরে হোম অবন ঠাকুর হতে চায়। হোয়াট এ পিটি !

আর, আর কিছু ?

হ্যাঁ, তোমায় নাকি ক্লাউনের মত দেখায়, বিশেষ করে ঝুলফি রাখার জন্য।

হোমেন ত অবাক। সবিতা তাকে ক্লাউন বলিত, ইহাও বিশ্বাস করিতে হইবে ? দেবকুমার তার মুখের উপর একথা বলিল কেমন করিয়া ? এত দিনই বা গোপন করিয়াছিল কেন ?

ইয়াঙ্কি প্যাটার্ণের কাচের বড জানালার ভিতর দিয়া তার মুখের উপর চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছিল। তার ভিতরের বেগুনী আভায় মুখখানাকে এবার যেন করুণ করিয়া তুলিল।

দেবকুমার বন্ধুর এই রূপ দেখিতে চাহিয়াছিল কিনা নিজেও জানে না কিন্তু স্ত্রীর স্মৃতিবাসরে তার এই করুণ মূর্তি তাকে পীড়া ত দিলই না সে বরং একটু আনন্দ বোধ করিল।

আর ঠিক এই সময় হোমেন ভাবিতেছিল—স্নিগ্ধ লাবনিতে ভরা চলচলে একখানা মুখ, শিশুর মতন সরল, মিষ্টি মিষ্টি হাসি। এই হাসিই ছাত্রজীবনে তাকে ও দেবকুমারকে আকৃষ্ট করে। তিন জনে একসঙ্গে বি, এ পড়িত। হোমেনরা তাকে নিজেদের মধ্যে ডাকিত 'লিটল বার্ডি' বলিয়া।

এই মিষ্টি হাসিকে রূপ দিতে যাইয়াই হোমেনের শিল্পীজীবন শুরু হয়। এর আগেও সে ছবি আঁকিত, সে-ছবি ছিল রেখার পর রেখা টানিয়া যাওয়া। 'লিটল বার্ডি' তার প্রথম সার্থক সৃষ্টি।

পাঁচ ছয়খানা ছবি আঁকিয়াই শিল্পী-সমাজে সে কিছুটা খ্যাতি অর্জন করে। তার ছবিগুলি ছিল নূতন ধরনের। শুধু নরনারীর চোখমুখ আঁকা নয়, মানুষের ভিতরকার চরিত্রকে ফুটাইয়া তোলাই ছিল তার ছবির বৈশিষ্ট্য। এমন কি জঙ্গলের ছবিতেও সে গাছের পর শুধু গাছই সাজাইত না, কতগুলি গাছের সামগ্রিক জীবন-সত্তা প্রকাশ করিত। কোথায়ও ফুটিত বনানীর গাম্ভীর্য, কোথাও বা ধ্বনিয়া উঠিত ঝরা পাতার চাপা কান্না।

সে বলিত, এই প্রাণময়তার সঙ্গে তার পরিচয় সবিতার মধ্য দিয়া।

সবিতা একদিন বলে, তোমার জীবনে তা হলে আমারও কিছুটা প্রয়োজন ছিল, হোম ?

সার্থক শিল্পীর প্রয়োজনে আসিয়া সবিতা আনন্দ পায় প্রচুর। এব

কিছুদিন পরে তারও শখ হয় ছবি আঁকার। সে হোমেনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। তার ভিতরে একটা সহজ শিল্পবোধ ছিল। অল্পেই উহা ফুটিয়া উঠিল। সে কয়েকখানি ছবি আঁকিল। হোমেন বলিল, খাসা হয়েছে।

তার তিন চার খানা ছবি একজিবিশনে প্রদর্শিত হয়। এই দুই শিল্পী নিজেদের মধ্যে গড়িয়া তোলে এক নূতন জগৎ, রং ও তুলির, রেখা ও কল্পনার স্বপ্নরাজ্য।

বন্ধুরা ভাবিয়াছিল পরস্পরকে বিবাহ করিয়া এই কল্পনালোককে তারা বাস্তব করিয়া তুলিবে। দেবকুমারও ঐরূপই ভাবিত। বছর ছয় সাত পরে সবিতা কিন্তু দেবকুমারের গলায় মালা পরাইল। দেবকুমার তখন কলিকাতা বারের একজন উদীয়মান ব্যারিষ্টার, নিজের রোজগারের টাকায় এর মধ্যেই দশ হাজার টাকা দিয়া গাড়ী কিনিয়াছে, জমি কিনিয়াছে পণ্ডিতিয়ার কাছে।

হোমেন তাকে অভিনন্দন জানাইল—এরই নাম যোগ্যতমের জয়! Survival of the fittest।

দেবকুমার বলিল, যোগ্য কে? তুমি না আমি?

এতে কি আর কোন সন্দেহ আছে?

দেবকুমার বলিল, তোমারও ত খ্যাতি আছে। পাঁচজনে তোমায় চেনে।

তা হয়ত চেনে। কিন্তু খ্যাতি হচ্ছে ধোঁয়া; ধরা ছোঁয়া দেয় না। আর টাকা বাস্তব জিনিস্। মেয়েরা বাস্তববাদী কিনা, তাই ধোঁয়ার বদল বস্তু বেছে নিয়েছে।

বন্ধুর এই কথায় দেবকুমার ব্যথিত হয়। হোম যেন বলিতে চায়, সবিতা ভালবাসিয়া তাকে বরণ করে নাই, সে বিবাহ করিয়াছে টাকা, মোটর গাড়ী।

এর অল্পদিন পরে সবিতার ছবি আঁকা বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু তার কল্পনালোক এই ভাবে নষ্ট হইয়া যাইবে, হোমেন ইহা সহজে মানিয়া লইতে পারিল না। এর পরও কিছুদিন সবিতাকে দিয়া সে ছবি আঁকাইবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু তার মধ্যে দেখিয়াছে কেমন যেন উৎসাহের অভাব।

সংসারে কোন ঝক্কি-ঝামেলা নাই, শাশুড়ী জা নাই, ননদ নাই, স্বামী প্রাচুর্যের মধ্যে রাখিয়াছে। এই প্রাচুর্য শিল্প-সাধনার অনুকূল।

হোমেন তাকে জিজ্ঞাসা করিল, ছবি আঁকা ছাড়লে যে?

ভাল লাগে না, শরীর ভাল না—সবিতা দিল এই সব ওজুহাত। শেষটায় একদিন বলিল—ডি, কে, চায় না যে আমি ছবি আঁকি।

হোমেন প্রশ্ন করিল, কেন?

তুমিই ত বলেছ অনেক স্বামী এই রকম inferiority complex-এ ভোগে।

সবিতার ছবি আঁকা বন্ধ হইল বটে কিন্তু তাদের বন্ধুত্ব অব্যাহতই রহিয়া গেল, মেলামেশা কমিল না। দেবকুমার ও হোমেন পরস্পরকে ভালবাসিত, শ্রদ্ধা করিত। আর সবিতার উপর হোমেনের আকর্ষণ ছিল আরও তীব্র।

তবে একদিন তাদের যে বিবাহের গুজব উঠিয়াছিল, দেবকুমার সে কথা ভুলিতে পারে নাই। ছোট ছোট হাসিঠাট্টার মধ্য দিয়া উহা প্রকাশ করিয়া ফেলিত। প্রায়ই বলিত, তোমরা দুজনেই সমান eccentric। কথাগুলি বলিত একটু হাসিয়া।

একদিন বলে, ছবি নিয়েই জীবনটা কাটিয়ে দিলে, হোম। ছবি আঁকা আর ছবি দেখা।

ছবি দেখা অর্থাৎ সবিতাকে দেখা।

উত্তরে হোমেন শুধু একটু হাসিয়াছিল। আঘাত দেওয়ার মতন শর তার তূণীরেও ছিল—সবিতার দেওয়া বাণ। সে বলিত, সেন্স অব হিউমর তোমার বন্ধুর মধ্যে একটুও নেই। আর একদিন বলে, কমনসেন্স না থাকলেও লোকে যে বেশ উন্নতি করতে পারে তার প্রমাণ তোমার ডি, কে।

হোমেন বলিল, বড্ড দেরিতে বুঝেছ দেখছি।

সবিতা উত্তর করে, আগে বুঝলে আমার জীবন অন্য খাতে বইত—বলিয়াই ছোট্ট একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে। সেই নিঃশ্বাস হোমেনের বুকে ঝড় তুলিয়াছিল। তবে সে শুধু মুহূর্তের জন্য।

হোমেন কিন্তু এসব বাণ কখনও ব্যবহার করে না। লোককে আঘাত করা তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। আজ মনে হইল, আঘাত না দিয়া ভালই করিয়াছে। যে বাণ দিয়া আঘাত করিবে সেই বাণই তো ছিল ভুয়া, ফাঁকা। সবিতা কারও কাছে ধরা দেয় নাই, তার কাছে নয়—দেবকুমারের কাছেও নয়।

সে কি কাহাকেও ভালবাসিত না? নিষ্ঠুর ছিল? তার হাসি ছিল মিথ্যা? সে শুধু ভালবাসিত পটের ছবির মতন ফিটফাট থাকিতে—কথা-বার্তায় ধরনে-ধারণে অপ্-টু-ডেট্ হইয়া চলিতে? নিজের কাছেও সে খাঁটি ছিল না, তাই শিল্প-রূপ তার কাছে ধরা দেয় নাই?

সন্তান হইলে তাকে হয়ত ভালবাসিত—বাসিত মাতৃজাতির animal instinct লইয়া। সেই instinct-কে কেন্দ্র করিয়াও শিল্পীসত্তা কিছুটা বিকাশ পাইত। পায় নাই প্রেমের অভাবে, ভালবাসার অভাবে—যে প্রেম শিল্পী-মানসে spark-এর কাজ করে।

স্ফুলিঙ্গ বা এই স্পার্কের কথা দেবকুমারকে প্রথম বলে শান্তশীল জানা। লোকটি আর্ট-কনোসার। তখন হোমেন মন্তব্য করিয়াছিল, স্পার্কের অভাবের কথা বলেছে ত শান্তশীল? ওর কথা ছেড়ে দাও। লেখা বাজারে না কাটলে লেখক যেমন সমালোচক হয়—ওর ছবি না কাটায় শান্তও তেমনি হয়েছে আর্ট-কনোসার।

নীরব দু'জনেই। ঘরখানা নিস্তব্ধ। দেয়ালের ঘড়ির টিক্‌টিক ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা যায় না। মাঝে মাঝে দক্ষিণের বাগানে শিউলি-ঝোপে একটা পাখী ডাকে। অদূরে পণ্ডিতিয়ায় কে যেন একবার মোটরের হর্ন বাজাইয়াছিল। মিনিটখানেক ডাকিয়া হর্নটা অবশ্য থামিয়া গিয়াছে। সময় কাটে। হোমেন একখানা কাগজের উপর কি যেন আঁকে। অঙ্কন ও নিস্তব্ধতার মধ্যে সে ডুবিয়া গিয়াছে। বাহিরের কোন শব্দই শোনে না, লক্ষ্য করে না কিছুই।

দেবকুমার অন্যমনস্কভাবে ফোনগাইড উলটায়। দেখে নিজের ধনী মক্কেলদের বাড়ির ফোন-নম্বর। ঘরের প্রতিটি শব্দ সে শুনিতে পায়—ঘড়ির টিক টিক, পনর মিনিট পর পর একটা করিয়া জোর আওয়াজ। দেখে হোমেনের আঙুলের কাঁপন, চোখের মধ্যে, ভ্রূ ও নাসিকার প্রতিটি কুঞ্চনের মধ্যে তার শিল্পী মানসের প্রকাশভঙ্গী।

এর মধ্যে একবার সে বাথরুমেও ঘুরিয়া আসিয়াছে।

সাড়ে সাতটা, আটটা, নয়টা বাজিল। চাকর জগনারায়ণ দুইবার খাবার তৈরির খবর দিতে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। সে একেবার জোরে দরজা বন্ধ করায় দেবকুমারের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়াছিল। চাকরবাকররা এমনি করিয়াই

দামী দরজা জানালাগুলি ভাঙিয়া ফেলিবে। দেখিবার যে কেহ নাই। সবিতার অভাবে সব যে ছত্রখান হইয়া গেল।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর দরজা জানালা বাথটব এই সব সম্পর্কে সে কেমন যেন দরদী হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে-সঙ্গে কিছুটা অসহিষ্ণুও। মধ্যে মধ্যে চাকরদের ধমকায়। পরক্ষণেই আবার দুঃখ পায়।

প্রায় পৌনে দশটার সময় সে হোমেনকে বলিল, তোমার বাসের সময় হ'য়ে এল। এইবার খেয়ে নাও।

ওঃ—বলিয়া হোমেন বন্ধুর দিকে তাকায়। তার ছবি তখন বোধ হয় হইয়া গিয়াছে।

দেখি, কি করলে? —বলিয়া দেবকুমার তার সামনের কাগজখানি টানিয়া নিল। পরক্ষণেই বলিল, ওঃ, এ যে দেখছি তারই ছবি। কিন্তু—

হোমেন সবিতাকে আঁকিয়াছে। দেবকুমারের উহা পছন্দ হয় নাই।

সরল সাদাসিধা মেয়ে, প্রাণশক্তিতে উজ্জ্বল সবিতা এ নয়—এ বিংশ শতাব্দীর এ্যাংলোবেঙ্গলী সভ্যতার দোআঁশলা ফল, চালবাজ এক তরুণী। প্রেম নাই, সন্তোষ নাই, ত্যাগ নাই, আছে মিথ্যা আত্মপ্রত্যয়। জীবনের সকল সাধই তার অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে, কিছুই পায় নাই। কি যেন খুঁজিয়াছিল; কিন্তু খুঁজিতেও ঠিক মতন জানিত না।

এই ছবি দেখিয়া দেবকুমারের মনে হইল হোমেন সবিতাকে অপমান করিয়াছে, বন্ধুত্বের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে।

সবিতার অমর্যাদার চেয়েও তার কাছে বোধ হয় বড় হইয়া উঠিল—স্বামীত্বের অপমান, অধিকারের অপমান। সে বলিল, ইউ! ইউ হ্যাভ্ ডন ইন্‌জাষ্টিস টু সবিতা। টু-টু মি···

জগন্নাথ টেবিলের উপর খাবার রাখিয়া গিয়াছিল। কাঁটার ডগায় কাটলেটের টুকরা তুলিয়া হোমেন বলিল, খাঁটি রূপই দিয়েছি।

খাঁ-খাঁ-খাঁটি রূপ—ডান গালে পুরা একটা আলু থাকায় দেবকুমারের মুখের ঐ দিকটা বিকৃত দেখাইতেছিল।

সে আর কি বলিল শোনা গেল না।

হোমেন তখন মন দিয়া ছবিখানা দেখছিল। তার মনে হইল সত্যকার সবিতাকে সে রূপ দিতে পারিয়াছে।

মাস দুই পরে একজিবিশনে হোমেন মুখুয্যের 'মডার্ন-তরুণী' প্রথম পুরস্কার পাইল। বাজারেও বিকাইল সব চেয়ে চড়া দামে।

বাঙলা সাহিত্যের অন্ধকার-কাল

গোপাল হালদার

বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ বা প্রথম যুগ (আঃ খ্রী ৯০০—খ্রী ১,২০০) শেষ হয় তুর্ক-আক্রমণে। তারপরে আসে একটা যুগ-সন্ধিকাল। খ্রীষ্টীয় প্রায় ১,২০০ থেকে খ্রীষ্টীয় ১,৩৫০ অব্দ কিংবা খ্রীষ্টীয় ১,৪৫০ অব্দ পর্যন্ত। এ-সময়ে আমরা বাঙলা সাহিত্যের কোনো নিদর্শন পাই না। তার পূর্বে আমরা পাই 'চর্যাপদ'; আর বাঙলায় না হলেও সংস্কৃতে ও অপভ্রংশে তখনকার বাঙালী কবির সাহিত্য-রচনারও প্রচুর পরিচয় সুরক্ষিত রয়েছে (দ্রষ্টব্য, ডাঃ সুকুমার সেনের 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস')। তারপরে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধ থেকে আমরা চৈতন্য-পূর্ব বাঙলা সাহিত্যের প্রকাশ লক্ষ্য করতে পারি—সে পর্বের প্রধান কবি হচ্ছেন বড় চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, বিপ্রদাস পিপ্‌লাই, হয়ত বা বিজয় গুপ্তও। কিন্তু খ্রী ১,২০০ থেকে খ্রী ১,৩৫০ কেন প্রায় খ্রী ১,৪৫০ পর্যন্ত আমরা বাঙলা দেশে না পাই কোনো বাঙলা রচনার প্রমাণ, না পাই কোনো অন্যবিধ রচনার নিদর্শন।

✓ রাজনৈতিক হিসাবে এই কালটা হল তুর্ক-আক্রমণের ও তুর্ক-বিজয়ের কাল—আর একটা সামাজিক আপৎকাল। এই দেড়শ' বা আড়াই শ' বৎসর বাঙলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ হলেও একটা যুগসন্ধি-কাল। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্য এ সময়ের মধ্যে বিবর্তিত হয়ে যখন আবার পঞ্চদশ শতকে দেখা দেয় শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে, শ্রীরাম পাচালীতে, শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে ও মনসা বিজয়ে, পদ্মপুরাণে তখন বুঝতে পারি আমরা মধ্য যুগে পদার্পণ করেছি। এদিকে (ডাঃ সুকুমার সেনের 'ইতিহাসের' ৫ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) এই দেড়শ'-দু'শ বৎসরের মধ্যে বাঙলা দেশের জীবন কি ভাবে আবর্তিত-বিবর্তিত হচ্ছিল তা অনুমান করা চলে পরবর্তী সাহিত্য থেকে। অবশ্য বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাস—তা অনেকটাই রাজবংশের ও রাজাদের সিংহাসন লাভ ও সিংহাসন হারানোর ইতিহাস—মোটের উপর সুস্থির হয়েছে (দ্রষ্টব্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ইংরেজিতে লেখা "বাঙলার ইতিহাস," ২য় খণ্ড)। কিন্তু বাঙালীর

সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস অনেকটাই অনিশ্চিত। বলা বাহুল্য, সামাজিক ও বাস্তব জীবনের ছাপ সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে পড়ে পরোক্ষে, তা আক্ষরিক হিসাবে গ্রহণ করলে ভুল হবে। কিন্তু তথাপি এই সামাজিক হিসাব না জানলে সে সাহিত্যের যথার্থ মূল্যও নিরূপণ করা যায় না।

তুর্ক-বিজয়ের হিসাব

যে কারণে বাঙালী জীবনে বিপর্যয় এল, সে কারণটা সুবিদিত। তা প্রধানত রাজনৈতিক—বিদেশীর আক্রমণ ও বিজয়। নূতন শাসক-শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা ও নূতন শাসক-ধর্মের ও শাসক-সংস্কৃতির চ্যালেঞ্জ।

খ্রীষ্টীয় ১,২০০ অব্দ শেষ হতে না হতেই বাঙলার উপরে তুর্কী-আক্রমণের সে ঝড় ভেঙে পড়ে। দিল্লীতে তখন তুর্ক-সুলতানী প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। বিহার জয় ও বিধ্বস্ত করে পশ্চিমবঙ্গ অধিকার করতেও মুসলমান তুর্কদের বিলম্ব হল না। সম্ভবত নদীয়া খ্রী ১,২০১ বা ১,২০২তে বিজিত হয়। লক্ষণ সেন অবশ্য পূর্ববঙ্গে আশ্রয় নেন। তাঁর সঙ্গে গৌড় ও পশ্চিমবঙ্গের (রাঢ়ের) বহু রাজপুরুষ, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, বিদ্বজ্জন তখন পূর্ববঙ্গে এবং উত্তরবঙ্গ থেকে কামরূপে চলে যান তা অনুমান করা যেতে পারে। আরও প্রায় এক শত বৎসর কাল নদীনালা পরিবৃত পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে সেন, বর্মণ, দেব প্রভৃতি রাজারা স্বাধীন ছিলেন। তখন কামরূপ-কামতাও বিজিত হয়নি। অন্যদিকে বিহার ও গৌড় দেশ আক্রান্ত হলে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ পণ্ডিত পুঁথিপত্র, মূর্তি, পট প্রভৃতি নিয়ে নেপালে পলায়ন করেছিলেন। কাজেই এই তুর্ক আক্রমণে বাঙলার শিল্প ও সংস্কৃতি একদিক দিয়ে নেপালের গিরিপথে অগ্রসর হয় তিব্বত চীনের দিকে, অন্যদিকে দিয়ে পূর্ব-বাঙলা দিয়ে আরও কিছু কাল সম্পর্ক অব্যাহত রাখে ব্রহ্ম-আরাকানের সঙ্গে।

কিন্তু তুর্ক-আক্রমণের ফলে বিহারে, গৌড়ে, পশ্চিম বাংলায় চলল এক ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা। তুর্করা নিজেরাও ছিল দুর্ধর্ষ ও ভয়ঙ্কর জাতি; তার পরে ইসলাম গ্রহণ করে সেই ধর্মোন্মাদনায় তাদের নৃশংসতা ও ধ্বংস-প্রবৃত্তি বেড়ে গেল। যা মুসলমান ধর্মে নেই তাই তাদের বিবেচনায় ভ্রান্ত; বিশেষ করে আবার হিন্দু বা বৌদ্ধ দেবদেবী, শাস্ত্র, শিল্পকলা, সংস্কৃতি। কাজেই, যেখানে তারা বিজয়ী হল সেখানে তারা রক্তে ও আগুনে হিন্দু-সংস্কৃতির চিহ্ন বিলুপ্ত করতে কোনো দ্বিধা বোধ করবে না, এ সহজ কথা।

মনে রাখতে পারি—তুর্ক বা মুসলমান-ধর্মাবলম্বী বিজেতারাই নয়, মধ্য-যুগের কোনো জাতি ও কোনো বিজয়ী ধর্মই এইরূপ সার্বিক ধ্বংসকে অন্যায় মনে করত না। দ্বিতীয়ত, মধ্যযুগের পরেও খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকরাও বিজিতদের জাতিকে জাতি ধ্বংস করতে এর থেকে কম নৃশংসতার বা কম বর্বরতার পরিচয় দেয়নি—পেরু ও মেক্সিকোতে স্পেনীয়দের, আমেরিকায় ব্রিটিশদের, আফ্রিকায় ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকদের ধ্বংসলীলার কথা আমরা মনে রাখতে পারি (আর, এ বর্বরতা কি একেবারেই লোপ পেয়েছে?)। সে তুলনায় বিজয়ী তুর্করা বা বিজয়ী মুসলমান ধর্ম তো বরং ভালোই মনে হবে।

প্রায় পাঁচশত বৎসর মুসলমান রাজা ও সম্রাটরা ভারতবর্ষে রাজত্ব করে। তথাপি ভারতবর্ষে "হিন্দু" নাম লোপ করা তো দূরের কথা, মুসলমানরা ভারতবর্ষে সংখ্যায় এক তৃতীয়াংশও হতে পারেনি (যেসব বিশেষ কারণে পশ্চিম পাঞ্জাবে ও পূর্ব-বাঙলাতে তারা সংখ্যাগুরু হয়ে ওঠে, তা আমরা জানি)। অথচ, সেই সামন্ত-যুগে রাজার ও রাজপুরুষদের ধর্মই প্রজা-সাধারণের ধর্মে পরিণত হত। মুসলমান বিজেতারা মরক্কো থেকে যবদ্বীপ পর্যন্ত যেখানেই অগ্রসর হয়ে গিয়েছে সেখানেই অচিরকাল মধ্যেই দেশবাসীও ইস্‌লাম ধর্ম স্বীকার করে নিয়েছে, অথচ পাঁচ শত বৎসরেও ভারতবর্ষে তা সম্ভব হল না। এর কারণ, প্রথমত, ভারতবর্ষ একটা প্রকাণ্ড, জনবহুল এবং সহন ও গ্রহণপটু বিচিত্র সভ্যতার দেশ, দু-এক শতাব্দীতে তার পারাপার পাওয়া সহজ নয়। দ্বিতীয়ত, বিজিত ভারতবাসীও নিজেদের একটা সভ্যতার সংস্কৃতির প্রতিরোধ রচনা করতে পেরেছিল, এবং বাঙালীর এই প্রতিরোধের প্রধান হাতিয়ার হল মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য। আর তৃতীয়ত, বিধর্মী বিজয়ীরা তাড়াতাড়ি প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতি মুছে ফেলে দিতে না পারাতে এ-দেশে বসবাস করতে গিয়ে ক্রমে নিজেদের সেই সর্বধ্বংসী মূঢ়তা ও ধর্মান্ধতা, জাতিবিদ্বেষ অনেকটা খুইয়ে ফেলল—এমন কি, পরস্পরের জীবন-যাত্রা ও সংস্কৃতিকেও কতকটা মেনে নিলে। প্রতিরোধমূলক বাঙলা সাহিত্যও তাদের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়নি।

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে এই তুর্ক-আক্রমণের ধ্বংসচ্ছায়া ও তারপর হিন্দু-বাঙালীর প্রতিরোধ-রচনা এবং মুসলমান বিজয়ীদের ক্রমিক রূপান্তরের ও বাঙালীত্ব লাভের পরিচয় লাভ করা যায়।

তুর্ক-বিজয়ের প্রাথমিক রূপটি ছিল ধ্বংসের রূপ। উচ্চবর্গের বহু জ্ঞানী ও মানী যাঁরা পলায়ন করেননি, তাঁরা অনেকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দান করেন, অনেকে আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারান—সংস্কৃতির শীর্ষস্থানীয়রা ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে বসলেন। মন্দির ভগ্ন হল, বিগ্রহ চূর্ণ হল, মঠ-বিহার ভস্মসাৎ হল। পুঁথিপত্র, শাস্ত্র, শিল্প আগুনে সব ছারখার হয়ে গেল, দেব-মূর্তি, পূজার বিগ্রহ গৃহস্বামী ও পুরোহিতেরা ভয়ে জলে বিসর্জন দিলে। এই হচ্ছে তখনকার সাধারণ চিত্র। মগধের বৌদ্ধ বিহার (বিক্রমশীলা, ওদন্তপুর, প্রভৃতি) ধ্বংসের কথা জানা যায়। বাঙলায় যা ঘটল তার সাক্ষ্য বেশি নেই। পরবর্তী বাঙলা পুঁথি 'শূন্যপুরাণের' (১৮ শতকের রচনা) অন্তর্গত 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' থেকে আমরা ওড়িষ্যার ধ্বংস-লীলার কথা জানতে পারি—সম্ভবত সে চিত্রটি ফিরুজ্-শাহ্-তুঘ্লকের ওড়িষ্যায় সমুদ্রতীরস্থিত নগর কোনারক-ধ্বংসের চিত্র। কিন্তু শুধু এক কোনারক নয় ছোট বড় অনেক কোনারকের ধ্বংস-স্মৃতি তাতে সুরক্ষিত।

বাঙলা দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে এই আক্রমণের যুগের প্রাথমিক ধ্বংসকাণ্ডের শেষেও শান্তি অনেকদিন এল না। প্রায় দেড়শত বৎসর, খ্রীষ্টীয় ১,২০০ থেকে খ্রীষ্টীয় ১,৩৫০ পর্যন্ত গেল দুর্যোগের দিন। তারপরে (১০৫০শর পরে) সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ গৌড়ে একটা স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠা করলেন—সে রাজবংশও বেশি দিন স্থায়ী হল না। গৌড়ের সিংহাসন নিয়ে সুলতানদের হাব্সী রক্ষী-দলের নেতারা, নব নব তুর্ক ও পাঠান ভাগ্যান্বেষীরা, আর আমীর ওম্‌রাহ্ সেনাপতিরা জুয়া খেলতে লাগ্ল, কে কখন তা পায় ও হারায় তার ঠিকানা নেই। দৃঢ় রাজশক্তির অভাবে এ অবস্থায় দেশ জুড়ে বিস্তার লাভ করল অরাজকতা। দুর্যোগ আপনার নিয়মেই কেটে আসছিল,—আর তা কেটে গেল যখন খ্রীঃ ১৪৯৩ সালে হোসেন শা গৌড়-সিংহাসন লাভ করলেন। ততক্ষণে বাঙালীরও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের নতুন বনিয়াদ প্রায় রচিত হয়েছে।

সামাজিক বিবর্তন

বিদেশী, বিধর্মীর রাজ্যমধ্যে বসবাস করে সেদিনের হিন্দু জনসাধারণ যে সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলে তা একদিকে যেমন কঠিন, অনমনীয়, বহি-র্বিমুখ, অদ্ভুত কথা এই যে, অন্যদিক থেকে তা তেমনি আঘাতে নির্বিকার,

সহনপটুত্বে অসাধারণ। ধর্মই মধ্যযুগের সংস্কৃতির প্রধান কথা, আর ধর্মের কোন না কোন একটা তত্ত্ব ও বিধানের সঙ্গে জীবন-যাত্রার প্রত্যেকটি প্রধান ক্ষেত্রই সে যুগে জড়িত থাকত। তখন পর্যন্ত ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র (secular state) ছিল অজ্ঞাত, ধর্ম-নিরপেক্ষ সমাজও ছিল প্রায় অসম্ভব। ইস্‌লাম এই তুর্কী-মুসলিম রাষ্ট্রের রাজধর্ম। সে হিসাবে ইসলাম ধর্মের ও (তুর্ক-আরবী) ইসলামী সংস্কৃতির জয় ছিল দুর্নিবার। তা ছাড়া, নানা সুফী, ফকির, দরবেশ এবং গোঁড়া পীর ও প্রচারক ইসলামের বাণীকে বহন করে সমাজের বুকে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। এই দুই দিককার আক্রমণের থেকে শাসিত-সমাজ ও শাসিত সংস্কৃতিও আপনাকে রক্ষা করতে চাইল দুই ক্ষেত্র থেকেই সামাজিক শক্তিকে পুনর্গঠন করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক আয়োজনকেও সংগঠিত করে।

বৌদ্ধধর্মের বিলোপ

তুর্ক-আক্রমণে যা প্রথমত ঘটল তা হচ্ছে হিন্দু-বৌদ্ধ এই দুই সম্প্রদায়ের পূর্ণ সংযোগ। অবশ্য এর ফলে প্রকাশ্যত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিলোপই ঘটল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম বিলোপের পথে এগিয়ে আসছিল অনেক দিন থেকেই। যে বাঙলায় ৭ম-৮ম শতক পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের প্রসার ছিল, তার স্মৃতি থেকেও জৈনধর্ম মুছে যাচ্ছিল। বৌদ্ধধর্ম তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে পরিণত হয়ে তান্ত্রিক শৈবধর্মের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে,—'চর্যাপদে' তা দেখেছি। তুর্ক-আক্রমণ তার এই বিলোপ আরো দ্রুত ও সুনিশ্চিত করে দিলে। পশ্চিম বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম আত্মগোপন করলে জনসমাজের নানা লৌকিক পূজা-আচারের মধ্যে—অবশ্য সে সব পূজা-আচারের মূলও ছিল প্রাক-আর্য জীবন-যাত্রায় ও ধর্ম-আচরণে। পূর্ববঙ্গে সম্ভবত বৌদ্ধধর্ম এমনভাবে হিন্দু সমাজের মধ্যে মিশে গেল না। সেখানে হয়ত বৌদ্ধ জনগণ স্বতন্ত্র ছিল, হয়ত অপাংক্তেয় ও নিপীড়িতও হয়েছে। তাই পরবর্তী কালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতেও তারা দ্বিধা করেনি। যেজন্য পূর্ববঙ্গ মুসলমান-প্রধান দেশ হয়ে উঠল সকলের দৃষ্টির অগোচরে পরবর্তী দু'তিন শতাব্দীতে।

উচ্চবর্ণের বিপর্যয়

কিন্তু সর্বপ্রধান কথা—তুর্ক-বিজয়ে পূর্বেকার হিন্দু অভিজাত ও উচ্চবর্ণের শাসকশ্রেণী আর শাসক পর্যায়ে রইল না—তারা রাষ্ট্রমধ্যে শাসিত শ্রেণীতে

পরিণত হ'ল। এ কথা ঠিক যে, অভিজাতদের অনেকেই আপনাদের সম্পত্তি ও মর্যাদা একেবারে হারাল না, আবার কালক্রমে তারা বিজেতাদের সহকারী, মন্ত্রী, সেনাপতি, বৈদ্য, হিসাবরক্ষক প্রভৃতি রূপে খেলাত-খেতাবও পেল। কিন্তু প্রধানত যা ঘটল তা হচ্ছে শাসক শ্রেণীর অধোগতি, নিজেদেরই শাসিত ও শোষিত শ্রেণীর পার্শ্বে গিয়ে তারা দাঁড়াতে বাধ্য হল।

আপোষ রক্ষার দিক

এই শাসক শ্রেণী ছিল প্রধানত উচ্চবর্ণের ; নিজেদের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, শাস্ত্র-পুরাণ ও আচার-নিয়মের দর্পে তারা নিম্নবর্ণের ও নিম্নবর্গের জনসাধারণের জীবনযাত্রা, ধর্মকর্ম, ধ্যান-ধারণা, আচার-নিয়মকে এতদিন ঘৃণাই করে এসেছিল। কিন্তু উচ্চবর্গ থেকে অধোগতি ঘটতেই তাদের পক্ষে এই 'ছোট জাতদের' লৌকিক দেবদেবী ও কথা-কাহিনীকে আর অবজ্ঞা করে তত দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হল না। সর্প-দেবী মনসা ও বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনি কচ্ছপরূপী (?) ধর্মঠাকুর ও লাউসেনের কীর্তিকথা, ভয়ঙ্করী বনদেবী ও তার ভক্ত কালকেতু-ব্যাধের কথা, শ্রীকৃষ্ণ নামের আড়ালে গ্রাম্য প্রণয়ীর গোপ-বধূদের সঙ্গে লীলাবিলাস, ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের যে কথা সিন্ধু, পাঞ্জাব, গুজরাত পর্যন্ত বিস্তারিত হয়ে আছে—এ সকলের উদ্ভব-ক্ষেত্র ছিল এই নিম্নবর্গের ও নিম্ন শ্রেণীর লোক-জীবন। ইতিপূর্বেই হিন্দু সভ্যতার অনেক কিছু নিম্ন শ্রেণীও গ্রহণ করে এসব পূজা ও কাহিনীর ক্রম-পরিশোধন করছিল। কিন্তু তবু উচ্চবর্গের হিন্দু তা শাস্ত্রে, পুরাণে তখনো গ্রাহ্য করেনি। কিন্তু এখন সেই রাষ্ট্র-শাসন হারাবার পরে ক্রমশই এইসব কাহিনীকে এই উচ্চবর্ণদেরও গ্রাহ্য করতে হল, হিন্দুর সেই অদ্ভুত গ্রহণশক্তির বলে তারা তা মাজিয়েও নিলে—চাষী, গাঁজাখোর সেই লৌকিক দেবতা শাস্ত্রোক্ত রুদ্র শিবের সঙ্গে মিশে গেল, ভয়ঙ্করী বনদেবী রণচণ্ডী হয়ে উঠল, গ্রাম্য প্রণয়ী ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে কৃষ্ণমঙ্গলের বিষয় হয়ে গেল। হিন্দু শাসক শ্রেণীর ও হিন্দু শাসিত শ্রেণীর সাংস্কৃতিক একটা আপোষ-রক্ষা এরূপে ধীরে ধীরে সংঘটিত হল। অবশ্য বিনা সংঘর্ষে তা হয় নি, আর তা দু'এক শত বৎসরেও শেষ হয় নি,—সমস্ত মধ্যযুগ ধরে তা চলেছে, কিন্তু লৌকিক ও উচ্চবর্গের এই সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও এই আপোষ-রক্ষা দুই বর্গের সামাজিক

নৈকট্যের ও আপোষ-রক্ষার জন্যই সম্ভব হল—আর তুর্ক-বিজয় হিন্দু উচ্চবর্গকে ঠেলে নীচে নাবিয়ে দেওয়াতে এই আপোষ-রক্ষা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল।

অপরদিকে বাঙলার এই লোক-সাধারণ মূলতও আর্যভাষী ছিল না, আর আর্যভাষা গ্রহণ করলেও ততদিন পর্যন্ত তারাও হিন্দু-আর্য সংস্কৃতির উচ্চতর বস্তু থেকে বঞ্চিতই ছিল। শাস্ত্র চর্চা, জ্ঞানাহরণ, তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল; সংস্কৃত কাব্যের রসাস্বাদন ছিল অসম্ভব (যদিও কবি ধোয়ী সম্ভবত তন্তুবায় বা রজক ছিলেন)। কাজেই, সামাজিক হিসাবে এই সব অন-আর্য কৌম বা উপজাতিগুলি (পুণ্ড্র, পুঁড়, বাগদী, শবর, ব্যাধ, হাড়ি, ডোম) তাদের কৌম (tribal) জীবনযাত্রা খুইয়ে শুধুমাত্র এক-একটা স্বতন্ত্র জাতিতে (caste) পরিণতি লাভ করছিল। হিন্দু উচ্চবর্গের দ্বারা অবহেলিত হয়ে চলিত বৌদ্ধধর্মের কিছু কিছু তারা গ্রহণ করে এক ধরনের 'লৌকিক বৌদ্ধধর্ম' নিজেদের মধ্যে প্রচলিত করছিল। কিন্তু এখন উচ্চবর্গের বর্ণচ্যুতিতে এইসব জাতি হিন্দু পুরাণ কাহিনীর আধ্যাত্মিকা প্রভৃতি গ্রহণ করবার অধিকতর সুযোগ লাভ করলেও ইসলামের জনপ্রিয়তা ও প্রচারের থেকে তাদের রক্ষা করার প্রয়োজনেই হিন্দুর পুরাণ প্রভৃতিরও বহুল প্রচার পাঁচালী, নাট ও কথকতার মারফত আরম্ভ হয়। সেই শাস্ত্র-বাঁধা হিন্দু ধর্মকে তারা আবার নিজেদের মত করে ক্রমে ক্রমে একটা লৌকিক হিন্দু ধর্মেও পরিণত করে নিলে। বৌদ্ধ প্রভাব বিলুপ্ত হতে হতে যা ছিল 'লৌকিক বৌদ্ধধর্ম'—তার স্থান গ্রহণ করলে 'লৌকিক হিন্দুধর্ম।'

সংরক্ষণ কৌশল

ভাগ্যবিপর্যয়ে শাসন প্রতিষ্ঠা হারালেও সমাজ ও সভ্যতার খাতিরেও হিন্দু উচ্চবর্ণ কিন্তু দেশের নিম্নবর্ণের সঙ্গে একেবারে হাতে হাত ধরে একত্র দাঁড়াতে পারল না; সম্ভবত সেরূপে দাঁড়াতে তারা প্রস্তুতও ছিল না। অথচ দুর্ধর্ষ বিদেশী শাসক-শক্তির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিরোধ করতে হলে শাসিতদের পক্ষে প্রয়োজন ছিল এইরূপ সর্বশ্রেণীর ব্যাপক ঐক্যের। হিন্দু সমাজের বর্ণভেদে সে ঐক্য বরাবরই ছিল সুদূর। হিন্দু-সমাজের বর্ণভেদের মূল উদ্দেশ্য ও কাজ ছিল শাসক-শ্রেণীর অধিকার, তাদের শ্রেণীগত সুযোগ-সুবিধা ভূতিকে সনাতন ধর্ম ও ঐতিহ্যের নামে একেবারে পাকা করে রাখা। রাজশক্তি

হারালেও রাজ্যচ্যুত উচ্চবর্ণ এ সব সামাজিক অধিকার এখন ক্ষুণ্ণ হতে দেবে কেন? বরং সামাজিক পদ-প্রতিষ্ঠা ও সুযোগ-সুবিধাই তখন তাঁরা আরও আঁকড়ে ধরলেন। সমাজ-শাসনে তাঁদের কর্তৃত্ব তাঁরা অব্যাহত রাখতে আরও সচেষ্ট হলেন। রাজশক্তি যখন হাতে নেই, তখন আত্মরক্ষার অর্থ হল সমাজ-রক্ষা, এবং সমাজের ধর্ম-কর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা, ধ্যান-ধারণা, অর্থাৎ সংস্কৃতিকে ম্লেচ্ছধর্ম ও আচার-নিয়ম থেকে রক্ষা।

সেদিন রাষ্ট্র অপেক্ষাও সমাজ ছিল বেশি সচল জীবন্ত জিনিস। রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিরোধ রচনার চেষ্টা ঐক্যবদ্ধ সমাজ ছাড়া সম্ভবও নয়। বিজিত হিন্দু সমাজের এই প্রতিরোধ তাই রাজনৈতিক প্রতিরোধরূপে ততটা প্রকট হয়নি, বরং রাজনৈতিক পরাজয় মেনে নিয়েই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ রচনায় উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা অধিকতর মনোযোগী হলেন। এইদিকে তাঁরা সার্থকও হলেন বহু রূপে।

হিন্দুর প্রচলিত বর্ণভেদের আশ্রয়েই এই উচ্চবর্ণের সমাজ-শাসকেরা সমাজের প্রতিরোধ-কেন্দ্র রচনা করতে আরম্ভ করলেন। 'ম্লেচ্ছ' ও 'যবনের' সমস্ত সম্পর্ক থেকে সযত্নে তাঁরা দূরে রাখতে লাগলেন নিজেদের। যে-কেউ ম্লেচ্ছাচারে দুষ্ট হলে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কারও যবন-সংসর্গ ঘটলে, তার আর মার্জনা নেই, হিন্দু সমাজ তাকে তৎক্ষণাৎ নির্মমভাবে বর্জন করবে। প্রচলিত আচার-ধর্মও তাই এ সময়ে আরও শক্ত, আরও অনড়, আরও কঠিন হয়ে উঠতে লাগল। প্রচলিত বর্ণভেদে তখনো পর্যন্ত যেটুকু অবকাশ ছিল—যেটুকু নমনীয়তা ছিল বিবাহে-ক্রিয়া-কর্মে তখন পর্যন্ত,—তাও এবার বন্ধ হল। আহারে, বিবাহে, ক্রিয়াকর্মে প্রত্যেক জাতি এখন থেকে গণ্ডীবদ্ধ ও পৃথক হয়ে রইল। যারা মিলেমিশে নতুন জাত হয়ে উঠতে পারত তেমনি নিম্নবর্ণের ছোট ছোট কোম-জাতগুলো পর্যন্ত এর ফলে হয়ে উঠল এক-একটা স্বতন্ত্র জাত। অবশ্যই উচ্চবর্ণ রইল উচ্চে, নিম্নবর্ণেরা রইল নিম্ন, অনাচরণীয়, আর 'নবশাখরা' মধ্যখানে সুনির্দিষ্ট স্থান দখল করে রইল পৃথক। এই জাতের প্রাচীর ভেঙে মুসলমান ধর্মের সামাজিক সাম্য বা আচার-নিয়মের সাধ্য কি প্রবেশ করে, আর সমাজের উচ্চ-নীচ ভেদ ঘুচিয়ে দেয়?

এই সামাজিক প্রতিরোধের সঙ্গে সঙ্গেই চলল সাংস্কৃতিক সংগঠনও—তার একটা মূল অংশমাত্র সেই উচ্চ-নীচ সংস্কৃতির বা লৌকিক ও পৌরাণিক দেবতাদের আপোষ-রফা। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা আপোষ-রফা করলেন বাধ্য হয়ে, কিন্তু

নিজেদের শাসক-সংস্কৃতির ঐতিহ্য রক্ষা করতে লাগলেন নিজেদেরই উদ্যোগে—সমস্ত শক্তি দিয়ে। রাজশক্তি অবশ্য হাতে নেই ; কিন্তু ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি হল পল্লী-কেন্দ্রিক। দূরবর্তী ছোট ছোট পল্লীতে অনেকখানেই হিন্দু সামন্তরা তুর্কদের রাজনৈতিক বশ্যতা মেনে নিয়ে আপনার ধন-সম্পত্তি ও প্রতিষ্ঠা রক্ষা করতে পেরেছিলেন। তা ছাড়া, ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন পল্লীর জীবন-যাত্রা রাজনৈতিক পরিবর্তনে বিশেষ পরিবর্তিত হয়নি। উচ্চবর্ণের সামাজিক শক্তি সেখানে অব্যাহতই ছিল। এই সমাজ শক্তি ও সামন্ত-শক্তিকে আশ্রয় করে ব্রাহ্মণরা এক আধ শতাব্দীর মধ্যেই আবার নতুন করে সাংস্কৃতিক সংগঠনে উদ্যোগী হলেন। মিথিলার শাস্ত্রচর্চা শেষ হল না। দেখতে দেখতে নবদ্বীপের অভ্যুদয় ঘটল। চৈতন্যদেবের জন্মকালে (খ্রীঃ ১৪৮৬) তাই দেখি নবদ্বীপ, শ্রীখণ্ড প্রভৃতি এক-একটি বিদ্যাকেন্দ্র শাস্ত্রচর্চায় মুখরিত, দেশ-বিদেশে নব্যন্যায়ের খ্যাতি, আর কী অসাধারণ পাণ্ডিত্য সেই বাঙালী উচ্চবর্ণের! চৈতন্যের পরিচরদের দিকে তাকালেই তা বুঝতে পারি। এর পিছনে ছিল যে অন্তত এক-আধ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক আয়োজন, তাতে সন্দেহ নেই।

এই সাংস্কৃতিক উদ্যোগেরই একটা দিক হল পৌরাণিক কাহিনীর বাঙলায় পরিবেশন। তুর্ক-আক্রমণে সব কিছু বিপন্ন হলে সমাজের সাধারণ মানুষদেরও সনাতন ধর্মের সাধারণ সত্যগুলো জানানো প্রয়োজন হয়ে পড়ে। নইলে সুফী, দরবেশ প্রভৃতি প্রচারকদের সামনে সেই জনসমাজ ভেসে যেত। এ উদ্দেশ্যে পুরাণের অনুবাদ—বিশেষ করে ভাগবত, রামায়ণ ও মহাভারতের লোকচিত্ত-চমৎকারিণী অমর উপাখ্যানগুলির লোক-বোধ্য ভাষায় পরিবেশন কর্তব্য হয়ে ওঠে। সম্ভবত, মালাধর বসু, কৃত্তিবাস প্রভৃতি কবিদের পূর্বেও গ্রাম্য পাঁচালীতে এই সব আখ্যায়িকার রসাস্বাদন করছিলেন বাঙালী জনসাধারণ, উচ্চ, মধ্য ও নিম্নবর্ণ সকলেই,—এমন কি, মুসলমান শাসনকর্তারা পর্যন্ত। তাই হোসেন শাহ্ ও তাঁর সেনাপতি পরাগল খাঁ হয়ে ওঠেন এই বাঙালী কবিদের পৃষ্ঠপোষক।

আসলে ততদিনে (খ্রীঃ ১,৪৫০এর পরে) আর একটি বড় সামাজিক বিবর্তনও প্রায় সুনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। এই মুসলমান সুলতান ও তাঁর সেনাপতিদের বাঙলা-পরিপোষণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় এঁরা অনেকাংশেই বাঙালী হয়ে গিয়েছেন কাজেই মুসলমান শাসক-শ্রেণীও আর বাঙলা সাহিত্য কিংবা এই সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রয়াসের বিরোধী নন। ফলে শাসক-শ্রেণীর এই স্তরে শুধু মালাধর বসু বা রূপসনাতন নন, ভাগ্যবান হিন্দুরাও অনেকেই স্থান লাভ

করেছেন (দ্রষ্টব্য: সুকুমার সেন, 'মধ্যযুগের বাঙলা ও বাঙালী')। তখনো সময়ে-অসময়ে ইস্‌লামের নাম করে অবশ্য কাজী বা কোনো মুসলমান শাসন-কর্তা হিন্দুর উপর অত্যাচার করত, সমস্ত মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যেই তার প্রচুর প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু সে অত্যাচার হচ্ছে অনেকাংশেই মধ্যযুগের সামন্ত শাসকের অত্যাচার; শাসিত সমাজ ও শাসিত সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কোনো নিয়মিত জেহাদ নয়। আসলে, মুসলমান শাসক-শ্রেণীর মধ্যেও এ পরিবর্তন ক্রমেই অনিবার্য হয়ে উঠছিল। কারণ ধ্বংসের যুগেও তুর্করা এদেশে বসবাস এদেশেই স্ত্রী গ্রহণ করে। তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা নিশ্চয়ই বাঙলা জানতেন। আবার, তাঁরাও বিবাহ করেন এদেশেরই কন্যা। এঁদের বংশধরদের রক্তে সিকি ভাগ কিংবা দু'এক আনি যদি বা তুর্ক রক্ত থাকে, কয়পুরুষের মধ্যে তা দু'এক পাইতে গিয়ে ঠেকে, তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য তা হলেও তাঁরা নিশ্চয়ই ধর্ম সম্পর্কিত ব্যাপারে চর্চা করতেন আরবী, আর দরবারী ব্যাপারে চর্চা করতেন পারশী এবং হয়ত তখনকার মুসলমান অভিজাতরা ইংরেজ আমলের এ দেশের খ্রীষ্টান বা ফিরিঙ্গীদের মতই শাসকধর্ম ও শাসক-সংস্কৃতিকেই মনে করতেন নিজধর্ম, নিজসংস্কৃতি। তথাপি সাধারণ লোকের সঙ্গে বাঙলা ভাষা না বলে তাঁদের উপায় কি? তাছাড়া সাধারণ মুসলমান,—সে এ দেশের ধর্মান্তরিত মুসলমানই হোক, কিংবা হোক সাধারণ তুর্ক-সৈনিকের সন্তান—বরাবরই বাঙলা বলত, শুনত বাঙলা পাঁচালী, গান। শাসক-গোষ্ঠির মধ্যেও এই বাঙালী-স্বাজাত্য ক্রমশ সহজ হয়ে উঠছিল বলেই আমরা দরফ খাঁর (জাফর খাঁ গাজীর, ১৩শ শতক) নামেও পাই সংস্কৃতে 'গঙ্গা-স্তোত্র'; আর হোসেন শাহ্‌-পরাগল খাঁকে দেখি হিন্দু রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীর ভক্ত। অবশ্য এই উচ্চবর্গেরা প্রধানত যেমন ভক্ত ছিলেন উচ্চবর্গের বিষয়বস্তুর (রামায়ণ-মহাভারত) নিম্নবর্গের মুসলমানরা আবার তেমনি মত্ত ছিল মনসামঙ্গল, গোপীচন্দ্রের গান প্রভৃতিতে।

যুগসন্ধিকালের এই অনালোকিত সামাজিক বিবর্তনের পরিপূর্ণ সাংস্কৃতিক রূপ প্রকাশ লাভ করে কিন্তু একটু পরে—চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে ও বাঙলা সাহিত্যের চৈতন্য পর্বে (খ্রীঃ প্রায় ১,৫০০—খ্রীঃ ১,৭০০)। তখনই মধ্যযুগের বাঙালী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ তাঁর ধর্মে ও সাহিত্যে চরম সার্থকতা লাভ করে। বাঙালী সমাজের উচ্চস্তরে তখন যে স্বেচ্ছাচার দেখা দিয়েছে—বৃন্দাবন দাস যার উল্লেখ করেছেন—চৈতন্যদেবের প্রচারের একটা উদ্দেশ্য ছিল তা

রুদ্ধ করা, আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল আপামর সাধারণ উচ্চ-নীচ সকলকে ভক্তিধর্মে ও নাম-ধর্মে একত্রিত করা। এর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ফল সুস্পষ্ট। উচ্চবর্ণের ও নিম্নবর্ণের মধ্যে হিন্দু সংযম, সদাচার প্রভৃতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হল; বৈষ্ণব-সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সংস্কৃত ভাষা, দর্শন, কাব্য প্রভৃতির চর্চা সুপ্রসারিত হল; আর এই ভাবলোকের (মূলত ও মূলত যা হিন্দু) উপর স্থাপিত হল বাঙলা সাহিত্য ও বাঙলা সংস্কৃতির বনিয়াদ। সাধ্য নেই বাঙলা সাহিত্য পরবর্তী কালেও আর তার এই ভাবলোককে একেবারে ত্যাগ করে যায়।

অবশ্য এ কথা অত্যন্ত সত্য যে, বৈষ্ণব ভাবাদর্শের মধ্যে, সেই ভক্তিবাদের মধ্যে ইসলামের বিরোধিতা নেই—চৈতন্যদেব যবন হরিদাসকেও আপনার করে নিয়েছিলেন। (কিন্তু যবন হরিদাস আর কতটুকু ছিলেন তখন 'যবন' ধর্মে ও আচারে?) তাছাড়া, স্বয়ং চৈতন্যদেব ইসলামের একটা বড় গণতান্ত্রিক প্রথাকে গ্রহণ করেছিলেন তাঁর নিজের প্রচার-পদ্ধতিতে—সংকীর্তনে। তাঁর গণতান্ত্রিক ঝোঁকও অবশ্য হিন্দুসমাজের ভেদ-নীতিকে দূর করতে পারেনি।

অথচ যে-সময়ে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব সে সময়ে প্রতিরোধের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণ প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। শাসকগোষ্ঠী মুসলমান হলেও বাঙালী হয়ে যাচ্ছেন। এমন কি, বাঙলা কবিতার হিন্দু ভাবলোকেও তাঁদের আপত্তি নেই। অবশ্য এই কারণেই এই প্রতিরোধকামী বাঙলা সাহিত্যও ক্রমশ নিরর্থক হয়ে উঠতে লাগল। তাই খ্রীঃ ১,৭০০-এর পূর্বেই তার প্রতিরোধ-প্রেরণা নিস্তেজ হয়ে ওঠে, বাঙালী জীবনে দেখা দিতে থাকে 'নবাবী আমলের' (খ্রীঃ ১৭০০-খ্রীঃ ১৮০০) ভাবধারা তাতে হিন্দু-মুসলমানের পৃথক জীবন অনেকটা এক হয়ে উঠেছে,—বিজয়ী ও বিজিতের বিরোধ, কিম্বা তার ধর্মগত বা সংস্কৃতিগত দ্বন্দ্বের আর স্মৃতিও তাতে বিশেষ নেই। এই নবাবী আমলের ভাব ও ভাষার উপরে একটা হিন্দু-মুসলমানের সমবেত বাঙালী সংস্কৃতি গড়ে উঠ্‌তে যাচ্ছিল—কিন্তু তা ব্যাহত হল দু'কারণে: প্রথমত, নবাবী আমল সামন্ততন্ত্রের পতনের যুগ, তাতে সৃষ্টির বীজ বেশি রস পেতে পারে না; দ্বিতীয়ত, এ যুগের পরে স্বদেশীয় বণিকবিপ্লব না ঘটতেই এল ইংরেজ আমল—ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি। আর তাতে বাঙালী হিন্দুর তুলনায় বাঙালী মুসলমান সাংস্কৃতি ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়তে লাগলেন; আর সাম্রাজ্যবাদী শাসক-শ্রেণীও বিলুপ্তপ্রায় এই সামাজিক সাংস্কৃতিক তফাতকে আপনার ভেদনীতিতে আবার ফাঁপিয়ে বড় করে তুলতে লাগল। প্রতিরোধের বাঙলা সাহিত্যে এবারও সমস্ত বাঙালীর ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের সৃষ্টি হল না।

আগন্তুক

ননী ভৌমিক

দূর থেকে সারি সারি গাছের সুবিন্যস্ত লাইন দেখে বোঝা যায় ওটা ডিস্ট্রিক্ট্‌-বোর্ডের রাস্তা। নির্জন রাস্তাটার এক কোণ দিয়ে টিমিয়ে টিমিয়ে চলেছে একটা ছই-ফেলা গরুর গাড়ী। চলন্ত গরুর গা থেকে মৃদু গৈরিক একটা ধুলোর রেশ উঠে রোদ্দুরে-বাতাসে ভেসে উঠছে আবীরের মত।

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তাটা ছেড়ে মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে আসে একটা লোক। দূরে আকাশের গায়ে মসৃণ নীলাভ একটু আবছায়ার মত দেখা যায় সাঁওতাল পরগণার পাহাড়। রাঢ়ের রুক্ষ কঠিন মাটি। কখনো ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে নেমে গেছে। ধাপে ধাপে সেখানে ধানখেত গড়ে তুলেছে এখানকার মানুষ। কোথাও বিঘার পর বিঘা পতিত জমি, ডাঙা। চারিদিককার খেতের মাঝখানে উঁচু হয়ে উঠেছে এক বৃহদাকার কাছিমের পিঠের মত।

মাঠের মধ্যে দিয়ে হন হন করে হেঁটে আসে লোকটা। গায়ের জামাটা খুলে মাথায় চাপা দিয়ে রেখেছে রোদ্দুর এড়াবার জন্যে। হাঁটার ধরন দেখেই বোঝা যায় স্থানীয় লোক নয়। যত তাড়াই থাক, এখানকার মানুষ যখন আলের ওপর দিয়ে হাঁটে তখন সে হাঁটার মধ্যে একটা স্বাভাবিক ছন্দ চোখে না পড়ে পারে না। কিন্তু এ লোকটির হাঁটার ধরন সেরকম নয়। বেশ বোঝা যায় শহরের লোক।

এদিকে ওদিকে মাঝে মাঝে ছোট ছোট কতকগুলো গ্রাম দেখা যায়। মাটির দেয়াল আর উঁচু নিচু কুঁড়েঘরের চাল। গ্রামগুলোর পাশ দিয়ে যাবার সময় লোকটা এক একবার থামে। মনে হয়, হয়ত ভাবছে ঢুকবে কিনা। তারপর কি ভেবে প্রত্যেকবারই নিঃসঙ্গ মেঠো পথ ধরেই হাঁটতে থাকে।

রোদের হলকায় কোথাও কোথাও মাটি অসম্ভব তেতে উঠেছে। সে সব জায়গায় বাতাসটা উত্তপ্ত হয়ে ঝিলমিল করতে থাকে। হঠাৎ মনে হয় বুঝি বালির মধ্যে জল চিকচিক করছে।

চোখ কুঁচকিয়ে সেই ঝিলমিলিটুকুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে লোকটা, তারপর অদূরের হিজিবিজি কালো ছোট শালবনটা লক্ষ্য করে এগিয়ে যায়।

'কে বটেন গো—'

একটা কাঁদরের পাশে দুনী ছেঁচছিল কয়েকজন। অনেক নিচে জল। ধাপে ধাপে সেটা তুলে সেচ করার জন্ত তিনটে দুনী লাগাতে হয়েছে। সবার ওপরের ধাপের লোকগুলো কৌতূহলবশে দুনী ছেঁচা বন্ধ রেখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ওরই মধ্যে বুড়ো মোড়ল মত একটা লোক এগিয়ে এসে চীৎকার করে জিজ্ঞেস করে আবার, 'কে যেছেন গো-ও-ও-ও—'

লোকটা অস্বস্তিভরে খানিক থামে। তারপর হাঁটতে হাঁটতেই উত্তর দেয়—

'ভিন গাঁয়ের লোক বটি বাপু, যাবো শালবুনী…'

দূর থেকে আবার প্রশ্ন ভেসে আসে, 'ঘর কুথা-আ-আ…'

লোকটা হাঁটতে হাঁটতেই উত্তর দেয়—'মল্লারপুর—'

বুড়ো লোকটা তামাক খেতে খেতে আরো খানিকটা এগিয়ে যায়। বাঁ হাতটা প্রসারিত করে উপযাচক হয়ে নির্দেশ দেয়—'হই শালবনটোর পুবপাশ দিয়ে ওই দেখা যেছে, একটো সরান পাবেন। সরানটোর পর একটা দুটো তিনটে গাঁ বটে…কিন্তুক উখানে কেনে যাবেন মাশায়, উখানে যে…'

লোকটা বিব্রতভাবে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। আপন মনে অস্ফুটভাবে বলে—'হুঁ। শালবুনীর অবস্থা তাহলে ভালো নয়। লোকগুলোর সঙ্গে একটু আলাপ করে গেলে হত!' তারপর কিছুক্ষণ পরে আবার কি ভেবে মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলে 'ধুত্তারি যতো…'বলে আরো জোরো জোরে হাঁটতে থাকে।

শালবনটাব এক কোণে গিয়ে লোকটা থামল। শালবুনী গ্রামটা এখান থেকে একেবারে কাছে। এলোমেলো কুঁড়েঘরগুলো দেখা যাচ্ছে। কিন্তু লোকটা গ্রামে ঢুকল না। একটা কাটা শাল কাঠের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে রইল ক্লান্ত ভাবে। ছোট শালবনটার ভেতরে কোথায় যেন ঠিকাদারের কয়েকটা লোক কাঠ চেলাই করছে। মাঝে মাঝে বাতাসে শুকনো শালপাতা ওড়াব খড় খড় শব্দ আর অজস্র নানারকম পাখির ক্লান্তিহীন কাকলীর মাঝে কাঠ চেলাইয়ের নিয়মিত ঝপঝপ শব্দটাকেও একটা নৈসর্গিক শব্দ বলেই ভুল হয়। এ সমস্ত কিছুই লোকটার কাছে অত্যন্ত চেনা, কিন্তু তবু কেমন যেন নতুন।

'আহ্!' একটা দুর্বোধ্য যন্ত্রণার শব্দ উচ্চারণ করে লোকটা অস্ফুটভাবে। তারপর হাঁটুর ওপর থুতনিটা রেখে বসে থাকে ক্লান্তিতে আর গভীর চিন্তায়।

'ঠাকুর!'

অনেক দূর থেকে ভেসে আসা এই মৃদু আওয়াজটা শুনে হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠল লোকটা, 'কে!'

দূরে মোষের পিঠের ওপর বসে একটা ন্যাংটা কালো ছেলে গরু চরাচ্ছিল। অন্য গরু আর মোষগুলোকে তাড়া দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল একটা শুকনো গোচর থেকে আর একটা গোচরে। মোষের পিঠের ওপর থেকে ওকে দেখে সেই চিৎকার করেছে, 'ঠাকুর'। অতদূর থেকে সে শব্দটা সুস্পষ্ট ঠাহর করা কঠিন, কিন্তু এই ডাকটা এতই পরিচিত যে শুধু তার স্বরটুকু কানে এসে লাগা মাত্রই লোকটা চমকে উঠল 'কে তুই?'

ছেলেটা মোষের পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়াল। আগন্তুক লোকটার দিকে আর একবার ভালো করে চেয়ে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ঠাকুরই তুমি বটো! বহুৎ দিন দেখি নাই যে—'

'হাঁ তা দুবছর হল! তুই কে?' অন্যমনস্কভাবে বলে লোকটা।

'আজ্ঞা আমাকে চিনবেন না। আমি তো ই শালবনীর লই। আমি হই রুদমপুরের শঙ্কর বাগদীর বেটা—'

'ও। শালবুনীর লোকেরা কেমন আছে জানিস?'

'আজ্ঞা উখানে তো সেই হতে মিলিটারী বসে আছে…'

'হুম—' লোকটা চুপ করে থাকে।

ছোঁড়াটা এদিক ওদিক তাকিয়ে আবার জানায়, একজন অভিজ্ঞ বয়স্কের মত, 'এখন গরিবদের মরণ। আপনারা সেই হতে আর তো এলেন না। কত লুকে বলে বাবুরা হচকিয়ে পলাইল, এখন…'বেশ বোঝা যায় বড়োদের মুখে শোনা কোন একটা অভিযোগ সে হুবহু পুনরাবৃত্তি করল মাত্র।

'পালাল!' হঠাৎ এক মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে হয়ে উঠল ওর সারা মুখ! বিকৃত গলায় জিজ্ঞেস করলে, 'হচকিয়ে পালিয়েছি আমি?'

ছেলেটা ভীতভাবে সরে যায় 'আজ্ঞা—'। তারপর আস্তে আস্তে পেছিয়ে গিয়ে ছুটতে শুরু করে বনের মধ্যে ঢিয়ে।

হচকিয়ে পলাইল…সেই হতে আর তো এলেন না…

ঠিক এই অভিযোগটিকেই ভয় করে এসেছে ঠাকুর। কম অভিযোগের সম্মুখীন তাকে হতে হয়নি। অনেক নিন্দা, অনেক কুৎসা, অনেক মূর্খ প্রতিরোধ, কিন্তু কোনদিন তার সম্মুখীন হতে গিয়ে আতঙ্ক জাগেনি। আজ জাগছে।

আর আতঙ্ক জাগছে এমন কি অন্তের মুখে তার উদ্দেশে রচিত এককালের প্রিয় সম্ভাষণ 'ঠাকুর' ডাক শুনেও। মনে মনে অনেকবার প্রতিজ্ঞা করা সত্ত্বেও শালবনের কোণটি থেকে উঠে সে গ্রামের মধ্যে ঢুকতে পারল না। শূন্য ফাঁপা একটা মানুষের মত ঠায় বসে রইল ওই একই জায়গায়।

ঠাকুর! এক সময় এ ডাকটা ছড়িয়ে গিয়েছিল ঐ অঞ্চলের সমস্ত গ্রামে। ভালোবাসত কিনা কে জানে, কিন্তু ঠাকুর বললেই লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথা ঝাঁকাত। লোকটার আসল নাম ছিল মুরারি। কিন্তু সে নামটা কারো পছন্দ হয়নি। কেউ মনে রাখেনি।

'আমরা লাল ঝাণ্ডার লোক, বুঝলে? আমার নাম মুরারি।

প্রথম এ অঞ্চলে এসে মুরারি পরিচয় নিজের দিয়েছিল ঐ বলে। কিন্তু তাতে কেউ সন্তুষ্ট হয় নি। বুড়ো মতো বেঁটে একটা লোক সাহস করে আবার প্রশ্ন করেছিল 'আজ্ঞা হাঁ, ভদ্দর লুক বটেন। কিন্তু জাতিটো কী আমনার?'

মুরারি না ভেবেই বলে ফেলেছিল, বামুন।

কথাটা শোনামাত্রই মৃদু গুঞ্জন উঠল ওদের মধ্যে। তারপর সশ্রদ্ধভাবে সকলে দণ্ডবৎ করতে শুরু করে দিলে। 'আজ্ঞা তা হবেন বৈকি, ভদ্দরলুক—দণ্ডবৎ হইগো—'

জনকয়েক সাঁওতাল দাঁড়িয়েছিল একটু দূরে। তারা এগিয়ে এল—'তুই বামুন বটিস? তবে তো তুই ঠাকুর হলি!'

'হাঁ হাঁ ঠাকুর বৈকি। দেববংশে জন্ম—'

সকলে সায় দেয়। মুরারির অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই অছুৎ শূদ্র এলাকায় তার নাম চালু হয়ে যায় ঠাকুর বলে। ব্রাহ্মণকে ঠাকুর বলে ডাকাই এ অঞ্চলের প্রাকৃতজনের রীতি।

মুরারি এর পর থেকে বার বার চেষ্টা করেছে এই সম্ভাষণটাকে বর্জন করায়। কিন্তু সফল হয়নি।

'শোনো, ঠাকুর নয় কম্‌রেড। যারা পুরুতগিরি করে তারা ঠাকুর। আর যারা একসঙ্গে লড়াই করে তারা কম্‌রেড। বুঝলে—'

'আজ্ঞা হাঁ। উ ক্যানে বুঝব না?'

কিন্তু পর মুহূর্তে ডাকার সময় কম্‌রেড কথাটা কিছুতেই মুখে আসেনি। অনায়াসে ঠাকুর বলেই ডাক দিয়েছে। মনে করিয়ে দিলে লজ্জিত ভাবে বলেছে 'আজ্ঞা ই ডাকটোই আমাদের চল্‌ হয়ে গেইছে যে—'

যে ডাকটা অচল হয়ে যাওয়া উচিত সেটাকে কিছুতেই অচল করতে না পেরে হাল ছেড়ে দিয়েছিল মুরারি।

শুধু একটা জায়গায় সে সফল হয়েছিল। সে হচ্ছে কেঁদরা মাঝির বৌ সনা সাঁওতালনী। সেই শুধু ওকে ঠাকুর বলে ডাকেনি।

মূল গ্রাম থেকে খানিকটা দূরে একটা ডাঙার ওপর ছিল কেঁদরা মাঝির ছুটি কুঁড়েঘর।

ক্রমে ক্রমে কেঁদরা মাঝির ঘরটাই মুরারির আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল। ছন্নছাড়া মানুষ ছিল কেঁদরা মাঝি। জমি-জিরাত কিছুই ছিল না। ঘরে ছিল তার এক বুড়ি মা, বৌ, আর বাচ্চা একটা ছেলে। কয়েকটা বাচ্চা সহ দুটো শূয়োর। তিনটে ছাগল আর মুর্গী কয়েকটা। কেঁদরা দিনমজুরী করে বেড়াত এখানে ওখানে। কখনো মাটি কাটা, কখনো শালবনে কাঠ কাটা, কখনো দূর নামালে ধান কাটার কাজ। কেঁদরার বুড়ি মার ছিল খানিকটা ডাঙা জমি। তাতে সর যা হত তাই দিয়ে সে বসে বসে সরের ঝাঁটা তৈরী করত, তালপাতা দিয়ে মাথার মাথালি বুনত। আর নিয়ে যেত হাটে বেচতে।

ঘরকন্নার বাকি কাজ, ঘরের সামনে খানিকটা লাউলতা কুমড়োলতার আর তরীর একটু বাগান দেখত কেঁদরার বৌ সনা।

কেঁদরা যখন প্রথম নিয়ে আসে মুরারিকে, তখন ঘরের লোকেরা কেউ খুশি হয়নি। কিন্তু সহ্য করেছিল। মুরারিকে শুতে দেয়া হয়েছিল কেঁদরার মায়ের সঙ্গে আর একটা কুঁড়েতে। ঘরের মধ্যেই শুয়োর থাকার জন্যে মাটির ছোট পাঁচিল দেয়া একটুখানি জায়গা। জায়গাটা যার জন্যে করা হয়েছিল সে জীবটিকে বিক্রি করে দিতে হয়েছে কিছু দিন আগে। সেই খালি জায়গাটায় খড় বিছিয়ে শুতে দেয়া হয়েছিল মুরারিকে। মাথার ওপর বাঁশের মাচা থেকে ঝোলান একটা ঝাঁপির মধ্যে কতকগুলো মুর্গী সারারাত থেকে থেকে খস্ খস্ করে উঠেছে।

ভোরবেলা মুরারিকে আশস্ত করে কেঁদরা চলে গিয়েছিল কোথায় খাটতে। মুরারি কি একটা কাজে অভ্যাসবশে সনাকে ডেকেছিল 'মেঝেন, ও মেঝেন শোনো তো খানিক—'

এ অঞ্চলের ভদ্রলোকেরা সাঁওতাল মেয়েদের ডাকতে হ'লে মেঝেন বলেই ডাকে। কিন্তু সে ডাকটা যে তাচ্ছিল্যের ডাক, অপমানের ডাক, এ ধারণা মুরারির ছিল না।

সনা এসে দাঁড়িয়েছিল ক্রুদ্ধভাবে 'কি বলছিস তুই ?'

মুরারি না ভেবেই তার প্রয়োজনের কথাটা জানাল। কিন্তু সনা নড়ল না— 'কিন্তু তুই কি বলে আমাকে ডাকছিস ?'

'কেন মেম্বেন বলে—'

'ক্যানে মেম্বেন বলবি ?' সনা ভুরু পাকিয়ে সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে রইল মুরারির দিকে।

মুরারি থতমত খেয়ে বলেছিল 'তবে ?'

'উ তুর কে হয় ?' সনার কথার ভঙ্গিতে বোঝা গেল সে কৈঁদরার কথা বলছে। মুরারি অপ্রতিভভাবে জানাল 'কেন, ও তো আমার কমরেড। যারা একসঙ্গে লড়াই করে তারা হল কমরেড—'

সনার সুন্দর তাজা কালো মুখটার ওপর ক্রোধ ও সন্দেহের কোঁচকানিটুকু তখনো যায়নি। তবু একথাটা শুনে একটু অপেক্ষা করল। তারপর অন্যদিকে চেয়ে বললে 'তবে তুই আর উ তো বন্ধু হলি !'

'হাঁ বন্ধু হলাম—'

'তবে আমাকে মেম্বেন বলছিস কেনে ?'

'বেশ, তবে তোকেও কমরেড বলব।' অনিশ্চিতভাবে বলেছিল মুরারি। কিন্তু এই অদ্ভুত ইংরেজী কথাটা শুনে সনার কোঁচকানো মুখ আরো কুঁচকিয়ে উঠল সন্দেহে। কৈঁদরার বুড়ি মা এসে ওকে বাঁচিয়ে দিলে।

'হাঁ তবে মেম্বেন ক্যানে বলবি। উসব কি বলছিস ? তো উ ক্যানে বলবি ? কৈঁদরা তুর বন্ধু হল, তুই আমার ব্যাটা হলি। তো 'ফুল' পাতা, 'বন্ধু' পাতা—'

সনা তখনো ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে মুরারি বিব্রত অনিশ্চিতভাবে জানালে যে বেশ তাহলে এবার থেকে সে সনার সঙ্গে 'ফুল' পাতাল, এবার থেকে সে 'ফুল' বলে ডাকবে, অমনি সে কোঁচকানো সুন্দর কালো মুখটা আদিম সারল্যে খুশি হয়ে উঠল :

'তুর সামনে লাজ নাই আর। তুই ঘরের লুক হলি। তুই আমার 'ফুল' হলি—'

বলে সনা তাড়াতাড়ি ছুটে চলে গেল ওখান থেকে। কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এল। লজ্জিতভাবে হেসে বললে 'এই লে—'

বিস্মিতভাবে মুরারি হাত বাড়ালে, 'কি এগুলো ?'

'ফুল'…সনা কোন সময় এদিক ওদিক খুঁজে কতকগুলো বুনো ফুল নিয়ে এসেছে বন্ধুত্বের স্মারক হিসাবে…

হাঁ, এরা ওকে গ্রহণ করে নিয়েছিল। এই শুকনো রাঢ়ের মাটির আদিম সন্তানেরা, এই কালো কালো সরল মানুষগুলো মেনে নিয়েছিল আগন্তুক মুরারিকে কেউ ঠাকুর বলে, কেউ বেটা বলে, কেউ ফুল বলে। কিন্তু অনায়াস-গ্রহণের এই বিপুল বিস্ময়টুকু কোনো দিন বিস্মিত করেনি মুরারিকে। কারণ ওরা মুরারিকে যত সহজে গ্রহণ করেছিল, ততখানি দৃঢ়তার সঙ্গেই তার প্রত্যেকটি বিশ্বাসকে ওরা প্রতিরোধ করেছে।

মনে পড়ে মুরারির প্রথম জনসভা। তখনো সে ঠাকুর বলে তত পরিচিত হয়ে ওঠেনি। সভার জন্য মুরারি আর কয়েকজন উৎসাহের সঙ্গে এ গ্রাম ও গ্রাম, এধর ওধর প্রচার করে বেড়িয়েছে। তারপর সভার নির্দিষ্ট দিন দেখা গেল কিছু কিছু লোক এসে জুটেছে বটে, কিন্তু কাছাকাছি আসছে না কেউ। সভাস্থলে একটা লাল ঝাণ্ডা পুঁতে আনুষ্ঠানিকভাবে স্লোগান দিয়ে মুরারি একটা আনুষ্ঠানিক জনসভা শেষ করেছিল। লাল ঝাণ্ডার কাস্তে আর হাতুড়িটার মানে বুঝিয়ে দিয়ে বলেছিল 'এ পতাকা হল চাষী আর মজুরের পতাকা, বুঝেছ?'

সবাই চুপ করে রইল। খানিক চুপ করে থাকার পর ওদের মধ্যে থেকে একজন বয়স্ক 'লেট' জাতের ভাগচাষী উঠে এসে বললে 'আজ্ঞা উ নিশানটো একবার আমরা দেখব—'

'বেশ বেশ', মুরারি খুশি হয়ে ঝাণ্ডাটা নামিয়ে এনে ওদের দিয়েছিল। কাপড়ের দোকানে লোকে যেভাবে কাপড়ের জমি পরখ করে, সেই ভাবে ওরা ঝাণ্ডার সালু কাপড়টা নেড়ে নেড়ে পরখ করলে। উলটে পালটে কাস্তে আর হাতুড়ির ছাপটা দেখলে, তারপর নিজেদের মধ্যে গুঞ্জন করতে করতে ফিরে গেল।

সভামণ্ডপ থেকে মুরারি জিজ্ঞেস করেছিল—'কি বলছ?'

'আজ্ঞা না উ আমরা নিজেদের কথা বটে, আমনাদের লয়—' কিন্তু গুঞ্জন যেটা শুরু হয়েছিল তা থামল না। জনসভাও হল না। আস্তে আস্তে যারা জুটেছিল তারা অন্তর্হিত হয়ে গেল।

কারণটা কি মুরারি বুঝতে পারেনি।

কিন্তু তারপর থেকে দেখা গেল লেট আর বাগদী চাষীরা ওঁকে এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছে। —'কি হয়েছে তোদের?' বিরক্ত হয়ে ধমক দিত মুরারি।

'আজ্ঞা না, হবেন আর কি, আপনারা ভদ্দর লুক—।'

'কিন্তু হ'ল কি? কি ভাবছিস সেইটে খুলে বল—'

'আজ্ঞা উসব আমরা কি ভাবব মাশায়? আমাদের কি খেমতা আছে। সেই যে কথায় বলে, 'অনো ভুনো কানা পথ চলি তিনজনা'—সেই হ'য়েছে আমাদের। আমরা কি ভাবব?…তবে লুকে বলছে'…

'কি বলছে লুকে?'

'হেই ঠাকুর দোষ লিও না। কিন্তুক লুকে বলছে তুমরা চাষীর কিছু করতে লারেবে। ক্যানে? না তুমরা ঐ যে পতাকাটি বানিয়েছ, তাতে একটি কেদে (কাস্তে) লাগিয়েছ। কিন্তুক ঐ কেদেতে কি ধান কাটা চলবে? উ কেদেতে দাঁত কই? ই আমাদের কেদে লয়। সোজা সাপটা একেবারে…তাই বলছে ই পতাকাটি চাষীর পতাকা লয়। আমনারা ভদ্দর লুক—'

মুরারি হাসবে না কাঁদবে ঠাহর করতে পারল না। যত বোঝায় যে আসল কাস্তের দাঁত থাকে বটে, কিন্তু ছবি আঁকার সময় ঘোরালো একটা টান দিয়ে দেখালেই তা কাস্তের প্রতীক হয়ে ওঠে। কিন্তু কে কার কথা শোনে।

পরের বা'র সভা করতে যাবার সময় মুরারি কাস্তের ছাপটার ওপর কোনাচে কোনাচে করে কাগজ এঁটে দাঁত বানিয়ে নিয়ে হাজির হয়েছিল। প্রথমে ও বক্তৃতা শুরু করেছিল 'এই হল গিয়ে কেদে, এই দাঁত, চাষী এই দিয়ে ধান কাটে। এ হল গিয়ে চাষীর হাতিয়ার'…

কতকগুলি অবিশ্বাসকে বুঝ দেয়া গেলেও অনেক অবিশ্বাসকে এক ইঞ্চি টলানো যায়নি। তার মধ্যে প্রধান অবিশ্বাসটাই ছিল মুরারির ক্ষমতা সম্পর্কে অবিশ্বাস, মুরারির স্বপ্ন সম্পর্কে অবিশ্বাস।

মুরারি স্বপ্ন দেখেছিল এ দুনিয়াটাকেই বদলে দিতে হবে। নতুন-পাওয়া এক রাজনৈতিক আদর্শ আর আবেগ তাকে দুরন্ত করে তুলেছিল। মনে পড়ে কলকাতার সেই বিরাট জনসভার কথা। ছাত্র, কর্মচারী আর মজুরের জনসমুদ্র। সেই সভায় বড়ো বড়ো নামকরা নেতার মাঝে উঠে দাঁড়িয়েছিল এক মজুর। আঁটো হাফশার্টটার তল থেকে তার চওড়া কাঁধ আর অসম্ভব শক্তিশালী মোটা ঘাড়ের দীপ্ত ভঙ্গিটা এক মুহূর্তে মুগ্ধ করে দিয়েছিল সমস্ত জমায়েতকে। অল্প একটুখানি বক্তৃতা করেছিল সে। চ্যাটালো পেশল হাতটা মুষ্টিবদ্ধ করে বক্তৃতার

শেষে কর্কশ মোটা গলায় মজুরটা হেঁকে উঠেছিল—'হিলা দেঙ্গে! হিন্দুস্তানকো হিলা দেঙ্গে!'

তারপর অনেক ওলট পালট হয়েছে। কিন্তু সেই নির্ঘোষটা মুরারির মাথা থেকে যায়নি। মুরারির সমস্ত স্বপ্নের মধ্যে সে আওয়াজটা আজো বাজে এক গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনির মত—হিলা দেঙ্গে! হিন্দুস্তানকো হিলা দেঙ্গে!

সে স্বপ্নকে সে বাস্তবে দেখবার জন্যে এসেছিল রাঢ়দেশের এই অপরিচিত কোণটায়।

মুরারি বলত তার স্বপ্নের কথা—'এই যে জমি, এই জমির মালিকটা কে? জমিদার? বটে তো! তারপর ধরো ঐ দত্তরা, ২০০০ বিঘা খাস জমি করে নিয়েছে ওরা। তোমাদের ভাগচাষ খাটতে হচ্ছে। কিন্তু ফসল যা হচ্ছে তার বিশ ভাগ ওরা নিচ্ছে ১৮ ভাগ তোমরা পাচ্ছ? কেন! এসব বদলে দিতে হবে…'

ওরা এসব কথা শুনত না যে তা নয়, শুনত মুগ্ধের মত। প্রত্যেকেই নিজের নিজের কাহিনী বলত। কেমন করে বসন্তে চোখ কানা মহাজন দত্তরা একদিন ধর্ম পুজোর দিন ডে লাইট জালিয়ে দেখালে। গাঁয়ের কেউ ডে লাইট দেখেনি। দেখতে গেল। দত্তরা বলে দিলে তোদের সকলের ওপর এক এক টাকা ধার্য রইল। ডে-লাইটের খরচটা তুলতে হবে তো।

তারপর হিসেবের কারচুপীতে সুদের চক্রবৃদ্ধি হারে একদিন দেখা গেল ডিক্রি হয়েছে। জমিতে টান পড়েছে সবার। ডে-লাইট দেখার শোধ দিতে হল জমি বেচে। সকলের ভাগ্যেই এমনি প্রকাণ্ড দস্যুতার নানা ইতিহাস। শালিখ-ডাঙার এক কামার ঐ মহাজন দত্ত আর জোতদার কালী ময়রার দাপটে ভিটেমাটি তুলে দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল। সেই কামার গান বেঁধেছিল:

> বল্ মা দুর্গে বল্ মা শঙ্করী!
> কলিকালে উপায় কি করি
> কানা বেনে আর কালী ময়রা
> কেহ প্লেগ কেহ কলেরা
> একবার যারে ধরিবে তাহারে
> সম্পত্তি না নিয়ে নিষ্পত্তি করে না…

মুরারি বলত, 'তবে? এ ব্যবস্থাটাকেই বদলে দিতে হবে। জমিদার জোতদার চাই না। যে চাষ করে জমি হবে তার। চাষীর হাতে জমি এলে আমরা কলের লাঙল নিয়ে আসব। দেশের চেহারা একেবারে বদলে দেব।

তখন সকলেই মাথা ঝাঁকাত। 'ইটো ন্যায্য কথা বটে।'

'যা বলেছ! তা নয়ত কি?'

কিন্তু দুদিন পরেই দেখা যেত আবার ওরা এড়িয়ে এড়িয়ে চলছে মুরারিকে। 'কি কি হয়েছে তোদের বল্ দেখি—'

ক্রুদ্ধ ধমক দিয়ে দিয়ে ওদের পেটের কথা বার করতে হত মুরারিকে। 'কী হয়েছে?'

'না ঠাকুর! ও লুকে বলছে জমিদারী উঠে গেলে উতো লাটের জমি হয়ে গেল। তখন আরো মরণ। সূর্যি ডুবতে না ডুবতে খাজনা দাও নয়ত নীলাম— উ আমাদের চলবে না।'

ওদের আশঙ্কার বহর দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায় মুরারি।

'না ঠাকুর, উ কলের লাঙল তো আনবেন আপনারা। তবে উ জমি আমরা আর কি প্যাব? উ বাবুরাই লিবে।'

মুরারি ক্রুদ্ধ হয়ে আবার প্রথম থেকে সবটা বোঝাতে শুরু করে কিন্তু মাথা ঝাঁকিয়ে এক অনড় অটল অবিশ্বাসের সঙ্গে ওরা জবাব দেয়⋯'না ঠাকুর; ই কলিকাল বটে, ভালো আমনি কুথা হ'তে করবেন? ঐ আমরা যেমন আছি তেমনি ভালো। ঐ যে কথায় বলে, 'যেমন কলি, তেমনি চলি' তো সেই আমাদের ভালো—'

রীতি! রীতি! আর হাজার বছরের অচলায়তন অভ্যাসের প্রবল অবিশ্বাস। মুরারি প্রথমে কৌতূহলী পরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। এখানকার লাল মাটির লাল আভাটুকুকে মনে হয়েছিল নিতান্ত মরীচিকা। হাজার নাড়া খেলেও এখানকার মানুষ এক পাও নড়বে না। একটুও বদলাবে না। জলের অভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবে, দুনী ছেঁচে ছেঁচে যেটুকু ধান হবে, তা অনায়াসে তুলে দিয়ে আসবে জোতদারের গোলায়। তারপর হাড়িয়া খেয়ে ভুলে যাবে সব। এই অনড় অচলায়তনের ধাক্কা খেয়ে মুরারির স্বপ্ন-জলা চোখ শুধু রূঢ় আর নিষ্ঠুর হয়ে উঠত। কেঁদরা মাঝির কুঁড়ে ঘরের মধ্যে বসে বসে সে গুম হয়ে পুরনো খবরের কাগজ পড়ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। দাওয়ায় বসে বুড়ি মা সরের কাঁটা পাকাতে পাকাতে আকাশের দিকে তাকাত—। আপন মনে বকত। মেঘকে অনুযোগ করত বৃষ্টি দেবার জন্তে :

"হা-হা, হড়াম হড়াম করছিস ক্যানে? ঢেলে দে। ঢাল্। তবে তো মানুষগুলা বাঁচবে—। ঢাল···জমি কানছে, মাটি কানছে···'

আঙিনায় কেঁদরার ছোট্ট ব্যাটাটা কোনরকমে দাঁড়াতে শিখেছে মাত্র। কিন্তু ঐ অবস্থাতেই সে একটা কাঠি নিয়ে অস্ফুট শব্দ করত আর তাড়া দিত শূয়োরের বাচ্চাগুলোকে। শূয়োরের বাচ্চাগুলো এতই ভীতু যে ঐ দেখেই গুট গুট করে স'রে যেত ভয়ে। 'বাহাদুর বেটা, বাঘ মারবে উ বেটা! বাঘ মারবি তুই?' বুড়ি মেঘকে ডাকতে ডাকতেই আদর করত নাতিটাকে।

কিন্তু এর কোনটাই নজরে পড়ত না মুরারির। পুরনো খবরের কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়ে অন্যমনস্ক মুরারি ঠোঁট কামড়াত আর বিড়বিড় করত:

'এরা একপাও কেউ নড়বে না—এক পাও নড়বে না···!'

'ফুল!'

সনা এসে দাঁড়িয়েছিল একদিন সামনে। 'চুড়ি কিনলাম দেখ!'

দুই হাতে কাঁচের চুড়ি পরে দেখাতে এসেছিল ফুল। উ গেইছিল মল্লারপুরে খাটতে। তো লিয়ে এল···'বলে লজ্জিতভাবে হেসেছিল।

মুরারি নিয়মরক্ষার মত একবার তাকিয়ে দেখে তারপর আবার ডুবে গেছে নিজের চিন্তায়।

সনা কোমরে হাত দিয়ে একটু বিমর্ষ আর অবাক হয়ে তাকিয়েছিল এই অদ্ভুত লোকটার দিকে। তার মৃদু গলায় একদিন বলেছিল:

'কি ভাবছিস তুই? ক্যানে এত ভাবছিস?'

মুরারি হড়বড় করে কি বলেছিল কে জানে। সনা তার আদিম সরল চোখ দুটি তুলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিল, 'হেই গো, তুকে দেখে ডর লাগছে ফুল! মানুষের লিগে তুর দরদ নাই···'

কিন্তু এই মানুষেরাও একদিন নড়তে শুরু করলে।

একপা দুপা করে তারা এগোয় কিন্তু বারবার পেছন ফিরে চায়। অচলায়তন ভেঙে নড়ে ওঠে সামনের দিকে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে চলে তাদের সমস্ত অভ্যস্ত রীতি আর কুসংস্কার।

কেঁদরা মাঝি মুরারিকে আশ্রয় দিয়েই নিশ্চিন্ত ছিল। আর কিছু কর যে প্রয়োজন আছে তা ওর মাথায় আসত না। বাইরে খাটতে গিয়ে যেদিন

পয়সা পেত সেদিন মদ খেয়ে আসত। অল্প নেশা হলে আসত টলতে টলতে, অন্ধকারে বাঁশী বাজাতে বাজাতে 'তিতুর তিয়া—তিতুর তিয়া—'

মুরারি টেনে আনত কেঁদরাকে, 'কি কমরেড তোমার যে দেশা নাই! এবার তো লড়াই শুরু হয়ে যাচ্ছে!'

কেঁদরা মাথা ঝাঁকাত টলতে টলতে, 'তা হলে লড়াইটো লাগিয়ে দিলি! ইটা ভালো হল!'

বলে আপন মনে বকত। বকতে বকতে আবার আপন মনে বাঁশীটা নিয়ে বাজাতে শুরু করত 'তিতুর তিয়া—তিতুর—তিয়া—'

মুরারি নাছোড়বান্দা।

'নেশা করলে চলবে না কমরেড! এই এলাকার সমস্ত সাঁওতালদের একান করতে হবে।'

কেঁদরা হঠাৎ বাঁশী থামাত'তুই বলছিস কমরেড। তুকে কথা দিয়েছি তো করব। কিন্তু আমি কেনে করব? আমার জমি আছে না কি আছে? তুরা বলছিস, ভাগচাষীরা ফসলটো লিবে, কিসানরা ফসলটো লিবে। কিন্তু আমি চাষ করলম না। জমিটো উয়োরা কেড়ে লিলে তো আমি চাষ ছেড়ে দিলম। তো আমি ক্যানে যাবো তুদের সঙ্গে? কিন্তু তুকে কথা দিয়েছি তো করব!'

লেট আর বাগ্দী ভাগচাষীরা ভয়ে ভয়ে সন্দেহ করতে করতে তবু শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি হঠাৎ মেনে নিল মুরারির সমস্ত উপদেশ। পাটকিলে মাটির ডাঙা আর খেত কোন এক যাদুতে যেন বদলিয়ে গেল একেবারে।

সেদিন কথা ছিল দল বেঁধে ধান কেটে তুলতে হবে। প্রথম ধানকাটা শুরু হবে মহীন্দ্র লেটের চাষ করা জমিতে। জোতদারের বাড়ীতে ধান না তুলে সে ধান তোলা হবে মহীন্দ্রর ঘরে। গুজব ছড়াল মারদাঙ্গা হবে, পুলিস আসবে, দত্তরা এক থলি টাকা নিয়ে চলে গেছে সদরে, ফিরবে পুলিস নিয়ে।

একসঙ্গে ধান কাটার কথা ছিল কিন্তু দেখা গেল যাদের আসার কথা তারা কেউ আসেনি। যারা এসেছে তারাও মাঠে নামছে না। এখানে ওখানে ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে উৎসুক হয়ে, কিন্তু মাঠে নামছে না। ডাকাডাকি করলেও সাড়া দিচ্ছে না। মুরারি শ্লোগান দিল কয়েকবার। কিন্তু একটা দুটো গলা ছাড়া কেউ সায় দিল না।

ক্রুদ্ধ নিঃসঙ্গ মুরারি গালাগালি দিয়ে হয়রান হয়ে শেষ পর্যন্ত একজনের

হাত থেকে কাস্তে ছিনিয়ে নিয়ে নিজেই গিয়ে দাঁড়াল ধানখেতের মধ্যে। অনভ্যস্ত অপটু হাতে ধান কাটতে শুরু করলে। অনিশ্চিতভাবে তাকে অনুসরণ করল শুধু কৈদরা।

দত্তরা তখনো ভালো করে তৈরি হতে পারেনি। একজন সরকার আর এক হিন্দুস্থানী দারোয়ানকে পাঠিয়েছিল ব্যাপারটা ধমক দিয়ে ফয়সালা করে দিতে। তারা এসে মুরারিকে ছেড়ে ধমক দিচ্ছিল উৎসাহী দর্শকদের। সে ধমক শুনে কেউ প্রতিবাদ করছিল না। বরং জানাচ্ছিল—'আজ্ঞা হাঁ, ই পরের দব্য, রাজার ন্যায্য পাওনাটো তো দিতে হবে। সেটিতে নিজের ঘরে তুলা —ধম্ম হবে না…'

মুরারি ক্ষিপ্তের মত কাস্তে হাতে ছুটে এসেছিল—'কি? ধমক দিতে এসেছ? ভাগো শিগগির! দত্তকে বলে দিও চাষীরা জান দেবে কিন্তু ধান দেবে না! লাঠি তুললে তোমাদের কারো মাথা আস্ত থাকবে না…'

গ্রাম্য সরকার আর দারোয়ান গ্রাম্য লোকদের শায়েস্তা করতে অভ্যস্ত। কিন্তু এই শিক্ষিত শহুরে ক্ষিপ্তপ্রায় মানুষটির প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের কাছে সত্যিই ভয় পেল! গাঁইগুঁই করতে করতে হাঙ্গামা করার বদলে সত্যি সত্যিই পালা'ল মুরারির প্রচণ্ড সাহসের সামনে থেকে।

কাস্তে হাতে খেতে নামতে নামতে ভাঙা গলায় মুরারি আবার হাঁক দিল— 'চলে এসো ভাই! জান দেব, কিন্তু ধান দেবো না…'

মুরারি ভাবতে পারে নি, হঠাৎ দেখা গেল এতক্ষণ যারা উৎসুক হয়ে, ভয়ে ও সন্দেহে এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করছিল তারা কলরব করতে নেমে পড়েছে খেতে। এক মুহূর্তে কোথা থেকে এসে জুটল শ-খানেক লোক। সব চেয়ে ভীতু ছিল যে মহীন্দ্র, সবচেয়ে বেশি চিৎকার করতে শুরু করেছে সে—'হাঙ্গাম করবে? মার কববে? শালা কত জমি নিয়েছে আমাদের। দিব না ধান! দেখি শালার জোর কত…'

এক মুহূর্তের মধ্যেই সারা এলাকার চেহারা বদলিয়ে গেল। এক মুহূর্তে ছড়িয়ে গেল ঠাকুরের নাম—'হাঁ, বাপের বেটা। নাকি বলো? ওই! সরকারটোকে কি রকম জবাব দিয়ে দিলে বাবু। উ ঠাকুর যা বলছে, তা মিথ্যে নয়! বাপের বেটা বটে। ঠিকই বলছে, ই ফসল তো আমাদেরই…'

দূরের হাটেও কথা হত।

'উ শালবুনীতে কে একজনা এসেছে বাপু ঠাকুর। শুনলম বড়া শক্তিমান

মানুষ বটে বাপু। জমিদার জোতদার কেউ চাইতে পারে না উর চোখের দিকে। ধক্‌-ধক্‌-ধক্‌ করে বাপু আগুন! কুছু একটা শক্তি আছে বাপু উ ঠাকুরের, নাকি বলো?' তারপর গলাটা নিচু করে বলত—'উ বলছে কি যে জমিটো চায করে, জমিটো তার। বলছে। বলছে, ধান দিও না...'

'বলছে ধান দিও না?'

'হাঁ বাপু, উ ঠাকুরটো ই সব কথাই বলছে...'

তারপর চুপি চুপি হাসত সবাই। শান্তভাবে হাসত খানিক স্বপ্নে, খানিক সন্দেহে।

আর সবার বেশি ক্ষেপে উঠল কেঁদরা মাঝি।

'তুকে কথা দিয়েছি কম্‌রেড। লড়াইটো লাগিয়েছিলি—ইটা ভালো হল—' বলে কেঁদরা দিনমজুরী ছেড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল ক্ষেপার মত এক সাঁওতাল পাড়া থেকে আর এক সাঁওতাল পাড়ায়।

কেঁদরার বাড়ির আঙিনায় এসে জুটত এ তল্লাটের লোকজনেরা। মহীন্দ্র বাউড়ী, শিবু লেট, শালিখডাঙার এক সদগোপ ছেলে আর অজস্র অচেনা লোক। সবাই যেন পালটিয়ে গেছে। আস্তে আস্তে সবাই মেনে নিয়েছে মুরারির প্রবল ইচ্ছাশক্তিকে। মুরারি বোঝাত তাদের দুনিয়ার সংবাদ। লড়াইয়ের কায়দা। কথা বলতে মুরারির চোখ দুটো সত্যি সত্যিই যেন জ্বলত। কথা যখন বলত তখন সে যেন তার চারিপাশের এই চিরপরিচিত লেট-বায়েন-বাগদী-সাঁওতাল মানুষগুলোর ওপর তাকাত না। যেন সে তাদের দেখতে পেত না। তার ক্ষেপা ক্ষেপা চোখ দুটো যেন এদের অতিরিক্ত কোন এক স্বপ্নের ওপর ঘুরে বেড়াত। যেন এক একরোখা বৈজ্ঞানিক তাকিয়ে আছে তার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার আসন্ন ফলের দিকে; পরীক্ষার উপকরণগুলোর প্রতি তার আর একবিন্দু আগ্রহ নাই। সমস্ত আগ্রহ শুধু সেই আশ্চর্য ফলটুকুর জন্যে।

বৈঠক যখন বসত তখন ফুল ছেলেটাকে কোলে করে দাঁড়িয়ে থাকত দূরে। চুপ করে বোঝার চেষ্টা করত ওদের কথাবার্তা। কখনো তা বুঝতে না পেরে খেলা করত নিজের ছেলেটার সঙ্গেই। ধাড়ী শুয়োরের পিঠের ওপর ছেলেটাকে বসিয়ে হাততালি দিত খুশিতে। ছেলেটা যেই উলটিয়ে পড়ার উপক্রম করত অমনি তাকে জাপ্টে ধরত বুকের মধ্যে। মৃদু গলায় গান গাইত অন্যমনস্কভাবে।

ঐ ঘটনার পর দত্তরা ছেড়ে দেয় নি। পুলিস নিয়ে এসেছে শহর থেকে। দত্তদের ইস্কুল বাড়িতে ঘাঁটি বসেছে পুলিসের। পুলিস কয়েকবার টহল দিয়েছে, কিন্তু কোন হামলা করেনি এখনো। আন্দোলনটা খানিকটা থমকে আছে, যেন চূড়ান্ত হামলার জন্যে উভয় পক্ষই প্রস্তুত হচ্ছে।

মুরারি তাই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াত। কৈদরায় বাড়ির চির অতৃপ্ত শুয়োরের আস্তানাটা ছেড়ে একটা পুঁটলী নিয়ে অন্ধকারে সে নেমে যাচ্ছিল মাঠের মধ্যে।

ছায়ার মত ছেলেটা কোলে করে এসে দাঁড়াল সনা 'তুই চলে যেছিস ফুল ?'

'হাঁ—'

অন্ধকারে কালো আবছায়া শালবনটা থেকে একটা বনজ হাওয়ার ঠাণ্ডা ঝাপ্টা আসে মাঝে মাঝে। একঘেয়ে বনজ শব্দ উঠতে থাকে অনবরত। অনেক দূরে শুধু একটা নোংরা লালচে আভা দেখা যায় কেরোসিনের ডিবের। বনে যারা কাঠ কাটে, তাদের আস্তানার আলো।

ফুল অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে—'তুর চোখ দুটো কেমন ক্ষ্যাপা পারা হয়ে গেইছে ফুল···'

মুরারি নিঃশব্দে হাসে, 'ভয় করছে ?'

'হাঁ ফুল ডর হচ্ছে। বড়া ডর হচ্ছে···তুই সর্বনাশ করবি আমাদের! উকে তুই বন্ধু করেছিস। উ কথা দিয়েছে, জান দিবে তো ধান দিবে না। আমাদের জাত তো কথা ফেরত লেয় না···কিন্তু তু সর্বনাশ করবি উয়ার !'

অভিযোগ, আশঙ্কা আর বেদনায় কেঁপে উঠেছিল এই সরল মেয়েটার কণ্ঠস্বর।

মুরারি বলেছিল—'আমরা যে কম্‌রেড ফুল। আমাদের নিজেদের কি বিপদ হবে, তাতো ভাবলে চলবে না···'

সনা অন্যদিকে তাকিয়েই বলেছিল—'উ রোজগার করে না, বাঁশী বাজায় না, উকে তুই ক্ষেপা-ক্ষেপা করে দিয়েছিস ফুল !'

দুদিন পরেই প্রত্যাশিত হামলাটা হল। একদিন সশস্ত্র পুলিস মার্চ করে গেল শালবুনী গ্রামটার ভেতর দিয়ে। প্রত্যেকটি ঘরের ভেতর ঢুকে তল্লাস চলল। অকারণে তছনছ করা হল জিনিসপত্র। হঠাৎ হকচকিয়ে গেল সবাই। কথা ছিল সশস্ত্র হামলাকে বাধা দিতে হবে সজোরে। কিন্তু কেমন থমকে গেল সবাই।

নিরুপায় মহীন্দ্র বাউড়ী শেষ পর্যন্ত ফিরে এল মুরারির কাছে—'উ হবে না ঠাকুর! তার চাইতে শুনো তোমায় বলি—'

বলে মহীন্দ্র বাউড়ী চোখ বড়ো বড়ো করে পরিপূর্ণ আস্থার সঙ্গে জানাল—তিন ক্রোশ দূরে এক বুড়ো গুনীন আছে। খুব নাম। তুকতাক যা জানে অব্যর্থ!

মুরারি ক্ষিপ্তভাবে জিগেস করেছিল—'কিন্তু তাকে নিয়ে কি হবে?'

মহীন্দ্র অবাক হয়ে বললে—'ক্যানে, পাঁচ টাকা লাগবে। আর উ দারোগাটির নাম লাগবে। উ যদি একবার মন্ত্র জুড়ে বানটি মারে তো দেখতে হবে না—'

'বান মারা' হল এক তান্ত্রিক প্রক্রিয়া। মহীন্দ্রর ধারণা, এত সশস্ত্র পুলিসের সামনে বন্দুকের সামনে বাঁচার একমাত্র উপায় এই প্রক্রিয়াটি। তাহলেই দেখা যাবে সমস্ত পুলিস পরদিন যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে 'জ্বলে গেল! জ্বলে গেল!' চীৎকার করতে করতে মরে শেষ হয়ে যাবে।

দাঁতে দাঁত চেপে অপ্রস্তুত মহীন্দ্রকে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল মুরারি।—'তোমাদের দিয়ে হবে না, আমিই যাব···'

কিন্তু মুরারিও পারেনি লোক জোটাতে। পথের মধ্যে আচমকা গ্রেপ্তার হয়ে গিয়েছিল শুধু। গ্রেপ্তার করে নিয়ে পুলিসের দলটা তাকে কয়েদ করে রেখেছিল দত্তদের স্কুল ঘরটাতে। খাসি কাটা হয়েছিল দত্তদের বাড়িতে। ঠিক ছিল খাসি খেয়ে বিকেল বেলা রওনা দেবে পুলিস-দলটা।

শূন্য স্কুল-ঘরটাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উদ্‌ভ্রান্তের মত পায়চারি করছিল মুরারি। শেষ মুহূর্তে যেন তার অসম্ভব মূল্যবান বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাটা ভেস্তে গেছে। যে উপকরণগুলিকে সে জোগাড় করেছিল, হঠাৎ মনে হল সেগুলি যেন ভেজাল দেয়া।

এমন সময় স্পষ্ট শোনা গেল মাদলের আওয়াজ।

ড্রুম্ ড্রুম্ ড্রুম্। মাদল বাজছে, সাঁওতালী মাদল। শিকারের জন্যে সাঁওতালদের জড়ো করার সময় ঐ মাদল বাজে।

স্কুল-ঘরের জানলার শিক ধরে উৎসাহে পাগলের মত চীৎকার করতে লাগল মুরারি:

'লাল সেলাম! কম্‌রেড! লাল সেলাম!'

একমুহূর্তের জন্য দেখা গিয়েছিল সেই অপূর্ব দৃশ্যটা। মাদল বাজাতে বাজাতে সবার আগে আসছে কৈঁদরা। তার পেছনে এলোমেলো এক

দঙ্গল কালো কালো লোক। কারো হাতে লাঠি, কারো হাতে সড়কি, কারো হাতে তীরধনুক।

তাড়াতাড়ি এসে রুক্ষভাবে জানলাটা বন্ধ করে দিল সেপাইগুলো। বন্দুক নিয়ে তৈরি হয়ে গেল। কিছু ঘরের মধ্যে; কিছু বাইরে। নিঃশ্বাস আটকে রইল মুরারি—দূর থেকে দুর্বোধ্য ঘোড়ো আওয়াজটা মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে দ্বিগুণ জোরে কেঁপে উঠছে এক ভয়ঙ্কর হুঙ্কার—'ছিনিয়ে লুব! উ ঠাকুরটোকে ছিনিয়ে লুব আমরা……'

ছিনিয়ে নিতে তারা পারেনি। কেঁদরা আর মহীন্দ্র শুধু বুকে গুলি নিয়ে জান দিয়ে তাদের শপথ রক্ষা করে যায়। জেলখানার ভেতর থেকে নানাসূত্রে মুরারি শুনেছিল সমস্ত ঘটনা। শুনেছিল দুঃসাহসী মহীন্দ্র কেমন করে সমস্ত গুলি অগ্রাহ্য করে ছুটে গিয়েছিল জানালাটার কাছে। কেমন করে কেঁদরা এক তীর দিয়ে বিঁধেছিল একটা সেপাইকে। তারপর গুলি খেয়ে পড়ে যাবার সময় বলেছিল—'উ ঠাকুরকে বলিস, একটা কথা যখন দিলম, তো সে কথাটি ক্যানে ঘুরাবো? জানটি দিব, কিন্তু ক্যানে ধান দিব……'

মহীন্দ্র হাসপাতালে গিয়ে মরে। মরার সময় নাকি ভুল বকত—'উ গুনীনটোকে পাঁচটি টাকা দিলি না ঠাকুর? দিলে ভালো করতিস। উদ্দেরকে আর বাঁচতে হ'ত না……'

দীর্ঘ দু'বছর জেলে আটক থেকেছে মুরারি। সাথীরা ওকে তার আন্দোলনের গল্প করতে বলেছে। অনেকেই ওকে ভেবেছে বীর। কিন্তু ও নিজেকে তা ভাবতে পারেনি। যতবারই ঐ ঘটনার কথা মনে হয়েছে মুরারির ততবারই ধ্বক করে উঠেছে ওর বুকের মধ্যে। যন্ত্রণায় গলা আটকে গেছে। কেবলি মনে হয়েছে—ওরা মরে গেল। এত সহজে জীবন দিয়ে দিল ওরা!

মুরারিকে ওরা পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি। তবু এক নিষ্ঠুর অভিযানকারীর মত মুরারি নিজের প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে ওদের টেনে নিয়ে গেছে এক অনভ্যস্ত অনিশ্চিত ধ্বংসের মধ্যে। ওদের দিকে তাকায়নি। তাকিয়েছিল শুধু নিজের স্বপ্নটুকুর দিকে—'হিলা দেজে! হিন্দুস্থানকো হিলা দেজে!'

মুরারি কাপুরুষ নয় তবু মুরারিই বেঁচে রইল। কিন্তু কথা রাখবার জন্যে প্রাণ দিল মহীন্দ্র, কেঁদরা……

রাজের এই দুর্গম অচলায়তনকে দুই হাতে টেনে হিঁচড়ে বদলে দিতে চেয়েছিল

মুরারি। জেলখানায় প্রথম সে অনুভব করল, সে নিজে বদলে গেছে। সে কোনদিন ভাবেনি তার চোখ দিয়ে জল বেরুতে পারে। কিন্তু যখনই সে ভেবেছে এই সরলবিশ্বাসী কালো মানুষগুলোর কথা, তখনই কেন জানি গলা বুঁজে এসেছে একটা যন্ত্রণাকর কান্নায়। ধিক্কার জেগেছে নিজের ওপর—ওরা ভেবেছিল মুরারি তাদের নিয়ে যেতে পারবে তাদের স্বপ্নের দিকে, কিন্তু মুরারি পারেনি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ওরা মুরারির ওপর যতটুকু আস্থা রেখে গুলির মুখে এগিয়ে গিয়েছিল, মুরারি তার সমান হয়ে উঠতে পারেনি।

'হিন্দুস্থানকো হিলা দেঙ্গে' এই নির্ঘোষটা মনে পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে মুরারির মনে পড়ে আর একটা মৃদু অভিযোগ—'তুই সর্বনাশ করবি মুর্ল!'

দুই বছর জেলখানায় উদ্গ্রীব হয়ে ছিল মুরারি রাঢ়প্রান্তের এই এলাকাটির খবরের জন্যে। দুই বছর টুকিটাকি যেটুকু খবর এসেছে, তা আনন্দের নয়, নির্যাতনের। তা সত্যি না মিথ্যা তাও কেউ হলপ করে বলতে পারত না।

'কেঁদরার বউয়ের কি হয়েছে জানো?'

না কেউ জানে না। কেঁদরার বুড়ি মা-টা মারা গিয়েছিল। কেঁদরার তো জমিজমা ছিল না। পুলিস এসে খুব অত্যাচার করে ওদের বাড়িতে। তারপর কেঁদরার বৌটা কোথায় চলে গেছে কে জানে! কোন ধানকলে খাটতে না কি কোন বনে কাঠ চেরাইয়ের কাজে কামীন হয়ে!

'মহীন্দ্রের ঘরের লোকজন?'

'ওদের ঘরে আগুন দিয়ে দিয়েছে দস্তরা। মহীন্দ্রের বুড়ো বাপটা অন্য গাঁয়ে গিয়ে ভিক্ষে করছে……'

'সদ্‌গোপদের ছেলেটা?'

'ও গাঁয়ে থাকতে পারেনি। আর তো কেউ সেই ঘটনার পর ওখানে যায়নি। কোন কম্‌রেড যেতে পারেনি। লোকও কেউ ছিল না…। ঐ সদ্‌গোপের ছেলেটাই ঐ ঘটনার পর আবার লোকজনকে জোটাবার চেষ্টা করে। পুলিসের ভয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত গ্রামের কেউ আর ভয়ে আশ্রয় দেয়নি। গাঁয়ের মেয়েগুলোই হাঙ্গামা লাগিয়েছিল—এ ছোঁড়াগুলো পরের কথায় নেচে আমাদের সব্বনাশ করে দিলে। আবার এলে ঝাঁটা পেটা করব……'

মুরারি এ খবর শুনে আক্ষেপ করত না। শুধু গুম হয়ে যেত। গলার

কাছে কি একটা আটকে যেত। মনে হত, ওরা অন্যায় কিছু করেনি…

কিন্তু দু বছর পরে হঠাৎ যেদিন ও হাইকোর্টের কি একটি রায়ে ছাড়া পেয়ে গেল, সেদিন ও আতঙ্ক বোধ না করে পারেনি। ছাড়া পাওয়ার পর প্রথম যদি কোথাও যেতে হয় তো যাওয়া উচিত সেই পাটকিলে মাটির এলাকায়। সেই রক্তের দাগগুলোর কাছে।

কিন্তু কেমন করে সে যাবে? কেমন করে গিয়ে দাঁড়াবে সেই সর্বনাশের সামনে?

মুরারি রীতিমত ভীত হয়ে উঠেছিল। দুই বছর নির্মম অত্যাচারে অত্যাচারিত রাঢ়ের এই জংলা গ্রামটা যেন তীব্র অভিযোগ নিয়ে তাকিয়ে আছে। সে দৃষ্টি কেমন করে সে সইবে!

সমস্ত রাস্তাটা সে ক্ষিপ্তের মত মাঝে মাঝে আপন মনে বিড়বিড় করেছে। তারপর ঠোঁটে ঠোঁট চেপে কোনরকমে পৌঁছিয়েছে শালবনটার ধারে। কিন্তু আর একবার ভরসা পায়নি। গাঁয়ের মধ্যে ঢুকতে পারেনি।

গাঁয়ের মধ্যে ঢোকার যতটুকু ইচ্ছে ছিল, তা ভেঙে গেল ঐ ন্যাংটা রাখাল ছেলেটার কথায়—'সেই হুচকিয়ে পলাইলেন, তাব পর হতে তো কেউ আর এলেন না—'

মুরারি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়াল। শালবনটার পাশ দিয়ে দূরে পাহাড়গুলোর ওপাশে সূর্যটা অসম্ভব লাল হয়ে ডুবে গেছে অনেকক্ষণ। ওদিককার আকাশটা জুড়ে দগদগে লাল আভাটা ক্রমে ক্রমে নিভে আসছে। সূর্য ডোবা টের পেয়ে শালবনটার প্রত্যেকটা গাছে গাছে পাখিগুলো শেষবারের মত যে তুমুল কাকলী শুরু করেছিল, তাও থেমে এসেছে। একটা অদ্ভুত শুকনো বনজ গন্ধের সঙ্গে মিশে সন্ধ্যেটা ছড়িয়ে পড়ছে মাঠ, ডাঙা, আর শালবনটায়।

মুরারি উঠে দাঁড়াল। না, গাঁয়ে সে ঢুকতে পারবে না। ফিরে যাবে। সমস্ত দৃশ্যপটটা সে একবার চোখ ভরে দেখে নিল। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল কেঁদরার ডাঙাটার দিকে। ফিরে যাবে। শুধু যাবার আগে একবার দেখে যাবে কেঁদরার জনশূন্য ভিটেটা।

অন্ধকারে এক পা দু পা করে এগিয়ে গেল মুরারি। কেঁদরার মা যেসব গাছগুলোর পরিচর্যা করতো, সেগুলো এলোমেলো বেড়ে উঠে এককালের তকতকে নিকনো ভিটেটাকে জংলা করে তুলেছে। কুঁড়ে দুটোর দেয়ালগুলো এখনো

ঠিকই আছে। শুধু ওপরের চালাটা নেই। দেয়ালের ওপরগুলো কালো হয়ে আছে এখনো। চাল পোড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালের ওপরটাও পুড়ে কালো হয়ে আছে।

আমগাছটা আছে এখনো। ঐ গাছটার তলায় বসে কেঁদরা বাঁশী বাজাত। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গিয়ে মুরারি ঢুকলো ভাঙা ঘরটার ভেতরেই। শূয়োর থাকার জন্ম ছোট্ট প্রাচীর তুলে ঘরের মধ্যে যে ছোট ঘরটুকুতে ও খড় বিছিয়ে ডেরা বানিয়েছিল, সেটা আছে। শুধু খড়গুলো নেই। তার বদলে রোদ আর জল পেয়ে মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে উঠেছে ঘাস, ঝোপঝাড় আর শেয়ালকাঁটা।

ডিটেটা পার হয়ে লোকাল বোর্ডের রাস্তাটা ধরে মুরারি ফিরে যাচ্ছিল। এমন সময় দূর হতে কে ডাকল—'ফুল।'

মুরারি চমকে উঠল। অস্ফুটভাবে বলল—'কে, কে।'

'হাঁ, দাঁড়াও গো খানিক,

দূরে আবছায়ার মত মূর্তিটা দ্রুত কাছে সরে এল। সনা হাঁপাচ্ছিল। বেশ বোঝা যায় অনেক দূর থেকে দ্রুত গতিতে সে হেঁটে এসেছে। মুরারির সামনে দাঁড়িয়ে সনা স্থিরভাবে মুরারির দিকে তাকাল—'কুথা চলে যেছিস ফুল?'

মুরারি উত্তর দিল না।

'তুই পালাই যেছিস? একটো ছোঁড়ার কাছে শুনে ছুটতে ছুটতে এলাম…'

মুরারি যন্ত্রণায় অন্যদিকে তাকাল। 'ফুল, আমি সব শুনেছি…' তারপর হঠাৎ রূঢ়ভাবে অকারণে বিশদভাবে বোঝাতে শুরু করল তার ভুল হয়েছিল। লড়াইয়ের কায়দায় ভুল হয়েছিল…

বলতে বলতে মুরারি থেমে গেল এক সময়।

সনা শুনছে না। হঠাৎ যেন কি একটা আশা ভেঙে গেছে তার। তীব্র দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে তাকিয়ে যেন যাচাই করে নিচ্ছে মুরারিকে। 'হেই ফুল। তুর কথা বুঝতে লারছি। তুখে চিনতে লারছি। লুকে তুর লেগে কত বলেছে। হুই দেখ উরা এসে গেল। কিন্তু তুকে চিনতে লারছি ফুল…'

শুধু ফুল নয়। আরো অনেকে এসে দাঁড়িয়েছে ওর চারপাশে। গাঁয়ের বুড়ি বুড়ি মেয়ে, বাচ্চা অনেকে—আরো অনেকে আসছে। মুরারি নির্বোধের মত তার চারিপাশে চাইলো। তার চারি পাশে কি হচ্ছে সে যেন আর কিছুই বুঝতে পারছে না।

কাঁদছে অনেকে, মুরারির গায়ে হাত দিয়ে পরখ করে দেখছে সবাই, হাত

বুলিয়ে বুলিয়ে দেখছে 'ঠাকুর ভালো আছো? ভগবান তুমার ভালো করুক ঠাকুর, বেঁচে থাকো। কবে ছাড়া পেলে গো?…হায় হায় আমাদের কথা আর শুধায়ো না। তুমরা কেউ তো ছিলে না ঠাকুর…এই দেখো হাল দেখো আমাদের। ধান নাই গো দেশে…আর এই কাপড় পরে আমরা মেয়েরা চলতে পারি?'

মুরারি বিব্রতভাবে এলোমেলো কি কয়েকটা কথা বলল। তারপর চুপ করে গেল।

'অত্যাচারের কথা আর বলব না ঠাকুর। তুমি এসেছ, এর একটা বিহিত করো এবার নয়ত ছাড়ব না—' বুড়ি বুড়ি মেয়েরা একান্ত আশায় তাকিয়ে আছে মুরারির দিকে। অভিযোগ নয়, তারা তার কাছে দাবি জানাতে এসেছে। এক মুহূর্তে মুরারির চোখ থেকে সমস্ত আতঙ্কটা কেটে গেল। সমস্ত আত্মবিশ্বাস তার যেন ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে সেই নির্ঘোষটা—ছিলা থেকে আগের চেয়ে আরো রক্ত আরো দুর্জয় হ'য়ে।

'আবার আন্দোলন করতে হবে। বুঝেছ। আবার জমায়েত করতে হবে সবাইকে—' পুরুষেরা দাঁড়িয়েছিল মেয়েগুলোর পেছনে। শান্তভাবে তারা সায় দিল 'আজ্ঞা তা বটে! আমাদের দুটো লোক গেলছে কিন্তুক আবার তো লাগতে হবে…'

'হাঁ লাগতে হবে—।'

আস্তে সবাই আবার ফিরে গেল। গাঁয়ে এখনো পুলিস ক্যাম্প আছে। 'ঠাকুর ফিরে এসেছে' এ খবরটা যেন হাওয়ায় ছড়িয়ে গিয়েছিল। পুলিস ক্যাম্প এড়িয়ে নিঃশব্দে ওরা এসে জুটেছিল ঠাকুরের পাশে। আবার নিঃশব্দে চলে গেল। বলে গেল—'তুমাকে আর ছাড়ছি না ঠাকুর! মনে রেখো—'

শুধু সনা তখনো দাঁড়িয়েছিল। সে এ গাঁয়ে থাকে না। মল্লারপুরের ধানকলে কাজ করে। ধানকলে কাজ নেই বলে এসেছিল এই বনে কাঠ কাটতে। ফিরে যাবে পশ্চিম দিকের একটা সাঁওতাল গ্রামে। সব চলে গেলে মৃদু স্বরে সে বললে—'উ বলেছিল আমাদের জাত কথা ফেরত লেয় না! জানিস ফুল…'

বলে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

'কাঁদিস না ফুল—' ব্যথিতভাবে সান্ত্বনা দিল মুরারি। তারপর কি ভেবে বললে, 'জানিস ফুল, আমার কি ভুল হয়েছিল? আমি মানুষকে দেখি নাই।

দুষ্মন্তকে তেমন করে দেখি নাই।' 'তুই-ই সেকথাটা আমায় বলেছিলি একদিন—"

সনা শান্ত হয়ে শুনলে ওর কথাগুলো। তারপর শান্তভাবে আঁচলচাপা দিয়ে আবার কাঁদতে শুরু করলে—

'না কাঁদব! খানিক কেঁদে নিই।...'কেনো ভুল করলি ভুল? আর ভুল করিস না...'

কালরাত্রি

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্ধকার ছোঁওয়া যায়। আকাশের হু হু কান্না। ফিসফাস অঝোর অশ্রুতে
ভরে গেল এ অঞ্চাট। এ বিচিত্র কালরাত্রি কোনদিন আসল ভোরের
পাবে না হদিস বুঝি। সোঁ সোঁ হাওয়া, হি হি হাওয়া অহরহ চোবল চালায়
যাতনা ছটফটে গাছে। এ রাত-রাজার দেশে নিশাচর হুতাশন সাপ
রাতে রাতে যুগে যুগে কেবল ভরাট করে রাশি রাশি অমের মৃত্যুর
কড়ির পাহাড়, সাদা হাড়ের পাহাড় আর ঘোরালো ঝড়ের জটা তুলে
লক্ষ লক্ষ নাকাড়ায় ছিঁড়ে ছিঁড়ে কুটিকুটি মরাপাখী-বিবর্ণ সকাল
টেনে আনে। মাদারের বৈঠা ব্যর্থ, ভাঙা নায়ে কেবলই চলকে উঠে জল
ডুবল অথৈ দরিয়ায়। পথে পথে কান্না বাজে এ রাত-রাজার দেশ জুড়ে
ঘোরাও বন্যার ঘন কলোরোলে ভেসে গেল টিয়া ময়না বুলবুলি কোকিল।

তবুও প্রথম যামে স্মৃতির পুরনো প্রেত ঘুরে মরে বিজন প্রাসাদে
হাতিশালে হাতি ছিল, ঘোড়াশালে ঘোড়া, ছিল রামধনু আলোর বাহার
রাজকন্যা তুমি যেই সর্বনাশা কুচক্রজারিত ফল ছিঁড়ে মুখে দিলে
নিয়ে এলে অন্ধকার, হাহাকার, মহামার রাত্রিচারী লোভাতুর সাপ।
লুব্ধকের লালাসিক্ত তিক্ততার রিক্ততায় শববাহী বিষণ্ণ শকট
এদিকে ওদিকে যত ছড়ানো জ্বলন্ত চিতা তারই মাঝে থমকে দাঁড়াল।

কতবার কতজনা শানানো নানান অস্ত্রে হানা দিল নিশুতি রাত্তিরে,
ময়াল আঁধির গর্ভে তারা সব মিশে গেল। টিপটিপ আকাশ-কাঁদনে
শাওনিয়া গোঙানির সুর বাজে, নিদ্রাহত রাজকন্যা, ঝিল্লির ঝনকে

ভয়াবহ কাল ঘুম। গাছে গাছে কালধাম, শীর্ণ গায়ে সারাটা মুলুক
হে হৃদয় সমুত্থান, এবারে সওয়ার হও, চূড়ান্ত কশার হিলিবিলি
বিদ্যুৎ লীলায় জেগে, দুরন্ত অশ্বের খুরে আগুনের আরক্ত কমল
ফোটাও ফোটাও তুমি। লোটাও সাপের মাথা করাল ভয়াল তরোয়ালে।

আজ সেই কালরাত্রি। আজ রাতে মুখোমুখি আমি আর মৃত্যুর নাগিনী।
আজ রাত্রি পার হলে নিবিড় নীলকেশা অপরূপা আয়ুর কন্যাকে
আমার বাহুর ঘেরে পাব। আজ রাত্রি পার হলে প্রাণের ডালিম বীজে
দীর্ণ হবে সবুজ খোলশা এক। জীর্ণ সিঁড়ি হাজার হাজার ধ'সে যাবে,
গুরু গুরু ডাক ছেড়ে অতল পাতাল তাকে মুক্তি দেবে প্রশাখা পল্লবে,
বউকথাকও ঘাট আবার মুখর হবে গাগরী গুঞ্জন কলরবে।

আজ সেই কালনিশি। আজ রাত্রে মুখোমুখি আমি আর মৃত্যুর নাগিনী।

আমরা নতুন যৌবনের দূত

পরভেজ শহীদী

আমরা নতুন যৌবনের দূত :
বসন্তের ছাড়পত্র, আমরা শীতের মৃত্যুপরোয়ানা;
সুকুমার কৌমার্যের বাহন আমরা বুথবন্ধ;
আমরা পেয়ালা আর সরাবখানের অতৃপ্ত আত্মা,
মাতাল মাথা-জাগানোর অগ্নিগর্ভ বাসনা আমরা,
আগুনলাগা লাল গোলাপের বিচ্ছুরিত স্ফুলিঙ্গ, স্ফুলিঙ্গ :
—আমরা নতুন যৌবনের দূত।

বুকে আমাদের দাউদাউ দাবাগ্নি বহ্নিমান;
ভোরের তৃষ্ণায় চাতক আমাদের নিঃশ্বাস
কখন সে উজ্জ্বল সোনালি রোদ,
অন্ধকারের কোটরে কোটরে দরজায় দেয়ালে
সেই উজ্জ্বল রোদ্দুর কখন বড় বড় ফাটল,
আর দু'চোখ আমাদের অদম্য হৃদয়ের প্রজ্বলন্ত আলামুখী।
আমরা নতুন যৌবনের দূত।

স্নায়ুতে আমাদের উদ্দাম বিদ্যুৎবন্যা ঝিন্‌ঝিন্ ঝিন্‌ঝিন্,
খ্যাপা ফুলকিরা ওড়ে এলোমেলো, ঝিলিক দেয়, যেন ঝড়,
জলন্ত উল্কারা যেন সারাদেহে চারিয়ে দেয় সূর্যের হল্‌কা,
আর গন্‌গনে-আগুন ধমনীতে আমাদের দুরন্ত-স্রোত গলন্ত ইস্পাত।
—আমরা নতুন যৌবনের দূত।

অফিসই হোক, ইস্কুলই হোক, কারখানাই হোক,
নিবিড় চিন্তার আর আবেগের নিভৃত নিকুঞ্জ হোক না সে,
মাঠের জমিন সে কি সবুজ? কিংবা ঘুরঘুটি সে কি
ধোঁয়ার চাঁদোয়া?
আজ ঐকতানে মুখরিত সকলেই, সকলের গলায় গলা মেলায় যৌবনের গান।
—আমরা নতুন যৌবনের দূত।

হাসির মাধুরী, সে কি কুটিকুটি হবে অ্যাটমবোমায়?—না, কখনো না।
স্পষ্ট ভাষণ কি হ'তে পারে ডলারের সামনে নতজানু?—না, কখনো না।
গানের পাগলামি সেও চাঁদির ঝন্‌ঝনে ডুবে যাবে?—না, কখনো না।
তবে কেন ভয় করব মৃত্যুকে? জীবনেরই জীবন্ত প্রেরণা আমরা
কেন ভয় করব?
—আমরা নতুন যৌবনের দূত।

যে-বিচিত্র রূপকথা লিখে গেছে কুলপ্লাবী প্রমত্ত ঢেউ,
যে-স্বপ্নের লালিমায় লাল ইওরোপের নদনদী অপরূপ,
ইয়াংশির সুধাকণ্ঠ যে-কাহিনী বলে শতমুখে—
সে-কাহিনী আমাদেরই অতীতের অভ্যুত্থান, অতীত কীর্তি।

—আমরা নতুন যৌবনের দূত!

লজ্জায় মুখ লুকিয়ে ফেলবে কবে ঘূর্ণি অ্যাটলাণ্টিক?
এরি মধ্যে বুক কাঁপছে ভাখো ভীরু প্রশান্ত মহাসাগরের!
আমাদের এ সমুদ্রযাত্রা চিরকালই দিগ্বিজয়ের,

নিত্য নতুন দিগ্বিজয়ের,

প্রলয়ের এই সমুদ্রে শান্তি আর স্বস্তির একমাত্র কাণ্ডারী আমরাই।

—আমরা নতুন যৌবনে দূত!

নবোদ্ভিন্ন গোঁফের রেখায় রূখে দাঁড়িয়েছে আজ উদ্ভিন্ন যৌবন—
দাও, দাও, প্রাণোচ্ছল জীবনে বেড়ে উঠতে দাও, এই তার দাবি;
আকণ্ঠ তৃষ্ণায় দাও পান করতে দাও পূর্ণ পানপাত্রে জীবনমদিরা!
ইয়ারের জমায়েতে হাসির হর্‌রায় দাও ফেটে পড়তে দাও!
কা'কে ভয় দেখাতে চাও, লোলচর্মে বলিরেখা বার্ধক্যের প্রলেপে মেখে

ভয় দেখাতে চাও কাকে?

—আমরা নতুন যৌবনের দূত!

ভালবাসা আর সৌন্দর্যের নন্দনকানন আমরা নিশ্চয় জয় ক'রে নেবো,
খুশির ভোর আর সুখের সন্ধ্যা আমাদেরই মুঠোয় অবধারিত,
ছিনিয়ে আনবো আমরা, নিশ্চিত ছিনিয়ে আনবো আমাদের স্বত্বস্বর্গকে।
বাহাত্তরে আহাম্মকের বাগীরা এত ক্ষিপ্ত কেন! আহা, এত ক্ষিপ্ত কেন!

—আমরা নতুন যৌবনের দূত!

অনুবাদ: মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

ইচ্ছামতী

জগন্নাথ চক্রবর্তী

হে নদি, আবেগ-বন্যায় ধরো ধরো,
তীর ম্রিয়মান লজ্জাবতীকে কখনও কি মনে করো ?
একটু রোদের আলোর হাওয়ার ছোঁয়ার একটু গানে
দোলা লাগে যার প্রাণে,
তোমার দুধারে লতায় লতায় সবুজের জাল বোনা
কভু যার থামলো না,
তার বাহু থেকে লজ্জা কে কাড়ে
ভয়ে-বোজা চোখ খোলায়,
কুণ্ঠাজড়িত স্বপ্ন চোখের তোলায় ?
লজ্জাবতীকে তোমার তুফানে উত্তাল করে দোলাও
হে নদি, আপন বন্যায় ধরো ধরো
লজ্জাবতীকে তরঙ্গময়ী করো।

তোমার গভীরে ঘূর্ণির বীজ বাড়ে
দুরন্ত রাতে হঠাৎ তীব্র কশাঘাত লাগে পাড়ে,
সাজানো বাগান ধ্বসে ধসে যায়—
দ্বীপেরা হারায়—
প্লাবনে প্লাবন লাগে চারিদিক—
সংঘাত এসে প্রহরে প্রহরে নিরিবিলি সুখ কাড়ে
নদীর গোপন গভীরে ঘূর্ণি বাড়ে।

ইছামতীর গোপনে আজ স্বপ্নের ছায়া নামে—
পাখির বাকের ঢেউয়ের ফুলের নীলের ওপার দেশের

পতাকার রক্ত নামবেই অবশেষে
নামবেই এই দেশে।

জাহাজ এল কি ?
গন্ধভরা মাঠ, ওমভরা মাটি, নরম আখরে মোড়া
নীল নীল ধান, বিদ্যুৎ-চোখ, লক্ষ যোজন জোড়া
মুক্তির ঘ্রাণ, সোনালি সবুজ লাল হলুদের মেলা
তার ছোঁয়া এসে পৌঁছয় বুঝি আসন্ন ভোরবেলা !

নদীর গভীর ঢেউয়ের নূপুর পাখি হয়ে গেল দূরে
রাত্রি নামলো দিগ্‌দিগন্ত জুড়ে।
অন্ধ গায়ক একতারা নিয়ে রেললাইনের পাশে
পা ছড়িয়ে এসে বসলো একাই ঘন এলোমেলো ঘাসে,
মেঘে মেঘ লেগে তারা নিভে গেল, কী যে আলা তারে তারে,
নিরন্ন দেহ ভেঙে পড়ে গেল তীব্র ক্ষুধার ভারে,
একতারা ছিঁড়ে ছড়ালো কান্না দেশজোড়া হাহাকারে।

আমি বারবার ইছামতীর রূপোলি ঢেউয়ের মতো
আকাশের চোখে ঝলকে ঝলকে খুশিকে দিয়েছি ছুঁড়ে
আমি বারবার মেঘে ভর দিয়ে উঠেছি আকাশচূড়ে।
উষার রক্ত প্রাণে মেঘ দোলা, রক্তের চুমকি-ঠাসা
রাত্রির মতো যৌবন আনে ঝিলিমিলি ভালবাসা,
ভোরের শিশির স্বচ্ছ আখরে ঘাসে যার নাম লিখে
হলুদ শরৎ-গন্ধ ছড়ায় শেফালী দিগ্বিদিকে।
ইছামতী-জলে মধু জমে ওঠে, মধু ভরে ধানশীষে,
এ প্রাণবন্যা রাখবে পৃথিবী কিসে ?

হে নদি, ঢেউয়ের বন্যায় ধরো ধরো,
হে আমার মিতা, তোমার চূড়ায় আমাকেও তুলে ধরো।

আদিম বন্য জলধারা, তুমি তুষারমুকুট খুলে
নেমে এসো এই ঝর্ণার পথে ; আমার মর্মমূলে
সূর্যমুখীর সোনালী পরাগ অজস্র হাতে ছড়াও
গুহায় অন্ধ দেয়ালকে ভেঙে পলিমাটি মাঠ গড়াও
তরঙ্গে ভেঙে আমার মনের লৌহকবাট খোলো
মাটি থেকে টেনে আমাকে তোমার মত্ত চূড়ায় তোলো।
আমি পৃথিবীর প্রথম তৃষ্ণা, আমার জীবন-স্রোতে
বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির মতো রক্ত পড়েছে ঝরে ;
সে রক্তরেখা পদ্মের বনে গোলাপের গুঞ্জনে,
সে রক্তরেখা ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ ক্ষতবিক্ষত মনে,
সে রক্তধারা সাতায় দাস, সে রক্তধারা বোম্বাই-বিদ্রোহ,
সে রক্ত আজ ফুটন্ত রোষে বেদনার দুঃসহ।
আমার রক্তে দিগন্ত রাঙা, আমার রক্তে আগ্নেয়গিরি জ্বলে,
আমার রক্তধারায় মুক্তি আনবে স্বদেশ মুক্ত আকাশ তলে।

হে নদি, আবেগবন্যায় ধরো ধরো,
তোমার ঢেউয়ের উত্তাল চূড়ে আমাকেও তুলে ধরো।

মওকা

তরুসখ বসু

অতীতের ভুল আজ প্রায়শ্চিত্তে শোধরাতে বলে,
সকাল ও সন্ধ্যাকালে বস্তুবুদ্ধি গৃহিণী আমার
দেবতার সাক্ষ্য রেখে অনুরোধ করে বার বার
এবার তৃতীয় যুদ্ধে—আর যেন বিস্মৃতির ছলে
ভুলো না ধরিতে কিছু পণ্যভার বুদ্ধির কৌশলে
পাঁচ আনাকে পাকচক্রে প্যাঁচ কষে পাঁচশো টাকার
অঙ্ক করে তোলা চাই. বর্তমান জীবনে বাঁচার
এই তো একক পথ, তা না হলে ধ্বংসের কবলে

সুবুদ্ধি একেই বলে। সাধ্বী পত্নী, সাধুবাদ দিই।
কল্যাণকামিনি অয়ি, বুদ্ধিমতি, সুদীর্ঘায়ু ভব।
সভ্যতা যখন থেকে বেনেদের এসেছে কবলে
নির্বোধকে খুন করে তাজারক্তে স্নান করে নিই;
তারপর কিছু টাকা দান করে মৃত্যুঞ্জয় হব,—
দেশের ঐতিহ্যকামী বারবার পুষ্পমাল্য গলে।

একবিংশ বর্ষ
প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা
কার্তিক, ১৩৫৮

পরিচয়-এর কুড়ি বছর

হিরণকুমার সান্যাল

দুই

এই রচনার প্রথম কিস্তি বেরিয়েছিল শ্রাবণ সংখ্যায়। হিসাবমতো এতদিনে আরো দু' কিস্তি বের হওয়া উচিত ছিল, তা হতে পারেনি লেখকের দোষে। যাঁরা নতুন ক'রে পড়তে আরম্ভ করছেন বা প্রথম কিস্তি পড়ার পর যাঁদের স্মৃতিবিচ্যুতি ঘটেছে তাঁদের অবগতির জন্যে অন্তত এইটুকু বলা প্রয়োজন যে গিরিজাপতি ভট্টাচার্যের দৌত্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পেয়েছিলেন নীরেন্দ্রনাথ রায়কে নতুন পত্রিকা-প্রকাশ-ব্যবস্থাপনায় প্রধান সহকর্মী হিসাবে। পরিচয়-এর নেপথ্যবিধানের খুঁটিনাটি খবর যেটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি তার বেশির ভাগ গিরিজাবাবুর মুখ থেকে শোনা। সুতরাং পাঠকদের মুখবদলের জন্যে তাঁর মুখে এবার এই কাহিনীর সূত্র ধরিয়ে দেওয়া অসংগত হবে না।

সোসিয়েতে এঁ্যাদো-ল্যাতাঁ

গিরিজাবাবু শ্রাবণ সংখ্যার পরিচয় পড়ে বললেন, "যা, লিখেছ তাতে তেমন ত্রুটি কিছু ঘটেছে মনে হয় না। সুধীন দত্তের সঙ্গে নীরেন রায়ের যোগাযোগ ঘটনের ঘটক ছিলাম আমি, আর এই যোগাযোগ না হলে পরিচয় বের করা কঠিন হত সন্দেহ নাই। কিন্তু নীরেন রায়ের সঙ্গে আরো দুচারজনকে আমি জুটিয়ে দিয়েছিলাম। তাঁদের সবিশেষ পরিচয় দেবার আগে সোসিয়েতে এঁ্যাদো-ল্যাতাঁ-র কথা একটু বলা প্রয়োজন।"

সোসিয়েতে এঁ্যাদো-ল্যাতাঁ-র নাম শুনে ঘাবড়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "সে আবার কী ব্যাপার?"

গিরিজাবাবু বললেন, "ভয় পাবার কিছু নাই; ইংরেজীতে যাকে বলে সোসাইটি ইণ্ডো-ল্যাটিন। এ ক্ষেত্রে 'ল্যাটিন' মানে নিছক 'ফ্রেঞ্চ'। ফ্রান্স্-এ গিয়ে প্রসাধনী প্রভৃতির প্রকরণ আয়ত্ত করে আমি দেশে ফিরেছিলাম এ কথা তুমি লিখেছ। ফরাশি দেশ সত্যি বড় মজার দেশ। কিছু কাল সেখানে কাটালে মনে মৌতাত ধরে। এই মৌতাত জিইয়ে রাখার উদ্দেশ্যে জন কয়েক

ফ্রান্স্-ফেরৎ পণ্ডিত মিলে ঐ সমিতিটি স্থাপন করেছিলেন—তাঁদের দলে একমাত্র অপণ্ডিত ছিলাম বোধ হয় আমি। আমাদের পালের গোদা ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। তাঁর ফরাশি-সংস্কৃতি-প্রীতির কথা কে না জানে ?

"অন্যান্য সভ্যদের মধ্যে ছিলেন সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও প্রবোধচন্দ্র বাগচী। দুজনেই ফরাশি দেশ থেকে উচ্চস্তরের গবেষণা-লব্ধ 'ডক্টর'-ডিগ্রি সংগ্রহ ক'রে এনেছিলেন। সুবোধবাবু কিছুকাল অধ্যাপনার পর অডিট-সার্ভিসের পরীক্ষা পাশ করে মোটা মাইনের সরকারি চাকরিতে বাহাল হয়েছিলেন। কিন্তু জীবিকা অর্জনের চেয়ে জ্ঞানার্জনের টান ছিল তাঁর অনেক প্রবল, তাই চাকরি থেকে দীর্ঘ ছুটি নিয়ে তিনি ফ্রান্স্-এ যান রসগ্রাহী ফরাশি পণ্ডিতদের তত্ত্বাবধানে প্রাচীন ভারতীয় রসতত্ত্বের নবরস আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে। প্রবোধ বাগচীকে তো তুমি ভাল করেই জান।"

আমি বললাম, "হ্যাঁ। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সময়ে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে বিখ্যাত ফরাশি পণ্ডিত সিলর্ভ্যা লেভি যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন প্রবোধ বাগচী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন ও পরে চীন দেশ ঘুরে ফ্রান্স্-এ গিয়ে তিনি বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে গবেষণা করে ডক্টর উপাধি লাভ করেন। কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুদিন অধ্যাপনার পর তিনি কিছুকাল হল বিশ্বভারতীর গবেষণা বিভাগের পরিচালনার ভার নিয়েছেন ও এই কাজের সূত্রে চীন দেশের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ যোগ আবার জমে উঠেছে।"

গিরিজাবাবু বললেন, "আমি যখনকার কথা বলছি তখন প্রবোধবাবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অল্পদিন হল অধ্যাপনা শুরু করেছেন। আমাদের ঐ সমিতিটির অধিবেশন হত বিশ্ববিদ্যালয়েরই বাড়িতে। সত্যেন বোস ও নীরেনও এই দলে ছিল। নীরেন চিরকালই নেশাখোর ; আমাদের নেশা জমাতে যেতে হয়েছিল ওপারে, নীরেন কিন্তু কালাপানির এপারে ব'সেই শুধু পুঁথিগত বিদ্যার মাধ্যমে ফরাশি মৌতাতে একেবারে মশগুল হয়ে গিয়েছিল।"

আমি বললাম, "মনে পড়ছে আনাতোল ফ্রান্স্ মারা যাবার পর কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউট্ হলে তাঁর স্মৃতিসভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থ সাহেব বলেছিলেন, 'Bengali students have a peculiar fondness for things Erench.' এর সরল অর্থ তো এই যে ফরাশি দেশের নামে বাঙালী ছাত্রেরা প্রায় মূর্ছা যায় ? অধ্যাপকরাই যদি পথ দেখান তাহলে ছাত্রদের আর

কী দোষ? সুধীন দত্ত তো ফরাশি সাহিত্য প্রভৃতি অধ্যয়ন করেছেন—তিনিও কি ফরাশি দেশের নামে মূর্ছা ও পতনের পালায় আপনাদের সঙ্গী ছিলেন?"

"তাঁকে ঐ সমিতির অধিবেশনে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তোমার মনে থাকতে পারে মাঝে মাঝে পরিচয়-এর আড্ডার দস্তুরমতো ফ্রাঙ্কো-জার্মান্ লড়াই বেধে যেত। যখনই প্রবোধ বাগচী ফ্রেঞ্চ্ কাল্চার্ বা স্কলার্সিপ্ সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস করতেন, সুধীনবাবু অমনি কড়া পাল্টা জবাব দিতেন জার্মান্দের পক্ষ ধ'রে।"

"খুবই মনে আছে। কিন্তু এও মনে পড়ে যে আধুনিক ফরাশি লেখকদের মধ্যে ভালেরি ও জিদ্—এই দু' জনের কথা উঠলে সুধীন প্রশংসায় শতমুখ হয়ে উঠত। পরিচয়-এর পাতায় তার সাক্ষ্য আছে। যাই হোক, আপনাদের ঐ এঁ্যাদো-স্যাতাঁ কারবার আর আমাদের পরিচয়, এই দুইয়ের মধ্যে যোগসূত্রটা কী তা বুঝলাম না।"

পরিচালক-মণ্ডলী

গিরিজাবাবু বললেন, "তাহলে গোড়া থেকেই বলি।

"ড্যালহাউসি স্কোয়ারের পূর্বদিকে স্টিফেন্ হাউস বলে যে প্রকাণ্ড অট্টালিকা আছে তার দুতলার দিকে তাকালে এক সময় দেখা যেত দুটো মস্ত সাইনবোর্ড জলজল করছে: একটিতে লেখা "এ্যাডেয়ার্ ডাট্ এণ্ড কম্পানি", আর একটিতে 'দি লাইট অফ এসিয়া ইনসিওরেন্স্ কম্পানি'। ফ্রান্স্ থেকে ফিরে কিছুকাল সৌখিন প্রসাধনীর ব্যবসা করেছিলাম। কিন্তু ব্যবসাটাও বিশেষ সৌখিন হয়ে পড়াতে অবশেষে এ্যাডেয়ার্ ডাট-এ আশ্রয় নিতে হয়েছিল চাকরির উদ্দেশ্যে। প্রায় পাশের ঘরেই ছিল 'লাইট অফ এসিয়ার আফিশ, তার সেক্রেটারী ছিলেন সুধীন বাবু। এই বীমা কম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা তাঁর মামা রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক। স্বদেশী যুগে তিনি দেশজোড়া নাম কিনেছিলেন স্বদেশপ্রেমের বানে (রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলছি) তাঁর বিষয় সম্পত্তির মোটা অংশ ভাসিয়ে দিয়ে। এ্যাডেয়ার্ ডাট্ অর্থাৎ এ্যাডেয়ার্ ও দত্ত—নামেই পরিচয় যে প্রতিষ্ঠানটি আধা দেশী আধা বিদেশী: এদের কারবার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিয়ে। এই সূত্রেই সুধীন বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ জমে। তাঁর শখ ছিল ক্যামেরা কফি-পারকোলেটর্ প্রভৃতি সৌখিন যন্ত্রের আর এই বিষয়ে তাঁর মন্ত্রণাদাতা হয়ে উঠেছিলাম আমি। ফলে তাঁর

বাড়িতে যাতায়াত, সাহিত্যচর্চা, তাঁর অপ্রকাশিত কবিতা পাঠ ও তা ছাপাবার পরামর্শ ও অবশেষে পত্রিকা-প্রকাশের সংকল্প—এই হল আমার সঙ্গে পরিচয়-এর যোগাযোগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

"যখন নতুন পত্রিকা-প্রকাশের জল্পনাকল্পনা বেশ জোর চলছে তখন সুধীনবাবুর বৈঠকখানায় প্রায়ই দেখা যেত তাঁর মেশোমশায় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্তকে। তিনি তখন যাকে বলে 'অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ন'। বোম্বাই প্রদেশে কর্মজীবন কাটিয়ে তিনি কলকাতায় এসে আস্তানা গেড়েছিলেন। এঁর যথাযথ পরিচয় আশা করি তুমি যথাসময়ে দেবে। আপাতত এইটুকু বললে যথেষ্ট হবে যে পত্রিকা-প্রকাশের ব্যাপারে চারুবাবুর উৎসাহ না পেলে আমরা হয়তো এগোতে ভরসা পেতাম না।

"মোট কথা, কাগজ বের করার সিদ্ধান্ত একেবারে পাকাপাকি হ'য়ে গেলে চারুবাবু আমাকে বললেন, 'ম্যানেজারির ভার নিতে হবে আপনাকে।' আমি অমনি লেগে গেলাম আড়কাঠির কাজে অর্থাৎ লোকবল সংগ্রহে। নীরেনকে তো জানি ছেলেবেলা থেকে, তা ছাড়া সোসিয়েতে এঁ্যাদো-স্যাভাঁর থেকে জুটিয়ে আনলাম আমার প্রবাসের দুই বন্ধু সুবোধ মুখুজ্যে ও প্রবোধ বাগচীকে। সুতরাং আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে যদি পরিচয়-এর কোনো স্থান থাকে তাহলে সেই সূত্রে সোসিয়েতে এঁ্যাদো-স্যাভাঁর নামও ছাপার অক্ষরে ইতিহাসের পাতায় ওঠা অসংগত হবে না।"

"নিশ্চয়ই না। আয়ন্ত সর্বতঃ স্বাহা—প্রাচীন ভারতের এই উদার বাণী আমরা বার বার শুনেছি রবীন্দ্রনাথের উদাত্ত কণ্ঠে। পরিচয়-এর প্রথম সংখ্যার প্রথম রচনায় ভাষা ভিন্ন হলেও তার মর্ম ঐ এক। সেকালের ভারতবর্ষ বা একালের ফ্রান্স বা চীন—পরিচয় উন্মুখ হ'য়ে গ্রহণ করেছে সকল দেশের সকল যুগের শ্রেষ্ঠ দানকে। এই হ'ল তার ঐতিহ্য। অতএব আজ পরিচয়-এর ইতিহাস-রচয়িতা হিসাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনাদের সোসিয়েতে এঁ্যাদো-স্যাভাঁকে। ঐ সমিতিটি ছিল বলেই অত সহজে আমরা পেয়েছিলাম সুবোধ মুখুজ্যে ও বিশেষ ক'রে প্রবোধ বাগচীকে—ভারতবর্ষ, ফ্রান্স ও চীন এই তিন দেশের সংস্কৃতির ত্রিধারায় অবগাহন ক'রে যিনি পুণ্য সঞ্চয় করেছেন।"

গিরিজাবাবু বললেন, "মনে রেখো পুণ্য সঞ্চয় যত সহজ, বিতরণ করা ততটা নয়। এই বিতরণের বাহন হিসাবেই পরিচয়-এর সার্থকতা।"

"তা জানি। সঞ্চয়ীর ভাণ্ডার জনসাধারণের ভোগে নিয়োগ করায়

জাগিয়ে পরিচয় প্রগতির পথে এগিয়ে চলবে এই আমার বিশ্বাস্। এই শুভ যাত্রার শুরুতে পরিচয়-এর যাঁরা পরিচালক ছিলেন তাঁরা আজ স্মরণীয়।"

পরিচালকমণ্ডলী

গিরিজাবাবু বললেন, "অবশ্য। অতএব আমার ভাণ্ডারে যা তথ্য আছে তা উজাড় ক'রে দি—শোনো।

"নীরেনকে এনে জুড়ে দিলাম সুধীনবাবুর সঙ্গে সম্পাদকীয় জোয়ালে। কাজের ছেলে বটে। ছুটোছুটি, লেখালেখি, প্রুফ সংশোধন, সমালোচনার জন্যে পুস্তক-সংহরণ বা বলতে পারো দরকার হলে এখান ওখান থেকে হরণ—সব কাজেই সে সমান দড়। সুধীনবাবুর প্রধান সমস্যার সমাধান হ'ল, আর আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম নীরেনকে আমার আড়কাঠির কাজের সাব-কন্ট্রাক্ট্ দিয়ে।

"তারপর ঠিক হল একটি পরিচালকমণ্ডলী গঠন করতে হবে ও এই মণ্ডলীর কাজ হবে কাগজটির আকৃতি-প্রকৃতি নির্ধারণ ও বিশেষভাবে ছাপার জন্যে লেখা নির্বাচন। আরো ঠিক হ'ল সম্পাদকমণ্ডলীর নিয়মিত অধিবেশন হবে সপ্তাহের নির্দিষ্ট এক দিনে। ক্রমে এই অধিবেশনই পরিণত হ'ল পরিচয়-গোষ্ঠীর সাপ্তাহিক বৈঠকে।"

"পরিচালকমণ্ডলীতে কে কে ছিলেন আপনার কি মনে আছে? আমার মনে পড়ে ছোট্ট একটি বিজ্ঞপ্তি-পত্রে ওঁদের নাম ছাপা হয়েছিল। কিন্তু আজ কোথাও তার খোঁজ পাচ্ছি না। সুধীনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু তারও ঠিক মনে নাই।"

গৃহিণীর সঙ্গে পরামর্শ করে গিরিজাবাবু আমাকে জানালেন, "সম্পাদক-মণ্ডলীতে ছিলেন চারু দত্ত, সত্যেন বোস, সুবোধ মুখুয্যে, প্রবোধ বাগচী, ধূর্জটি মুখুয্যে, নীরেন রায়, সুধীন দত্ত ও আমি—যতদূর মনে পড়ে এই আটজন। বলতে পারো অষ্টদিক্‌পাল বা অষ্টদিগ্‌গজ।"

আমি বললাম, "পরিচয়-এর ভাবনা ও রচনাতে যদি অনেকে অষ্টাবক্রত্ব আরোপ ক'রে থাকে তা খুব অকারণ নয়।"

আমার কথায় কান না দিয়ে গিরিজাবাবু বললেন, "ধূর্জটি আমার বাল্যবন্ধু। তাকেও জুটিয়ে দিয়েছিলাম আমি। আমাদের দলে একমাত্র সেই ছিল প্রতিষ্ঠাপন্ন লেখক। বাদবাকি সকলেরই হাতে-খড়ি হয় পরিচয়-এ। পরিচয়-এর লেখকগোষ্ঠীর আরো অনেকের সম্বন্ধে একথা খাটে।

"লক্ষ্ণৌ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীষ্মের ছুটিতে ধূর্জটি ও সত্যেন দুজনেই তখন কলকাতায় থাকাতে আমাদের বিশেষ সুবিধা হয়েছিল। এদের দুজনেরই লেখা বেরিয়েছিল প্রথম সংখ্যায়। ধূর্জটি লিখেছিল 'প্রেমপত্র' ব'লে একটি গল্প। চাইবার আগেই তার লেখা পাওয়া যায়; পত্রিকা-সম্পাদকের কাছে এর চাইতে বড় গুণ আর কী হ'তে পারে?

"মুস্কিল হয়েছিল সত্যেনকে নিয়ে। আমাদের জেদ চেপেছিল প্রথম সংখ্যায় তার একটি প্রবন্ধ ছাপাতেই হবে। সাধ্যসাধনায় যখন সিদ্ধিলাভ হ'ল না তখন বাধ্য হ'য়ে প্রয়োগ করতে হ'ল বিশুদ্ধ ফ্যাশিস্ট রীতি। বাইরে থেকে শিকল দিয়ে ঘরে বন্ধ ক'রে তাকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল প্রবন্ধ লেখা না হ'লে অব্যাহতি নাই। সত্যেন জাত বৈজ্ঞানিক। সমূহ ব্যক্তিগত সংকটের চাপে তার মাথা থেকে বেরোল 'বিজ্ঞানের সংকট' নামে নৈর্ব্যক্তিক প্রবন্ধ। পরিচয়-এ ঐ ওর প্রথম ও শেষ লেখা। কলকাতায় এলেই পরিচয়-এর আড্ডায় আসতে সত্যেনের কখনো কসুর হয়নি। কিন্তু ওর কাছে দ্বিতীয় প্রবন্ধ আদায় করার শক্তি আমাদের ছিল না।

"আমার কথা এখানেই ফুরোল, আর এর পর পরিচয় বেরোল। আশা করি অন্তত প্রথম সংখ্যায় বিবরণ তুমি ফলাও ক'রে লিখবে। একটি কথা মনে রেখো—'পরিচয়' নামটি দেওয়া নীরেনের। এই নামকরণের বিশদ ব্যাখ্যা সে নিজেই করেছে প্রথম সংখ্যার প্রথম রচনায়। রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ তাকে করতে হয়েছে কিন্তু অায়ত্ত সর্বতঃ স্বাহা—এই বাণীর প্রেরণায় তার কলম বিচলিত হয়েছিল কিনা বলতে পারি না।

"আর একটি দুঃখের কথা না ব'লে পারছি না। মলাটের ওপর বহুদিন ধ'রে পরিচয়-এর নাম ছাপা হ'ত যে বর্ণলিপিতে তা আমারই হাতের রচনা। অনেক মেহনৎ করে লেখা। আমারই হাতের টিপ প'রে পরিচয়-এর আবির্ভাব হয়েছিল এ কথা ভুলতে পারি না। কি দোষে জানি না ঐ টিপ আজ বরখাস্ত হয়েছে।"

আমি বললাম, "কপাল দোষে। কর্তৃপক্ষকে জানাব। আপাতত যদি কোনো তথ্য বাদ পড়ে থাকে এই বেলা জানিয়ে দিন, নইলে ইতিহাসের হিসাবে ঘাটতি পড়বে।"

গিরিজাবাবু বললেন, "প্রথম সংখ্যায় আমার একটি সমালোচনাও ছাপা হয়েছিল। সেটি লেখার পরই আমি ঘায়েল হলাম ছুঁচোর কামড়ে। তারপর

দীর্ঘকাল ভুগে ভুগে যখন প্রায় অন্তিম অবস্থায় পৌঁছেছি তখন আমার দাদা ডাক্তার ও সাহিত্যিক পশুপতি ভট্টাচার্য—প্রথম সংখ্যায় তাঁর লেখা একটি সমালোচনা বেরিয়েছিল—অনেক পুঁথি ঘেঁটে আবিষ্কার করলেন ছুঁচোর বিষের প্রতিষেধক। তাই কোনো রকমে সে যাত্রা রক্ষা পেলাম। কিন্তু সে আর এক কাহিনী, তার যোগ্য বাহন পরিচয় নয়—সত্যেনের 'জ্ঞানবিজ্ঞান' পত্রিকা।"

আমি না ব'লে পারলাম না, "সুরতি সৃষ্টিতে আপনি এক সময়ে ছুঁচোদের প্রতিযোগিতা করেছিলেন ব'লে আপনার ওপর তাদের আক্রোশ থাকা স্বাভাবিক। ব্যাপারটি লেখার মতন বটে। বাইরে করলেন মলাটের পত্তন নিপুণ হাতের সাজসজ্জায়, আর ভিতরে নেপথ্যবিধান সাজ হবার আগেই দিলেন রণে ভঙ্গ ছুঁচোর কীর্তনে না হোক কর্তনে অর্ধকৃত্ত (hors de combat) হয়ে। আপনি ফরাশিবিৎ, তাই একটু ফরাশি বুলি প্রয়োগ করলাম। ও ভাষার উচ্চারণ আমার জিভে গড়ায় না। আপনি আপনার অভ্যস্ত রসনায় তা সংশোধন ক'রে নেবেন।

"বাংলা দেশে ছুঁচোর অভাব নাই, তালকানা সাহিত্যিকের সংখ্যাও কম নয়। সুতরাং ছুঁচোর বিষের প্রক্রিয়া ও প্রতিষেধক সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় গবেষণামূলক আলোচনা হওয়া খুবই দরকার, আর এই আলোচনার যোগ্যতম বাহন হবে যে পরিচয় নয়, জ্ঞানবিজ্ঞান-পত্রিকা, তাতে সন্দেহ কি? কিন্তু বাংলা দেশ যেন একথা না ভোলে যে জ্ঞানবিজ্ঞান-পত্রিকা ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান অনুশীল ও প্রচারে যিনি আজ পথনায়ক সেই সত্যেন বোস বাঙালী পাঠকদের জন্যে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের গূঢ়তত্ত্ব প্রথম পরিবেশন করেছিলেন পরিচয়-এর পাতায়।"

[ক্রমশ

সমুদ্র

বিমলচন্দ্র ঘোষ

সমুদ্র তোমায় আমি বলিষ্ঠ মনের সীমা দিয়ে
গর্বিত নীলাভ্র তুঙ্গ বাসনায় রেখায় রেখায়
সত্তার দিগন্তজোড়া গাম্ভীর্যের রঙ দিয়ে আঁকি।
আমি শিল্পী আমি স্রষ্টা বস্তুবাদী কবি
সহস্রাক্ষ-পদ-বাহু সম্মিলিত মানব-অটবী,
সংহত উদার আমি প্রকৃতির বিজয়ী সন্তান
আমি বিশ্ব-চেতনার গান।
তুমি জানো আমি নই ফাঁকি
আমি নই দেবদত্ত আমি মানবক।
কত যুগযুগান্তের আবর্তসংকুল উন্মাদনা
কী জাগ্রত আমার বেদনা।

আমার অশান্ত মনোবিপ্লবের আঘাতে আঘাতে
জন্ম হল বিংশ শতাব্দীর
আমারি সৃষ্টির রঙে রঞ্জিত অধীর।
যে আকাশ আমারি সৃজন,
সমুদ্র তুমি তো সেই আকাশের বুকে নিয়ে রঙ
সভ্যতার আদিম উষায়
শুধু ভয়ে ভেবেছিলে তরঙ্গিত নীল উপেক্ষায়
বাহুবলে মুছে দেবে আমার রক্তের স্রোতোধারা।
ভেবেছিলে মৃত্তিকায় অস্তিত্ব আমার
নিঃশেষে বিলীন করে দেবে।
আমি জানি সমুদ্র তোমায়
বৃথা দর্পে গর্জমান কত অসহায়

কল্লোল তরঙ্গ আর জলস্তম্ভ জল শুধু জল
নীলের মায়ায় মুগ্ধ অচ্ছোদ অতল।
পৃথ্বীর আদিম উষ্ণ অঙ্গের গলিত ঘর্মধারা
তোমার নীলাম্বুরাশি,
যে পৃথ্বী আমারি কন্যা, আমারি দুহিতা
তুমি তারি স্বেদসিন্ধু, হে সমুদ্র আমি যার পিতা।

আমি বিশ্বশিকারীর অজেয় কার্মুক হাতে নিয়ে
অগ্নিবাণে অন্ধকার দিগন্ত-পঞ্জর বক্ষ ভেদি'
সূর্যের দিয়েছি জন্ম স্বাধিকারপ্রমত্ত যৌবনে।
মাতরিশ্বা বহমান আমার নিঃশ্বাসে
কটাক্ষে বিদ্যুৎ জ্বলে আমি মানবক।
আমার যাত্রায়
লবণাক্ত ঘর্মধারা সহস্রবর্ষের রণোল্লাসে
পরাজিত পঞ্চভূত আমারি শ্রমের পরিণাম।
আমারি শ্রমের রক্তে জ্যোতির্ময়ী মুগ্ধা বসুধার
জঠরে তোমার জন্ম,
তাই আজ হে সমুদ্র, রত্নাকরপদবী তোমার।
আমার মানসপুত্র তুমি
উত্তরাধিকারে তাই পেয়েছ চিন্তার চঞ্চলতা
ঊর্মিল অজস্রনীল, গগনের চন্দ্রাতপতলে।
আমার অনলবর্ষী শায়কের ক্ষতচিহ্ন জ্বলে
তারায় তারায়।
মাঝে মাঝে তাই আসে করুণ উদ্বেগ,
তোমার আমার নীল আকাশের গাঢ় কম্প্র মেঘ।

সমুদ্র আমার তুমি স্রষ্টা ব'লে জানো মনে মনে
অবিচ্ছেদ অশান্ত স্মরণে।
আমি যে মানুষ, আমি পিতা
জীবনের জীবিকার সংঘাতের জান্তব সংহিতা।

অসংখ্য সূর্যাস্ত আর সূর্যোদয়ে আলোকের লিপি
লিখেছি সৃষ্টির ইতিহাসে
সর্বজয়ী বিপ্লবের অনন্ত বিশ্বাসে।
সমুদ্র, স্মরণ করো আদিম গুহার অন্ধকারে
কর্দমাক্ত মৃত্তিকায় কূলহীন কূলে উপকূলে
তোমার ক্রন্দনরোল
সকরুণ অবিশ্রান্ত শব্দের কল্লোল,
বজ্রের আওয়াজে মেশা নিত্য ভূকম্পনে
অতিকায় শ্বাপদের মুহু মুহু অকাল মরণে।

সমুদ্র সেদিন আমি, কালজয়ী আমি
আদিম কাব্যের শোকসঙ্গীতের অনন্ত তারায়
ছন্দসূত্রে গেঁথেছি এ জড়ের অমূল্য মণিহার।
আতঙ্কের মেরুদণ্ড পায়ে চেপে করেছি সংহার
আদিম পশুর অসংযম।
পিতা আমি বিংশ শতাব্দীর
আমারি মুক্তির মন্ত্রে জন্ম হ'ল বিংশ শতাব্দীর।
সমুদ্র তোমার নীল বিশালত্ব মানে পরাজয়
আমার ছন্দের সূত্রে স্বপ্নের বন্ধনে।
সৃষ্টি স্থিতি ব্যাপ্ত ক'রে মহাভুজ আমি
বিশ্বজয়ী উদ্ধত উদার
মানব সভ্যতা তাই আমার অনন্ত অহংকার।
প্রতিভার আভিজাত্যে আমি বলবান
সদম্ভে দণ্ডায়মান
উর্ধ শীর্ষ দৃঢ়পদ অচল অটল,
আমার চেতনা তবু অশান্ত চঞ্চল।
সমুদ্র তোমার নীল ঘন নীল তরঙ্গে আমার
স্বপ্নের তরণী দোলে কূলে উপকূলে
তোমার তরঙ্গ কাঁপে ফেনশুভ্র মর্মরার কূলে।

জনমদুখিনী মা

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

জনমদুখিনী মাগো,
কাদা ছেনে ছেনে উঠোন নিকিয়ে রাত না ফুরুতে দিয়ে
তুষের পাতিলে আগুন পোহাতে এলি,
বল না আমায় জনমদুখিনী খুঁটেকুড়ানীর মেয়ে
জনমে জনমে কত ব্যথা পেয়ে গেলি।

চিঁড়া কুটে ধান ভেনে
মাঘমণ্ডল ব্রতের ঝুমকি টেনে
কোলে কাঁখে করে মাটির কলস
এঁদো পুকুরের জলে ডুব দিয়ে এলি
জনমদুখিনী মাগো,
জনমে জনমে কত ব্যথা পেয়ে গেলি।

তুই না কামার মাঝি মাল্লার মা,
কুমোর তাঁতীর জনমদুখিনী মাগো,
কৃষাণ কৃষাণী তোর সব ছেলে মেয়ে
তোর নাতি পুতি সারা ঘর আছে ছেয়ে।
শয়তান এসে ছিনিয়ে নিয়েছে সুখ তোর চাল চেলে
বড়ো দাবা খেলে হার মেনে নিল তোর স্বামী তোর ছেলে
তাই এ-জনমে তোর সারা চোখে জল আসে ছেপে ছেয়ে
তুষের হাঁড়িতে আগুন পোহায় খুঁটেকুড়ানীর মেয়ে।

জনমদুখিনী মাগো,
মারীতে মড়কে কত না আঁচড় পেলি—
মরেও মরেনি তোর সব ছেলে মেয়ে
তাইতো দুপুরে আধপেটা খেয়ে
ঢেঁকি পাড়া দিতে এলি।

জনমদুখিনী মাগো
শবরীর মতো বেঁচে তো আছিস, আরো দুটো দিন থাক্
মোটা ভাত আর মোটা কাপড়ের অভাব হবে না কিছু
হামাগুড়ি দিয়ে দিন আসে আজ বসে বসে দিন গোন
তোর ও-চোখের দুকোণে দেখেছি অনেক ব্যথার কথা
অভিশাপে তারা প্রত্যেকে হ'ল উদ্ধত লাল কথা।

হারমোনি

সত্যব্রত ঘোষ

কালো মসৃণ পথ; দু'ধারে গাছের শান্তি,
দু'একটি সেতু; দু' পারে চলার ক্লান্তি
ক্ষীণতর জলে মনে হয় নিই জুড়িয়ে।
কিংবা থমকে কয়েকটি নুড়ি কুড়িয়ে
ছুঁড়ে ভেঙে দিই বর্তমানের ভ্রান্তি।

মসৃণ কালো পথ; অনেক লোকের যাত্রা,
যেন সিন্ধুর ক্রমগতি ধীর-মাত্রা।
কী যে ভালো লাগে যখন ও-সবে কান দি'।

ধানক্ষেতের গান

নন্দদুলাল সরকার

পড়শী এলে বেড়াতে সই বসতে পিঁড়ি দিয়ে
বাটার পান খাওয়ায় কাকে গল্প জমে না তো।
অনেক সাঁঝ-বেলায় পায় ঢেঁকির পাড়ে পাড়ে
ভানুতে ধান শিবের গীত গাওয়ায় আছে প্রীতি।

শিবের গীত গাইবো সই পড়শী গেলো কই
পড়শী এলে বসবে কোথা—খড়ের চালা ঘরে
অঝোর ধারে বাদল ঝরে চালায় নেই খড়
ছেলের বউ কাঁপছে শীতে ওরের ছেলে কোলে :

ভানবো ধান ? শূন্য গোলা, ভানার ধান কই
মরদ স্বামী গুলিতে মলো রুইতে ক্ষেতে ধান
জোয়ান ছেলে খাটছে জেল বাপের খুনে বোনা
সোনার ধান ভানার ধান চাওয়ার অপরাধে।

ভানতে ধান শিবের গীত গাওয়ার দিন কই
খামার দেখি শূন্য, ধান বোনার লোক নেই
শহরে গেলো কাস্তে ছেড়ে
কাস্তে ছেড়ে শহরে ঘর বেঁধেছে ফুটপাথে ?

বউমা চলো, পড়শী চলো, সই গো চলো ক্ষেতে
দু'হাতে মোরা সবাই মিলে বুনবো সোনার ধান
স্বামীর খুনে এবার জমি সার পেয়েছে কতো
জোয়ান ছেলে নিড়িয়ে গেছে আগাছা ছিল যতো ।

আবারো যদি আগাছা বাড়ে ভয় কি আছে তাতে
জোয়ান ছেলে গিয়েছে জেলে শিখিয়ে গেছে সে তো—
সবার হাতে একটা করে কাস্তে আছে আজো
আগাছা যতো হোক না বড় কাস্তে বড় আরো ।

একমুঠো মাটি, একগোছা শীষ

বিমল দত্ত

শুধু একমুঠো এখানের মাটি, একটি ধানের শীষ
বলে দিতে পারে হবে এই দেশ অনাবিল নির্বিষ।

বলে দিতে পারে লোভী রুপিনীর মারণ-যন্ত্রটাকে
সমবেত স্বরে লক্ষ কণ্ঠ কোন্ বিশ্বাসে ডাকে।

যে কোন একটি এ গ্রামের বৌ, একটি সরল চাষা
বলে দিতে পারে কেন মিছে নয় এ মাটিকে ভালোবাসা।
বলে দিতে পারে কি করে কাস্তে হয়ে গেছে ক্ষুরধার,
কি নবব্রতের সন্ধান পেয়ে শাপ কাটে বন্যার।
যে কোন একটি ঝড়লাগা ঘর, একটি স্তিমিত দীপ
জানাবে তোমায় কেন যে মোছেনি আজো সে আলোর টিপ।

ঐ ভাঙাঘর ক্ষুব্ধ ঘরের জনেছে মন্ত্রণা যে,
দেখেছে ও দীপ অভয় দীপালি নয়ন-বহ্নি মাঝে।

যে কোন একটি আমার স্বপ্ন, ক্ষুব্ধ বুকের গান
আর কিছু নয়, শুধু পেতে চায় সেই এক সন্ধান—
বিশ্বাসে জাগা বৈশাখী-লাগা সুতীক্ষ্ণ এক স্বর
বলবে সে কেন বাঁশী ফেলে এই হাত যে অস্ত্রধর।
একমুঠো মাটি, একগোছা শীষ, একটি সরল চাষা,
আমার এ গান, এ গ্রামের বধূ ভুলবে না ভালোবাসা।

তুমি আমি

আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন

তুমি আছ চেয়ে সুদূর ধবল পানে—
আমি অসংখ্য জীবনের শত স্বপ্নের সাধনায়
চক্রকালের রাস ধরে আছি টেনে।
মাঝে মাঝে ফিরে যাই—
ফেলে আসা পিছে দখিনা হাওয়ায়
ফাগুনের কোনোদিনে।

তোমার ভাবের মালা
খুঁজে ফেরে কিবা জানি—
শ্রাবস্তি-কারুকার্য খচিত মন্দিরে মন্দিরে।
আমি মনে মনে ভাবি
বন্দী যাদের লক্ষ যুগের নাগপাশ বন্ধনে
জীবনের যত রঙীন কামনাগুলি,
তাদেরই রক্ত নয়নের জল আর ঝরা ঘর্মের
নোনাসিন্ধুর মহাতরঙ্গে বিদ্রোহ জাগে না কি ?

ভুলেও যে কভু ভুলিতে পারি না স্মৃতি
সেদিন তো কেউ ভাবিনি আমরা আছে কোনো গরমিল :—
শুধু জানতাম তুমি আর আমি এক হ'য়ে একসাথে
রক্তের রাঙা পদাঙ্ক খুঁজে খুঁজে
বন্ধুর পথে চলেছি জোর কদম,
স্বপ্ন দেখেছি নতুনের সবুজের ?
মনে পড়ে নাকি অতীতের কোনো কথা
কোনো ক্ষেতে কোনো পৌষের গোধূলিতে ?
কেমনে ভুলবে সেদিনের সেই জলন্ত ইতিহাস।
সূর্যাস্তের রক্তিম আলো সাক্ষী রয়েছে আজো।
গাঁয়ের মরদ রহমত মিয়া বলিষ্ঠ দুই বাহু
পাকা ধানে হায় সেদিন ঝরালো খুন।
হায়রে পাগলী। ফুলমতি যার নাম
স্বামীর রক্তে মেখে মেহেদীর রঙ
সারা ধানক্ষেতে ছুটোছুটি করে প্রলাপের জারী গেয়ে
নিষ্ফল আক্রোশে !
তুমিই সেদিন দাঁড়িয়ে আলের শিরে
আমায় শুধালে বুঝি
এ দেওয়ার কভু শেষ নয় ওগো নয়
দেবার যে আরো অনেক রয়েছে বাকি।

তারপর মাঝে কেটে গেল বহুদিন,
কালবৈশাখী ঝড়ের ঝঞ্কা হাওয়া
ভেঙে দিয়ে যায় স্বপ্নের ঘরবাড়ি।
মাঝে আসে নিস্তব্ধ বছর দুই॥
আবার নতুন এলো শপথের দিন,
কারখানা কলে, খেতের খামারে, পথে আর প্রান্তরে
গ্রামের বুকেতে শহরে নগরে নবজীবনের গানে
নতুন পৃথিবী জাগে।
আজকে জানি না কেন
তোমার জীবনে আর জাগে না তো সাড়া,
কি মোহে কি জানি গাইছ কিসের গান
ঝলমল করে প্রাণ।

আমি যে রয়েছি আজও তেমনি ধারা
আজো অতীতের সুরে সুরে গান গাই
আকাশে দৃষ্টি রাখি।
দেবার যা আছে দিয়ে যাই দিনে দিনে
এ দেয়ার শেষ কবে হ'বে জানি নাকো ;
তবে জানি ঠিক, আছে দৃঢ় বিশ্বাস—
দেয়ার মাঝেই লেখা হ'বে ইতিহাস।

(পূর্বানুবৃত্তি)

সমরেশ বসু

(১)

মহিম তার কাজের জিনিসপত্র সব গুছিয়ে বেরোবার উপক্রম করতেই হঠাৎ আবার অহল্যা এসে ঢুকল। মহিমকে সব গুছোতে দেখে অহল্যা ভ্রূ তুলে গম্ভীর মুখে বলল, একজন তো মামলা লড়তে বের হইলেন। আর একজনের নিশানা কোনদিকে ?

মহিম বলল, দেখি একবার কুঁজো মালা গেল কুনঠাঁই। আর যাব একবার লতার ঠাঁই।

তাই ভাল, বাঁকা ঠোঁটে হেসে রহস্য করে বলল অহল্যা, কাল বলছিলে রাতে, কোন এক অপরূপ সোন্দরী নাকি দেখে আস্ছ। মুখ নাকি তার তোমার গড়া বুদ্ধদেবতার মত মিষ্টি। ভাবি বুঝি রাত পোয়াতেই সেই মুখের খোঁজে চলল।

সহজ জবাব না দিয়ে মহিম বলল, কেন, আমাদের ঘরের বউ বুঝিন্ কুচ্ছিত ?

—পোড়া কপাল অমন সোন্দরের।

কথা বলতে গিয়ে কথা আটকায় বুকে অহল্যার। যত দিন যায়, বুকের মধ্যে কোথায় যেন কিসের এক ত্রাস তার জমিয়ে বাসা বেঁধে তুলছে। কথা নয়, যেন চোরাবালুতে সন্তর্পণে পা ফেলে চলেছে। মুহূর্তের এদিক ওদিকে বুঝি চিরদিনের জন্য তলিয়ে যেতে হবে বসুমতীর গর্ভে।

হেসে তেমনি রহস্য করে বলল, নিজের জন্য একটি খুঁজে আনতে হবে তো। না কি চিরদিনই ভাযের বউয়ের মুখ দেখে চলবে ?

চলছে না নাকি! তা যা-ই বল, ও পরের মেয়ের ঝামেলায় আর যাচ্ছিনে বাপু।

প্যায় বুঝি পরের মেয়ে নই ?

তুমি ? মহিম চোখ তুলল। অহল্যা তার তীক্ষ্ণ অপলক দৃষ্টি চকিতে নিল সরিয়ে।

মহিম বলল, সে কথা মোর মনে লয় নাই কোনদিন। তুমি আবার পরের মেয়ে হলে কবে ? তুমি যদি পরের মেয়ে, তবে আর মোদের আছে কে ?

কশাঘাত নয়, তবু যেন কিসের আচমকা আঘাতে অহল্যার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। পরমুহূর্তেই মুখে হাসি টেনে নিজেকে মনে মনে গাল দেয় সে, মুখপুড়ি, পাষাণী আর কি শুনতে চাস্ তুই এ নরম মানুষটার কাছ থেকে ? বলল, হ্যাঁ, মোরে ছাড়া তো তোমাদের জগৎ সম্সার খা খা করতেছে।

পরের কথা নয়, মোর কথা বল। শুনি জন্ম দিয়ে মা মরেছিল, বাপকেও মোর মনে নাই। দাদা হল অন্ত মানুষ, তার মনের তল পাইনে। তোমার মনের হদিসও আমি হারিয়ে ফেলি মাঝে মাঝে। তবু, এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, সেদিন যদি তুমি কলকাতায় না যেতে তবে আর বুঝি জ্যান্ত ফিরতাম না এ নয়নপুরে।

চকিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ফিরে অহল্যা দু'হাতে মহিমের মুখে হাত চাপা দিল। থাম—থাম, খুব হইছে মোর মস্করা। একি কথার ছিরি ?

তারপর তার সমস্ত হৃদয়কে মুচড়ে দিল মহিমের চোখের দু' ফোঁটা জল। সে জলে জল আনল তার চোখে। মহিমের এক মাথা চুলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে দিয়ে অহল্যা চোখে জল নিয়েই একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, মস্করা বোঝ না বাপু তুমি। বড় নরম মানুষ।

চোখ মুছে মহিম বলে, আর তুমি বুঝিন্ পাথরের ? তবে পাথরের চোখে জল কেন ? পর বলে বুঝি ?

নেও হইছে, কোথা যাচ্ছিলে যাও। দেখ বেলাটুকুন কাটিয়ে আস না যেন।

আমি আসব, তুমি বসে থেকো না, বলে মহিম বেরিয়ে যায়।

আশ্চর্য ! অহল্যার ঠোঁটে এক বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে। চোখ পলকহীন। সে দৃষ্টি, সে হাসি সুখের না দুঃখের, কিছু চাওয়া না পাওয়ার— তা বুঝি সে নিজেই জানে না। তারপর আরও আশ্চর্যতর, যখন আচমকা

দমকা হাওয়ায় কেঁপে ওঠা ফুলের পাপড়ির মত কেঁপে উঠল তার ঠোঁট, চোখে ছুটে এল বন্যা। অবমিত তার বেগ। কেন?

একি সেই তার নিজের হাতে বাঁধা বীণার তারে বেসুর?

(১০)

সপ্তাহখানেক পরের কথা।

মহিম সারা নয়নপুর ও তার আশেপাশে আতিপাতি করে খোঁজে কুঁজো কানাইকে। কিন্তু কোথাও দেখা গেল না তার। না, এতে নয়নপুরের বুকে কোন দুশ্চিন্তা, তার চলতি জীবনে কোন ব্যতিক্রমই দেখা দেয়নি। শুধু মহিমের ঘুচেছে নাওয়া খাওয়া, চোখে মুখে অদ্ভুত দুশ্চিন্তা, বুকের মধ্যে এক অজানা শংকা তাকে বড় মুষড়ে দিয়েছে। কুঁজো কানাইয়ের প্রাণের হদিস্‌ তো আর কারুর জানা নেই। সকলের চোখে সে জানোয়ারের সামিল। জানোয়ারের আবার প্রাণ কিসের। সত্য কুঁজো কানাইয়ের কিছু নেই, তবু আর দশজনের হিসেবনিকেশ যে তারও হিসেবনিকেশ। সুখ দুঃখ ভাল মন্দ সবকিছুতে আর দশজনের চেয়ে তার প্রাণের বোধ যে আরও বেশী। তার প্রাণের শিশুবুদ্ধের যুগপৎ বিচিত্র খেলা আর কেউ না জানুক, মহিম তো জানে। আর জানে বলেই তার উৎকণ্ঠা।

মালাপাড়ার নামকরা সুন্দরী মেয়ে সে কালু মালার মেয়ে। টাকার লোভে কালু মেয়ে দিয়েছিল ঘাটের-দিকে-এক-পা-বাড়ানো এক বুড়োকে। তাইতেই কুঁজো কানাইয়ের ক্ষোভের অন্ত ছিল না। মহিমকে এসে বলেছিল, পিশাচ শুধু নয়নপুরের শ্মশানেই থাকে না, ঘরেও থাকে।

এই ক্ষোভই একদিন ফেটে পড়েছিল কুঁজো কানাইয়ের—যেদিন চোখের সামনে দেখল, সেই মেয়েকে তার বুড়ো সোয়ামী এলোপাথাড়ি পিটছে। ছুটে এসে তার সেই দস্তা হাত দিয়ে বুড়োকে সাপটে ধরে সে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল উঠোনে, বুড়ো হারামজাদা, তোর ওই নোনা-ধরা ও পোড়া কাঠের হাতে ঠ্যাঙাস্‌ ওই কচি মেইয়াটারে।...মালাপাড়ার মালারা সেদিন বেধড়ক মার দিয়ে বার করে দিয়েছিল কুঁজো কানাইকে।

কানাই এসে মহিমকে বলেছিল, মোরে বেড়ন দিলে, সেটা বড় লয়। মালাদের এ মতিগতি দেখতে এ ছার পরান আর রাখতে ইচ্ছা যায় না।

আর সেই হল মহিমের সবচেয়ে বড় ভয়। এসব পাগলেরা থাকে

একরকম, কিন্তু বিগড়ে গেলে এক মস্ত সমস্যা। মানুষের মতিগতিতে যার নিজের প্রাণের প্রতি বিশ্বাস, তাকে নিয়ে খেলা করেছে যে ভগবান, সেই ভগবানের বিদ্রূপের প্রতিশোধ তুলতে যে সে প্রাণত্যাগ করে বসবে না তার ঠিক কি?

মহিম শিল্পী, কিন্তু হাত চোখ আর মন আজ বেয়াদপ পনি ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকিয়ে বসল। হাতের মাটি হাতে রইল, প্রাণ রইল নিঃসাড়।

অবস্থাটা বুঝল মাত্র একজন। মহিমের সবকিছুই যে প্রতি প্রহিটি ধরতে পারে। সে অহল্যা। যমুনার মত উপরে শান্ত, তলে তার খরস্রোতের তীব্র বেগ। অহল্যা হল তাই। সে ডাকল তার প্রিয় অনুচর মানিককে। বলল, যেখান থেকে পারিস্ কুঁজো মালার খোঁজ নিয়ে আয়। এ জগতে তো তোর কোন ঘাট-অঘাটের বেড়া নেই। এ খবরটা যোগে এনে দে বাবা, নইলে সোয়াস্তি নাই তোর কাকীর পরানে।

ব্যাপারটা বড় ছোট নয়। মানিক ছুটল কোমরে চিড়েগুড়ের পোঁটলা বেঁধে।

ভরত এসবের কোন খোঁজ রাখে না। সে একথা জানতে পারলে সামান্য দরদ তো দূরের কথা, এ পাগলামিকে সে তার স্বাভাবিক বিষয়ী ও রূঢ় ভাষায় শাসনই করবে।

এ অবস্থায় পথ চলতে হরেরাম একদিন ডাকল মহিমকে। দুপুর গড়ায়। উঠোন থেকে উঠে এসে হরেরাম ডাকল, মহিম নাকি গো?

মহিম ফিরল। বলল, কিছু বলছ হরেরামদা?

বলতে তাই ইচ্ছে করে অনেক কথা। ঠিক বিদ্রূপ নয়। কেমন যেন একটা চাপা আফশোষ ফুটে উঠল হরেরামের গলায়। বলল, যেতে পারিনে কোথাও। জর-জারিতে শরীলও বশ থাকে না। আর—

কথা শেষ করল না হরেরাম। মহিম দেখল কেমন বিতৃষ্ণায় ঠোঁট জোড়া কুঁচকে উঠেছে হরেরামের। বলল, আর কি বল?

তোমার দাদার ভিটেয় পা বাড়াতে মনটা বড় ছোট হয়। নইলে গাঁ জোড়া যার এত নাম, একবার কি প্রাণে সাধ যায় না, তার হাতে গড়া কাজ দু' দণ্ড দেখে আসি?

কথাটি বড় সত্য। সেজন্য মহিমের শুধু লজ্জা নয়, ক্ষোভও বড় কম নেই। মামলাবাজ, রূঢ়ভাষী ভরতের উপর গ্রামের মানুষ, বিশেষ জাতভাই চাষীরা

সকলেই মর্মাহত, ক্রুদ্ধ। বুঝি ঘৃণাও করে। মানুষের সঙ্গে তার সম্বন্ধ বড় তিক্ত, জাতিকে করে হেয়জ্ঞান। অথচ কিসের জোরে কিসের অহঙ্কারে, তা বোধ হয় অন্তরতই জবাব দিতে পারে না। এ কথা নিয়েই দাদা বউদি'র মাঝখানেও যেন এক মস্ত প্রাচীর উঠেছে খাড়া হয়ে।

তবু অনেকেই তো যায় মহিমের কাছে। কত মানুষকে মহিম হাত ধরে ডেকে নিয়ে যায় নিজের কাজ দেখাতে, কেউ আসে ডাকের আগে। এই নয়নপুর, ওপারে রাজপুর, আশেপাশে মহিম তো কোথাও পর নয়। মহিম বলল, আমার কাছে তো সকলেই যায় হরেরামদা।

যায়, সে তোর টানে ভাই।

নয় কেন? তাছাড়া ভিটে তো একলা দাদার নয়।

কথাটা বলে ফেলে বুকের মধ্যে ধ্বক্ ধ্বক্ করে উঠল মহিমের। কেন যেন তার মনে হল সে বুঝি চীৎকার করে লোককে তার অধিকারের কথা জানিয়ে দিচ্ছে, যেন ভয়ত বিস্মিত ক্রোধে বাক্‌হারা, তার দিকে তাকিয়ে আছে অহল্যা। না না, মহিম তো তাই ভেবে ওকথা বলেনি।

যেন কৈফিয়ৎ দেওয়ার মতন হরেরামকেই বলল সে, দশজন ছাড়া আমি নয় হরেরামদা। তোমরা কেবলি দাদার কথা বল, আমি কি কেউ নই?

হঠাৎ হরেরাম অত্যন্ত আপনভাবে বলে উঠল, আয় না কেন, খানিক বসবি।

মহিম দ্বিরুক্তি না করে ঢুকল বাড়িতে। যে ঘরে নিয়ে এল তাকে হরেরাম, সেখানে এসে চমকে উঠল মহিম। দেখল, গাঁয়ের চাষী, মালা, কামার সকলেই এসে সেখানটিতে ভিড় করেছে। রাজপুরেরও কেউ কেউ এসেছে। আশেপাশের গাঁও'লাও বাদ যায়নি। কি ব্যাপার! এমন একটা পরিবেশের কথা মহিম কল্পনাও করতে পারেনি। সকলেই তাকে বাবা, ভাই বলে ডেকে বসাল। এক কোণে অহল্যার বাবাকে বসে থাকতে দেখে মহিম উঠে গিয়ে প্রণাম করল। অহল্যার বাবা পীতাম্বর তাড়াতাড়ি মহিমের হাত ধরে বলল, থাক্ থাক্ বাবা, বেঁচে বর্তে থাকো, পায়ে হাত দিও না।

পায়ে হাত দিও না কথাটা অভিমানের। নিজের জামাই যাকে ভুলে কোনদিন নমস্কার করে না, তারই বিমাতার সন্তান প্রণাম করলে মনে আর লাগে না কার? তবু পীতাম্বর শুধু তুষ্ট নয়। মনে প্রাণে আশীর্বাদ করল

মহিমকে আর একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস সে কিছুতেই চেপে রাখতে পারল না। মেয়ের মুখে তার এই দেবরটির অনেক কথাই শুনেছে সে। তার মেয়ের বড় স্নেহের দেবর শুধু নয়—কথায় আঁচ করেছে পীতাম্বর, বুঝি বড় সোহাগের। পীতাম্বরের কথার প্রতিবাদ করল দয়াল কামার। বলল, এ তোমার রাগের কথা পীতু ভাই। গুরুজনকে পেন্নাম করবে না। এ তোমার কোন শাস্তরের কথা?

ও সব শাস্তর ফাস্তরের কথা ছাড়, নয় তো বল ঘরে যাই।

কেবল চেঁচানি নয়, কথাটা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ধমকানির মত শোনাল। সকলেই তাকিয়ে দেখল বক্তা পীতাম্বরের বড় ছেলে ভজন। কেউ লক্ষ্য করেনি, কিন্তু এতক্ষণের সমস্ত ব্যাপারটা তাকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। এবং এ ক্ষিপ্ততার বর্ত্তমান ক্ষেত্র মহিম হলেও আসলে ভরতই। ভরীপতির সঙ্গে ভজনের সম্পর্কটা এমনই তিক্ত যে, অনেকদিনই তার ইচ্ছে হয়েছে ভরতকে পথে ঘাটে ধরে অপদস্থ করে দেয়। কিন্তু অহল্যা তার বড় আদরের বোন। ভরতের উপর আঘাত যে বোনের উপরে গিয়েই শেষ পর্যন্ত পড়বে এটা সে জানত, জানত বলেই নীরব। ভরতের জন্যই ভজন কোনদিন মহিমকে ডেকে কথা বলেনি। অহল্যার কাছে তার দেবরের গুণপনা শুনলেও রাগটা ভজন মনে মনে এঁকে রেখেছে, শত হলেও একই ঝাড়ের বাঁশ তো। আর চাষীর ছেলে কুমোর হল, তাও কি না শহরের লেখাপড়া জানা বাবুদের স্কুলে শেখা কুমোরগিরি। একটা কারাক ভজন কিছুতেই ভুলতে পারে না। সে মাটিতে চাপড় মেরে বলল, চাষী চাষীর পেন্নাম লেয়, আর কারুর লয়।

মহিম চকিতে ফিরে দু হাতে ভজনের পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিল, দাদা বইসে আছেন, দেখি নাই।

ভজন দু হাত বাড়িয়ে বাধা দিয়ে কি একটা বলতে গেল, কিন্তু মহিমের দিকে তাকিয়ে মুহূর্ত স্তব্ধ রইল সে। ঘরের আর সবাই ভজনের গোঁয়ারপনার খ্যাতির কথা স্মরণ করে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। না জানি ভজন কিছু ঘটিয়ে বসে।

হাত জোড় করে মহিম বলল, ঠিকই বলছেন দাদা, চাষীর পেন্নাম চাষী লেয়, মোর তো অপরাধ নাই। এট্টু ঠাঁই দেন মোরে বসবার।

সকলেই জায়গা দেবার আগ্রহে নড়ে চড়ে উঠল। কিন্তু তার আগেই

তখন মহিমের জোড় হাত ধরে নিজের পাশে বসিয়ে নিল। বলল, ... ভাই, মোর ভুল হইছে। মানুষ তো বাপের ঝাড় নয়। মানুষ— মানুষই।

মহিম ছাড়ল না। তখনকে আরও খানিক যাচাই করে নেওয়া ... বলল, চাষীর ছেলের মূর্তি গড়া কি অপরাধ দাদা? মাঠে লাঙল ... ছাড়া চাষীর ছেলে কি আর কিছু করবে না কোনদিন? মেলা ... শিখি নাই, কিন্তু যা করছি মোর সাধনা কি অন্যায়। ... কি চাষীর ... কলঙ্ক?

তখন লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ছি ছি, সে কি কথা ভাই? তোমার নাম যে ঘরে ঘরে।

মহিম বলল, মোর কাজ দশজনার। আপনাদের জন্য আমি কাজ করতে চাই। বোঝা গেল ঘরের সকলেই তুষ্ট হয়েছে তার কথায়। দয়াল কামার উঠে এসে মহিমের মাথায় হাত দিয়ে বলল, মুই আশীর্বাদ করছি, তুমি আরও উন্নতি কর বাবা, বেঁচে থাক। তুমি চাষীকুলের রত্ন!

সকলেই বলে উঠল, নিশ্চয় নিশ্চয়।

রাজপুরের জহীর মিয়া বলে উঠল, নইলে বাপজান মোর এক কথায় জমিদারের কথায় পিতিবাদ করে আসল পিতিমে গড়তে পারবে না বলে?

শ্রদ্ধায় বিস্মিত সকলের চোখ গরীয়ান করে তুলল শিল্পীকে। মহিম বুঝল, এটা গাঁ ঘরে ভরতের ঢাক-পেটানো রটনা। উঠে হাত জোড় করে বলল সে, পিতিবাদ নয় জহীর চাচা। যা মোর মন চায় না তা আমি অস্বীকার করেছি।

সেই হইল বাপজান, সেই হইল। সে হিম্মতই বা ক'জনার আছে?

কথাটা দয়ালের ছেলের গায়ে লাগল। সে ফুঁসে উঠল, আছে। আছে বলেই আজ হরেরামদা'র ভিটেয় সব একত্র হইছি।

জহীর হেসে বলল, কথাটা মোর ভুল বুইঝ না কামারের পো, জমিদারের সোহাগ আর চাঁদির লোভ সামলানো বড় চাট্টিখানি কথা নয়, বুঝলা? বাপজান মোদের সে পথ মাড়িয়ে দিয়ে আসছে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা টিকটিকির টিক টিক শব্দের সঙ্গে একত্রে কয়েক-জন মাটিতে টোকা দিয়ে বলে উঠল, সত্য সত্য সত্য।

অদৃশ্য টিকটিকির এ দৈব ঘোষণা যেন সমস্ত সত্যকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিল।

গেল। এ ঘরের সমস্ত মানুষগুলোর কাছে ওই জীবটি ঈশ্বরের প্রতিনিধির মতনই।

মহেশ মালা বলল, আর তো দেরি করা যায় না হরেরাম, বেলা যে গড়ায় ওদিকে।

মহিম বলল, মোরে কি থাকতে হইবে হরেরামদা?

হরেরাম বলল, তা তো হইবেই ভাই। সকলের কাজ, সকলের কথা। জোড়া জোড়া মহকুমার চাষী-মনীষরা আজ একটা পিতিবিধেন করতে বসছে। তোমার কথা তোমারে বলতে লাগবে না? কেন, শরীলটা কি বেগতিক বোধ?

শরীল না, মনটার বড় হুতাশ বইছে। কুঁজো মালা তার উপর দাঁ ছাড়া। সে বড় দুঃখু পেয়ে গেছে। যদি কিছু করে বসে—বলতে বলতে তার চোখ উঠল ছলছলিয়ে।

হরেরাম হেসে উঠল। ও হরি, এই কথা?

সকলেই প্রায় উঠল হেসে। দয়াল বলল, এরেই বলে পাগল। পাগলে পাগলে কেমন জোড় বাঁধে দেখছ তোমরা। তা মোদের জিজ্ঞেস করতে লাগে তো?

মহিমের চোখে যেন আলোর রেখা দেখা দিল, বলল, তা হইলে—

বাধা দিয়ে হরেরাম বলে উঠল, তোমার কানাইদা যে কাজে বার হইছে গো। তারে যে মোরা ন'হাট মহকুমায় পাঠাইছি।

বটে! কুঁজো মালা গেছে কাজে? আর এরাই তাকে পাঠিয়েছে? হায়। মহিমের মনে হল কুঁজো কানাই বুঝি আজও তার কাছে তেমনি দুর্জ্ঞেয় রয়ে গেছে। জীবনে এই বোধহয় প্রথম কুঁজো কানাইয়ের উপর মহিমের একটু অভিমান হল। কই, তার কানাইদা তো তাকে কিছু বলে যায়নি!

একটি নিঃশ্বাস ফেলে সে ভাবল, যাক। প্রাণটা তবু আশ্বস্ত হল। হরেরাম প্রথমে কাজের কথা শুরু করল। তার আগেই পিছনের দিকে অল্পবয়স্ক কয়েকজন যোয়ানকে লক্ষ্য করে বলল সে, তোমরা এবার হাসি-কথায় একটু চুপ দেও ভাই। তারপর অখিল চাষীকে বলল, অখিলদা', বার দেনা কি তোমার কিছু কম আছে যে, মাটিতে দাগ কাটতেছ?

অখিলের এটা অভ্যাস। বসলে নানান রকম দাগ কাটা। সে লজ্জায়

হেসে হাত গুটিয়ে নিল। প্রচলিত প্রবাদ আছে, মাটিতে দাগ কাটলে নাকি দেনা হয়।

পেছনের যোয়ানের দল হেসে উঠল। ভজনের পাশে বসে মহিমও মুখ টিপল। দেখল হরেরামের গাম্ভীর্যের আড়ালে ঠোঁটে রয়েছে চোরা হাসি।

ঘরটা মানুষে আর তামাকের ধোঁয়ায় ভরপুর। সকলেই নীরব।

হরেরাম বলল, কুঞ্জো মালা আজই ন'হাট থেকে ফিরে আসবে খবর নিয়ে। আমার পুরো পেত্যয় হয়, ন'হাট মহকুমা অরাজী হইবে না। শোনেন দাদাভাই দশজনায়, নিজে না চষে, পরকে দিয়ে চাষ করায় এমন মানুষও যখন এখানে আসছেন, তখন মনে লয় মোদের বেগার বন্ধের লড়ায়ে জয় হইবে।

পেছনের যোয়ানের দল থেকে হঠাৎ একজন উঠে বলল, পাগলা বামুন না আসতেই শুরু করলা যে?

হরেরাম বলল, পাগলা বামুন আসতে পারবে না, খবর দিছে। তবে সে যা যা বলে দিছে সব কথাই আপনারা শোনবেন।

বলে সে বেগারের বহু বিচিত্র রকম সম্পর্কে পাগলা গৌরাঙ্গের সুচিন্তিত অভিমত বর্ণনা করে গেল। এমন কি শত শত বছরের পুরনো প্রথা, ঈশ্বরের বিধানরূপে যা সকলের মনে শিকড় গেড়ে বসে'ছল, সেই শিকড়ে টান পড়তে অনেকে কিছুটা সংশয়ান্বিত হয়ে উঠল। কিন্তু হরেরামের অকাট্য যুক্তি ও উদাহরণ সাপের মত কুটিল এই অবুঝ সংশয়ের মাথা দিল নত করে। এই চাপানো বিধানের প্রতিরোধের নীতি ও কৌশলের ব্যাখ্যা করে গেল, কথায় কথায় অভিমত চাইল সকলের। সম্মতি পেল, প্রতিজ্ঞা শুনল, পেল আশা ও উৎসাহ। সগৌরবে জানিয়ে দিল, আর নয়নপুরই প্রথম শুরু করবে তিনটি মহকুমার মধ্যে। এবারকার হেমন্ত নয়নপুরের বুকে নতুন চেহারায় পদক্ষেপ করবে, নতুন তার স্বাদ গন্ধ। শুধু তাই নয়, আগামী বছরে এই সূত্র ধরেই আসবে ভাগচাষীর ভাগের লড়াই সেকথাও ঘোষণা করা হল।

ভজন দেখল, মহিমের চোখ দুটো যেন মোটা সলতের প্রদীপের মত জ্বলছে।

জ্বলবে না! তার মনে পড়ছে একটি উজ্জ্বল মুখ, একটি আবেগদীপ্ত কণ্ঠ। লক্ষ গ্রামের এ অনাগত গৌরবের কাহিনী একদিন সেই কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। নয়নপুরের খালের জলে জোয়ার আসার মত প্লাবিত করেছিল তার অন্তর। কিন্তু ভাটা আসতে দেরি হয়নি। আজ আবার জোয়ার

এসেছে। কিশোরের সেই কানে শোনা কথা আজ চলেছে কাজে হতে। আর শুনেছিল, তোমার শিল্পসাধনা আপসের পথ ধরবে যদি না তুমি এ মানুষের বাঁচার তাগিদে তাল।

সে কণ্ঠ, সে মুখ পাগলা গৌরাঙ্গের। আর এই হরেরামদা। নিজের উপর শুধু ধিক্কার নয়, বুকটা ভরে উঠল মহিমের। নয়নপুরের চাষীমনিষ্যিরা আজ সকলেই নিধনের আগ্রত শিব। মর্মাহত, ক্রুদ্ধ। চোখে চোখে আগুন, সে আগুন ছড়িয়ে পড়ল মহিমের বুকে।

ঘরের মধ্যে তখন নানান্ জনে নানান্ কথা বলছে। মহিম এগিয়ে গেল হরেরামের কাছে। বলল, স্বপন দেখছিলাম হরেরামদা', কথা শুনছি অনেক কিন্তু এ মনটার ছিরিছাঁদ নাই, তাই চোখ পথ দেখতে পায় না সব সময়। মোর কি কোন আলাদা কাজ নাই?

নাই কেন? হরেরাম বলল, ধম্মোঘটের পুজো দেব মোরা, তোমারে তৈরি করতে হইবে সেই ঘট। তোমার মনের মত ঘট বানাবে।

কে একজন হেঁড়ে গলায় গেয়ে উঠল,

নতুনকন্তের গরুতে সন্তান
চ্যালামাটির মাঠে ধান,
অনাবিষ্টির আকাশে জল;
দিন কখনো সমান থাহে না,
(ও) তোমার গত বিধেন না ভাঙিলে
নতুন বিধেন হবে না
জোড় হাতে বলি একবার কর পিনিধান।

পথ চলতে চলতে মহিমের মনে সেই অতীতের পাগলা গৌরাঙ্গের কথা-গুলো গুনগুন করতে লাগল। সেই কথার পাশাপাশি অহল্যার কথাগুলোও মনে পড়ল তার। মোর ভাবনার অন্ত নাই তোমারে নিয়া। কেবলি ডর লাগে, মোদের ছেড়ে চলে যাবে তুমি, এ গাঁ ঘরের আপনজন বুঝি তোমার পর। এ কথার সঙ্গে পাগলা বামুনের ফারাক কোথায়, বিচার-কথা মন মহিমের খুঁজে পায় না তা। অথচ কি ছিষ্টিছাড়া রাগে ও ত্রাসে বউদি বলে তার, পাগলা বামুন তোমারে কেড়ে নিতে চায় পর করবে বলে।

না। অহল্যা বউয়ের একথা ভুল। ভুল মনে হতেই তার প্রাণে নতুন

আকাঙ্ক্ষা বাসা বাঁধল—তার জীবনের একই নির্ঝর থেকে বয়ে চলা এই ধারা দুটিকে একত্র করতে হবে।

(১১)

আকাশে ঘন মেঘের ভিড় দক্ষিণ থেকে পাড়ি জমিয়েছে উত্তরে। আকাশে তাকিয়ে মনে হয়, বুঝি ভূমণ্ডলই চলেছে দক্ষিণ দিকে। হালকা হাওয়ায় শীতের আভাস। দিবাগতিকে আপনা থেকেই মনে হয় গা যেন ম্যাজ্‌মেজে লাগছে। এ ঘোর কাটলেই বোধ হয় হেমন্তের উজ্জ্বল আকাশ দেখা দেবে।

আখ্‌ড়া থেকে খোল করতাল সহযোগে নসিরামের বৃদ্ধগলার গান শোনা যাচ্ছে: প্রাণ শুকিয়ে প্রাণনাথ তোমায় ডাকি হে, প্রাণে আশা, প্রাণে আমার তোমায় পাব হে। মাঝে মাঝে সেই গলাকে ছাপিয়ে উঠছে প্রাণেশের মোটা গলা, পাব হে, পাব হে। পাব হে কথাটা যেন তার গলায় জেদের মত শোনাচ্ছে।

আগল ঠেলে বনলতা ঢুকল গোবিন্দর বাড়িতে। ডাকল, পিসি!

সাড়া না পেয়ে গোবিন্দর ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখল সে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। গোবিন্দের দরজা বন্ধ! এতবড় ব্যতিক্রম আর কোনদিন চোখে পড়েনি বনলতার। সামান্ত অসুখে বিসুখে তো কখনো সাধুর দরজা বন্ধ দেখা যায়নি। তবে কি কোন ভারী ব্যামো হল তার?

ভাবতেই বনলতার বুকের মধ্যে শংকায় ভরে উঠল। সে দাওয়ায় উঠে ডাকল, সাধু, সাধু ঘরে আছ।

জবাব পেল না। তাকিয়ে দেখল পিসির ঘরের দরজায় শিক্‌ল তোলা। গোবিন্দর দরজায় সামান্ত ঘা দিতেই দরজা খুলে গেল। দেখল, গোবিন্দ উপুড় হয়ে শুয়ে আছে বিছানায়। বাসি বিছানা কেমন যেন বড় বেশী ঘোমড়ানো এলোমেলো। ঘুম না অচৈতন্ত গোবিন্দ? কাছে গিয়ে বনলতা ডাকল, সাধু, সাধু।

গোবিন্দ নিশ্চ প নিথর।

এবার অসহ উৎকণ্ঠায় বুকের মধ্যে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল বনলতার। সে গায়ে হাত দিয়ে ডাকল গোবিন্দকে। সাধু, কি হুইছে। বেলা যে গোহর গড়ায়।

একটা বিরক্তির শব্দ করে গোবিন্দ উঠে সরে বসল। কিন্তু একি চেহারা হয়েছে সাধুর। আচমকা ভয়ে ও বিস্ময়ে বনলতার প্রাণ কেঁপে উঠল। চোখ লাল, গাল বসা। সমস্ত মুখে একটা যন্ত্রণার চাপা আভাস। কেন? জিজ্ঞেস করল সে, কি হইছে তোমার সাধু। অসুখ বিসুখ করল নাকি?

বনলতার আকুল মুখের দিকে তাকিয়ে মুহূর্ত স্তব্ধ রইল গোবিন্দ। এই দুর্জয় বৈরাগীর মেয়েটির চোখে রুদ্ধ দুষ্টামির আভাস পেলে সাধক মন খুলে তবু যা খুশি তাই বলতে পারে। কিন্তু এ মুহূর্তেই এই মুখটি তাকে বড় ধমকে দেয়। সে অস্বস্তি বোধ করে এই ভেবে যে, এ বুঝি দামাল মেয়েটার নতুন কোন কথার ভূমিকা। যত ভাবে মন কষে গোবিন্দ। বলল, কিছু হয় নাই-মোর। কিন্তু তুই এই সাত সকালে এখেনে কেন?

মুখের অন্ধকার ঘুচল না বনলতার। বলল, তোমার-'কেন' শুনলে মোর গা জ্বালা করে সাধু। কি হইছে কও। শরীল কি খারাপ করছে?

গোবিন্দ বলল, না।

কিন্তু কি এক গভীর দুশ্চিন্তা যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে গোবিন্দকে। মুহূর্তে চোখের দৃষ্টি অন্তবাবদ্ধ হয়ে উঠল, বুঝি ভুলেই গেল বনলতার কথা। তার শান্ত সাধক জীবনের কোথায় যেন একটা অশান্তির দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। মনটাকে তার দু'হাতে বেড় দিয়ে রেখেছে যেন এক গভীর সমস্যা যা নাকি তার দৈনন্দিন জীবনে এনে দিয়েছে ব্যতিক্রম।

এ ব্যতিক্রম ও অশান্তির ধোঁয়া যে বনলতার নিঃশ্বাস আটকায় তা বোধহয় গোবিন্দ জানে না। বনলতা বলল, কোন কিছুর মধ্যে নাই, তোমার আবার এত ভাবনা কিসের?

অর্থাৎ গোবিন্দ এ সংসারের বাইরে, জীবন তার ভাবনাহীন। খোঁচাটা তার দুশ্চিন্তাচ্ছন্ন মগজে বাজল বড় রূঢ়ভাবে। বুঝল, তার চিন্তার কাজের কোন মূল্য নেই এদের কাছে। বলল, তোর কি কোন কাজ নাই ঘরে আখড়ার?

চোরা হাসি ফুটল বনলতার ঠোঁটে। ভ্রূ তুলে বলল, নাই আবার? কত কাজ। শেষ নাই তার। হাসিটুকু চোখে না পড়লেও মনের হাসির আঁচ পায় গোবিন্দ। বলল, তবে মোর ঘরে কেন তুই?

মুখ ফিরিয়ে হাসি গোপন করল বনলতা। চেষ্টা করল, গম্ভীর গলায়

বলতে, তাই তো বলি তোমার ওই কেন শুনলে গা জ্বলে মোর। ঘর আখড়া মোর এইটাই।

স্তম্ভিত হয় গোবিন্দ। তার দিকে মুখ ফেরাতেই ত্রাস ফোটে গোবিন্দের চোখে। বনলতার গায়ে জামা নেই, শাড়ীতে ঢাকা। তবু গোবিন্দর মনে হল তার বলিষ্ঠ উদ্ধত যৌবন যেন সবটুকুই উন্মুক্ত, সুস্পষ্ট। যেন তার ভারে আর সমস্ত কিছুকে সে দলে দিয়ে যাবে। চন্দন কাঠের এক মূর্তির কণ্ঠে তার শ্যামল নিটোল গলায় হার মানিয়েছে সোনার হারকে। তার চোখ মুখের এই বিচিত্র নাম না জানা হাসি, আর সাংঘাতিক নির্লজ্জ উক্তি, সব মিলিয়ে গোবিন্দর গভীর দুশ্চিন্তাচ্ছন্ন মনে নতুন বিপর্যয় সৃষ্টির উপক্রম করল। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে বলল, কুকথা বলতে কি তোর বাধে না বনলতা?

মোর কথা কুকথা, তোমারই সব সুকথা বুঝিন্?

তোর কথা মেয়েমানুষের মুখে শোভা পায় না।

কেন কও তো? সত্য কথা বলে?

ছিঃ! সত্য নিয়া খেলা করিস না।

সাধু, সে খেলা কর তুমি। মিছের কারবারে সাধ ছিল না কভু, আজও নাই।

গোবিন্দ আজ উত্তেজিত হল আরও বেশী। বনলতার কথা বুঝি এতখানি আর কোনদিন বাজেনি তার। বলল, সত্য নিয়া খেলা করি আমি?

নয়? বনলতার কথার ধার তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। বলল, মোর কথা মেয়েমানুষের মুখে শোভা পায় না, তুমি মোরে গালি দিলা। তোমার কথা কি পুরুষের মুখে শোভা বাড়াইছে?

বনলতার এ কণ্ঠ ও মূর্তি এতখানি চমকপ্রদ যে, গোবিন্দ তার নিজের উপর মিথ্যা দোষারোপের কথা ভুলে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে রইল।

বনলতা আবার বলল, মোর কথা মেয়েমানুষের নয়, মুই নই মেয়েমানুষ। তবে বলি তোমার এ ভগমানের পিথিমিতে পুরুষ নাই নাই নাই।

সমস্ত ব্যাপারটাই অবুঝ ও অভাবনীয়। তাড়াতাড়ি এটাকে চাপা দেওয়ার জন্য গোবিন্দ ডাকল, লতা!

হ্যাঁ, ওই মোর নাম। রাতবিরেতে লোকে নাগিনীর নাম করে না, বলে লতা। তুমি মোরে তাই ভাব।

গোবিন্দ অসহায়ের মত বলে উঠল, থাম্ থাম্ বনলতা। কাল পাগলা-বামুন বুকটারে মোর টুঁণ্ডা করে দিছে। আজ আর মুই সইতে পারছি না কিছু।

বনলতা থামল কিন্তু দারুণ কান্নায় ফুলে ফুলে উঠল তার শরীর, বিশাল তরঙ্গের মত বুক দুলে উঠল। বার বার মরণ কামনা করল সে। এ কান্না আর কামনা বুঝি থামতে নেই কোনদিন। এ পোড়া দেহ ও মনের দৌরাত্ম্য আর সয় না।

পরমুহূর্তেই লজ্জায় সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে গেল তার। কই, এমন করে তো সাধুকে সে বলেনি কখনও, ভাবেনি কোনদিন। ছি, এ মুখ বুঝি আর দেখান যাবে না সাধুকে। তাড়াতাড়ি কাপড় গুছিয়ে ঘোমটা টেনে বনলতা উঠে দাঁড়াল। বলল, অন্যদিকে মুখ করে, মুই অভাগিনী, মোর কথায় কান দিও না। পাগলাবামুন তোমারে দুঃখ দিছে, তোমার যাতনা দেখেই তো চুপ থাকতে পারি নাই। তুমি মোরে খেদাই দিলা।

বলতে বলতে তার গলায় আবার কথা আটকাল। গোবিন্দ স্তব্ধ। একবার প্রতিবাদ করতে চাইল বনলতার কথার। কিন্তু বাধা পেল। উঠোন থেকে নরহরির মিষ্টি আবেগমাখা গলা গুন্‌গুনিয়ে উঠল,

আমি অভাগিনী রাই,
কাঁদিয়া বেড়াই
কানু সঙ্গ আশে।
মজিয়ে কুলমান
সে তো পলাইছে
মোর হিয়া ভরিয়া বিষে।

বনলতা বেরিয়ে এল। চোখে তার তখনও জলের দাগ, মনের স্পষ্ট ছাপ মুখে। সেই মুখে ছড়িয়ে পড়ল নরহরির গানের সুর। বৈরাগী যেন তার অন্তর্যামী, কিছুই তাকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না। নরহরির ঠোঁটে বেদনামুগ্ধ হাসি। বলল, তাই ভাবি, সই গেল কুনঠাঁই। চল বাইরে যাই।

বনলতা বাড়ির বাইরে এল। নরহরি বলল, তোমার চোখের জল যে শুকায় না সই। পরানটা খানিক কঠিন কর।

বনলতা বলল, পরান যে মোর বশ নয়।

কিন্তু পরান বশ না হইলে আর সব যে বশ হইবে না।

তবে এ হায় পরান শেষ হউক।

ছি, বে-রীতির কথা বল না। পরান যে অনেক বড় বস্তু। চাই বললে আসে না, যাও বললে যায় না। তার একটা ধর্ম আছে তো?

তারপর ক্ষণিক নিশ্চুপ থেকে সে বলল, বাপ বলছিল তোমার, বেটি বড় মুষড়ে থাকে নরহরি, তোমার সঙ্গে যদি ভিক্ষায় যায় হয় তো ওরে নিয়ে যেও। যাবে সই?

কি আকুল আগ্রহই না ফুটে উঠল নরহরির জিজ্ঞাসু চোখ দুটোতে! একটি জবাবের জন্ম বুঝি তার সর্বাঙ্গই উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

এ হল এই দেশগাঁয়ের রীতি। বোষ্টম বোষ্টমী গান গাইতে আসে। বাড়ির ভাল জায়গাটিতে দুখানা আসন পেতে দেয়। তারা জগৎ ভুলে কৃষ্ণ-রাধা, বিরহ-মিলনের গানে গানে হাসিতে বেদনায় মানুষের মনকে ক্ষণিকের জন্ম আতুর নিকর্ম করে দিয়ে যায়।

আগে যেত বনলতা। আজকাল আর সচরাচর যায় না। নরহরিও ডাকে না বিশেষ।

বনলতা বলল, শরীল অবশ লাগে, তুমি যাও সয়া। তাছাড়া সাধুর কি যেন হইছে।

নিমেষে নরহরির চোখের সমস্ত আলোটুকু নিভে গিয়ে অন্ধকার চোখে এক বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল। তাড়াতাড়ি বলল, সেই ভাল সই। আমি যাই।

হন্ হন্ করে পথ চলে তেপান্তরের বুকে একবার দাঁড়ায় নরহরি। একতারাটার তারে ঘা দেয় কয়েকবার। তারপর উজোন ফিরে চলে খালের মোহনার দিকে। সারা দিনমান আজ তার সেখানেই কাটবে, গান গাইবে। আর নির্জনে সে গান হবে তার স্বগতোক্তি।

[ক্রমশ

পল রোবসনের গান

পরেশ ধর

যুদ্ধ-পূর্ব যুগের ছায়াচিত্র ও রেকর্ডের গায়ক পল রোবসন, আর আজকের দিনের জনগণের গায়ক পল রোবসনের মধ্যে একটি প্রকৃত সৎ শিল্পীর বিপ্লবী সমাজচেতনার অন্তর্নিহিত ধারা লক্ষ্য করা যায়। যে রসরূপকার নিপীড়িত মেহনতী মানুষের বেদনা নিজের বুকে আন্তরিকভাবে পোষণ করেন, দেখা গেছে তিনি শেষ পর্যন্ত প্রকৃত গণতন্ত্রের সংগ্রামী শিবিরে এসে যোগ দেন। জীবনের প্রান্তসীমায় এসেও রোমাঁ রলাঁ তাঁর নিজের ভাবদর্শন সামাজিক চেতনার সত্য আলোকে উদ্ভাসিত করে নিতে কুণ্ঠিত হননি। তাঁর সততা তাঁর হৃদয়বৃত্তিকে ঠিক পথে পরিচালিত করেছিল। পল রোবসনও ঠিক এমনি একজন শিল্পী। অগ্নিগর্ভ গানের দুর্জয় হাতিয়ার নিয়ে আজ তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন জনগণের পাশে। অর্থের তাঁর অভাব নেই; সারাজীবন উপার্জন করেছেন লক্ষ লক্ষ টাকা। ইচ্ছে করলে তিনি স্বচ্ছন্দ ও নির্বিঘ্ন-জীবন-পিয়াসী পলায়নী মনোবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার আওতায় নিশ্চিন্ত বিলাসের জীবন গুছিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। লাঞ্ছিত মানবতার পক্ষ নিয়ে তিনি নিঃশঙ্ক চিত্তে লড়াইয়ের ময়দানে নেমে এসেছেন। তাঁর শিল্পী-সত্তা অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে। শিল্পীর যে কঠিন সামাজিক দায়িত্ব—সেই দায়িত্ব তিনি হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছেন মার্কিন ফ্যাসিবাদী শাসকদের ভ্রুকুটি অগ্রাহ্য করে।

যুদ্ধ-পূর্ব যুগে পাওয়া তাঁর বহু গানের বাণী ও সুর বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় যে তার মধ্যে নিহিত ছিল পল রোবসনের এই বর্তমান বিপ্লবী রূপান্তরের বীজ। তখন অবশ্য তিনি এখনকার মত সমাজ-সচেতন শিল্পী ছিলেন না; কারণ তখনও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ও নিজের দেশে শ্রেণীদ্বন্দ্ব এমন প্রকট হয়ে দেখা দেয়নি বা সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা দেউলিয়াত্বের চরম স্তরে পৌঁছে পৃথিবীকে দুই শিবিরে বিভক্ত করে ফেলেনি। তাই তখনকার দিনের ছোটখাট সামান্য ত্রুটির জন্য তিনি আজও আক্ষেপ করে থাকেন। যেমন 'স্যাণ্ডার্স অব্ দি রিভার' ছবিতে তাঁকে নিয়ে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করিয়ে গল্পটির মারফৎ সাম্রাজ্যবাদী প্রচার চালানো হয়েছে। তখন পল

রোবসন এটা ধরতে পারেননি। ধরবার মত সূক্ষ্ম রাজনৈতিক বিচক্ষণতা তখন তাঁর ছিল না। আর যুদ্ধ-পূর্ব যুগের পরিবেশে একজন শিল্পীর পক্ষে ঐ ধরনের বিশ্লেষণ-ক্ষমতা না থাকাটা খুব অস্বাভাবিক নয়। আজ তাই তিনি বলেন যে ছবিখানা তাঁর পুড়িয়ে ফেলতে ইচ্ছে হয়।

সবচেয়ে বড় কথা এই যে গায়ক ও সুর-স্রষ্টা হিসেবে রোবসন কখনো বিকৃত রুচির পরিচয় দেননি। তাঁর মূলগত রসবোধ ছিল খাঁটি বনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই বনিয়াদ হচ্ছে নিপীড়িত জনসাধারণের জন্য অকৃত্রিম ও অকুণ্ঠ বেদনা-বোধ।

পল রোবসন একজন মার্কিন নিগ্রো। সারাজীবন ধরে তিনি দেখেছেন তথাকথিত গণতন্ত্রের পীঠস্থান আমেরিকায় নিগ্রোদের ওপর শ্বেতকায় প্রভুদের অত্যাচারের তাণ্ডব। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তাদের নিষ্ঠুর নিগ্রহ। নিগ্রোদের পাড়া আলাদা, বাড়িঘর আলাদা। শ্বেতাঙ্গদের ইস্কুল, কলেজ, হোটেল প্রভৃতিতে তাদের স্থান নেই। সমান পরিশ্রম করেও শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় তারা মাইনে পায় অর্ধেক। বিনা অপরাধে কোন নিগ্রোকে প্রকাশ্য রাজপথে খুন করে ফেললেও একজন শ্বেতাঙ্গ সহজেই শাস্তির হাত এড়িয়ে যেতে পারে। এ রকম কত বিভিন্ন, বিচিত্র সব পীড়নের বন্দোবস্ত। পশুর চেয়েও অধম তাদের জীবন।

এই অত্যাচার দেখে দেখে পল রোবসনের শিল্পীমন ক্রন্দন করে উঠেছে। তিনি তাঁর পুঞ্জীভূত ক্ষোভ গানের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন। "কেউ জানে না কী কষ্ট দেখেছি আমি" গানটিতে একটি ক্ষেতমজুরের অন্তর্যাতনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। সারা জীবন সে খেটে মরে। সুখ নেই, শান্তি নেই, স্বপ্ন নেই। শুধু আছে বিষাদ পরিশ্রম। তার কষ্ট কেউ বোঝে না। ক্ষোভে, অভিমানে, অন্তর্জ্বালায় যেন সে বলছে :

"Nobody knows de trouble I've seen
Nobody feels below.
Although you see me dig and sow
(oh, yes, oh)
I have my troubles in below
(oh, yes, oh)

—কেউ জানে না কী কষ্ট দেখেছি আমি। অন্তরের বেদনা বোঝে না কেউ। আমি মাটি চষি, বীজ বুনি তোমরা দেখ। বেদনা আমার অন্তরে থাকে।

পল রোবসনের "বাই অ্যাণ্ড বাই" গানটিতে শুনতে পাই একটি খেটে-খাওয়া মানুষের আকুল আর্তনাদ। মুখে রক্ত তুলে সে মেহনত করে। আর সে পারে না। প্রাণ যেন বেরিয়ে যেতে চায়। কবে শেষ হবে এই দুঃখের রাত্রি! কবে সে পাবে নিষ্কৃতি:

"Oh, by an' by
By an' by
(I am going to lay down dis heavy load)
O, one-a-dis morning's bright an' fair
(I'm going to lay down dis heavy load)
Going to spread out ma' wings an' cleave the air,
(I'm going to lay down dis heavy load)

—একটু একটু করে ভারী নাশটা নাবাতে চলেছি। এই আলো-ঝলমল সকালে আকাশের বুক চিরে মেলে দেব আমার পাখা।

তাঁর "জন হেনরি" গানখানির বোধ হয় তুলনা মেলা ভার। জন একজন কারখানার মজুর। লোহার কাজ করে। হাতুড়ি চালাতে পাকা ওস্তাদ। শক্ত মজবুত দেহ। কিন্তু এই অমিত শক্তিধর মজুরের কাছেও শ্রম শেষ পর্যন্ত দেখা দিল অভিশাপ হয়ে:

"John Henry went to the mountain top
With that steam drill down.
But the rock was high,
John Henry was so small.
Then he laid down his hammer
An' he died.
Yes, he laid down his hammer
An' he died."

—জন হেনরি গেল পাহাড়ের চুড়োয়। উঁচু পাথর, খাটো হেনরি। হাতুড়ি নামিয়ে রেখে সে চিরকালের মত চোখ বুঁজল।

শ্রম এমন তীব্র পর্যায়ে পৌঁছল যে জনের হিম্মৎও হল পরাজিত। তাকে শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতে হল। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার আওতায় একজন সাধারণ মানুষের জীবন যে খোলামকুচির চেয়ে বেশি কিছু নয়—গানটি এই নগ্ন সত্যেরই মর্মন্তুদ দলিল বিশেষ।

"ওয়াটার বয়" গানে কালা আদমীর সন্তানদের ওপর খেতাঙ্গদের অত্যাচারের কথা বড় হৃদয়গ্রাহী ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ছোট ভাই

কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। বড় ভাই তাকে খুঁজে পাচ্ছে না। পরে সে বুঝতে পারল যে শ্বেতাঙ্গরা ধরে নিয়ে গিয়ে তাকে জেলে আটকে রেখেছে।

"I don't hear his rough voice
From the little beckon
All the way to the jail boys,
Yes, you are back to the jail."

—ঝুনঝুনি দিয়ে আর তো তার দরাজ গলা শুনতে পাই না। তুমি বুঝি জেলে এখন।

ছোট ভাইয়ের ওপর সঞ্চার হচ্ছে তার স্নেহজনিত অভিমান। হয়ত সে কোন শ্বেতাঙ্গপাড়ায় ঢুকে দুষ্টুমি করেছিল, তাই এই দুর্দশা। ঠিক হয়েছে। জেলের ভিতর এবার বেশ রাজার হালে থাকবে। সেখানে হীরে-মানিকের ছড়াছড়ি কিনা!

"How ye check the diamon's
Now ye check there the diamon's."

—কেমন তুমি হীরেমুক্তোর জহরী। এখন তুমি হীরেমুক্তোর জহরী।

আবার পরক্ষণেই ছোট ভাইটির জন্য বড় ভাই বেদনায় অস্থির হয়ে উঠছে। মনে পড়ছে মাঝে মাঝে ছোট ভাই তার পকেট থেকে পয়সা চুরি করলে সে তাকে কত বকুনি দিত। কিন্তু এখন সে বলছে:

"How you robbed my pocket
Yes, yes robbed of my pocket.
You can rob my pocket of all
The silver an' gold"

—আমার পকেট থেকে চুরি করতে পয়সা। সোনারুপো যা আছে আমার পকেট থেকে আজ চুরি করো, কিছু বলব না।

গানটির শেষের দিকে বড় ভাই আবার নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। হয়ত ছোট ভাই জেলে যায়নি; হয়ত সে কোথাও লুকিয়ে রয়েছে।

"Water boy where are you hidin'g?
If you don' come I'm gonna tell
You' ol' man."

—কোথায় তুমি লুকিয়ে? না যদি এসো, বাবাকে ঠিক বলে দেবো।

শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের কবলে নিগ্রোদের জীবন ঠিক দাসজীবনের মত। তারই হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে "Ol' Man River" গানে।

"Dont know calm,
We don't know calm,
The gold-days missed,
The white boss frown.
Bent to Knees and cow our head,
An' pull that rope until we are dead.
Let me go away from the Mississippi,
Let me go away from the white man boss."

—শান্তি নেই, শান্তি নেই। সোনার দিন হারিয়েছি। শ্বেতপ্রভুরা চোখ রাঙায়। আমরা হাঁটু গেড়ে মাথা নোয়াই। প্রাণ না বেরোনো পর্যন্ত গুন টেনে যাই। আমাকে মিসিসিপি থেকে চলে যেতে দাও, পালিয়ে যেতে দাও শ্বেতমনিবের কাছ থেকে।

এখানে বলা প্রয়োজন যে উপরোক্ত গানগুলির রচয়িতা কিন্তু পল রোবসন নিজে নন্। বিভিন্ন সংগীত-লেখকদের দিয়ে তিনি লিখিয়ে নিয়েছেন এবং কিছু কিছু সংগ্রহ করেছেন প্রাচীন নিগ্রো লোকগীতি থেকে। নিজের রচনা না হলেও বুর্জোয়া-শাসিত সমাজের বিকৃত প্রেম-বিরহের গানের যুগে রোবসনের এইরকম বিশেষ ধরনের গানের প্রতি আসক্তি থেকে তাঁর প্রকৃত বিদ্রোহী শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়। এই গানগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য এদের সহজ, সরল, বলিষ্ঠ নবরূপে রূপায়িত খাঁটি লোক-গীতির সুর; আর এই সুরগুলি পল রোবসনের নিজস্ব অবদান।

গণসুরের প্রধান বিশেষত্ব এই যে তা মুখ্যত সমাজের নীচুতলার খেটে-খাওয়া মানুষের বিচিত্র ও বিভিন্ন দৈহিক মেহনতের গতিভঙ্গি ও ছন্দ একটি সহজ-অনুভব্য আবেগের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে। বঞ্চিত জনসাধারণের জীবনধারণের জন্য যে শ্রম—সেই শ্রমের সঙ্গে এই সুর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, কারণ এই শ্রম থেকেই তার উদ্ভব। মাঠে কৃষাণ ধান কাটতে কাটতে, নদীতে মাঝি নৌকোর দাঁড় টানতে টানতে, দিনমজুর সড়ক তৈরি করতে করতে ও আরো হাজার রকম খাটুনি খাটতে খাটতে যে সুরের দোলা মনে প্রাণে অনুভব করে, সেই সব সুরই বংশপরম্পরায় নানাভাবে তাদের কণ্ঠ মারফৎ প্রকাশিত হয়ে হয়ে একটি জাতির সমৃদ্ধিশালী সুরের ঐতিহ্য সৃষ্টি করে, অতএব সুরের প্রকৃত ভাণ্ডার সমগ্র জাতির সৃষ্টি। বিখ্যাত রুশ সংগীত-স্রষ্টা গ্লিন্‌ক্ ভারি চমৎকার বলেছেন, "সংগীত সৃষ্টি করে জনসাধারণ; আমরা সুরকারেরা শুধু তাকে সাজিয়ে দিই।" সুর সম্পর্কে এমন গভীর

তাৎপর্যপূর্ণ কথা পৃথিবীর আর কোন সংগীতকার বলতে পেরেছেন বলে আমাদের জানা নেই। অবশ্য সুরশিল্পীর ব্যক্তিগত কৃতিত্বের একটা প্রশ্ন আছে। তা এই যে, তিনি জাতির বিরাট সংগীতভাণ্ডার থেকে সুর সমাবেশের পর নিজের সৃজনশীল প্রেরণা অনুযায়ী স্থলবিশেষে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জিত করে তাতে নতুন অর্থ ও সামঞ্জস্য আরোপ করেন।

পল রোবসনের সুরের শ্রেষ্ঠত্বও ঠিক এইখানে। মার্কিন লোক-গীতি-সুরের যে প্রাণরস, তিনি সেই প্রাণরস অদ্ভুত নৈপুণ্যের সঙ্গে সঞ্চারিত ও শিল্পায়িত করতে সক্ষম হয়েছেন নিজের গানের সুরের মধ্যে। জনতা-বিদ্বেষী তথাকথিত আধুনিক সুরকারদের মত তিনি নিজের খেয়ালখুশি-মাফিক যথেচ্ছ স্বরবিন্যাস করেন নি। জনগণের সুস্থ চেতনার সঙ্গে সম্পর্ক-বিহীন নানারকম উদ্ভট ও অলস সুরের প্যাঁচ সৃষ্টি করা ঐ সব ক্ষয়িষ্ণু সুরকারদের রেওয়াজ। সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও উপনিবেশগুলিতে আজকাল আধুনিক সুর নামে পরিচিত এই ধরনের নপুংসক সুরের আবির্ভাব ঘটেছে। সংগীতের এই দেউলিয়াপনা ভেঙেপড়া সমাজ-ব্যবস্থার একটি লক্ষণ। এই মুমূর্ষু সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পল রোবসনের শিল্পী-মনে যে প্রতিবাদের অনুরণন—তারই প্রভাবে তিনি সৃষ্টি করেছেন বলিষ্ঠ জনপ্রিয় লোক-সংগীত। তাই তাঁর সুরে আমরা শুনতে পাই জনচিত্তের প্রকৃত ছন্দটি। গানের কথার মধ্যে যে ক্রিয়া, পল রোবসনের সুর সেই ক্রিয়াকে আমাদের চোখের সামনে দৃশ্যের মত করে তুলে ধরে। তাঁর "কেউ জানে না কী কষ্ট দেখেছি আমি" গানের

"Sometimes I'm up
Sometimes I'm down
(oh, yes, oh)
—এই ভাসছি, এই ডুবছি।

পংক্তিগুলির সুরের মধ্যে দুঃখজর্জর মেহনতী মানুষটির দেহের ওঠানামা যেন আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই। আর oh, yes, oh কথাগুলির মধ্যে ভেসে ওঠে তার সঙ্গীর সহানুভূতিসূচক সমর্থনের ছবি। পল রোবসনের 'বাই অ্যাণ্ড বাই' গানটির সুরও ঠিক এমনি চিত্র-ধর্মী। দুটি দিনমজুর কথার পিঠে কথা বলে যাচ্ছে। খাটতে খাটতে তাদের হাতপা অবশ। শরীর আর বয় না। তাদের দেহের ক্লান্ত ভঙ্গিমাটি যেন প্রত্যক্ষ করি সুরের মধ্যে।

সংগীত-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই বোধ হয় পল রোবসনের বিখ্যাত "ভলগার মাঝি-মাল্লার গান" গানখানি শুনেছেন। এই গানটির সুরে রয়েছে নৌকায় দাঁড় টানার অপূর্ব গতিবেগ। রোদে-পোড়া জলে-ভেজা মাঝি গান গাইতে গাইতে স্রোতের উল্‌টো দিকে কড়া হাতে দাঁড় টানছে অবিশ্রান্ত ভাবে। শুধু তার দৈহিক ক্রিয়া নয়, তার জীবনধারার বিশেষ আবেগটিও যেন রূপ পেয়েছে ঐ সুরের মধ্যে। নদীর যেমন একটানা স্রোত, মাঝিরও তেমনি একটানা দুঃখকষ্টের জীবন। নদীর সঙ্গে তার রয়েছে প্রাণের নিবিড় ঘনিষ্ঠতা। কারণ নদীই তার অন্নদাত্রী। পল রোবসনের সমস্ত গানের সুরই খেটে-খাওয়া মানুষের শ্রম-ছন্দ ও অন্তরানুভূতির ব্যঞ্জনায় ভরপুর।

এতক্ষণ যে সব গানের আলোচনা করা হল তার সবগুলিই রেকর্ডের গান। আজ আর অবশ্য পল রোবসনের গান রেকর্ড হয় না, ছায়াচিত্রে কাজ করার জন্যে তাঁর ডাক পড়ে না, এমনকি আমেরিকার বাইরে যাবার জন্য তাঁকে ছাড়পত্র পর্যন্ত দেওয়া হয় না। তাছাড়া নানারকম হীন ষড়যন্ত্র করে বর্তমানে তাঁর কণ্ঠরোধের চেষ্টা চলেছে প্রতিনিয়ত। আমেরিকার কোথাও আজ তাঁর পেশাদারী অডিটোরিয়াম পাবার যো নেই। কিন্তু মার্কিন শাসকরা তবু পল রোবসনের কণ্ঠ স্তব্ধ করতে পারেনি। তাঁর কণ্ঠ আজ গর্জন করে ওঠে রাস্তায়, ফাঁকা মাঠে, খেটে-খাওয়া মানুষের ব্যারাকে। অনেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ধর্মযাজক তাঁকে আজকাল গির্জার প্রাঙ্গণ ছেড়ে দিচ্ছেন। সেখানে তাঁর মহান বজ্রকণ্ঠ সংগীতে মুখর হয়ে উঠেছে আর সে আহ্বানে জড়ো হচ্ছে শোষিত মানুষের জনতা। মানব-সভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আজ তাঁর জীবন-পণ সংগ্রাম।

পল্ রোবসন আজ সম্পূর্ণ সমাজ-সচেতন শিল্পী ও সরাসরি বিপ্লবের শিবিরে পার্টিসান। তাঁর গান এখন অনেক বেশি স্পষ্টব্যক্ত, অনেক বেশি প্রত্যক্ষ রাজনীতি-ঘেঁষা ও অনেক বেশি নির্মম—অথচ সুমহান মানবতা-বোধে ভাস্বর। তাই মার্কিন ধনকুবেররা আজ তাঁর গানকে ভয় করে—কারণ সে গানে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে ফ্যাসিবাদী যুদ্ধবাজ শাসকদের দুঃশাসন অবসানের জয়োদ্ধত ঘোষণা; পৃথিবীকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের রক্ত-গঙ্গায় নিমজ্জিত করার ঘৃণ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে মাভৈঃ হুংকার; শোষণহীন মুক্ত-জীবন গড়ে তোলার জন্য কোটি প্রাণের দুর্জয় শপথ। আজ পল রোবসন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শান্তি-সৈনিকদের একজন। তাই বিশ্বশান্তি-পরিষদ তাঁকে শান্তি-

পুরস্কার অর্পণ করে তাঁর প্রতি সমস্ত পৃথিবীর সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধাকেই রূপায়িত করে তুলেছেন।

বুর্জোয়া-পন্থলেহী সমালোচকেরা আজকাল পল রোবসনকে বলে রাশিয়ার দালাল; তাঁর গানকে বলে রাজনৈতিক গলাবাজি। কিন্তু দুনিয়ার সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা ঐ সব সমালোচনাকে মিথ্যা কুৎসা বলেই প্রতিপন্ন করে দিয়েছে। উপসংহারে রুশ লেখক সুরভ্-এর একটি সুন্দর বিবৃতি উল্লেখ করে এই প্রবন্ধের সমাপ্তি টানা যাক :

"প্রতিভাবান আমেরিকান গায়ক পল্ রোব্সন অতীতে কিছুটা সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে পরিচিত ছিলেন এবং সেই অল্পসংখ্যক শ্রোতাই তাঁর কণ্ঠের নিগ্রো লোক-সঙ্গীতের আশ্চর্য রূপায়ন উপভোগে ছিলেন অভ্যস্ত। এই অনন্যসাধারণ গায়কটি তাঁর সম্প্রদায়ের লোক-শিল্পকে জনপ্রিয় ক'রে তোলার কাজ তখনও সততার সঙ্গেই সম্পন্ন করতেন। বাস্তব জীবন অবশ্য রোবসনকে ক্রমশ অনেক বেশি গুরুতর সমস্যার মুখোমুখি করল। আমেরিকার শ্রেণী-সংঘর্ষের মর্মান্তিক শিক্ষা আর সেইসঙ্গে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার ফলে রোবসন এ-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলেন যে, যদি তিনি শান্তি আর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজে সক্রিয় রাজনৈতিক যোদ্ধাদের সামনের সারিতে এসে দাঁড়ান, একমাত্র তাহলেই শিল্পী ও নাগরিক হিসেবে তাঁর মহৎ দায় পালন করতে সক্ষম হবেন তিনি।

"আর তাই রোবসনের কণ্ঠে লাগল নতুন সুর। আর হাজার হাজার শ্রোতা আজ শুনছে সেই-কণ্ঠস্বর। সভাসমিতির মতই তাঁর গানের জলসায় ভিড় ক'রে আসছে মানুষ। এই গীতশিল্পী আজ আর শুধুমাত্র শিল্পী নন, আজ তিনি জনগণমনঅধিনায়কও বটে। আর এর ফলে শিল্পও তাঁর সমৃদ্ধতর, অধিকতর প্রাণশক্তিতে আর সার্থকতায় মহত্তর।"

গল্প

উলুখড়ের রূপকথা

সলিল চৌধুরী

এক দেশে এক গরীব চাষী বাস করত। তার না ছিল হালবলদ, না ছিল জমিজমা। কোনরকমে এক জমিদারের দু' বিঘে জমি ভাগে চাষ করে বেচারী দিনাতিপাত করত। এক বছর ফলন বেশ ভাল হল—কিন্তু ধান যে কাটবে এমন কাস্তে অবধি তার নেই। সে তখন জমিদারের কাছে গিয়ে বললে, 'মহারাজ! কাস্তে নেই যে ধান কাটি, একটা কাস্তে ধার দিতে হবে।' জমিদার বড় দয়ালু, তাকে একটা কাস্তে দিলেন, দিয়ে বললেন, 'দেখ বাপু, কাস্তের বড় দাম আজকাল, কাস্তে না যায়।' চাষী মনের আনন্দে ধান কাটতে লাগল। কিন্তু কাস্তেটা ছিল মরচে-ধরা—কয়েক আঁটি ধান কাটতে না কাটতেই গেল মট্ করে ভেঙে। চাষী কী করে। কাঁদতে কাঁদতে জমিদারের কাছে গিয়ে বললে, 'মহারাজ, মার্জনা হয়, কাস্তেটা ভেঙে ফেলেছি। আর একটা কাস্তে দিন, ওর দাম আমি খেটে শোধ দিয়ে দোব।' জমিদার রেগে অগ্নিমূর্তি হয়ে বললেন, 'তুই সারাজীবন খাটলেও আমার কাস্তে শোধ হবে না। যেথেকে পাবি আমার কাস্তে এনে দিবি, নয়তো তোকে শূলে চড়াব।'

এখন, সেই গ্রামে এক কামার বাস করত। কাস্তে, কুড়ুল, খুরপী, শাবল, লাঙলের ফাল তৈরি করতে সেই তল্লাটে তার জুড়ি ছিল না। দূর-দূরান্ত থেকে লোকে তার কাছে জিনিস কিনতে আসত। চাষী তখন তার বাড়ি গিয়ে ডাকল, 'কামার ভায়া, কামার ভায়া, বাড়ি আছ হে?'

—'কে?'

না, 'আমি একজন গরীব চাষী, জমিদারের কাস্তে ভেঙে ফেলেছি, ধান কাটতে পারছি না, একটা কাস্তে গড়ে দিতে হবে।'

কামার বললে, 'তাইতো।—কিন্তু তিনমাস আমার হাপরে আগুন পড়েনি—লোহা মিলছে না। তা তুমি যদি গঞ্জের থেকে আমায় খানিক ইস্পাত এনে দিতে পারো তো তোমার কাস্তে গড়ে দিতে পারি।'

চাষী তখন গল্পে গেল এক লোহা-ব্যবসায়ীর দোকানে।

'কে তুমি? কী চাও?'

'আমি একজন গরীব চাষী। একটা কাস্তে বানাব, এক টুকরো ইস্পাত দিতে পারো ভাই?'

ব্যবসায়ী বললে, 'আগে লোহার ব্যবসা করতুম বটে, এখন ধোঁয়ার ব্যবসা করি। এটা গাঁজার দোকান।'

চাষী চেয়ে দেখলে। তাই বটে। লোহার নামগন্ধ নেই সেখানে।

ব্যবসায়ী বললে, 'তবে তুমি যদি শহরে যেতে পার—সেখানে অনেক বড় বড় লোহা-ইস্পাতের কারখানা আছে, তারা তোমাকে দিতে পারে।'

চাষী তখন শহরে গেল। গিয়ে দেখল এক বিরাট কারখানা চলছে—হাজার হাজার লোক কাজ করছে। বড় বড় ভারী ভারী সব জিনিস-পত্তর তৈরি হচ্ছে। চাষী ভয়ে ভয়ে তাদের কাছে গেল। গিয়ে বললে, 'কাস্তে বানাব—একটু ইস্পাত দেবে ভাই?'

তারা বললে, 'এ তো আমাদের নয়—মালিককে গিয়ে বল—তিনি দিতে পারেন।'

মালিকের কাছে যেতে বললে, 'এর থেকে তো আমার দেবার ক্ষমতা নেই। এ সব সরকারী ফরমায়েসের মাল—কানাকড়ির হিসেব দিতে হবে। তবে তুমি যদি মন্ত্রীমশাইকে গিয়ে ধরতে পার—তিনি বড় দয়ালু—তিনি তোমার সাহায্য করতে পারেন।'

চাষী জিজ্ঞেস করলে, 'তিনি কোথায় থাকেন?'

'—রাজধানীতে।'

চাষী রাজধানীতে গিয়ে উপস্থিত হল। মন্ত্রীমশায়ের প্রাসাদের কাছে গিয়ে ডাকলে, 'মন্ত্রীমশাই, মন্ত্রীমশাই, বাড়ি আছেন কি?' যেই না বলা, অমনি দশ জন দারোয়ান, বিশ জন সিপাহী, চল্লিশ জন গোয়েন্দা এসে তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। সাড়ে ছিয়াত্তর ঘণ্টা তাকে জেরা করার পর হাতকড়া লাগিয়ে মন্ত্রীমশায়ের কাছে হাজির করা হল। মন্ত্রীমশাই বললেন, 'ও কে?'

সিপাই-গোয়েন্দা বললে, 'হুজুর সন্দেহ হয় ও গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।'

তার চেহারা দেখে কিন্তু মন্ত্রীমশায়ের দয়া হল। বললেন, 'ওর হাত-

কড়া খুলে দাও।' সিপাহীরা হাতকড়া খুলে দিলে। মন্ত্রীমশাই বললেন, 'তোমার কোন ভয় নেই—এ রাজ্যে সবাই সমান—বল তুমি কী চাও।'

চাষী বললে, 'হুজুর, জমিদারের কাস্তে ভেঙে ফেলেছি। কাস্তে না ফেরত দিলে আমায় শূলে চড়াবে। এক টুকরো ইস্পাত যদি দেন কামার তাহলে কাস্তে গড়ে দেয়—নয়ত ধনে-প্রাণে মারা যাব হুজুর।'

মন্ত্রী বললেন, 'তাইতো! বড় অন্যায় করে ফেলেছ। কিন্তু ইস্পাত তো নেই!'

চাষী বললে, 'আছে হুজুর, শহরে দেখে এলুম বড় বড় কারখানায় হাজার হাজার যন্ত্র তৈরি হচ্ছে।'

মন্ত্রী বললেন, 'হ্যাঁ আছে বটে—তবে ও আমাদের নয়।'

চাষী বললে, 'আমাদের নয়? তবে যে ওরা বললে, আমাদের দেশের সব লোক আমাদের খনি থেকে তুলছে—আর আমাদের লোকেই সব জিনিস বানাচ্ছে।'

মন্ত্রী বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের তো বটেই—তবে ঠিক আমাদের নয়। গম খেয়েছিলে মনে আছে?'

চাষী বললে, 'আজ্ঞে?'

'—গত সনে দুর্ভিক্ষে আমরা বিদেশ থেকে গম আনিয়েছিলুম, তার বদলে সব ইস্পাত ওদের দিয়ে দিতে হয়েছে। মানে ইস্পাত আমাদেরই রইল—তবে তাতে কি তৈরি হবে তা সব ওরা বলে দেবে। তাই এখন শুধু কামান, বন্দুক, ট্যাংক এই সব তৈরি হচ্ছে। তার মূল্য বাবদ টাকা অবশ্য আমাদের পাওনা হবে—কিন্তু সেই টাকা দিয়ে আমরা কি কিনব আর কোত্থেকে কিনব তা কিন্তু ওরা বলে দেবে।'

চাষী ঠিক বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে, 'তাহলে কাস্তে তৈরির জন্যে ইস্পাত মোটে পাওয়া যাবে না?'

মন্ত্রী বললেন, 'যাবে—তবে পরে। এখন ভয়ানক যুদ্ধ হবে কিনা। যুদ্ধ মিটে গেলে আবার কাস্তে তৈরি হবে।'

চাষী বললে, 'হুজুর, যদি অভয় দেন একটা কথা বলি।'

মন্ত্রী বললেন, 'নির্ভয়ে বল।'

চাষী বললে, 'এত সিপাহীর বন্দুকে সঙ্গীন রয়েছে—ঐ যদি আমাকে একটা খুলে দেন দয়া করে তাহলে কাস্তে তৈরি হয়।'

মন্ত্রী মশাই জিব কাটলেন। বললেন, 'তাহলে দেশে অরাজক শুরু হবে। তার চেয়ে তুমি এক কাজ কর। হাঁড়িচাচার কাছে যাও—তিনি তোমায় ইস্পাত দিতে পারেন।' এই বলে মন্ত্রীমশাই চাষীকে হাঁড়িচাচার দেশে পাঠিয়ে দিলেন।

চাষী অবাক হয়ে গেল—কী বিরাট আকাশ-ছোঁয়া সব বাড়ি—কত গাড়ি ঘোড়া চলছে—কতরকম আলো জ্বলছে। তার মনে বড় আনন্দ হল—গুনগুন করে গান করতে করতে চলতে লাগল পথ দিয়ে। হঠাৎ কতকগুলো লোক এসে তাকে ভীষণভাবে মারতে আরম্ভ করল—চড়, কিল, লাথি, জুতো। ব্যাপারটা ভাল করে বোঝবার আগেই তারা যে যার চম্পট দিল। রক্তাক্ত অবস্থায় চাষী রাস্তায় পড়ে রইল—মনে হল তার হাড়গোড় সব ভেঙে গেছে। রাস্তার লোকজন কেউ যেন দেখেও দেখছে না। খানিক পরে একজন লম্বা চওড়া লোক এসে তাকে কোলে করে তুলে নিয়ে গেল। বিছানায় শুইয়ে অনেক শুশ্রূষা করে গরম দুধ আর ফল খেতে দিলে। তখন চাষী কাঁদতে আরম্ভ করল। জিজ্ঞেস করলে, 'তুমি কি হাঁড়িচাচা?'

লোকটি বললে, 'না, আমি একজন মজুর। তুমি কোথা থেকে এসেছ?'

চাষী বললে, 'অনেকদূর থেকে। ওরা আমায় মারল কেন? আমি তো ওদের কিছু করিনি।'

মজুর বললে, 'তোমার গায়ের রং কালো কিনা, তাই। আমাদের দেশে কালো-চামড়া লোককে মেরে ফেললেও কোন অপরাধ হয় না। তা তুমি কেন এসেছ?'

চাষী বললে, 'আমি হাঁড়িচাচার কাছে যাচ্ছি—এক টুকরো ইস্পাত চাইতে। একটা কাস্তে বানাবো কিনা।'

মজুর বললে, 'না, তুমি দেশে ফিরে যাও। এরা কেউ তোমাকে ইস্পাত দেবে না। তোমার দেশেই ঢের ইস্পাত আছে—তাতে তোমারও ভাগ আছে'—এই বলে তাকে সঙ্গে করে দেশের সীমানা-পার করে দিয়ে এল।

মনের দুঃখে চাষী হাঁটতে লাগল। দশদিন দশরাত ধরে সমানে হেঁটে কত দেশ-দেশান্তর নদী-পাহাড় পেরিয়ে চলতে লাগল। মনে ভাবল আর জীবনে সে দেশে ফিরবে না। এগার দিনের দিন বেলা যখন দুপুর—তখন অবসন্ন হয়ে সে একটা গাছের ছায়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে একটা বড় মজার স্বপ্ন দেখল। হাঁটতে হাঁটতে সে

যেন এক আশ্চর্য দেশে গিয়ে পড়েছে। —যতদূর নজর চলে ধানক্ষেত ফসলে নুয়ে পড়েছে—আর হাজার হাজার ছেলে মেয়ে গান করতে করতে ফসল কাটছে। কিন্তু তারা কাস্তে দিয়ে কাটছে না—বিরাট একটা গাড়ি চলছে আর আপনিই সব ধান কাটা হয়ে যাচ্ছে—তারপর আর একটা গাড়ি এসে সব ধান জড়ো করে দিচ্ছে। চাষীকে দেখেই সব ছেলেমেয়েরা তাকে হাতে ধরে নিয়ে গেল।

বলল, 'আজ থেকে তুমি বন্ধু হলে। তুমি আমাদের সঙ্গে থাক!'

চাষী বললে, 'তোমরা ধান কাটছ কি দিয়ে?'

তারা বললে, 'ট্রাক্টর!'

'—কে দিলে তোমাদের?'

তারা বললে, 'আমরা নিজেরাই বানিয়েছি—এদেশে কলকারখানা জমি-জমা যা কিছু দেখছ—সব আমাদের—চল আমাদের সঙ্গে—আমাদের দেশ তোমায় দেখাব।'

চাষীকে নিয়ে তারা চলল। প্রথমে দেখাল একটা বিরাট নদী—তার বাঁধ দেওয়া হয়েছে। চাষের জন্যে তার থেকে ইচ্ছেমত জল সরবরাহ করা যাবে। তার থেকে বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে—সমস্ত গ্রাম আলোয় আলো হয়ে গেছে। চাষী ভাবল, আহা আমার দেশে যদি এমন হ'ত—তাহলে বন্যা অনাবৃষ্টিতে আর ফসল নষ্ট হ'ত না।

তারপরে দেখাল একটা বিরাট বাড়ি—তাতে ফুলের মত শত শত ছেলে-মেয়ে রয়েছে—কেউ খেলনা নিয়ে খেলা করছে—কেউ গান করছে—কেউ পড়ছে। ওরা বলল, এখানে সব ছেলেমেয়েদের বিনা খরচে যার যা খুশি শেখান হয়। চাষী ভাবল, আহা, আমার পাঁচ বছরের ছেলেটি এখন থেকেই লাঙল ঠেলে—এমনটি যদি আমার দেশে হ'ত।

তারপরে দেখাল একটা মস্তবড় কাপড়ের কল—কত সুন্দর সুন্দর পোষাক সেখানে তৈরি হচ্ছে। ওরা বললে, এ সব পোষাকে আমাদের দেশের মানুষ আরো সুন্দর হয়ে উঠবে—এ সব তাদের। চাষী ভাবল, আহা আমার বৌটা একটুকরো কাপড়ের অভাবে লজ্জায় ঘর থেকে বেরোতে পারে না—এমন যদি সেখানে হ'ত।

ওরা বললে, এমনি আরো কত আছে—সারা বছর দেখেও তুমি শেষ করতে পারবে না—এখন খাবে চল। নানারকম খাবার সাজিয়ে তাকে

ডাকা হ'ল। চাষী দেখে ঠিক করতে পারে না—কোনটা খাবে আগে—কোনটা পরে। শেষ পর্যন্ত ঠিক করে একটা মিষ্টি যেই মুখে তুলতে যাবে—অমনি তার ঘুম ভেঙে গেল। ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল তার। ভাবল, আহা, এমন যদি সত্যি হ'ত। এমন সময় সে শুনতে পেল—খুব কাছেই যেন কারা কথা বলছে—অথচ চারিদিক চেয়ে চাষী কাউকে দেখতে পেলে না। তারপর ওপর দিকে চেয়ে দেখে—গাছের ডালে ছটো পাখী বসে কথা বলছে—একটা ব্যাঙ্গমা আর একটা ব্যাঙ্গমী। চাষীর মনে পড়ল ছোটবেলায় গল্পে শুনেছিল যে ঐ পাখীদের কিছু অজানা নেই—তারা সব কিছু বলে দিতে পারে। চাষী মন দিয়ে শুনতে লাগল তারা কী বলে:

ব্যাঙ্গমী বললে, দেখ। এই চাষীটা সারা দেশ ঘুরে এমন একটু ইস্পাত পেলে না যে একটা কাস্তে বানাবে—অথচ ওর ধান সব নষ্ট হয়ে যাবে—হয়ত জমিদার সব কেটে নেবে। ওর বৌ ছেলে না খেয়ে মরবে—ওর জন্তে আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে।

ব্যাঙ্গমা বললে, কষ্ট হলে কি হবে বল—ওর তো একার অবস্থা ঐ নয়—বেশির ভাগ লোকেরই আজ ঐ দশা। কামারের লোহা নেই—তাঁতীর সুতো নেই—চাষীর জমি নেই—পুরুষের কাজ নেই—নারীর আশ্রয় নেই—ছেলেদের ইস্কুল নেই—দেশের যা কিছু সম্পদ সব আজ কয়েকজনের লাভের জন্তে যুদ্ধের কাজে লাগান হচ্ছে। এমন তো হবেই। হয়ত শীগ্‌গিরই দেশে এমন আগুন জ্বলবে যে এ গাছ ছেড়ে আমাদের অন্ত দেশে চলে যেতে হবে।

ব্যাঙ্গমী বললে, তাহলেই তো সর্বনাশ। কিন্তু এমনি করে মানুষ আর কতদিন মরবে? এর থেকে বাঁচার কি কোন উপায় নেই।

ব্যাঙ্গমা বললে, উপায় আর কি বল—আমরা হাজার হলেও পাখী তো—আমাদের কথা কি আর মানুষ শোনে? উপায় করতে পারে মানুষই—যদি তারা ইচ্ছে করে।

চাষী কান খাড়া করে রইল—পাছে একটা কথাও ফসকে যায় কান থেকে।

ব্যাঙ্গমা বলছে, একটা মন্তর আছে। এ এমনি মন্তর যে মানুষ মাত্রেই যার কানে এ কথা ঢুকবে সেই আর একজনকে বলবে—তবে তার নিস্তার। তবে যারা মানুষের মত দেখতে অথচ আসলে পশুর চেয়েও অধম তাদের কিছু হবে না। এমনি করে যখন সারা পৃথিবী এ মন্তর ছড়িয়ে পড়বে আর মন্তরের কথামত সবাই চলবে—তখনই দেশে শান্তি আসবে।

ব্যাঙ্গমী বললে, বল না সে কী মন্তর !

ব্যাঙ্গমা বললে, শোন।

"উলুখড় উলুখড় শুধু পুড়ে মরে
সেই উলুখড় যদি দড়িরূপ ধরে
কামানকে টেনে জলে ফেলে দিতে পারে।
যার মাথা, যার শ্রম, যারা জনবল
তাদেরই রক্তে নেপো পাতে দখল
তারা এক হলে হয় সকলি বিকল।
গর্জন সার তার গর্জন সার
সবে বল আর নয় আর নয় আর
কামান কাজে হবে—বন্দুক হার।
ভেদাভেদ ভুলি এস, দেশ গড়ে তুলি ॥"

যেই না এই মন্তর শোনা অমনি চাষী বিড় বিড় করতে লাগল,

'উলুখড় উলুখড় শুধু পুড়ে মরে—'

তারপর সোজা তার দেশ লক্ষ্য করে ছুটতে লাগল—পথে যেতে যেতে যত লোক পেল—বাজার, বন্দর, গঞ্জ-হাট সর্বত্র সে ঐ মন্তর বলে বেড়াতে লাগল। আবার যেই ঐ মন্তর শোনে সেই আবার লোককে বলে বেড়ায়। দেখতে দেখতে সারা দেশে আগুনের মত ছড়িয়ে গেল ঐ মন্তর। ছেলে পড়তে পড়তে ঐ মন্তর বলে—মা রাঁধতে রাঁধতে মন্তর বলেন—চাষী চষতে চষতে বলে—কলে খাটতে খাটতে মজুর বলে—ভীষণ হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। মন্ত্রী মশ ইয়ের গোয়েন্দাবা খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে বললে, 'মন্ত্রীমশাই সর্বনাশ, একরকম ভয়ানক ছোঁয়াচে মন্তর বেরিয়েছে। যে শুনছে সেই নাকি বলছে—সারা দেশে বিদ্রোহ শুরু হচ্ছে।'

মন্ত্রীমশাই হুকুম দিলেন, 'এখনি সবাই কানে তুলো দাও।' আইনসভায় আইন পাশ হ'ল প্রত্যেককে কানে তুলো দিতে হবে—আর যার মুখে ঐ মন্তর শোনা যাবে তার জেল হবে। কিন্তু কে কার কথা শোনে—ক্রমশ ক্রমশ মন্ত্রীর সিপাহী-দারওয়ানরাও মন্তর বলতে শুরু করল।

মন্ত্রীমশাই একদল সৈন্য নিয়ে কানে দুটো বড় বড় ছিপি এঁটে বেরোলেন। হাজার লোক এসে তাঁকে ধরল—সবাই তারস্বরে চেঁচাতে লাগল—

'উলুখড় উলুখড় শুধু পুড়ে মরে
সেই উলুখড় যদি দড়িরূপ ধরে
কামানকে টেনে জলে ফেলে দিতে পারে।—'

কিন্তু মন্ত্রীর কানে একটা কথাও ঢুকল না। তিনি হুকুম দিলেন—সব গ্রেপ্তার কর। এমন সময় দুজন ছেলে এসে মন্ত্রীমশায়ের কানের থেকে ছিপি খুলে ফেলে দিলে। তখন মন্ত্রীও বলতে শুরু করলেন

'উলুখড় উলুখড় শুধু পুড়ে মরে—'

সঙ্গে সঙ্গে সব কামান বন্দুক ভেঙে মজুররা বানাতে লাগল ট্রাক্টর—চাষী জমি ফিরে পেল—দেশের যা কিছু সম্পদ দেশের কাজের জন্যে লাগান হবে ঠিক হ'ল। চাষী তার গাঁয়ে গিয়ে জমি ফিরে পেল—আর মনের আনন্দে চাষ করতে লাগল—দেশে সুখ সমৃদ্ধি ফিরে এল। কেবল হাঁড়িচাচাকে তার দেশের লোকেরা বনবাস দিয়ে এল।*

---

* একটি নৃত্যনাট্যের খসড়া

ফ্রয়েড-প্রসঙ্গ

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

১ : অনুবন্ধ

ফ্রয়েডীয় মতবাদের সমর্থনে ফ্রয়েডপন্থীদের পক্ষে এমন এক সুবিধে আছে যা বিজ্ঞানের কোনো ক্ষেত্রে, এমন কি দার্শনিক মতবাদের বেলাতেও, সত্যিই সম্ভব নয়। সুবিধেটা হল, বিপক্ষ-সমালোচনার মধ্যে মনোবিকারের লক্ষণ আবিষ্কার করবার দাবি। বিশেষ করে সে-সমালোচনার সঙ্গে যদি কোনো রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের যোগাযোগ থাকে তাহলে তো কথাই নেই। কেননা, ফ্রয়েডপন্থী অনায়াসেই বলবেন, রাজনীতি নিয়ে উৎসাহের পেছনে মানসিক গরমিলের পরিচয় খুঁজে পাওয়া খুবই সম্ভব। তার উপর রাজনীতিটা যদি বৈপ্লবিক হয় তাহলে তাঁর মতে এই সম্ভাবনা প্রায় সুনিশ্চয়ের কোঠায় পৌঁছোবার কথা।

অথচ, এই প্রবন্ধে ফ্রয়েডীয় মতবাদের বিবরণ দিতে বসিনি। সমালোচনা করবার প্রয়াসীই হয়েছি। সে-সমালোচনার সঙ্গে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের যোগাযোগও থাকবে। রাজনীতিটা অহিংস বা নিরামিষ নয়; বৈপ্লবিক। অর্থাৎ মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ফ্রয়েডীয় মতবাদ নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। তাই, ফ্রয়েডীয় মতবাদের দিক থেকে এ-সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করবার যে-দুটি প্রাথমিক দাবি হবে, শুরুতে পূর্বপক্ষ হিসেবে সেই দুটি দাবির জবাব দেওয়া দরকার।

একে একে দুটি কথার আলোচনা করা যাক।

প্রথমত, বিরুদ্ধ-সমালোচনার মধ্যে মনোবিকারের লক্ষণ আবিষ্কার করবার দাবি। মনে রাখতে হবে, এ-দাবি একমাত্র ফ্রয়েডবাদেরই। তার মানে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং দার্শনিক মত পেশ করবার পর বিরুদ্ধ-সমালোচনা—তুমুল সমালোচনা—বহুবারই শোনা গিয়েছে; কিন্তু তার জবাবে এ-কথা আর কখনো শোনা যায়নি যে, সমালোচকদের এতো যে সোরগোল তা শুধু তাদের মানসিক গণ্ডগোলেরই পরিচয়। যেমন ধরুন, কোপার্নিকাস যখন প্রথম ঘোষণা করলেন সূর্যের চারপাশেই পৃথিবীর আবর্তন, পৃথিবীকে ঘিরে

সূর্যের আবর্তন নয়, তখন কোপার্নিকাসের বিরুদ্ধে গোয়গোল খুব কম হয়নি। কিংবা জীবজগতে বিবর্তনের কথা পেশ করবার পর ডারউইনের বিরুদ্ধে তীব্র আর তুমুল সমালোচনার তুফান নিশ্চয়ই উঠেছিল। আজো, লাইসেন্‌কো জীববিজ্ঞানে যে-বিপ্লব ঘোষণা করছেন তার বিরুদ্ধে সমালোচনার অন্ত নেই। দার্শনিক মতবাদের বিরুদ্ধেও অনেক সময়ই এই রকম। দিদ্যরো, ফয়ারবাখ, এঙ্গেলস্—অনেক দার্শনিকের নাম মনে পড়ে। অনেকের বিরুদ্ধেই তীব্র তুমুল সমালোচনা। কিন্তু উত্তরে এ-পর্যন্ত আর কাউকেই দাবি করতে দেখা যায়নি যে সমালোচনাগুলির মধ্যে সমালোচকদের মনোবিকারের স্বাক্ষর রয়েছে। বাস্তব দৃষ্টান্ত, বাস্তব অভিজ্ঞতা আর যুক্তিতর্ক দিয়েই বরাবর বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক সমস্যার কিনারা করবার প্রথা। কিন্তু ফ্রয়েডপন্থীরা শুধু এইটুকুকেই পূর্বপক্ষ-খণ্ডনের একমাত্র পন্থা বলে স্বীকার করতে সম্মত হবেন না। যেমন ধরুন, কেউ হয়ত তীব্র সমালোচনা করে বললেন, "জিঘাংসা-বৃত্তি নাম দিয়ে ফ্রয়েড্ যে সহজবৃত্তির কথা উল্লেখ করেন সেটা আসলে অতিকথা মাত্র। উত্তরে ফ্রয়েড-পন্থী সহজেই বলবেন, সমালোচকের নিজের মনে এই সহজবৃত্তির উৎপাত নিশ্চয়ই বেশী. তা নইলে একে অস্বীকার করবার এমন উৎসাহ হবে কেন? ঠাকুর ঘরে কে রে,—না, আমি তো কলা খাইনি। তর্ক করে সমালোচক হয়ত বলবেন, তা কেমন করে হবে? নিজের মনেই যদি এ-হেন সহজবৃত্তির উৎপাত থাকতো তাহলে অন্তত নিজে তো তার কথা টের পেতুম। উত্তর শোনা যাবে, তা হয় না; কেননা, নিজের মনের পুরো খবরটা নিজে নিজে পাওয়া যায় না।

ফ্রয়েডীয় মতবাদের এই বিশেষ সুবিধেটার ভিত্তি ঠিক কি, এইবারে তা স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যাবে। ভিত্তিটা হল, আলোচ্য বিষয়ের এক বিশেষ সংজ্ঞা-নিরূপণ। ফ্রয়েড বলেন, নির্জ্ঞান মন নিয়ে তাঁর আলোচনা, নির্জ্ঞান বলতে তিনি বোঝেন মানব-মনের অজানা আর. গভীর এক প্রদেশ। তার মানে, ফ্রয়েডের মতে আমরা নিজেরা যথাসাধ্য চেষ্টা করে নিজেদের মন সম্বন্ধে মাত্র সামান্য আর ভাসাভাসা খবর জোগাড় করতে পারি, সেটুকু অবশ্যই আমাদের মনের আসল খবর নয়। কেননা, আমাদের মনের আসল দিকটার কথা আমরা নিজেরা সব সময় নিজেদের কাছ থেকেই লুকোতে ব্যস্ত। ওই ভাগটারই নাম হল নির্জ্ঞান। এবং ফ্রয়েডের মতে আমাদের যা-কিছু চিন্তা, যা কিছু সজ্ঞান ব্যবহার তার সবটুকুই ওই নির্জ্ঞানের নিয়ন্ত্রণ মেনে চলে।

অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে, নির্জ্ঞান মনটা কেন নির্জ্ঞান? আমাদের মনেরই প্রধান দিক অথচ আমরাই তার খবর পাইনে, এমন ব্যাপার সম্ভব হয় কেমন করে? উত্তরে ফ্রয়েড বলবেন আমাদের মনের মধ্যেই সদা-সর্বদা একটা চেষ্টা রয়েছে ওই নির্জ্ঞানকে চেপে রাখবার, ওর বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টি করবার। সেই বাধা উত্তীর্ণ হয়ে নির্জ্ঞানের বিষয়টুকু সজ্ঞানের স্তরে উঠে আসতে পারে না—দেউড়ির পাহারাদারকে পেরিয়ে যে-রকম মুক্ত রাজপথে বেরিয়ে আসতে পারে না কয়েদখানার বাসিন্দারা। কিংবা, পাহারাদারদের ফাঁকি দিয়ে কয়েদীরা যদি একান্তই বেরিয়ে আসতে চায় তাহলে তাদের পক্ষে ছদ্মবেশ পরবার দরকার। আমাদের মনের বেলাতেও ওই রকম: পাহারাদারি পেরিয়ে নির্জ্ঞানের কথা যদি সজ্ঞানের স্তরে উঠে আসতে চায় তাহলে ছদ্মবেশ ছাড়া গতি নেই। এই জাতীয় হরেক রকম ছদ্মবেশের বর্ণনা ফ্রয়েডীয় গ্রন্থাবলীতে। দৈনন্দিন খুঁটিনাটির ভুলচুক আর হাসিতামাসা থেকে শুরু করে স্বপ্ন এবং মনোবিকারের লক্ষণ পর্যন্ত কতোই না।

ফ্রয়েডীয় মতবাদের এই মূল দাবি মনে রাখলে বুঝতে পারা যাবে বিপক্ষ সমালোচনার মধ্যে মনোবিকারের লক্ষণ খোঁজবার ব্যাপারে সঙ্গতিটা ঠিক কোথায়। ওই নির্জ্ঞান মনের কথা যদি বৈজ্ঞানিক বাস্তব হয়,—অর্থাৎ ওই নির্জ্ঞানের কথা নিজেদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে আমরা যদি সদাসর্বদা ব্যস্ত হই—এবং ফ্রয়েডীয় আলোচনার প্রধান উৎসাহ যদি ওই নির্জ্ঞানের উপর আলোকপাত করবার চেষ্টাই হয়, তাহলে সে-আলোচনার বিরুদ্ধে আমাদের তরফ থেকে প্রতিবন্ধ জাগা তো স্বাভাবিকই: সভ্যমানুষ সদাসর্বদা নিজের সম্বন্ধে যে-কথা গোপন করতে চায় সেই কথা প্রকাশ করে দেবারই প্রধান তাগিদ ফ্রয়েডের, ফলে ফ্রয়েডের বিরুদ্ধে সভ্য মানুষের স্বাভাবিক আপত্তি। এবং আমাদের মধ্যে তার আপত্তিই ততো বেশি যার নিজের মনে নির্জ্ঞান মনের উৎপাত যতো প্রবল। কেননা, তার মনে সজ্ঞানে-নির্জ্ঞানে রফা হয়নি, দুয়ের মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব। অতএব, ফ্রয়েডবাদের বিরুদ্ধে আপত্তির রকম দেখেই আন্দাজ করা চলে কার মনে সজ্ঞানে-নির্জ্ঞানে দ্বন্দ্বটা কী রকম; ফ্রয়েডীয় মতে এই দ্বন্দ্বের নামই হল মনোবিকার। তাই বিপক্ষ-সমালোচনার মধ্যে মনোবিকারের লক্ষণ আবিষ্কার করবার দাবি।

অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে, বিরুদ্ধ-সমালোচনা যদি একান্তই প্রতিবন্ধ-প্রসূত হয় তাহলে কি ভক্তি-গদগদ চিত্তে ফ্রয়েডবাদকে ধ্রুব সত্য বলে মেনে নেওয়া

ছাড়া সুস্থ ও বৈজ্ঞানিক মনের আর কোনো পরিচয় নেই? ফ্রয়েড বলবেন, তাও নয়। অতিভক্তিটা আবার চোরের লক্ষণ। মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহ নিয়ে ফ্রয়েডবাদের কাছে আত্মনিবেদন করবার ভঙ্গিটাও ফ্রয়েডের মতে ওই একই প্রতিবন্ধের উলটো দিক মাত্র, কেবল এর মধ্যে এমন এক চালাকি আছে যে প্রতিবন্ধের পরিচয়টা চট করে চোখে পড়ে না। দৈনন্দিন ব্যবহারের মধ্যেও এ-রকম চালাকির নমুনা একান্ত দুর্লভ নয়। যেমন ধরুন, একজন কেউ এমন সব কথা বলছে বা এমন মত প্রকাশ করছে যা আমার কাছে একেবারে বাজে কথায় সামিল। আমি তার সঙ্গে জোর গলায় তর্ক করতে পারি। কিন্তু যদি আরো চালাকি করতে চাই তাহলে হয়ত খুব সোজাসুজি—এমন কি সোৎসাহ বিস্ময়ের অভিনয় করে—তার সব কথা সরাসরি মেনে নিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দেবো। তার কথা তখন আর আমাকে স্পর্শও করবে না, বিব্রতও করবে না।

প্রশ্ন হল, তাহলে? যদি বিরূপ সমালোচনা আর সোৎসাহে মেনে নেওয়া দুয়ের মধ্যেই মানসিক গণ্ডগোলের পরিচয় থাকে তাহলে কি ফ্রয়েডীয় মতে ফ্রয়েডবাদকে যাচাই করবার—এমন কি সম্যকভাবে চেনবার আর বোঝবার—কোনো পথই নেই? উত্তরে ফ্রয়েড যে কথা বলছেন তা সত্যিই অতি-দুরূহ এক দাবি। বই পড়ে বা মাথা ঘামিয়ে এ-মতবাদকে চেনা-জানা যায় না, যাথার্থ্য-বিচার তো দূরের কথা। ফ্রয়েড বলছেন, একে চেনবার-জানবার একমাত্র পথ হল সহৃদয়-সংশয়ের (Benevolent scepticism) মনোভাব নিয়ে কোনো এক ফ্রয়েডপন্থীর কাছে আত্মনিবেদন করতে হবে। তিনি জানেন, মনের প্রতিবন্ধ ভাঙবার কৌশলটা ঠিক কী, যদিও অবশ্য দুঃখের বিষয় এ-ব্যাপারে সহজ আর ছোট কোনো পথ এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। সাধারণত ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলে পারদর্শী ফ্রয়েডপন্থীর পক্ষে এই কাজ সমাধা করবার জন্যে একটানা দু' তিনশো দিন ধরে দৈনিক একঘণ্টা করে চেষ্টার প্রয়োজন। তাছাড়া, এই কলাকৌশলেরই একটা অঙ্গ হল নগদ-দক্ষিণা (রুপোর টাকায়) গ্রহণ করা। তা নইলে কাজ হবে না। ফলে, ব্যাপারটা শুধু সময়-সাপেক্ষই নয়, ব্যয়-সাপেক্ষও। তবু ফ্রয়েডীয় মতে এছাড়া আর কোনো পথ নেই। আপনি যদি ফ্রয়েডবাদের সম্যক পরিচয় পেতে চান তাহলে ওই ভাবে কোনো এক ফ্রয়েডীয় কৌশলে পারদর্শীর কাছে আত্মনিবেদন করতে হবে, করতে হবে বহু দিন এবং বহু অর্থ ব্যয়। তাহলে আপনার নিজের মনের প্রতিবন্ধ ভাঙবে,

ফ্রয়েডবাদের স্পষ্ট পরিচয় আপনি পাবেন এবং আপনি হবেন সমালোচনার অধিকারী। নিজের উপর একান্ত ব্যক্তিগতভাবে এর প্রয়োগ না দেখলে ফ্রয়েডের মতে তাঁর মতবাদ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পাওয়াই সম্ভব নয়, সমালোচনার অধিকার পাওয়া তো দূরের কথা। মনে রাখতে হবে, ফ্রয়েডীয় কলাকৌশল শিক্ষালাভ করবার ব্যাপারেও প্রথমে নিজের উপর এর প্রয়োগ করানোর নির্দেশ। অর্থাৎ, সাধারণ রোগীর চিকিৎসা করবার সময় ফ্রয়েডপন্থী যেমন ভাবে দীর্ঘ দিন ধরে রোগীর উপর তাঁর পদ্ধতির প্রয়োগ করেন, ঠিক তেমনি ভাবেই শিক্ষার্থীর উপরও প্রয়োগ করবেন ওই একই পদ্ধতি। শিক্ষার্থীর পক্ষে শিক্ষালাভ করবার এ-ছাড়া আর কোনো পথ ফ্রয়েডপন্থী স্বীকার করেন না। তাঁর যুক্তিটা সহজ: এইভাবে শিক্ষার্থীর পক্ষে শুধুই যে ফ্রয়েডীয় কলাকৌশল সম্বন্ধে অপরোক্ষ পরিচয় পাবার আশা তাই নয়, ফ্রয়েডবাদের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীর সভ্যমনে যে স্বাভাবিক প্রতিবন্ধ তা দূর করবারও এই হল একমাত্র পথ।

ফ্রয়েডীয় কলাকৌশল এবং তার মতবাদের বিভিন্ন দিকগুলি নিয়ে একটু পরেই খুঁটিয়ে আলোচনা তুলবো। কিন্তু তার আগে যে কথা নিয়ে শুরু করেছিলাম,—অর্থাৎ ওই সমালোচনার অধিকার নিয়ে কথা। স্পষ্টই দেখা যায়, অধিকারভেদের কথা তুলে ফ্রয়েডপন্থী ব্যাপারটাকে একান্ত ব্যক্তিগত এক স্তরে নিয়ে যেতে চান। কেননা, ফ্রয়েডীয় মতে সমালোচনার অধিকারী হবার পক্ষে যা প্রয়োজন তা নেহাতই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ব্যাপার। তাই আমার উত্তরটাও অনিবার্যভাবেই ব্যক্তিগত হয়ে পড়বে; কেননা নইলে শুরুতেই ফ্রয়েডবাদের অনেকগুলি মূলকথা অস্বীকার করতে হয় এবং এই প্রাথমিক অস্বীকৃতিকে ফ্রয়েডবাদীরা প্রতিবন্ধ-প্রসূত—অতএব অগ্রাহ্য—এই বলে সরিয়ে দিতে পারবেন। অথচ, ব্যক্তিগত স্তরে উত্তর দিলে তাঁদের পক্ষে এ-প্রচেষ্টাও ফলপ্রসূ হবে না। অর্থাৎ, আমি দাবি করতে চাই যে যদিও বা ফ্রয়েডবাদের এই সব মূল কথাগুলি যথার্থও হয়—যথার্থ কিনা বা কতোখানি যথার্থ তার হিসেব একটু পরেই করবো—তাহলেও আমি যে-সমালোচনায় প্রবৃত্ত হতে চাই তাকে নিছক প্রতিবন্ধের বিকাশ বলে প্রত্যাখ্যান করা চলবে না—তাঁদের নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকেই চলবে না—এর জবাব দিতে গেলে যুক্তিতর্ক এবং বাস্তব দৃষ্টান্তর ভিত্তিতেই জবাব দিতে হবে, সমালোচকের মনোবিকার অনুমান করে সাধারণ বৈজ্ঞানিক জবাবের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া তাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকেই স্ববিরোধী হবে। কেননা, শিক্ষার্থী হিসেবে দীর্ঘ

দিন ধরে দৈনিক একঘণ্টা করে ফ্রয়েড-গোষ্ঠী দ্বারা স্বীকৃত সুকৌশলী ফ্রয়েড-পন্থীর কাছে আমি আত্মনিবেদন করেছিলাম এবং অপরোক্ষভাবে ফ্রয়েডীয় পদ্ধতির প্রয়োগ ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজের উপর হতে দেখেছি এবং শেষ পর্যন্ত ফ্রয়েড-সমাজ আমাকে জানিয়েছিলেন যে শিক্ষার্থীর পক্ষে যতোখানি গভীরভাবে এই পদ্ধতির সাহায্যে আত্মোপলব্ধির প্রয়োজন আমার ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার, ফ্রয়েডপন্থীর মতে সাধারণ রোগীর রোগলক্ষণ নিবারণের জন্তে যতোখানি গভীর মনঃসমীক্ষণ প্রয়োজন, শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রয়োজন তার চেয়েও বেশী গভীর সমীক্ষণ। আশা করি এই আত্ম-কাহিনীর নজির তোলবার পর ফ্রয়েডপন্থীরা আমার সমালোচনায় যুক্তিতর্ক ও বাস্তব দৃষ্টান্তর দোষত্রুটি অন্বেষণ করবেন, আমার ব্যক্তিগত আবেগ-অনু-ভূতিতে গরমিল আছে, এমনতরো দাবি করে আমার সমালোচনার জবাব দেবেন না। অবশ্যই এ-রকম ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তুলে পাঠকসাধারণের ধৈর্যের উপর যদি জুলুম করে থাকি তাহলে তার জন্তে আমি ক্ষমা চাইছি যদিও ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলের আলোচনাপ্রসঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা তুলতে ভবিষ্যতে অনিবার্যভাবেই আবার বাধ্য হবো। আসলে সমালোচনা-প্রসঙ্গে দেখাবার চেষ্টা করবো ফ্রয়েডের দৃষ্টিকোণ একান্তভাবে বুর্জোয়া-দৃষ্টিকোণ হওয়ার দরুন এ-নিয়ে আলোচনা ঘুরে ফিরে বারবার ব্যষ্টিকে কেন্দ্র করবার দিকে ঝুঁকে পড়তে চায়ঃ বুর্জোয়ার দৃষ্টিকোণ অনিবার্যভাবেই ব্যষ্টির দৃষ্টিকোণ।

কিন্তু রাজনৈতিক উৎসাহ? রাজনৈতিক মতবাদ? বিশেষ করে বৈপ্লবিক রাজনীতি? ফ্রয়েডপন্থীর মতে যে এ-জাতীয় উৎসাহের অন্তত চোদ্দ আনা প্রেরণাই হল নিজ্ঞান মনের সমীক্ষণ-সাপেক্ষ পিতৃদ্রোহ। এখানে ফ্রয়েডীয় বক্তব্যটার সঙ্গে সাধারণের অভিজ্ঞতা এবং ধারণার এতো তফাৎ যে সে-বক্তব্যের জবাব দেবার আগে বক্তব্যটা একটু বিশদ করা দরকার। ফ্রয়েডের মতে নিতান্ত শৈশবদশা থেকেই মানুষের মনে—বিশেষ করে পুরুষ মানুষের মনে—পিতৃশাসনের বিরুদ্ধে একটা তীব্র আপত্তি আর বিদ্বেষ জমা হতে থাকে। তার কারণ, ফ্রয়েড বলেন, শিশুর কাছে যে অবাধ সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা সেই আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে শিশুর ক্ষুদ্র জগৎটুকুর মধ্যে পিতৃ-শাসনই সব চেয়ে বড় বাধা। তাই বিদ্বেষ, পিতৃদ্রোহ। অবশ্যই বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক অভিজ্ঞতা এবং সামাজিক নীতি-শিক্ষার চাপে এই বিদ্বেষ, এই বিদ্রোহ, আমরা মনের গোপনে লুকিয়ে ফেলবার চেষ্টা করি;

অর্থাৎ ফ্রয়েডের পরিভাষায়, নির্জ্ঞানের মধ্যে একে নির্বাসনে পাঠাই। কিন্তু নির্জ্ঞানে নির্বাসিত হলেও ওই পিতৃদ্রোহ মরে না, উপে যায় না ; বয়ঃপ্রাপ্তির পরেও মনের মধ্যে টিঁকে থাকে। আর যদি টিঁকেই থাকে তাহলে তার পক্ষে চরিতার্থতা খোঁজবার পথই হবে একমাত্র পথ। কিন্তু সোজাসুজি চরিতার্থতা খোঁজবার বিরুদ্ধে সমাজবোধের তীব্র বাধা। ফলে যেন দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হয়। মনের মধ্যে গোপন পিতৃদ্রোহ সহজ চরিতার্থতার পক্ষে বাধা দেখে ছদ্মবেশী চরিতার্থতার পথ খুঁজতে চায়। ছদ্মবেশী চরিতার্থতা নানান রকমের। তার মধ্যে এক রকম হল বৈপ্লবিক রাজনীতি। কিন্তু কেন? কেমন করেই বা? ফ্রয়েডপন্থী বলবেন, পরিণত বয়সে আমরা যখন পারিবারিক অভিজ্ঞতার ক্ষুদ্র গণ্ডিটুকু থেকে বেরিয়ে বৃহত্তর সমাজ-জীবনের পরিধির মধ্যে গিয়ে পড়ি তখন আমাদের কাছে পিতাই আর একমাত্র শাসক, একমাত্র কর্তৃপক্ষ নন। শাসক বলতে, কর্তৃপক্ষ বলতে, তখন সরকার, সরকারী ব্যবস্থা, আমলা, রাজপুরুষ। ফ্রয়েডীয় পরিভাষায় এ-সবই হবে পিতৃ-প্রতীক, 'ফাদার-ইম্যাগো'। অর্থাৎ, শিশুমনের কাছে পিতা যে-ভাবে শাসকের জায়গা জুড়ে ছিলো পরিণত মনের কাছে এইগুলিই সেই রকম জায়গা জুড়ে থাকে। তাই, শৈশবের সঞ্চিত ওই পিতৃ-বিদ্বেষ পরিণত বয়সে এই পিতৃ-প্রতীকগুলির উপর গিয়ে পড়ে। অর্থাৎ, বিপ্লবের মনোভাব। বৈপ্লবিক রাজনীতি। অবশ্যই, দায়িত্বশীল ফ্রয়েডপন্থী স্বীকার করবেন যে রাজনীতির মধ্যে ষোলো আনাই এই রকম নির্জ্ঞান মনের পিতৃ-বিদ্বেষ নয়। অর্থাৎ, রাজনীতির মধ্যে কিছুটা শুদ্ধ ও নির্মল রাজনৈতিক হিসেব-নিকেশের পরিচয় থাকতে পারে। কিন্তু রাজনীতির মধ্যে আবেগ-উত্তেজনার যে দিক সেটা নির্জ্ঞানের পিতৃদ্রোহই এবং অনেকের ক্ষেত্রে—ফ্রয়েডপন্থী বলবেন, অধিকাংশের ক্ষেত্রেই—নির্জ্ঞানের জটিলতা সচেতন মনের তথাকথিত নির্মল হিসেব-নিকেশকে অজুহাত হিসেবে নিজের কাজে ব্যবহার করে নেয়। যেমন ধরুন, আমাদের দেশের হালের ইতিহাসে সাধারণ মানুষ "বন্দেমাতরম" বলে বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠেছিলো। এর পেছনে কি শুধুই নির্মল রাজনৈতিক চেতনার পরিচয়? ফ্রয়েডপন্থী নিশ্চয়ই তা স্বীকার করবেন না। তিনি বলবেন, মানুষের মনের কাছে জননী আর জন্মভূমি এক জিনিস। অর্থাৎ মাতৃভূমি হল এক নিখুঁত মাতৃ-প্রতীক, 'মাদার-ইম্যাগো'। এবং ফ্রয়েডীয় মতে শিশুমনের সবচেয়ে বড় চাহিদা হল মা-কে ভোগ করবার (ইডিপাস কমপ্লেক্স্ :

এ নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে) আকাঙ্ক্ষা। আসলে ওই পিতৃ-বিদ্বেষের মূলেও রয়েছে এই ভোগাকাঙ্ক্ষা : মাকে একান্তভাবে পাবার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হল বাবা, অবাধ উপভোগের যে চাহিদা তার বিরুদ্ধে পিতার শাসনই সবচেয়ে বড় শাসন। এখন, মাতৃভূমি যদি মাতৃ-প্রতীক হয় আর মানুষ যদি দেখে তার এই মাতৃ-প্রতীককে বিদেশী শাসকের দল এমনভাবে উপভোগ করছে যে তার নিজের পক্ষে উপভোগের সম্ভাবনা বন্ধ,—অর্থাৎ বিদেশী শাসকের দল হয়ে দাঁড়িয়েছে নিখুঁত পিতৃ-প্রতীক,—তাহলে দেশের মানুষ তো মায়ের নামে ক্ষেপে উঠবেই। "বন্দেমাতরম" বলে ওই ছোট্ট আওয়াজটুকুর মধ্যে অমন অদ্ভুত যাদুশক্তির যোগানটা ঠিক কোথা থেকে—তার হদিস দিয়ে ফ্রয়েডপন্থী তাই বলতে চাইবেন, এর ভিতর একটি গূঢ় মানসিক তত্ত্বকে সর্বাঙ্গীণভাবে ব্যবহার করবার নিপুণ আয়োজন রয়েছে যে।

তর্ক তুলে আপনি হয়ত বলবেন, বাস্তব পৃথিবীর চাক্ষুষ অভাব-অভিযোগগুলো তাহলে কি কিছু নয়? শিশুমনের একটা আজগুবি আক্রোশই সব হল? পলাসীর প্রাঙ্গণ থেকে জালিয়ানওয়ালাবাগ, জালিয়ানওয়ালাবাগ থেকে সাতচল্লিশের দেশ-ভাগ সব কিছুই হল গৌণ, নিমিত্ত মাত্র? ফ্রয়েডপন্থী বলবেন, তাই-ই। তা নইলে অমন আক্রোশের ভাবটা আসে কোথা থেকে? আবেগ-উত্তেজনায় অমন আত্মহারা হয়ে পড়া কেন? রাজনীতির প্রেরণাটা যদি নিছক বাস্তববোধ থেকেই সঞ্চারিত হোতো তাহলে রাজনীতির আবহাওয়াটা হোতো শান্ত, নির্লিপ্ত,—বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের আবহাওয়াটা যে রকম। আঁক কষবার সময় আমরা যে-রকম স্থির অবিচলিত, বৈপ্লবিক আওয়াজ তোলবার সময় তো আর তা নয়। তার কারণ, গণিতের হিসেবনিকেশের খুঁটি হল বাস্তববোধ, আর বৈপ্লবিক চেষ্টার ভিত্তিতে নির্জ্ঞানের আবেগ।

এর পরও যদি আপনি নেহাত নাচার না হন তাহলে হয়ত প্রশ্ন তুলবেন কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে সব দেশে সবযুগে তুমুল বৈপ্লবিক আন্দোলন চলছে না কেন? বিদেশী শাসক না থাকলেও অন্তত স্বদেশী শাসক তো সর্বত্রই; বিদেশী শাসকের তাঁবে দিন কাটে এমন দৃষ্টান্তও তো কম নয়। অর্থাৎ, ফ্রয়েডীয় পিতৃ-প্রতীক তো সর্বত্রই এবং ফ্রয়েডীয় মতে নির্জ্ঞানের অন্ধ পিতৃদ্রোহটাও এমন কিছু একটা বিশেষ দেশের এবং একটা বিশেষ কালের মানবমনস্তত্ত্বের লক্ষণ নয়। অথচ, ইতিহাস-বিচারে দেখতে পাওয়া যায় যখন তখন

বিপ্লব হয় না, বৈপ্লবিক আন্দোলনের জন্যে বৈপ্লবিক পরিস্থিতির প্রয়োজন। এবং বৈপ্লবিক পরিস্থিতি বলতে একান্ত বাস্তব, একান্ত পার্থিব জিনিস বোঝায়, মোহমুক্ত অর্থনীতিবিদ্ নিখুঁত বৈজ্ঞানিক হিসেব করে তার নির্ভুল রূপ নির্ণয় করতে পারেন। এই যুক্তি ফ্রয়েডপন্থীকে হয়ত কিছুটা টলাতে পারে। তবুও তিনি নিশ্চয়ই আত্ম-প্রকল্প-ভ্রষ্ট সহজে হবেন না। হয়ত জবাব দিয়ে বলবেন; বাস্তব পরিস্থিতির কথাটাকে তো উড়িয়ে দেবার দরকার নেই; এ-কথা অস্বীকার করে কী হবে যে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি ছাড়া বৈপ্লবিক আন্দোলন হয় না। তবু ওই পরিস্থিতিটুকুকেই বৈপ্লবিক আন্দোলনের মূল কারণ বলাও চলবে না। মূল কারণ নির্জ্ঞান-আবেগের গরমিল, যে-গরমিল বাস্তব পরিস্থিতি পেলে তাকে আশ্রয় করে রাজনৈতিক বিপ্লব সৃষ্টি করে, বাস্তব পরিস্থিতি না পেলে অন্য কিছুকে অবলম্বন করে অন্য পথে আত্মচরিতার্থতা অন্বেষণ করে। উপমা দিয়ে ফ্রয়েডপন্থীর বক্তব্যটুকু ব্যাখ্যা করা যায়: অন্ধকার পথে মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালাতে গিয়ে কেউ হয়ত একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। অন্ধকার না থাকলে বা হাতে গাড়ি না থাকলে দুর্ঘটনাটা ঘটতো না নিশ্চয়ই। কিন্তু এগুলিই তো দুর্ঘটনার আসল কারণ নয়। আসল কারণ হল, চালকের মত্ত অবস্থা। হাতে গাড়ি না পেলে অন্য কিছুকে অবলম্বন করে অন্য কোনো ভাবে তার মাৎলামি আত্মপ্রকাশ করতো!

এ-কথা অবশ্যই স্পষ্ট যে বৈপ্লবিক রাজনীতি সম্বন্ধে ফ্রয়েডীয় মন্তব্যগুলি তাঁর কয়েকটি মূল প্রকল্পের নিগমন-বিশেষ। ফলে সেই মূল প্রকল্পগুলি নিয়ে আলোচনা তোলবার আগে রাজনৈতিক উৎসাহ সম্বন্ধে ফ্রয়েডায় মতবাদের পূর্ণাঙ্গ জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। এবং আত্ম-অভিজ্ঞতার পুনরুল্লেখ-প্রচেষ্টা করুণ জবাবদিহির মতো শোনাবে, ঠিক জবাব হবে না। আপাতত তাই পূর্ণাঙ্গ জবাব দেবার চেষ্টাও করবো না, করুণ জবাবদিহির চেষ্টাও নয়। কিন্তু এখানে ফ্রয়েডপন্থীদের আত্মপক্ষ-দোষটুকু বর্ণনা করা অন্তত চিত্তাকর্ষক হবে। আত্মপক্ষ-দোষ বলতে বোঝাতে চাই, রাজনৈতিক উৎসাহের এই বিশ্লেষণকে যদিও আপাতত রাজনীতি-নিরপেক্ষ হবার ডাক বলে ভ্রম হতে পারে তবুও প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ দাঁড়ায় এক নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রতি পক্ষপাতী হবার উমেদারিই। আর তাছাড়া যতো দিন যাচ্ছে ততোই বাস্তব রাজনীতিতে ফ্রয়েডপন্থীদের পক্ষপাতটুকু প্রকট থেকে প্রকটতর হয়ে পড়ছে। অর্থাৎ, মতবাদগত তাৎপর্যের দিক এবং বাস্তব রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিক—

দুদিক থেকেই ফ্রয়েডপন্থীরা রাজনৈতিকভাবে মোটেই অনাসক্ত এবং অপক্ষপাতী নন, এক সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক পক্ষের apologists মাত্র। এই কথাটি খুব স্পষ্টভাবে মনে না রাখলে ফ্রয়েডতত্ত্বের স্বরূপ স্পষ্টভাবে বুঝতে পারাই সম্ভব হবে না।

মতবাদগত তাৎপর্যের দিক থেকে ফ্রয়েডবাদের রাজনৈতিক পক্ষপাতটা কী রকম প্রথমে তার আলোচনা করা যাক।

ফ্রয়েডপন্থী বলছেন, রাজনীতি নিয়ে উৎসাহটা সুস্থ আর স্বাভাবিক মনের পরিচয় নয়। কিন্তু এ-কথায় তো কোনো সন্দেহ নেই যে বাস্তব সমাজে, বাস্তব পৃথিবীতে, রাজনীতি বলে ব্যাপারটা একটা ধ্রুব সত্য। ফ্রয়েডার মতে রাজনীতির মধ্যে সুস্থ মনের পরিচয় থাক আর নাই থাক বাস্তব ভাবে প্রত্যেক যুগের মতো আজকের দিনেও একটা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করবার আয়োজন করছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে রাজনৈতিক নিরুৎসাহের একমাত্র অর্থ কী হবে? বাস্তবভাবে আমাদের জীবনের উপর যে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বর্তমান তাকেই মাথা পেতে মেনে নেওয়া, তাকে বদল কববার বা উচ্ছেদ করবার আয়োজনে যোগ না দেওয়া। অর্থাৎ, রাজনীতি সম্বন্ধে নিরপেক্ষ হবার প্রসঙ্গটা শেষ পর্যন্ত বর্তমান শাসক-সম্প্রদায়ের রাজনীতিটাকে মাথা পেতে স্বীকার করে নেবার নির্দেশই। মেনে নিতে যদি আপনি অস্বীকার করেন তাহলে ফ্রয়েডপন্থী এই অস্বীকারকে আপনার শৈশবের অন্ধ পিতৃদ্রোহের বিকাশ বলে বর্ণনা করবেন। তাই, দেশটাকে যে-রাজনৈতিক দল যেমনভাবেই শাসন করুক না কেন, আপনি শুধু সে-সম্বন্ধে উদাসীন থাকুন, তাদের দিন চালাও সুযোগ।

তার মানে, রাজনীতি সম্বন্ধে আপাত-নিরপেক্ষতাটুকু নির্দিষ্ট এক রাজনৈতিক শাসনকে স্বীকার করে নেবার পক্ষে উমেদারি ছাড়া আর কিছুই নয়। দেশের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণটা তো আর ফ্রয়েডার ভাষায় মানসিক যাথার্থ্য (psychical reality) নয়, এক অতি বড় বাস্তব যাথার্থ্য। ফ্রয়েডের ভাষায় material reality। ভূতের ভয়ের মতো শুধু মাত্র মানসিকভাবে যদি যথার্থ হোতো তাহলে না হয় মনস্তত্ত্বমূলক কোনো পদ্ধতিতে তার সঙ্গে যুঝবার অন্তত আশ্বাসটুকুও পাওয়া যেতো। কিন্তু বাস্তব যাথার্থ্য সম্বন্ধে অপক্ষপাতী হবার একমাত্র তাৎপর্য হল তাকে স্বীকার করে নেওয়া, বড় জোর এই স্বাক্বতির দুর্ভোগকে ভুলে থাকবার একটু আধটু আয়োজন করা।

একটা নমুনা নেওয়া যাক। আজকের দিনে ভাত-কাপড় থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য-শিক্ষা পর্যন্ত সব কিছুর ব্যাপারে চরম অব্যবস্থায় জর্জরিত হয়ে আপনি হয়ত কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে বীতরাগ হয়েছেন ; পথে-ঘাটে গুলি চালাবার বহর দেখে আপনি হয়ত অল্পবিস্তর উত্তেজিতও বোধ করেন। এমনটাও তো অসম্ভব নয় যে বাঞ্ছিত কোনো সরকার কায়েম করবার আশায় আপনি কোনো বামপন্থী—অর্থাৎ বৈপ্লবিক দলের সঙ্গে—নিজেকে সাংগঠনিক ভাবে সংযুক্ত করতে চান বা করেছেন। এ-হেন অবস্থায় ক্রয়েডপন্থী যদি আপনাকে বোঝাতে চান যে রাজনীতি নিয়ে আপনার এই উৎসাহটুকু নেহাতই নিজ্ঞান-মনের শিশুসুলভ কোনো আক্রোশের বিকাশ মাত্র,—বাস্তব অব্যবস্থার নজিরগুলোকে এই আক্রোশ শুধু ওজুহাত হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে, এবং শেষ পর্যন্ত আপনি যদি ক্রয়েডপন্থীর কথাগুলো মনেপ্রাণে মেনে নেন, তাহলে আসল ব্যাপারটা দাঁড়াবে ঠিক কী রকম? ব্যক্তিগতভাবে আপনি আপনার রাজনৈতিক উৎসাহটুকুকে বিসর্জন দেবেন, যার বাস্তব অর্থ হল কংগ্রেসী সরকারের যে রাজনীতি কায়েম রয়েছে সেটা কায়েমই থাকবে।

তাই ক্রয়েডপন্থীর এই তথাকথিত রাজনৈতিক নিরপেক্ষতাটুকু আসলে রক্ষণশীল রাজনীতির তরফে ওকালতি করা ছাড়া আর কিছুই নয়; সদর-দোর দিয়ে রাজনৈতিক উৎসাহ-মাত্রকে নির্বাসন দেবার যে-আয়োজন, তারই বাস্তব পরিণতি হল খিড়কী দোর দিয়ে বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমর্থনকে গোপন আমন্ত্রণ পাঠানো। তার মানে, রাজনীতি বিষয়ে এই নিরুৎসাহ প্রচারটা আসলে এক সুনির্দিষ্ট রাজনীতির পক্ষে উৎসাহ-প্রচারেই পরিণত। প্রসঙ্গত বলা যায়, আজকের দিনে মতবাদগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে অনুরূপ দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। বুর্জোয়া শ্রেণীর পোষকতা-পরিপুষ্ট দার্শনিকেরা বুর্জোয়া-দর্শনেরই অনিবার্য প্রচারক, তবু প্রচার কাজের কায়দা-কানুনটা আজ অভিনব। বুর্জোয়া-জীবনাদর্শকে গ্রহণ করবার কথাটা তাঁরা আর জোর গলায় বলছেন না, তার বদলে বলছেন সংশয়বাদের কথা: মানুষের সত্যান্বেষণ নিষ্ফলতায় পর্যবসিত, জীবনের যে কোন রকম মূল্য নির্ণয় করতে যাওয়াটাই আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর। হালের তথাকথিত 'পসেটিভিস্ট' থেকে শুরু করে 'একসিসটেনসিয়ালিস্ট' দর্শন পর্যন্ত সর্বত্রই এই কথা। যুক্তিতর্কের এতো রকম আর এতো সংকীর্ণ সব অলিগলি ঘুরিয়ে পাঠক-সাধারণকে এই অর্থহীনতার মুখোমুখি নিয়ে যাবার কায়দা, সহজবুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করবার

এমন সূক্ষ্ম আয়োজন, যে দেখে তাক লেগে যায়। এবং এতো মার্জিত, এমন সূক্ষ্ম, এমন নির্লিপ্ত যুক্তিতর্কের পিছনে যে কোনো রকম স্থূল শ্রেণীস্বার্থ লুকোনো থাকতে পারে তো সন্দেহ করতে যাওয়াই যেন সন্দেহ-বাতিকের পরিচয়। অথচ, আসলে, শ্রেণীস্বার্থ একটা রয়েছেই; যদিও প্রকটভাবে নয়, প্রচ্ছন্ন ভাবে। তবুও এই শ্রেণীস্বার্থকে দেখতে না পাওয়া অন্ধতারই প্রমাণ। কেননা, আজকের দিনে বাস্তব-পরিস্থিতিটা ঠিক কী রকম তা একবার ভেবে দেখুন। বুর্জোয়া-শাসনের কৃপায় আজকের দিনে বুর্জোয়া জীবন-দর্শন আকাশে বাতাসে মিশে রয়েছে; ইস্কুল কলেজ থেকে শুরু করে ছাপাখানা-সিনেমা-রেডিও পর্যন্ত সব কিছুর মাধ্যমে এই দর্শনকে প্রচার করবার ব্যক্ত বা অব্যক্ত আয়োজন। এ-হেন পরিস্থিতিতে আপনাকে যদি বুঝিয়ে দেওয়া যায় দার্শনিক প্রচেষ্টাটুকু পণ্ডশ্রমেরই নামান্তর-মাত্র তাহলে কি ওই বুর্জোয়া-দর্শন আরো নিষ্কণ্টক, আরো নিরাপদ হবার সুযোগ পাবে না? আপনি তো হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন, দার্শনিক বিচারের চেষ্টা আর করবেন না; আর এই বিচার-বিতৃষ্ণার সুযোগে আপনার মনে আপনার পারিপার্শ্বিকে প্রচলিত জীবনদর্শনটি নিরুপদ্রবে বাসা বাঁধতে পারবে।

রাজনীতি সম্বন্ধে ফ্রয়েডপন্থীদের যে ভঙ্গি তার বাস্তব পরিণতিও এই রকমই নয় কি?

কিন্তু শুধু ওইটুকুই নয়। শুধু যে ওই রকম খিড়কী দোর দিয়ে বর্তমান শাসন-ব্যবস্থার সমর্থনকে গোপনে আমন্ত্রণ জানানো তাই নয়। বাস্তবভাবে দেখলে দেখা যায় যতোই দিন যাচ্ছে ততোই ফ্রয়েডপন্থীরা সোজাসুজিভাবে, স্পষ্টাস্পষ্টিভাবে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করছেন।

ফ্রয়েডীয় মতবাদের মূল কথাগুলি আলোচনা করলে দেখতে পাবো কেমন ভাবে তার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির প্রচ্ছন্ন সমর্থন বর্তমান। কিন্তু সে আলোচনা পরে তোলা যাবে। আপাতত দেখা যাক ফ্রয়েড এবং ফ্রয়েড-পন্থীদের স্পষ্ট এবং সোজাসুজি রাজনৈতিক উক্তিগুলির কথা। এই উক্তিগুলি মোটেই রাজনীতি-নিরপেক্ষতার পরিচয় নয়। তার বদলে, স্পষ্টাক্ষরে পুঁজিবাদী রাজনীতির সমর্থন মাত্র, কিংবা, যা একই কথা, মেহনতকারী জনগণের সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির বিরুদ্ধ-প্রচার মাত্র।

অবশ্যই মনে রাখতে হবে, বাস্তব পৃথিবীতে দিনের পর দিন পুঁজিবাদের

পরমায়ু নিঃশেষ হয়ে আসছে। তার মানে, উলটো দিক থেকে বললে বলা যায়, দিনের পর দিন সমাজতন্ত্রের শক্তি হয়ে উঠছে দুর্বার, সুনিশ্চিত। বছর বিশেক আগেকার পৃথিবীর অবস্থার সঙ্গে আজকের পৃথিবীর অবস্থাটা তুলনা করুন, এই বাস্তব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। আর তাই, পুঁজিবাদের গতিপথ যতোই কবরখানার কাছাকাছি পৌঁছুচ্ছে ততোই পুঁজিবাদের যাঁরা প্রচারক তাঁদের অবস্থা হয়ে উঠছে বেপরোয়া, মরিয়া।[1] ফলে, তারই অপর পিঠে, সমাজতন্ত্রের সমালোচনাটা পরিণত হচ্ছে নোংরা খিস্তি-খেউড়ে।

প্রায় বিশ বছর আগে স্বয়ং ফ্রয়েড সমাজতন্ত্র এবং মার্কসবাদের যে সমালোচনা করেছেন তার সঙ্গে আজকের দিনের 'আন্তর্জাতিক সাইকোএ্যানালিটিক্যাল সোসাইটির' সভাপতি আর্নস্ট্ জোন্স্-এর উক্তির তুলনা করুন।

প্রায় বিশ বছর আগে (১৯৩২-এ) 'জীবনের দর্শন' শীর্ষক প্রবন্ধ লেখবার সময় ফ্রয়েড বলছেন, তাঁর—অর্থাৎ মনঃসমীক্ষণ বা সাইকোএ্যানালিসিসের—দার্শনিক মত weltanschnung) আর কিছুই নয় বৈজ্ঞানিক বিশ্বালোচনের নামান্তর মাত্র। এই বিশ্বালোচনের সমর্থন করতে গেলে বিপরীত-বিশ্বালোচনের দাবি—অর্থাৎ, বিজ্ঞান-বিরোধী বিশ্বালোচনের দাবি—খণ্ডন করা দরকার। এবং আধুনিক যুগে প্রচলিত বিজ্ঞান-বিরোধী বিশ্বালোচনের দাবি বলতে ফ্রয়েড প্রধানত দুটি দাবির আলোচনা তুলেছেন। এক হল 'থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি'র দাবি, যা-কিনা ফ্রয়েডের মতে বিজ্ঞানের ঘরে জন্মেও বিজ্ঞানকে ধ্বংস করবার কাজে এক-রকম কালাপাহাড়ী উৎসাহে মেতে উঠেছে, প্রচার করতে শুরু করেছে বাস্তব বিশ্ব সম্বন্ধে সুনিশ্চিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্ভব নয়। রাজনীতিতে নৈরাজ্যবাদের মতোই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই থিয়োরী অফ রিলেটিভিটির অনাচার। এবং বিজ্ঞান-বিরোধী দ্বিতীয় দার্শনিক মতবাদ (বিশ্বালোচন : weltanschanung) হিসেবে তিনি উল্লেখ করছেন মার্কসবাদের। অবশ্যই বিনয়ের অভাব নেই। তিনি বলছেন, "এ-বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত জ্ঞানের যে-অভাব সে সম্বন্ধে আমি গভীরভাবে দুঃখিত।" এবং এক আধা-অভিনন্দনের ভঙ্গিতেই স্বীকার করছেন, "মার্কসবাদের আসল যেটা জোর সেটা অবশ্যই তার ইতিহাস সম্বন্ধে মতবাদ নয়; কিংবা এই মতবাদের ভিত্তিতে মার্কসবাদ যে ভবিষ্যদ্বাণী করে তাতেও নয়; আসলে সেই জোরটা হল মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমনভাবে তার বুদ্ধিগত, নীতিগত এবং শিল্প-

গত প্রতিক্রিয়াগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে সে-বিষয়ে স্পষ্ট ধারণায় অন্তর্দৃষ্টি। মার্কসবাদ আবিষ্কার করলো পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং কার্যকারণ সম্বন্ধের এমন একটি গুচ্ছ যাকে ইতিপূর্বে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই অগ্রাহ্য করা হয়েছে।" (স্বাধীন তর্জমা, আক্ষরিক নয়)। কিন্তু, ফ্রয়েড বলছেন, মার্কস-এর কয়েকটি বক্তব্য আমার কাছে অদ্ভুত মনে হয়, মনে হয় এগুলি বস্তুবাদী তো নয়ই, বরং কূট হেগেল-দর্শনের অবশেষ মাত্র। যেমন সামাজিক গড়নের বিবর্তন প্রাকৃতিক ইতিহাসেরই পরিণাম-মাত্র, কিংবা সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধারা ডায়ালেকটিক পদ্ধতি মেনে চলে। তা' ছাড়া, মার্কসবাদে শ্রেণীসংগ্রামের যে-কথা তাও ভ্রান্ত। কেননা, ফ্রয়েডের মতে, ইতিহাসের শুরু থেকেই বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত থেকেই সামাজিক শ্রেণীর জন্ম হয়েছে এবং এই সংঘাতে যে গোষ্ঠী বিজয়ী হয়েছিল তার সম্পদ ছিলো দুরকম। এক হল মানসিক সম্পদ: যেমন জন্মগত আক্রমণ-বৃত্তি। আর দুই, পার্থিব সম্পদ: যেমন ভালো অস্ত্রশস্ত্র! তাছাড়া, মার্কসবাদের বিরুদ্ধে ফ্রয়েডের মূল আপত্তি হল: অর্থনৈতিক নিয়মণের উপর জোর দিতে গিয়ে মার্কসবাদ অন্যান্য বিষয়ের কথা ভুলে যায়, ভুলে যায় মনস্তত্ত্বের কথা, ঐতিহ্যের কথা। ইত্যাদি।

মার্কসবাদের বাস্তব প্রয়োগ রুশ বলশেভিজম্-এ। ফ্রয়েড তাই বলশেভিজম্-এর আলোচনাও তুলেছেন। ফ্রয়েড বলছেন, বলশেভিজম্-এর উৎসে বিজ্ঞানের প্রেরণা, কিন্তু তার বাস্তব পরিণতি হল বিজ্ঞানবিরোধে, ধর্মমোহে। ধর্মমোহের লক্ষণটা কী? এক হল, স্বাধীন চিন্তার বিরুদ্ধে কড়া রকম হুকুমজারি: ইসলাম ধর্মের কাছে কোরান যে রকম, বলশেভিকদের কাছে সেই রকমই মার্কসীয় গ্রন্থ। দুই হল দীনদরিদ্রের কাছে সোনালী ভবিষ্যতের আশ্বাস। ধর্মের মতোই বলশেভিজম্ বলে, জনগণের উপস্থিত (অর্থাৎ পূর্ণ সাম্যব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার আগে পর্যন্ত) যতো অভাব, যতো দুঃখকষ্ট, তা দুদিন পরে শেষ হবে: ইহকালের মতো পরকালে আর অপূর্ণ বাসনার তাড়না থাকবে না। তর্ক তুলে বলশেভিকরা হয়ত বলবেন, আমরা তো আর ইহলোক-পরলোকের তফাত করি নে, আমরা বলি ইহলোকেই, এই পৃথিবীতেই, জনগণের সুদিন আসন্ন হয়েছে। উত্তরে ফ্রয়েড বলছেন, এহেন কথাও নতুন কথা নয়। মনে রাখতে হবে ইহুদীদের ধর্মে পরকালের যে সোনালী ছবি তাও কোনো পরলোকের কথা নয়, ইহলোকেই, এই পৃথিবীর বুকেই। অবশ্যই ফ্রয়েড বিনয় করে বলছেন, বলশেভিজম্-এর

সব কথা তাঁর ভালো করে জানা নেই, এবং এই তথ্যাভাবের জন্যে তিনি বিশেষ দুঃখিত।

সমাজতন্ত্রের মতবাদ এবং বাস্তব প্রয়োগ—থিয়োরী এবং প্রাকটিস্—সম্বন্ধে এই হল স্বয়ং ক্রয়েডের সমালোচনা! নজর করলে দেখা যায় এ-সমালোচনায় নতুন কথা একটিও নেই! বুর্জোয়া মহলের পণ্ডিতেরা মার্কসবাদের মধ্যে কূট হেগেল-দর্শনের ভগ্নাবশেষ থেকে শুরু করে সোভিএট সমাজে নব্য ধর্মমোহের অভ্যুত্থান পর্যন্ত প্রত্যেকটি কথাই বহুবার বলেছেন। এবং এই সব সমালোচনার অন্তঃসারশূন্যতা বহুবারই দেখানো হয়েছে। সাম্প্রতিক সমাজতন্ত্রবাদী গ্রন্থাবলীর সঙ্গে যাঁর কিছুটাও পরিচয় আছে তাঁর কাছে এইসব সমালোচনার প্রত্যুত্তর পুনরুক্তি-মাত্র হবে। আপাতত আমি সে-চেষ্টা করবো না। তার বদলে, ক্রয়েডীয় সমালোচনার একটি বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর দিতে বলবো।

কী রকম একটা উদার, দরাজ আর বিনয়ী ভাব দেখুন: মার্কসবাদ তো সব একেবারে মিছে কথা নয়, এর-মধ্যে কিছু কিছু সত্যি কথাও তো আছে। অবশ্যই, যে-সব কথায় বুর্জোয়া-শ্রেণীর আশু সর্বনাশ-সম্ভাবনা সেগুলির প্রতি একটুও দরাজ ভাব নয়; শ্রেণী সংগ্রামটা ভুল কথা, ইতিহাসের বিচারটা ভুল কথা; আগামীকাল ইতিহাস কোন রূপ নেবে তার হিসেবটাও ভুল কথা। মেজাজ যতোই উদার আর দরাজ হোক না কেন, বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে এই কথাগুলোর সংঘর্ষ যে বড় প্রকট। তাই মার্কসবাদের আপাত-নিরীহ কিছু দাবিকে সত্যের সম্মান দেওয়া যায়: মূল কথাগুলিকে মিথ্যা বলে বিষদাঁতটা ভেঙে দেওয়া গেলো, তারপর ওই ভদ্দরলোক সাপটাকে কিছুটা দুধকলা খাইয়ে উদার মনোভাবের পরিচয় দেওয়া গেলো।

স্বয়ং ক্রয়েডের রচনায় এই উদার দরাজ ভাবটার দিকে বিশেষ করে নজর রাখতে বলছি তার কারণ পুঁজিবাদের তরফের পণ্ডিতদের পক্ষে বিশ বছর আগে এমনতরো একটা ভঙ্গির অবকাশ তবু ছিলো। আজকের দিনে আর তা নেই। কেননা, প্রথম মহাযুদ্ধের পরেও বুর্জোয়াদের পক্ষে টিকে যাবার যেটুকু ক্ষীণ সম্ভবনা ছিলো আজ আর তা নেই। অপর পক্ষে, বুর্জোয়াদের চোখে সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ তখন পর্যন্ত অল্পবিস্তর অনিশ্চিত ছিলো; কিন্তু যতোই দিন যাচ্ছে ইতিহাস ততোই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর ভাবে প্রমাণ করছে এই অনিশ্চয়তার উপর নির্ভর করতে যাওয়াটা অলীক আত্মপ্রবঞ্চনাকে আঁকড়ে

ধরবার চেষ্টা মাত্র। আজকের দিনে বুর্জোয়া তরফের প্রচারে তাই অমন উদার, দরাজ আর বিনয়ী ভাবের বদলে বেপরোয়া আর মরিয়ার ভাব।

বিশ বছর আগের মতোই,—স্বয়ং ফ্রয়েডের মতোই, আজকের দিনের ফ্রয়েডপন্থীরাও বুর্জোয়া রাজনীতিকে আঁকড়ে ধরতে চান। কিংবা যা একই কথা, সমাজতন্ত্রর বিরুদ্ধ-প্রচারে যোগ দিতে চান। কিন্তু সেকালের ছকে বাঁধা আপাত মোলায়েম বুর্জোয়া-সমালোচনাগুলির পুনরুক্তি করার মতো মনের সম্পদটুকু ফুরিয়ে গিয়েছে। তাই সোজাসুজি গালাগালির পথ। প্রায় খিস্তি-খেউড়ের পথ। সেকালের মতো আপাত-নিরপেক্ষতার ভঙ্গি কিসের সাহসে পাওয়া যাবে? তাই সোভিএটের মানুষদের নেহাত পাগল-ছাগল প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা, সমাজতন্ত্রের নেতাদের মনে কোন্ মনোবিকারের তাড়না তারই কল্পিত বর্ণনা দেবার চেষ্টা, এবং সমাজতন্ত্রর প্রভাব থেকে পৃথিবীকে (অর্থাৎ বুর্জোয়াকে) বাঁচাতে গেলে কোন ধরনের কায়দা-কানুন অনুসরণ করতে হবে তাই নিয়ে মাথা ঘামানো।

কয়েকটা নমুনা তোলা যাক।

বর্তমানকালে, ফ্রয়েডপন্থীদের মহাগুরু হলেন আর্নস্ট জোন্স্। সম্প্রতি "আন্তর্জাতিক মানসিক স্বাস্থ্য সম্মেলনে" বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন রুশ জনসাধারণের মনে এমন যে উৎকণ্ঠার জের (অর্থাৎ কিনা, আজকের পৃথিবীতে তারা যে এতো উৎপাত শুরু করেছে) তার কারণ হল ওদের মনে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে এক পাপবোধের উৎপাত। পাপবোধটা এলো কোথা থেকে? কিসের পাপ? জোন্স্ বলছেন, পিতৃহত্যার মহাপাপ। ওরা ওদের ছোট্ট পিতা জারকে খুন করেছে যে।

বলাই বাহুল্য, আপাত-বৈজ্ঞানিক শব্দ-সম্ভার সত্ত্বেও এ-জাতীয় উক্তির বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব নেহাতই শূন্য। এমন কি পাল্টা প্রশ্ন করে এ-কথা তোলাও পণ্ডশ্রম যে চার্লসকে হত্যা করার ফলে ইংরেজ জনসাধারণের মনে পাপবোধ আর উৎকণ্ঠার তাড়না দেখা দেয় নি কেন, কেন দেখা দেয় নি ওই পাপবোধ আর উৎকণ্ঠা ফরাসীদের মনে। তারাও তো বিপ্লবের সময় তাদের "ছোট্ট পিতা"-কে খুন করতে কসুর করে নি। মুসোলিনীকে হত্যা করবার দরুন ইতালির জনগণও কি ওই ফ্রয়েডীয় পাপবোধের বোঝায় পাগল হয়ে যাবে? পাগল হয়ে যাবে কি চীনের জনগণ চিয়াঙ-কাই-শেক-কে দেশ থেকে দূর করে দিয়ে? এ-সব প্রশ্ন তোলা সত্যিই পণ্ডশ্রম। কেননা জোন্স্-এর উক্তি

বিজ্ঞানের ধারকাছ ঘেঁসে না, ইতিহাস বা সমাজতত্ত্ব নিয়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার পরিচায়কও নয়—খোলাখুলি রাজনৈতিক অপপ্রচার মাত্র, কেবল আপাত-বৈজ্ঞানিক কিছুটা রঙ চড়িয়ে চটকদার করবার চেষ্টা। আর, রাজনৈতিক প্রচার হিসেব কতোখানি খেলো কী রকম সস্তা! ওর মধ্যে দুটো মোদ্দা কথা। প্রথমত, রুশ বিপ্লব পিতৃহত্যার মতোই মহাপাতক। আর এই হল, সোভিএটের মানুষগুলো নেহাতই যেন পাগল-ছাগল; তারা যে আজ দুনিয়ার মেহনতকারী মানুষকে অত্যাচারের বিরুদ্ধে, যুদ্ধ-চক্রান্তের বিরুদ্ধে আগুয়ান হবার নেতৃত্ব দিচ্ছে তার আসল কারণ তাদের মনের কোনায় মনোবিকারের তাড়না।

নিজের প্রিয়তম শিষ্যকে এমন খোলাখুলিভাবে একটা বিশেষ রাজনীতি নিয়ে কোমর বাঁধতে দেখলে স্বয়ং ফ্রয়েড হয়ত লজ্জিতই হতেন; তার কারণ এই নয় যে ফ্রয়েড নিজে এই রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করেন নি। তার কারণ হল এই যে ফ্রয়েডের সময় দিনকাল এমন 'খারাপ' হয়ে পড়ে নি। তখনও পর্যন্ত একটা উদার, দরাজ ভাব, একটা মোলায়েম আপাত-নিরপেক্ষ মুখোস পরা সম্ভব হতো, ওই নির্দিষ্ট রাজনীতির প্রচারক হওয়া সত্বেও সম্ভব হত। আজকের দিনে তা আর চলছে না। কেননা, এ-কথায় কোনো সন্দেহ নেই যে জোন্স-ই আজকের দিনে সবচেয়ে প্রবীণ এবং সবচেয়ে সৌম্য-শান্ত ফ্রয়েডপন্থী। তাঁরই এই দশা।

তাঁরই যখন এই দশা তখন ছোটখাটো ফ্রয়েডপন্থীদের রাজনৈতিক তাণ্ডব যে অনেক বেশী বীভৎস হয়ে দাঁড়াবে তাতে আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়? এই তাণ্ডবের লীলাভূমি আজ মার্কিন মুলুকে। ফ্রয়েডপন্থীদের পক্ষে এতো পত্রিকা প্রকাশ করবার এতো বই লেখবার ধুম আর কোথাও নেই। সেই সব পত্রিকার পাতাগুলি উলটে যান, উল্টে দেখুন বইগুলির আলোচ্য বিষয়। দেখবেন, কোনো অজ্ঞাতকুলশীল ফ্রয়েডপন্থী হয়ত মলটভ-এর মানসিক রোগটা নির্ণয় করবার চেষ্টা করছেন, কেউ বা স্টালিনের। পৃথিবীর বুক থেকে সাম্যবাদের উপদ্রব কেমন করে দূর করা যায় তার আলোচনা কম নয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ যুদ্ধ না বাধিয়ে টিকতে পারে না, তাই ফ্রয়েডপন্থীদের লেখায় যুদ্ধবাদের প্রচার। মনে রাখতে হবে, সাম্প্রতিক ফ্রয়েডবাদের আজ প্রথম ও মূল আলোচ্য বিষয় হল মানবমনের জিঘাংসা। এই জিঘাংসাই নাকি মানবমনের সবচেয়ে প্রাথমিক সহজপ্রবৃত্তি।

তর্ক তুলে কেউ হয়ত বলবেন, যদিই বা মেনে নেওয়া যায় আজকের দিনে মার্কিন মুলুকে রাজনৈতিক উৎসাহে ফ্রয়েডবাদের ব্যবহারটা খুব বেড়েছে তাহলেই তো সেটা ফ্রয়েডবাদের কোনো নিজস্ব দোষ হবে না। যুদ্ধবাদীরা আণবিক বিজ্ঞানকে যুদ্ধের কাজে নিয়োগ করতে চাইছেন, কিন্তু অপরাধটা কি আণবিক বিজ্ঞানের? পূর্বপক্ষ হয়ত বলবেন, ফ্রয়েডবাদ একটা বৈজ্ঞানিক মতবাদ মাত্র; সেটা ভুল হতে পারে, ভুল না হতেও পারে। কিন্তু তার প্রয়োগ-অপপ্রয়োগের কথাটা একেবারেই স্বতন্ত্র। সে-কথা তুলে এই মতবাদকে সমালোচনা করতে যাওয়া বৈজ্ঞানিক মেজাজের পরিচয় নয়।

উত্তরে বলবো, এ-তুলনাটা ঠিক হল না। কেননা ফ্রয়েডবাদের নিজস্ব ধর্মই এমন যে ওই নির্দিষ্ট রাজনীতির সঙ্গে তার নাড়ির যোগ। এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা, এমন সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছানো যে এই নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবহারের জন্যে তৈরি জমি যেন। তার মানে ফ্রয়েডবাদ এবং ফ্রয়েডবাদের রাজনৈতিক প্রয়োগকে আলাদা করা যায় না, যেমন হয়ত আণবিক বিজ্ঞানের বেলায় যেতে পারে। কিন্তু এই কথা স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করবার জন্যে ফ্রয়েডবাদের মূলসূত্রগুলির আলোচনা তোলা দরকার। তাই আপাতত তা সম্ভব নয়।

আপাতত যে-আলোচনা হচ্ছিলো, রাজনৈতিক উৎসাহের বিরুদ্ধে ফ্রয়েডীয় যুক্তি নিয়ে আলোচনা। উত্তরে স্বপক্ষ দোষের কথা তুলেছি: ফ্রয়েডবাদের নিজস্ব রাজনৈতিক উৎসাহ। এই উৎসাহের প্রকাশ দুদিক থেকেই। ব্যঞ্জনার দিক থেকে এবং সোজাসুজি রাজনৈতিক পক্ষপাতের দিক থেকে। কেবল, রাজনীতিটা একটা নির্দিষ্ট রাজনীতি, বুর্জোয়া-রাজনীতি এই যা বৈশিষ্ট্য।

আমাদের চলতি কথায় বলে: পাঁচ কড়ায় গণ্ডা গুনছিস কেন? না, আমি যে জাকা। তিন কড়ায় গোন না! না, আমার যে কম হবে।

[ক্রমশ

রামমোহন

[পূর্বানুবৃত্তি]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

তৃতীয় অঙ্ক

—চার—

[রাধাকান্ত দেবের বৈঠকখানা। ১৮২৮ সাল।

প্রকাণ্ড হলঘরে চালাও ফরাস। ঝাড়, দেওয়ালগিরি। বিস্তৃত বহুমূল্য ফ্রেমে বিলিতী ছবি। ফরাসের ওপর একটি পরিপুষ্ট তাকিয়ায় বুক পেতে রাধাকান্ত দেব একখানা বই পড়ছেন। মুখে আলবোলার সুদীর্ঘ নল। পড়তে পড়তে ভ্রূকুটি করলেন রাধাকান্ত। মুখ থেকে নল নামালেন, একটা পেন্সিল তুলে নিয়ে দাগাতে লাগলেন বইয়ের পাতায়।

তারিণীচরণ মিত্র ঢুকলেন। পায়ের শব্দে ফিরে চাইলেন রাধাকান্ত।]

রাধাকান্ত। এসো তারিণীদা—বোসো।

(তারিণী বসলেন)

তারিণী॥ কী পড়ছিলে ওটা?

রাধাকান্ত॥ (সোজা হয়ে উঠে বসলেন—মৃদু হেসে এগিয়ে দিলেন বইটা) দেখো।

তারিণী॥ (বইটা তুলে নিয়ে) ও। 'প্রবর্তক-নিবর্তক সংবাদের দ্বিতীয় প্রস্তাব!' এতো পুরোনো বই!

রাধাকান্ত॥ বই পুরোনো হলেও যুক্তিগুলো এখনো সমান ধারালো। তা ছাড়া আশ্চর্য আন্তরিকতা লোকটার। শুধু তর্কের জন্যে তর্ক তোলেনি রামমোহন, হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছে। যুক্তির সঙ্গে ইমোশনের চমৎকার যোগাযোগ ঘটিয়েছে।

তারিণী॥ কিন্তু হৃদয় নিয়ে কারবার করা তো ধর্মের কাজ নয়। কঠোর তার নীতি, অলংঘ্য তার শাসন।

রাধাকান্ত॥ বিপদ তো সেইখানেই। কি জানো তারিণীদা, মাঝে মাঝে

বড় ভয় করে আমায়। পৃথিবী বদলে যাচ্ছে—হয়তো হৃদয়ের দাবি ধর্মকে একদিন পেছনে ফেলেই এগিয়ে যাবে। রামমোহনের মতো এমন সর্বনাশা প্রতিভা আরো গোটাকতক জন্মালে কী যে হবে কল্পনাও করা যায় না। একা রামমোহনের তোড়েই আমরা হিমসিম খাচ্ছি—এর পরে বান ডাকলে তাকে রোধ করবে কে? শোনো না একবার (পড়তে লাগলেন) "বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্ধ অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন; যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে, অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে কি বর্ষাতে স্থানমার্জন, ভোজনাদি পাত্র মার্জন, গৃহলেপনাদি তাবৎ কর্ম করিয়া থাকে; এবং সুপকারের কর্ম বিনা বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে।... ঐ রন্ধনে ও পরিবেষণে যদি কোনো অংশে ত্রুটি হয়, তবে তাহাদের স্বামী দেবর প্রভৃতি কি কি তিরস্কার না করেন; এ সকলকেও স্ত্রীলোকেরা ধর্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে, আর সকলের ভোজন হইলে ব্যঞ্জনাদি উদরপূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে—"

তারিণী॥ (বাধা দিলেন) থাক—থাক। এসব কথা শুধু ইংরিজী শেখার ফল। এদেশের মেয়েরা চিরদিন স্বামী-সংসারের সেবা করেই সুখী হয়েছে—নিজেদের তারা বড় করে দেখেনি। ম্লেচ্ছের চোখ দিয়ে দেখলে আদর্শের অমনিই একটা অপব্যাখ্যা হবে বটে।

রাধাকান্ত॥ কিন্তু চিরন্তন আদর্শ আর জীবনের মধ্যে কোথায় যেন একটা বিরোধ ঘনিয়ে আসছে তারিণীদা। দেখা দিচ্ছে ঝড়ের সংকেত। রামমোহন হয়তো তারি অগ্রদূত!

(তারাচাঁদ দত্ত, মতিলাল শীল এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবেশ করলেন।)

আসুন আসুন দত্ত মশাই, এসো মতিলাল। আরে—আবার দুর্ধর্ষ সম্পাদক ভবানীচরণ বাঁড়ুয্যেকেও দেখছি যে। বসুন, বসুন সব—

(সকলে বসলেন)

ব্যাপার কী? একেবারে সদলবলে?

তারাচাঁদ॥ এখনো চুপ করে বসে আছো রাধাকান্ত? একটা উপায় করো! সব যে যায়।

রাধাকান্ত॥ এত উত্তেজনা কেন দত্ত মশাই? কী যায়?

তারাচাঁদ॥ ধর্ম।

রাধাকান্ত ॥ রাতারাতি ধর্ম যাবে কোথায় ? (হাসলেন) যেতে দিচ্ছেই বা কে ? কিন্তু হল কী ?

মতিলাল ॥ নতুন করে আর কী হবে ? ওদিকে রামমোহন যে সতীদাহ বন্ধ করবার জন্যে তোড়জোড় করছে !

রাধাকান্ত ॥ তোড়জোড় শুধু বলছ কেন ? বন্ধ করে ফেলেছে ধরে নিতে পারো। এই তো ওর 'প্রবর্তক-নিবর্তক' পড়ছিলাম নতুন করে। সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করে যুক্তিগুলো যা দিয়েছে প্রায় অকাট্য।

ভবানীচরণ ॥ (উত্তেজিতভাবে) যুক্তি দেওয়াটা শক্ত নয় রাধাকান্ত বাবু। তাতে ফাঁকির অভাব নেই। শাস্ত্রকে ইচ্ছেমতো ব্যাখ্যা যে কেউ করতে পারে। চার্বাকও এক সময়ে সব নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। কণাদের দর্শনও নাস্তিক্যবাদ প্রচার করেছে—কিন্তু হিন্দুধর্ম তাতে মিথ্যে হয়ে যায়নি। তাই প্রতিজ্ঞা নিয়ে 'সমাচারচন্দ্রিকায়' কলম ধরেছি আমি। দেখা যাক, সনাতন ধর্মের জয় হয়, না সতীদাহ বিরোধ আইন পাশ হয়ে যায়।

রাধাকান্ত ॥ রামমোহনের কলমও কম জোরালো নয়। আমার সন্দেহ হয়, ওতেই হয়তো অর্ধেক বাজী জিতে নেবে।

ভবানীচরণ ॥ রামমোহনের লেখা ! ও আবার গদ্য নাকি ! ছ্যা—ছ্যা ! দশ বছর মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সাকরেদি করলে তবে যদি লিখতে শেখে।

রাধাকান্ত ॥ মৃত্যুঞ্জয়ের লেখা সম্বন্ধে আমার কোনো বক্তব্য নেই। একটা নিখুঁত পণ্ডিতী গদ্য, আর একটা প্রাণের ভাষা। মুশ্‌কিলটা কোথায় জানো ভবানীচরণ ? পণ্ডিতী লেখা পড়ে লোকে হাততালি দেয়, কিন্তু প্রাণের ডাক শুনলে তখনি সাড়া দিয়ে ওঠে।

মতিলাল ॥ (অধৈর্যভাবে) গদ্যতত্ত্ব এখন থাকুক। ব্যাপারটা যে অত্যন্ত জরুরি। অবিলম্বে কাজে না নামলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

তারিণী ॥ আরে, শর্ষের মধ্যেই যে ভূতে বাসা করেছে। লড়াইটা যে এখন ঘরের মধ্যেই এসে পৌঁছেছে। এই তো আমাদের তারাচাঁদ দত্ত মশাই —ম্লেচ্ছ রামমোহনকে বিষবৎ পরিত্যাজ্য মনে করেন—আবার ওঁরই ছেলে হরিহর দিনরাত গিয়ে রামমোহনের ব্রহ্মসভায় বসে আছে।

তারাচাঁদ ॥ (ক্রুদ্ধ হয়ে) হতভাগা—নচ্ছার। ওকে ত্যাজ্যপুত্র করব

আমি—বাড়ি থেকে বের করে দেব। চাবকে তুলে দেব পিঠের চামড়া।

ভবানীচরণ। কাগজে আমরা লিখছি, আরো লিখব। তোলপাড় করে তুলব চারদিক।

রাধাকান্ত। কাগজের লড়াইতে যে ঠিক পেরে ওঠা যাবে না, সে তো বারে বারেই প্রমাণ হয়ে গেছে। বড় বড় সব দিক্‌পাল পণ্ডিত থেকে ফ্রেণ্ড্ অব ইণ্ডিয়ার অমন ঝুঁদে মার্শম্যান-টাইটলার সাহেব সব একেবারে ঠাণ্ডা। আর মুখও তেমনি। প্রকাণ্ড বিচারসভায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর কী অবস্থা করে ছাড়ল, দেখলেন তো? যাই বলুন—লোকটা অসাধারণ পণ্ডিত।

তারিণী। ওই পাণ্ডিত্যই কাল হয়েছে দেখছি।

রাধাকান্ত। তা যা বলেছ তারিণীদা। লড়াইটা একেবারে 'আন্‌ইকুয়্যাল ম্যাচ্'। ও যদি জ্ঞানের সমুদ্র হয়, আমরা প্রায় খানা-ডোবার সামিল। পৃথিবীতে এমন কোনো শাস্ত্র নেই, যা ওর পড়া নেই। ভাষাই তো শিখেছে কম্‌সে কম সাত আটটা।

মতিলাল। আপনি যদি এভাবে রামমোহনকে সমর্থন করেন, তা হলে আমরা জোর পাই কোত্থেকে বলুন তো?

রাধাকান্ত। ভুল বুঝছ কেন—সমর্থন আমি করছি না। যুদ্ধ করতে গেলে শত্রুর শক্তির পরিমাপটা জেনে নেওয়াই তো বুদ্ধিমানের কাজ। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে কর্মশক্তিও দেখো একবার। কী করল, কী না করল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, জুরির বিচার, Western Education—কী নয়? আত্মীয় সভা করল, অ্যাডামের সঙ্গে ইউনিট্যারিয়ান কমিটি করে গোঁড়া ক্রীশ্চানদের সঙ্গে লড়াই চালালো। তারপরে আবার এই ব্রহ্মসভার পত্তন। দিনের পর দিন শক্তি বাড়ছে লোকটার—ওদিকে আবার সতীদাহ নিয়ে খোদ বেণ্টিঙ্ককে গিয়ে পাকড়েছে।

ভবানী। বেণ্টিঙ্ক সম্বন্ধে যা শুনেছি সে কিন্তু সুবিধের নয়। ভারতবর্ষের সংস্কার করবার নাকি মতলব আছে তলে তলে।

তারাচাঁদ। (মুখভঙ্গি করে) মা-র চেয়ে মাসীর দরদ। আমাদের ধর্ম নিয়ে আমরা আছি—তোমাদের নাক গলানো কেন বাপু। লাট আছো, লাট হয়েই থাকো। ভাটপাড়ার পণ্ডিত সাজতে যাও কেন?

মতিলাল ॥ কিন্তু রামমোহন আবার ওই বেণ্টিঙ্ককে দিয়ে সতী বিলটা পাশ করিয়ে না নেয়।

রাধাকান্ত ॥ অসম্ভব নয়। আমার সেইরকম সন্দেহই হচ্ছে।

ভবানী। কিছুতেই নয়। একেবারে তোলপাড় করে ফেলব চারদিক।

তারাচাঁদ ॥ শুধু লিখে না হয়, অন্য ব্যবস্থা দেখতে হবে। ব্রাহ্ম সমাজ! ওই সমাজই হয়েছে বিষের জড়। 'একমেবাদ্বিতীয়মের' উপাসনা হচ্ছে ওখানে বসে। আবার মুখ বলে, 'আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ সম্প্রদায়—এখানে সকলের ঠাঁই আছে।' বুলি শুনলে ব্রহ্মতালু অবধি জ্বলে যায়। শোনো রাধাকান্ত, ওসব লেখালেখির কাজ নয়। মূর্খের জন্যে লাঠ্যৌষধিই প্রশস্ত।

(জয়কৃষ্ণ সিংহ ঢুকলেন)

রাধাকান্ত ॥ এই যে—মেঘ না চাইতেই জল! জয়কৃষ্ণ সিংহ এসে পড়েছেন।

মতিলাল ॥ ওঁর তো আবার ব্রাহ্ম-সমাজে গিয়ে চোখ বুজে বসা অভ্যেস আছে। কী মশাই, পরম ব্রহ্মের সন্ধানে কতদূর এগোলেন?

জয়কৃষ্ণ ॥ (বলতে বলতে) পরম ব্রহ্ম—হাঃ-হাঃ-হাঃ। (অট্টহাসি করলেন) বা বলেছেন! বড় ভালো ওদের ভড়ং। সেই রাম বিদ্যেবাগীশটা আছে না? সে হল আচার্য—ব্যাখ্যা করে। বাওজী বলে খোট্টাটা পড়ে উপনিষদ। একটা মুসলমানকেও জুটিয়েছে—তার কাজ হল পাখোয়াজ বাজানো। বিষ্টু চক্কোত্তি চোখ বুজে রামমোহনের ব্রহ্ম সঙ্গীত গায়। সে কি গান। প্রায় নিধুবাবুর টপ্পার সামিল। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

রাধাকান্ত ॥ খুব জমেছে তা হলে?

জয়কৃষ্ণ। সে আর বলতে! রগড় কত। তারাচাঁদ চক্কোত্তি, চন্দ্রশেখর দেব, দ্বারকা ঠাকুর, কালী মুন্সী, ভৈরব দত্ত, মথুর মল্লিক—নিরাকারের প্রেমে কেঁদে একেবারে গড়াগড়ি। ওদিকে গান হচ্ছে: 'নিত্য নিরঞ্জন, নিখিল কারণ, বিভু বিশ্বনিকেতন—' এদিকে সমানে মদ্যপান আর গো-মাংস ভক্ষণ চলছে।

মতিলাল ॥
তারিণীচরণ ॥ } ছিঃ—ছিঃ।

তারাচাঁদ ॥ উঃ—কী পাষণ্ড। এখুনি ওদের নিপাত করা কর্তব্য। ধর্ম কি রসাতলে গেছে? কল্কি-অবতার কি এখনো ঘুমিয়ে?

রাধাকান্ত ॥ (অস্বস্তিভরে) দেখুন জয়কৃষ্ণ বাবু, ব্রহ্মসভার নিন্দে আমরা অন্তভাবে যা খুশি করতে পারি। কিন্তু বেশি নিচে গেলে নিজেদেরই কি ছোট করা হয় না?

জয়কৃষ্ণ ॥ (বিস্মিত) মানে?

রাধাকান্ত ॥ গো-মাংস ভক্ষণের কথাটা সর্বৈব মিথ্যে এ আমরা সবাই জানি। আর ব্রহ্মসভায় মদ্যপান চলে—একথা পাগলেও বিশ্বাস করবে না।

তারিণী ॥ তাহলে তুমি বলতে চাও রামমোহন মদ খান না?

রাধাকান্ত ॥ তা বলব কেন? মদ খাওয়ার উপকারিতা তিনি নিজেই প্রচার করেছেন তাঁর 'কায়স্থের সঙ্গে বিচারে'। ওটা তাঁর মতে স্বাস্থ্যরক্ষার অঙ্গ। আর ব্যক্তিগতভাবে আমাদের অনেকেরই যে ও কাজটা প্রচুর পরিমাণেই চলে, তাও কি অস্বীকার করা যায়? ব্রহ্মসভার সঙ্গে আমাদের মত মেলে না তা ঠিক। কিন্তু ওখানে গো-মাংস আর মদের আড্ডা বসেছে—এ সব মিথ্যে নোংরামির চাক পিটিয়ে লাভ কী?

ভবানী ॥ আপনার একটা অন্যায় পক্ষপাত আছে ওদের ওপর।

রাধাকান্ত ॥ পক্ষপাতের কথা হচ্ছে না ভবানীচরণ। শত্রু যেই হোক, তাকে কাপুরুষের মতে মিথ্যে অপবাদ দেওয়া আমি সমর্থন করি না।

(চাকর করসীর তামাক বদলে দিয়ে গেল। নলটা মুখে তুলে নিয়ে খানিক ধোঁয়া ছাড়লেন রাধাকান্ত]

রামমোহন হিন্দুধর্মের বিপক্ষে যাচ্ছেন। দাঁড়াতেই হবে তাঁর বিরুদ্ধে। কিন্তু তিনি বীরপুরুষ। বীরের মতোই তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করুন।

মতিলাল ॥ বীর!

তারাচাঁদ ॥ (মুখভঙ্গি করলেন) ওই বীরদের জন্যে একটিমাত্র ব্যবস্থাই আছে। সে হল লাঠ্যৌষধি!

জয়কৃষ্ণ ॥ (ক্রুদ্ধ) ভাব দেখে সন্দেহ হচ্ছে কোন্‌দিন রাধাকান্ত দেব গিয়ে ব্রাহ্ম-সমাজের খাতায় নাম লেখাবেন।

রাধাকান্ত ॥ (উত্তেজিত হয়ে নড়ে চড়ে বসলেন। নামালেন ফরসীর নল) ব্রাহ্ম-সমাজে নাম লেখাবার প্রশ্ন উঠছে না। কিন্তু অস্বীকার করতে

পারেন সিন্নি মশাই, আজ সারা দেশে অমন তেজী, অমন স্বাধীন মানুষ আর দুটি নেই ?

অন্নকৃষ্ণ। (ব্যঙ্গভরে) তা বটে !

রাধাকান্ত। (আরও উত্তেজিত) ঠাট্টার কথা নয়। নেপল্‌সের স্বাধীনতা-লড়াইয়ের যখন গলা টিপে ধরল অস্ট্রিয়ার সৈন্য, তখন সিল্ক বাকিংহামকে একমাত্র তিনিই লিখতে পেরেছিলেন : "Enemies to liberty and friends of despotism have neven been and never will be ultimately suceessful।" দক্ষিণ আমেরিকার কলোনিগুলো যেদিন স্পেনের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেল—সেদিন ভারতবর্ষে এই একটি মানুষই প্রীতিভোজ ডেকে সেই স্বাধীনতাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এ দেশে ফরাসী বিপ্লবকে তিনিই সব চেয়ে অভ্যর্থনা করেছেন।

তারিণী। (বিব্রত) সে সব তো আমরা জানিই রাধাকান্ত।

রাধাকান্ত। না, সবটা জানি না। আজ আমরা পোলিটিক্সের বুলি শিখছি, কিন্তু সে চেতনা এনে দিয়েছে কে ? আমরা জমিদার—প্রজার রক্ত শুষে খাই—কিন্তু প্রজার উন্নতির জন্যে আন্দোলন তো তিনি একাই করেছেন। রেবিয়াস কর্পাসের অধিকার তুলে ধরেছেন তিনিই। গরীবের পক্ষ থেকে অত্যাচারী বড়লোককে শাস্তি দেবার কথা তাঁরই। সিন্নি মশাই, তাঁর ধর্মমতের বিরোধিতা যা খুশি আমরা করতে পারি। কিন্তু একদিন যখন ইতিহাস লেখা হবে—তখন সে ইতিহাসে হয়তো আমরা ঠাঁই পাব না। আর রামমোহন সম্বন্ধে হয়তো সেদিন ভারতবর্ষ জানবে : "He is the maker of new India।"

(উত্তেজনায় রাধাকান্ত কাঁপতে লাগলেন। সমস্ত ঘর স্তব্ধ হয়ে রইল)

তারিণী। (কিছুক্ষণ পরে) রাধাকান্ত—কী হচ্ছে এ সব ?

রাধাকান্ত। (নিজেকে সামলে নিয়ে) ভয় নেই তারিণীদা—নিশ্চিন্ত থাকুন। (হাসলেন) ব্যক্তি রামমোহনকে আমরা যত শ্রদ্ধাই করি, ধর্ম আর সমাজের বিচারে তিনি আমাদের চিরশত্রু। কথা হচ্ছে : Even the Deyll must get his due। (হাসলেন) যাক সে সব। আসল কথাই চলুক। রামমোহন তো সতীদাহ বন্ধ করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। আমাদের কর্তব্য কী ?

ভবানী ॥ কাগজে আগুন ছুটিয়ে দেব। জ্বালাময়ী সমালোচনা লিখব।

রাধাকান্ত। উঁহু, ওতে হবে না। শুধু কাগজের কাজ নয়। আরো কিছু চাই—আরো concrete suggestions—

(রামকমল সেন ঢুকলেন)

রামকমল ॥ ভালো খবর আছে মশাই—খাইয়ে দিন।

রাধাকান্ত ॥ আরে—রামকমল সেন যে। ত্রিকালচারের কোনো সুখবর নাকি ?

রামকমল। এগ্রিকালচার নয়—এগ্রিকালচার নয়। হিন্দু কালচার। ব্রাহ্ম-সমাজের দলে ভাঙন ধরেছে। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশও ভেগেছে।

ভবানী। (সবিস্ময়ে) রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ! সে কি। সে যে রামমোহনের ডান হাত। ওর সেই বিটলে জ্ঞানদেব হরিহরানন্দের আপন ভাই।

জয়কৃষ্ণ। শেষকালে ব্রহ্ম-সমাজের আচার্যিই চম্পটং!

রামকমল। এতদিন সয়ে ছিল—শাস্ত্রটাস্ত্র ব্যাখ্যা করছিল নিশ্চিন্তে। কিন্তু কতটা বরদাস্ত করবে আর! সতীদাহ-বিলের তোড়জোড় দেখেই সরে পড়েছে। রামমোহন খুব দমে গেছেন শুনলাম।

মতিলাল। একটা বড় কাতলাই তবে জাল কাটল। যাবে—এমনি করেই সব যাবে।

রাধাকান্ত। (চিন্তিত) হাঁ সকলের শক্তি সমান নয়। রামমোহন রায় সবাই হন না।

তারাচাঁদ। জয় মা কালীঘাটের কালী! এবার যেন একটু আশার আলো দেখা যাচ্ছে।

রাধাকান্ত। (দীর্ঘশ্বাস ফেললেন) কিন্তু আমি দেখছি না। পৃথিবীর সবাই যদি সরেও দাঁড়ায়—তবু একা লড়বার শক্তি নিয়েই এগিয়ে চলবে রাম-মোহন রায়। সে যাক্—আমাদের কাজ আমরা করি। আসুন, উঠে পড়েই লাগা যাক্—

[ক্রমশ

পুস্তক পরিচয়

জগন্নাথ চক্রবর্তী

মিঠেকড়া। সুকান্ত ভট্টাচার্য। প্রকাশক—সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা—৬ । দাম দু' টাকা ।

১৩৩০ সালে মাত্র ৩৬বৎসর বয়সে যখন সুকুমার রায় মারা যান তখন রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "বঙ্গসাহিত্যে ব্যঙ্গরসিকতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আরো কয়েকটি দেখা গিয়েছে কিন্তু সুকুমারের অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাসের বিশেষত্ব তাঁর প্রতিভায় যে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছে তার ঠিক সমশ্রেণীয় রচনা দেখা যায় না। তাঁর এ বিশুদ্ধ হাসির দানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অকালমৃত্যুর সকরুণতা পাঠকদের মনে চিরকালের জন্য জড়িত হয়ে রইল।" সুকান্তর সদ্যপ্রকাশিত ছড়ার বই 'মিঠেকড়া' হাতে নিয়ে সর্বপ্রথমেই সুকুমার রায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি মনে পড়ে। সুকান্তর ছড়া অবশ্য "বিশুদ্ধ হাসি"র ছড়া নয়; সুকান্তর নিজের দেওয়া নাম 'মিঠেকড়া'র মধ্যেই এ বইয়ের মিশ্র চরিত্রের পরিচয় রয়ে গেছে। কিন্তু "অকালমৃত্যুর সকরুণতা" সুকান্তর ক্ষেত্রে আরও মর্মান্তিক।

সুকান্তর কাব্যগ্রন্থগুলি—'ছাড়পত্র', 'ঘুম নেই', 'পূর্বাভাস'—ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে সুপরিচিত হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের ইস্কুল-কলেজের আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় সুকান্তর কবিতা আজ অপরিহার্য। বাংলাদেশের পাঠক—বিশেষত তরুণেরা—সুকান্তর কবিতা ভালবাসে, ভালবাসে তার বলিষ্ঠতার জন্য, অকুতোভয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার জন্য, সামাজিক শোষণ-দুর্নীতির বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রতিবাদের জন্য, গভীর স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে প্রগতিশীল আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সমন্বয়ের জন্য।

ছোটদের জন্য ছড়া লিখতে বসেও সুকান্ত তার কাব্যের মূল সুরকে ভুলতে পারেনি। যে দুর্ভিক্ষপীড়িত লঙ্গরখানার দেশে বসে সুকান্ত "বোধন" কবিতা রচনা করেছিল সেই মন্বন্তরী দেশের ছবিই সে ফুটিয়ে তুলেছে "মিঠেকড়া"র বিভিন্ন ছড়ার মধ্যে; এবং সেই মূল-সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সে 'পৃথিবীর দিকে তাকাও' নামক দীর্ঘ বিদেশী কবিতাটি অনুবাদ করেছে। লেনিন ও সোভিয়েট রাশিয়ার প্রসঙ্গ যেখানে এসে পড়েছে সেখানে এক অদ্ভুত আবেগে

ও স্বাভাবিকতায় উচ্ছল হয়ে উঠেছে অনুবাদ। যে ফেব্রুয়ারির ঝড়ে একদা কলকাতার রাজপথ কেঁপে উঠেছিল, শুরু হয়েছিল ব্যারিকেডের মহড়া, সেই ফেব্রুয়ারির কাহিনী নিয়েও ছড়া বানিয়েছে সুকান্ত 'আজব লড়াই'। ইংরেজ তাড়াবার খেলায় সেদিন বালকবালিকারাও এসে যোগ দিয়েছিল, কিন্তু বড়দের বোকামিতেই সেই খেলাটা মাঠে মারা গেল, শুধু তাই নয় খেলায় হারও হল। সেই পরাজয় ও পৃষ্ঠভঙ্গের জের—বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমঝোতার জেরই—হচ্ছে আজকের দুঃশাসন-পীড়িত খাদ্য-বস্ত্র-শিক্ষাশূন্য ১৯৫১ সালের বাংলাদেশ। এর চেয়েও বড় একটা লড়াই হয়েছিল ১৮৫৭ সালে; তারও শুরু হয়েছিল এই বাংলাদেশেরই ব্যারাকপুর থেকে। সেই "স্বাধীনতার প্রথম লড়াই"কেও কিশোরদের কাছে "সিপাহী-বিদ্রোহ" নামক ছড়ায় পরিবেশন করেছে সুকান্ত। দুর্ভিক্ষ বাংলার প্রতিবাদী কবি সুকান্ত ছড়ার মধ্যেও রেশন, কালোবাজার, ভেজাল, মজুতদার প্রভৃতির ব্যঙ্গচিত্র তুলে ধরেছে, আর প্রশ্ন রেখেছে জিজ্ঞাসু কিশোর মনের সামনে—কেন অসাম্য, কেন গরীব বড়লোকের মধ্যে এই আকাশপাতাল প্রভেদ। তার ছোট্ট অথচ সার্থক ছড়া "পুরোনো ধাঁধা"র শেষ পংক্তি দু'টি ছোটরা হয়তো মুখস্থ করে ফেলবে সহজেই, কিন্তু শুধু মুখস্থ করেই এ গোলক-ধাঁধা থেকে নিষ্কৃতি নেই; কারণ—

> "হিং-টিং-ছট্‌ প্রশ্ন এসব মাথার মধ্যে কামড়ায়
> বড়লোকের ঢাক তৈরি গরীব লোকের চামড়ায়"

ছোটদের কবিতায় অনুপ্রাস, মিল, অন্ত্যমিলের আড়ম্বর না থাকলে তা স্বভাবতই শিশুমনের কাছে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। একথা সত্যি যে "মিঠেকড়া"র অনেক কবিতা মিঠে ততটা নয় যতটা কড়া। কিন্তু সে কড়া-পাক বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভাবের, ভাষার নয়। "হঠাৎ দেশে উঠলো আওয়াজ হোহো হোহো হোহো" (সিপাহী বিদ্রোহ), অথবা "ফেব্রুয়ারী মাসে ভাই কলকাতা শহরে" (আজব লড়াই) কিশোরচিত্তকে জয় করবেই। কিন্তু "এক যে ছিলো আপনভোলা কিশোর" সম্ভবত গদ্যছন্দের জন্যই কিশোরচিত্তে সাড়া জাগাতে ব্যর্থ। প্রথম ছড়াটির 'অদৃষ্টচক্র', 'মধুপর্ক' প্রভৃতি শব্দগুলিও ঠিক কিশোরোপযোগী নয়। তাছাড়া "পৃথিবীর দিকে তাকাও" নামক অনুবাদটিও শুধু দৈর্ঘ্যেই বড় নয়, ভাবের দিক থেকেও গুরুভার।

সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোলে'র মত "বিশুদ্ধ হাসি"র কবিতাও

'মিঠেকড়া'তে আছে, নিছক হাসি ছাড়া তার অন্য কোনোই উদ্দেশ্য নেই; যেমন, "মেয়েদের পদবী" অথবা "জ্ঞানী"। সুকান্তর "বরেনবাবু মস্ত জ্ঞানী, মস্ত বড পাঠক" (জ্ঞানী) পড়তে পড়তে সুকুমার রায়ের ছড়াগুলি মনে না পড়ে যায় না। সুকুমার রায় আরও ছোট কবিতায় আরও অল্প কথায় ওই একই রস পরিবেশন করতে পেরেছিলেন, যথা—

"সব লিখেছে কেবল দেখ পাচ্ছিনে কো লেখা কোথায়
পাগলা ষাঁড়ে করলে তাড়া কেমন ক'রে ঠেকাব তায়।"
(—আবোল-তাবোল)

অবশ্য সুকুমার রায়ের সব ছড়াই যে "বিশুদ্ধ হাসি"র তা আমরা স্বীকার করি না। তাঁর—

"রামগরুড়ের বাসা ধমক দিয়ে ঠাসা
হাসির হাওয়া বন্ধ সেথায়
নিষেধ সেথায় হাসা" (—রামগরুড়ের ছানা)

অথবা, "শিবঠাকুরের আপন দেশে
আইন কানুন সর্বনেশে" (—একুশে আইন)

প্রভৃতি পংক্তিগুলির মধ্যে বৃটিশ-শাসিত বাংলাদেশের একটি গভীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস স্পষ্টই শোনা যায়; সেই দমন নিপীড়ন ত্রাসের ইতিহাস এতই নিষ্করুণ যে রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত "বিশুদ্ধ হাসি"র বিশুদ্ধিকে পর্যন্ত তা আক্রমণ করেছে। নতুন এক 'একুশে আইনে' বাঁধা আমাদের এই সোনার বাংলা আজ আবার যখন 'রামগরুড়ের বাসা'য় পরিণত তখন যতই আরেকজন আধুনিক কিশোরের "অকালমৃত্যুর সকরুণতা" আমাদের মনকে ব্যথিত করে, সে কিশোর আর কেউ নয়, সুকান্ত।

'মিঠেকড়া'র শেষ দুটি ছড়া "সিপাহী বিদ্রোহ" এবং "আজব লড়াই" সেকাল ও একালের ঐতিহাসিক কাহিনী বা ঘটনার ওপর রচিত। রুশ কথা-সাহিত্যে নতুন ও পুরানো উভয় ঢংয়েরই 'বিলিনি' নামক কাহিনী-কাব্যগুলি অনেকটা এই স্টাইলের। সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রাচীন 'চতুষ্ক' (চশতুষ্ক) ও প্রাচীন বিলাপমূলক কাব্যের কাঠামোকেও আজকাল লোক-কবিতা ও লোকগাথায় পরিণত করা হচ্ছে, এদের মধ্যে বাস্তব সমাজবোধের আবির্ভাব ঘটিয়ে। সুকান্তর "ফেব্রুয়ারী মাসে ভাই কলকাতা শহরে"র সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার ক্রুকোভা রচিত বিখ্যাত কবিতা—"এমনি সেদিন

পাষাণপুরী মস্কো নামক শহরে"র মিল শুধু ঢংয়ে নয়, মেজাজেও। সুকান্ত এই ছড়াগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের "কথা ও কাহিনী"র রীতিকেই আরও হাল্কা, বাস্তব এবং সমাজসচেতন করে প্রয়োগ করেছে। প্রয়োগ হিসাবে এগুলি সার্থক। বাংলা কাহিনীকাব্যের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও পথের ইংগিতও রয়ে গেছে এদের মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথ যে শিশু-কবিতাগুলি লিখেছেন সংখ্যায় সেগুলি অনেক। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যের মূল বিশেষ ধরনের রোম্যান্টিক সুরের সঙ্গেই তাদের মিল। সেগুলি যে রবীন্দ্রনাথেরই শিশুকবিতা তা আর বলে দিতে হয় না। তেমনি সুকান্তর বেলাতেও দেখি 'ছাড়পত্র', 'ঘুম নেই' যে-ঘাটে বাঁধা 'মিঠেকড়া'ও সেই ঘাটেই বাঁধা—যদিও তা ছড়া, যদিও তাতে প্রলেপ হাস্যরসের। রবীন্দ্রনাথ নিজে অবশ্য বিশুদ্ধ হাসির কবিতা—শিশু-কবিতা—অনেক লিখেছেন। তাঁর 'খাপছাড়া'র—"ক্যাম্বু বুড়ীর দিদিশাশুড়ীর তিন বোন থাকে কালনায়" বা "তেরিয়া মেজাজ খাজা খাঁ সে এই মারে তো সেই মারে" সুকুমার রায়ের আবোলতাবোলধর্মী। আমরা রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় সুর বেশি করে পাই তাঁর আগের কালের শিশুকবিতাগুলিতে। রবীন্দ্রনাথের "মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে" অথবা "মা যদি তুই আকাশ হতিস" অথবা "আমি আজ কানাই মাস্টার" প্রভৃতির নায়ক যে মন-কেমন-করা শিশু বা উদাসীন শিশু ভোলানাথ, তারই বংশধর যখন নতুন ডাংগুলি খেলায় মেতে ওঠে কলকাতা শহরের রাস্তায় কোনো এক রক্তাক্ত ফেব্রুয়ারি মাসে তখন সেও নায়ক হয়ে ওঠে, কিন্তু সে নায়ক হয়, রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কবিতায় নয়, সুকান্তর 'মিঠেকড়া'র। সুকান্তর ছড়াগুলির বৈশিষ্ট্য এবং সার্থকতা এইখানেই।

'মিঠেকড়া'র এই প্রথম সংস্করণটির আরও একটি উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ হচ্ছে এর পাতায় পাতায় শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের ছবিগুলি। সুকান্ত কলমের মুখে যাকে ব্যক্ত করেছে দেববাবু তুলির আঁচড়ে তারই ছবি এঁকেছেন। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ 'গ্রোটেস্ক' ধরনের ছবিগুলি স্বভাবতই খাপছাড়া ধরনের ছড়াগুলির সঙ্গে অত্যন্ত মানানসই হয়েছে। সারস্বত লাইব্রেরী সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশনে বরাবর যে সুরুচির পরিচয় দিয়ে আসছেন 'মিঠেকড়া'তে তা শুধু অক্ষুন্নই থাকে নি উৎকর্ষও লাভ করেছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস 'মিঠেকড়া'র প্রথম সংস্করণ খুব অল্পদিনের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে যাবে।

সংস্কৃতি সংবাদ

রবীন্দ্র মজুমদার

চীনা সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি-দল

গত ২৮শে অক্টোবর নতুন চীন থেকে এক সাংস্কৃতিক মিশন ভারত-ভ্রমণের উদ্দেশ্যে কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন। ষোলজন বিশিষ্ট চীনা পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক আর শিল্পী-সাহিত্যিক এই দলে আছেন। চীনা জনগণের রিপাবলিক থেকে চীনের কোন প্রতিনিধি-দলের ভারত-পরিদর্শন এই প্রথম এবং এ ব্যবস্থাটি হয়েছে সরকারী উদ্যোগে। এই একই সময়ে আবার একটি ভারতীয় সাংস্কৃতিকদল চীন-ভ্রমণ করছেন—যে-দলে আছেন বোম্বাইয়ের করাঞ্জিয়া, আহমেদ আব্বাস, দিল্লীর ডক্টর রাও, কলকাতার অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য প্রভৃতির মত বিশিষ্ট প্রগতিশীল সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী।

ভারত-চীনের মধ্যে এই যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আর চিন্তা-বিনিময় আবার নতুন করে আরম্ভ হল, বলা বাহুল্য, এটা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণকর। এশিয়ার এই দু'টি প্রাচীনতম প্রতিবেশী দেশ সুউন্নত সভ্যতায়, সুপরিণত জীবন-দর্শনে আর সমাজ-ব্যবস্থায়, সুকুমার শিল্প-সাহিত্য আর ললিতকলায় প্রায় স্মরণাতীত কাল থেকে পরস্পরের কাছে ঋণী। অভিধর্ম আর মহাসংঘের শরণ নেবার জন্যে যে-সব মনীষী তীর্থঙ্কর ওদেশ থেকে এদেশে এসেছেন কুরুবর্ষ পার হয়ে হিমজম্বাব বরফ-ঢাকা পথ পায়ে হেঁটে, সুনাগপত্তনের মহাবলাধিনায়কের জয়স্কন্ধাবারে রাত্রি কাটিয়ে বৈশালী-বারাণসী-নালন্দার চৈত্যগৃহে বসে ধ্যানমগ্ন হয়ে থেরবাদীর মর্ম উপলব্ধি করতে, তাঁরাই চীন-ভারত-সংস্কৃতির অগ্রণী মৈত্রীদূত। তাছাড়াও, চীন আর ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতি আর সামাজিক ব্যবস্থা প্রায় একই রকম বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে এসেছে যুগ যুগ ধরে। দুই দেশেই সেই একদিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগোষ্ঠী, অন্যদিকে নগর-রাষ্ট্র; সামন্ততন্ত্রের অভ্যুত্থানের পটভূমিকায় নগর-রাষ্ট্র থেকে

জাতি-রাষ্ট্র ; তারপরে স্থিতাবস্থা, আত্মঘাত, জাতি-বৈর, অধঃপতন, 'অন্ধকার-যুগ'—আধুনিক অধ্যায়ে সাম্রাজ্যবাদের রক্তচোষা শোষণ আর ঔপনিবেশিক বা আধা-ঔপনিবেশিক চরিত্র-বৈশিষ্ট্য—দুই ভিন্ন দেশের ইতিহাসের কাঠামোর মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ মিল আর কোথাও বড় একটা চোখে পড়ে না। ইতিহাসের এই সমস্ত পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর অধ্যায়গুলির মধ্যে দিয়ে এই দুই দেশ সৃষ্টি করে এসেছে তাদের আশ্চর্য রকমের ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ, দীর্ঘজীবী, ঐতিহ্য-রস-সঞ্চারী আর প্রাণ-পরিপূর্ণতায় উজ্জ্বল সংস্কৃতি-সম্পদ।

আজ সেই দুই মহাদেশের মধ্যে একটি দীর্ঘ এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের শেষে সামন্ততন্ত্র-সাম্রাজ্যবাদের শোষণমুক্ত, আপন বাহুর শক্তিতে আত্মপ্রতিষ্ঠ, স্বাধীন আর সুখী জীবন গড়ে তোলার কাজে আনন্দ-মুখর। অন্যটি দেশ-নেতাদের বিশ্বাসহন্তা ষড়যন্ত্রে ছিন্নমস্তা, কল্পনাতীত দারিদ্র্য আর রাজনৈতিক গ্লানিতে ভরা, উদ্বাস্তু আর চোরাকারবারীদের রামরাজ্য। কিন্তু তবু, তারই মধ্যে থেকে আজকের নবজাত নয়া-গণতন্ত্রী চীনের মতই জন্ম নিতে চাচ্ছে এক নতুন ভারতবর্ষ। এশিয়া-জোড়া সেই মুক্তি-আন্দোলনের নেতা আজ মহাচীন। ইয়েনান-নানকিং-বণাঙ্গণের সীমারেখা আজ বিস্তৃত হয়ে গেছে পেগুর টিনের খনি, সিঙ্গাপুরের রবারের জঙ্গল ছাড়িয়ে বাংলা-বিহার-মাদ্রাজের ক্ষেতখামার পর্যন্ত। জাতীয় মুক্তির সেই পথে মহাভারত আজ চীনের কাছ থেকে সহযাত্রীর নির্দেশ পেতে চায়—যে-পথের দিশাকে আলোকিত করে রাখবে সংস্কৃতির অনির্বাণ অগ্নি-চিহ্নটি।

চীন আর ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করাটা আজ আর তাই শুধু সরকারী উদ্যোগে মুষ্টিমেয় সংস্কৃতি-বিলাসীর শৌখিন আত্ম-সন্তোষের প্রশ্ন নয় ; মহাভারতের জনগণের নতুন চেতনার আত্মপ্রকাশ আর আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। চীনের সঙ্গে এই সাংস্কৃতিক লেনদেনের ব্যাপারে এদেশের সরকারী সূত্রটি বেশ কিছুটা সংকুচিত। চীনে আমন্ত্রিত ভারতীয় সংস্কৃতিকর্মী-বুদ্ধিজীবীদের সেদেশে যেতে নানাভাবে বাধা দেওয়া হচ্ছে ; চীনা সাংস্কৃতিক মিশনের সভ্যদের সঙ্গে এখানকার সাংবাদিকদের ও জনসাধারণের মেলামেশার সুযোগ সরকারী আমলারা অত্যন্ত ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বন্ধ করে দিচ্ছেন। এ সব থেকে স্বভাবতই মনে হয়, চীন সম্বন্ধে আমাদের জনসাধারণের শ্রদ্ধা আর উৎসাহ যতখানি আন্তরিক, সরকারী উদ্যোগটি ঠিক ততটা আন্তরিক নয়। সরকারী কূটনীতির বেড়া ডিঙিয়ে চীন-ভারতের

মধ্যে সত্যিকারের মৈত্রী রচনা করতে ভারতের জনসাধারণ আজ উৎসুক।

নতুন চীনের এই সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে তাই ভারতের সাধারণ মানুষের পক্ষে সংস্কৃতিকর্মী হিসেবে আমরা শ্রদ্ধার আর বন্ধুত্বের, সহযাত্রীর আর সহকর্মীর হাত বাড়াচ্ছি।

বার্নার্ড শ' ও বিভূতিভূষণ স্মরণে

আর একটি ২রা নভেম্বর ফিরে এল: গত বছর এই সময়ে একই সঙ্গে আমাদের সাহিত্য-সংসারে দু'টি মর্মান্তিক বিয়োগ-বেদনা যুক্ত হয়েছিল। সুপরিণত বয়সে জর্জ বার্নার্ড শ'র মৃত্যু বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডারে যে-পরিমাণ শূন্যতার সৃষ্টি করেছে, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যুতে বাঙলা সাহিত্যের ক্ষতির পরিমাণ তার চেয়ে কম নয়।

চুরানব্বই বছর বয়সে বার্নার্ড শ'র মৃত্যু আমাদের কাছে যে এত অপ্রত্যাশিত বলে মনে হয়েছিল, তার কারণ আমাদের কাছে শ' হয়ে উঠেছিলেন তাঁর রচনাবলীর মতই অমর—কালোত্তীর্ণ মেথুসেলার এক ইন্টেলেক্চুয়াল দোসর। আমাদের এ যুগের মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে যে প্রচণ্ড ওলোট-পালটের ঝড় বয়ে গিয়েছে, তার ইতিহাস বড় বিচিত্র। গত অর্ধ-শতাব্দী কাল ধরে মানুষ, সমাজ আর বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এসেছে এক বিরাট পরিবর্তন। চিন্তার ক্ষেত্রে বিবর্তনের সেই ইতিহাসের প্রায় প্রত্যেকটি অধ্যায়ে যিনি অবলীলাক্রমে নিজের স্বাক্ষর চিহ্নিত করে গেছেন, প্রায় প্রত্যেকটি বিষয়ের ওপর যাঁর আশ্চর্য মন্তব্য শোনবার জন্যে পৃথিবীর মানুষ উদ্গ্রীব কৌতূহলের সঙ্গে অপেক্ষা করে থেকেছে, তিনি বার্নার্ড শ'। শ'য়ের মত দীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে এমন সর্বাঙ্গীন অনুসন্ধিৎসার উদ্যম, বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণতা আর নতুন সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছনোর দুঃসাহস আর কোন্ সাহিত্যিকের রচনায় পাই? মানুষের অনুশীলনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে শ' বারবার যাতায়াত করেছেন অবলীলাক্রমে। দর্শন, রাজনীতি, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, শিল্প-স্থাপত্য-সংগীত ইত্যাদির কোন-না-কোন দিকের ওপর আলোচনা আর নতুন চিন্তার আলোকপাত শ'য়ের উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধাবলীতে আছে। আর সেই সঙ্গে আছে তাঁর প্রচণ্ড বিদ্রোহ—সমাজ, রাষ্ট্র আর শিক্ষায় সমস্ত রকম জড়তা, অন্ধতা আর কুসংস্কারের

বিরুদ্ধে তাঁর নির্মম ব্যঙ্গের কশাঘাত। কেবিয়ানিজম্‌-এর মোহের মধ্যে শ'য়ের-যে সীমাবদ্ধতা ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শেষ জীবনে শ' যে তাঁর আজীবনের বিশ্বাসকেও যাচাই করতে ছাড়েন নি, মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন ফেবিয়ানিজম্‌-এর ব্যর্থতা, শ'য়ের সেই সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির প্রতি সততাকে আমরা শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারি না।

এদেশে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের কাছে বার্নার্ড শ'র রচনাবলী বিশেষ তাৎপর্য পেয়েছে তাঁর মুক্ত আর শুভবুদ্ধির জয়ঘোষণা থেকে। 'Eighteen Ninetees'-এর ভিক্টোরীয় ইংল্যাণ্ডের মধ্যবিত্ত-নিয়ন্ত্রিত আত্মসন্তুষ্ট নীতি-বাগীশদের অসহ্য কৃত্রিম মূল্যবোধ আর ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে ছিল শ'এর যুদ্ধ-ঘোষণা। আর, এ দেশের ধর্ম-নীতি-সংস্কারের রুদ্ধশ্বাস আবহাওয়ায় মানুষের অন্ধ বুদ্ধিবিভ্রম আর সামাজিক জড়তার বিরাট সামন্ততান্ত্রিক অচলায়তনকে যাঁরা বৈজ্ঞানিক চিন্তা আর যুক্তির আঘাতে কিছুটা নাড়া দিতে চেয়েছিলেন, তাঁরা স্বভাবতই বার্নার্ড শ'যের কাছ থেকে মস্তবড় প্রেরণা পেয়েছেন। "সভ্যতার প্রিয়শত্রু" শ'য়ের উদ্দেশ্যে প্রমথ চৌধুরীর সেই চতুর্দশপদী তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের মনের কথাই ব্যক্ত করেছে :

এ জাতে শেখাতে পারি জীবনের মর্ম
হাতে যদি পাই আমি তোমার চাবুক।

সত্যের সন্ধানে শ'যের দুর্নিবার কালাপাহাড়ী অভিযান তাঁকে দিয়ে বহু ক্ষেত্রে আমাদের মনের কথা বলিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী-ধনতন্ত্রী শোষণব্যবস্থা আর "its merchant-princely enterprise, its ferocious slave-driving, its prodigality of blood, sweat and tears" শ'য়ের অসীম ঘৃণার সৃষ্টি করেছিল। সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের সার্থকতার হিসেব-নিকেশের খাতায় জমার অঙ্ক কতটুকু—এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, "Only a monstrous pile of frippery, some tainted class literature and class art and not a little poison and mischief."—'একটি অসামাজিক সমাজতন্ত্রী' নামক উপন্যাসে বিরাট ধনী আর তুলো-কারখানার মালিকের ছেলে সিড্‌নি ট্রেফ্যুসিস যখন তার পৈত্রিক পুঁজির অফুরন্ত উৎস আবিষ্কার করেছে, গভীর আবিষ্কারের সঙ্গে উপলব্ধি করেছে যে তার ধনসম্পত্তির মূলে আছে শ্রেণীগত চরম শোষণ-ব্যবস্থা, তখন তীক্ষ্ণ তীব্র নির্মম ভাষায় নিজের শ্রেণীর বিরুদ্ধে তার স্ত্রীর কাছে অভিসম্পাত উচ্চারণ করেছে : "Modern English

polite society, my native sphere, seems to me as corrupt as consciousness of culture and absence of honesty can make it. A canting, lie-loving, fact-hating, scribbling, chattering, wealth-hunting, pleasure-hunting, celebrity-hunting mob, that having lost the fear of hell, and not replaced it by the love of justice, cares for nothing but the lion's share of wealth wrung by the threat of starvation from the hands of the classes that create it."—ট্রেঞ্চ্যাসিস-এর জবানীতে এই আত্মসমালোচনা বার্নার্ড শ' ছাড়া আর কারুর পক্ষে করা সম্ভব ছিল কিনা সন্দেহ। মানুষের প্রত্যেকটি সংস্কারকে যিনি চ্যালেঞ্জ করেছেন, চূর্ণ করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত মুক্তবুদ্ধির এক হাস্যোজ্জ্বল প্রান্তরে এনে পৌঁছে দিয়েছেন একটা গোটা যুগের মানুষের মনকে, বিশ্ব-সংস্কৃতির ইতিহাসে সেই বার্নার্ড শ' অবিস্মরণীয়।

বিভূতিভূষণের যে সহজ আর সৌন্দর্যমুগ্ধ একটি শিল্পী-ব্যক্তিত্ব প্রতিভাত হয়েছিল তাঁর রচনাবলীতে, তা বাঙলা সাহিত্যের আধুনিক অধ্যায়ে একটা নতুন আস্বাদ আনার নির্দেশ। আজ থেকে বছর পঁচিশ আগে 'পথের পাঁচালী' যখন প্রথম 'বিচিত্রা'র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে, বাঙলা কথাসাহিত্যের ঢেউ তখনও খানিকটা ঘোলাটে থেকে গিয়েছিল 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর কিছুটা চেষ্টাকৃত, কৃত্রিম আর লক্ষ্যহীন উত্তেজনার চঞ্চলতায়। এঁদের অনেকেরই দেশের মাটির মধ্যে শিকড়ের যোগাযোগ ছিল না। পথের পাঁচালী' আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত অনায়াসে বাঙালীর মনে এমন একটা জায়গায় তা আসন পেল যেটা আন্তরিক একটা ভালবাসার রাজ সংহাসন। পুরনো আর চিরপরিচিত এই গ্রামবাঙলার মাঠ-ঘাট-নদী-প্রান্তরের সেই আশ্চর্য স্নিগ্ধ মায়া কবিতায় রূপ পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথে, আর গদ্য-সাহিত্যে তাকে নতুন করে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন বিভূতিভূষণ। বাঙলা-প্রকৃতির যে রূপ-রস-সুষমায় আমরা আজন্মলালিত, তাকে যেন নতুন করে ভালবাসতে শিখি বিভূতিভূষণের রচনাবলীর মধ্যে দিয়ে। ঘেঁটুফুল-কলমী-লতা-বনচালতের মায়া-জড়ানো সেই ঘুঘুডাকা নিস্তব্ধ দুপুর আর সোঁদা মাটির গন্ধভরা সন্ধ্যা-রঙীন পথে পথে সুখবেদনাবিহ্বল যে মনের কৈশোর-বিলাস, সেই মন বাঙলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণেরই পুনরাবিষ্কার। আর, উপন্যাসে-

পরে সেই খাঁটি বাঙালী মনকে নতুন করে রূপায়িত করে গেছেন প্রধানত বিভূতিভূষণ। গ্রামবাঙলার জীবনকে তিনি রাঙা করিয়েছিলেন তাঁর শিল্পী-মনের একটি মস্তবড় সত্যের জোরে: সে সত্য হচ্ছে সৌন্দর্যমুগ্ধতা এবং অত্যন্ত সহজ আর আন্তরিক ভালবাসা—মানুষের প্রতি ভালবাসা। নিশ্চিন্দিপুরের সর্বজয়া আর ইন্দির-ঠাকরুণ থেকে লবটুলিয়া-বইহারের জোয়ারী-ক্ষেতের আড়ালে আরণ্যক-কবি মিসিরজী পর্যন্ত বিভূতিভূষণের প্রত্যেকটি চরিত্র তাঁর সেই ভালবাসার স্পর্শে ফুটে উঠেছে উজ্জল হয়ে, সাহিত্যে স্থান পেয়েছে অবিস্মরণীয় হয়ে।

একথা অবশ্যই ঠিক যে জীবনের সৌন্দর্যের দিকে বিভূতিভূষণের মুগ্ধ দৃষ্টি মেলা ছিল যতখানি, জীবনের গ্লানির দিকে, অন্যায়ের দিকে, সংগ্রামের দিকে তাঁর চোখ ততখানি বিশ্লেষণের দৃষ্টি দেয়নি। জীবনকে তিনি দেখেছেন প্রধানত প্রকৃতিরহস্যমুগ্ধ ভাবুক অপুর কিশোর চোখ দিয়ে। বিভূতিভূষণের রচনায় তাই জীবন সম্বন্ধে যে অনুসন্ধিৎসা আছে, সেটা একান্তভাবেই অনুভূতি-নির্ভর হৃদয়ের পথে; রহস্য-বিস্ময়ের আনন্দে ভরা বালকমনের পথ ধরেই তিনি জীবনকে অনুসরণ করেছেন। নিবিড় আন্তরিকতার সঙ্গেই তা করেছেন এবং আন্তরিকতার সঙ্গে করেছেন বলেই সেটা যথার্থ রসোত্তীর্ণ সাহিত্যেব মর্যাদা পেয়েছে। তবু, 'পথের পাঁচালী' আর 'আরণ্যক'-এর পরে বিভূতিভূষণ যে আর নতুন কিছু দিতে পারেন নি, তার কারণও বোধহয় সেই জীবন সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতা। এই দুটি রচনার পরে তিনি আর যা-কিছু লিখেছেন, তা হয়েছে 'পথের পাঁচালী' বা 'আরণ্যক'-এরই মোটের ওপর রকমফের—সেই অপুর চোখে দেখা জীবনলীলারই পুনরাবৃত্তি। কিন্তু তাই বলে কি 'পথের পাঁচালী' বা 'আরণ্যক'-এর সাহিত্যিক মূল্য কিছু কমে? —"যেখানে আজন্মকাল আছি সেখানেও সব মানুষের সব জায়গায় প্রবেশ ঘটে না। 'পথের পাঁচালী' যে বাংলা পাড়াগাঁয়ের কথা, সেও অজানা রাস্তায় নতুন করে দেখতে হয়। সাহিত্যে এই একটা নতুন জিনিস পাওয়া গেল, অথচ পুরাতন পরিচিত জিনিসের মতই সে সুস্পষ্ট।"—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিই 'পথের পাঁচালী'র কথকের উদ্দেশ্যে সার্থকতম শ্রদ্ধা-নিবেদন।

সাড়ে চার-শো বছর আগে ক্রিস্টোফার কলম্বাস ভারতবর্ষ আবিষ্কার করেছেন বলে মনে ক'রে আমেরিকার উপকূলে এসে জাহাজ ভিড়িয়েছিলেন। পণ্ডিত নেহ্‌রুর এ-যুগের 'ডিস্‌কভারি অফ ইণ্ডিয়া' শুনেছি মার্কিন বুদ্ধিজীবী-দের কাছে তারি তারিফ পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর

ভারত-সন্ধানে মার্কিন সাংবাদিক

গদী থেকে কিংবা সত্যবতী-নগরে কোকাকোলার স্টলে বসে নেহ্‌রুজী কখন কি বললেন অথবা বিশ্ব-জাতিসংঘের নিরাপত্তা-পরিষদে তাঁর প্রতিনিধি কোন্ পক্ষে ভোট দিলেন, তাই নিয়ে মার্কিন কূটনীতি-বিশারদদের ভাবনা-চিন্তার অন্ত নেই। কিন্তু সে দেশের ক'জন যথার্থ ভারতবর্ষকে চেনে-জানে? মহারাজা-কোব্‌রা-রোপট্রিক্‌-ইয়োগী, কিপলিং-এর গঙ্গাদীন আর হীরা-জহরতের হরির লুঠ, হলিউডের সাবু আর হস্তিকন্যা শান্তি: এই হচ্ছে সাধারণ মার্কিনের চোখে আজও ভারতবর্ষের একমাত্র পরিচয়। এ দেশের মার্কিন-প্রবাসীরা প্রধানত দুই শ্রেণীর—এক ব্যবসায়ীর দল, যারা টুথ্‌-পেস্ট বিক্রির বাজার পাবার চেষ্টায় খাঁটি মার্কিন চঙে সিনেমা-মঞ্চে স্নানের পোশাক পরা ভারতীয় তরুণীদের সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থায় উৎসাহী; অন্যটি, কূটনীতিক রাষ্ট্র-কর্মচারীর দল যাদের 'আমেরিকান ওয়ে অফ লাইফ'-এর প্রচারকৌশলে আমাদের বেশ-কিছু সংখ্যক ডলার-প্রসাদপুষ্ট সম্পাদক-বুদ্ধি-জীবী উচ্ছ্বসিত। এদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ নিউদিল্লীর প্রাসাদপ্রকোষ্ঠ, নাম্বার টেন মোটরগাড়ির মডেলে, ক্ষুধার্ত ভারতভূমি থেকে বহুদূরে বিচ্ছিন্ন 'ক্যাসানোভা'র নৃত্যসংগীতমুখর ডিনার টেবিলে। অথচ, সেই ডিনার-টেবিলে এই সব মার্কিনদের সঙ্গ পেয়ে ধন্য হন যে-সব খদ্দর-শোভিত ভদ্রলোকেরা, তাদেরই মন্ত্রগুরু একদা আসল ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে পায়ে হেঁটে অগণিত জনতার সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগ স্থাপন করেছিলেন: "India lives in her villages, not in her cities" বলেছিলেন গান্ধীজী।

গ্রাম-ভারতে ঘুরে ঘুরে হিন্দুস্তানের সেই আত্মাটিকে আবিষ্কার করবার চেষ্টায় কিছুদিন আগে এদেশে এসেছিলেন একজন প্রায়-অজ্ঞাতনামা মার্কিন সাংবাদিক: জন ফ্রেডরিক ম্যুয়েল। ম্যুয়েল-এর নামের সঙ্গে আমরা কেউ কেউ পরিচিত হয়েছিলাম যখন ১৯৪৩-৪৪'-এ এদেশের মন্বন্তর আর দুর্ভিক্ষের নিদারুণ বর্ণনা দিয়ে মর্মস্পর্শী ভাষায় লেখা 'Famine Is Like This' নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় শ্রীমতী পার্ল বাক্‌-এর 'এশিয়া অ্যাণ্ড দি

আমেরিকাস্' পত্রিকায়। যুদ্ধের সময় ম্যুয়েল এদেশে আসেন মার্কিন ফিল্ড সার্ভিস অ্যাম্বুল্যান্সের একজন হয়ে। এখানকার কর্মক্ষেত্রে তিনি গণ-ভারতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ পান। এ দেশের জনতার অবর্ণনীয় দুঃখ-দারিদ্র্য, সামন্তব্যবস্থার ভারবাহী কৃষকের কল্পনাতীত শ্রমকষ্ট, সাম্রাজ্যবাদী শোষণযন্ত্রের নির্মমতম অভিযান, আর রোগে মহামারীতে উদাসীন অবহেলায় নিদারুণ প্রাণের অপচয়—এ সবই তাঁর মনে গভীর নাড়া দেয়। সেই সময়ে এদেশে তৎকালীন মার্কিন শ্বেতাঙ্গ সৈনিকদের উৎকট আত্মচেতনা, উচ্ছৃঙ্খলতা আর ইতরতা দেখে নিজে একজন মার্কিন হিসেবে নিবিড় লজ্জা অনুভব করেছিলেন। ১৯৪৬-এ তাঁর একটি বই বেরোয় 'American Sahib' নামে, যাতে তিনি উদ্ধত আর অমার্জিত, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যহীন শ্বেত-চর্মগর্বিত এই সব স্বদেশবাসীদের উদ্দেশ্যে তীক্ষ্ণ তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করেছিলেন।

ম্যুয়েল্-এর যে বইটির পরিচয় এখানে দিতে চাই, সম্প্রতি-প্রকাশিত সে বইটির নাম : 'Interview With India'। গান্ধীজীর ওই বাণীটিই ম্যুয়েল্-এর মনে এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা জাগায় গ্রাম-প্রাণপ্রবাহিনী ভারতের স্বরূপ-সন্ধানে। ১৯৪৮-এ তিনি বৃটিশ-কবলমুক্ত "স্বাধীন" ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গ্রামে গ্রামে ঘোরেন—অধিকাংশই সংখ্যাতীত মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে, কখনো বা গোরুর গাড়িতে, কখনও বা ঘোড়ার পিঠে, কিংবা নদীপথে নৌকায় চেপে। রাজপুতানার মরুভূমি অঞ্চলে গিয়েছেন উটের পিঠে চড়ে, ছোট-নাগপুরের বনভূমিতে গিয়েছেন আদিবাসীদের গ্রামে, বাঙলার সুন্দরবনে গিয়েছেন সমুদ্রে মাছ-ধরা জেলেদের সঙ্গে থাকতে, নারকেল-পাতার ছিটে মাথায় দিয়ে গিয়েছেন দক্ষিণ-ভারতের গ্রামে গ্রামে। একবার একটানা ছ'মাসের মধ্যে কোন শহরে ম্যুয়েল যাননি; গ্রামের চাষীদের কুঁড়ে ঘরে রাত কাটিয়েছেন খড়ের গাদায় শুয়ে; শুধু ভাত, জোয়ারী-রুটি কিংবা নারকেলের 'কোরাড়া' খেয়ে থেকেছেন দিনের পর দিন; ঘর্মাক্ত দেহে নদীর ঘোলাজলে স্নান করে সর্দিগর্মিতে ভুগেছেন; মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া হয়ে বিনা-চিকিৎসায় পড়ে থেকেছেন কুইনিনের অভাবে; জল-বসন্তে আক্রান্ত হয়ে গ্রাম্য ওঝার মন্ত্রপড়া জল খেয়েছেন অসহায় অবস্থায়। শেষ পর্যন্ত ১৪ সের দেহের ওজন খুইয়ে, ১০৫ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে, অজ্ঞান অবস্থায় যখন প্রলাপ বকছেন, তখন শহরের হাসপাতালে এসে ম্যুয়েল প্রাণে রক্ষা পান। কি

করে যে পেলেন তা ভেবে ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য যে-কোন দেশের লোক বিস্ময়ে নির্বাক হবে।

মোটের ওপর, একজন ভারতীয় কিসানের দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সবরকম অভিজ্ঞতাই ম্যুয়েল্ প্রত্যক্ষভাবে অর্জন করেছেন। জন ফ্রেডরিক ম্যুয়েল প্রথম আমেরিকান যিনি ভারতের সঙ্গে আত্মিক ও আন্তরিক পরিচয় স্থাপন করেছেন নিদারুণ শ্রম আর কষ্টের বিনিময়ে। ভারতের জনতার জীবনের সঙ্গে জীবন যোগ করার মধ্যে দিয়ে তিনি ভারতীয়ের মনের পরিচয় পান ঘনিষ্ঠভাবে। অতিসাধারণ একজন অশিক্ষিত ভারতীয় চাষীর মধ্যে যে মহৎ সরলতা, আন্তরিকতা, অতিথিপরায়ণতা, জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা আর সুমার্জিত অথচ সহজ শালীনতাবোধের পরিচয় ম্যুয়েল্ পেয়েছেন, তার কথা বারবার লিখেছেন গভীর আবেগের সঙ্গে। তাঁর সেই ভারত-সন্ধান সৎ এবং যথার্থ বলেই সেই পরিচয়ের শেষে তিনি তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে বলতে পেরেছেন : "I was sick to death of those who prate of the 'glorious traditions of India.'...Even in the so-called golden ages, it seemed, there was less political freedom than in Nazi Germany." বিনা-বিচারে জেলে আটক রাখার বৃটিশ আইন "স্বাধীন" ভারতের কয়েকটি রাজ্য-পরিষদে প্রায় বিনা-প্রতিবাদে তখনই গৃহীত হতে দেখে ম্যুয়েল্ স্তম্ভিত হয়েছেন। রাজনৈতিক অত্যাচার, জনমতের কণ্ঠরোধ, গণতন্ত্রের অপমান, চোরাকারবারীর অমানুষিকতা, জমিদারের শোষণ, মহাজনের জুয়াচুরি, ব্রাহ্মণের সামাজিক পৈশাচিকতা, অচ্ছুৎ-হরিজনদের পশুজীবন-যাপন, ইত্যাদি একের পর এক দেখতে দেখতে ম্যুয়েল-এর যখন যন্ত্রণায় রুদ্ধশ্বাস অবস্থা, তখন তিনি যান তেলেঙ্গানার তৎকালীন কমিউনিস্ট কিসানদের দ্বারা স্বায়ত্তশাসিত কয়েকটি গ্রামে। এখানে বলে রাখা যাক, ম্যুয়েল্ মোটেই কমিউনিস্ট নন ; বইটির মধ্যে তিনি অনেক জায়গায় কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের প্রতি তাঁর বিরোধিতার কথা বলেছেন। কিন্তু তবু, সাংবাদিক হিসেবে ম্যুয়েল্-এর যে নিরপেক্ষ স-বিবেক সততা আছে, তার প্রমাণ এই তেলেঙ্গানা সম্বন্ধে তাঁর বিবরণীটি। আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন আপন বাহুর শক্তিতে মুক্তিজয়ী তেলেঙ্গানার জমিদার-হীন চাষী-সমাজের সুখী আর সমবায়-নিয়ন্ত্রিত শ্রমফলভোগের ব্যবস্থায়। জন ম্যুয়েল তেলেঙ্গানায় গিয়েছিলেন ১৯৪৮-এর গোড়ার দিকে। এই বিদেশী

অ-কমিউনিস্ট সাংবাদিকের রচনায় তৎকালীন তেলেঙ্গানার বর্ণনা হয়েছে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কমিউনিস্টদের রণনীতি-কৌশলের (tactics) পেছনে অনেক কিছু ম্যুয়েল্-এর চোখে আপত্তিকর ঠেক্লেও তিনি তেলেঙ্গানাকে বলেছেন, "people's state", সেখানকার "well-trained peasant militia"কে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন, বারবার বলেছেন—এই সব গ্রামের লোক "happy and satisfied without exception." ভবিষ্যৎ ভারতের নির্দেশ দিয়েছে তাঁকে এই তেলেঙ্গানা।

ভারতের দেশপ্রেমিক কোন বুদ্ধিজীবী বিদেশী ম্যুয়েল্-এর মতো এমন ভাবে এদেশকে দেখেছেন বলে জানি না। যদি দেখতেন, তাহলে দেশের পক্ষে সেটা যথার্থ কল্যাণের হতো। ম্যুয়েল্-এর এই 'Interview With India' বইটির সার্থকতা নিঃসন্দেহে ভারত-রাষ্ট্রনায়ক পণ্ডিত নেহ্রুর 'ডিস্কভারি অফ্ ইণ্ডিয়া'র চেয়ে অনেক বেশি—শুধু মার্কিন পাঠকদের কাছেই নয়, এ দেশেরও অনেকের কাছে। এ দেশের মানুষের সত্যিকারের পরিচয় আর তাদের প্রতি এমন নিবিড় ভালবাসা আর-কোন সমসাময়িক বিদেশীর রচনায় পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। সত্যসন্ধানী-জন ফেওরিক ম্যুয়েল্-কে অভিনন্দন জানাই প্রথম মার্কিন হিসেবে যিনি ভারতের যথার্থ স্বরূপটিকে আমেরিকার সামনে সততার সঙ্গে এঁকে ধরেছেন। প্রগতিশীল, বিবেকবান, গণতন্ত্রী; ভারতপ্রেমিক আমেরিকার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে ম্যুয়েল্-এর রচনায়।

গ্রামোফোন-রেকর্ডে শান্তির গান

গত কয়েক বছরে ভারতীয় গণনাট্য-সংঘের অনেকগুলি গান গ্রামোফোন-রেকর্ডে প্রকাশিত হয়েছে। সুরের বলিষ্ঠ বৈচিত্র্যে আর বিষয়বস্তুর জীবনধর্মী বাস্তবতায় গণনাট্য-সংঘের গানগুলি আজ দেশের জন-চিত্তকে ক্রমশই জয় করে নিচ্ছে। এই গান-গুলির সুরের প্রধান উৎস আমাদের লোকসংগীতের সতেজ আর প্রাণোচ্ছল সুরৈশ্বর্য। আর, রচনার দিয়ে যে গণনাট্য-সংঘের গান জনতার মনের কথাকে, তার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে, তার দৈনন্দিন আর বৃহত্তর সংগ্রামকে রূপ দেবে—তা বলাই বাহুল্য। গ্রামোফোন-রেকর্ডে প্রকাশিত হয়ে এই গানগুলির যেমন বহুল প্রচার হচ্ছে, তেমনি তাদের জনপ্রিয়তাও হচ্ছে ব্যাপকতর।

সম্প্রতি-প্রকাশিত এই গণসংগীতের রেকর্ডগুলির মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে

বেশি উল্লিখিত হবার দাবী রাখে 'শান্তির গান' আর 'জন্মভূমি' গান দুটি। এই রেকর্ডটির প্রকাশক কলম্বিয়া, রেকর্ড-নম্বর জি-ই-৭১৪৮। দুটি গানেরই কথা আর সুরের রচয়িতা সলিল চৌধুরী, গেয়েছেন গণনাট্য-সংঘের গায়ক-গায়িকাদল। মনে আছে, গত বছর শান্তি-সংস্কৃতি-সম্মেলনে বিরাট জন-সমাবেশের সামনে সলিল চৌধুরীর নেতৃত্বে গণনাট্য-সংঘের গানের দল যখন গেয়েছিলেন :

…আমাদের দেশের কোটি হাতে হাতে কাজের ক্ষুধা,
খনি, পাহাড়, অগাধ মাটি ভরা সুধা।
তবুও আকাল মহামারী ঘরে ঘরে অনাহারী
খাদ্যহারা বেকার কাঁদে—হারবে সোনার দেশ।
অশান্তির এই দেশে গড়ি প্রাণের পরিবেশ।
বোঝা সবাই তখন একসাথে ভাই মিলি…
…যখন প্রশ্ন ওঠে ধ্বংস কি সৃষ্টি,
আমাদের চোখে জ্বলে আগুনের দৃষ্টি
আমরা জবাব দিই—সৃষ্টি, সৃষ্টি, সৃষ্টি।

তখন আবেগ-চঞ্চল শ্রোতাদের মধ্যে থেকে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। শান্তি-আন্দোলনের ওপর আরও অনেক গান রচিত হয়েছে; কিন্তু এই গানটিতে রচয়িতা যেরকম আন্তরিকতা আর অকৃত্রিম আবেগের সঙ্গে দেশের সাধারণ মানুষের শান্তি-কামনাকে বিশ্বশান্তি-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেছেন, তেমনটি বোধহয় আর কোন গানে হয়নি। বার্লিনের যুব-শান্তি-উৎসব এই গানটিকে বিশিষ্ট মর্যাদা দিয়ে বাঙলার সংগীত-প্রতিভাকে সম্মানিত করেছেন।

'জন্মভূমি' গানটিতে ফুটে উঠেছে দেশের প্রতি ভালবাসার নিবিড়তায় ভরা একটি মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ স্নিগ্ধতা। ধানধান্যের শ্যাম-সমারোহে ভরা এই দেশের সোনার ক্ষেতখামারে খাটছে কোটি সোনার প্রাণ, কিন্তু তবু তারা নিজভূমে পরবাসী, বর্গিরা এসে লুটে নিয়ে যায় তাদের সেই শ্রম-সম্পদ, বিচ্ছেদ-বিষে জর্জর ঘরে ঘরে দুঃখিনী দুয়োরাণী মার কেঁদে কাটে কাল। সুচিত্রা মিত্রের একক কণ্ঠস্বরের এই মর্মস্পর্শী বেদনার রূপান্তর সমবেত কণ্ঠের বলিষ্ঠ মুক্তি-প্রতিজ্ঞা-ঘোষণায় :

আজ তোমার ঘরে শিশুর হাসি মায়ের মত প্রাণ
বন্ধ্যা মাটি না-ফোটা প্রেম অগীত সব গান
দিয়েছে ডাক, আজকে বোঝা পেলাম সমাধান
মাগো সবার মিলন-মোহনায় ॥ ...
...হিমালয় আর নিদ্রা নয়, কোটি প্রাণ-চেতনায় বরাভয়
জাগো জাতির হয়েছে সময়, আনো মুক্তির খরবন্যা ॥

আজকের দিনে যখন বেশির ভাগ রেকর্ড-সংগীতেই খেলো সুরের সঙ্গে ন্যাকামি-ভরা কথার সংযোগ ছাড়া আর কিছু বড় একটা পাওয়া যাচ্ছে না, তখন এই দুটি সুস্থ, সুন্দর, জীবনধর্মী, আর দেশের প্রতি ভালবাসায় ভরা গান পরিবেশন করার জন্যে কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানীকে সংগীতরসপিপাসুরা ধন্যবাদ জানাবেন।

একবিংশ বর্ষ
প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা
অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮

প্রেমচাঁদ

(১৮৮০-১৯৩৬)

ভি. এস. বেসক্রভ্‌নি

বর্তমান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক প্রেমচাঁদের নাম অধিকাংশ সোভিয়েট পাঠকের কাছে অজ্ঞাত। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য জগতে তাঁরা যা জানেন তা কেবল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মুল্‌করাজ আনন্দ-এর লেখার কিছু কিছু অনুবাদ। তাও আবার বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় ও মুল্‌করাজ আনন্দ-এর লেখা বই অনূদিত হয়েছে মাত্র দু'খানি এবং তার খোঁজ অনেকেই রাখেন না। সাহিত্যের মাধ্যমে বর্তমান ভারতের জীবনধারা জানতে হ'লে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের রচনাই সম্বল। সেইজন্যে আমাদের সামনে বিরাট কর্তব্য রয়েছে—এ যুগের হিন্দী, বাঙলা, মারাঠি ও অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের সঙ্গে সোভিয়েট পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে প্রেমচাঁদের আবির্ভাব। ১৯০৫ সালের রুশ-বিপ্লবের পর সারা এশিয়া জুড়ে চলেছে গণজাগরণের চেষ্টা। ১৯০৫-১৯০৮, এই তিন বৎসরে ভারতের গণআন্দোলন এমন তীব্র হয়ে ওঠে যে লেনিন এই সম্পর্কে বলেন, "ভারতের শ্রমিকেরাও সচেতন হয়ে উঠেছে, তাদের সংগ্রামও সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক রূপ নিচ্ছে।" ঠিক এই সময়ে উত্তরপ্রদেশের দক্ষিণাঞ্চল থেকে "দেশপ্রেম" নামে ছোট গল্পের একটি সংকলন বের হয়। হামিরপুরের কালেক্টরের বিবেচনায় বইখানি দেশদ্রোহাত্মক হওয়ায়, তা বাজেয়াপ্ত করে পুড়িয়ে ফেলা হয়। বইখানিতে ছিল পাঁচটি ছোট গল্প এবং সেগুলির রচয়িতা ছিলেন প্রেমচাঁদ। প্রেমচাঁদের সাহিত্য-জীবনের সূত্রপাত হয় এইভাবে।

সাহিত্যিক প্রেমচাঁদের সত্যকার বিকাশ ঘটে প্রথম মহাযুদ্ধের পর, ১৯১৯ থেকে ১৯২১ সালে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের সঙ্গে জমিদার ও মহাজনদের জুলুম জনসাধারণের জীবনযাত্রা তখন দুর্বহ করে তুলেছে এবং দিকে দিকে

ফেটে পড়ছে তার বৈপ্লবিক প্রকাশ। রুশবিপ্লবের সাফল্যে ভারতবাসীরা আশান্বিত হয়ে উঠেছে।

প্রেমচাঁদ প্রায় দু'শ ছোট গল্প এবং বহু প্রচলিত দশটি উপন্যাসের রচয়িতা। সব ক'টি উপন্যাসই ভারতের প্রায় সব ভাষাতে অনুবাদ হয়ে গেছে। তাঁর অধিকাংশ লেখাই ভারতের কৃষিনির্ভর ও ঔপনিবেশিক জীবন নিয়েই। এই জীবনের যথার্থ বাস্তব ও মানস রূপ তাঁর রচনায় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচারের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্যে কিষাণদের বিদ্রোহ, নাগরিক জীবনের অন্ধকূপ থেকে মধ্যবিত্ত গরিব কেরানীদের আত্মরক্ষার আপ্রাণ প্রয়াস, অন্ধ সংস্কার ও ছুৎমার্গের যাঁতাকলে মানুষকে পিষে মারা, মানুষের সরল বিশ্বাস ভাঙিয়ে ধর্মের নামে ভণ্ডামি, বিচারের নামে নীতিভ্রষ্ট ঘুষখোর বিচারকদের অবিচার ও পক্ষপাতিত্ব, জমিদার ও সরকারী কর্মচারীদের নিয়ত অনাচার, বিদেশী শাসনের দাসত্ব—এই হল প্রেমচাঁদের সমস্ত গল্প ও উপন্যাসের বিষয়বস্তু।

জনসাধারণের চিন্তা ও উন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে প্রেমচাঁদের প্রতিভা বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে বলে তাঁর রচনা সমসাময়িক ভারতের সাধারণ মানুষ ও তার জীবন সম্পর্কে প্রামাণিক বলে গণ্য করা যায়। হিন্দী সাহিত্যে তাঁর কীর্তি অতুলনীয়। তাঁর সামাজিক উপন্যাস ও ছোট গল্প হিন্দী সাহিত্যের এক নূতন যুগ সূচনা করে।

প্রেমচাঁদ চিরাচরিত পথে চলেন নি। যে কৃষকদের নিয়ে তাঁর বেশির-ভাগ রচনা, তারা ভারতীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে ছিল অপাংক্তেয়। বিষয়-নির্বাচনের এই নূতনত্বের ফলে তাঁর রচনায় মৌলিকতা। তাঁর 'প্রেমাশ্রম' উপন্যাসের ভূমিকায় পণ্ডিত ও সাহিত্যরসিক রামদাস গৌর লিখেছেন, ভবিষ্যতে যদি কেউ ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেন, কৃষক জীবনের যথাযথ বর্ণনায় প্রেমচাঁদের দক্ষতা তাঁকে স্বীকার করতেই হবে। কেবল বিষয়বস্তু ও রচনাভঙ্গিতেই নয়, হিন্দী ভাষাকেও তিনি নূতন করে সাজিয়েছেন।

প্রেমচাঁদ ছিলেন যুক্তপ্রদেশের হিন্দু অধিবাসী। প্রথমে উর্দুতে এবং পরে হিন্দীতে লিখলেও তাঁর মানবতা, শোষিত মানুষের প্রতি তাঁর দরদ, তাদের সাম্য ও মুক্তির অধিকার সর্বস্বীকৃত করার জন্যে তাঁর অক্লান্ত প্রয়াস তাঁকে

সমস্ত প্রাদেশিকতার ঊর্ধ্বে নিয়ে গিয়েছিল এবং নানা ভাষায় বিভক্ত ভারতেও সর্বভারতীয় লেখকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছিল। একই কারণে, স্বদেশের বাইরেও, মুক্তিকামী মানুষ মাত্রই তাঁকে আপনার বলে মেনে নিতে দ্বিধা করেনি।

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ প্রেমচাঁদের লেখায় স্থান পায়নি, কারণ তাঁর মতে দেশের লোকদের কাছে এই বিরোধের অস্তিত্ব নেই।

উর্দুকে হিন্দীর কাছাকাছি আনার জন্যে প্রেমচাঁদ হিন্দীতে লিখতে আরম্ভ করেন। আরবী-শব্দ-কণ্টকিত উর্দু ভাষা সমসাময়িক হিন্দু-মুসলমানদের কাছে সহজবোধ্য নয়—এই ছিল তাঁর ধারণা। তিনি বলেছিলেন, "যে ভাষা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের প্রকাশমাধ্যম, সে ভাষার প্রাণ নেই, তা কেবল পোষাকী ভাষা। সাধারণ মানুষের নাড়ীর সঙ্গে যোগসাধনের শক্তি সে ভাষার নেই। সে-ভাষা যেন বদ্ধ পুষ্করিণী, স্ফটিক পাথর দিয়ে তার ঘাট বাঁধানো, তার জলের তলায় কত ফুলের ঘটা, কিন্তু তাতে জল নিকাশনের বা প্রবেশের কোন পথ নেই।"

কায়িক্লেশে রোজগারে যাদের দিন চলে, সেই কিষাণ-মজুরদের সঙ্গে প্রেমচাঁদের ছিল প্রাণের যোগ। এই কারণে প্রেমচাঁদ সেইসব মনীষীদের সমগোত্রীয় যাঁরা জীবনের সত্য ও বাস্তব রূপকে দেখেছেন, যাঁদের দেখা কেবল দোষ দেখেই ক্ষান্ত হয়নি, দোষস্খালনেরও উন্নতির উপায়ও দেখেছে।

লেনিন টলস্টয় সম্বন্ধে বলেছিলেন, "তাঁর মধ্যে যেমন দেখা যায় একটা সুস্থ বিবেক, উন্নত অবস্থার জন্যে একাগ্র আকাঙ্ক্ষা, অতীতের দায় থেকে নিস্তার পাওয়ার প্রবল ইচ্ছা, তেমনি দেখি এমন একটা মন যা অলীক কল্পনা দিয়ে স্বপ্নসৌধ রচনা করেছে, যার মধ্যে ছিল না রাজনীতিক অন্তর্দৃষ্টি এবং বৈপ্লবিক দৃঢ়তা।" প্রেমচাঁদ সম্পর্কেও, বিশেষত ১৯১৯-১৯২১-এর দেশব্যাপী আন্দোলনের সময় তাঁর রচনা সম্পর্কে, একই কথা খাটে।

কৃষকের শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণে টলস্টয়ের মত প্রেমচাঁদও দ্বিধাদ্বন্দ্বের পরিচয় দিয়েছেন। একদিকে যেমন তিনি জমিদারি ও ঔপনিবেশিক শোষণের যথাযথ বর্ণনা করেছেন, সরকারী আমলা ও কর্মচারীদের স্বরূপ প্রকাশ করেছেন, ভণ্ডামিকে বিদ্রূপ করেছেন, কুসংস্কারকে চাবুক মেরেছেন, অন্যদিকে আবার এই অসহ বাস্তব অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় নির্দেশ করেছেন অবাস্তব গান্ধীবাদে। তাঁর "প্রেমাশ্রম" উপন্যাস ও "সংগ্রাম" নাটক ১৯১৯-২১-এর

অহিংস অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে লেখা। এতে তিনি দেখিয়েছেন বৃটিশ ও জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ। অথচ এই বিদ্রোহের অবসান ঘটল উপন্যাসের জমিদার-নায়ক যখন তার জমিদারিতে "প্রেমাশ্রম" নামে এক সংগঠন গড়ে তুলল। "সংগ্রাম" নাটকের জমিদারকে দেখানো হচ্ছে, প্রজাদের উপর উৎপীড়ন করেছে বলে ভীষণ অনুতপ্ত এবং তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ প্রজাদের সামনে নিজের অপরাধ স্বীকার করে সমস্ত জমিজমা তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে তীর্থে চলে যাচ্ছে। যাবার আগে জমিদারি-প্রথা কত খারাপ, কিভাবে এই প্রথা বিদেশী শাসনের পোষকতা করছে তার সমালোচনা করে এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিচ্ছে। টলস্টয়ের "রেসারেক্‌শন্" উপন্যাসের নেখলিউডভ্ চরিত্রের কথা মনে পড়ে যায়। "প্রেমাশ্রম" উপন্যাসের তরুণ জমিদার-নায়ক তার বিরাট পৈত্রিক সম্পত্তি প্রজাদের মধ্যে বিলি করে দেবার আগে জমিদারদের কর্তব্য সম্বন্ধে বলছে—"মহাত্মাজী বলেছেন, তালুকদার তার প্রজাদের বন্ধু, গুরু ও রক্ষক। সবিনয়ে আমি বলতে চাই, এই যথেষ্ট নয়। এ ছাড়াও তাকে আরও কিছু হতে হবে, তাকে হতে হবে জনসাধারণের সেবক। জনসেবার মধ্যেই তার বেঁচে থাকার একমাত্র সার্থকতা, নইলে, দুনিয়ায় তার টিঁকে থাকার কোন প্রয়োজন নেই, তার অবর্তমানে সমাজের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রক্ত জল করে প্রজারা যে সম্পদ আহরণ করছে, বিলাসব্যসনে তা যথেচ্ছ ভাবে উড়িয়ে দেবার জন্যে, তাদের কুঁড়ের পাশে তাই দিয়ে আকাশ-ছোঁওয়া ইমারত গড়ে তোলার জন্যে, সাজপোষাক অলঙ্কারের ঘটায় গরিব প্রজার নগ্নতাকে বিদ্রূপ করার জন্যে, রাতের উচ্ছৃঙ্খল উল্লাসে তাদের অনাড়ম্বর শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটাবার জন্যে আর ভূরিভোজের প্রাচুর্য দিয়ে তাদের অনাহার ও হাহাকারকে ব্যঙ্গ করার জন্যে জমিদারের জন্ম হয়নি। জমিদার তার নিজের অধিকার বজায় রাখার জন্যে প্রাণপণ লড়তে পারে, কিন্তু তার ওপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত তা পালনে সে নির্বিকার। এই সব জানোয়ারদের হাত থেকে জনসাধারণ যত শীঘ্র মুক্ত হতে পারে, যত শীঘ্র এদের জোয়াল ঘাড় থেকে নামে, ততই মঙ্গল। জমির মালিক কেবল ভগবান কারণ তিনি এর সৃষ্টিকর্তা, আর কৃষাণ, তাঁর ইচ্ছানুসারে সে জমি চাষ করে। রাজা রাজ্যের পালক, সেইজন্যে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা নেবার তিনি অধিকারী, এই খাজনা এমন হওয়া উচিত যা প্রজাদের সাধ্যাতিরিক্ত না হয়।

বিরাট বিরাট জমির মালিক হয়ে জমিদার ও জায়গীরদারেরা পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাকবে, আর প্রজাদের ওপর চালাবে অবাধ শোষণ, আধুনিক কালের কোন সমাজ এই অন্যায় অধিকার স্বীকার করবে না।"

প্রেমচাঁদ যে টলস্টয়ের ভক্ত ছিলেন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তিনি টলস্টয়ের লেখা কুড়িটির অধিক গল্পের অনুবাদ করেছেন। অনুবাদগুলি অবশ্য দেশ-কালানুযায়ী পরিবর্তিত, যেমন রুশ নাম ও পরিবেশের বদলে ভারতীয় নাম ও পরিবেশ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত আরও একটা কথা বলে রাখি, গান্ধীজীও টলস্টয়ের গল্প অনুবাদ করেছেন তাঁর মাতৃভাষা গুজরাটীতে।

"প্রেমাশ্রম" উপন্যাসে আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা প্রেমশঙ্করের মধ্যে কোন কোন ভারতীয় সমালোচক গান্ধীজী অথবা টলস্টয়ের প্রতিচ্ছবি দেখতে পান। গান্ধীজীও যে ট্রান্সভাল, নাটাল ও গুজরাটে এইরকম সাংঘিক আশ্রম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন, অনেকেরই হয়ত তা মনে আছে।

প্রেমচাঁদ স্বীকার করেন না কেবলমাত্র শ্রমিকেরাই উৎপীড়িত কিষাণদের মুক্তি এনে দিতে পারে। অথচ কৃষক পরিবারের ভাঙন দেখাতে গিয়ে এই শ্রমিকদের আপনার বলে মানতে বাধ্য হয়েছেন, যখন বুঝেছেন বাস্তুহারা কিষাণেরাই পেটের দায়ে শহরে এসে শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে। প্রেমচাঁদ অবাক বিস্ময়ে দেখেছেন গ্রামের পর গ্রাম ছারখার করে ধনতন্ত্র কি নির্মম ভাবে ফুলে কেঁপে উঠছে। এরই মর্মান্তিক বর্ণনা পাই তাঁর বৃহৎ উপন্যাস "অরুণা"তে।

প্রেমচাঁদের উপর টলস্টয়ের প্রভাব যথেষ্ট থাকলেও সমাজ-সম্পর্কিত তাঁর চিন্তাধারার জন্যে টলস্টয় সম্পূর্ণ দায়ী নন। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে রুশিয়ার বাস্তব অবস্থা এবং বিংশ শতকের প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক ভারতের অবস্থা একেবারে একই রকম যদি না হয়ে থাকে, তাহলে টলস্টয় ও প্রেমচাঁদের মধ্যে পুরোপুরি মিল না থাকাই স্বাভাবিক। আদর্শের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে যে মিল আছে তার কারণ "ইতিহাসের বাস্তব বিচারে সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ড, বিশেষত এশিয়া, টলস্টয়ের আদর্শে চালিত।" টলস্টয়ের প্রভাবের এই একমাত্র কারণ এবং এই কারণেই টলস্টয়ের ভাবধারার পক্ষে ভারতের ক্ষেত্র এত উর্বর। যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলে রুশিয়াতে টলস্টয়বাদের উদ্ভব হয়েছিল, ১৯০৫ সালের বিপ্লবে সে অবস্থার অবসান ঘটে। এই বিপ্লব এশিয়ার ঘুম ভাঙিয়ে দেয় এবং ভারতের স্বাধীনতা

সংগ্রামের আদর্শ হয়ে ওঠে। এরপর রুশিয়ার বিখ্যাত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দেখিয়ে দিল, চাষী-মজুররা কী ভাবে ক্ষমতা অধিকার করে। ভারতবর্ষে এর প্রভাব দেখা গেল ১৯১৯-২১এর বৈপ্লবিক আন্দোলনে। কিন্তু ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে সামন্ততন্ত্র বরাবর প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে। আজও পর্যন্ত তার প্রতাপ কম নয়। ধর্মের গোঁড়ামি ও কুসংস্কার ভারতীয় সমাজকে আজও আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই জন্তে রুশিয়ার প্রাক্-বৈপ্লবিক গ্রামের সঙ্গে আধুনিক ভারতের গ্রাম্যাবস্থার কোন কোন বিষয়ে সামঞ্জস্য হয়ত আছে কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে তার সাহিত্যিক প্রতিফলন এক নয়। তাই প্রেমচাঁদের মধ্যে যা দেখি তা টলস্টয়ের অন্তর্দ্বন্দ্বের একটা বিশিষ্ট ও পরিবর্তিত রূপ। একমাত্র উল্লিখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই দুই লেখকের তুলনামূলক বিচার চলতে পারে।

প্রেমচাঁদ ও টলস্টয়ের মধ্যে যেটুকু মিল আছে, তা হচ্ছে এই : দু'জনেই লিখেছেন গরিবদের নিয়ে, সমাজের বাস্তব রূপ দুজনেই তুলে ধরেছেন, জীবনের সত্য আবিষ্কার করতে দুজনেই প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন এবং দুজনেই একই প্রকার ভাববিকারে ভুগেছেন যেমন ভুল যুক্তি ও উদ্ভট কল্পনার সাহায্যে সমাজ সংস্কারের অবাস্তব পরিকল্পনা করা। এ ছাড়া আর সব বিষয়ে দুজনের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে এবং স্থান ও কালের ব্যবধানে সে প্রভেদ স্বাভাবিক। প্রেমচাঁদের কৃষকেরা জমিদার ও মহাজনদের শুধু শোষণকারী বলেই জানে না, বিদেশী শাসকদের দালাল বলেও মনে করে। তাই জমিদার ও মহাজনদের প্রতিরোধ করে তারা ভাবে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। ইতি-হাসের অমোঘ নির্দেশে বিদ্রোহ যে মুক্তির একমাত্র উপায় এ চেতনা প্রথম জাগছে কৃষকদের মধ্যে। যে শাসন-ব্যবস্থা দেশের সর্বনাশ করে দেশকে শ্মশানে পরিণত করে, তার অন্তঃসারশূন্যতা কৃষকদের নজর এড়ায় না। "সংগ্রাম" নাটকে একজন কৃষক বলছে "তোমরা কি মনে কর, টাকা না থাকলে সরকার এই বিরাট সেনাবাহিনী পুষতে পারত? হাজার হাজার টাকা লাগে এক একটা কামানের জন্তে। প্রতিটি হাওয়াই জাহাজের জন্তে লাগে লক্ষ লক্ষ টাকা। সৈন্ত চলাচলের জন্তে লাগে মোটর ও যানবাহন। সেপাইরা যা খানা খায়, আমাদের বড়লোকদের বরাতেও তা জোটে না। সরকারী বড় সাহেবরা বছরে ছ'মাস পাহাড়ে গিয়ে বাস করে। ছোট সাহেবরাও কম রাজার হালে থাকে না। তাদের পরিবারের প্রতিটি লোকের

অন্তে ১০।১৫ জন করে চাকর, একটা পুরো বাড়ি না হলে তাদের থাকা চলে না। আর তাদের থাকার মত এক একখানা বাড়িতে যা জমি লাগে আমাদের একটা গোটা গ্রামেও তা নেই।"......প্রেমচাঁদ দেখাচ্ছেন, যারা মুখ তুলে কথা কয় না, মার খাওয়া যাদের বিধিলিপি, অবস্থায় তাদেরও মুখ খোলে, তারাও মরিয়া হয়ে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে দুর্দিনে তারা তাদের একমাত্র হাতিয়ার লাঠিটাই শক্ত করে মুঠিয়ে ধরে। ঐ নাটকের প্রধান কৃষকচরিত্র বলছে: "আমিও খুনী। তবে, আমি দুর্বলদের খুন করি না, আমি কেবল তাদের খুন করি যাদের অন্নের অভাব নেই, টাকার জোরে যারা গরিবদের সর্বস্বান্ত করে, তাদের বেইজ্জৎ করে ভিটেছাড়া করে।"···
"এত অপমানের পরও ঘৃণায় যে জ্বলে ওঠে না, যার রক্ত টগবগ করে ফোটে না, প্রতিশোধ নিতে যে মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে না, সে মরদ নয়, আর কিছু।"
"...এইজন্যেই ত' সাহেব আর জমিদারেরা আমাদের কুকুরের অধম ব'লে মনে করে।"

জীবনের প্রকৃত অবস্থা থেকেই প্রেমচাঁদের সমাজসংস্কারের আদর্শ রূপ নিয়েছিল। টলস্টয় সম্পর্কে লেনিন যা বলেছিলেন, প্রেমচাঁদ সম্পর্কেও তা বলা চলে: "টলস্টয় সেই অসংখ্য রুশ দেশবাসীর মুখপাত্র, যারা সমাজের উপরতলাকার প্রভুদের সবে ঘৃণা করতে শুরু করেছে, যারা এখনও পর্যন্ত লড়াইয়ের সেই সচেতন স্তরে পৌঁছোতে পারেনি যেখানে আপোসরফা নেই, লড়াইয়েই যেখানে লড়াইয়ের শেষ।" এই প্রসঙ্গে বলে রাখি ভারতের কোন কোন সাহিত্য-সমালোচক আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য বোঝার পক্ষে টলস্টয়ের উপর লেখা লেনিনের প্রবন্ধগুলির গুরুত্ব সম্প্রতি উপলব্ধি করেছেন। যেমন, আখতার হোসেন রায়পুরী তাঁর "সাহিত্য ও জীবন" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের রক্ষণশীল মনোভাবের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেনিনের "লিও টলস্টয়, রুশ বিপ্লবের প্রতীক" নামক প্রবন্ধ থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত ক'রেছেন।

জনসাধারণের সঙ্গে প্রেমচাঁদও ছিলেন একাত্ম। তাই ভারতীয় জনসাধারণের মনে কী ভাবে আদর্শের পরিবর্তন ঘটছে, কী ভাবে তারা অতীতের সংস্কার ছেড়ে এগিয়ে আসছে, প্রেমচাঁদের রচনায় তা সহজেই ধরা পড়েছে। বস্তুনিষ্ঠ প্রেমচাঁদ তাই তাঁর সমাজগঠনের অবাস্তব ধারণাকে নিজেই পদে পদে খণ্ডন করেছেন। তাঁর লেখায়, বিশেষতঃ "প্রেমাশ্রম" ও "সংগ্রাম"-এর

মত রচনায় সমাজগত ও শ্রেণীগত দ্বন্দ্বের যথাযথ বর্ণনা আছে বলেই পাঠক আপনা থেকেই বুঝতে পারে, একজন জমিদারের ব্যক্তিগত ত্যাগে সমাজ-জীবনের কোন পরিবর্তন ঘটে না, প্রকৃত অবস্থার বর্ণনার মধ্যে দিয়ে যে পথের ইঙ্গিত ফুটে ওঠে সেই পথই সমাজসমস্যা সমাধানের পথ, লেখক নিজে যে পথের নির্দেশ দিয়েছেন, তা অস্পষ্ট ও অবাস্তব। তাঁর শেষ উপন্যাস "ত্যাগ"এ দেখি, গ্রাম্যজীবনের প্রতি প্রেমচাঁদের আসক্তি কমে এসেছে, শহরের খারাপ দিকগুলো তুলে ধরে গ্রাম্যজীবনের উৎকর্ষ প্রমাণের সে-উৎসাহ আর নেই। পরবর্তীকালের "প্রতারণা" উপন্যাসে দেখি শহরে জীবনের ভয়াবহ চিত্র। ভারতীয় সাহিত্য-রসিকদের মতে এই উপন্যাসখানি বিপ্লবাত্মক। এ বক্তব্য প্রেমচাঁদের সমস্ত রচনা সম্পর্কেই কমবেশি প্রযোজ্য, কারণ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের আদর্শ তাঁর সব লেখাতেই আছে। "প্রেমাশ্রম" উপন্যাসে প্রেমচাঁদ গ্রাম্যজীবনের দুঃখকষ্ট বর্ণনাপ্রসঙ্গে দেখাচ্ছেন গ্রামের লোকেরা আর পিছিয়ে নেই; ইওরোপ মহাদেশে রুশ বিপ্লবের মত যে সব বড় বড় ঘটনা ঘটছে, তাদের কাছেও তার খবর পৌঁছোচ্ছে। উক্ত উপন্যাসে কৃষকেরা বলাবলি করছে:

"দপৎ। বুঝি না কী যে ঘটল। জমি তার ফলন কমিয়ে দিচ্ছে কেন? আগেও জমি যা ছিল, এখনও তো তাই আছে, তবে আগে বিঘা-প্রতি যেখানে ২০।২৫ মন ফসল হত, এখন সেখানে পাঁচ মনের বেশি হয় না কেন?

মনোহর। এ ব্যাপার যদি সরকারের জানা থাকত, কৃষকদের জন্যে নিশ্চয় তারা ভাবত।

কাদির। তুমি কি মনে কর, সরকারের তা জানা নেই। প্রতি কণা ফসল তাদের হিসেবে লেখা আছে।

দপৎ। (কৌতুকছলে) তবে, বল না বলরাজকে, আমাদের তরফ থেকে ও যাক একবার সরকার বাহাদুরের কাছে আমাদের আর্জি নিয়ে।

বলরাজ। চাষাদের অপদার্থ মনে করে হাসছ, ভাবছ, তাদের জন্ম হয়েছে জমিদারের বেগারী খাটতে। কিন্তু, আমার কাছে রোজ খবরের কাগজ আসে, তাতে দেখেছি রুশিয়ায় চাষীরাই বাদশাহ হয়ে গেছে। কেবল নিজেদের জন্যে যতটুকু দরকার, তার বেশি কাজ তারা করে না। অল্প কিছুদিন হল সেখানকার কিষাণরা তাদের

রাজাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। রাজার জায়গায় তারা চাষীমজুরের পঞ্চায়েৎ গড়ে তুলেছে। একমাত্র এই পঞ্চায়েতের নির্দেশ তারা মানে।

কাদির। (উত্তেজিতভাবে) তাই নাকি ? তবে চল আমরাও সেদেশে যাই, সেখানে গেলে আর আমাদের খাজনা দিতে হবে না।"

প্রেমচাঁদ বিপ্লবী বলরাজের দলে। বলরাজ ন্যায়নিষ্ঠ, বলরাজ স্বাধীনতার সাধক। প্রেমচাঁদ দেখাতে চান, ভারতীয় কৃষকদের মধ্যে স্বাধীনতার জন্যে এই যে ব্যাকুলতা, তা কেবল জমিদারদের অত্যাচারের ফলেই জাগেনি, রুশ বিপ্লবের প্রভাবও এর অন্যতম কারণ। উদ্ধৃত অংশ থেকে সোভিয়েট সম্পর্কে প্রেমচাঁদের মনোভাব বুঝতে কষ্ট হয় না।

"সংগ্রাম" নাটকে এক কৃষক বলছে : "যতদিন আমরা স্বরাজ না পাচ্ছি, ততদিন অবস্থার উন্নতি নেই। যদি আমাদের দেশবাসীর ওপর দেশশাসনের ভার থাকত, তবে এই দুর্দিনে আমরা এত অসহায় বোধ করতাম না।" দেশের স্বাধীনতা ও স্বরাজ সম্বন্ধে প্রেমচাঁদ চিন্তা করেছেন সমস্ত ভারতবাসীর হয়ে। কোন বন্ধুকে লেখা এক চিঠিতে তিনি বলেছেন : "আমার নিজস্ব কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। আজকাল স্বভাবত আমার মনে একটি আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে উঠছে. স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের জয়ী হতে হবে। যশ, অর্থ, বাড়ি. গাড়ি—কিছুই আমি চাই না। আমার যা আছে তাতেই আমি খুশি। লেখক যখন, ভালো ভালো বই লেখার ইচ্ছা স্বাভাবিক, কিন্তু সে-সব বইএর একটি-মাত্র উদ্দেশ্য থাকবে—স্বরাজলাভ।"

প্রেমচাঁদ পরিষ্কারভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য কী এবং সেই উদ্দেশ্যসাধনে শ্রমিকের স্থান কোথায় ? নিজেকে তিনি মজুর বলে পরিচয় দিতেন। এতে তাঁর স্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, কাঁধে কোদাল নিয়ে খেতে তিনি কাজ করতে চান না কেন। স্ত্রীকে তিনি এই বলে উত্তর দেন : "কোদাল নিয়ে খেত চষতে যাই না বটে, তবু কোদাল দিয়েই আমি কাজ করি ; কলমই আমার কোদাল।" পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান কিছু কম ছিল না। স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহিত্য যে কত খানি সহায়তা করতে পারে, তা তিনি বুঝেছিলেন। প্রেমচাঁদ এমন সাহিত্য সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন যা পাঠকদের মনে নূতন উদ্দীপনা ও সাহস সঞ্চার করবে, যার দ্বারা তারা নিজেদের চিনতে পারবে। তিনি চেয়েছিলেন তাঁ

দেশের সাহিত্য নবজীবনের এমন এক জোয়ার আনবে যার স্রোতবেগে ভারতের সমাজদেহ থেকে অতীতের যা কিছু আবর্জনা, যা কিছু অন্ধ সংস্কার ধুয়ে মুছে যাবে। কোন এক বক্তৃতায় প্রেমচাঁদ বলেছিলেন: "পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের কল্যাণের জন্য যখনই নতুন কোন আন্দোলন দেখা দিয়েছে, সাহিত্য সে আন্দোলনের উপযোগী ক্ষেত্রই শুধু তৈরি করেনি, সেই ক্ষেত্রে বীজবপন ও জলসেচনও করেছে। সাহিত্য রাজনীতির পিছনে চলে না, সাহিত্য পতাকাবাহী, তার স্থান পুরোভাগে। প্রভুত্ব, অন্যায় ও আত্মসর্বস্বতার বিরুদ্ধে মানুষের মনে যে বিদ্রোহ জলে ওঠে, তার নাম সাহিত্য। লেখক শুধু এই বিদ্রোহকে ভাষায় রূপান্তরিত করে।"

প্রেমচাঁদ প্রগতি লেখক সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। কলমের হাতিয়ার দিয়ে তিনি লড়াই করে গিয়েছেন। তাঁর এক চিঠিতে তিনি লিখছেন: "আমি শান্তিতে বসে থাকতে চাই না, সর্বক্ষণ সাহিত্য ও দেশের জন্যে কিছু না কিছু করতে চাই।" এই কারণে তিনি ছিলেন পুরোপুরি কর্মী, কথার আঘাতে দেশবাসীর দুঃখ দুর্দশা মোচন করাই ছিল তাঁর সাধনা। তথাকথিত 'দেশসেবক' বা 'জাতির সেবক' তিনি ছিলেন না। এই ধরনের স্বার্থপর, ভণ্ড অসামাজিক নেতাদের নিয়ে তাঁর উপন্যাসগুলিতে যখনই সুযোগ পেয়েছেন ঠাট্টা করেছেন। প্রেমচাঁদ সবার সমান অধিকার প্রচার করে গিয়েছেন, এ বিষয়ে তার আন্তরিকতা সন্দেহাতীত। তাঁর জীবন খুব সুখের ছিল না, দুঃখকষ্ট ছিল তাঁর নিত্য সঙ্গী। বড়লোকের ঘরে তাঁর জন্ম হয়নি। মাত্র পনেরো বছর বয়সে তিনি পিতৃমাতৃহীন হন এবং ঐ বয়সে সংসারের সব দায়িত্ব একা তাকে বহন করতে হয়। রক্তের দিক থেকেও তিনি ছিলেন ভূমিদাস ও কৃষকদের সগোত্র। যারা ভাগ্যবিড়ম্বিত, দুঃখ যাদের নিত্যসঙ্গী, প্রেমচাঁদের রচনা কেবল তাঁদেরই উদ্দেশ্যে। কোন এক চিঠিতে তিনি লিখছেন: "কোন মহৎ ব্যক্তি বড়লোক হয়েও প্রকৃতিস্থ আছে, এ আমি কল্পনাও করতে পারি না। আমার উপর থেকে কোন শিল্পীর মনের বা তার শিল্পের প্রভাব সেই মুহূর্তে উঠে যায়, যখনই আমি জানতে পারি সে ব্যক্তি ধনী। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হয় এই ব্যক্তি বর্তমান সমাজব্যবস্থার একজন গোঁড়া সমর্থক, যে সমাজ-ব্যবস্থায় গরিবদের উপর বড়লোকদের অবাধ শোষণের অধিকার স্বীকৃত।...আমার ভাগ্য ও মনের গতি যে গরিবদের সঙ্গে আমাকে মিলিয়েছে এজন্যে সত্যিই আমি খুশি। মনের দিক থেকে এতে আমি শান্তি পেয়েছি।"

এই ভারতীয় লেখকের শেষের কথাগুলির সঙ্গে বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিকের অনুরূপ উক্তি তুলনা না করে পারা যায় না: "সাহিত্যিক ও মনীষীদের জনসাধারণের দুঃখের অংশ নিতে হবে, এর থেকেই তারা শান্তি ও সার্থকতার সন্ধান পেতে পারে।"

প্রেমচাঁদের প্রকৃতিতে কোন ফাঁক বা জটিলতা ছিল না, তাঁর কথাও যা কাজও তাই। সারাজীবন ধরে নিজে যা অর্জন করেছেন সাধারণের জন্যে সব দিয়ে গেছেন। বিখ্যাত কবি মৈথিলীচরণ গুপ্ত তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন: "আমাদের বর্তমানকে বাঁচিয়ে রাখতে তিনি নিজের ভবিষ্যৎকে উৎসর্গ করেছেন।" অসহযোগ আন্দোলনের সময় প্রেমচাঁদ সরকারী চাকরি থেকে ইস্তফা দেন, সে চাকরি থাকলে স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের কোন ভাবনা তাঁর থাকত না। 'হংস' ও 'জাগরণ' এই পত্রিকা দু'টির প্রকাশের দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর। মাসের পর মাস ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও পত্রিকাগুলির প্রকাশ বন্ধ করেন নি, অথচ তাঁর ব্যক্তিগত অবস্থা তখন সঙীন। তার গ্রামের হরিজনদের জন্যে তার পারিশ্রমিকের একটা মোটা অংশ ধার্য থাকত। মাহোবায় শিক্ষাদপ্তরে যে সময়ে তিনি কাজ করতেন সে সময়ে প্রচলিত রেওয়াজ অনুযায়ী কৃষকদের সরকারী কর্মচারীদের প্রত্যেককে বিনামূল্যে ঘি দুধ জোগান দিতে হত। প্রেমচাঁদ কখনও এ অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করেন নি।

প্রেমচাঁদ একদিকে যেমন ছিলেন অসাধারণ বিনয়ী, অন্যদিকে তেমন ছিলেন তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা। গোরক্ষপুরে তিনি ইস্কুল মাস্টারি করতেন। কখনও কখনও সেখানে ইস্কুল পরিদর্শকের আগমন হত। কোন একবার, ইস্কুল পরিদর্শনের দ্বিতীয় দিনে তার বাড়ির দাওয়ায় বসে তিনি খবরের কাগজ পড়ছেন এমন সময় সামনের পথ দিয়ে পরিদর্শক মশায় যাচ্ছেন। প্রেমচাঁদ ভ্রূক্ষেপও করলেন না এবং যেমন কাগজ পড়ছিলেন তেমনি পড়ে যেতে লাগলেন। পরিদর্শক এতে অপমানিত বোধ করে গাড়ি থামিয়ে তাকে বললেন: "আপনি তো আচ্ছা দাম্ভিক লোক! আপনার ওপরওয়ালা আপনার বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছে, তাকে সম্মান জানানোরও প্রয়োজন বোধ করেন না!" এর উত্তরে প্রেমচাঁদ বললেন: "যতক্ষণ আমি ইস্কুলে ততক্ষণ আমি চাকর, তার পরে, আমার বাড়িতে, আমি বাদশাহ্।"

এই অমায়িক প্রকৃতির লোকটির মধ্যে মিথ্যা বা ভণ্ডামির কোন স্থান ছিল না। প্রথম নজরে তাকে চোখেই পড়ত না। লেখার মধ্যে দিয়ে কুসংস্কার

ও জড়ত্বের সঙ্গে বরাবর যেমন লড়াই করে গেছেন, ব্যক্তিগত জীবনেও বিধি-নিষেধের শাসন তিনি মানেন নি। তাঁর বিধবা বিবাহ প্রচলিত সামাজিক সংস্কারের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ।

প্রেমচাঁদ সম্পর্কে তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের প্রধান অভিযোগ, তাঁর লেখায় ভালোবাসার স্থান নেই, তিনি শুধু ঘৃণাই প্রচার করেছেন এবং এই কারণে সাহিত্যিক হিসেবে তিনি স্বধর্মচ্যুত। বিরুদ্ধবাদীরা তার সম্বন্ধে লিখেছিলেন: "তিনি দেখিয়েছেন, যেখানেই অর্থ সেখানেই দুর্নীতি। প্রেমচাঁদ রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর সমসাময়িক হয়েও এইভাবে বিদ্বেষের বীজ ছড়াচ্ছেন, এ কথা ভাবলে বাস্তবিক দুঃখ হয়। দারিদ্র্য বা সম্পদ মানুষের চরিত্র গঠন করে না, ব্যক্তিগত চেষ্টা ও প্রয়াসেই তা গঠিত হয়।" এরূপ উক্তি প্রেমচাঁদের বিরুদ্ধবাদীদের মুখেই শোভা পায়।

ভারতের বর্তমান অবস্থায় প্রেমচাঁদের লেখার গুরুত্ব অনেক। বিষয়বস্তুর নিশ্চয়তার দরুন তাঁর লেখা পাঠকদের মনে মানবোচিত মর্যাদার উদ্রেক করে এবং সাহস সঞ্চার করে তাদের সংগ্রামী করে তোলে। তাঁর ঐতিহাসিক গল্পগুলিও বর্তমান ভারতের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। ইতিহাসের পাতায় তিনি আজকের মানুষের দুঃখবেদনার সন্ধান করে গেছেন। "পরীক্ষা" গল্পে তিনি দেশের রাজাদের দুর্নীতি ও চরিত্রহীনতার বর্ণনা করেছেন; দেখাচ্ছেন, আত্মীয়তাবোধ হারিয়ে কী ভাবে তারা দেশের শত্রুদের কাছে মাথা নত করল। ঐ গল্পে ভারতবিজয়ী নাদিরের মুখ দিয়ে ভারতীয় বাদশাহর অন্তঃপুরবাসিনীদের তিনি এই বলে তিরস্কার করছেন, "তার মত লুণ্ঠনকারীকে হত্যা করার চেষ্টামাত্র ওরা করল না! যার হারেমের মেয়েদের মধ্যে মান-ইজ্জতের এতটুকু বালাই নেই, তার মৃত্যু অনিবার্য।"

কথায় কথায় যারা ইংরাজী বুলি আওড়ায়, উপন্যাসে গল্পে যখনই সুযোগ পেয়েছেন সেই সব পরপদলেহীদের তিনি বিদ্রূপে জর্জরিত করেছেন। "সেবা সদন" উপন্যাসে মিউনিসিপ্যালিটির কয়েকজন সদস্যকে এই রকম দেশী সাহেবরূপে চিত্রিত করেছেন। বিদ্রূপের মধ্যে দিয়ে প্রেমচাঁদ এই সব মেকি-সমাজ সেবকদের প্রতি জনসাধারণের অবিশ্বাস ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রেমচাঁদের চিঠিগুলির মধ্যেও প্রেমচাঁদের প্রকৃতির ছাপ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। বর্ণনাতীত 'অনাত্মতা' তিনি স্বীকার করতেন না। ব্যঙ্গ, কৌতুক, শ্লেষ তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে।

বিদ্রূপাত্মক নাটক 'সংগ্রাম' থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে দেখাচ্ছি—প্রেমচাঁদ কীভাবে পুলিশীরাজের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। জমিদার সবল সিং-এর বাড়ি পুলিস খানাতল্লাসি করছে। এই জমিদার প্রজাদের মধ্যে তার জমি বিলিয়ে দিয়েছে। খানাতল্লাসির ফলে কিছু বই ও কাগজপত্র পাওয়া গেছে। পুলিসের দারোগা ইংরেজ অফিসারের কাছে সেগুলো দেখিয়ে বলছে : "দেখুন স্যার এ সব পঞ্চায়েতের কাগজপত্তর, সভ্যদের নাম এতে লেখা আছে।

অফিসার। ভীষণ দরকারি জিনিস।

দারোগা। এই যে পঞ্চায়েত সম্পর্কে সেই প্রবন্ধ।

অফিসার। খুব দরকারি—

দারোগা। আরও দেখুন স্যার, জাতীয় নেতাদের ছবি সমেত একটা ছবির বই।

অফিসার। অত্যন্ত দরকারি।

দারোগা। আরও কতকগুলো বই দেখছি। ম্যাটসিনির রচনা সংগ্রহ, কেয়ার হার্ডির "ভারত ভ্রমণ", "চিত্তশুদ্ধির বিবরণ", টলস্টয়ের গল্প-সংগ্রহ।

অফিসার। সবগুলোই দরকারে লাগবে।

দারোগা। আর সম্মোহনবিদ্যা সম্বন্ধে এই বইখানা।

অফিসার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা বিশেষ দরকারি বই।

দারোগা। এখানে এক বাক্স ওষুধ রয়েছে।

অফিসার। চাষাদের হাত করার ফন্দী। ওটাও খুব দরকারে লাগবে।

দারোগা। দেখুন স্যার একটা ম্যাজিক লণ্ঠন।

অফিসার। তাই নাকি, ভয়ানক দরকারি জিনিস।

কনেস্টবল। হুজুর, বাগানে একটা কুস্তির আখড়া রয়েছে।

অফিসার। এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর হয় না...

২নং কনেস্টবল। হুজুর, আখড়ার পাশেই একটা গোয়ালঘর দেখতে পাচ্ছি, তাতে অনেক গরু, মোষ রয়েছে।

অফিসার। ও বুঝেছি, দুধ খাওয়া হয়, যাতে গায়ে জোর করে দেশদ্রোহের কাজে লাগা যায়! অব্যর্থ প্রমাণ। সবল সিং, আপনাকে গ্রেফ্‌তার করলাম।"

প্রেমচাঁদের রচনা থেকে এত খবর পাওয়া যেতে পারে যা সম্পূর্ণ উদ্ধার করা সাধ্যাতীত। ভারতীয় মনীষীদের মধ্যে প্রেমচাঁদ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। প্রথম মহাযুদ্ধ, রুশবিপ্লব এবং গনতন্ত্রের ক্রমবিকাশ ভারতবাসীর চেতনায় যে বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছিল, প্রেমচাঁদের রচনায় তা লিপিবদ্ধ রয়েছে। কৃষকদের নানা ভাবান্তর, তাদের রাগ দুঃখ সংগ্রামের প্রতিটি ইতিবৃত্ত তিনি তাঁর লেখায় ধরে রেখেছেন। বাস্তববাদিতায়, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এবং রচনাকৌশলে তাঁর উপন্যাসগুলি একালের ঔপনিবেশিক জীবনধারার আলেখ্য হয়ে থাকবে। এখনও পর্যন্ত তার রচনার যথার্থ অনুশীলন ও মূল্য নির্ধারণ হয়নি।

ভারতের এই বিপ্লবী লেখক তার যথোচিত মর্যাদা যদি না পেয়ে থাকেন এবং নিকট ভবিষ্যতেও যদি না পান, তার কারণ সহজবোধ্য এবং সুবিদিত। একমাত্র আমাদের দেশেই,—যেখানে দেশকাল-নির্বিশেষে সমস্ত সাহিত্যিক সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত, লেনিন ও স্টালিনের বিচক্ষণ জাতীয়নীতির দৌলতে যেখানকার মানুষের জীবন নিরুদ্বিগ্ন,—প্রেমচাঁদের রচনা গভীর গবেষণার বিষয় হতে পারে। এ বিষয়ে প্রাথমিক কাজ এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। ভবিষ্যৎ কর্মতালিকায় আছে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির অনুবাদ করা এবং নানাদিক থেকে তাঁর রচনার বিচার করা। এর মধ্যে থাকবে তাঁর সাহিত্যিক রচনা ও নানা জায়গায় লেখা সমালোচনা ও সাময়িক প্রবন্ধ।

অনুবাদ : সুনীল চট্টোপাধ্যায়

পারবে না এদের সঙ্গে

সতীনাথ ভাদুড়ী

[শেঠজীর গদি। কুলুঙ্গীর মধ্যে গণেশ-মূর্তির নীচে বড় বড় দেবনাগরী অক্ষরে সিঁদুর দিয়া লেখা "মুনাফা"; জনকয়েক অবাঙালী কর্মচারী ছোট ছোট জলচৌকির সম্মুখে হিসাবের খাতা খুলিয়া গল্প করিতে বসিয়াছে। বৃদ্ধ কেরানী টিকমচাঁদ দেওয়ালের লেখাটিকে ধূপধুনা দিয়া প্রণাম করিবার পর ধূপচিটি কুলুঙ্গিতে রাখিয়া দিল]

১ম কেরানী। কাল ফাটকা দরটা নেবে গেল হঠাৎ একেবারে।

২য় কেরানী। কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি।

৩য় কেরানী। আরে কতই বা নেবেছে। এক টাকা নামাকে আর নামা বলে না।

(হাফপ্যাণ্ট হাফসার্ট-পরিহিত ফণীর প্রবেশ)

ফণী। নমস্কার! নমস্কার! এক মিনিটও সময় নষ্ট নেই বাবা! এসেই ফাটকা দরের হিসেব আরম্ভ করে দিয়েছেন। যেন এই প্রেমের গপ্পো-টুকু না করতে পেরে রাত্তিরে ঘুম হয়নি ভাল করে। মাসকাবারে মাইনে পাই; ফাটকার দরে আমার আপনার দরকার কি মশাই? সে বুঝুকগে মালিকরা।

টিকমচাঁদ। জয় গণেশ। ফণীবাবু, জয় গণেশ!

১ম কেরানী। নমস্তে ফণীবাবু, নমস্তে।

৩য় কেরানী। আরে, ফণীবাবু কি আর জয় গণেশ, নমস্তের লোক। ও হচ্ছে অংরেজী-পড়া লোক; ওকে বলতে হয় গুড্ মর্ণিং।

(সকলের হাস্য)

৪র্থ কেরানী। ঠিক ঠিক ঠিক। ঠিক বলেছ। প্যাণ্টপরা লোককে কি আর গুড মোর্ণিং ছাড়া অন্য কিছু বলা চলে!

ফণী। শখ করে কি আর খাঁকির হাফপ্যাণ্ট প'রি দাদা। আজকাল সত্তর টাকা মাইনেতে কি ধুতি কিনে পরা যায়—যদি বড়লোক শ্বশুর না থাকে তো? শুধু ধোপার খরচেই যে বিকিয়ে যাব।

টিকমচাঁদ। শেঠজী কিন্তু গদির মধ্যে সাহেবিয়ানা অপছন্দ করেন।

ফণী। সাহেবিয়ানা মানে!

টিকমচাঁদ। মানে, এই প্যাণ্ট পরা, এখানে ঐ 'থারমফ্লাস্' না কি যেন বলে তাতে করে চা নিয়ে আসা, এই সব আর কি।

ফণী। খাঁকির হাফ-প্যাণ্ট পরা সাহেবিয়ানা? আপনাদের ছোট মালিক বিরিঞ্চিলাল বাবু যে রোজ সাহেবী হোটেলে গিয়ে মুরগী ওড়াচ্ছেন সে বেলায় কিছু না; আর জলখাবারের পয়সা জোটে না বলে আমি চা খাই, সেইটাই হয়ে গেল দোষ?

টিকমচাঁদ। 'আপনাদের ছোট মালিক' বলছ কেন? বিরিঞ্চিবাবু শুধু আমার ছোট মালিক নয়, তোমারও ছোট মালিক।

১ম কেরানী। বিরিঞ্চিবাবু হলেন কোটি টাকার মালিক। তাঁর যা করা সাজে তা কি তাঁর সত্তর টাকা মাইনের চাকরেরও সাজে?

৩য় কেরানী। মালিক খানা খায়, তাতে তোমার চোখ টাটায় কেন?

২য় কেরানী। সেও তো এই ব্যবসারই জন্যে। সাহেবসুবো, নেতা, হাকিম —এদের খানা না খাওয়ালে ব্যবসা চলে না কি?

৪র্থ কেরানী। হাকিম হুকম হাতে রাখা, এটা কি একটা সোজা কাজ না কি ভেবেছ? একটা কারবার চালানো কি চাড্ডিখানি কথা।

টিকমচাঁদ। ছোট মালিক গদির মধ্যে তো আর অনাচার করতে আসেন না? গদি হল একরকম গণেশজীর মন্দির। গণেশজীর সমুখে তো আর বিরিঞ্চিবাবু অখাদ্য-কুখাদ্য খান না?

ফণী। মন্দিরই বটে। শেঠজী যখন খয়নি খেয়ে গণেশজীর নাকের সমুখে প্যাচ প্যাচ করে থুতু ফেলেন, তখন আপনারা কোন দিকে তাকিয়ে থাকেন? আপনারা গদির মধ্যে বসে আচার আর পাঁপড় খেলে অনাচার হয় না? ইনকাম ট্যাক্সের লোক গদিতে এলে তাকে চা খাওয়াতে দোষ হয় না? যত দোষ আমি গদিতে চা খেলে? সত্তর টাকা মাইনে পাই বলে?

৩য় কেরানী। আরে ফণীবাবু চটো কেন? আমি তেরো বছর কাজ করবার পর আজ বাষট্টি টাকা মাইনে পাই। তুমি তিন বছর কাজ করেই পাচ্ছ সত্তর টাকা, শুধু তোমার ঐ প্যাণ্টের জোরে। তুমি হাফ-

প্যাণ্ট পরলে মালিক অপছন্দ করবেন, আবার না পরলে মাইনে কমিয়ে দেবেন। বুঝি তাই আমি সব, কাশীবাবু।'

ক্ষণী। (রাগত স্বরে) কাশীবাবু! কাশীবাবু! জিভের ডগাটায় আরও খানিকটা বেশী করে ঘি আর লঙ্কা মালিশ করবেন, তাহলে উচ্চারণ ঠিক বেরুবে! ক্ষণী কথাটা উচ্চারণ করতে পারে না, এসেছে বুকনি ঝাড়তে!

টিকমচাঁদ। আহা-হা চটো কেন কাশীবাবু! এতটুকু ঠাট্টা বোঝো না!

ক্ষণী। ঠাট্টা কি! খাঁতে ঘা মারা কথা ব'লে ঠাট্টা! বেশী ঘাঁটাবেন না বলছি আমাকে! এমনিই আজ আমার মাথার ঠিক নেই—সারা রাত জাগতে হয়েছে—ছোট বোনটার টাইফয়েড চলছে আজ সতর দিন। যাক, সে সব আপনাদের এই 'মুনাফা' ঠাকুরের মন্দিরের যোগ্য কথা নয়। —যতই জবজবে করে এখানকার তেল মাথায় ঢালো না, ঐ মরুভূমিভরা মগজগুলি টাকার ঝনঝনানি ছাড়া আর অন্ত কোন আওয়াজে সাড়া দেবে না!—তেল মেখেছে দেখো না মাথায়!

[হঠাৎ শেঠজীর কাশি শোনা যাওয়ায় সকলে নিজের খাতায় মুখ গুঁজিয়া বসিল। শেঠজী ঢুকিয়া 'মুনাফা' কথাটিকে প্রণাম করিলেন]

শেঠজী। জয় গণেশ! জয় গণেশ! (গদিতে বসিয়া) তোমরা এখানে এসেই এ আরম্ভ করেছ কি? (ঘড়ি দেখিয়া) পনেরো মিনিট সকলে কাজে ফাঁকি দিলে আমার লোকসান কত হয় তার হিসাব রাখো? এই গদির জন্ত খরচ ১০৮০০৲; মাসিক খরচ ৯০০৲; দিনে পড়ল তিরিশ টাকা; দশ ঘণ্টা করে তোমাদের কাজের ডিউটি; ঘণ্টায় পড়ল তিন টাকা; পনেরো মিনিটে হল বারো আনা। কত ধানে কত চাল তা তোমরা বুঝবে কেমন করে? এই পনেরো মিনিট দেরির জন্ত কত টাকা ফসকে বেরিয়ে যেতে পারে জানো? সে সব লোকসানের কথা তো হিসেবের থেকে বাদই দিলাম।...দেখি টিকমচাঁদ চিঠিপত্তর কি সব এসেছে। সে রকম জরুরী কিছু নেই তো? বাংলা আর ইংরিজী চিঠি-গুলোকেই দাও আগে। বাকিগুলো তুমি একবার পড়েছো তো? কোথায়—ও মিস্টার কাশী, পড় তো এগুলো।

ক্ষণী। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) দেখুন, আমাকে মিস্টার বলে ঠাট্টা করেন কেন বলুন তো?

টিকমচাঁদ। এই ফাণীবাবু।...

শেঠজী। (হাসিয়া) তুমি হাফ প্যান্ট পরো; তোমাকে মিস্টার ফাণী বলব না তো বলব কাকে?

ফণী। হাফপ্যান্ট পরি তাতে হয়েছে কি? কলেজে পড়বার সময় তো ফুল-প্যান্ট পরতাম। ইংরিজীতে 'ফাণী' কথাটার মানে জানেন? গদির সব আমলারা আমায় ফাণীবাবু বলে ডাকে। আমি ভাবতুম বুঝি এটা হিন্দী ফাণী। এখন দেখছি তা তো নয়। এ দেখছি ইংরিজী 'ফানী'। বাবুর সঙ্গে ফাণী কথাটা বললে যা মানে হয়, ইংরিজী মিস্টারের সঙ্গে বললেও তাই মানে হবে?...তাই বলো।...ইংরিজী Funny।...

শেঠজী। ইংরিজী কথাই যদি জানব, তবে আর তোমায় পিছনে মাসে সত্তর টাকা করে খরচ করব কেন?

ফণী। সত্তর টাকা দিচ্ছেন বলে কি আমায় কিনে নিয়েছেন? যা ইচ্ছে তাই বলবেন?—আমাকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করবেন? কর্মচারীকে তুমি না বলে আপনি বলা যায় না? নিজের ছেলেকে তো এদিকে আপনি বলা হয়! সত্তর টাকা দেখাতে এসেছেন! অমন সত্তর টাকা—

টিকমচাঁদ। করছ কি ফাণীবাবু? নিমক খেলে তার দাম দিতে হয়।

ফণী। হয়েছে—হয়েছে! যথেষ্ট হয়েছে। আপনি থামুন তো! সত্তর টাকার নিমকের দাম আমি তিন তিন করে দিচ্ছি চার বছর ধরে। কাজের কথা ছেড়ে দাও, দৈনিক দশ ঘণ্টা করে তোমাদের সঙ্গে এই মুনাফার মন্দিরে বসে কাটানোর মজুরীই সত্তর টাকার চাইতে বেশী। তোমার মাসিক ছিয়াশি টাকার নিমকের দাম তুমি হুজুরের মাথার পাকা-চুল তুলে, হুজুরের খয়নির থুতু চেটে, হুজুরের নাকে ধুপধুনো দিয়ে, যেমন করে ইচ্ছে শোধ করো না কেন।—অন্তর ব্যাপার নিয়ে কেন মাথা ঘামাতে আসো?

কেরানীরা। 'মুখ সামলে কথা বলো বলছি!'

'দারোয়ান!'

'বড় তেল বেড়েছে!'

'ছোট মুখে বড় কথা।'

শেঠজী। থামো থামো! চুপ করো। তোমরা সকলে উঠে দাঁড়িয়েছ কেন? ব'সো। কথা হচ্ছে আমার সঙ্গে আর মিস্টার ফাণীর

সঙ্গে—তোমাদের কি এর মধ্যে? হ্যাঁ, শোনো মিস্টার ফণী, তোমার যদি ধারণা থাকে যে তোমার দর সত্তর টাকার বেশী, তাহলে সে ভুল ধারণা বদলে ফেলতে চেষ্টা করো। এখানে সকলের দর কেনা আছে কড়ায় ক্রান্তিতে। হিসেব দেখতে চাও? ধরো, তোমার কথা। মাইনে ৮৪০৲ হলে মাসে পড়ল সত্তর টাকা—দৈনিক পড়ে দু টাকা পাঁচ আনা চার পাই। বাংলার চিঠি আসে গড়পড়তা পাঁচ খান—পাঁচ দুগুণে দশ আনা। ইংরিজী চিঠি দৈনিক দু'খান—ধরো এর জবাব লিখতে তোমার মজুরী চিঠি-পিছু তিন আনা—তিন দুয়ে আঠারো আনা। সরকারী গেজেট, আর ইংরিজী কাগজে প্রকাশিত নতুন আইন-টাইন পড়ে বুঝিয়ে দেওয়া, বাঙালী ইনকাম-ট্যাক্স কি সেল-ট্যাক্সের হাকিম এলে তাদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলা এই সবের জন্ত ধরো দৈনিক পড়ে আট আনা। সব মিলিয়ে হলো দু টাকা চার আনা। তুমি পাচ্ছ দু টাকা পাঁচ আনা চার পাই। রোজ এক আনা চার পাই করে ফাউ দিচ্ছি,—বকশিশ। কার কি বাজারদর সেইটা বুঝতে না পারাতেই আজ দেশ জুড়ে এত অশান্তি। নিজের দর নিজে ফেললে সব সময় ভুল হয়।

ফণী। যেটা অন্তকে বলা হয়, সেটা নিজের উপর লাগিয়ে দেখলেই তো হয়!

শেঠজী। সেইটা দেখেই বলা হচ্ছে। আমিও ছোটবেলায় বছরে ছিয়ানব্বই টাকা মাইনেতে হাউমল ঢেকামলের গদিতে কাজ করেছি। ('মুনাফা' লেখাটিকে প্রণাম করিয়া) সকলকার ন্যায্য বাজারদর ফেলবার মালিক হচ্ছেন ঐ ঠাকুর। কারও উপর ওঁর একচোখোমি নেই। আর এক কথা—বড় মানুষের বেশী রোজগারটাই তোমাদের চোখে পড়ে। তাদের খরচের তো হিসেব রাখো না।

ফণী। খুব রাখি! খুব রাখি! পাঁপড় আর আচারের হিসেব খুচরো পয়সাতেই রাখা যেতে পারে—তার জন্ত টাকার আর নোটের দরকার পর্যন্ত হবে না। হিসেব শোনাতে এসেছে! উপদেশ শুনতে শুনতে ছোটবেলা থেকে কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছে, বুঝেছেন!

শেঠজী। মিস্টার, আরও একটু শুনে নাও; ক্ষতি হবে না তাতে। টিকমচাঁদের মাসিক ছিয়াশি টাকা মাইনের কথা তুমি তুললে বলেই বলছি।

ও হচ্ছে গদির সবচেয়ে পুরনো কর্মচারী। গদির হাজার হাজার টাকার হিসেব ওর হাত দিয়ে বার হয়েছে। তবু ও নিজের দর জানে। ওর আসল মাইনে হওয়া উচিত ছিল মাসে একাত্তর টাকা—তোমার চেয়ে এক বেশী, সবচেয়ে পুরনো কর্মচারী বলে। সকালে সন্ধ্যাতে গদির ঐ গণেশজী আর মুনাফা ঠাকুরের (প্রণাম করিয়া) পূজো করে বলে ও-পায় আরও পনেরো টাকা। সব মিলিয়ে ছিয়াশি টাকা। পূজারী রাখতে গেলেও আমাকে মাসে পনেরো টাকা করে দিতে হত। কিছু একচোখোমি নেই এর মধ্যে। বুঝলে?

ফণী। না না সে কথা তো আমি বলিনি; আপনি ভুল বুঝছেন। আমি এদের হিংসে করি না—আমার মায়া হয় এদের দেখে।

শেঠজী। মিস্টার ফাণী—অন্তর অত মায়া-মমতা আর একটু কম খরচ ক'রো। ওগুলো বড় গোলমেলে জিনিস; হিসাবে গণ্ডগোল করিয়ে দেয়।

ফণী। আপনি তো এদিকে অনেক হিসেব-টিসেব কষে সব কর্মচারীর দর ফেলে বসে আছেন। কিন্তু বড্ড আঁটুনি ফসকা গেরো। আপনি কি খোঁজ রাখেন যে আপনার পেয়ারের এই সব বিশ্বাসী আমলারা মনে করে যে তাদের বাজারদর আরও বেশী? সেটাকে পুষিয়ে নেবার জন্ত আপনার অন্দরমহল থেকে আনা আচার বড়ি, পাঁপড়, আমসত্ব আরও কত জিনিসের কারবার করে এরা আধাআধি বখরাতে?

শেঠজী। অন্দরমহল থেকে? আমার বাড়ির!

ফণী। হ্যাঁ, হ্যাঁ!. আপনার বাড়ির! বুঝেছেন এইবার কথাটা?

টিকমচাঁদ। ফণীবাবু!

২নং কেরানী। মিছে কথা বললে কি জুতিয়ে মুখ ভেঙে দেব!

৩নং কেরানী। হুজুর এই সাহেবের বেটাটার কথা একটাও বিশ্বাস করবেন না।

৪নং কেরানী। মিথ্যেবাদী কোথাকার! জিভ টেনে বার করে নেব!

শেঠজী। (কেরানীদের প্রতি) তোমরা আবার সবাই উঠে এলে? যাও নিজের নিজের জায়গায় বসগে যাও। (ফণীর প্রতি) মিস্টার ফণী, তুমি আমাকে এ সব খবর কী দেবে! প্রত্যেকের দর ফেলবার সময় মনে মনে এ সব জিনিসেরও হিসেব করা আছে, এ তুমি নিশ্চয় জেনে রেখে দিও। ...তবে আমি বুঝছি যে তোমার আর এখানে পোষাবে না।

(সিন্দুক খুলিয়া) এই নাও তোমার তিন মাসের মাইনে। এই গদিতে বসে আর কষ্ট করবার দরকার নেই তোমার।

ফণী। আপনি আমায় বরখাস্ত করলেন নাকি? যে কর্মচারী চুরি না করে তাকে রেখো না—এও কি ঐ মুনাফা ঠাকুরের হুকুম নাকি? (প্রস্থানোদ্যত) তোমার মতো লোককে চাকরির জন্য পায়ে ধরতে যাবো, তেমন মানুষ এই ফণী চাটুজ্যেকে পাওনি। না খেতে পেয়ে মরলেও তোমার মতো চশমখোরের খোশামোদ করতে পারব না। তোমার গদির নাড়ীনক্ষত্র আমার জানা। সব আমি ফাঁশ করব—পাবলিকের কাছে, গভর্ণমেন্টের কাছে। দেখে নেবো তোমাকে আমি, এই বলে রাখলাম। লালবাতি দেখেছ—লালবাতি? দেয়ালের ঐ মুনাফা লেখাটাকে আমি লোকসান লিখিয়ে তবে ছাড়ব; ঐ গণেশকে উলটে তবে আমি ছাড়ব।

শেঠজী। মিস্টার ফণী, আমি চাই কোনও গদিতে আর যেন তোমায় হাঁটু মুড়ে বসতে না হয়। ফুলপ্যান্ট পরে চেয়ারে বসবার চাকরি কোথাও যেন তোমার জুটে যায়। জয় গণেশ। জয় গণেশ।

ফণী। সব জয় গণেশ আমি বার করছি। হাটে হাঁড়ি ভাঙবো। ফণী চাটুজ্যেকে চেনো না—

[ফণীর প্রস্থান]

শেঠজী। টিকমচাঁদ।

টিকমচাঁদ। হুজুর—

শেঠজী। কি দেখাশুনো করো তুমি তাও তো বুঝি না! বাড়ির চাকর-বাকরদের বদলে দিলে হয় না?

টিকমচাঁদ। না হুজুর, তাদের দোষ নেই—

শেঠজী। বৌমার ঝিটা?

টিকমচাঁদ। না হুজুর—

শেঠজী। না হুজুর, না হুজুর, বলেই ফেলো না পরিষ্কার করে। বিরজুর মার দাইটা বুঝি এই শয়তানি আরম্ভ করেছে?

টিকমচাঁদ। হুজুর, সেইটাই আনে বটে ভিতর দেখে জিনিসটিনিসগুলো—তবে, তবে—তবে—

শেঠজী। (ভেংচি কাটিয়া) তবে, তবে। তবে আমাকে একথা আগে বলনি কেন?

টিকমচাঁদ। না হজুর ব্যাপার তা নয়।

শেঠজী। এ যে দেখি ধাঁধাতে কথা বলতে আরম্ভ করলে।

টিকমচাঁদ। বলতে লজ্জা করছে হজুর।

শেঠজী। ও তাই বলো। (চাপা গলায়) বিরজুর মা?

টিকমচাঁদ। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) হজুর—

শেঠজী। দেখ একবার কাণ্ডখানা! জয় গণেশ! জয় গণেশ। যাকগে একথা যেতে দাও।—আচ্ছা চটর্জীরা বামুন?

টিকমচাঁদ। শুনেছি তো সেই রকম। তবে এর শাপে ভয়ের কোন কারণ নেই—একে মাছ খায়, তার উপর মোটে সত্তর টাকা দরের বামুন।

শেঠজী। (সহাস্তে) আমিও ঠিক এই কথাই ভাবছিলাম। এমন করে আমার প্রাণের কথা আর কেউ বোঝে না। সেই জন্তই না তোমাকে এত ভালবাসি!

টিকমচাঁদ। সে হজুরের মেহেরবানি। কতটুকুই বা কালীবাবু জানে আপনার খাতাপত্রের? আপনি কিছু ঘাবড়াবেন না। ট্যাঁকে নেই চারটে পয়সা, ঐ চুনোপুঁটি আবার আসে আপনাকে ভয় দেখাতে—বলে গণেশ উলটোবে! হেঃ!

শেঠজী। (হাসিয়া) মাছখোররা জানবে কি করে যে দোকানের গণেশ আসল গণেশজী নয়—তিনি থাকেন বাড়ির ভিতরে। জয় গণেশ! জয় গণেশ! যাক যাক! খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দিয়ো তো—বাংলা-ইংরাজী-জানা লোকের জন্ত। না দিলেও চলে না, আবার দিলেও এই নিত্যি খেচামেচি। বিজ্ঞাপনে লিখে দিও প্যাণ্টপরা লোক কেউ যেন দরখাস্ত না দেয়।

টিকমচাঁদ। জী হজুর। আর চায়ের কথাটাও লিখবো না কি?

শেঠজী। না না ওটা দেবার দরকার নেই, বিরজু চটবে। যে ছেলে এই বয়সেই বাপের কারবারের আয় সওয়া লাখ টাকা বাড়াতে পেরেছে, তার পছন্দ অপছন্দর কথাও একটু ভাবতে হবে বই কি। সে আবার হল আজকালকার ছেলে! জয় গণেশ! জয় গণেশ! (অন্তান্ত কেরানীদের) আর শোনো, তোমাদেরও বলে রাখি; ফের যদি কোনদিন শুনি যে আমার বাড়ির ভিতরের কোনও জিনিস, তোমাদের হাত দিয়ে বিক্রি হয়েছে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমি তোমাদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করব।

যত কিছু বলি না, ততই সবাই মাথায় চড়ে বসছ! যেমন হয়েছ তোমরা, তেমনি হয়েছেন—

জয় গণেশ! জয় গণেশ!

দ্বিতীয় দৃশ্য

(শেঠজীর বাড়ির অন্দরমহল। শীতের সকাল। দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে রক্ষিত গণেশের মূর্তিকে প্রণাম করিয়া শেঠজী গদিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। হাসিতে হাসিতে গঙ্গাস্নান-প্রত্যাগত শেঠগৃহিণী প্রবেশ করিলেন।)

শেঠজী। জয় গণেশ! জয় গণেশ!

শেঠগৃহিণী। (গঙ্গাজল শেঠজীর গায়ে ছিটাইয়া) জয় গঙ্গে! জয় গঙ্গে! আজ অনেক লাভ হোক। কাল রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছি যে শিগ্‌গিরই তোমার একটা মোটা টাকা লাভ হবে।

শেঠজী। আরে বাবা অত ভনিতা কেন—সদ্য গঙ্গাস্নান করে আসছ। সোজা কথাটা বলেই ফেলো না। কি চাও? কিছু কেনবার দরকার আছে?

শেঠগৃহিণী। কথা বলতে গেলেই অমন হাঁ হাঁ করে ওঠো কেন বলো তো? কখনও কি একটা ভাল করে কথা বলতে নেই?

শেঠজী। আচ্ছা, আমার ত্রুটি হয়েছে স্বীকার করছি। এবার হল তো। এখন তোমার কি বলবার আছে বলো।

শেঠগৃহিণী। বলছিলাম কি,—এই গঙ্গাস্নান করে ফেরবার সময় দেখলাম একটা লোক ঝুড়িতে করে লেবু বিক্রি করছে। এত বড় বড় পাতিলেবু। বেশ পাকা পাকা। রস যেন ফেটে বেরুচ্ছে। সুন্দর লেবুজারা হবে। তাই তাকে সঙ্গে ডেকে আনলাম। গদিতে দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে গিয়ে লেবুগুলো নিয়ে, দাম দিয়ে দিও।

শেঠজী। এমনি যে একটা কিছু আছে তা আমি আগেই বুঝেছিলাম। তা এক ঝুড়ি লেবু কি হবে?

শেঠগৃহিণী। (রাগত স্বরে) আমি যেন আমারই জন্যে আচার তয়ের করি! ঝুড়ি ঝুড়ি লেবুজারা কি আমি একাই খাই না কি? না আমার বাপের

বাড়ি পাঠাই ? ভাবলাম বিরজু লেবুআরা খেতে ভালবাসে—নিতে হবে না লেবু ! ফিরিয়ে দিও লোকটাকে ! এই কে আছিস ! যাই, বলে আয় বাইরে গিয়ে লেবুওয়ালাটাকে চলে যেতে। হল তো ? খুব এতে গদির সুনাম বাড়বে ! সেই ছোটবেলায় এই সংসারে আসার পর থেকে একদিনের জন্যও কি শান্তি পেলাম !

শেঠজী। আহা চেঁচাও কেন—এই সকাল বেলায়।

শেঠগৃহিণী। চেঁচাই কি আর সাধে ! গলায় দড়ি জোটে না বলেই চেঁচাই। সামান্য এক ঝুড়ি লেবু কেনা নিয়ে এই বুড়ো বয়সেও এত কথা শুনতে হবে ? আমি কি বুঝিনি যে তুমি কোথায় ঠেস দিয়ে কথা বললে ? এত কানপাতলা লোক তুমি ? কবে একবার হতভাগা কালীটা, লুকিয়ে আচার বিক্রি করা নিয়ে আমার নামে কি কেন লাগিয়েছিল তোমার কাছে—সারা জীবন কি আমায় তার জন্যে খোঁটা খেতে হবে ?...কেন আমায় এখনও বাঁচিয়ে রেখেছ মুনাফা ঠাকুর ! কেন আমার জীবনটাকে এখনও খরচের খাতায় লিখে দিচ্ছ না গণেশজী !

শেঠজী। আঃ। আমি গদিতে যাব, তবে তো লেবুর দাম দেব ! না এখান থেকেই দিয়ে দেব ! একবার যে কথাটা ধরবে—

শেঠগৃহিণী। (হাসিয়া) ধরতে আমার হয় কেন ? গদিতে গিয়ে দামটা দিয়ে দেবে বললেই মিটে যেত। তাহলে কি আর কোন কথা উঠত ? মিছামিছি গঙ্গাজলের ঘটি হাতে এত কথা আমায় বলালে।

(হঠাৎ নীচে মটর হর্নের শব্দ শোনা গেল)

শেঠজী। বিরজুর গাড়ির শব্দ না ?

শেঠগৃহিণী। হাঁ তাই তো !]

শেঠজী। এই তো খানিক আগে বেরুলো ! এখনই ফিরে এল !

শেঠগৃহিণী। নাও, তুমি শিগ্‌গির কোটটা গায়ে দিয়ে নাও। আবার তুমি তুলোর মেরজাইটা পরে গদিতে যাচ্ছিলে দেখলে, সে ছেলে এখনই এসে কাটাকাটি করবে।

শেঠজী। (কোট গায়ে দিতে দিতে) যত সব আজকালকার ছেলেদের খেয়াল ! খালি গায়ে গদিতে ব'সে ব'সে কতকাল চালিয়ে এলাম, আজ মেরজাই গায়ে দিয়েও চলবে না ! গদির ইজ্জত নাকি নষ্ট হয় ! দেখ দিকি, অত্যাচার !

শেঠগৃহিণী। যে গোরু দুধ দেয়, তার চাটও সহ্য করতে হয়। সওয়া লাখ টাকা আয় বাড়িয়েছে বিরজু বছরে।

শেঠজী। তুমিই তো নাই দিয়ে দিয়ে ছেলের মাথাটা খেয়েছ। আরও কিছু টাকা রোজগার করতে পারলে তোমার ছেলে তো বোধহয় গদির গণেশ ঠাকুরকেই সরিয়ে ফেলবার হুকুম দেবে।

শেঠগৃহিণী। কি যে বলো। অত অবুঝ বিরজু আমার নয়।

শেঠজী। আচ্ছা দেখে নিও। এই আমি বলে রাখলাম। আর পাঁচ-দশ লাখ টাকা রোজগার করবার পর বিরজু যদি গদি থেকে গণেশ ঠাকুরকে সরিয়ে ফেলতে না বলে, তা হলে আমার নামে কুকুর পুষো, তাহলে আমি লঙ্কা খাওয়া ছেড়ে দেব; তাহলে যেন ইনকাম ট্যাক্সের হাকিম আমার আসল হিসাবের খাতার সন্ধান পায়।

শেঠগৃহিণী। এই সকালে কি যে অমঙ্গুলে কথা তুমি বলতে আরম্ভ করলে! আগে বিরজু আরও দশ লাখ টাকা রোজগারই তো করুক, তারপর তখনকার কথা তখন হবে। তেমন দুদিন যদি আসে তাহলে গদির কুলুঙ্গীর উপর একটা পর্দা-টর্দা টাঙিয়ে দিলেই হবে'খন। ছোট ছেলেটা খেলেখেলা বোঝে, আর তিনি বুঝবেন না! এই ঘরের গণেশ ঠাকুর হলে না হয় কথা ছিল; গদির গণেশজীকে নিয়ে আবার ভাবনা! হেঃ!...

শেঠজী। (জানলা দিয়া দেখিয়া) হাঁ, বিরজুই তো ঠিক। কোনও জরুরী কাজ নিশ্চয়ই।

শেঠগৃহিণী। কোনো শাঁসালো মক্কেল-টক্কেল ধরেছে হয়তো।

শেঠজী। (জানলা দিয়া দেখিতে দেখিতেই) হাতে দেখছি একখান বই। রঙীন ছবিওয়ালা মলাট। খবরের কাগজের উপর পয়সা অপব্যয় করাটা তবু বুঝি; তাতে লড়ায়ের খবর থাকে, সরকারী আইনের খবর থাকে, সোনা-রুপোর দর থাকে। কিন্তু বই কিনে পয়সা নষ্ট করা, এ জিনিস আমার মাথার মধ্যে ঢোকে না। কে একথা বলতে যাবে আজকালকার ছেলেদের কাছে!

শেঠগৃহিণী। না না বিরজুর আমার এসব বদ খেয়াল তো কোনোদিন ছিল না। নিশ্চয়ই তোমার বৌমার হুকুম ছিল যে, এখনই নবেল-নাটক চাই। পানটা সেজে সংসারের উপকার করে না, বিছানা থেকে নড়ে বসে না।

কি হ'াদেরই যে ছেলের বৌ এনেছ ঘরে! দিনরাত ফুসলানি দিচ্ছে ছেলেকে। ফরমাশের উপর ফরমাশ চলেছে বিরজুর উপর।

শেঠজী। ফরমাশ তো আমিও এককালে কত খেটেছি। কিন্তু তাই বলে রোজগারের কাজ কামাই করে বৌয়ের ফরমাশী বই কিনতে ছুটোছুটি করা কি উচিত?

শেঠগৃহিণী। তা বললেই তো পারো ছেলেকে।

শেঠজী। আমি কেন বলতে যাব, তুমি বললেই তো পারো। আদর দিয়ে দিয়ে একেবারে ছেলেটার মাথা খেয়ে দিয়েছ।

শেঠগৃহিণী। যত দোষ হল আমার! দেখ, মিছামিছি আমায় চটিয়ো না বলছি। একবার যদি আমি মুখ খুলি—

শেঠজী। দোহাই তোমার! আমারই হয়েছে বিপদ। এদিকে ছেলের মুখনাড়া, ওদিকে ছেলের মায়ের নখনাড়া!

শেঠগৃহিণী। বিরজুরও কি—বৌয়ের ফরমাশী বইখানা পকেটে ঢুকিয়ে, একটু মা-বাপকে আড়াল করে আনা উচিত ছিল না! আছে তো, সব জিনিসেরই একটা—

শেঠজী। তা তো বটেই। লক্ষণ ভাল ঠেকছে না বিরজুর মা। কিছুদিন থেকেই এই কথাটা আমার মনে হচ্ছে—খোলাখুলি ভাবে আমাদের তাচ্ছিল্য করবার কথাটা বলছি।—বিরজুর আলাদা-টালাদা হবার মতলব নয়ত! তোমাকে বলি বলি করেও বলতে পারিনি,—আবার তুমি চেঁচামেচি করে একটা অনর্থ বাধিয়ে বসো, সেই ভয়ে। কুমায়ুনে একটা সাহেবের কাছ থেকে মদ চোয়ানোর কারখানাটা যে কেনা হল—সেটা বিরজু কিনেছে নিজের নামে। মাদ্রাজের সেই চামড়ার কারখানাটাও ও চালাচ্ছে নিজের নামেই।

শেঠগৃহিণী। ও মা আমার কি হবে গো! আমার কপালে কি এও ছিল! (দেওয়ালের মুনাফা কথাটিকে) ও মুনাফা ঠাকুর! তোমায় প্রণাম না সেরে আমি জলস্পর্শ করি না; রোজ তোমাতে ঠেকিয়ে একটা করে আধলা আমি গঙ্গাতে ফেলে দিয়ে আসি; আচার তয়ের করবার আগে তেল দিয়ে হাঁড়ির উপর তোমার অক্ষরমূর্তি আঁকি; হিঙের বড়ি দেওয়ার সময়, বড়ি সাজিয়ে তোমারই দেবকলেবর লিখে নিই। তবু কেন ঠাকুর তুমি আমার উপর খুশি নও! আমার এমন রোজগেরে ছেলেকে

লোকসানের খাতায় ফেলতে দিলে! কেন একটা পরের বাড়ির মেয়েকে দিয়ে, এমন ছেলেকে পর করিয়ে নিতে দিলে!

শেঠজী। আঃ! চুপ! এই জন্যই তো তোমার কাছে মনের কথা বলি না। এখনই বিরজু এসে পড়ল বলে। চক্ষুলজ্জার খাতিরে বিরজু যে জিনিসটা বলতে পারছে না, সেটাও থাকবে না তোমার মুখে এই সব কথা শুনলে। এই যে বিরজু এসে গেল। হয়তো ও অন্যমনস্ক আছে বলে বইখান লুকোতে ভুলে গিয়েছে। তাকিয়ো না বইখানার দিকে; শুধু ওর মুখের দিকে তাকিও। নইলে ও অপ্রস্তুত হয়ে যাবে।

(বিরিজলালের প্রবেশ)

শেঠগৃহিণী। কি বাবা বিরজু, এই গেলি, আবার এখনই ফিরে এলি যে! চোখ মুখ অমন থমথমে কেন! শরীর খারাপ হয়নি তো! কোনও লোকসানের খবর নয়তো!

বিরজু। না।

শেঠগৃহিণী। তবে!

শেঠজী। নতুন কোন কানুন-টানুন নাকি সরকারের!

বিরজু। না।

শেঠজী। হুত্তিসগড়ের দেশলাইয়ের কারখানায় ধর্মঘট আরম্ভ হল নাকি!

বির। না।

শেঠজী। তবে!

বিরজু। দেখুন বইখানা।

শেঠজী। (বইখানার দিকে না তাকাইয়াই) বাঃ, বেশ রং-চং-করা মলাটটা। জয় গণেশ! জয় গণেশ!

শেঠগৃহিণী। দেখি, দেখি, (কাড়িয়া লইয়া) বাঃ, ভারি মজার ছবিটা তো মলাটের। একজন মেরজাই-পরা, পাগড়ি-বাঁধা লোক জাঁতা ঘোরাচ্ছে; জাঁতায় দেওয়া হচ্ছে মানুষের কঙ্কাল, আর জাঁতা থেকে বেরিয়ে আসছে সোনা-রুপোর গুঁড়ো। ভোজবাজির বই নাকি রে বিরজু! মরদে আবার জাঁতা ঘোরায় নাকি! এ তো মেয়েমানুষের কাজ। ও মা! লোকটার মুখে তোর বাপের মুখের আদোল আসে, তাই না! একেবারে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রাখবার মতো ছবি।

শেঠজী। দেখি, দেখি। এর সঙ্গে আমার মিল দেখলে কোনখানটায় বিরজুর

মা ? আমি তো বুঝতে পারছি না কিছু। ছবির লোকটার নাক গণেশজীর শুঁড়ের মতো লম্বা, দাঁতও প্রায় তাঁরই মতন। আমার চোখ মুখের চেহারা বোধহয় তুমি ঠিক চেনো না বিরজু মা।

শেঠগৃহিণী। হ্যাঁ, চিনি আবার না! হাড়ে হাড়ে ব'লে চিনি।

বিরজু। সে আমিও দেখে এসেছি চিরকাল যে মার লোক চেনবার অসম্ভব ক্ষমতা আছে। মা ঠিকই বলেছে।

শেঠজী। তাহলে তাই হবে। ভোটের যুগ এটা। তোমাদের দুজনেরই যখন এক মত, তখন আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে আমার চেহারা এই লোকটারই মতো। তা হবে। অনেকদিন আয়নায় মুখ দেখা হয়নি। হয়ত এই রকমই হয়ে গিয়ে থাকবে।

শেঠগৃহিণী। বাজে কথা ব'লো না বলছি। রোজই তো রাতে আতর মেখে বেরুনোর আগে, একঘণ্টা ধরে চুল আঁচড়াও আয়নার সমুখে।

শেঠজী। (অপ্রস্তুত হইয়া) সে তো চুল আঁচড়াই। মুখ দেখি নাকি ? আর নিজের রোজগারের পয়সায় কেনা আয়নাতে যদি মুখই দেখি, তাতে দোষটা কিসের শুনি।

শেঠগৃহিণী। দোষগুণের কথা আমি তুলেছি নাকি ? তুমি নিজের মুখদর্শন করো না বললে তাই না আমি ঐ কথা বললাম। গঙ্গাজল হাতে নিয়ে, রোজগারের কথা ছাড়া অন্য কোনও বিষয়ে মিথ্যে কথা সইতে পারব না। কোনও দিনও না! তেমন বাপের বেটী আমি নই!

শেঠজী। হয়েছে, হয়েছে, থামুন! সত্যিবাদী যুধিষ্ঠিরের গিন্নি আপনি! আর বেশী বাজে বকবক করতে হবে না! যেমন নিজের চেহারা তেমনি তো অন্যকে দেখবে!

শেঠগৃহিণী। দেখছিস্ বিরজু! শুনছিস!

বিরিজলাল। শুনুন বাবা, যে কথা আমি বলতে এসেছিলাম—

শেঠগৃহিণী। বৌয়ের কুসলানিতে নাচিস না বলছি বিরজু।

শেঠজী। কি যে বাজে বকো তুমি! চুপ করো না। ওকে বলতে দাও না—যা ও বলতে চায়।

বিরিজলাল। আমি বলছিলাম এই বইখানার কথা।

শেঠজী। এখনও এই বইখানারই কথা ? (বইখানিকে নাড়িয়া চাড়িয়া) এ যে দেখি বাংলাতে লেখা! বৌমা কি বাংলাও পড়তে জানে না কি ?

বিরিঞ্চলাল। এর মধ্যে আবার আপনার বৌমাকে টেনে আনছেন কেন?

শেঠজী। (অপ্রস্তুত হইয়া) না, তোমার মা বলল কিনা, তাই—

শেঠগৃহিণী। আমি বললাম, না তুমি বললে?

বিরিঞ্চলাল। না না তোমাদের দুজনের কেউ বলেনি। বলেছি আমি। এখন শুনুন বাবা, এই বইখানা আনলাম আপনাকে দেখানোর জন্ত।

শেঠজী। আমাকে? বই?

বিরিঞ্চলাল। হাঁ, সেইজন্তই আমি তাড়াতাড়ি ফিরলাম।

শেঠজী। আমাকে বাংলা বই দেবার জন্ত?

বিরিঞ্চলাল। হ্যাঁ, ঠিকই তাই। আজ বেরিয়েই দেখি যে পথের মোড়ে মোড়ে খবরের কাগজওয়ালারা আপনার নাম ধ'রে ধ'রে চেঁচাচ্ছে। "শেঠজীর কেচ্ছা! দাম দু টাকা, বইয়ের দাম দু টাকা!" সে কি চেঁচানি!

শেঠগৃহিণী। কতদিন বারণ করেছি; হ'ল তো এইবার?

শেঠজী। কি বলছিল বিরজু? শেঠজীর কেচ্ছা, না শেঠজীর গদির কেচ্ছা?

বিরিঞ্চলাল। আগে আমাকে শেষ করে বলতেই দেন। বইগুলোর কি বিক্রি! পড়তে পাচ্ছে না। এই সকালেই ফুটপাথে ভিড় জমে গিয়েছে, ঐ বই কেনবার জন্ত। আমিও একখান কিনে একটু নেড়ে চেড়ে দেখে নিলাম ব্যাপারটা কি। "ইন্দ্রাণী পাবলিশার্স" নামের একটা নদী বইয়ের দোকান "হাটে হাঁড়ি" বলে একটা সিরিজ বার করছে। এখানা সেই সিরিজের প্রথম বই।

শেঠজী। এ ঐ হতভাগা কাণীটার কাজ। নইলে আমার কথা বাইরের লোকে জানবে কি করে?

শেঠগৃহিণী। কে? সেই সাহেবের ছিবড়ে কাণীটা? যে হতভাগা আমার নামেও সাতখানা করে লাগিয়েছিল তোমার কাছে? হাঁরে বিরজু, এতে অনেক টাকা লোকসান হবে? ও গণেশজী, কেন তুমি বিরজুর বাপকে এমন দুধকলা দিয়ে সাপ পুষতে দিয়েছিলে? ওগো, আমাদের কি হবে গো! ও দেওয়ালের মুনাফা ঠাকুর! বিরজুর বাপকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করো। বইয়ের দরুন লোকসানটাকে লাভে বদলে দাও। তাহলে আমি ঘরের এই দিককার দেওয়াল থেকে তোমার কাছের দেওয়াল পর্যন্ত

বুকে হেঁটে যাব। তাহলে তোমার সেবাকরা দেহটাকে সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব মুনাফা ঠাকুর!

শেঠজী। বিরজুর মা! চুপ! আর কিছু বললে ফেলো না যেন। সোনা না বলে রুপো দিয়ে বাঁধাবার কথা বললেই পারতে।

শেঠগৃহিণী। মানত আগে বলতেই দাও। রুপোর গয়নায় আমার ঝিটাই বলে নাক সিঁটকোয়। তা দিয়ে কখনও মুনাফাঠাকুরের মন ভিজনো যায়—বিশেষ করে এই রকম বই-কইয়ের মারাত্মক ব্যাপারে? তুইই বল না বিরজু, হোমরা-চোমড়া হাকিমের কাছ থেকে কাজ আদায় করতে গেলে কি, কখনও অত টিপে টিপে খরচ করলে চলে? চুপ করে রয়েছিস কেন?

বিরিজলাল। তোমাদের কথা শেষ হয়েছে? না আরও চলবে এখন?

শেঠগৃহিণী। চটিস না বাবা বিরজু। এমন খবর নিয়ে এলি তুই! আমাদের কি আর মাথার ঠিক আছে এখন।

বিরিজলাল। আমারই কি আছে? রাস্তায় একখানা বই কিনে আমি প্রথমেই গেলাম মামার গদিতে। মামাকে পাঠালাম একখান মোটর ট্রাকে করে, সব বইগুলো কিনে নিয়ে আসতে। নিজে তো যেতে পারি না—আমাকে যে বাপের ছেলে বলে সবাই চিনে ফেলবে। মামার গদির সব লোকদের পাঠিয়ে দিলাম রাস্তার খবরের কাগজওয়ালাদের কাছ থেকে খুচরো বইগুলো কিনতে। বাড়িতে পৌঁছুলে বইগুলোকে সব পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

শেঠজী। কিন্তু তারপর? আবার যে ছাপবে!

বিরিজলাল। সেই বিষয়ে পরামর্শ করবার জন্যই তো ছুটে এলাম।

শেঠজী। কত টাকা পুঁজির লোক এই বইয়ের দোকানদাররা?

বিরিজলাল। তা তো ঠিক বলতে পারছি না। মামা এলে সব জানা যাবে। কত টাকা হলে ইন্ডিয়ান পাবলিশার্সের মুখ বন্ধ করা যাবে বোঝা যাচ্ছে না।

শেঠজী। কি লিখেছে বইয়ে? আগে, কত ক্ষতি হতে পারে, সেটা না জানলে ঠিক করব কি করে যে কত টাকা আমরা সেই দোকানদারদের খাওয়াতে পারি!

বিরিজলাল। আমি কি পড়তে পেয়েছি বইখানা এখনও ভাল করে যে বলব!

শেঠগৃহিণী। হ্যাঁরে খুব খারাপ লিখেছে না কিরে তোর বাবার নামে? সব রকমের কথা?

শেঠজী। বিরজুর মা, তুমি চট করে গিয়ে আঁতার ঘরটা পরিষ্কার করে রাখো। বইগুলো এলে ঐ ঘরে রাখতে হবে। তারপর খানকয়েক খানকয়েক করে উনুনে পোড়াতে হবে।

শেঠগৃহিণী। যাই। তুমি কিন্তু একবার গদিতে ঘুরে এস। লেবুওয়ালাটা বোধহয় দাঁড়িয়ে আছে তোমার জন্য। তাকাচ্ছ কি অমন ড্যাব ড্যাব করে? তোমার শালা কি আর নিজের কাজ ছেড়ে এ বেলায় আসবে, যে তার জন্য অপেক্ষা করবে? আর এলে, ঐ গদির পাশের সদর দরজা দিয়েই তো আসবে।

(শেঠগৃহিণীর প্রস্থান)

শেঠজী। দেখছো তো তোমার মার কাণ্ডজ্ঞান। এখনো ওঁর সেই লেবুর কথাটাই বড় হল। বাড়িতে যদি এখন আগুনও লাগে, তাহলেও উনি লেবুর কথাটা ভুলবেন না। হাঁ—যেজন্য ওঁকে পাঠিয়ে দিলাম—আমার কথা কি খুব খারাপ লিখেছে? যতটা খারাপ তার চেয়েও কি বেশী লিখেছে? সব লিখেছে?

বিরিজলাল। সব কি আর লিখতে পেরেছে!

শেঠজী। দোহাই তোর! বাপ হয়ে তোর কাছে হাত জোড় করে বলছি, ভাল করে বইখানা পড়ে কত টাকার খারাপ বলেছে সেইটা একবার হিসেব করে নিয়ে আয়।

বিরিজলাল। এখনও হিসাব! যত টাকা খরচ হয় ইন্দ্রাণী পাবলিশার্সকে একবার দেখে নেব! আমি কোনও কথা শুনতে চাই না আপনার! মানহানির মোকদ্দমা আনবো আমি তাদের বিরুদ্ধে! ফাঁসীটার পিছনে আমি গুণ্ডা লাগাবো! আগুন লাগিয়ে দেব আমি ইন্দ্রাণী পাবলিশার্সের প্রেসে! পুলিসকে টাকা খাইয়ে আমি ওদের জেরবার করব! কার সঙ্গে লাগতে এসেছে জানে না? ভেবেছে কি ওরা!

শেঠজী। মাথা গরম করিস না বিরজু। মোকদ্দমা করলে যে কথা বইয়ে লেখেনি সে কথাও বেরিয়ে আসবে। তোর মামা নিশ্চয়ই ওবেলার দিকে আসবে। তার সঙ্গে সলা পরামর্শ করে যাহোক একটা কিছু করা যাবে। তুই তোর অফিসে গিয়ে আজকে ভাল করে বইখানাকে পড়। আমিও গদিতে গিয়ে একটু ভাল করে ভেবে দেখি। জয় গণেশ।

[উভয়ের প্রস্থান। যাইবার পথে যাড় ফিরাইয়া শেঠজী মুনাকাঠাকুরকে প্রণাম করিয়া গেলেন। নেপথ্যে শোনা গেল শেঠগৃহিণীর চীৎকার—"লেবুওলাকে পাঠিয়ে দিও তাড়াতাড়ি করে"]

যবনিকা

[পৌষ সংখ্যায় সমাপ্য

(পূর্বানুবৃত্তি)

সমরেশ বসু

(১২)

বনলতা চলে যাওয়ার পর ক্ষণিক বিমূঢ় বসে রইল গোবিন্দ। মহিম এল এই সময়। গোবিন্দ তাড়াতাড়ি দু'হাত বাড়িয়ে মহিমকে টেনে নিয়ে বলল, মহী আসছিস। এখুনি ছুটতাম তোর কাছে।

কেন, কি হইল?

মুই কোন কিছুর দিশা পাই না মহী। জগৎ বড় বেতাল লাগে মোর কাছে।

মহিম দেখল গোবিন্দর মুখে একটা দুশ্চিন্তা ও চাপা যন্ত্রণার ছাপ। দিশেহারা চোখ। বলল, রাতে ঘুমাস নাই নাকি?

ঘুম মোরে ত্যাগ দিছে—গোবিন্দ বলল—বুকে মোর পাষাণ। দুঃখ দিয়া কানাইমালারে গাঁ-ছাড়া করলাম।

মহী বলল, সেই নাকি তোর ভাবনা?

বলে সে কুঁজো কানাই ও হরেরামের বাড়ির সমস্ত ঘটনা বলল গোবিন্দকে। আশা করেছিল, গোবিন্দের চোখেও আশা আনন্দ ফুটে উঠবে তার মতো। কিন্তু অন্ধকার ঘুচল না তার মুখ থেকে। বলল, পাগলাবামুন মোর মাথার বাজ ফেলছে।

পাগলা বামুন? মহিম জিজ্ঞেস করল, কি হইছে?

গোবিন্দ বলল, মুই গেছলাম পাগলাবামুনের কাছে কুঁজো কানাইয়ের কথা বলতে। ভাবলাম, পাগলাবামুন এত বোঝে, এত কথা বলে। গাঁয়ে ঘরে জ্ঞানী বলে তার কত নাম। সে কি বুঝবে না কুঁজো কানাইয়ের এ দুখের দায় মানুষের নয়, মানুষের হাত নাই এতে। কিন্তু···বলতে বলতে স্তব্ধ হয়ে গেল গোবিন্দ। অসহায়, চিন্তাচ্ছন্ন।

মহিমের শোনবার আকাঙ্ক্ষা অদমনীয় হয়ে উঠল। যেন, এ প্রশ্নের জবাবটা তারই পাওনা। বলল, তারপর?

পাগলাবামুন দু'হাতে সাপটে ধরে আদর করে বলাল মোরে। বলল, গোবিন্ দুঃখ পাসনি। কুঁজো কানাইয়ের ছিষ্টিকর্তা মানুষ, দায়টাও মান্‌ষেরই। মুই ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে বললাম, মিছে বল না পাগলঠাকুর, পাপ হবে। পাগলাবামুন হাসল। মহী, মিথ্যাবাদী আর পাপী কখনও হাসতে পারে না অমন করে। এ আমি হলপ করে বলতে পারি। হেসে বলল, মোরা দৈব দুর্ঘটনা দেখে ভাবি কেমন করে ঘটল। উপায় না দেখে সেই এক নাড়ার মা ভাড়া ভগবানের দোহাই পেড়ে খালাস পাই। কিন্তু তাই কি? না। খুব সম্ভবত জন্মসময়টিতে কানাই কুঁজো হয়েছে, নয় তো মায়ের পেটে থাকতেই। হুতোশে মোর ঘাম ঝরল। বললাম, কেমন করে? ঠাকুর বলল, সে যে অনেক কথা গোবিন্! তারপর খানিক কাদা-মাটির ড্যালা নিয়া আঙুলের খুঁটো দিয়ে বার করে দিল, সোজা বার হইয়া আসল। আবার গলিয়ে আবার বার করল, দেখলাম বেঁকে গেছে। ঠাকুর বলল, দেখলি গোবিন্, এই হইল কাণ্ড। মায়ের পেট থেকে কানাই প্রমাণ দরজা পায়নি। কুঁজো অর্থে, কানাইয়ের পিঠের শিরদাড়া বেঁকে গেছে।

মোর পুরো পেত্যয় হইল, হায়, পাগলবামুন সত্যি পাগল। কিন্তুক অন্তর্যামীর মত বলল ঠাকুর, ভাবছিস বুঝি পাগলের কথা বলছি? না রে না। এ মোদের জীবনের অভিশাপ, অন্ধকারে মোদের বাস। দেখলাম ঠাকুরের চোখে আলোয় আলো, যেন কোন্ জগতে চলে গেছে। বলল, কানাইয়ের মা যদি সেই দেশের মেয়ে হত যেখানে সন্তান প্রসবের সমস্ত বাধা উচ্ছন্নে গেছে, সেখানে কানাইয়ের জীবনে এ অভিশাপ নেমে আসত না। নয়তো বলি, কানাইয়ের বাপের জবর অত্যাচার ছিল নিজের বৌয়ের উপর, গতিক বোঝেনি। কিন্তু দোষ কার? কুঁজো কানাই এ অভিশাপের বোঝা কি একলা বইবে? না, মোদেরও বইতে হইবে, তেমন দেশটি মোদের বানাইতে হইবে। সেই বানানোর তাগিদ চাই, বাধা থাকলে তারে সরাইতে হইবে। গোবিন্, মানুষ হইয়া খামোখা ওই ভগবানের ঘাড়ে সব চাপিয়ে হাঁটু মুড়ে থাকিস্ না। শুনে বুকের মধ্যে মোর ধ্বক্ ধ্বক্ করতে লাগল। হায়, একি মানুষ, ভগবানের সব বোঝা নিজের ঘাড়ে নিয়া প্রাচিত্তি করতে চায়। কিন্তু সে মুখের দিকে তাকিয়ে সাধ্যি কার বলে, তুমি মিছে বলছ। ঠাকুর যে কত কথা বলে গেল, আমি তার সব কথার মানে বোঝলাম না। আর বার বার বলল, দুঃখ পাস্‌নি, মানুষের সংস্কার একটা সোনার শেকল। হোক্ শেকল,

'সোনার মে! যাদের চোখে সে সোনা চটে গেছে, তাদের ওই শেকলটুকু ছাড়া সবই গেছে। তাই তারা আজ ঘোর বিবাদ লাগাইছে শেকল ভাঙবে বলে।

মুই আর থির থাকতে পারলাম না। বললাম, ঠাকুর, বামুনের ছেলে, ঈশ্বরে পেত্যয় নাই তোমার? আবার হাসল। মোরে উপহাস করে নয়, বড় দুঃখে। বলল, আমি তোর মনের উপর জুলুম করতে চাই না। মোর কথা যদি বলিস্, তবে বলি, যা দেখতে পাই না, ছুঁতে পাই না, যার কোন হদিস্‌ই পাই না, তার কথা ভাবি না আমি। আমি সবকিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তোর নিরাকার সাধনা; তবু সে কিছু তো? বললাম, নিশ্চয়। বলল, একবার চোখ বুজে বল্, সে কিছুটা কি?

আমি চোখ বুজে দেখলাম, কিছু পেলাম না। আবার বুজলাম, দেখলাম, ছাইভস্মমাখা বাবা শ্মশানে বসে আছে। আবার বুজলাম, দেখলাম, রাজপুরের আচায্যি বসে বসে হাসছে। মোর মাথা ঘুরতে লাগল। বসে থাকতে পারলাম না। মোরে ধরে বসাল আবার, তারপর মানুষের জন্মের কথা শুরু করল পাগলঠাকুর। কিন্তু মোর যেন কি হইল শুনতে শুনতে, দিশা রাখতে পারলাম না। ছুটে বার হইয়া আসলাম।

গোবিন্দ স্তব্ধ হল। বলতে বলতে তার সে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু মহিমেরও প্রাণটা এ ঘরে আছে বলে মনে হল না। চোখ দুটো তারও শূন্যে নিবদ্ধ অথচ অনুসন্ধিৎসু। সে অনুসন্ধান মনে মনে। গোবিন্দ দেখল, মহিমের চোখে আলোর ছড়াছড়ি, কি যেন সে খুঁজছে। কিন্তু তার চোখে জল জমে উঠল বড় বড় ফোঁটায়। মহিমের কাঁধে মাথা পেতে বলল, মহী, এ সব যদি সত্য হয়, তবে মোর বাপ জীবনভোর একি করল? সে কি সব মিছে?

মহিম তাড়াতাড়ি দু'হাতে গোবিন্দর মুখ তুলে ধরে বলল, সত্য মিথ্যা তো বিচারের বিষয় গোবিন্ ভাই, তার জন্ত তুই উতলা হইস কেন?

গোবিন্দ বলল, সেই তো হইল গেরো। ছুটে গেলাম রাজপুরে আচায্যির কাছে, বললাম সব। তিনি তখন খাওয়ায় ব্যস্ত। বললেন, কাল আইস, জবাব দেব। কিন্তু পাগলঠাকুরকে কেবলি গালাগাল দিতে লাগল। সে মোর সইল না। বড় খারাপ লাগল আচায্যিকে। চলে আসলাম।

মহিম বলল, বেশ তো, এর সন্ধান তো মস্ত বড় কাজ গোবিন্ ভাই।

সকলের কথা শোন তুই। বলল, কিন্তু সে স্পষ্টই বুঝল পাগলবামুন কোথায় যেন গোবিন্দের মনে এক মস্ত ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে। অপরের মনে হয়তো লাগত না এত, গোবিন্দ্ বলেই এতখানি লেগেছে।

গোবিন্দ চোখের জল মুছে বলল, মহী, বাবার সব যদি দিছে, তবে মোর মায়ের দুঃখ বুঝি বুকের রক্ত দিয়েও শোধ করা যাবে না। মাকে মোরা সবাই মিলে মেরে ফেল্‌ছি।

উঠোন থেকে পিসির গলা শোনা গেল। গোবিন্দ্ আছিস্ রে, গোবিন্দ্। পরমুহূর্তেই গলার স্বর রুক্ষ হয়ে উঠল। তুই ওখানে কি করছিস লা ?

মুহূর্ত নীরব।

গোবিন্দ মহিম বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে বনলতা, খানিকটা অপ্রতিভ ভাবে। চকিতে সেটুকু কাটিয়ে সে বলল, মহীরে ডাকতে আসছি।

সেই মুহূর্তেই সকলের চোখ পড়ল পিসির সঙ্গে একটি ফুটফুটে শাড়িপরা ছোট্ট মেয়েকে। নাকে নোলক, পায়ে মল। বিস্ময়াবিত দুটো বড় বড় চোখ। যেন জন্মে অবধি বিশ্ব দেখা হয়নি তার। আর এক মাথা ঝাঁপানো কালো চুল।

মহিম জিজ্ঞেস করল, পিসি ও কে ?

পিসি সে কথার জবাব না দিয়ে বলল ভারী তুষ্ট হয়ে, মাকে মোর এ উঠোনটিতে কেমন মানিয়েছে দেখ দিকিনি, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। পরমুহূর্তেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে-ছলছল চোখে বলল, পরের মেয়ে দু'দিনের জন্য নিয়ে আসলাম বেড়াতে। চেরদিনের জন্য ঘরে তোলা যাবে কি ?

মহিম তাকাল বনলতার দিকে, বনলতা তাকাল গোবিন্দের দিকে। গোবিন্দর চোখ আর মন তখন এখানে নেই, এ জগতেই কি না সন্দেহ।

বনলতার নিশ্বাস পড়ল একটা। তা স্বস্তির না দুঃখের সে-ই জানে।

সবাইকে এ রকম নির্বাক দেখে পিসি হঠাৎ অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে মেয়েটির হাতে টান দিয়ে বলল, আয় তো মা, মোর ঘরে উঠে আয় তুই।

পিসির নবীনা কিশোরীর চোখে চাপা সংশয় ও অস্বস্তি দেখা গেল। গোবিন্দর দাওয়ায় মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে তার চোখ যেন বলল, মোর পানে তাকিয়ে! কিছুক্ হাসো না কেন তোমরা ?

[ক্রমশ

কলকাতার বাঁড়ুজ্যে

নাজিম হিকমত

তাদের বয়স হয়েছে
পৃথিবীও ছেলেমানুষটি নেই।
চোখে আমার সোনার কৌটার মত আলো-ফেলা
এই নক্ষত্র
যখন প্রথম বিদীর্ণ করেছিল শূন্যতার অন্ধকার
পৃথিবীতে মাথা গুঁজবার জায়গা ছিল না।

তারারা এখান থেকে দূরে
অনেক, অনেক দূরে
সেখানে আমাদের এই পৃথিবী একটি কণিকামাত্র
ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি বিন্দু
আর পৃথিবীকে পাঁচ টুকরো করলে তার এক টুকরো এই এশিয়া
এশিয়ার অনেক দেশের একটি দেশ ভারতবর্ষ
ভারতবর্ষের বহু শহরের একটি শহর কলকাতা
বাঁড়ুজ্যে হলেন সেই কলকাতার নেহাত একটি লোক।

আর আমার বলবার কথাটা এই
ভারতবর্ষে, কলকাতা শহরে
একটি মানুষের গতিবিধি আজ রুদ্ধ
শিকল পরানো হয়েছে এক অভিযাত্রী মানুষের পায়ে।

কাউকে মহিমার আলোয় তুলে ধরতে বসিনি আমি
তারারা অনেক দূরে, তোমরা বলো,
আর কতটুকুই বা এই পৃথিবী।
আমি হাসি।

গতিরুদ্ধ একজন মানুষ
শৃংখলিত একজন মানুষ
—আমার কাছে তার চেয়ে অবাক হবার,
তার চেয়ে মহিমান্বিত
তার চেয়ে বিস্ময়কর এবং তার চেয়ে মহীয়ান আর কিছু নেই। *

অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়

আমি দেখি

পূর্ণেন্দু পত্রী

আমি দেখি চতুর্দিকে একটিমাত্র মানুষের মুখ
একটিমাত্র মুখ দেখি প্রতিদিন দুর্দশার ঘরে
সহস্র পাঁপড়িকে তার বন্যার বীজাণু কুরে খায়
ধুলোয় বিলীন হয় জীবনের অমূল্য পরাগ।
তবু তার প্রতি অঙ্গে কামনার দৃঢ় অঙ্গীকার
মরেনি মরেনি তবু সারা দেহে আশার যৌবন
হাপরে চিমনিতে তার নিশ্বাসে ঝড়ের তীব্র বেগ
অন্ধ দুটি চোখে জ্বলে দিবারাত্রি চিতার আগুন।

যন্ত্রে তার গান শুনি—প্রত্যেক বিদ্যুতে দেখি হাসি
প্রত্যেক অরণ্যে ওড়ে দুরন্ত হাওয়ায় তার চুল;
নদীতে সাগরে তার রক্তের কি প্রবল গর্জন
পেশীর প্রচণ্ড বল আকাশ পাতালে তোলপাড়।

আমি দেখি চতুর্দিকে তারই মুখ—তারই দৃপ্ত মুখ,
আমি শুনি তারই গান—তারই সেই রক্তের গর্জন।

---

* ভারতের অনেক বিপ্লবী বাঁড়ুজ্যে সম্পর্কে লেখা "বাঁড়ুজ্যে কেন খুন হলেন?" মহাকাব্যের একটি অংশ।

আটাম্বর ছড়া

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

এক

হাত ঘুরলেই নাড়ু দেব, মার্কিনী এই নাড়ু
এ্যাটম বোমার খেলনা দেব, বেয়নটের ঝাড়ু
কায়েম করে বসিয়ে দেব ইউ-এন-ও-র ঘটে
সোভিয়েটের শান্তিবাণী যদিও কিছু রটে—
কান দিও না, গম পাঠাব, আর বানাব পাঁঠা
গরিব দেশের চণ্ডী, বলাই, তাদের কপাল কাটা।

দুই

কাৎরায় মাহি—কেরানী বন্ধু
ছেলেপুলে এক পাল
'হাফপ্যান্ট পরো' উপদেশ আর
হপ্তা দু'সের চাল।
ভ্যাবভেবে চোখ, বন্ধু আবার
শুনলো অনেকক্ষণ
পানের দোকানে বেতার ভাষণ
জন্ম-নিয়ন্ত্রণ।

তিন

বকধার্মিক ফাঁদ পেতেছেন কোটি টাকা মূলধন
যোগচ্ছন্ন চৌকস বুলি হবে নদী-বন্ধন
লাফ ঝাঁপ যত সাত-সতেরোয় দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড
দু'দিনেই হায় চেটেপুটে শেষ মূলধনটির ভাণ্ড।
অবশেষে দেখি উলটি গণেশ হয়েছে কেতাবে লিখা
স্বাধীন দেশের বিশ্বকর্মা তৈরি করেন চিকা।

পরিচয়-এর কুড়ি বছর

হিরণকুমার সান্যাল

তিন

স্মৃতির পটে জীবনের ছবি যেই আঁকুক সে শুধু ছবিই আঁকে; আর ছবি যে কখনো যথাযথ হয় না, অন্তত হওয়া উচিত নয়, স্বয়ং ছবি এঁকে রবীন্দ্রনাথ তা প্রচার করেছেন।

অতএব এই ইতিকথায় মাঝে মাঝে ভুলচুক হলে আশা করি পাঠকেরা তার জন্যে কথকের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করবেন না। অবশ্য কথকের বিবেক একথা বলে যে এই জাতীয় ইতিকথায় যাথার্থ্য সম্ভব না হলেও বাঞ্ছনীয়, সুতরাং সুযোগ পেলেই নিজের ভুল কবুল করতে তিনি প্রস্তুত।

খুলে বলি। এর আগের কিস্তিতে গিরিজাবাবুর মুখের কথায় প্রকাশ পেয়েছে সত্যেন বোসকে ধ'রে বেঁধে পরিচয়-এর প্রথম সংখ্যার জন্যে যে-প্রবন্ধ লেখানো হয়েছিল, পরিচয়-এ ঐ তাঁর প্রথম ও শেষ প্রবন্ধ। পুরনো পরিচয়-এর পাতা উল্টাতে উল্টাতে চোখে পড়ল সত্যেন-বোসের লেখা আর একটি প্রবন্ধ: বিষয়টি তাঁরই উপযুক্ত—'আইনস্টাইন'।

কিন্তু সে অনেকদিন পরের কথা। আপাতত প্রথম সংখ্যার পরিচয়-এর আবির্ভাব আর বিলম্বিত হ'লে পাঠকদের আসরে উদ্যোগপর্বেই হয়তো ভাঙন ধরবে। গিরিজাবাবু বলেছিলেন প্রথম সংখ্যার কথা একটু ফলাও ক'রে লিখতে। এবার সেই চেষ্টা করা যাক্।

আবির্ভাব

পরিচালকমণ্ডলী—বা প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক তাঁর একক বিবেচনায়—এই সার কথা বুঝেছিলেন যে বাংলা দেশের মতন দেশে সংবৎসরে চারবারের বেশি যে-পত্রিকা ছাপা হয়, কুলের ও শীলের অর্থাৎ বহরের ও বক্তব্যের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে সে-পত্রিকাকে বেশি দিন বাঁচিয়ে রাখা অসম্ভব। পরিচয়-কে যে সত্যিকারের মর্যাদাবান পত্রিকা করতে হবে এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ ছিল না; অতএব স্থির হয়েছিল যে পরিচয় হবে ত্রৈমাসিক।

বাংলা ১৩৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে এই ত্রৈমাসিকের অভ্যুদয় ঘটেছিল।

ঘটনাটি পৌরাণিক নয়, ঐতিহাসিক। তাই দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করেননি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর আশীর্বাদ বর্ষণ করেছিলেন উদার হস্তে তার প্রমাণ পাওয়া যায় দ্বিতীয় সংখ্যা থেকেই।

আর স্বর্গে দুন্দুভিনাদের বদলে এখনকার প্রথা হ'ল নিজের ঢাক নিজে পিটানো। নীরেন রায়ের কথায়বার্তায় পরিচালকমণ্ডলী বুঝে নিয়েছিলেন যে তিনি জবরদস্ত ঢাকী; অতএব জবরদস্ত ভাবে ঢাক পিটানোর ভার দেওয়া হল তাঁর ওপর। সাবেগ ও সজোর কলমে নীরেন রায় ঘোষণা করলেন:

"সভ্যতাবৃদ্ধির অনুপাতে মানুষের শ্রীবৃদ্ধি হয় কি-না এ প্রশ্ন আজিও তর্কাধীন। কিন্তু জটিলতা যে বাড়ে এ বিষয়ে পণ্ডিতেরাও একমত। পাণ্ডিত্য বাদ দিয়াও দেখা যায়, এক পরিচয়-প্রথাই সভ্যসমাজে কত রকম ছোট বড় জটিলতার সৃষ্টি করে।…পরিচয়ের অভাবে এক-গাড়ী লোক পরস্পরের দৃষ্টি এড়াইয়া নিস্তব্ধভাবে চলিয়াছে—এ দৃশ্য এ দেশেও নিতান্ত বিরল নয়।

"কিন্তু সভ্যতার আদবকায়দার কড়াকড়ি সত্ত্বেও মানুষের আদিম পরিচয়-স্পৃহাকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না।…সঙ্গলোভী মানুষ অন্যের সংস্পর্শ পাইয়া নিজেকে সম্পূর্ণতর বোধ করে।

"এই সঙ্গলোভই মানুষকে দিয়া সমাজ গড়ায়, শিল্প রচায়, সাহিত্য-সৃষ্টি করায়। সুপ্রসিদ্ধ কবি-অধ্যক্ষ মনোমোহন ঘোষের স্মৃতি-সভায় অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, তাঁহার মনে হয় সাহিত্য কথাটার মূলে আছে সহিত।* যে মানুষ কাহারও সহিত বাস করে না, সাহিত্য সৃষ্টির কোনো তাগিদ সে অনুভব করে কিনা সন্দেহ। সাহিত্যের বাহন যে ভাষা তাহা সমূহের সৃষ্টি। একা মানুষের ভাষার প্রয়োজন নাই বলিলেই হয়। হয়ত এমন জ্ঞান আছে যাহা ঐকান্ত নির্জন সাধনা-সাপেক্ষ…কিন্তু সমাজবদ্ধ মানুষ সে জ্ঞানের সাধক নয়। নিজেকে জানিবার, নিজের পরিচয় পাইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার কম তীব্র নয়; সমস্ত কর্ম্ম ও চিন্তার মধ্য দিয়া, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, এই আত্ম-

* এ ক্ষেত্রে নীরেনের স্মৃতিবিভ্রম ঘটেছিল, কেননা 'সহিত'-এর সঙ্গে যে 'সাহিত্য' কথাটির মূলগত যোগ আছে এই মত রবীন্দ্রনাথ বহুদিন আগে ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত 'সাহিত্য' বইয়ের 'সাহিত্য' প্রবন্ধে। সুতরাং মনোমোহন ঘোষের স্মৃতি-সভায় কবি যা বলেছিলেন তা শুধু পুনরুক্তি।

পরিচয় লাভই তাহার উদ্দেশ্য ;…তাই সে অপরের সান্নিধ্য চায়, তাই সে সাহিত্য চায়। কারণ সাহিত্যের মধ্য দিয়া যে-পরিচয় তাহা চাক্ষুষ পরিচয়ের চেয়েও প্রত্যক্ষ।…দেশ ও কালের বিস্তীর্ণ ব্যবধানের সমুদ্রকে উপেক্ষা করিয়া এই সাহিত্যজগতেই সমধর্মী মন পরস্পরের সহিত করকম্পন করে…এমন একদিন আসা অসম্ভব নয় যখন এক বিশ্বজনীন ভাষা ও সাহিত্যে সম্মিলিত মহামানবের অন্তরের কাহিনী ছন্দিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু এই শুভদিনের আবির্ভাবকে ত্বরিত করিতে হইলে আজ মানুষের প্রধান কাজ—ভাষা-সঙ্কটের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সত্ত্বেও বিভিন্ন জাতির যুগযুগসঞ্চিত পরিশীলন-সম্পদের সহিত পরিচিত হওয়া। এই পরিশীলন-পরিচয়ই জাতিগত দ্বেষ-হিংসা ও অবজ্ঞাকে, সংকীর্ণ-চিত্ততার রন্ধ্রগত শনিকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ।"

করকম্পন অবশ্য রোগবিশেষ—অত্যন্ত স্থূল দৈহিক রোগ। নীরেন রায়ের লেখা পড়লে ধারণা হয় যে সাহিত্যের সসাগরা বিস্তৃতিই এই রোগের নিদান ও এর সাংঘাতিক পরিণতি 'এক বিশ্বজনীন ভাষা ও সাহিত্যে সম্মিলিত মহামানবের কাহিনী ছন্দিত' হওয়া। সম্ভবত ভাবের আবেগে ঐ রকম অসম্ভাব্য পরিণতির কথা বেরিয়েছিল নীরেনের অসংযত কলম থেকে। তখনকার দিনের গদ্যরচনাতেও এই অবাস্তবতা অমার্জনীয়। কিন্তু এই জাতীয় দুঃস্বপ্নকে প্রশ্রয় দেওয়াই যে ছিল পরিচয়-সৃষ্টির উদ্দেশ্য একথা ভাবলে ভুল হবে।

ভাবগঙ্গা

কেননা, এই গুরুতর স্খলনের পর তার সামনে নীরেন পরিচয়-এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা লিখেছিল তার সারমর্ম যে আমার সর্বতঃ গ্রাহ্য তা আগেই লিখেছি। অবশ্য নীরেনের ভাষা তার সম্পূর্ণ স্বকীয়। এই স্বকীয় ভাষাতে নীরেন বলেছিল :

"প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত ভাব-গঙ্গার ধারা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া বহাইয়া দেওয়া। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন ভাষার বিশিষ্ট দানগুলিকে 'পরিচয়' বাঙালী পাঠককে উপহার দিতে অভিলাষী,…এই সঙ্গে মাতৃভাষার সর্বাঙ্গীন উন্নতির দিকেও 'পরিচয়'

তাহার দৃষ্টি সদাজাগ্রত করিয়া রাখিবে।... পরিচয় জানে যে তার সাধ বত সাধ্য তাহার পশ্চাতে। কিন্তু তাহার একান্ত বিশ্বাস তাহার এই স্বীকৃত অক্ষমতাই সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে...এই বিশ্বাসই তাহার দুরারোহণী আশার মূলে জলসেচন করিয়া আজ অঙ্কুরিত করিয়া তুলিয়াছে। এখন ইহাকে লালনের ভার পড়িল তাঁহাদের উপর—বাংলা ভাষার অতীতকে যাঁহারা শ্রদ্ধা করেন, বর্তমানকে দরদ দিয়া দেখেন ও ভবিষ্যতের আলোকিত প্রসার সম্বন্ধে যাঁহাদের বিশ্বাস অকুণ্ঠ।"

"পরিচয়" নামের তকমা-আঁটা শিরোপার নিচে ছাপা এই রচনাটিতে লেখকের স্বাক্ষর ছিল না, কেননা এটি প্রকাশ করা হয়েছিল নিছক সম্পাদকীয় মুখবন্ধ হিসাবে। লেখক নীরেন রায়ের নাম সম্পাদক হিসাবে মলাটে ছাপা না হলেও, পরিচয়-এর প্রারম্ভিক যুগে সুধীনের ও নীরেনের আত্মিক অভিন্নতার নিদর্শন ভাবগঙ্গায় এই অবতরণিকা। এই অভিন্নতা খুব বেশি দিন টেঁকেনি। কেননা যে-নীরেন রায় একদিন 'দেশের সুধীবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ' করার উদ্দেশ্যে এই জাতীয় ইস্তাহার জাহির করেছিলেন নির্দ্বন্দ্ব উল্লাসে, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রভাব তাঁকে ক্রমশ টেনে নিয়ে গেছে সুধীবৃন্দের থেকে দূরে।

অবশ্য সুধীবৃন্দেরও অনেকেরই মনে ঐ একই প্রভাবে রূপান্তর ঘটেছে : কী ভাবে ঘটেছে তার বিবরণ আশা করি এই ইতিহাসের মধ্যে খানিকটা ফুটবে ; না ফুটলে এর সার্থকতা কোথায় ? কিন্তু এখনকার মতন এই কথা মনে রাখা দরকার যে পরিচয় আত্মপ্রকাশ করেছিল উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্তের মুখ তাকিয়ে ও এই মধ্যবিত্ত তাঁদের সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারী যাঁরা একদিন রাজনৈতিক চৈতন্যে দীক্ষা পেয়েছিলেন গোলদিঘিতে সুরেন বাঁড়ুয্যের ও বিপিন পালের বক্তৃতা শুনে।

এখন আর গোলদিঘিতে কুলায় না, কথায় কথায় যেতে হয় গড়ের মাঠে মিছিল ক'রে—শুধু রাজনৈতিক নয়, সামাজিক চৈতন্যের ব্যাপক প্রেরণায়। যখন গোলদিঘি ছিল শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্র, কে ভাবত তখন সামাজিক চৈতন্যের কথা ? পরে ভাবতে হয়েছে ও এই ভাবনার ছাপ পড়েছে পরিচয়-এ প্রায় গোড়ার থেকে। কিন্তু তখন এই ভাবনা ছিল শুধু বুদ্ধির বিলাস, অর্থাৎ নীরেন রায়ের ভাষায় 'ভাবগঙ্গার ধারা।'

অবশ্য পরিচয়-এর আবির্ভাবের এক শতাব্দীরও বেশি আগে বাংলা দেশে এই ভাবগঙ্গার আবির্ভাব হয়েছিল প্রধানত রামমোহন রায়ের কল্যাণে।

পরিচয় যদি এক্ষেত্রে ভগীরথবৃত্তিপালনের দাবি করে থাকে তা শুধু ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারসূত্রে—বঙ্গদর্শন, সাধনা, ভারতীর পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে।

কাব্যের মুক্তি

সুধীনের মুখে নীরেনের এই রচনাটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছি বারবার, অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে এতে তার সম্পূর্ণ সায় ছিল। অথচ 'কাব্যের মুক্তি' নামে সুধীনের যে-প্রবন্ধ ঐ প্রথম সংখ্যাতেই ছাপা হয়েছিল তা একেবারে ভিন্ন সুরে বাঁধা। সুদূর অতীতের দিকে ফিরে সুধীন প্রবন্ধটির গোড়াপত্তন করেছিল "কাব্য অনাদি" এই আপ্ত বাক্য উচ্চারণ করে। ব্রহ্মও অনাদি-অনন্ত ছেলে-বেলা থেকে এই কথা শুনেছি, আর সংস্কৃত আলংকারিকদের রচনায় পড়েছি কাব্যের সঙ্গে ব্রহ্মের তুলনা। কিন্তু 'কাব্যের মুক্তি'র লেখক এই অনাদিত্বের যে ব্যাখ্যা করেছেন তা আলংকারিক বা আধ্যাত্মিক নয়, ঐতিহাসিক। কেননা,

> "অনাদি শব্দটা যদি আমাদের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে পীড়া দেয়, তাহলে বলা যেতে পারে যে আদিম মানুষ যবে বিভিন্ন ছন্দোবদ্ধ ধ্বনিকে বস্তু ও আবেগের সঙ্গে বাঁধতে পারলে, সেই দিনই কাব্যের জন্মদিন।"

এর পর আছে আদি কাব্যের এই স্বরূপ-ব্যাখ্যা :

> "প্রথম কবিতার আবির্ভাব হয়েছিলো কোনো ব্যক্তিবিশেষের মনে নয়, একটা মানবসমষ্টির মনে ; প্রথম কবিতার প্রসার শুধু একটি মানুষের উপরে নয়, সমগ্র জীবনের উপরে ; প্রাথমিক কবিতার উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ নয়, সঙ্কলন।"

ঐতিহাসিক গবেষণার এইখানেই শেষ। এর পর দার্শনিক তত্ত্ব।

> "সেইদিন থেকে আরম্ভ ক'রে আজ পর্যন্ত কাব্যের সেই বিশ্বম্ভর মূর্তি কেবল ক্ষয়ে গেছে। তার সেই নীহারিকার মতন আয়তন সৃষ্টির রীতিতে আজকে কবিরূপ উল্কাখণ্ডের মধ্যে আবদ্ধ। ফলে অনেকে জিজ্ঞাসা করতে সুরু করেছেন কাব্যের বিকাশধারার কি এইখানেই শেষ। আমার তাই বিশ্বাস। আমি মনে করি, এই ধরণের একটা পর্যায়ে পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে ; এর পরেও যদি কাব্যের মধ্যে একটা তীব্র জ্যোতি দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে সে জ্যোতি পথচ্যুত উল্কার চিতাগ্নি মাত্র।"

কোথায় 'ভবিষ্যতের আলোকিত প্রসার' আর কোথায় 'পথচ্যুত উল্কার চিতাগ্নি'! বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে যে সংঘাত দেখা দিয়েছিল আরো অন্তত দশ বছর পরে, পরিচয়-এ তা প্রকাশ পেয়েছিল একেবারে প্রথম থেকে। কিন্তু

তখনো এই সংঘাতের অর্থ মননশীল বাঙালীর আত্মনিবিষ্ট মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। কেমন করে হবে? কেননা, অবাস্তবতার মেরু থেকে মেরুতে আমাদের মন ছিল দোদুল্যমান।

'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধের আলোচনায় ফেরা যাক। সমাজতত্ত্বের উপকরণ এতে যথেষ্ট আছে; তার ওপর আছে লেখকের নিবিড় রসবোধের পরিচয়। ছন্দ সম্বন্ধে লেখক বলছেন:

> "ছন্দ আর আবেগ হয়তো যমজ ভাই। তাদের টান হয়তো নাড়ীর টান। এখানে একটা বিষয় অবশ্য দ্রষ্টব্য—আবেগ আর বেগ এক কথা নয়। আবেগের মধ্যে বেগের চেয়ে বিরামই বেশী; অর্থাৎ আবেগ যখন মুখর হয়ে ওঠে তখন তার ভাষা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়য় না। চলে বিরতিবহুল গতিতে। এই ধ্বনি ও যতির সুব্যবস্থিত নক্সাই বোধ হয় ছন্দ।"

এর পর গদ্য ও পদ্য যে অভেদাত্মা তার প্রমাণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের লিপিকা থেকে 'এখানে নামলো সন্ধ্যা। সূর্যদেব, কোন্ দেশে কোন্ সমুদ্রপারে তোমার প্রভাত হলো?' এই সমগ্র রচনাটি উদ্ধার ক'রে সুধীন মন্তব্য করেছে:

> "যদি কুসংস্কার বর্জন করে শোনা যায় তাহলে আমাদের কান ওই লাইন কটার মধ্যে একটা সার্বভৌম ছন্দের ঝঙ্কার পাবে। এই গূঢ় শৃঙ্খলার মূলে কোনো রকম তান্ত্রিক চাতুরী নেই; কেবল উপমা ও ভাবের বৈকল্পিক বিন্যাসেই এই প্রতিসাম্য এসেছে। দিক্তির একদিকে সন্ধ্যার ভার যেই রজনীগন্ধার সহযোগে এলিয়ে পড়তে চায়, অমনি কনকচাঁপা সূর্যের সমর্থনে ছুটে এসে তাদের নির্ভর হয়ে দাঁড়ায়; 'জাগলো কে'—প্রশ্নটা যেমন উতল হয়ে ওঠে, দীপের আরতি আর ফুলের অর্ঘ্য অমনি তাকে শান্ত করে দেয়; হাওয়ার ভরা পালের চালনে অর্গলিত ঘরের স্থবির নিদ্রা কোথায় উধাও হয়ে যায়, কে জানে?"

মননশীলতা ও রসগ্রাহিতার সম্মিলিত রসায়নে এর আগে বা পরে এমন ক'রে বাংলা ভাষায় কাব্যের রস আর কে ফুটিয়েছে?

এর পর আছে মহৎ কাব্যের এই উজ্জ্বল বর্ণনা:

> "...কাব্য যখন মহত্ত্বের কোঠায় পৌঁছয় তখন তার সঙ্গে আর সংখ্যার কোনো সম্পর্ক থাকে না। তখন তার ভিতরে পাওয়া যায় একটা বিরাট সহজতা। কাব্যের ভাষা যেমন অকৃত্রিমতার কণ্ঠস্বর, কাব্যের ছন্দও তেমনি অকৃত্রিমতার পদধ্বনি।"

আর অগ্রগমনের স্থান দেয়।

গতিবেগ থামতে চাইছে না। এখনো তার উদ্যমের অন্ত নেই, শ্রান্তি নেই তার চরণে। এই অদ্ভুত আত্মোৎসর্গের পারিতোষিক-স্বরূপ সে যেন কেবল এইটুকুই বুঝতে চায় যে শূন্যগর্ভ মায়ার মধ্যে তার সৃষ্টি আরো শূন্যময়!"

পাঠকদের মনে থাকতে পারে আমি সুধীন সম্বন্ধে একেবারে গোড়াতেই লিখেছিলাম যে বিদেশী ছাচে-ঢালা মনের উপর বৈদেশিক সংস্কৃতির পালিশ লাগিয়ে সে দেশে ফিরেছিল প্রবাসে দেহমনের রোগ কাটিয়ে। একথা আজ ফিরিয়ে নিচ্ছি। নীরেনের কম্বকম্পনের চেয়ে অনেক বেশি জটিল ব্যাধি সুধীন বাধিয়েছিল সম্ভবত এ দেশে ব'সেই। কেননা এই ব্যাধির জন্ম দেশের বা বিদেশের মাটিতে নয়—যারা মাটিকে মানেনি ও মানুষকে দেখেও দেখেনি, যুগসন্ধির সেই সব বাস্তহারা সাহিত্যিকদের মনে। নইলে কোথা হতে আসে এই শূন্যতাবোধ, এই জীবনবিমুখতা?

এই বাস্তহারা সাহিত্যের অবাস্তবতার মধ্যেও ছিল প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ—সমাজের সঙ্গে শিল্পীর বিরোধের বিরুদ্ধে। এইটুকুই এর সার্থকতা। সুধীনের গদ্য বা পদ্য রচনায় এই বিরোধের উপলব্ধি থাকলেও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তার রচনায় কোনোদিন পুরোপুরি ফুটে ওঠেনি, উঠলে আজকের বাংলা সাহিত্য অনেক বেশি সমৃদ্ধ হ'ত। কিন্তু বাংলা গদ্যকে মোড় ফেরাবার চেষ্টার নমুনা হিসাবে সুধীনের 'কাব্যের মুক্তি' ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। এর ভাষা জমাট ও জলজ্বলে। এর চরম সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য হলেও এর অনেক যুক্তি আজ প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের মুখে বাঁধা বুলির মতন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এই সব যুক্তিতে সুধীনের মৌলিক মৌরসিপাট্টা না থাকতে পারে, কিন্তু বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে এর আগে এ সব কথা আর কেউ বলেনি। আর এ রকম আগ্রহ ও নিষ্ঠার সঙ্গে বাংলা ভাষায় সমসাময়িক সাহিত্যের আলোচনাই বা আজ পর্যন্ত অন্য কোন্ লেখক করেছেন?

[ক্রমশ

"বাস্তবিক পক্ষে কোনো সাত্ত্বিক আধুনিক কবি নবীনতায় বড়াই করে না ; সে জানে সাহিত্যকে নবসম্পদে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা চিরদিনই উপহাস্ত ; তাই সে শুধু আবিষ্করণে মন দিয়েছে। প্রথার অন্ধকূপ থেকে কণ্ঠাগতপ্রাণ ঐতিহ্যকে মুক্ত করাই তার উদ্দেশ্য ; তার ব্রত কাব্যকে আদিম স্বাধিকার ফিরিয়ে দেওয়া।"

দুঃখের কথা এই যে এই আদিম স্বাধিকারের সন্ধানে আজ পৃথিবীর একাধিক প্রমত্ত কবি বিমুখ হয়েছে ভবিষ্যতের প্রতি, আশ্রয় খুঁজেছে সেই ঐতিহ্যে যা একান্তভাবে অতীতে বিলীন।

আধুনিক কাব্যের দুর্বোধ্যতা সম্বন্ধে সুধীন দত্তের মতামত উদ্ধৃতির যোগ্য :

"দুরূহতার দুটো দিক আছে। একটা পাঠকের দিক, অন্যটা লেখকের। যে-দুরূহতার জন্ম পাঠকের আলস্যে তার জন্যে কবিকে দোষী করা চলে না। দর্শন-বিজ্ঞান-গণিতকে বাদ দিলেও কলার অন্যান্য বিভাগে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্যে যে-সাগ্রহ অভিনিবেশ ও অনুশীলন আবশ্যক, কবি যদি তার নিজের কলার পক্ষে সেই পরিমাণের শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা চায়, তাহলে তার দাবি নিশ্চয়ই ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু যে-দুরূহতার উৎপত্তি অনুকম্পার অভাবে, যার মূল কবির নিজের দ্বিধা, তার কতকটার দায় যুগসন্ধির স্কন্ধে চাপানো গেলেও বেশীর ভাগটা বইতে হবে কবিকেই।"

একথা কি পুরোপুরি যুক্তিযুক্ত ? যুগসন্ধির দ্বিধা কি এত সহজে গা থেকে ঝেড়ে ফেলার জিনিস ? সেদিনকার দ্বিধা থেকে মুক্ত হয়ে আজ যাঁরা 'নিত্য প্রলয়ের উত্থান উত্তরোলের মাঝখানেও নিরপেক্ষ স্থিতির অবিনশ্বর শান্তি'-লাভের কামনায় সংগ্রামকে পাশ কাটিয়ে বিপ্লবকে বিদ্রূপ করছেন, কাব্যের চরম সার্থকতার সন্ধানে তাঁরাই কি পথনায়ক ?

সুধীন দত্তের মতে ঐ অবিনশ্বর শান্তিকে পায়নি বলেই আধুনিক কাব্য (অর্থাৎ তখনকার দিনের) হার স্বীকার করেছে। কিন্তু

"তবু সে চলেছে, নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ নেয়নি, উপসন্ন বিপদের আশঙ্কা রাখেনি, ফিরে দেখেনি তার প্রত্যাবর্তনের পথ পদে পদে খসে যাচ্ছে।"

তারপর ?

"ইতিমধ্যে মণ্ডলাকার প্রগতির পরিক্রমা হয়তো তার শেষ হয়েছে।

গল্প

অমনোনীত

সমরেশ বসু

'বাট—মানে কিন্তু, নাউ—মানে এখ—ন...'

বলে একটা বিলম্বিত টান দিয়ে অবলাকান্ত কোলা ব্যাঙের মত অদ্ভুত শব্দ করে, নাক ভ্রূ কুঁচকে, অত্যন্ত তিক্ত মুখে, সামনের নথিপত্র কাগজ বিল-বই ইস্তাহার, অনেককিছুর উপর একবার বিরক্ত চোখ বুলিয়ে তার কোলের উপর মেলে দেওয়া টুকরো কাগজটার দিকে আবার তাকাল। যেন কাউকে নিতান্ত অসহায় ভাবে বলে উঠল, হোয়াট ক্যান্ আই ডু—অর্থাৎ, আমি কি করতে পারি হে?

তারপর চোখ বুজল এমনভাবে যেন কেউ তার চোখে প্যাঁক করে আল্‌পিন ফুটিয়ে দিল এবং হাত মুঠো করে হাঁটুতে ঘষতে লাগল। অর্থাৎ অমন সরল ইংরেজীর সরল মানে করেও বোঝা যাচ্ছে যে গূঢ় অর্থটি অতি দুরূহ। নইলে অবলাকান্তর অসাধ্য কিছু আছে, তা কে জানত। এমন কি তার মনের অন্তঃস্রোতও যে এলোমেলো হয়ে গেছে তা বোঝা যাচ্ছে তার মেদবহুল শরীরটার আড়ষ্ট ভঙ্গি দেখে। গলার পৈতেটাও যেন বেঁকে আছে। তার সদারক্তচক্ষুর চারপাশে কোলা মাংসে মেচেতার দাগের উপর যে কয়টি ভাঁজ পড়েছে, সেগুলোও বারকয়েক নড়ে উঠে স্থির হয়ে গেছে। গোঁফ-দাড়ি-কামানো মস্ত মুখটা দেখাচ্ছে ত্রিভঙ্গ একটা কুটার দলার মত। অবশ্য অবলাকান্তর মুখ কোনকালে সুশ্রী ছিল কিনা কে জানে, কিন্তু এত কোঁচকানো ছিল না।

এমন সময় কাপড়ের খসখস্ শব্দ শুনে মুখটা আরও বিকৃত করে অবলা-কান্ত চোখ খুলল।

সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তার স্ত্রী শশী, দেখতে তার চেয়েও বুড়ি বলে মনে হয়। ভীতু চুড়ুবুড়ির মত বউটা এসে দাঁড়িয়েছে কিছু বলবে মনস্থ করে। ভাবগতিক সুবিধের নয় দেখে চুপ করে আছে।

অবলাকান্তর চোখে ঘৃণা ফুটে উঠল। তাড়াতাড়ি উঠে খদ্দরের জামাটা গায়ে চাপিয়ে খাদির টুপিটা মাথায় তুলতে গিয়েও দলা পাকিয়ে পকেটে

পুরে রাখল। তারপর তার বিশাল শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বেরিয়ে পড়তে গিয়ে শশীর মুখোমুখি দাঁড়াল। স্বভাবসিদ্ধ কটূক্তি করে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'চাঁদের মুখে বাক্যি নেই যে!'

বলেই আচমকা ঠাস করে কষল এক থাপ্পড় শশীর গালে। কিন্তু শশী চমকাল না, কেননা এটা অভ্যাসের ব্যাপার। কেবল টাল সামলে দাঁড়াল। সে রক্তমাংসের শরীরে একটা কাঠের পুতুল যেন। নির্বিকারভাবে গালে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'মেয়েটার কথা—'

'ঢের শুনেছি।' বলে অবলাকান্ত খানিকটা ঝুঁকে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'মেয়েটা তোর মত বুড়িয়ে যাচ্ছে, চোখের কোলে কালি পড়ছে, সেজেগুজে খালি বাইরের ছোঁড়াদের সঙ্গে টহল দিচ্ছে, আর তোর ঘুম হচ্ছে না।'

বলেই কষল শশীর আর এক গালে এক থাপ্পড়, 'আমারও লীলা সাঙ্গ হয়েছে। আমাকে যে কংগ্রেস নমিনেশন দিল না, আমাকে যে—'

হঠাৎ থেমে সে চরকির মত একটা পাক খেয়ে নমিনেশন না পাওয়ার চিঠিটা হাতের মুঠোয় নিয়ে কি সব বিড়বিড় করতে করতে বেরিয়ে গেল। বেরুল যেন ঝড়ের বেগে, শরতাড়িত মাতঙ্গের মত।

কেবল শশীবালা বিন্দুমাত্র বিস্মিত না হয়ে অসময়ের মার খেয়ে অভ্যাসবশত নিজের মৃত্যুকামনা করতে গিয়ে হঠাৎ থমকে গেল। অবলাকান্তর হাতে গড়া পুতুল সে, তাই স্বামীর শেষ কথাটায় তারও স্বপ্নপতন হল। স্বামীর সঙ্গে সুদিনের দীর্ঘ প্রতীক্ষা তারও শেষ হয়ে গেল। তার মতে তার মেয়ে কলঙ্কিনী। আর সেটা হয়েছে অবলাকান্তর সঙ্গে ঘাটে অঘাটে ঘুরে ঘুরেই, কূটনৈতিক বাপের প্রশ্রয়েই। আজ শশীর চোখের সামনে তার অপবিত্র মেয়ের ভবিষ্যতে কোন এক কেউকেটার সাতপাকের অঙ্কশায়িনী হয়ে নিষ্কলঙ্ক হওয়ার শেষ আশা চূর্ণ হয়ে ধুলো হয়ে গেল।···অবলাকান্তর হাজার মারে পোক্ত শশী আজ তাই হঠাৎ ডাক ছেড়ে কাঁদতে গিয়েও কাঁদতে না পেরে দু'হাতে চুল টেনে ছিঁড়তে লাগল।

২

অবলাকান্ত চলেছে দক্ষিণ দিকে একটা সাইকেল-রিক্সায় করে, চটকলের ইউনিয়ন অফিসে। তার চোখ খোলা, কিন্তু সে চোখের দৃষ্টি যে কোনদিকে নিবদ্ধ তা বোধকরি সে নিজেই জানে না। সে যে রিক্সায় যাওয়ার সময় বিশেষ ভঙ্গিতে বসত, একটা শাণিত বুদ্ধিমত্তা ও তীব্র চাপা অথচ অমায়িক

হাসি মুখে ফুটিয়ে তুলত, প্রত্যেকটি মানুষের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখত, (অর্থাৎ কে তার দিকে কি চোখে তাকিয়েছে এটা নাকি সে ভাল বুঝত)। আজ তার সেসব যেন কোথায় উধাও হয়ে গেছে। উধাও হয়ে গেছে বুঝি আজ তার চোখের সামনে এই বিকালের রাস্তা, হাল্‌কা রাঙা আকাশ, কল-কারখানা, মানুষ। অনেকের যে অবাক-মুগ্ধ চোখ তাকে পথে নিরীক্ষণ করত (তার ধারণা), যাকে সে মনে করত জনতার অভিনন্দন, বোকা ম্যাস-এর স্বভাব-পূজা, আজ তা যেন কোথায় হারিয়ে গেছে তার চোখ থেকে।

আজকেই তার মুখ প্রকৃত ভাবহীন গম্ভীর, চোখের দৃষ্টি শর্তছাড়া। ঠোঁট দুটো বেঁকে আছে কী আবেগে তা সে-ই জানে, কেবল তার মনে হচ্ছে তার বুকটা ঠেলে উঠে আসতে চাইছে গলার কাছে। বুঝি ভারী অসুখ করেছে অবলাকান্তর।

পথ দীর্ঘ। রিক্‌সাওয়ালাটা বুড়ো ঘোড়ার মত প্যাডেলে চাপ দিচ্ছে। এই অদ্ভুত লগ্নে অবলাকান্তর বারবারই মনে পড়তে লাগল তাদের বংশের উঠতি-পড়তি।...বংশ ছিল খাঁটি পুরোহিতের। ঐশ্বর্য ছিল প্রচুর। কিন্তু কালের গতিতে যজমানি ব্যবসায় যখন ভাঁটা পড়ে এল তখনো সেই গুরু-কুলের আভিজাত্যটা মরল না। গোপন মদ্যমাংসের লোলুপতা ও শিষ্যের দান করা সম্পত্তি ভোগের নেশা তখনো মাতাল করে রেখেছে। সেই মাতলামির মধ্যেই গুরুগিরি ছেড়ে, বেনে হওয়ার বাসনা জাগল। কিন্তু ছিল না বেনে-বুদ্ধি। ফলে অবস্থাটা দাঁড়াল না ঘরকা, না ঘাটকা। ঐশ্বর্য গেল রসাতলে, গোষ্ঠী হাতী মশা-ডোবা জল সইয়ে কাদা করল। মান-সম্মান সব গেল, পরবর্তী বংশধরেরা হল আকাট, মন্ত্র হল পয়সা।

অবলাকান্ত তখন 'ক অক্ষর গো-মাংস' হলেও, একটা চটকলে কেরানীর কাজ করত। সরাবখানায় দশজনের সঙ্গে বসে মদ খেত, জুয়া খেলত, বাড়ি যেত, (এসব অভ্যেসগুলো এখনো তার পুরোপুরি আছে, যদিও তার চেহারাটা পাল্‌টে গেছে)। কারখানায় ছোটখাট মাল চুরি করত ছিঁচকে চোরের মতো। এ সময়ে এল শশীবালা, তার বড়দাদার আইবুড়ো শালী।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতোই এ সময়ে অবলাকান্ত মিউনিসিপালিটির ইলেকশনে দাঁড়িয়ে কমিশনার হয়ে গেল। কমিশনার হয়ে দেখল মিউনিসি-পালিটির চারদিকে ফুটোফাটা, আর সব ফুটোফাটা দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পয়সা

পড়ে। আর যায় কোথায়! গণ্ডুষ ভরে তা অবলাকান্তও তার দলের সঙ্গে নিল। চাকরিটি দিল ছেড়ে।

চাকরি ছাড়ার কথাটা মনে পড়তেই রিকসাটাশুদ্ধ অবলাকান্তর মাথাটা একবার বোঁ করে পাক দিয়ে উঠল। আজকে চাকরিটা থাকলে বোধ হয় এ অবস্থা—যাক্।

কমিশনারদের মধ্যেই একজন কংগ্রেস-সেবক অবলাকান্তকে রাজনীতিতে হাতেখড়ি দিল। সেই থেকে শুরু।

মনে পড়তেই অবলাকান্ত তাড়াতাড়ি চোখ বুজল, শত রেখার দ্রুত আবির্ভাবে মুখটা আবার কুটোর দলার মতো হয়ে উঠল। শক্ত হয়ে উঠল চোয়াল দুটো। এ পথ ও জনারণ্যের মধ্যে নিজেকে সামলাতে পারছে না অবলাকান্ত। নিজেকে সে বার বার সান্ত্বনা দিতে লাগল, ছি ছি ঘ'টে (ঘ'টে তার ডাক নাম) তোমার মতো হাল তো কতজনারই হয়েছে!

তাই কি? কিন্তু অবলাকান্তর মনে হচ্ছে, তার আকাশ মাটি একাকার হয়ে গেছে, জগৎ অন্ধকার হয়ে গেছে, সেই অন্ধকারের ভিতর দিয়ে রিকসাটা তাকে নরকের দরজায় পৌঁছে দিতে চলেছে। জীবনটা তার পিছনে পড়ে আছে, সে সুখদুঃখের অতীত একটা প্রেতমাত্র। তার সবই শেষ হয়েছে। কেন না—

আবার গোড়ার কথাই মনে পড়ল তার। (এই সময়ে সে রিকসাওয়ালাটাকে মনে মনে গালি দিল, শুয়োরের বাচ্চা টানতেও পারে না।) মিউনিসিপালিটির টাকা জুটল, কিন্তু সে টাকা ব্যবহারের নীতি ছিল আলাদা। পয়সার অভাবে স্ফূর্তির যেসব পথ বন্ধ ছিল, পুরোহিতের ছেলের যে আশৈশব সাধনা—দেশব্যাপী পাহাড়ে জঙ্গলে গ্রামে শহরে নানান বৈচিত্র্যের মধ্যে সুখভোগ করে বেড়াবে—সেই মত্ত বাসরের যৌবন-আসরের পর্দা সরিয়ে ঢুকে পড়ল সে। আনুষ্ঠানিকভাবে দাদার শালী শশীকেও গাঁটছড়া বেঁধে এনে রাখল ঘরে।

কিন্তু যখন পকেট শূন্য হল, সেদিন দেখা গেল, কোথায় রাজা, রাজ্যপাট, শশী, সুরা, ইয়ার-দোস্ত। সব কোন-ফাঁকে কেটে পড়েছে। পড়ে আছে শুধু বাপ-পিতামহের বাড়িটার অনেক ভাগের পুরনো জীর্ণ একটা অংশ, আর বাড়িটার মতোই জীর্ণ শরীরের শশীবালা, কোলে তার বছরখানেকের একটা মেয়ে।

কিন্তু অবলাকান্ত দমল না। লোকে তাকে তখনো একটা হিরো ভাবত। বয়সও ছিল। ভবিষ্যতের জন্ত সে ঝাঁপ দিল রাজনীতিতে একেবারে ভারত-মাতার কোলে বীর সন্তানের মতো। লহমায় নাম হল তার শ্রেষ্ঠকর্মী বলে, মিউনিসিপালিটি এলাকার কংগ্রেস সেক্রেটারি হয়ে গেল, মহকুমা কমিটির একজন। তার থেকে বয়সে নবীন অথচ কর্মে প্রধান নেতারা বলল, ছোকরা তেজী আছে।

বিয়াল্লিশ সালে ছ'মাস জেলও খাটল, ছেচল্লিশের ইলেকশনে ঝড়ের বেগে সারা জেলা সে তোলপাড় করে তুলল। এমন কি সেহরজী, অবলাকান্ত, বলে পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন।

সেইদিন অর্থের সঙ্গে নতুন আশার বীজ পড়ল তার মনে। সম্মান চাই, মালা চাই, তার প্রাসাদোপম অট্টালিকার সামনে (অর্থাৎ, প্রাসাদ তার হবে এটা ধরেই নিয়েছে) এসে দাঁড়াবে কুলললনারা (ললনাদের মালা আর কৌটার তার বড় সাধ) আঙুলের ডগায় জয়তিলক নিয়ে। আর মাননীয় পুরুষের প্রতি কোন্ মেয়ের না লোভ আছে! আহা আহা, কী সে দিন!

হঠাৎ ঘায়ে খোঁচা খাওয়ার মতো তার নিজের মেয়ের কথা মনে পড়ে গেল। কোল-বসা ছুটো টানা টানা মাতাল চোখ, রং-মাখা চোপসানো গাল, অন্তের মতো মাপাজোকা সাজানো শরীর। বাপের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে অনেকের গলায় মালা দিয়েছে, তিলক দিয়েছে কপালে। আর...

আর হিরো অবলাকান্ত কেবলি এগিয়েছে। আজকে সে কয়েকটা চটকল ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা কয়েকটার সেক্রেটারি। কবে জিন্ ধরে ঘোড়া ছুটিয়েছে সে। আসছে, আসছে সেদিন। তার ভবিষ্যৎ—

আচমকা ভাঙা গলার খলখল হাসিতে চমকে উঠল অবলাকান্ত। তাকিয়ে দেখল কয়েকটা রিক্সাওয়ালা নিজেদের মধ্যে কি নিয়ে হাসাহাসি করছে। যাক্, তাহলে অবলাকান্তকে নিয়ে কেউ বিদ্রূপ করছে না। কেনই বা করবে? ওরা কি করে জানবে তার নমিনেশন না পাওয়ার কথা! আর যদি জানলই, তাহলেও বা...

থমকে গেল অবলাকান্তর মন। উল্কা গতিতে ছুটে আসা ঘোড়া অন্ধ-গভীর খাদের কিনারায় এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। স্বর্গের দুয়ারে এসে পাশ-পোর্ট হারিয়ে গেছে।

শান্ত হও, শান্ত হও ব'টে! স্থির হও। পথে এখন কত মেয়েপুরুষ মজুরের ভিড়, কত লোকে তোমার দিকে তাকিয়ে আছে, হয়তো কতলোক জমা হয়ে আছে ইউনিয়নে। শক্ত হয়ে গিয়ে দাঁড়াও তাদের সামনে (শালা রিক্সাওয়ালা যেন আমাকে ঠেলা গাড়িতে করে নিয়ে যাচ্ছে।)

আবার চিন্তায় ডুবে গেল সে। দৃষ্টি রইল শূন্যে আবদ্ধ। পথে ছুটির ভিড়। আকাশে লেগেছে সন্ধ্যার ছোঁয়া। ঘরমুখো পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। কে একটু হাসল কিংবা সেলাম দিল অম্বরিশ বলে তা দেখতে পেল না অবলাকান্ত, যার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে এ জনারণ্যের একটি মুখও কোনদিন বাদ যায় না।

আহা, দেখ দেখ অবলাকান্ত, গঙ্গার ধারের নিরালা পথে চটকলের যুবক ম্যানেজার শ্রীযুত ডাড্‌লি শ্রীমতী ডাড্‌লিকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যে মহিলাকে ইওরোপীয় ক্লাব-বারে দেখে তোমার প্রৌঢ় বুকে আগুন জলে উঠত। দেখ, শ্রীমতী তোমার দিকেই তার নীল আগুনের মত চোখ তুলে হাসছে। হেসে একটু মেমসাহেবকে জবাব দাও! বড় আশায় তুমি যে এক সুদিনের আশায় ছিলে!

না, স্থির দৃষ্টি একটুও হেলল না। ফুডিটা পাতি হাঁসের একসঙ্গে কোরাসের মত প্যাঁক প্যাঁক করে বাজছে রিকসার হর্নটা। বাজতে বাজতে থামল এসে ইউনিয়ন অফিসের সামনে। ভাড়া মিটিয়ে নামল অবলাকান্ত।

কমিটি মিটিং হওয়ার কথা আছে ইউনিয়নের। কিন্তু একজন ছাড়া কেউই আসেনি এখনো। কতগুলি বুড়ি মেয়েমানুষ এক কোণে বসে আছে জড়সড় হয়ে। ওদের ছাঁটাই নোটিস দিয়েছে। কয়েকজন পুরুষ এসেছে তাদের বিশেষ বিশেষ অভিযোগ নিয়ে। কার স্পষ্ট চাপা গলা ভেসে আসছে, এই দালালদের কাছে এইচিস তুই নালিশ জানাতে! ওরে শালা এরা হল কোম্পানি মাথায় করে রাখবার মুটে। এ শালাদের বাদ দে।

কমিটির অন্যতম সভ্য কুইনস্ মিলের ডাক্তার বসে বসে চোখ বুজে সিগারেট টানছে। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে এর মধ্যেই বোতল উজাড় করে এসেছে সে। অবলাকান্তকে দেখে বলে উঠল, এসে পড়েছ দাদা।

হ্যাঁ, তাহলে—

বাধা দিল তার কথায় অবলাকান্ত। তার স্বাভাবিক দিলদরিয়া তাব

ফুটিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করে হেসে বলল, তাহলে পেলাম না ইন্টার-ভিউ লেটার।

ডাক্তার একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, ইন্টারভিউ মানে?

ওই তুমি যে কথা বলতে যাচ্ছিলে। তা সে তো ইন্টারভিউই বটে। টিকেট পেলে না হয় একবার ট্রায়ালের চেষ্টা করে দেখতুম। পিপলসের অফিসে একটা ট্রায়াল—বলতে বলতে আবার সেই চিন্তায় চলে গেল অবলাকান্ত। না অবলাকান্ত নয়, তার ঘ'টে। আপন মনে ফিস্ ফিস্ করতে করতে ভাবনায় ডুবে গেল।...ইন্টারভিউ। হ্যাঁ তাই তো। মনটা যে তার সেই তারেই বাঁধা ছিল, ছিল অনেক আশা। সময়ে অসময়ে সে বুঝিয়েছে শশীবালাকে, তার মেয়েকে, নিজেকে, ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের, বলেছে তার জীবনের সব ও শেষ চাওয়ার দিনগুলির কথা। শশীর যৌবন নাকি ফিরিয়ে দেবে, পাহাড় তুলবে ঐশ্বর্যের, গাড়ি বাড়ি, মেয়েটা ঝুলবে কোন রাজপুত্রের গলায় একখানি মুক্তোর লকেটের মতো। ভদ্রলোকের মেয়েরা মহামুক্তার মতো শ্রেষ্ঠ নাগরিক অবলাকান্তকে দেবে মালা। ঘ'টে ভাবত কেমন করে সে মেয়েগুলোকে নিয়ে—

আচমকা যেন বাতি ফিউজ হয়ে গিয়ে অন্ধকারে ভেসে উঠল তার মেয়ের মুখ। বয়সকালের রূপ হারিয়ে কাঠের মতো শরীরটাতে বিষের জ্বালা নিয়ে হাহাকার করে ঘুরছে মেয়েটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, অবলাকান্তই তাকে সে পথে এগিয়ে দিয়েছে, বুঝি লেলিয়েই দিয়েছে মালা হাতে। পাশপোর্ট দিয়েছে মেয়েকে, নিজের পাশপোর্টের জন্ত। সারা মুখটা দাগ পাকিয়ে উঠল অবলা-কান্তর, গলার শিরগুলো ফুলে উঠল মোটা দড়ির মতো। মনে হচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা গলে গিয়ে বমি হয়ে যাবে এখুনি।

ডাক্তার চেঁচিয়ে বলে উঠল, ওহো। তুমি নমিনেশনের কথা বলছ? মদের ঝোঁকে এতক্ষণ সে ব্যাপারটা ধরতেই পারেনি। আরে সেতো আমি আগেই জানি যে, ওসব চেষ্টা বৃথা। ওই যে ব্যাটাকে দিয়েছে, তোমার সম্বারাম ঘেড়ি, না ভেড়ি, তার আছে টাকার গাছ, মস্ত সওদাগর। অকূলে সে কূল দেবে, সলিড্ ফ্রেণ্ড—

অবলাকান্ত বোকার মতো প্রশ্ন করে বসল, আমি কি অ-সলিড ফ্রেণ্ড? সে শুয়োরের বাচ্চাকে চেনে কে, কী করেছে এখানে, কী কাজ করেছে?

ডাক্তার হা হা করে হেসে উঠল, দেখ দেখ, পাগলের মতো কথা বলছে

দেখ! কাজ? কাজ তোমার কাছে কে চেয়েছে? টাকা থাকলে তো কাজের লোক কতই পাওয়া যায়। তুমিও তো কাজ করছ, করবেও। আর এ নিয়ে তুমি এত ভাবছ?

অবলাকান্ত তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার চেষ্টা করল। বলল, ভাবব কেন। ভাবছি না, কিন্তু ইনজাস্টিসটা—

ইনজাস্টিস! ডাক্তার এবার বিকৃত গলায় খল খল করে হেসে উঠল। —মাইরি অবলাদা, মনে হচ্ছে তোমার মাথার ঠিক নেই।

অবলাকান্ত দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে রইল। খোলা চোখে অন্ধ দৃষ্টিতে সে এটা সেটা দেখতে লাগল নেড়ে চেড়ে। কিন্তু কি দেখছে সে জানে না। মাথাটার মধ্যে যেন আগুন জ্বলছে মনে হচ্ছে। বাড়ি থেকে বোধ হয় আজ না বেরুলেই ভাল হত। হঠাৎ তার ইচ্ছে করল ডাক্তারকে এক ঘুষি দিয়ে ওর ওই মস্ত বাঁকা হাসিটা বন্ধ করে দেয়।

তার চোখ পড়ল ছাঁটাই-নোটিস-পাওয়া বুড়িগুলোর উপর, বাইরের দরজার কাছে সদ্য-কারখানা-ফেরতা কয়েকটা লোকের দিকে। সকলেই তার দিকে তাকিয়ে আছে। বোধ হয় হাসছে, কুত্তার বাচ্চাগুলো মনে মনে সব হাসছে তার দিকে তাকিয়ে, ওর টিকিট না পাওয়ার কথা জেনে। (আঃ ঘ'টে, এরকম মাথা গরম কি ঠিক হচ্ছে? কে হাসছে? কেউ তো হাসছে না। ওরা সব দরকারে এসেছে। তোমার নমিনেশন না পাওয়ায় ওদের সত্যিই কি কিছু যায় আসে?)

আবার অকারণ কাগজপত্র ঘাঁটতে লাগল সে। হাসবার যারা, তারা খোলাখুলিই হাসবে, পথে দেখে হাততালি দেবে, কোন দুর্বিনীত মুখের উপরে হয়তো বলে দেবে, শালা দলের টিকেট পায়নি।

সব, সবই জানে অবলাকান্ত। লোকে তাকে কি ভাবে, তাও সে জানে। সে যা, লোকে তাকে তাই ভাবে। লোকে তাকে গালাগাল দিয়েছে, অপমান করেছে, পীড়নও করেছে। কিন্তু সেদিন সে ছিল বসুমতী, যাকে বলে সর্বংসহা। লোকে বলত গণ্ডার।

যে যাই বলুক, কি আসে যায়। সে যে জানত, তার সুদিন আসছে। সুদিন!

ডাক্তার টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে নিচু গলায় ডাকল, অবলাদা!

অবলাদা? ওই ডাক পছন্দ নয় অবলাকান্তর। সে তার ধারালো মুখে

বাঁকা হেসে বলেছে, দেখ হে, অবলা বল না আমাকে। বল অবলাকান্ত। আমি যে তাই। অবলা জাতির কান্ত। ডাক্তার বলত, সেই ভয়ে তো দাদা বিয়ে করিনি, মাইরি। তোমার মত কান্ত থাকতে আমি আর অবলার স্বামী হই কেমন করে? যে খান চিনি, তারে যোগান চিন্তামণি। দিন কাটলেই হল।

আজ সে সব মনে এল না অবলাকান্তর। ডাক্তারের ডাকের জবাবে বলল, বল।

তোমার কমিটি তো কোথায় গায়েব হয়েছে। চল কেটে পড়ি। নইলে এ মাগীগুলো জ্বালাতন করবে, ওখানে কটা বখত খচ্চর দাঁড়িয়ে আছে। করবার তো কিছু নেই। ওদিকে মন্ত্রীসাহেবের খিচুনি, এদিকে শালা ফচ্‌-গুলোর লম্বাচওড়া বুলি। অন্য সময় হবে এ সব। চল নগিন সর্দারের ঘরে, দু'পাত্তর টেনে আসি। একটা ছুকরিও আছে বেশ—

অবলাকান্তর মনে হল, আজ দু'টা মাস সে লুকিয়ে মদ খেয়েছে, মাতাল হয়ে পথে বেরোয় নি। খোলাখুলি কোন বেলেল্লাপনা করেনি। বোঝাতে চেয়েছে লোককে, সে ভাল হয়ে গেছে, পরিবর্ত্তন হয়েছে তার। সম্প্রতি ভাবছিল, সিগারেট খাওয়াটাও লোকের সামনে বন্ধ করে দেবে কি না। সে ভাবছে, কিন্তু কতগুলি কাগজ জমা পাকিয়ে যাচ্ছে তার মুঠোর মধ্যে। এক মুহূর্ত্ত চুপ থেকে বলল, চল, তাই চল।

বলে সে উঠে দাঁড়াল। ইউনিয়নের কেরানীটা বাইরে বসেছিল। এসে বলল, চলে যাচ্ছেন?

জবাব দিল ডাক্তার, হ্যাঁ। ওদের কিছু লেখালেখির থাকলে লিখে রাখবেন, আজ আর কিছু সম্ভব নয়।

বুড়িগুলো হঠাৎ গলা ছেড়ে চেঁচাতে আরম্ভ করল, বাইরের লোক ক'টা ইউনিয়নের উদ্দেশ্যে খেউড় করতে করতে কেরানীর টেবিলটা ঘিরে ধরল।

রাস্তায় বাতি জ্বলে উঠেছে, ভিড় জমেছে সন্ধ্যা রাত্রির।

অবলাকান্ত চলেছে যেন কোন নির্জ্জন পথে। শব্দহীন দীর্ঘ পথ।

নগিনের বাড়ি এসে আকণ্ঠ পান করল সে, খানিকটা নির্বিকার উদাস-ভাবে। থেকে থেকে তার মুখটা কখনো লম্বা, কখনো গোল হয়ে উঠছিল। কখনো ভাবলেশ, বা অনেক ভাবের ঘোরে ভাবময়। ডাক্তারের লেলিয়ে দেওয়া মেয়েটা অনেক চেষ্টা করেও সুবিধে করতে পারল না।

তারপরে একসময় আগুনের মতো চকচকে লালমুখ নিয়ে অবলাকান্ত উঠে চেঁচিয়ে উঠল, সে শালাকে চেনে কে ? সে কে ?

অর্থাৎ সেই গয়ারাম ঘেড়ি না তেড়ির কথা বলছে সে। তারপরে সেই রক্ষিতা মেয়েটার দিকে নজর পড়তেই সে থমকে গেল। যেন চেনে অথচ চিনতে পারছে না, এমনি ভাবে দেখছে অথবা দেখে বড় তাজ্জব হয়েছে।

না, তা নয়। আসলে অবলাকান্তর চোখে ভেসে উঠেছে তার মেয়ের চেহারা। শশীবালার কথা মনে পড়ছে, মনে পড়ছে তার আশার কথা, তার ভবিষ্যৎ জীবনের কথা। তারপর হঠাৎ সব গোলমাল হয়ে গেল। সে খ্যাপা শুয়োরের মত একটা লম্বা পাক দিয়ে বেরিয়ে গেল।

পথে ভিড় নেই, গাড়িঘোড়াও কম। রাত দশটা বেজে গেছে।

অবলাকান্ত টলতে টলতে চলেছে, বাতাসে দুলতে দুলতে চলেছে ডাইনে বাঁয়ে। অনেকদিন পর মাতাল হয়ে খোলা আকাশের তলায় এসেছে সে, তার যা খুশি তাই বলছে। না, সে ভাবছে অনেক কিছু বলছে, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে কিছুই বলছে না। তার বুকের মধ্যে একটা দারুণ যন্ত্রণা হচ্ছে, তার মাথার মধ্যে একটা দুরন্ত নাগরদোলায় চেপে কারা যেন চিৎকার করছে, নমিনেশন, ভোট, মেয়ে, বউ, অর্থ, মান, প্রতিপত্তি, সুন্দরী যুবতী—সাহেব মন্ত্রী—।

মারো মারো। বলে বিড়বিড় করে উঠল সে। কারা হাসছে। কে চেঁচিয়ে উঠল, হমারা পিসিডেন সাব।। ঘাড়ে পিঠে কোত্থেকে জল পড়লছলাৎ করে।

একটা সেপাই এসে খপাৎ করে হাত ধরল অবলাকান্তর, চাঁদ আর জায়গা পেলে না ? ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, কোথায় যাবে—এই—

না, ভুল করেনি অবলাকান্ত। মনে মনে হেসে ভাবল, ব্যাটা নতুন সেপাই, চেনে না আমাকে। ধরুক, যা খুশি তাই করুক। বলল, যাওয়ার তো জায়গা নেই বাবা।

জায়গা নেই ? বলে সেপাইটা একটা কটূক্তি করে টেনে নিয়ে চলল থানায়। আবার কে হেসে উঠল মোটা গলায়। অবলাকান্তর মনে হল, বুঝি সে নিজে হাসছে।

থানার অফিসার ইনচার্জ সমর চমকে উঠে খিঁচিয়ে উঠল সেপাইটাকে, এই ইডিয়ট, কার হাত ধরে নিয়ে এসেছ তুমি? ছাড় শীগ্‌গির।

সেপাইটা ভড়কে গিয়ে সরে দাঁড়াল।

অবলাকান্ত প্রায় ছোট ভাইটির মতো মনে করত ও. সি.-কে। সে সেপাইটার কাছে সরে গিয়ে আড়াল করে বলল, ভাখ সমর, খবরদার ওকে কিছু বলিস্‌নি। ওর কোন দোষ নেই। সত্যি—

সেপাইটা ততক্ষণ সমরের ইঙ্গিতে সরে গেছে। সে তাড়াতাড়ি অবলাকান্তকে বসিয়ে বলল, বসুন, বসুন দাদা। একি করেছেন? এতদিন বাদে—

এতদিন বাদে। চাপা গলায় ফিস্‌ফিস্‌ করে উঠল অবলাকান্ত, অনেক-দিন তো হল, আর কেন? আন্‌ফিট্ তো হয়েই গেছি। শালা, তোদের মতো একটা পোস্ট পাওয়ার চেষ্টা করলেও ভাল করতাম, আপ্‌সে আসত লাখ টাকা। কোন শালা যেত ওদের টিকিটের জন্ত। তোর কর্তারা তো দিলে না নমিনেশন—

সমর দারোগা হাসি চেপে বলল, দাদা, সবই তো আপনারা।

আমরা? গলা খুলে গেল অবলাকান্তর, আমি কে? শালা ধোবী কা কুত্তা। ঘর বার, সবই দূর হয়ে গেছে,—

গলা বন্ধ হয়ে এল তার। হঠাৎ টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে সমরের হাত চেপে ধরে যেন ফুঁপিয়ে উঠল, তুই বল সমর, তুই জানিস্‌ কী না করেছি। এই চাকলার সব গোলমালে কি আমি ছুটে ছুটে যাইনি, এখানকার খ্যাপা কুলিকামিনের মুখোমুখি দাঁড়াইনি? যাদের তোরাও ভয় করতিস্‌? বল্‌, আমি কি ষ্ট্রাইক ভেঙে দিইনি, দিনের পর দিন পথে ঘাটে ইউনিয়নে ওদের সামাল দিইনি, ধোঁকা দিইনি? বারবার ওদের ফিরিয়ে আনিনি লড়ায়ের মুখ থেকে, ঠ্যাঙানি খাইনি দালাল বলে?

হঠাৎ একটা সরু গলায় হি হি হাসি শুনে অবলা থেমে গেল। দেখল হাজতের ভিতরে গরাদ ধরে একটা জন্তুর মতো কুৎসিত মুখ দাঁত বের করে দেখছে তাদের।

সমর খেঁকিয়ে উঠল, এও হারামজাদা!

মুখটা অদৃশ্ত হয়ে গেল হাজতের অন্ধকারে।

কোলা ব্যাঙের মত মোটা গলায় অবলাকান্ত যেন আপন মনেই বলছে,

হারামজাদ্ আমি, আমি। আমাকে পুরে দে মাইরি, তোর পায়ে পড়ি।

সমর দারোগা তাড়াতাড়ি একটা রিক্সা ডাকিয়ে অবলাকান্তকে তুলে দিল বাড়ি যান দাদা, অনেক রাত হয়েছে।

রিকসায় উঠে একপাশে চলে পড়ে বলল অবলাকান্ত, রাতই তো সার। রাত...

রিকসা চলল উত্তরদিকে। অবলাকান্ত তেমনি বিড়বিড় করতে লাগল। মগজের মধ্যে কোলাহল চলেছে সমানে। কেবল থেকে থেকে ছুটো কোল-বসা অসহায় চোখ ভেসে উঠতে লাগল আর বার বারই বলতে লাগল, আমি কি খাইনি—স্ট্রাইক ভাঙিনি—ধোঁকা দিইনি?—

তারপরে একবার টাল সামলাতে না পেয়ে রাস্তায় পড়ে একেবারে গড়িয়ে পড়ল নর্দমার মধ্যে। এ অবস্থাতেও সে মনে মনে বলে উঠল, এসব কি হচ্ছে ঘ'টে? মরবে নাকি?

রিকসাওয়ালাটা রাগে খিস্তি করতে করতে অবলাকান্তকে টেনে তুলল। পাঁকে ভরে গেছে সারা শরীর, দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে অবলাকান্তর শরীর থেকে।

এক মুহূর্ত থমকে থেকে রিকসাওয়ালাটা তাকে পথের ধারে শুইয়ে দিল, পড়ে থাক্ শালা মাতাল কাঁহিকা। বলে খালি রিকসা নিয়ে সরে পড়ল সে অন্ত পথে।

বোধ হয় ঘ'টে মনে মনে বলল, তা থাক্‌ছি, কিন্তু শশীবালা সারারাত ভাববে। বলে সে ধুলোর জোর করে মুখ গুঁজে রাখল। ঘ'টেটা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠতে চাইছে।

শ্রীভাক্তের "আদিম সাম্যবাদ হইতে দাসত্ব"

ডা: ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত "অগ্রণী" পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় শ্রীডাঙ্গের "India, From Primitive Communism to Slavery" পুস্তকের সমালোচনা-প্রসঙ্গে মার্কসবাদ, মর্গানবাদ ও আধুনিক নৃতাত্ত্বিক গবেষণা সম্বন্ধে যে-সব গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন আগামী "পৌষ" সংখ্যা "পরিচয়"-এ সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করবেন শ্রীবিনয় ঘোষ।

রামমোহন

[পূর্বানুবৃত্তি]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

তৃতীয় অঙ্ক

পাঁচ

[ভারতের গবর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের প্রাসাদ। খাস কামরায় একটি টেবিলে মুখোমুখি বসে আছেন গবর্ণর-জেনারেল ও রামমোহন রায়। লাটসাহেবের মর্যাদা অনুসারে ঘরখানা সাজানো। সময়: বিকেল।]

বেণ্টিঙ্ক। কাল আপনাকে আমি অনেক প্রত্যাশা করিয়াছিলাম।

রামমোহন। আমি অত্যন্ত দুঃখিত ইয়োর এক্সেলেন্সি। বিশেষ কাজেই আমি আসতে পারি নি।

বেণ্টিঙ্ক। আমি জানি রায়, কী জন্য আপনি আসেন নাই। কাল যখন আমার এ-ডি-কং আপনার নিকট হইতে ফিরিয়া আমাকে জানাইল যে আপনি আসিবেন না, তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: "তুমি তাঁহাকে কী বলিয়াছিলে?" সে কহিল: বলিয়াছিলাম, 'ভারতের গবর্ণর জেনারেল মাননীয় লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক ডাকিয়াছেন।' তাই আজ তাহাকে আদেশ দিলাম, গিয়া বলিবে: 'মিস্টার বেণ্টিঙ্ক আপনার সহিত কিছু আলাপ করিয়া সুখী হইতে চান।' সেই জন্যেই আপনি আসিয়াছেন—নহিলে আসিতেন না।

রামমোহন। (অপ্রতিভ) না—ঠিক তা নয়—

বেণ্টিঙ্ক। আপনি লজ্জা পাইবেন না রামমোহন। I highly appreciate your sentiment। এ দেশীয় nativeদিগের নিকট হইতে এইরূপ spirit-ই আমি প্রত্যাশা করি। বন্ধুভাবে আপনাকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছি, সেখানে পদমর্যাদার সুযোগ লওয়া আমারই অপরাধ হইয়াছে। I apologise।

রামমোহন। My Lord, দুঃখের বিষয়, আপনার মতো গবর্ণর-জেনারেল এ দেশে বেশি আসেন না। অধিকাংশই ওয়ারেন হেস্টিংসের সগোত্র। কিন্তু সে কথা যাক। সতীদাহ সম্পর্কে কাগজপত্রগুলো আপনি ভালো করে দেখেছেন কি?

বেণ্টিঙ্ক। দেখিয়াছি। ইহা অত্যন্ত বীভৎস প্রথা। ভারতবর্ষের মতো এমন advanced দেশে কী করিয়া ইহা চলিয়া আসিয়াছে তাহাই আশ্চর্য। বেলি সাহেবের রিপোর্ট আমি পড়িতেছিলাম। দেখিলাম, এক 1827-এই কলিকাতা এবং অন্য কয়েকটি জেলায় প্রায় সাড়ে ছয় শত সতীদাহ ঘটিয়াছে।

রামমোহন। এবং এদের মধ্যে ছয়শোকেই জোর করে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। My Lord—দেশের আইন-শৃংখলার রক্ষক হয়েও এই হত্যাকাণ্ড আপনারা বন্ধ করেন না।

বেণ্টিঙ্ক। আমরা কী করিতে পারি বলুন। আমরা বিদেশী—ক্রীশ্চান। আপনাদের ধর্মে তো আমরা হস্তক্ষেপ করিতে পারি না। অথচ জেলার পর জেলা হইতে পুলিস রিপোর্ট আসিতেছে। তাহাদের চোখের সামনে widowকে জোর করিয়া পোড়াইয়া মারা হয়—সে পলাইয়া গেলে ধরিয়া আনিয়া আগুনে চাপানো হয়। কিন্তু ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু করা উচিত নয় বলিয়া এমন horrible sightও তাহাদের দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে হয়।

রামমোহন। ধর্ম! না—এ ধর্ম নয়। শাস্ত্রে এমন কোনও উল্লেখ নেই যে অনিচ্ছুক সতীকে সহমরণে যেতেই হবে। তা ছাড়া রক্ষণশীল সমাজের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারও সতীদাহের বিপক্ষেই মত দিয়েছেন।

বেণ্টিঙ্ক। আপনাদের ধর্মের খবর আপনারাই জানেন। আমাদের পক্ষ হইতে চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। এই দেখুন—(কাগজপত্র উল্টে) লর্ড ওয়েলেসলির time হইতেই আমরা move করিতেছি। সেই সময় নিজামৎ আদালতের পণ্ডিতদের এ সম্পর্কে opinion চাওয়া হয়। তাহাতে পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্মা যাহা জানাইয়াছিলেন, তাহা দেখুন—

(কাগজগুলি রামমোহনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন)

রামমোহন। (দ্রুত চোখ বুলিয়ে) My Lord, এ থেকে আমার যুক্তিই প্রমাণ হচ্ছে। ঘনশ্যাম শর্মা বলছেন, অন্তঃসত্ত্বা, নাবালিকা বা শিশুর

জননীর স্পষ্টত সহমরণে যাওয়া অশাস্ত্রীয়। তা ছাড়া কোনরকম মাদক ইত্যাদি খাইয়ে অনিচ্ছুক সতীকে সহমৃতা করাও বে-আইনী। অথচ প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই এই কাজগুলো করা হয়ে থাকে। যাদের এমনিতে মাদক খাওয়ানো হয় না—তারা মাতাল হয় ধর্মের মদ খেয়ে। মারাত্মক এই ধর্মের নেশা। এমনও হয়েছে—শ্মশানে গিয়ে চেষ্টা করেও সতীদাহ আটকাতে পারিনি—নেশার ঝোঁকে স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেছে মেয়েরা।

বেণ্টিঙ্ক ॥ তা ছাড়া একটা কথাও আছে। সংকল্প করিয়া যদি কোন নারী সহমৃতা না হয়, আপনাদের শাস্ত্রমতে তাহার অনন্ত নরক—।

রামমোহন ॥ সংকল্প! সদ্য স্বামীর শোকে পাগল হয়ে সহমরণের সংকল্প করা অনেক সহজ My lord। কিন্তু আগুনে পুড়ে মরা অত সহজ নয়। আর তা ছাড়া, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য থাকে বিধবাকে চিতায় চড়িয়ে নিষ্কণ্টকভাবে তার সম্পত্তি দখল করা। My lord, from the standpoint of humanity জিনিসটাকে আপনি বিচার করুন। আফ্রিকার লোকের ধর্ম নরমাংস খাওয়া—কিন্তু সে ধর্মকে আপনারা কি স্বীকার করতে রাজী হবেন? তাদের সে ধর্মকে তো আপনারা বন্দুকের গুলিই উপহার দেন। ধর্ম যদি barbarism হয়, তা হলে সে ধর্মে আঘাত করা যে আরো greater religion, My lord।

বেণ্টিঙ্ক ॥ হাঁ—গোঁড়ামির পরিণাম কী ভয়ানক হইতে পারে, তাহা ইংল্যাণ্ডেও আমরা জানি। এক সময়ে আমাদের দেশে witchcraft সম্বন্ধে লোকের এমন prejudice দাড়িয়াছিল যে হাজার হাজার বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে ডাইনি সন্দেহ করিয়া hang করা হইয়াছিল—many were burnt alive!

রামমোহন ॥ সে প্রথা যদি আপনারা বন্ধ করে থাকেন, তবে সতীদাহই বা কেন করবেন না? My lord—এই পৈশাচিকতা যে করেই হোক রোধ করতে হবে। এবং আপনারা ইচ্ছা করলেই তা হতে পারে।

বেণ্টিঙ্ক ॥ ইচ্ছা! আপনি জানেন না রামমোহন—What I feel! এই তো recently একখানি বই পড়িলাম: "The Suttee's Cry to Britain!" লিখিয়াছেন মিস্টার জে. পেগ্‌স। What a horror! রামমোহন, আপনি যদি আমায় সাহায্য করেন—I must abolish this nuisance!

রামমোহন। সাহায্য! I stake my life—I stake my everything for it!

বেণ্টিঙ্ক। You are great রামমোহন। আপনি মহৎ। আপনার অন্য সমস্ত activityর কথাও আমি শুনিয়াছি। কিন্তু সব চাইতে বিস্ময়কর কী জানেন? আপনাদেরই দেশের সমস্ত বড় লোক—যেমন ধরুন, রাজা রাধাকান্ত দেব—জয়কৃষ্ণ সিংহ—মতিলাল শীল—প্রভৃতি ইহার বিরোধিতা করিতেছেন।

রামমোহন। শুধু বিরোধিতা নয়—আমার ওপর শারীরিক আক্রমণের চেষ্টাও চলছে। অন্ধকারে থেকে যারা কানা হয়ে গেছে, আলো তাদের সহ্য হয় না। কিন্তু প্যাঁচাদের জন্যে দুর্ভাবনা আমার নেই—My lord, সতীদাহ আপনি বন্ধ করুন। এ শুধু আমার কথা নয়—সমস্ত ভারতবর্ষের পক্ষ থেকেই আমি বলছি।

বেণ্টিঙ্ক। আমার চেষ্টার ত্রুটি হইবে না—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

(বেয়ারা এসে একখানা কাগজ দিল, বেণ্টিঙ্ক পড়লেন)

যাও—পনেরো-কুড়ি মিনিট পরে আসিতে বলো।

রামমোহন। আপনার কাজের ক্ষতি হচ্ছে, আমি উঠি।

বেণ্টিঙ্ক। না-না, বিশেষ কিছু নয়। ওয়াহাবী আন্দোলনের rebelদের সম্পর্কে সমস্যা দেখা দিয়াছে—সেই সম্পর্কে military officerদের সঙ্গে discuss করিতে হইবে। সম্ভবত সৈন্য পাঠাইতে হইবে।

রামমোহন। ওয়াহাবী আন্দোলন!

বেণ্টিঙ্ক। শুনিয়াছেন আশা করি। ইহা একটি communal movement। তিতুমীর বলিয়া একটা fanatic নদীয়া-ফরিদপুর অঞ্চলে খুব disturbance সৃষ্টি করিতেছে—

রামমোহন। Communal movement! No my lord, এ সম্বন্ধে আমি একমত নই। এ আন্দোলন বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে জনতার বিক্ষোভ! এ স্বাধীনতার সংগ্রাম! কিন্তু সব চাইতে painful কী জানেন My Lord? আজ দেশে ধর্মে ধর্মে বিরোধ—আচারে বিচারে সংঘাত। এক হিন্দুর মধ্যেই অজস্র শাখা-প্রশাখা, হিন্দু-মুসলমানে তো সমুদ্রের ব্যবধান। তাই এ সংগ্রাম সাম্প্রদায়িক হয়ে থাকবে—এর পরিণাম ব্যর্থতাতেই তলিয়ে যাবে। কিন্তু আজ যদি সারা দেশে একটি

মাত্র জাত থাকত—থাকত এক ধর্মে বিশ্বাসী একটি মাত্র ভারতবাসী—তা হলে—তা হলে—! কিন্তু কী হবে সে কথা বলে? সাধনা আমরা শুরু করেছি—আমার ভারতবর্ষ সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' মহাজাতির প্রতিষ্ঠা। যদি কোনো দিন আমার স্বপ্ন সফল হয়—তবে সেদিন তা ওয়াহাবী আন্দোলনেই ফুরিয়ে যাবে না—তা হবে সারা ভারতের মুক্তি সংগ্রাম।

বেণ্টিঙ্ক॥ কিন্তু ইহা তো পরাধীন জাতির মুক্তি আন্দোলন নয়। ইহা শুধুই rebellion।

রামমোহন॥ Rebellion থেকেই Revolution আসে। Excuse me My Lord, আপনাদের সমস্ত মহত্ত্বকে স্বীকার করেও আমি বলব—সে Revolution-এর ভূমিকা তৈরি হচ্ছে দেশে। "India for Indians"—এ সত্য ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসছে। বিদেশী শাসনকে একদিন এ দেশ থেকে চলে যেতে হবে—সেদিন এই ভারতবর্ষ গড়ে উঠবে ভারতবাসীর জন্যেই। সে ভারতবর্ষে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ঠাঁই পাবে—ইংরেজ-ভারতীয়ের ভেদ থাকবে না—খ্রীশ্চান-মুসলমান-বৌদ্ধ-হিন্দুর এক জাতি গড়ে উঠবে। সে কবে জানি না—কিন্তু My Lord, it will come—it must come!

বেণ্টিঙ্ক॥ গভর্নর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্কের কাছে ইহা রাজদ্রোহ। কিন্তু আমি বন্ধু বেণ্টিঙ্ক বলিতেছি—Yes Rammohan, it will come—it must come!

পর্দা। পড়ল

[ক্রমশ

স্থানাভাবে এই সংখ্যায় দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের "ফ্রয়েড প্রসঙ্গ" ছাপা গেল না।

কার্ল মার্কস

ভারত-ইতিহাস সম্পর্কে কালানুক্রমিক সংক্ষিপ্তসার

(৬৬৪-১৮৫৮)

মুখবন্ধ

মার্কস-এঙ্গেলস্-লেনিন ইনস্টিটিউট প্রণীত।

[উনিশ শতকের—অনুবাদক] পঞ্চম দশক হইতে শুরু করিয়া মার্কস মনোযোগে ভারতের বিষয় পড়াশোনা করেন। ভারত সম্বন্ধে তাঁহার আগ্রহের কারণ, এই দেশ উপনিবেশে পরিণত হইয়াছিল, ঔপনিবেশিক আধিপত্যের ও লুণ্ঠনের বহুবিধ আকার ও পদ্ধতি এই দেশে প্রযুক্ত দেখা যাইত। ভারত সম্বন্ধে তাঁহার আগ্রহের আরো একটি কারণ, এই দেশে তখনও পর্যন্ত আদিম-সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থা বহুল পরিমাণে রক্ষিত ছিল। "ভারতের অতীত ইতিহাসে অনেক উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটা সত্ত্বেও'—মার্কস ১৮৫৩ সালে লিখিয়াছেন—'তাহার সামাজিক অবস্থা অপরিবর্তিত রহিয়াছে সুদূরতম প্রাচীনকাল হইতে উনিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত" (ভারতের বৃটিশ শাসন, কার্ল মার্কস, নির্বাচিত রচনাবলী, দুই খণ্ডে প্রকাশিত, ২য় খণ্ড, ১৯৪০, পৃ ৫২১) [রুশ সংস্করণ—অনুবাদক]

প্রকাশিত কালানুক্রমিক সংক্ষিপ্তসার ভারতের ইতিহাসের হাজার বৎসরের অধিক কাল লইয়া ব্যাপৃত, সাত শতকের মধ্য হইতে উনিশ শতকের মধ্য পর্যন্ত; মুসলমান আক্রমণের প্রথম পর্ব হইতে ১৮৫৮ সালের ২রা অগস্ট পর্যন্ত, যেদিন পার্লামেন্টে ইণ্ডিয়া বিল আলোচিত হয়, ব্রিটিশ-অধিকৃত দেশ-গুলির সহিত ভারতকে একই ব্যবস্থাভুক্ত করিবার জন্য।

মার্কসের "কালানুক্রমে" প্রথম পর্বের জন্য—আঠারো শতকের মাঝ পর্যন্ত—তুলনায় কম জায়গা দেওয়া হইয়াছে, সমগ্র হস্তলিখিত পুঁথির এক-তৃতীয়াংশেরও কম। বাকি অংশ ভারতে ব্রিটিশ আক্রমণের ইতিহাসে ভরা।

মার্কস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সেইসব মুসলমান রাজবংশের কথা যাহারা পর-পর উত্তর ভারতে সিন্ধুনদের উপত্যকা হইতে গঙ্গার ধারা বাহিয়া রাজ্য

শাসন করিতেন, ও সেখান হইতে দক্ষিণাভিমুখে বিভিন্ন দিকে আক্রমণ বিস্তৃত করিতেন। অধিকতর বিস্তৃত সংক্ষিপ্তসার পাওয়া যায় মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস সম্বন্ধে, চেঙ্গিস খাঁ ও তৈমুরের বংশধর বাবর ১৫২৬ সালের আক্রমণে যে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

ভারতে ব্রিটিশ বিজয়ের ইতিহাসের কালানুক্রমিক সংক্ষিপ্তসার আরম্ভ করার আগে মার্কস পুনরায় অল্প কথায় বর্ণনা করিয়াছেন ম্যাসিডনের আলেক-জাণ্ডার হইতে শুরু করিয়া বিভিন্ন যুগে ভারতে বিদেশী আক্রমণের ইতিবৃত্ত, ও বিভিন্ন ভারতীয় শাসনব্যবস্থার পর্যালোচনা করিয়াছেন।

মার্কসের শেষ-জীবনে লিখিত পুঁথিগুলির মধ্যে ভারতের "কালানুক্রম" বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। "মার্কস ও এঙ্গেলস্-এর আর্কাইভস্"-এ প্রকাশিত ইতিহাসের বিষয়ে "কালানুক্রমিক সংক্ষিপ্তসার সমূহে" ইহা যোজনা করিয়াছে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিশিষ্ট। (পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম খণ্ড) [রুশ সংস্করণ—অনুবাদক]

ভারতে জমির মালিকানার বিভিন্ন ধরনগুলিতে নানা পরিবর্তন অধ্যয়ন করিতে গিয়া মার্কস এই কালানুক্রম প্রণয়ন করেন যাহাতে এই বৃহৎ দেশের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ ধারা সংক্ষেপে বর্ণনা করা যায়। জমির মালিকানার বিভিন্ন ধরনগুলির কী প্রকৃতি কেবল তাহার অধ্যয়নে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া মার্কস চেষ্টা করিয়াছিলেন ঐতিহাসিক ধারার সমগ্র রূপটিকে অধ্যয়ন করিতে সংশ্লিষ্টভাবে, (কংক্রীটলি)। যথা; কী অবস্থায় মুসলমানী আইন-কানুন (পাবলিক ল) ভারতীয় জমির মালিকানার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, কতকগুলি নির্দিষ্ট বিশেষ ক্ষেত্রে ফিউডালীকরণের পদ্ধতি কিভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল, ভারত বিজয় ও শোষণের পদ্ধতি কিভাবে ব্রিটিশেরা প্রসারিত করিয়াছিল, ইহাও তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

'আরো, ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব বিস্তারের ইতিহাসকে মার্কস ধাপে ধাপে অনুসরণ করিয়াছেন। ভারত বিজয় ঘটিতেছিল "ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর" নেতৃত্বে। সতের শতকের প্রথমে সৃষ্ট এই কোম্পানীটি ছিল ব্রিটিশ মূলধনী, কারবারী ও অভিজাতবর্গের হাতিয়ার। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতি ও প্রকারকে মার্কস উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন, আর সেই সঙ্গে প্রদর্শন করিয়াছেন ভারতে ব্রিটিশ শাসকগণের একটি পরিপূর্ণ চিত্রশালিকা।

যে অংশের মার্কস নিজেই নাম দিয়াছেন, "শেষ পর্ব, ১৮২৩-১৮৫৮; ইস্ট

ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তিরোধান" তাহাতে মার্কস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন পর পর অনেকগুলি যুদ্ধের দিকে যাহা ব্রিটিশেরা পরিচালিত করিয়াছিল ভারতে ও তাহার প্রতিবেশী দেশগুলিতে নূতন রাজ্য বিজয়ের লোভে।

এই "কালানুক্রমে" মার্কস দেখাইয়াছেন কেমন করিয়া ভারতের অধিবাসীগণের নির্মম শোষণের ফলে গ্রেট ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীগণের উপর ব্রিটিশ শাসনে কি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ফল ফলিয়াছিল তাহাও দেখাইয়াছেন।

এই "কালানুক্রম" প্রস্তুত করিতে মার্কসকে প্রচুর গ্রন্থাদি পড়িতে হইয়াছিল। প্রথম পর্বের ইতিহাসের জন্য—সাত শতক হইতে আঠারো শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত—মার্কস প্রধানত ব্যবহার করিয়াছেন—এলফিনস্টোন-কৃত ভারতের ইতিহাস।

ভারতে ব্রিটিশ বিজয়ের রাজনৈতিক ইতিহাসের কালানুক্রমের জন্য মার্কস কোন্ বইখানি ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা স্থির করিতে পারা যায় নাই।

বর্তমান "কালানুক্রম" সম্পাদনকালে কতকগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হইয়াছে, যেখানে পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত তথ্যের সহিত সর্বজনস্বীকৃত ও তর্কাতীত তথ্যের পার্থক্য ঘটিয়াছে। কতকগুলি বিষয়ে যেখানে ভবিষ্যতের প্রামাণিক ঐতিহাসিক গবেষণায় এমন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা মার্কসের গৃহীত তথ্য হইতে পৃথক, সেখানে এই নূতন তথ্য পাদটীকায়, যে নির্ভরযোগ্য পুস্তক হইতে উক্ত তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহার নামসমেত সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সকল মন্তব্যগুলি সম্পাদকমণ্ডলীর। গ্রন্থের কলেবরে সম্পাদকীয় প্রক্ষেপগুলি বন্ধনীর দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে।

অনুবাদক—নীরেন্দ্রনাথ রায়

পুস্তক পরিচয়

জীববিজ্ঞানে বিপ্লব ॥ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ॥ ক্যালকাটা বুক ক্লাব ॥ ৮৯ হ্যারিসন রোড, কলকাতা ॥ একটাকা আট আনা মাত্র ॥

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সাম্রাজ্যবাদী মহল থেকে সোভিয়েট-বিরোধী ঠাণ্ডা যুদ্ধ যতই গরম করবার চেষ্টা হচ্ছে, সোভিয়েট-বিরোধী প্রচারে ততই নতুন নতুন অস্ত্র আমদানি করা হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা আজ এটা স্পষ্টই উপলব্ধি করেছে আণবিক বোমা এ যুদ্ধে যথেষ্ট নয়। স্টালিনের বক্তব্যের মর্মটা তাঁরা ভালোই বুঝেছেন, জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে পারার উপরই যুদ্ধ বাঁধানোটা নির্ভর করে। তাই নিত্যনুতন সোভিয়েট-বিরোধী কুৎসা উদ্ভাবন করাটা বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম পেশা। লাইসেংকো-বাদকে উপলক্ষ করে বিজ্ঞান-জগতে যেভাবে ঝড়টা উঠেছে বা ওঠানো হয়েছে তা লক্ষ্যণীয়। ব্রিটিশ প্রকাশক-গোষ্ঠীরা এ সম্পর্কে অধুনা পর পর বই প্রকাশ করছেন। শুধু সাহিত্য-প্রচারই নয়; বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা প্রত্যক্ষভাবে প্রচারে লেগেছেন। ভারতবর্ষেও তার হাওয়া এসেছে; "সায়েন্স এণ্ড কালচার" পত্রিকায় অধ্যাপক রাগলস্ গেট্‌সের প্রবন্ধ, অধ্যাপক মুলার, ফোর্ড প্রভৃতির জীববিজ্ঞান-বিষয়ক বক্তৃতা সকল তারই নিদর্শন। মার্কস্‌বাদী বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে লাইসেংকোবাদের ব্যাখ্যা-মূলক বক্তব্য উপস্থিত করার সামান্য প্রচেষ্টা মাত্র হয়েছে। আলোচ্য বইটি সেদিক থেকে ভারতীয় ভাষায় প্রথম বই।

ডারউইনের বিবর্তনবাদ সমসাময়িক সমাজে যে-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল মার্কস্ এবং এঙ্গেলস্ তার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। এঙ্গেলস্ বলেছিলেন, ডারউইনবাদ জীবের সৃষ্টি সম্পর্কে মধ্যযুগীয় আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার মূলে কুঠারা-ঘাত করেছে। তারপর বহু সময় কেটে গেছে। উদীয়মান ধনতন্ত্র ডারউইন-বাদকে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্ষমতালাভের সংগ্রামে একটা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছিল। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সংকট তীব্র হয়ে ওঠার পর ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্র ডারউইনবাদকে তার যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে নিয়ে যেতে অস্বীকার করছে

তার পরিবর্তে ডারউইনবাদকে বিকৃত করে একদা-অবহেলিত মেণ্ডেলবাদকে পুনরুজ্জীবিত করে ডারউইনবাদকে তারা কার্যত নাকচ করতে চাইছে। অপর দিকে সোভিয়েট সমাজ-ব্যবস্থায় ডারউইনবাদকে যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা সম্ভব হয়েছে, সে-পরীক্ষায় যা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে তা বর্জন করে ডারউইনবাদের মূল সিদ্ধান্তের উপর দাঁড়িয়েই সোভিয়েট জীববিজ্ঞানী লাইসেংকো মেণ্ডেল-মর্গান-ভাইসমানবাদকে আঘাত করেছেন। "জীব-বিজ্ঞানে বিপ্লব" বইটিতে লামার্ক, ডারউইন, মেণ্ডেল, ভাইসমান ও লাইসেংকোর যাবৎ জীববিজ্ঞানে ধারাবাহিকভাবে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও প্রগতি চলেছে, তারই আলোচনা করা হয়েছে।

সোভিয়েট জীববিজ্ঞানী মিচুরিনের সারা জীবনের সাধনা এবং লাইসেং-কোর নিজের জীবনের একটা বড় অংশের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মিচুরিন-লাইসেংকোবাদের সৃষ্টি হয়েছে। বিজ্ঞানের কোনো ক্ষেত্রেই কোনো মার্কসবাদী শেষ কথা বলার ধৃষ্টতা রাখেন না; লাইসেংকোও তা করেন নি। বুর্জোয়া বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা পরীক্ষিত কোনো সিদ্ধান্তকেই লাইসেংকো অস্বীকার করেন নি। কিন্তু সোভিয়েটের বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রে কোটি কোটি কৃষকের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মিচুরিন-লাইসেংকোবাদের পক্ষে যে তথ্য হাজির করা হয়েছে বুর্জোয়া বৈজ্ঞানিকেরা তা নাকচ করছেন। তার জন্ম সুযোগমতো লাইসেংকোর বক্তব্যকে তাঁরা চেপেও যান। পেঙ্গুইনের Dictionary of Biologyতে মিচুরিন, লাইসেংকোর নামোল্লেখ পর্যন্ত পাবেন না! তাঁদের এ উষ্মা খুবই স্বাভাবিক। কারণ লাইসেংকো বুর্জোয়া অপবিজ্ঞানের মোক্ষম জায়গায় ঘা দিয়েছেন।

ভাইসমান-মেণ্ডেলবাদের মূল কথা হল—বংশগত সূত্রে জীব যে সমস্ত গুণ লাভ করে তার জন্ম দায়ী দেহের মধ্যস্থ এক ধরনের বস্তু যাকে বলা হয় জীববস্তু, ইংরাজীতে জার্মপ্লাসম্ ও দেহের বাকি বস্তুটিকে বলা হয় দেহবস্তু, ইংরাজীতে সোমা। দেহবস্তু বীজবস্তুকে বহন করে, তার পুষ্টির উপাদান হিসাবে কাজ করে। পারিপার্শ্বিকের যা প্রভাব তা শুধুমাত্র দেহবস্তুর উপরই সীমাবদ্ধ, কারণ দেহবস্তুর কোনো প্রভাব বীজবস্তুর উপর নেই। কাজেই জীবের দেহে পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে যে পরিবর্তনই হোক না কেন তা বংশগত সূত্রে সঞ্চারিত হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। বংশগতির ব্যাপারে দায়ী একমাত্র বীজবস্তু, যেগুলি অপরিবর্তনীয় এবং অমর। বংশানুক্রমে বীজবস্তু

অনাদিকাল থেকে সনাতন ধারায় একই গুণ সঞ্চারিত করে যাচ্ছে, বুর্জোয়া উৎকৃষ্ট জাতিতত্ত্বের (Theory of Superior Race) পক্ষে এর চেয়ে বড় যুক্তি আর কি হ'তে পারে ?

ভাইসমান-মেণ্ডেলবাদীদের মতে যে জীবকোষগুলি নিয়ে জীবদেহ গড়ে উঠেছে তার কেন্দ্রে সূক্ষ্ম সুতোর টুকরোর মতো কতকগুলি জিনিস সাজানো আছে ; সেগুলি হোল ক্রোমোসোম। জননকোষের ক্রোমোসোমগুলি অতি সূক্ষ্ম এক রকম পদার্থবিন্দুর মালা। এই পদার্থবিন্দুগুলিকে মেণ্ডেল নাম দিয়েছেন 'জিন'। এগুলি তাঁদের মতে বংশগত গুণের সনাতন বাহক। বংশগতসূত্রে সন্তান যে সমস্ত গুণের উত্তরাধিকারী হয় তার জন্ত দায়ী পিতা ও মাতার জীবকোষের জিনসমষ্টি বা ক্রমোসোম। এখানে উল্লেখযোগ্য যে জিনের অস্তিত্বের কোনো চাক্ষুষ প্রমাণ নেই। কতকগুলি অপ্রত্যক্ষ প্রমাণের সাহায্যে তার অস্তিত্ব অনুমান করা হয়। বংশানুক্রমে বিভিন্ন বীজকোষের মিলনের ফলে বিভিন্ন ধরনের জিন জননকোষের ক্রোমো-সোমে মিলতে থাকে, তার ফলে বংশগত গুণের পরিবর্তন হতে পারে ; কিন্তু তার কোনো নিশ্চয়তা নেই ; তার সম্ভাবনা সংখ্যাতত্ত্ববিভার অঙ্কের নিয়ম অনুযায়ী কমবেশী আন্দাজ মাত্র করা যেতে পারে। বংশগতিতে কোনো মৌলিক পরিবর্তন করা মেণ্ডেল-ভাইসমানবাদী বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এখনো পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। তার জন্ত তাঁদের মতে প্রাকৃতিক খেয়াল ছাড়া আর কিছুর উপর নির্ভর করা যায় না।

কিন্তু মিচুরিন-লাইসেংকোবাদ জিনের খোঁয়াটে অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। লাইসেংকোবাদ দেহকোষ আর বীজকোষ এই দুই মূলত. পরস্পর-নিরপেক্ষ ভাগকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী বিচার-পদ্ধতির বিরোধী বলে মনে করে। বস্তুত পাশ্চাত্য জগতের বিয়েন, মীণ্ডিস্, প্রেনান্ট এবং আরো কয়েকজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করেছেন যে দেহবস্তুও বীজবস্তুর জন্ম দিতে পারে। কলচিসিন্, মাস্টার্ড গ্যাস, এক্স-রে প্রভৃতির প্রভাবে ক্রোমো-সোমের মধ্যে যে গুণগত পরিবর্তন আনা যায় তা গবেষণাগারের মধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। সর্বোপরি সারা সোভিয়েট দেশ জুড়ে ব্যাপকভাবে লাইসেংকো পারিপার্শ্বিক অবস্থার বদল করে বসন্তকালের গমকে শীতকালের গমে পরিণত করেছেন ; এক গাছের গায়ে অন্ত অন্ত জাতের কলম বেঁধে তার মধ্যে নতুন গুণ সঞ্চারণ করে জিন বিনিময় না হলেও যে গুণ সঞ্চারণ

সম্ভব তা প্রমাণ করেছেন। সাম্প্রতিক সোভিয়েট বিজ্ঞানে ওলগা লেপেশিন্সকায়ার অবদান—তথাকথিত বীজকোষ বাদ দিয়েই দেহকোষ থেকে জীবকোষ উৎপাদন সম্ভব প্রমাণিত হবার ফলে জীববিজ্ঞানে ভাববাদের শেষ আশ্রয়স্থল বীজকোষের তত্ত্ব আজ মারাত্মকভাবে বিপন্ন হয়ে উঠেছে, বীজকোষ আর দেহকোষের কৃত্রিম বিভেদ চূড়ান্তভাবে ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

জীববিজ্ঞানের উদাহরণ থেকে লেখক চমৎকারভাবে বুর্জোয়া বিজ্ঞানে তত্ত্ব ও ব্যবহারের ক্রমবর্ধমান পার্থক্যটা ফুটিয়ে তুলেছেন। বুর্জোয়া বৈজ্ঞানিকদের কাছে লাইসেংকোর পরিচয়—একজন চাষা মাত্র। মেণ্ডেল-মর্গানবাদীরা খাস সোভিয়েট গবেষণাগারে দীর্ঘকাল পরীক্ষা চালিয়েছেন ড্রসোফিলা নামে এক জাতীয় মাছির উপর। একই সময়ে লাইসেংকোর উপদেশ গ্রহণ করে সোভিয়েট কৃষক ফসলের ফলন বাড়িয়েছে সারা দেশ জুড়ে। ভারতবর্ষে সম্প্রতি সোভিয়েট গমের বীজ যে ভারতীয় গমের বীজের তুলনায় তিনগুণ ফসল ফলাচ্ছে তা আকস্মিক নয় (ক্রসরোড্‌স্‌, ১৯শে অক্টোবর ১৯৫১)। সুবিস্তীর্ণ কৃষক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা লাইসেংকোকে সাহায্য করেছে তাঁর সিদ্ধান্তে পৌঁছতে।

ভাববাদের মূল ভিত্তি জ্ঞান আর কর্মের, মতবাদ আর প্রয়োগের মধ্যে বিচ্ছেদে। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার বর্তমান স্তরে শ্রমিকশ্রেণীকে স্বাধীন চিন্তার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম রাখার পক্ষে অপরিহার্য। সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক কিসলভ্‌স্কী লাইসেংকোবাদ-প্রসঙ্গে বলেছেন "ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার আওতায় এটা নিশ্চয়ই অবাঞ্ছনীয় যে কড়া-পড়া হাত নিয়ে যারা মেহনত করছে তারা চিন্তা করবে, কেন না তারা যদি চিন্তা করতে শুরু করে তাহলে তারা বুঝতে পারবে যে ধনতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্ক ঝেঁটিয়ে ফেলে নতুন সমাজতান্ত্রিক সম্পর্ক স্থাপন করা দরকার।" সোভিয়েট দেশে নতুন সমাজব্যবস্থায় এই বিরোধের অবকাশ ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে আসছে। সামাজিক মেহনতের সঙ্গে বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সেখানে প্রতিষ্ঠিত, 'প্রাভদা' কাগজের অর্ধেকেরও বেশী জায়গা জুড়ে মেণ্ডেলবাদ বনাম লাইসেংকোবাদের বিতর্কের বিবরণ দিনের পর দিন প্রকাশিত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায় লেখক বিবর্তনের মতবাদগুলির দার্শনিক ভিত্তির উপর

আলোচনা করেছেন। প্রাঞ্জলভাবে দুরূহ বিষয়ের আলোচনায় লেখকের যে খ্যাতি, এ বইটিতেও তা অক্ষুণ্ণ আছে। বিশেষ করে ক্রোমোসোম-সংক্রান্ত মতবাদ বাংলা ভাষায় কমই আলোচিত হয়েছে।

বইটিতে আর একটি বিষয়ের আলোচনা থাকার প্রয়োজন ছিল। জীব-বিজ্ঞানে লাইসেংকোর অন্যতম অবদান—ডারউইনের আন্তঃপ্রজাতি সংগ্রামের (inter-specific struggle) তত্ত্বকে ভুল প্রতিপন্ন করা। এই তত্ত্বকে নাকচ করেই আজ সোভিয়েট ইউনিয়নে বিরাট গাছের সারি লাগিয়ে মরুভূমির উত্তপ্ত বাতাস থেকে সোভিয়েট শস্যভূমিকে রক্ষা করা হচ্ছে; ধূলিধূসর মরুকেও উর্বর করে তোলা হচ্ছে।

মতবাদগত আলোচনাতেও ১৭৮৯এর পটভূমিকায় লামার্ক এবং ১৮৪৮এর পর ডারউইনের আবির্ভাবের ঐতিহাসিক তাৎপর্যের উল্লেখ লেখকের বক্তব্যকে আরো সুষ্ঠু করতে পারত।

বিজ্ঞানকে রাজনীতি-নিরপেক্ষ বলে ঘোষণা করে বুর্জোয়ারা সমাজ-বিজ্ঞানকে তাদের রাজনীতির হাতের পুতুল করে ফেলেছে। আণবিক বোমা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জীববিজ্ঞানে লাইসেংকোবাদের বিরুদ্ধে যেভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে তাতে মেণ্ডেল-মর্গান-ভাইসমানবাদের আর যাই হোক না কেন রাজনীতি-নিরপেক্ষ চরিত্র ফুটে ওঠে না। সমাজ-সচেতন পাঠক মাত্রেরই তাই লাইসেংকোবাদের আলোচনায় যোগ দেবার সময় এসেছে। দেবীবাবুর বই সে আলোচনার পথ প্রশস্ত করেছে।

দেবকুমার বসু

চার পা থেকে দু' পা॥ বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়॥ র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব॥ ৬ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২॥ দাম—১।৵ পৃ ৬৬ ন।

চার পা থেকে দু'পা! সে আবার কি? কৌতূহল হ'ল; এক নিশ্বাসে পড়ে গেলাম আগাগোড়া। ভারি ভাল লাগল। অভিব্যক্তি বা ক্রম-বিকাশ সম্পর্কে বাংলায় লেখা অনেক বই আছে কিন্তু শ্রমের পটভূমিকায় মানুষের ক্রম-বিকাশের উপর সহজবোধ্য ভাষায় লেখা বই ইতিপূর্বে নজরে পড়েনি। এদিক থেকে বিষ্ণুবাবুর বইটি বোধ হয় প্রথম। শ্রম আর প্রয়োজনের তাগিদে কালে কালে যুগ যুগ ধরে মানুষ কিভাবে ধীরে ধীরে

ক্রমপরিণতি লাভ করল, শ্রমের তাগিদে কিভাবে মানুষের মুখে কথা ফুটল, তার মন আর বোধের বিকাশ ঘটল, মানব সমাজ সংগঠিত হ'ল, সে সম্পর্কে এঙ্গেল্‌স-পরিবেশিত দুরূহ তথ্যগুলিকে বিষ্ণুবাবু সরল ভাষায় স্বল্প পরিসরে কিশোর পাঠকের উপযোগী করে সহজভাবে পরিবেশন করেছেন। মানুষের ক্রম-বিকাশের ইতিহাসে শ্রমই হ'ল বিধাতা। শ্রম আর মনের ফসলে সমৃদ্ধ আজকের মানুষ বহিঃপ্রকৃতির দাসত্ব-মুক্ত হয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে সাম্যবাদী-সমাজ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের পথে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। এরই অগ্রদূত হ'ল সোভিয়েট আর মহাচীনের মানুষ। প্রকৃতি বিজয়ের একাগ্র সাধনায় সোভিয়েট দেশের জীববিজ্ঞানে আজ কিভাবে ভাববাদী-মোহমুক্তি ঘটছে তার উল্লেখও বিষ্ণুবাবু এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে করেছেন। কিন্তু এই উল্লেখ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হওয়ায় স্বভাবতই কিশোর পাঠকের পক্ষে বেশ খানিকটা দুর্বোধ্য ও অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। পরিবেশনগত ত্রুটির জন্য শেষ পরিচ্ছেদের সোভিয়েট জীববিজ্ঞান-সংক্রান্ত তথ্যগুলিকে বইটির মূল বিষয়-বস্তুর তুলনায় বেশ কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক এবং অসমঞ্জস বলে মনে হওয়াও অসম্ভব নয়। লামু (মার্ড) কণ্ডুরা (চৈণ্ডন) ইত্যাদির মত মহাবিবরের (পৃ ১৬) ইংরাজী প্রতিশব্দটি উল্লেখ করলে ভাল হত। এই ধরনের সামান্য দু' একটি ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা বাদ দিয়ে 'চার পা' থেকে দু'পা'কে বিষ্ণুবাবুর অত্যন্ত সার্থক রচনা বলা চলে। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে আরও পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত কলেবরে পাবো বলে আশা রাখি।

পিনাকীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্পধারা ॥ অধ্যাপক প্রভাতকুমার দত্ত ॥ ক্যালকাটা বুক ক্লাব ॥ ৮৯ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ॥ দু টাকা ॥

সাধারণ মানুষের মনে শিল্পের যে অস্পষ্ট রূপ, তাকে স্পষ্টরূপে সামনে এনে সোজা আর সহজ করে (যতটা সম্ভব) বোঝাবার চেষ্টা করার প্রয়োজন শিল্পী হিসেবে আমরা আজ অত্যন্ত অনুভব করি। সেই চেষ্টা করার জন্য শ্রীঅধ্যাপককে ধন্যবাদ জানাতে পারলে আনন্দিত হতাম।

বইটির বাহ্যিক পারিপাট্যে বর্ণলিপিটা একটু যান্ত্রিক মনে হয়। বইটি শ্রীযামিনী রায়কে উৎসর্গীকৃত এবং ভূমিকা শ্রীবিষ্ণু দে কর্তৃক লিখিত। সত্যই

আমাদের দেশে শিল্প-সমালোচনায় বিশেষ কোন ভাল বই নেই, লেখকের দাবি অনুযায়ী "নতুন দৃষ্টিভঙ্গী" থেকে তো একটিও নেই। অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের যে কয়েকটি আছে, সেগুলি যথেষ্ট গভীর ও তত্ত্বপূর্ণ।

শ্রীঅধ্যাপক শিল্পবিচারের সাধারণ প্রচলিত সব কটি বিভাগই মোটামুটি আলোচনা করেছেন এবং তাঁর পক্ষে যথাসাধ্য বিশ্লেষণ করবার চেষ্টাও করেছেন। আমার মনে হয় যদি তিনি আরও কিছুদিন ধৈর্য ধরে বিষয়োপযুক্ত জ্ঞানার্জনের জন্য অপেক্ষা করতে পারতেন তাহলে নিজের প্রতি এবং পাঠকদের প্রতি আরও সুবিচার করতেন, বইটিও আরও যুক্তিপূর্ণ হত। "শিল্পধারা"র মাধ্যমে শিল্পকে সাধারণের মধ্যে প্রচার করবার যে চেষ্টা তিনি করেছেন তার গুরুত্ব সম্বন্ধে একান্ত সচেতনতা ও নিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল, কারণ "আর্ট যে দেশে আহিতাগ্নির ধোঁয়ামাত্র" সে দেশে শিক্ষকের দায়িত্ব গুরুতর; অশিক্ষার চেয়ে কুশিক্ষা মারাত্মক। লেখকের অনেকগুলি মত এতই পরস্পর-বিরোধী এবং "ধোঁয়ামাত্র" যে তাঁর বক্তব্য বোঝাই মুশ্‌কিল। তার মধ্যে থেকে কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি:

(১) "অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলাল যে ধারার প্রবর্তন করেন তা হচ্ছে শিল্পের সনাতনী ব্যাখ্যা", (২) "অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলালের যে দান তা প্রধানতঃ ভারতীয় প্রবহমানতার পুনঃপ্রতিষ্ঠায়।" (৩) "অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলাল ভারতীয় শিল্পের পরম্পরাগত ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করে তাকে ব্যক্তিগত প্রতিভার উজ্জ্বলতায় নবভাবে রসমণ্ডিত করেন।" এবং, (৪) "নন্দলালের চিত্রে বিষয়বস্তুর অদ্ভুত বৈচিত্র্য আছে এবং বর্তমানে তিনিই একমাত্র শিল্পী যিনি পরম্পরাগত ভারতীয় রীতিতে নানাভাবে সৃষ্টি করে চলেছেন।" অবশেষে, (৫) "নন্দলালের বিশেষ রীতির সার্থক পরিণতি আমরা দেখলাম"

একই সঙ্গে এরকম পরস্পর-বিরোধী মতামত বিস্ময়কর। নন্দলাল সম্বন্ধে এই জাতীয় অসাবধান ও দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য অত্যন্ত অযৌক্তিক এবং বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহৎ শিল্পী সম্বন্ধে মতামত দেওয়ার আগে লেখকের নিজের জ্ঞানের সীমা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া উচিত ছিল। নন্দলাল একজন সৃজনশীল শিল্পী, তাঁর "সার্থক পরিণতি" মাত্র কয়েক ছত্রেই ইনি ব্যাখ্যা করে ফেলেছেন! নন্দলালের "পরিণতি" সম্বন্ধে এঁর এই বাচাল পণ্ডিতম্মন্যতা প্রলাপপদবাচ্য।

লোকশিল্প ও অভিজাত শিল্প (অভিজাত শিল্প বলতে তিনি কি

Academic Painting বুঝিয়েছেন ?) সম্বন্ধে এঁর অভিমত, "লোকশিল্প হচ্ছে প্রত্যক্ষ শ্রমনিযুক্ত মানুষের সৃষ্টি। অভিজাত শিল্প হচ্ছে পরনির্ভর ও পরাশ্রয়ী মানুষের সৃষ্টি।" সাধারণ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে কোথাও কাউকে খুঁজে পেলাম না যে পরনির্ভরশীল নয়। চাষী, তাঁতী, তেলী, কুমোর ইত্যাদি শ্রমজীবীমাত্রেই পরস্পরের শ্রমের উপর নির্ভরশীল এবং যেহেতু শিল্পও একটি পেশা, ফলে—শ্রম, সেইহেতু সেই শ্রমের বিনিময়ে শিল্পী অন্য শ্রমিকের শ্রমের সাহায্য নেয়। লোকশিল্পের সঙ্গে চারুশিল্পের তফাতটা আরও একটু গভীরে। এই প্রসঙ্গে শ্রেণীহীন সমাজ থেকে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বিবর্তনের ইতিহাস এসে পড়ে, আদিম ইন্দ্রজাল থেকে ধর্মের বিকাশের ইতিহাস ইত্যাদি অনেক কিছুই এসে পড়ে। তা ছাড়াও যে সমস্ত গুণসমন্বয়ে মহৎ শিল্প সৃষ্টি হয় তাতে মোটামুটি এই কয়টি মূল সূত্র পাওয়া যায়, যথা :—

"রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্।
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্॥"

যেমন, Abstract Art এই মূল শিল্পসূত্রগুলির কয়েকটি মূল সূত্রের বিশেষ বিকাশ কিন্তু মূল সূত্রসমষ্টির সম্পূর্ণ বিকাশ নয়। তেমনি লোকশিল্পও অন্য কয়েকটি মূল শিল্পসূত্রের বিশেষ বিকাশ—যেমন বর্ণ, রূপ, রেখা ইত্যাদি, কিন্তু মূল সূত্রসমষ্টির সম্পূর্ণ বিকাশ নয়। আধুনিক শিল্পধারার বহু গবেষণা এই সব পর্ব-অনুপর্বের উপরে হওয়ায় অন্য এক একটি মূল সূত্রের পরিণত রূপ লাভ করেছে কিন্তু সমষ্টিগত পরিণতির অভাবে মহৎ শিল্পের পূর্ণতা পায়নি।

সোভিয়েট শিল্প সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে অধ্যাপক মহাশয় শুরুতেই লিখেছেন, —"সোভিয়েট শিল্পের নতুন আদর্শের আওতায় এমন কিছু যুগান্তকারী রচনা পাওয়া যায় না যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা চলতে পারে।" কিন্তু তবু তিনি সোভিয়েট শিল্প সম্বন্ধে দশ-পাতা-ব্যাপী আলোচনা চালিয়েছেন, পরে আবার "যা হোক বিপ্লবের পর সমস্যার উদ্ভব এবং তার সমাধানের মধ্যে যে কাল সে সময়ে সোভিয়েট শিল্পে যে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই তা নয়।" এবং "সোভিয়েট শিল্প আজ সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত" লিখেছেন।

পরস্পর-বিরোধী ও ভ্রমাত্মক মতামত বইটিতে আগাগোড়া আছে, ফলে বইটির সৎ উদ্দেশ্য বহুলাংশে ব্যাহত হয়েছে। শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে-কে শিল্পী হিসেবে আমার অনুরোধ, ভবিষ্যতে ভূমিকা লেখার আগে যদি তিনি দয়া

করে বইটি পড়ে নেন তাহলে পাঠকের বহু মূল্যবান সময়ের অহেতুক অপচয় হয় না।

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

লাল চিঠি। বিশু বিশ্বাস ।। তানিয়া সজ্ঞ। ৩২-এ, খেলাত বাবু লেন, টালা, কলিকাতা-২ ।। দাম বার আনা ।।

তেরো-চোদ্দর কবিতা। জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় ।। কবি প্রকাশনী ।। ২, দমদম রোড, কলিকাতা-৩০ ।। দাম আট আনা ।।

বিদ্রূপ ও বহ্নি। যদুনাথ ঘোষ ।। প্রবর্তক পাবলিশার্স ।। ৬১ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ।। দাম এক টাকা চার আনা ।।

বর্তমান বৎসরের (১৯৫১) মে থেকে সেপ্টেম্বর এই পাঁচ মাসের মধ্যে রচিত সমসাময়িক ঘটনাবলীর ওপর ন'টি কবিতার সমষ্টি বিশু বিশ্বাসের "লাল চিঠি"। কবিতাগুলির মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার যা প্রকাশ দেখা যায় তা বেশ বলিষ্ঠ। বাংলা দেশের জনমনের জ্বালার একটি বিশেষ প্রতিফলন এই আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটিতে আছে। কবিতাগুলি সবই উচ্চগ্রামের। বেশ বোঝা যায় মাইকের সঙ্গে গলা মেলাবার কথাই লেখক খুব বেশি করে ভেবেছেন। মাঝে মাঝে এও মনে হয় যে গদ্যকে চীৎকার করে পড়বার জন্যই লাইন সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'উত্তরপাড়া' শীর্ষক কবিতাটি তার প্রমাণ:

লরী বোঝাই
আসছে নোতুন নোতুন মজুর।
মনিবের গুপ্ত শয়তানী ইংগিত—
দালালের হাতে ইট পাটকেল
প্রতিরোধ ভাঙবার দুষ্ট ছল,
ধর্মঘটী বনাম মালিক!

'লাল চিঠি' শীর্ষক প্রথম কবিতাটি কিন্তু অনেক বেশি রসোত্তীর্ণ। এই কাব্যগ্রন্থখানি পড়তে পড়তে বারংবার একথা মনে হয় যে যান্ত্রিকতা এবং অতি-স্পষ্টতা দোষ থেকে মুক্ত হলে বিশু বিশ্বাস বীররসাত্মক কবিতায় সাফল্য অর্জন করতে পারবেন।

একেবারে আলাদা জাতের কবিতা হচ্ছে জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের "তেরো-চোদ্দর কবিতা"। বইটি কিশোরদের জন্য লেখা ছড়া-জাতীয়—বিশেষ করে

ঘুমপাড়ানী ছড়া-জাতীয়—কবিতার সমষ্টি। সুর হাল্কা, মেজাজ দিলখোলা। দু'একটি কবিতায় সমস্যার অবতারণাও আছে; যথা,—"সোনালী ফসলে, সোনালী ধানেতে ভরা ছিল এই দেশটা।" কিন্তু এগুলির তুলনায় অন্যগুলি বেশি উৎরেছে বলে মনে হয়। শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের আঁকা ছবিগুলি অত্যন্ত রুচিকর ও উপযোগী হয়েছে। ছাপাও বেশ ঝরঝরে।

নতুন কবির লেখা প্রথম কবিতার বই হিসাবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভূমিকা সম্বলিত রঘুনাথ ঘোষের "বিদ্রূপ ও বহ্নি" কাব্যামোদীদের আগ্রহ দাবি করতে পারে। বইটিতে সাবেকী রীতির শব্দবিন্যাস এত বেশি যে ভয় হয় লেখক হয়তো এই রীতির বাঁধন কাটিয়ে উঠতে পারবেন না। 'হেরিতেছি', 'নাহি জানি', 'সেইক্ষণে'র সঙ্গে 'এসেছ' 'রেখেছ' 'হয়েছে'ও আছে। মাইকেলের সনেটের সঙ্গে শ্রীযুক্ত ঘোষের সনেটগুলির তুলনা করলে দেখা যাবে যে শ্রীযুক্ত ঘোষের ব্যর্থতা কেবলমাত্র সাবেকী স্টাইলের জন্য নয়। 'চাবুকের শোধ চাবুক চালা', 'চাহে না আপোষ কোনো' এবং তজ্জাতীয় কবিতাগুলি মোটেই কবিতা হয়ে ওঠেনি। 'শকুন' কবিতাটি বরং ভাল। শ্রীযুক্ত ঘোষের কাব্য যদি বাঁধা-ধরা গৎকেই আঁকড়ে থাকে তবে তার ভবিষ্যৎ পরিণতি পাঠকের মনে সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হবে।

জগন্নাথ চক্রবর্তী

বাঙলা বর্ষলিপি : ১৩৫৮। সম্পাদক : শিশিরকুমার আচার্য চৌধুরী।। সংস্কৃতি-বৈঠক, ১৭ পণ্ডিতিয়া প্লেস, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।। দুই টাকা।।

ইংরেজিতে 'ইয়ার-বুক', 'অ্যানুয়াল সার্ভে', 'হু ইজ্ হু' ইত্যাদি বই আমাদের দেশে যথেষ্ট প্রকাশিত হয়। কিন্তু বাঙলায় যে একটি-দুটির বেশি এ জাতীয় বই বেরোয় না—এটা একটা মস্ত বড়ো ক্ষোভের কথা। সংস্কৃতি-বৈঠকের এই 'বাঙলা বর্ষলিপি' সেইজন্যে উল্লেখযোগ্য। নানান্ দিক থেকে বইটা সাধারণ জিজ্ঞাসু মনের খোরাক জুগিয়েছে। খেলাধুলা, সাহিত্য-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি, কৃষি ও বাজেট, শিল্প ও বিজ্ঞান, শিক্ষা ও গভর্ণমেণ্ট, ইত্যাদি বহু বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবিষ্ট হওয়ার ফলে বইটি রীতিমত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। বর্তমান বিশিষ্ট বাঙালীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং বাঙলা; ভারত-পাকিস্তান তথা পৃথিবীর সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর সালতামামী এই বর্ষ-লিপির একটা উল্লেখযোগ্য দিক। মোটের ওপর, সাধারণ জ্ঞানের বই হিসেবে এটি সাধারণ বাঙালী ঘরের ছাত্র, গৃহস্থ আর মহিলাদের পক্ষে বিশেষ কার্যকরী।

র. ম.

তুন্‌হুয়াঙ্‌-এর ছবি

রবীন্দ্র মজুমদার

প্রায় দু'হাজার বছর আগেকার কথা। গোবি মরুভূমির নিঃসীম বালুসমুদ্রের ধূ ধূ রুক্ষতার মধ্যে ছোট্ট একটু জায়গা জুড়ে তুন্‌হুয়াঙ্‌ পাহাড় তার গাছ-গাছালি-ঘেরা আঁচল বিছিয়ে সৃষ্টি করে রেখেছে একটি শ্যামস্নিগ্ধ মরূদ্যান। পাহাড়ের বুকে ঝরনা হিসেবে যার উৎপত্তি, সেই ক্ষীণতরঙ্গিনী নদীটি উপত্যকার বুকের ওপর দিয়ে মরুপ্রান্তে এসে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে চিরতৃষ্ণার্ত বালিয়াড়ির অগ্নিলেহনে। শরৎ-সন্ধ্যার শেষ সূর্যরশ্মি যখন তুনহুয়াঙের সূচীশীর্ষ দেবদারু গাছটির ঊর্ধ্বপ্রান্ত স্পর্শ করে, সুদূর কুয়েন্‌লিন্‌ থেকে আসা ভ্রাম্যমান হরিণের দল বিচরণক্লান্তিতে আশ্রয় সন্ধান করে ফেরে পর্বতগুহায়, ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে অরণ্যশাখায় অবশিষ্ট গুটিকতক পথভোলা পাখির কলকাকলি, তখন সেই শান্ত নিস্তব্ধ পরিবেশের মধ্যে একটি দুটি কুণ্ডাগ্নি জ্বলে ওঠে, মৃদু গুঞ্জনধ্বনি জাগে সমবেত কণ্ঠরাগে ত্রিশরণ-মন্ত্রোচ্চারণের, পীতচীবরধারী অভিযাত্রী তীর্থঙ্করের দল একরাত্রির উপনিবেশ গড়ে তোলেন এই তুনহুয়াঙের মরূদ্যানে। ধর্মসার্থবাহের এইসব সন্ন্যাসীদের মধ্যে যাঁরা চৈনিক তাঁরা চলেছেন ভগবান্ তথাগতের চরণ-স্পর্শপূত ভারতভূমির তীর্থসন্ধানে; যাঁরা ভারতীয় তাঁরা চলেছেন কুরুবর্ষ পার হয়ে উত্তরভূমিতে মহাসম্বোধির অমের প্রেমের বাণীপ্রচারে। এই তুনহুয়াঙের মরূদ্যান তাঁদের ভাববিনিময়ের এক প্রধান মিলনকেন্দ্র। কালক্রমে আরও কয়েক শো বছর পরে এখানে গড়ে ওঠে এক বৌদ্ধ সংঘারাম। দেশদেশান্তরের জ্ঞানসন্ধানীর ভিড় জমে তুনহুয়াঙের পাথুরে পায়ে গর্ত করে কেটে তোলা গর্ভকুটিরে। জনপদ থেকে বহু বহু যোজন-ক্রোশ দূরে মরুভূমির মধ্যে এই দুর্গম স্থানে তার নিগমসভায় এসে জড়ো হন ধর্মশিক্ষার্থীর দল মহাস্থবিরের পাদমার্গব্যাখ্যা শোনবার জন্যে। তার তণ্ডুলমণ্ডপ ভরে ওঠে চীন-ভারত দুইদেশের সম্রাটদের ধর্মবৃত্তিদানে। তার পুস্তকভাণ্ডার ভরে ওঠে দুষ্প্রাপ্য থেরগ্রন্থের অসংখ্য পাণ্ডুলিপিতে। ভিত্তিমণ্ডনে এই সংঘারামের চৈত্যগৃহগুলি সুসজ্জিত করে তুলবার জন্যে

৬

আসেন ভারতশিল্পের অতিসমৃদ্ধ রূপরীতিতে সুশিক্ষিত চৈনিক চিত্রকরের দল।

চীন-ভারত সংস্কৃতির সঙ্গমতীর্থ এই তুনহুয়াঙের গুহাচিত্রগুলি এক বিস্ময়কর মহিমায় মণ্ডিত ছিল প্রায় আট-শো বছর ধরে। তারপর কালক্রমে তুনহুয়াঙের স্মৃতি ম্লান হতে হতে শেষ পর্যন্ত তা একেবারে বিস্মৃতির মধ্যে তলিয়ে যায়। মানচিত্রের চিহ্ন হিসাবেও তার কোন অস্তিত্ব থাকে নি, শুধু থেকে গিয়েছিল লোকমুখে তার অতীত সমৃদ্ধির কিংবদন্তী। যে-বৌদ্ধসন্ন্যাসীর দল প্রায় হাজার বছর ধরে তুনহুয়াঙের সংঘারামকে চীন-ভারত সংস্কৃতির প্রথম ও প্রধানতম মিলনকেন্দ্র হিসেবে মুখরিত করে রেখেছিলেন, নানা কারণে তাঁরা ক্রমশ অন্যত্র চলে যেতে থাকেন। একদিকে মরুভূমি ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকার ফলে, অন্যদিকে ১১-১২ শতকে আরব-অভিযান শুরু হবার ফলে তুনহুয়াঙ জনশূন্য হয়ে পড়তে থাকে। যে-ক'জন ভিক্ষু থেকে যান, তাঁদের উত্তরাধিকারীরাও ক্রমশ আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েন। তুনহুয়াঙের আশ্চর্য আর অমূল্য সংস্কৃতি-সম্পদ অরক্ষিত অবস্থায় মরুপ্রকৃতির নির্মম প্রভাবে ক্রমশ ক্ষয় হতে থাকে।

ইতিহাসের এই স্মৃতিভ্রংশের অন্ধকার গহ্বর থেকে প্রায় ছ-শো বছর পরে বিংশ শতাব্দীতে যিনি তুনহুয়াঙকে উদ্ধার করেন, তিনি আমাদের এযুগের চিরস্মরণীয় এক প্রত্নতাত্ত্বিক: অরেল্ স্টাইন। তুনহুয়াঙের আবিষ্কারের কাহিনী সমসাময়িক প্রত্নগবেষণার ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো এক বিস্ময় হয়ে আছে। গোবি মরুভূমির সেই দিকচিহ্নহীন বালুসীমাতে ঘুরে ঘুরে ইংরেজ অতীতসন্ধানী অরেল স্টাইন ভারতসীমান্ত থেকে পিপিং-এর প্রান্তে চীনের প্রাচীর পর্যন্ত তুনহুয়াঙের মতোই অনেকগুলি বৌদ্ধবিহার ও গুহামন্দির আবিষ্কার করেন এবং এর থেকে এ কথা ধরে নিলে ভুল হয় না যে ভ্রাম্যমান চীন-ভারত তীর্থযাত্রীদের বিশ্রামকেন্দ্র বা ধর্মশালা হিসেবেই এগুলির উৎপত্তি ও বিকাশ। অরেল স্টাইন তাঁর আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী জুড়ে এক দারুণ সাড়া জাগে। অবশ্য তুনহুয়াঙ যে জনমানবশূন্য একটা সভ্যতা-সমাধিতে পরিণত হয়েছিল, তা ঠিক নয়। মরুভূমির বেড়াজালে সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েও কোন রকমে এই বিহারটির অস্তিত্ব টিকে ছিল একটি সামান্য বৌদ্ধমন্দির হিসেবে। অরেল স্টাইন যখন তুনহুয়াঙকে মাত্র ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনরাবিষ্কার করেন, তখনও

এখানে জনকতক মন্দিররক্ষী ও পুরোহিত ছিল—কিন্তু বহুকাল ধরে জনসংসর্গহীনতা আর রুদ্ধস্রোত ধর্মাচারের প্রাণহীন পুনরাবৃত্তির দায় মেনে চলার ফলে তারা তখন এতই আত্মবিস্মৃত যে শুনলে আশ্চর্য হতে হয়—অরেল স্টাইন সেই মন্দিরের তাওশি-সম্প্রদায়ভুক্ত পুরোহিতকে মাত্র পাঁচ-শো টাকা ঘুষ দিয়ে প্রায় ন'হাজার অমূল্য আর দুষ্প্রাপ্য পুঁথি নিজের দেশে নিয়ে যান! অরেল স্টাইনের অব্যবহিত পরেই আসেন ১৯০৭-এ দু-জন রাশিয়ান প্রত্নতাত্ত্বিক বেরিসভ্স্কি আর কাজালক। তারপর ফ্রান্সের পল পেলিও, জার্মানীর ভন লে-কক্, জাপানের অধ্যাপক তাচিবানা প্রভৃতি অনেকেই আসেন, এবং যে যা পারেন নিয়ে চলে যান। এসব ব্যাপার জানাজানি হবার ফলে তখন চীনে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তুনহুয়াঙের সেই অমূল্য সংস্কৃতিসম্পদের মধ্যে এক এই ভিত্তিচিত্রগুলি ছাড়া পুঁথি, মূর্তি, কারুশিল্প-ইত্যাদি আর সবই প্রায় ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানীর বিশ্ববিদ্যালয় আর যাদুঘরের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেছে। যাই হোক, বর্তমানে নতুন মুক্ত চীনের কর্তৃপক্ষ এই অতি প্রাচীন চীনা চিত্রকলার সাংস্কৃতিক তাৎপর্য মনে রেখে অত্যন্ত সতর্ক রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন, সুদক্ষ শিল্পীদের দিয়ে এই সমস্ত ছবির হুবহু অনুলিপি (original copy) আঁকিয়ে নিয়ে দেশের সর্বত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন।

সম্প্রতি যে চীনা সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল আমাদের দেশে ভ্রমণ করছেন, তাঁরা তুনহুয়াঙের সেই চিত্রাবলীর মূল প্রতিলিপিগুলি সঙ্গে করে এনেছেন। দিল্লী আর বোম্বাইয়ে তার প্রদর্শনী হয়ে গেছে, বর্তমানে কলকাতায় পার্ক-সার্কাসে লেডী-ব্র্যাবোর্ন-কলেজের প্রাঙ্গণে এই প্রদর্শনীটি চলছে। চীনা শিল্প-শিক্ষার্থী এবং বিশেষ ক'রে চীন-ভারত সংস্কৃতি-ইতিহাসের ছাত্রদের পক্ষে এই প্রদর্শনীটি যেমন অবশ্যদ্রষ্টব্য, তেমনি সাধারণভাবে শিল্পরসিক মাত্রের কাছেই এটা এক পরম আগ্রহের জিনিস। তুনহুয়াঙের সহস্রবুদ্ধ-গুহাবলীর এই প্রাচীরচিত্রগুলিকে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন্-লাই বলেছেন দেড় হাজার বছর আগেকার চীন-ভারত সাংস্কৃতিক যোগাযোগের নিখুঁত নিদর্শন। সত্যিই এই ছবিগুলিকে মধ্য-এশিয়ার বৌদ্ধ শিল্পকলার শ্রেষ্ঠতম ঐতিহাসিক সংগ্রহ বলা যায়। শুধু শিল্পকলা হিসেবেই নয়; যে-দু'শো বছর ধরে তুনহুয়াঙের বিকাশ আর গৌরবের যুগ, সেই সময়কার সামাজিক ইতিহাস অধ্যয়নের পক্ষেও এই ছবিগুলি অপরিহার্য। চীন-ভারত সংস্কৃতি-সম্পর্কের

এই প্রাচীনতম প্রমাণগুলি সঙ্গে করে এনে চীনা সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল ইতিহাসের আর-এক যুগসন্ধিক্ষণে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন চীনের সঙ্গে আমাদের পারস্পরিক নিবিড় একাত্মতার কথা।

তুনহুয়াঙের ৪৬০টি ছোট বড়ো গুহায় আঁকা শুধু ছবিগুলিই যে বিষয়বস্তু আর রূপরীতির দিক দিয়ে ভারতীয় তাই নয়—তার বিহার-স্থাপত্য, তার প্রকোষ্ঠ-পরিকল্পনা, তার ছাদকাকৃতি ইত্যাদি সবই একান্তভাবে ভারতীয়। খিলানগুলি নিখুঁত ভারতীয় পদ্ধতিতেই গোলাকৃতি বা ত্রিকোণাকৃতি করে তৈরি। চিত্র-অলংকরণে আর মূর্তিভাস্কর্যে অশ্বত্থপত্র, পদ্মের পাঁপড়ি, কদ্মা, স্বস্তিকা ইত্যাদি নক্সার প্রাধান্য মূলত ভারতীয়। চিত্রবিষয় সবই প্রধানত বুদ্ধজীবনী, জাতক-কাহিনী, তন্ত্র-বর্ণিত মঞ্জুশ্রী, বিরূপাক্ষ, বজ্রযোগিন্, সামন্তভদ্র ইত্যাদি মূর্তিরূপের চিত্রণ—ভারত-শিল্পের বিষয়বস্তু-রূপরীতি-আঙ্গিক সমস্তকেই আত্মস্থ করে নিয়েছেন চীনা শিল্পীরা। প্রথম দিকের সেই একান্ত ভারতীয় চিত্রচরিত্র কিভাবে ক্রমশই চৈনিক হয়ে উঠেছে, কিভাবে ক্রমশই তাতে চীনা চিত্রকলার বিশিষ্টতাগুলি অর্জিত হয়েছে—তাও সুন্দরভাবে লক্ষ্য করা যায়। তুনহুয়াঙের গুহাগুলিতে শিল্পসৃষ্টি আর চিত্র-মণ্ডনের কাজ চলেছিল দীর্ঘ ছ-শো বছর ধরে। স্বভাবতই তার শিল্প-সমারোহে কোথাও সজীবতা কোথাও ক্ষয়িষ্ণুতা দেখা দিয়েছে, কোথাও বা তুর্কী আর পারসিক প্রভাবও কাজ করেছে। এই পারসিক প্রভাব এসেছিল বোধহয় চার-শতকের শেষের দিকে চীন সাম্রাজ্য তুর্কীদের অধীনে আসার ফলে। আট-শতকে তৈরি একটি গুহায় আঁকা বজ্রধর-বোধিসত্ত্বের ছবি হিসেবে দেখতে পাচ্ছি: কালো দাড়ি-গোঁফ মণ্ডিত রাজসিক চাপকান্-পরা খাঁটি পারসিক পুরুষমূর্তি। আরও পরে আঁকা কয়েকটি ঘোড়ার অঙ্কন-পদ্ধতিতে এবং 'চাং ই-চাও'র দরবারী শোভাযাত্রার ছবি ইত্যাদিতে পারসিক চিত্রকলার রঙ-রেখা ও ফর্ম-এর ব্যবহার অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অতীত যুগে সংস্কৃতির এই সংক্রমণ (migration of culture) বড়ো বিচিত্র ব্যাপার। এশিয়ার সমস্ত দেশ থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তুনহুয়াঙে আসতেন, কয়েক শতাব্দী ধরে এটা হয়ে ছিল এক আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি-কেন্দ্র! তাছাড়া বাণিজ্য-সার্থবাহের উপনিবেশ হিসেবেও তুনহুয়াঙ এক সময়ে গুরুত্ব পেয়েছিল—বাইজান্টিয়ম আর আরবের সঙ্গে চীন-ভারতের পণ্যবিনিময়ের একটা কেন্দ্র ছিল এখানে।

তুনহুয়াঙের শিল্পকলার জীবন-ইতিহাসকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা

চলে। প্রথম ওয়েই-যুগ আনুমানিক ছয় শতক থেকে সাড়ে সাতশতক পর্যন্ত। এই সময়কার প্রাচীনতম গুহাটি অজন্তার প্রাচীনতম গুহার প্রায় দু-শো বছর পরেকার। এই ওয়েই-যুগে আঁকা ছবিগুলি আশ্চর্য প্রাণপরিপূর্ণতায় সমৃদ্ধ, সবল আন্তরিকতা আর পবিত্রতায় ভরা, চিত্রণরীতি বাস্তবধর্মী। তারপর থেকে তাঙ্-যুগ আট শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। এই সময়কার ছবিগুলি কম্পোজিশনের দিক থেকে একটু যেন দরবারী হয়ে উঠেছে, রেখার চারুতায় ভারতীয় রূপদক্ষতার সঙ্গে মিশেছে চৈনিক মুন্সীয়ানা, দরবারী জাঁকজমকের প্রাধান্য আর বেশ কিছুটা রীতিবাহুল্য (sophistication) এসেছে। এই সময়কার ছবিগুলিতে 'ফিগার'-এর ভিড় বেশি, ভারতীয় ও চীনা শৈলীর সংমিশ্রণে নতুন 'ফর্ম' বিবর্তিত হতে থাকছে, বিষয়বস্তু শুধুমাত্র ধর্মকাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই— সামাজিক আর রাজনৈতিক পরিস্থিতির বর্ণনা এই ছবিগুলির একটি উল্লেখযোগ্য দিক। যেমন একটি বড় 'প্যানেল' বা চিত্রকাহিনীর বিষয়: এক রাজা বুদ্ধদেবকে একটি রাজছত্র দান করছেন, পরে ব্রাহ্মণদের প্ররোচনায় তিনি দান প্রত্যাহার করতে চাচ্ছেন, সেই রাজার ছেলে এতে ক্ষুব্ধ হয়ে রাজগৃহ ত্যাগ করে সস্ত্রীক বৌদ্ধ-ভিক্ষু হয়ে যাচ্ছেন। এটা হচ্ছে পরবর্তী মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সংঘাত-সংঘর্ষের একটি রাজনৈতিক বর্ণনা। আর একটি বড়ো ছবিতে মহাযান-তন্ত্রের 'সপ্তৈশ্বর্য' বর্ণনা আছে অত্যন্ত বিশদভাবে—বৌদ্ধদর্শনের ছাত্রমাত্রেই জানেন, বৌদ্ধধর্মে যখন বিভিন্ন তান্ত্রিক মতবাদের বিভেদ ঢুকছে, তখন এই 'সপ্তৈশ্বর্য'-পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সংঘস্থবিরেরা সচেষ্ট হয়েছিলেন ঐক্য-প্রয়াসে, পরবর্তীকালে এটা মহাযান-তন্ত্রের অঙ্গীভূত হয়। তাঙ্-যুগের চিত্রাবলীর এক প্রধান অংশ জুড়ে আছে 'পুণ্যভূমি'র অর্থাৎ ভারতের বর্ণনা। অজন্তার অনুকরণে 'উড়ন্ত অপ্সরা', 'বাদ্যকর', 'তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী' ইত্যাদি ছবিগুলির আশ্চর্য লালিত্য, গতিবেগ আর রঙ-ব্যবহারের কৃতিত্বে মুগ্ধ হতে হয়। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের যে বর্ণনা একটি বড়ো চিত্রে আছে তা নিবিড় আবেগে, বাস্তবমুখী সৌন্দর্যে আর রচনা-লালিত্যে গভীরভাবে দর্শকের মন স্পর্শ করে। পূর্ববর্তী ওয়েই-যুগের তুলনায় এই দ্বিতীয় যুগে বুদ্ধদেবের আত্মত্যাগের কাহিনীগুলি সংখ্যায় অনেক কম, ধর্মভাব আর আন্তরিকতার কিছুটা অভাব, কিন্তু তবু কুশলতা আর শিল্পোৎকর্ষের দিক থেকে তাঙ্-যুগ ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ। এর পরে উত্তর-তাঙ যুগ নয়-শতক পর্যন্ত। এই সময়ে যেসব

গুহা তৈরি হয়, তাদের চিত্রাবলীতে ক্ষয়িষ্ণুতার লক্ষণ স্পষ্ট। চিত্রিত মূর্তিগুলির প্রতিমা-লক্ষণ, বর্ণিকাভঙ্গ, অ্যানাটমি ইত্যাদিতে স্থূলতা ফুটে উঠেছে, সৃষ্টির আনন্দ সেখানে যেন শিল্পীকে আর প্রেরণা দিচ্ছে না, পূর্বানুসৃত কতকগুলি বিধিনির্দিষ্ট (stylised) ফর্ম-এর আর টেক্‌নিক-এর প্রাণহীন পুনরাবৃত্তিতে তাঁরা বাঁধা পড়েছেন। এই সময়ে আঁকা হীনযান-তন্ত্রের 'মারপ্রত্যয়'-এর চিত্রণগুলি দেখলেই বোঝা যায়—বৌদ্ধ জীবনদর্শনের সেই স্নিগ্ধ আত্মসমাহিতি আর ক্ষমা-তিতিক্ষায় ভরা মানবপ্রেমের আদর্শ থেকে শিল্পী বহু দূরে সরে এসেছেন, সৌন্দর্যভাবের চেয়ে বীভৎস রসসৃষ্টির দিকেই তাঁর ঝোঁক বেশি। শিশ্ন-সম্পর্কিত (phallic cult) কয়েকটি ছবিও এই সময়ে দেখতে পাচ্ছি। এ-সবই হয়েছে তৎকালীন সামাজিক অবস্থার ফলেই। সমগ্রভাবে তখন বৌদ্ধধর্মের অধঃপতন শুরু হয়েছে, সংঘারামগুলি তান্ত্রিকদের দলাদলির আখড়ায় পরিণত, স্থূল দৈহিক উপভোগের পরকীয়া গ্লানিতে ভক্তেরা আত্মহারা। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাষাণের কথা'য় অভিধর্মের সেই অধঃপতনের কলঙ্কময় ইতিহাস বর্ণিত আছে উজ্জ্বল ভাষায়। তুনহয়াঙের এই যুগের গুহাচিত্রগুলি তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। চতুর্থ পর্ব স্থঙ-যুগের চিত্রাবলীতে (৯২০--১২৭০ খ্রীঃ) কিছুটা পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা দেখা গেলেও সেটা ততটা সার্থক হতে পারেনি। দশ-শতক থেকে ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে আসে, ভারতের আকাশে নামে এক রাজনৈতিক অন্ধকার-যুগ, মঙ্গোলদের অভিযান শুরু হয় গান্ধারের পথে, এশিয়া জুড়ে সমস্ত সংঘারামগুলির ধ্বংসের সূত্রপাত এই সময় থেকে। চোদ্দ-শতক পর্যন্ত তুনহয়াঙ বেঁচে থাকলেও তখন থেকেই তার সাংস্কৃতিক সজীবতার অবসান।

তুন্‌হয়াঙ গুহার চিত্রাবলী প্রধানত ধর্মমূলক আর বুদ্ধজীবনী ও জাতক-বর্ণনা হলেও জনসাধারণের জীবনকে শিল্পীরা উপেক্ষা করেন নি; শ্রমজীবী জনতার দৈনন্দিন কাজকর্মের সুন্দর চিত্ররূপ আছে অসংখ্য রচনায়—চাষী, সৈনিক, গ্রাম্যমেলার উৎসব, তীর্থযাত্রীদের রাত্রির আস্তানা, জেলে, কুমোর, শিকারী, রাজকীয় শোভাযাত্রা—ইত্যাদি সবকিছুই এই চিত্রাবলীর অন্তর্গত।

কলকাতায় ব্যাবোর্ন-কলেজ-প্রাঙ্গণে তুনহয়াঙ-চিত্রাবলীর এই প্রদর্শনী দেখে তার আশ্চর্য প্রাণপরিপূর্ণতায় বিহ্বল হতে হয়। বারবার মনে হয় চীন আর ভারতের আত্মা কত কাছাকাছি, আমাদের জাতীয় ভাবধারার মধ্যে কি আশ্চর্য মিল, দুই দেশের ইতিহাস-ভাগ্যবিধাতা যে কোটি কোটি

অগণ্য সৃষ্টিশীল মানুষ—যুগ যুগ ধরে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন-সংগ্রাম ভাবনা-জীবনদর্শন কত এক, কত ঘনিষ্ঠ! যাঁরা এই প্রদর্শনীটি দেখেন নি, তাঁদের চীন-ভারত মৈত্রীর ইতিহাসের শিক্ষা নিঃসন্দেহে অনেকখানি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

বিয়োগপঞ্জী : প্রমথেশ বড়ুয়া

গত ৩০শে নভেম্বর শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়ার মৃত্যুসংবাদে চলচ্চিত্রের অনুরাগী মাত্রেই মর্মাহত হবেন। দশ-পনের বছর আগে বাঙলা সিনেমা ছিল ভারতের অন্য যে-কোন প্রদেশের সিনেমার চেয়ে ঢের বেশি অগ্রণী। কাহিনীর সুষ্ঠুতায়, অভিনয়-প্রযোজনার কৃতিত্বে, টেকনিক্যাল উৎকর্ষে বাঙলা চলচ্চিত্র তখন ছিল এখনকার চেয়ে অনেক উন্নত। সিনেমার সেই তৎকালীন অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠতার পেছনে যাঁদের দান অনেকখানি তাঁদের মধ্যে প্রমথেশ বড়ুয়া আমাদের অবশ্য-স্মরণীয়। আমাদের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে সিনেমা হচ্ছে সবচেয়ে উপেক্ষিত, সবচেয়ে অবহেলিত। এ-যুগের নতুনতম এবং অত্যন্ত শক্তিশালী একটা আর্ট ফর্ম হিসেবে সিনেমাকে এদেশে আমরা কেউ বড় একটা উপলব্ধি করিনি। দু-একটি অতিবিরল ব্যতিক্রম ছাড়া আমাদের ফিল্ম্‌-পরিচালক আর প্রযোজকরা সিনেমা জিনিসটাকে দেখেন, "জনসাধারণের স্থূলরুচি"র চাহিদা মিটিয়ে অর্থোপার্জনের মাত্র একটা উপায় হিসেবে। সিনেমা-শিল্পী যাঁরা—অর্থাৎ অভিনেতা-অভিনেত্রীগোষ্ঠী—তাঁরাও হলিউডীয় 'স্টার সিস্টেম'-এর পাকেচক্রে সিনেমাকে দেখতে শিখেছেন ব্যক্তিগত 'গ্ল্যামর' আর পাব্লিক-এর মধ্যে অনুরাগী 'ফ্যান্'-সৃষ্টির একটা মাধ্যম হিসেবে—বাঙলা-হিন্দী-মাদ্রাজী চলচ্চিত্রে অভিনয়ের নিকৃষ্টতা এবং অভিনেত্রী-দের কুৎসিত ইঙ্গিতে ভরা ভাবভঙ্গিমা দেখে অত্যন্ত গ্লানির সঙ্গে অনুভব করতে হয় যে এঁদের অনেকেরই সিনেমাকে আর্ট হিসেবে দেখার মতো শিল্পশিক্ষাটুকু নেই। এ দেশে বোধহয় একমাত্র ফিল্ম্‌-টেকনিশিয়ান, অর্থাৎ ক্যামেরাশিল্পী, ফিল্ম্‌-এডিটর প্রভৃতিরা ছাড়া আর কেউ নিজেদের শিল্পমাধ্যম সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত নন। প্রমথেশ বড়ুয়া ছিলেন সেই অতিবিরল সিনেমা-শিল্পীদের মধ্যে একজন যাঁরা নিজেদের সৃষ্টিকে সত্যিকার আর্টের গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। সিনেমার যে নিজস্ব এবং বিশিষ্ট কতকগুলি ফর্ম আছে, কলাকুশলতা আছে—

সেই জিনিসটাকে বাঙলা চলচ্চিত্রে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে প্রমথেশ বড়ুয়া-পরিচালিত ফিল্‌ম্‌গুলি তখনকার দিনে রীতিমত উল্লেখ-যোগ্য। তাঁর 'দেবদাস', 'মুক্তি' প্রভৃতি ছবিগুলি আজও পর্যন্ত শুধু বাঙালী নয়, সারা ভারতের জনসাধারণের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে শুধু তাদের গল্পের বাঁধুনি বা অভিনয়ের কৃতিত্বের জন্যেই নয়—সিনেমার মাধ্যমে কোন বক্তব্যকে জোরালোভাবে উপস্থিত করার বিশিষ্ট রীতি-পদ্ধতিগুলির জন্যেও বটে। সব মিলিয়ে এগুলি যে তখনকার দিনে ফিল্‌ম্ হিসেবেই সার্থক হয়ে উঠতে পেরেছিল, তার কারণ সিনেমার আর্ট সম্বন্ধে প্রমথেশ বড়ুয়ার ছিল একটি সর্বাঙ্গীণ উপলব্ধি আর শিল্পীজনোচিত কল্পনাপ্রবণতা। তিনি ছিলেন একাধারে কুশলী ক্যামেরাম্যান, সিনারিস্ট্, এডিটর, অভিনেতা এবং পরিচালক। নিজের শিল্প-মাধ্যমকে তিনি মোটামুটি সবদিক থেকে জানতেন বলেই সেটাকে তিনি ভালভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। তাঁর শেষের দিককার ফিল্‌ম্‌গুলিতে তিনি অবশ্য তাঁর শিল্পসৃষ্টি-ক্ষমতার পুরোপুরি পরিচয় দিয়ে উঠতে পারেন নি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তখন থেকেই ভারতীয় সিনেমার—বিশেষ করে বাঙলা সিনেমার—এক কল্পনাতীত অধঃপতনের যুগ শুরু। তখনই এদেশে একদিকে অভিনেত্রীদের নিয়ে 'স্টার' সৃষ্টির পালা আরম্ভ হয়ে গেছে পুরোমাত্রায়, অন্যদিকে অত্যন্ত বিকৃতরুচি মুনাফালোভী প্রোডিউসারের দল সৎ শিল্পীর সৃষ্টি-স্বাধীনতায় নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ শুরু করেছে। এই দুটোই হচ্ছে একই বিকৃতির দুই ভিন্ন প্রকাশ। ধনতন্ত্রের শাসনে শিল্পের সেই বিকৃতি আর শিল্পীর নিরুপায় আত্মবিক্রয় সম্বন্ধে প্রমথেশ বড়ুয়ার মন যে সচেতন ছিল এবং তার ফলে তিনি যে সুত্যন্ত গ্লানি অনুভব করতেন, তার প্রমাণ পেয়েছিলাম ১৯৪৯-এ বাগবাজারে একটি সিনেমা-অনুরাগীদের সভায় তাঁর সভাপতির ভাষণে। তিনি যখন বুঝেছিলেন যে ভাল সিনেমা তৈরি করা আর তাঁর দ্বারা হচ্ছে না, স্বাধীন ভাবে সৎ শিল্প সৃষ্টি করার পথ তাঁর পক্ষে রুদ্ধ, প্রযোজকদের খুশিমতো বাজে ছবি তুলে তাঁর সুনাম ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, তখন থেকেই তিনি সিনেমা-জগৎ থেকে নিজেকে প্রায় সরিয়ে নেন। অবশ্য, শারীরিক অসুস্থতাও ছিল তার একটা মস্তবড় কারণ। তবু, আমাদের সমাজের বর্তমান অবস্থা দেখে তাঁর শিল্পীমন যে কতখানি ভেঙে পড়েছিল তা জানতে পেরেছিলাম তাঁর সেই বক্তৃতায় এবং দু-একটি ইংরেজী প্রবন্ধে। তখনকার অনেক বড় বড় পরিচালকের সাম্প্রতিক অধঃপতন দেখে, এবং প্রমথেশ বড়ুয়া

যে শেষ পর্যন্ত তাঁদের মতো আত্মবিক্রয় করেন নি—সেকথা মনে করে, তাঁর স্মৃতির প্রতি বেদনাভরা শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

নাট্য-আন্দোলনের মুখপত্র

বাংলার নাট্যসংস্কৃতির ক্ষেত্রে কিছুদিন থেকে একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একদিকে আমাদের পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলির নিতান্ত দেউলিয়া অবস্থা: দু-একটি অতিবিরল ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সর্বত্রই এঁরা নাটকের নামে যা পরিবেশন করছেন, দেশের জীবনের সঙ্গে তার কোন সংস্রব তো নেই-ই, এমন কি, অভিনয়-প্রযোজনা ইত্যাদি নাট্যকলাকুশলতার ব্যাপারেও তা হাস্যকর রকমের স্থূল আর অতীত-মুখী। অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে নাটক সম্বন্ধে জনসাধারণের সত্যিকার আগ্রহ আর চাহিদা—যার ফলে শহরে মফঃস্বলে পাড়ায় পাড়ায় 'অ্যামেচার' নাট্য-সম্প্রদায়ের স্বতঃস্ফূর্ত আবির্ভাব। এই সম্প্রদায়গুলি সম্বন্ধে সবচেয়ে বড়ো কথা: অ-পেশাদারী হলেও এঁদের অধিকাংশই কিন্তু দশ-বিশ বছর আগেকার 'শৌখিন নাটুকেদল'গুলির মতো সংস্কৃতি-বিলাসী নন, নাটক এবং নাট্য-আন্দোলনের ওপর এইসব নতুন আর বেশির ভাগই নবীন নাট্যশিল্পীরা রীতিমত গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন, নাটকের মধ্যে দিয়ে দেশের সত্যিকার অবস্থাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন, নাটকের সামাজিক তাৎপর্য সম্বন্ধে এঁরা অবহিত, অভিনয়-ইত্যাদিকে যথাসাধ্য আন্তরিক করে তুলতে চান। আমাদের নাট্য আন্দোলন—তথা সংস্কৃতি-আন্দোলন—যে একটা নতুন মোড় নিতে চাচ্ছে, এটা তারই একটা মস্তবড়ো সু-লক্ষণ। বলা বাহুল্য, সমস্যাও অনেক আছে। প্রধানতম সমস্যা ভালো নাটকের অভাব: আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে নাটকের ফসল সবচেয়ে অপ্রচুর, তার চেয়েও কম এমন নাটক যাতে দেশের মানুষের যথার্থ আর বাস্তব পরিচয় আছে। তারপর আছে প্রযোজনার সমস্যা যার সঙ্গে জড়িত অর্থের প্রশ্ন; ইত্যাদি। কিন্তু তবু, এসব বাধার মধ্যেই নতুন নাট্য-আন্দোলনের বেশ একটা সাড়া পাওয়া যাচ্ছে চতুর্দিকে। চাহিদা মতো ভাল নাটকের অভাবে এঁরা হাতের কাছে যা পাচ্ছেন তাই নিয়েই অভিনয় চালাচ্ছেন—অনেক ক্ষেত্রে এই নাটকগুলির রচনা কাঁচা, ঘটনা-বিন্যাস দুর্বল, রচয়িতার বাস্তব অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ। তা

সত্ত্বেও এই নাটকগুলি শিল্পীদের মনোনয়ন পাচ্ছে তাদের বক্তব্যের সুস্থতার জন্যে, তাদের বাস্তবমুখী সততার জন্যে।

কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাদের নাট্য-আন্দোলনের এই প্রকাশগুলি থেকে গেছে একান্তভাবেই স্বতঃস্ফূর্ত। এইসব নাট্য-সম্প্রদায়গুলিকে এবং তাঁদের প্রচেষ্টাকে মোটামুটি একটা সংগঠিত রূপ দেওয়ার প্রয়োজনও বেশ কিছুটা অনুভব করা যাচ্ছে। এ প্রয়োজন শুধু নতুন নাট্যদলগুলির আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যেই নয়, আমাদের নাট্যসংস্কৃতিকে আবার নতুন সজীবতায় জীইয়ে তোলার জন্যেও। সমাজের সমসাময়িক চেহারা, তার মধ্যে বিভিন্ন শক্তির স্ফুরণ আর সেইসব শক্তির সংঘাত-সংঘর্ষ, তার গ্লানির দিক আর গৌরবের দিক—এই সবকে শিল্পরসোত্তীর্ণ করে ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে প্রত্যেকটি দেশের জাতীয় রঙ্গমঞ্চের যে চিরদিনের একটি নিজস্ব ঐতিহাসিক দায়িত্ব এবং ঐতিহ্যগত তাৎপর্য আছে, সেদিক থেকে আমাদের আবার স্বপ্রতিষ্ঠ হতে হবে। এর জন্যে একান্ত দরকার একটি কেন্দ্রীয় নাট্যসংস্থা এবং নাট্য-আন্দোলনের একটি নিজস্ব মুখপত্র যার মারফত সবদিক থেকে ব্যাপক, বিস্তৃত আর সর্বাঙ্গীণ আলাপ-আলোচনা হতে পারবে।

শ্রীদিগিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'নাট্যলোক' নামে নাট্যজগতের যে পাক্ষিক মুখপত্রটি অল্প কিছুদিন থেকে প্রকাশিত হচ্ছে, সেটি এই প্রয়োজন অনেকখানি মেটাবে বলে আশা করি। এ পর্যন্ত 'নাট্যলোক'-এর যে তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে, তার থেকে পত্রিকাটির দ্রুত ক্রমোন্নতিও লক্ষ্যণীয়। দেশ-বিদেশের নাটক ও চলচ্চিত্রের আলোচনা, স্থানীয় পেশাদার-অপেশাদার মঞ্চাভিনয়ের সমালোচনা; বিভিন্ন নাট্যদলের কাজকর্মের খবরাখবর, আমাদের নাট্যসংকটের ওপর একাধিক প্রবন্ধ—ইত্যাদি অনেক কিছু 'নাট্যলোক'-এর এই তিনটি সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত। আমাদের নাট্যমঞ্চের ঐতিহাসিক পর্যালোচনাও আছে—যেমন প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের আবির্ভাব'। অবশ্য, খুব আশানুরূপ নয় এমন রচনাও কয়েকটি বেরিয়েছে, কিন্তু মাত্র প্রথম তিনটি সংখ্যায় যে-কোন পত্রিকাতেই সেই ত্রুটি থাকে। মঞ্চ-প্রযোজনার আধুনিক কলাকৌশল, নাট্যকার, অভিনেতা-অভিনেত্রী আর মঞ্চকারুশিল্পীদের শিল্পগত সমস্যা, সাংগঠনিক সমস্যা, আর্থিক সমস্যা ইত্যাদি, খ্যাতনামা অভিনয়-শিল্পীদের বৈশিষ্ট্য, দেশবিদেশের সাম্প্রতিক নাট্যসাহিত্যের বিভিন্ন ধারার পরিচয় প্রভৃতি নানা বিষয়ের ওপর আলোচনা ক্রমশ 'নাট্যলোক'-এ নিশ্চয়ই প্রকাশিত হবে। ইতিমধ্যে, 'নাট্যলোক'-এর প্রকাশ আমাদের একটা মস্ত-বড়ো সাংস্কৃতিক প্রয়োজন মেটাবে বলে এই নবতম প্রগতিশীল পত্রিকাটিকে অভিনন্দন জানাই।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবনীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে (৫ই ডিসেম্বর) আমাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে ক্ষতির সৃষ্টি হ'ল, তা শুধু অপূরণীয়ই নয়, অপরিমেয়ও। আমাদের এ-যুগের সংস্কৃতি-জগতে রবীন্দ্রনাথের ঠিক পরেই যিনি সবচেয়ে স্মরণীয়, তিনি অবনীন্দ্রনাথ। স্মৃতিভ্রষ্ট ভারতশিল্পের আত্মসন্ধান আর আত্মপ্রতিষ্ঠার কাজে পথিকৃৎ হিসাবেই যে অবনীন্দ্রনাথ শিল্প-ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন শুধু তাই নয়, সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে তাঁর দান এক নতুন রসের উৎসমুখ খুলে দিয়েছিল। শিল্প আর সাহিত্য—সংস্কৃতির এই দু'টি প্রধানতম সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি যে আশ্চর্য ফসল ফলিয়ে গেছেন, তা আমাদের সংস্কৃতি-ভাণ্ডারে অক্ষয় সঞ্চয় হয়ে রইল।

এই সংখ্যার 'পরিচয়' যখন ছাপা শেষ হয়ে এসেছে, তখন অবনীন্দ্রনাথের মৃত্যুসংবাদ পাওয়া গেল। আগামী সংখ্যায় তাঁর সম্বন্ধে একটি বিস্তারিত ও বিশদ সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হবে।

উপরের ছবিটি বিশ্বভারতীর সৌজন্যে

শান্তির স্বপক্ষে

বিশ্ব-শান্তি-সংসদের আবেদন

সম্মিলিত জাতি-সংঘ ও নিখিল বিশ্বের কাছে,
জাতি-সংঘের সাধারণ সংসদের সভাপতির কাছে,

ভিয়েনায় সমবেত বিশ্বশান্তি সংসদ সম্মিলিত জাতি-সংঘের সাধারণ সংসদের সভাপতির কাছে, নিখিল বিশ্বের জনমত ও জনসাধারণের কাছে এই আবেদন জানাচ্ছেন।

সম্প্রতি বিগত কয়েক মাসে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ায়, তার আরও অবনতি সকল দেশের নরনারীকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে, তাঁদের উৎকণ্ঠিত ও শংকিত করে তুলেছে। বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নির্ভরযোগ্য বৃহৎ পঞ্চ-শক্তির ভিতরে আলাপ-আলোচনা এবং ঐক্য ও চুক্তি-সম্পাদনের আশা প্রত্যেকেই করছেন—এই ঐক্য ও চুক্তি-সম্পাদন করতে হবে সম্মিলিত জাতি-সংঘের সনদের শর্ত অনুসারে এবং বৃহৎ পঞ্চশক্তির আক্রমণরোধী ক্ষমতার প্রয়োগে। বৃহৎ পঞ্চশক্তির ভিতরে শান্তি-চুক্তি সম্পাদনের জন্য বিশ্বশান্তি সংসদের আন্দোলন তাই বিশ্বজনমতের কাছে ঘটনা-প্রবাহের গতি-পরম্পরায় এবং অপরাপর উপায় ও পদ্ধতির অকার্যকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে ন্যায়সংগত বলে বিবেচিত হচ্ছে।

বিশেষ করে নিম্নলিখিত বিষয় ক'টির প্রতি বিশ্ব-শান্তি সংসদ সম্মিলিত জাতি-সংঘের সাধারণ সংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন:

(১) নিখিল মানবজাতির সাধারণত সংখ্যালঘু অংশের প্রতিনিধিস্থানীয় সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের সংখ্যাধিক্যের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ গোটা দুনিয়ার উপর চাপিয়ে দিলে শান্তি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। আলাপ-আলোচনা, মৈত্রী ও মিলনের পথেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নিখিল বিশ্বের শান্তিপূর্ণ বিকাশবিধানের জন্য প্রয়োজনীয় ঐক্য।

বিশেষত এশিয়া মহাদেশেও যেহেতু এ ধরনের ঐক্যের প্রসার লাভ অবশ্যই বাঞ্ছনীয়, তাই ন্যায়বিচার ও আন্তর্জাতিক নীতির বাস্তব বোধ ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি চীনা জনসাধারণের সাধারণতান্ত্রিক সরকারকে সম্মিলিত জাতি-সংঘে গ্রহণের দাবি করে, এই গ্রহণকে অবশ্য-প্রয়োজনীয় করে তোলে।

(২) চতুঃশক্তি সহকারী পররাষ্ট্র-সচিবদের সম্মেলনের ব্যর্থতা এবং আটল্যান্টিক সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশনে ওয়াশিংটন ও অটোয়াতে গৃহীত ঐক্য-চুক্তি নিরস্ত্রীকরণের সকল চেষ্টাকে দুরূহ করে তুলছে, জার্মান জনসাধারণের নিজেদের ঐক্য পুনঃস্থাপন সম্পর্কে নিজেদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথে বাধা দিচ্ছে আর ইওরোপের যুদ্ধের বিপদকে, আশংকাকে বাড়িয়ে তুলছে।

বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে আলাপ-আলোচনা একটি ঐক্যবদ্ধ, গণতান্ত্রিক ও অসামরিকীকৃত (demilitarised) জার্মানীর প্রতিষ্ঠা আরও বেশি তাড়াতাড়ি সংঘটিত করতে পারে। জার্মানীর সমস্যার এই সমাধান, একই সঙ্গে ও সময়ে জার্মান জনসাধারণের বিপুলতম অংশের আশাআকাঙ্ক্ষা, জার্মানীর প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থ এবং শান্তির উদ্দেশ্য সাধনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সংগতিপূর্ণ।

কাজে কাজেই বিশ্ব-শান্তি সংসদ সম্মিলিত জাতি-সংঘের কাছে এই সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছেন যে, জার্মানীর নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক ঐক্য, চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা, অর্জনের জন্য এই প্রতিষ্ঠান তাঁর প্রভাব প্রয়োগ করুন, তাঁর প্রভাব নিয়োগ করুন এমন একটি শান্তিচুক্তির সম্পাদনকে ত্বরান্বিত করার জন্য যা সকল দখলকারী সৈন্যবাহিনীর অপসারণকে সম্ভব করবে এবং একটি ঐক্যবদ্ধ ও অসামরিকীকৃত জার্মানীর পুনর্গঠন সম্ভব করে তুলবে।

(৩) এশিয়ায় পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সমগ্র মানবজাতি ব্যগ্র, আগ্রহান্বিত ও অনুরাগসম্পন্ন। জাপানের সঙ্গে সম্পাদিত সানফ্রান্সিস্কো চুক্তি এই শান্তি পুনঃস্থাপনাকে গুরুতরভাবে সংকট-সংকুল করে তুলেছে। এই শান্তি পুনঃস্থাপন শুধু যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদন করে সংঘটনশীল সকল যুদ্ধবিগ্রহের, প্রথম ও প্রধানতম কোরিয়ার যুদ্ধবিগ্রহের, অবসান ঘটানোই বোঝায় না, পরন্তু এশিয়া মহাদেশীয় জাতিসমূহের স্বাধীনতা ও সকল রকমের বৈদেশিক হস্তক্ষেপহীন আঞ্চলিক অখণ্ডতার অধিকারকেও সুনিশ্চিত করা বোঝায়।

(৪) জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের পরিপন্থী ব্যবস্থা ও অবস্থা-পরিবেশ চালু রেখে মধ্য প্রাচ্যে ও উত্তর আফ্রিকায় শান্তি বজায় রাখাকে সন্তোষজনকভাবে সুনিশ্চিত করা যায় না। মিশর, ইরান, মরোক্কো এবং নিকট ও মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার অপরাপর দেশের জনসাধারণের নিজেদের ব্যাপার-বিষয়, কাজকর্ম নিজেরা চালনা ও ব্যবস্থাপনা করার অধিকারকে স্বীকার করে নিতে হবে,—স্বীকার করে নিতে হবে কার্যকরী ভাবে। এই অধিকার হবে প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন সব রকমের বাইরের চাপ বা বিদেশী হস্তক্ষেপবিহীন এবং প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন সব রকমের সামরিক জবরদখলের এখ্‌তিয়ারবিহীন।

(৫) ধ্বংসের নিশ্চয়তা আর মানব জাতির মনুষ্যত্বের পক্ষে দুর্বৈবপূর্ণ মহাসমরের শংকা ছড়ানো ছাড়া অস্ত্রসজ্জার এ প্রতিযোগিতা জনসাধারণকে আর কিছুই দিতে পারে না। কাজেই যুগপৎ, ক্রমবর্ধমান ও কার্যকরী ভাবে নিয়ন্ত্রিত নিরস্ত্রীকরণের পথ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

বিশেষ করে, আণবিক অস্ত্র ও গণবিধ্বংসী অপরাপর অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারে নিষেধ আরোপ করাকে অবশ্যই স্বীকার করে নেবে, সামিল করে নেবে এই ধরনের নিরস্ত্রীকরণ। এই সব আণবিক অস্ত্র ও গণবিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার সর্বজনগ্রাহ্য নৈতিক মান ও আদর্শেও নিন্দিত। বিশ্ব-শান্তি সংসদ আজ (৮ই নভেম্বর, ১৯৫১) ভিয়েনাতে গৃহীত নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাবটিকে সম্মিলিত জাতি-সংঘ প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সংসদের কাছে আলোচনা করবার জন্য উপস্থাপিত করতে অনুরোধ জানাচ্ছেন। কোন অবস্থাতেই এই প্রস্তাবটি এক বা অপর কোন রাষ্ট্রের সুবিধা বা অসুবিধার ব্যাপারে তারতম্যহীনতার, অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করবে না। যে কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাই দিয়ে এই প্রস্তাব নিরস্ত্রীকরণের প্রতিটি পর্যায়ে সকলের নিরাপত্তাকেই সুনিশ্চিত করছে।

যুদ্ধ অনিবার্য নয়; বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক শাসনব্যবস্থা শান্তিপূর্ণ-ভাবে একই সময়ে বিদ্যমান থাকতে পারে; আর এই প্রস্তাবটি সমগ্র মানব-জাতির স্বার্থ, উদ্দেশ্যের অনুকূল, তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ সম্পর্কে বিশ্ব-শান্তি সংসদ কৃতনিশ্চয়, দৃঢ়বিশ্বাসসম্পন্ন।

মাননীয় সভাপতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।

—পশ্চিমবঙ্গ শান্তি-সংসদ কর্তৃক প্রচারিত॥

অবনীন্দ্রনাথের

বুদ্ধ ও সুজাতা
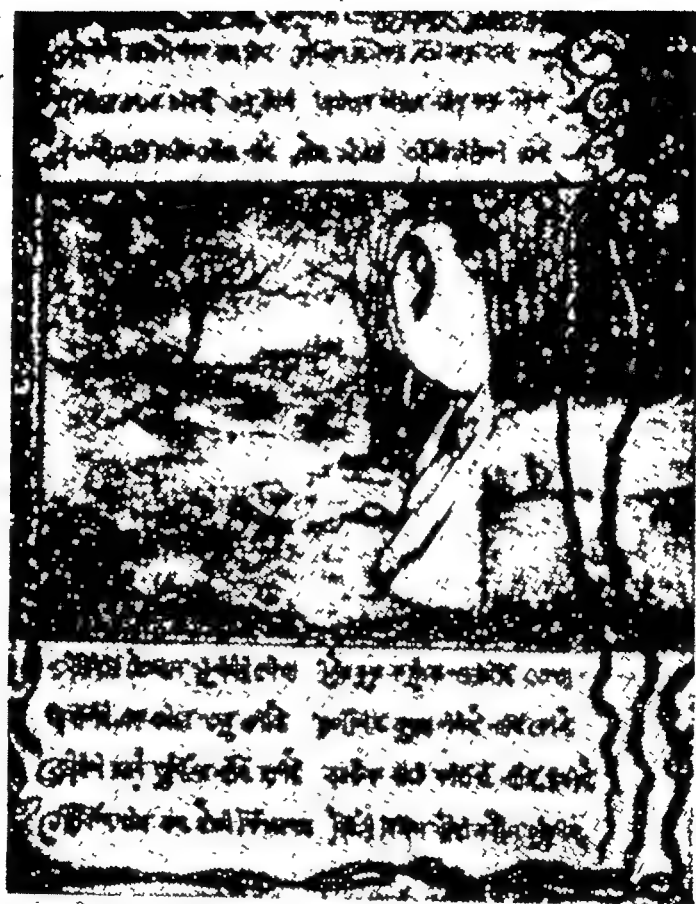
অভিসার
চণ্ডীদাসের পদাবলী অবলম্বনে ভারতীয়
পদ্ধতিতে অবনীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার
প্রথম প্রচেষ্টা

একবিংশ বর্ষ
প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা
পৌষ, ১৩৫৮

আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলাদেশের তথা সমগ্র ভারতের দুর্ভাগ্য যে আচার্য অবনীন্দ্রনাথের তিরোধানে আমরা কি হারালাম তার বোধশক্তি আমাদের নেই—আমাদের তথাকথিত সংস্কৃতির যতই আমরা বড়াই করি, আমাদের সাহিত্য-সেবার আস্ফালন করে আমরা যতই আত্মপ্রসাদ লাভ করি। এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে রবীন্দ্রনাথকে পুরোভাগে রেখে বাংলার সাহিত্যিকরা এক মূল্যবান সাহিত্যের সম্ভার সৃষ্টি করে তুলেছেন—বিশেষত কথা-সাহিত্যের বিভাগে,—যার তুলনা বোধহয় ফরাসী সাহিত্য ছাড়া আর কোথাও মেলে না। সংগীতে বর্তমান যুগের বাঙালীর ও অ-বাঙালীর দান মহনীয় এবং মহামূল্য। দেশে সাহিত্য-ও সংগীত-রসের রসিক ও সমালোচকের অভাব নেই। এবং আমাদের সম-সাময়িক সাংস্কৃতিক চর্চা সাহিত্যে, কাব্যে, উপন্যাস-রচনায়, সংগীতের নানা বিভাগে বরণীয় অর্ঘে গৌরবের চূড়া রচনা করেছে, আমাদের সংস্কৃতির মন্দির উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত করে তুলেছে।

আমাদের আধুনিক জীবন কেবল অতীতে রচিত বিপুল সংস্কৃত ও নানা প্রাচীন প্রাকৃত ভাষায় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনার আস্বাদন ও সমালোচন করেই তুষ্ট হয়নি; সাহিত্যের ও সংগীতের নানা ক্ষেত্রে নূতন ফসলের আবাদ করে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির ভাণ্ডার আমরা নানা বহুমূল্য সৃষ্টি দিয়ে সমৃদ্ধ করে তুলেছি। নানা প্রতিভাবান সংগীত-ও সাহিত্য-সাধক আমাদের প্রাচীন সাধনাকে নূতন পথে পরিচালিত ও পরিণত করে, নূতন সৃষ্টির নূতন কলেবর যোজনা করে, আমাদের সাহিত্যের ও সংগীতের ভাণ্ডার নানা রত্নে উজ্জ্বল করে তুলেছেন, যার ফলে আমাদের আধুনিক জীবন নানা বিচিত্র রসে ভরপুর হয়ে উঠেছে।

কিন্তু রূপ-চর্চার ক্ষেত্রে, রূপসাধনার পথে আমাদের জাতীয় জীবন এখনও অনেকটা অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সংগীত ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে-পরিমাণে চেতনা

বা সক্রিয়তা দেখা যায় রূপবিদ্যার ক্ষেত্রে তার শত অংশের এক অংশ দেখা যায় না। অন্যান্য সভ্যদেশে রূপবিদ্যার চর্চা, রূপসৃষ্টির আদর, শিক্ষা ও সমাজের একটি অবশ্যপালনীয় কর্তব্য বলে গৃহীত হয়েছে। কি আধুনিক কি প্রাচীন দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টির গুণ গ্রহণ করবার শক্তি আমরা বহুদিন হারিয়ে বসেছি। তার ফলে দেশের চিত্রশিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমাদের মনে কোনও প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করতে পারে না। কয়েকটি ঐতিহাসিক কারণে ভারতের প্রাচীন শিল্পের ধারা উনিশ শতকের মাঝামাঝি স্তব্ধ হয়ে এসেছিল এবং ইতিমধ্যে বিদেশী ইউরোপীয় শিল্পের মোহ আমাদের পরাধীন মনকে এমন আক্রান্ত ও আচ্ছন্ন করেছিল যে তার ফলে আমরা আমাদের প্রাচীন শিল্পের গৌরবের ইতিহাস একেবারে বিস্মৃত হয়েছিলাম। আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তির সঙ্গে পরিচয় পর্যন্ত হারিয়ে বসেছিলাম। ইংরাজী শিক্ষক আমাদের শিল্পের ইতিহাসের ব্যাখ্যা করে আমাদের শিখিয়ে দিয়েছিল যে, ভারতের প্রতিভা দার্শনিক চিন্তায় বিশেষ দক্ষ হলেও সৌন্দর্যবুদ্ধিতে হীন ও পঙ্গু। ভারতের কলাশিল্প ইউরোপের কলাশিল্পের সামনে দাঁড়াতে পারে এমন কোনও বড় দরের উচ্চ শ্রেণীর কলাসৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। অল্প সময়ে পাঞ্জাবের গান্ধার দেশ গ্রীকশিল্পের সংস্পর্শ লাভ করে কিছুদিনের জন্য উচ্চ অঙ্গের শিল্প-সাধনার সুযোগ পেয়েছিল বটে কিন্তু গান্ধার-শিল্পের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের শিল্পচেষ্টাও সমাধি লাভ করেছিল। তার পরে ভারতে যে সব কলাসৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে সে সমস্তই অপসৃষ্টি, সেগুলি 'কলা' নামের যোগ্য নয়—ইউরোপের যে-কোনও কলাসৃষ্টির সঙ্গে তার তুলনা হয় না। ভারতের বিজাতীয় ঐতিহাসিক ভারতের প্রামাণিক বিবরণপঞ্জীতে সগর্বে ঘোষণা করলেন যে, তিন শতকের পর, অর্থাৎ ভারতে গ্রীকশিল্পের তিরোধানের পর কোনও উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্যের আবির্ভাব হয়নি "এবং ভারতের ভাস্কর্য কলাপদ-বাচ্য নয়" ("After 300 A. D. Indian Sculpture properly so-called hardly deserves to be reckoned as Art"—Vincent Smith, Imperial Gazetter II, Ch. III.)

এইরূপে ভারতের কলাসাধনার অলৌকিক ইতিহাস, তার অপর্যাপ্ত শিল্প-সৃষ্টির অতি-উজ্জ্বল যুগ ও দৃষ্টান্তগুলি ভারতীয়দের পরিচয় ও আলোচনার পথ থেকে অপসারিত হল, এবং ইংরাজের বিদ্যালয়ে শিক্ষিত ভারতবাসী ভারতের জাতীয় কলাশিল্পের ইতিহাসের সম্পূর্ণ স্পর্শ হারিয়ে বিদেশী

কলাশিল্পের অন্ধ ভক্ত ও অনুরাগী হয়ে উঠল। দেশের শিল্পসৃষ্টিকে তারা বিরাগ ও বিদ্বেষের চক্ষে দেখতে শিখল। ভারতের কলাশিল্পের পাঁচ হাজার বৎসরের অবিচ্ছিন্ন গৌরবের ধারার ইতিহাস দেশের লোকে বিস্মৃত হল। ইলোরার গুহামন্দিরের অদ্ভুত ও অদ্বিতীয় শিল্পকীর্তি, যা আজ জগতের অষ্টম আশ্চর্য বলে স্বীকৃত হয়েছে, অজন্তার অলৌকিক চিত্রশালার স্মৃতি উনিশ শতকের তথাকথিত শিক্ষিত ভারতবাসী হারিয়ে ফেলে, ইউরোপের বিজাতীয় শিল্পসম্ভারে মনোনিবেশ করল। রূপবিদ্যার ক্ষেত্রে, কলাবিদ্যার আলোচনার ক্ষেত্রে শিক্ষিত ভারতবাসী আপনাকে হারিয়ে বিজাতীয় কলা-শিল্পের পায়ে মাথা নত করল। কারণ, ইংরাজের শিক্ষা, ইংরাজের প্রভাব ভারতবাসীদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি করল যে ভারতের রূপসৃষ্টির প্রতিভা নেই; শিল্প ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু, ইন্দ্রিয়-বিদ্বেষী ভারতের দর্শনশাস্ত্র ভারতের রূপ-সৃষ্টির পথে বাধা রচনা করেছিল। এইজন্য প্রাচীন ভারতে গ্রীক ও অন্যান্য যুগের স্রষ্ট কলাশিল্পের তুলনায় যোগ্য কোন কলাশিল্পের ইতিহাস গড়ে ওঠেনি। সুতরাং ইউরোপের শ্রেষ্ঠ রূপসৃষ্টিকে সামনে আদর্শ রেখে নূতন ভারতকে রূপসাধনার পথে যাত্রা শুরু করতে হবে। কারণ, রূপসাধনার পথে ভারতের কোনও কীর্তি নেই, কোনও ঐতিহ্য নেই। এমন কি, ভট্ট মোক্ষ-মূলারও এই রূপবিদ্যার "রূপকথা" ও কাল্পনিক আখ্যানে ও মিথ্যাতাবশে তাঁর প্রামাণিক মত প্রকাশ করে ভারতের কলাশিল্পের ইতিহাসে শূন্যতা ও নেতি-বাদের একটি কাল্পনিক ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। আচার্য মোক্ষমূলার অধ্যাপক উইলিয়ম নাইটকে এক পত্রে লিখেছিলেন :

"The idea of the Beautiful in Nature did not exist in the Hindu mind. It is the same with their descriptions of human beauty. They describe what they saw, they praise certain features, they compare them with other features of Nature, but the Beautiful *as such* does not exist for them. They never excelled either in Sculpture, or Painting.

...But it is strange nevertheless, that—the people so fond of the highest abstractions as the Hindus—should never have summarized their perception of the Beautiful."

অর্থাৎ—প্রকৃতির রূপের মধ্যে সৌন্দর্যের প্রতীতি হিন্দুর মানস-চক্ষে প্রতিফলিত হয়নি। মানুষের সৌন্দর্য সম্বন্ধে এক কথাই খাটে। চক্ষু যাহা দৃষ্ট বস্তুর তাঁরা বর্ণনা করেছেন, কোন কোন বিভাগের স্তুতিগান করেছেন,

এবং প্রকৃতির এক বস্তুর সহিত প্রকৃতির অন্য বস্তু বা অঙ্গের তুলনা করেছেন—কিন্তু রূপ-সৌন্দর্য বলতে যে-সত্তা বোঝায় তাঁদের কাছে তার কোনও অস্তিত্ব নেই। তাঁরা কোনও কালে মূর্তি-নির্মাণ কিংবা চিত্র-সৃষ্টিতে পরিদর্শিতা বা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারেন নি। কথাটা আশ্চর্য ও অদ্ভুত শোনালেও স্বীকার করতে হয় যে, হিন্দুদের মতো অতি উচ্চ-চিন্তার বিতর্কবাদের বিশেষ ভক্ত ও সূক্ষ্ম দার্শনিকতায় শ্রেষ্ঠ জাতি তাঁদের সৌন্দর্য-অনুভূতির কোন কথাই সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনিন।

ভারতীয় রূপসাধনা ও রূপ-তত্ত্বের ইতিহাসের এই অলীক আরব্য-উপন্যাস অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বীকার করে নিতে পারেননি। তাঁর মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ভারতের চিত্রসাধনার প্রাচীন ঐতিহ্য আছে এবং প্রাচীন যুগের চিত্র-শিল্পের নমুনা কিছু-না-কিছু কোথাও বর্তমান আছে। সেই প্রাচীন নমুনা ও প্রাচীন ঐতিহ্যের সন্ধান পেলে তাকে অবলম্বন করে নূতন যুগের উপযোগী জাতীয় চিত্র-পদ্ধতির সূত্রপাত করা সম্ভব হতে পারে।

চিত্রশিল্পে তাঁর প্রথম হাতেখড়ি হয় ইউরোপের চিত্ররীতির শিক্ষালাভ করে। এই বিষয়ে তাঁর প্রথম গুরু ছিলেন সিগ্‌নর গিলার্ডি এবং ফ্রেডরিক্ পামার। তাঁদের কাছে ইউরোপীয় রীতিতে রেখা-অঙ্কন, প্যাস্টেল চিত্র ও তেলের রঙের চিত্ররচনার প্রয়োগ তিনি শিক্ষা করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় পদ্ধতি আয়ত্ত করে স্বাধীনভাবে চিত্র-রচনায় মনোযোগী হলেন। তাঁর এই সময়কার প্রথম চিত্র-সৃষ্টি হল কয়েকটি "কৃষ্ণলীলা"-বিষয়ক চিত্রাবলী। কিন্তু তিনি এই শ্রেণীর চিত্র এঁকে তৃপ্তি পাননি। তিনি অনুসন্ধান করছিলেন প্রাচীন ভারতের রেখারীতি কি জাতীয়, তার চরিত্র কি, তার ঐতিহ্য কি। মানুষ যা একান্তমনে খোঁজে তা নিশ্চয়ই লাভ করে। অনেক অনুসন্ধানে তিনি একখানা প্রাচীন চিত্র-সমষ্টির সংগ্রহ বা এলবাম্ (মুরক্কা) পেলেন—তাতে অনেকগুলি প্রাচীন মুঘল "কলমে" লেখা ছবি ছিল। এই ছবিগুলির মারফত তিনি ভারতের প্রাচীন পদ্ধতির রেখারীতি ও ঐতিহ্যের সাক্ষাৎ পেলেন। এই প্রাচীন চিত্রের ভাষা অবলম্বন করে—তিনি তাঁর নূতন যুগের উপযোগী চিত্ররীতি উদ্ভাবিত করতে চেষ্টা করতে লাগলেন। ক্রমে রাজপুত শৈলীর কয়েকটি ছিন্ন চিত্র তাঁর হাতে পড়ল। এর মারফত অবনীন্দ্রনাথ হিন্দু চিত্র-শৈলীর প্রকৃতি কি তার পরিচয় পেলেন। এইরূপে তাঁর চোখের সামনে প্রাচীন ভারতীয় চিত্রের ঐতিহ্যের

অনুশীলনের পথ প্রকাশিত হল। ইতিমধ্যে ই. বি. হ্যাভেল মাদ্রাজ থেকে বদলি হয়ে কলকাতার সরকারী কলাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত হলেন। হ্যাভেলের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথও প্রাচীন চিত্র-শিল্পের নানা নিদর্শন ও নমুনা সংগ্রহ করতে শুরু করলেন। একদিকে যেমন সরকারী চিত্রশালা, অপরদিকে অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব সংগ্রহ-শালা—প্রাচীন ভারতের নানা রীতির নানা শৈলীর শিল্পসম্ভারে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ভারতের গৌরবময় কলাসাধনার ঐতিহ্যের ইতিহাস এই সব প্রাচীন নিদর্শনের মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অজন্তাগুহাবলীর চিত্রাবলীর অনুশীলন ও বিশ্লেষণ শুরু হল—তার অঙ্কনপদ্ধতি ও রেখারীতির পরিচয়ে প্রাচীন ভারতের চিত্রলেখার ভাষা অবনীন্দ্রনাথ আয়ত্ত করে নিলেন এবং সংকল্প করলেন যে, এই প্রাচীন ভাষাকে তিনি নূতন পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কলাসৃষ্টি থেকে তাঁর উদ্দেশ্যের অনুযায়ী নূতন উপাদান সংগ্রহ করতে আরম্ভ করলেন। পক্ষান্তরে চীন ও জাপানের চিত্রাবলী অনুশীলন করে তা থেকে ভারতের নবীন পদ্ধতির চিত্ররচনায় উপযোগী উপকরণ ও শক্তি সংগ্রহ করতে লাগলেন। তাঁর প্রবর্তিত নূতন ভারতীয় চিত্রের ভাষা প্রাচীন চিত্রের অনুকরণ বা পুনরাবর্তন নয়—প্রাচীন ঐতিহ্যকে স্বীকার করে, তাকে ভিত্তি করে নূতন পথে ভারতীয় চিত্রের জয়-যাত্রা।

এই নূতন পদ্ধতিতে চিত্রিত তাঁর প্রথম চিত্র "শাজাহানের শেষ জীবন" ১৯০৩ সালে লার্ট কার্জন সাহেবের দিল্লী দরবারের প্রদর্শনীতে দেখান হল—নানা কোলাহল ও গুঞ্জনের মধ্যে চিত্রখানি প্রথম পারিতোষিক লাভ করল।

তার পরে নবীন পদ্ধতিতে রচিত তাঁর কয়েকখানি চিত্র, "বজ্রমুকুট ও পদ্মাবতী", "মেঘদূত", "বুদ্ধ ও সুজাতা", "অভিসারিকা" ইত্যাদি ছোট ছোট চিত্র বিলাতের শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্যার মাসিকপত্র "স্টুডিয়ো"-র রঙীন্ প্রতিলিপিতে প্রকাশিত হল। এই প্রকাশের পর বিলাতের রসিক সমাজ ভারতের চিত্রচর্চার এই নব উদ্বোধনকে প্রীতির চক্ষে অভিনন্দিত করলেন। অনেকেই স্বীকার করলেন যে, ইউরোপের রীতির অনুকরণে নয়, বরং ভারতের কলাসাধনার ঐতিহ্যের পরিণতির পথেই ভারতের সংস্কৃতির মুক্তির পথ। ভারতের নিজস্ব সত্তাকে অনুসন্ধান করে উপলব্ধি করতে পারলেই ভারতের প্রাচীন সুপ্ত আধ্যাত্মিকতা নূতন যুগে, নূতন রূপে আত্মপ্রকাশ করবে এবং সেই পথেই জাতীয় আত্মা, জাতীয় ঐতিহ্য সার্থকতা লাভ করবে। জাতীয়তার নূতন

পুরোহিত অবনীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রমালার মধ্য দিয়ে এই কথাই প্রচার করতে ব্রতী হলেন। কিন্তু ভারতের প্রাচীন কলাসম্পদের ঐতিহ্য যাঁরা বিস্মৃত হয়েছিলেন, এইরূপ বহু গণ্যমান্য প্রবীণ ও বিচক্ষণ সাহিত্যিক বাংলাদেশে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পরচনাকে বিদ্রূপ ও নিন্দাবাদে তিরস্কৃত করেছিলেন এবং তাঁর রচিত অলৌকিক চিত্রমালার মধ্যে তাঁরা কোনও সৌন্দর্য, কোনও সৌকুমার্য, কোনও গাম্ভীর্য অনুসন্ধান করেও খুঁজে পাননি। কারণ প্রাচীন প্রভাবের অভ্যাসবশত ইতালির র‍্যাফাইল্‌ ও মাইকেল এঞ্জেলোর 'ঠুলি' তখনও তাঁদের চক্ষু আবৃত করেছিল—স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেশের চিত্রাবলীর সৌন্দর্য দেখবার উপযুক্ত রূপবুদ্ধি তখনও তাঁদের দৃষ্টিপথে ফুটে ওঠেনি। সুতরাং সুবিখ্যাত "সাহিত্য" পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় অবনীন্দ্রনাথের নূতন কল্পনায় রচিত চিত্রাবলীর উপর কটূক্তি ও গালি বর্ষণ করতে লাগলেন—মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অবিচ্ছিন্ন উৎকট নিন্দাবাদ ও তিরস্কার। আর দেশের সাহিত্যিক সমাজের সমালোচনা অবজ্ঞা করে নির্ভীকচিত্তে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রপদ্ধতিকে ধাপে ধাপে উন্নতির পথে পরিচালনা করলেন। তাঁর প্রধান সহায়ক ও উৎসাহদাতা ছিলেন কয়েকজন চিত্রবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ রূপরসিক সহৃদয় ইংরাজ সমালোচক, স্যর জন উড্রফ (তন্ত্রসারে সুপণ্ডিত), স্যর হার্বার্ট হোমুড, নরম্যান্ ব্লাণ্ট, এডওয়ার্ড থর্টন্ প্রমুখ কয়েকজন ভারতের কৃষ্টির বিশেষ সমঝদার ও ভক্ত। তাঁদের চেষ্টায় "প্রাচ্যকলার ভারতীয় পরিষদ" নামে একটি সংসদ গড়ে উঠল যার উদ্দেশ্য ছিল ভারত ও প্রাচ্যকলার গুণ গ্রহণ ও প্রচার। এই পরিষদের প্রদর্শনীতে বৎসরের পর বৎসর অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যদের চিত্রমালা সাদরে ও সাড়ম্বরে প্রদর্শিত হত এবং দেশবিদেশের রূপরসিক তার গুণগ্রহণ করে যথেষ্ট অর্থসাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁদের প্রদত্ত বৃত্তি লাভ করে শ্রীনন্দলাল বসু ভারতের প্রাচীন মন্দিরাদি ও শিল্পকীর্তির নিদর্শন অনুশীলন করবার সুযোগ পেলেন। তাঁদের উৎসাহে ভারতের এই নবীন চিত্রকলার আন্দোলন সারা ভারতে প্রচারিত হল, এবং ভারতের নানাস্থান থেকে নূতন নূতন শিষ্য এসে শিল্পগুরুর পাদদেশে বসে ভারতীয় জাতীয় কলাবিদ্যার মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। লাহোর থেকে এলেন রূপকিষণ; মহীশূর থেকে এলেন বেঙ্কটপ্পা; লাখনৌ থেকে এলেন হাকিম সাহেব, আর সমীউল্ল-জমা। নানা বিভিন্ন শিল্পীর কলমের মুখে ভারতীয় চিত্রপদ্ধতির মূলরীতি অক্ষুণ্ণ রেখে,

নানা বিভিন্ন রূপে তার ব্যাখ্যা শুরু হল। এই সব নবীন সাধকের বিচিত্র প্রকাশে নবীন ভারতের চিত্রসাধনা বিচিত্র সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। এর বহু পূর্বে নন্দলাল বসু, ৺সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, ও অসিতকুমার হালদার এই নূতন আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। এই শিল্পীগোষ্ঠীর উদ্দীপনায় সাধনায় ভারতের ইতিপূর্বে বিস্মৃত শিল্পপদ্ধতির ঐতিহ্য নূতন প্রাণ পেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে, ইউরোপের শ্রেষ্ঠকলাকেন্দ্র পারী-নগরী থেকে এল নিমন্ত্রণের ডাক। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর সুযোগ্য শিষ্যদের শ্রেষ্ঠ চিত্রমালা চয়ন করে পাঠানো হল পারীতে প্রদর্শনীর জন্য। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট করলেন এই ভারতীয় প্রদর্শনীর দ্বার-উদ্‌ঘাটন। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ রূপরসিক ও সমালোচকরা এলেন এই নূতন পদ্ধতির ভারতীয় চিত্রের মূল্য বিচার করতে। পারীনগরের কলাবিষয়ক সাময়িক পত্রগুলি, L' Art Decoratif, L' Illustration, Ars et Decorations, Gazette De Beaux Arts ইত্যাদি সমালোচকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাযুক্ত সুষ্ঠু সমালোচনায় পরিপূর্ণ ও মুখরিত হয়ে উঠল। সারা ইউরোপে তার ধ্বনি প্রতিধ্বনি জেগে উঠল। রয়টারের পারীনগরের প্রতিনিধি কলকাতার দৈনিক পত্রে তার করে জানালেন তার সংবাদ—সংবাদপত্রের শিরোনামায় বড় বড় অক্ষরে ছাপা হল—EXHIBITION OF INDIAN PAINTINGS IN PARIS—THE TRIUMPH OF ABANINDRA-NATH !!!

এই ব্যাপার কেবল অবনীন্দ্রনাথের বিজয়কীর্তি নয়, সারা বাংলা, সারা ভারতের বিজয়কীর্তি—ভারতের শিল্পসাধনা ও সংস্কৃতির বিজয়-ঘোষণা, ভারতের স্বকীয় সত্তার প্রকাশ ও জয়-কীর্তি। ফ্রান্সের কোন কোন সমালোচক এই নূতন শৈলীর চিত্ররচনার নামে দিয়েছিলেন—"L'ECOLE DU CALCUTTA"—কারণ কলকাতাই ছিল এর জন্মস্থান, কলকাতা-ই এর প্রাণ-কেন্দ্র।

কলকাতার শহরবাসী গর্ব করতে পারেন এই ভেবে যে, এই নূতন রীতির শিল্পকলার উদ্বোধন হয়েছিল এই শহরে এবং শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের অধিনায়কত্বে এই কলাসাধনার বাণী ভারতের নানা প্রদেশে বিস্তৃত হয়েছিল। তাঁর শিষ্যবর্গ একে একে শিক্ষা সমাপ্ত করে ভারতের নানা শহরে সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদে আসীন হলেন—গুরুপ্রদত্ত বাণী প্রচারের ও শিক্ষা দেবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে। লাহোরে প্রতিষ্ঠিত হলেন শ্রীসমরেন্দ্রনাথ

গুপ্ত, লখনৌ স্কুলে গেলেন শ্রীঅসিতকুমার হালদার, মাদ্রাজে গেলেন শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী এবং শান্তিনিকেতনে গেলেন শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু। এইসব বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদ পূর্বে ছিল ইংরাজ শিক্ষকদের জন্ত সংরক্ষিত একচেটিয়া পদ। অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যরা এইসব আসন দখল করলেন শিল্পগুরুর দূত ও প্রতিনিধির ভূমিকায়। সারা ভারতে ভারতের জাতীয় কলারীতির চর্চা ও সাধনা শুরু হল। ভারতের জাতীয় কলাবিদ্যা নূতন আত্মচেতনা লাভ করে তার স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হল। দেশের কথা, দেশের কাহিনী, দেশীয় ভাষায় লিখিত হয়ে দেশবাসীদের অন্তরে নূতন শিহরণ জাগিয়ে দিল। দেশের লোক প্রাচীন ভারতের মূর্ত্ত বিস্মৃত রূপবিদ্যার ভাষা অনায়াসে শিখে নেবার সুযোগ পেল। দেশের নানাস্থানের নানা সংস্কৃতি ও ভাবধারা ভারতীয় কলাবিদ্যার এক লিপিতে গ্রথিত হয়ে সুমধুর ঐক্য লাভ করে ধন্ত হ'ল। ইতিমধ্যে দেশে "স্বদেশীয়তার" আন্দোলন শুরু হয়েছে—জাতীয়তার অগ্রদূত জাতীয়তার পুরোহিত তার শিল্পকলার সাধনমন্ত্র নিয়ে স্বদেশী আন্দোলনে সর্বান্তঃকরণে যোগ দিলেন। তার অলৌকিক তুলিকার স্পর্শে "ভারত-মাতার" চারুস্বরূপ—রেখা, বর্ণ ও রসে সমুজ্জল হয়ে ফুটে উঠল।

ইতিমধ্যে বিলাতের নানা পুস্তক-প্রকাশক অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যদের উপর কয়েকটি পুস্তকের চিত্রসজ্জার ভার দিলেন—তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য—Myths of the Hindus and Buddhists. Buddha and Gospel of Buddhism (১৯১৬) এবং Studio প্রকাশকদের দ্বারা অবনীন্দ্রনাথের লিখিত উৎকৃষ্ট চিত্রমালায় সুসজ্জিত "ওমর খায়ামের কবিতা" (১৯১৮)। এই বইগুলির অনেকগুলি চিত্র অবনীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রচনার অন্তর্গত।

১৯২১ সালে স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে কলকাতার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভারতের কলাশিল্পের অধ্যাপনার জন্ত "বাগীশ্বরী আচার্যের" আসন সৃষ্ট হল আর এই আসন অলঙ্কৃত করলেন আচার্য অবনীন্দ্রনাথ। এই আসনে বসে তিনি ৩২টি সারগর্ভ ও গবেষণামূলক বক্তৃতা দিয়ে ভারত-শিল্পের মর্ম উদ্‌ঘাটন করলেন। "বাগীশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী" নামে সেগুলি প্রকাশিত হয়েছে এবং বর্তমান লেখক কর্তৃক তার ইংরাজী অনুবাদ এখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসে যন্ত্রস্থ।

এই প্রবন্ধাবলীতে আচার্যের অদ্ভুত পাণ্ডিত্য ও বিশ্লেষণী দৃষ্টির মারফত ভারত-শিল্পের তত্ত্বাংশের অনেক গুহ্য কথা সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অবনীন্দ্রনাথকে "ডি-লিট" উপাধি দিয়ে ভূষিত করলেন। যিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে কলেজে প্রবেশলাভের সুযোগ পাননি—বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর শ্রেষ্ঠ উপাধি তাঁকে দান করে নিজেকে সম্মানিত করলেন। তারপর উপর্যুপরি ইউরোপের নানা শহরে, বার্লিনে, মিউনিকে, হামবার্গে, ব্রাসল্‌স্‌-এ অবনীন্দ্রনাথের অনেকগুলি চিত্র-প্রদর্শনী হয়েছে এবং ঐসব প্রদর্শনীতে তাঁর চিত্রাবলী অজস্র প্রশংসা ও স্তুতি অর্জন করেছে। এই সব প্রদর্শনীর মারফত তাঁর শিল্প-প্রতিভা ও সাধনা ইউরোপের কলারসিকদের চিত্তে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পুনঃপুন তাঁরা স্বীকার করেছেন যে, অবনীন্দ্রনাথ বিশ্বের দরবারে পরিচিত একজন শ্রেষ্ঠ কলাবিদ ও চিত্তজয়ী চিত্রকর। তাঁর চিত্রমালার সুমিষ্ট কিরণ সারা বিশ্ব আলোকিত করেছে।

আশা করা যায়, কলকাতার পুরবাসী এই জাতীয়তার পুরোহিত ভারত-শিল্পের অদ্বিতীয় ব্যাখ্যাকার ও সাধক, পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ কলাবিদ ও রূপ-ঋষির যথাযোগ্য স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করে ভারতীয় সংস্কৃতির সম্মান রক্ষা করবেন।

কচ ও দেবযানী

পরিচয়-এর কুড়ি বছর

হিরণকুমার সান্যাল

চার

মরণমুখী মনোবৃত্তির নিরেট দেওয়ালে মাথা ঠুকে সুধীন দত্ত যখন সন্ধান করছিলেন আধুনিক কাব্যের মুক্তির পথ, তখনও বাংলাদেশের প্রগতিশীল কবিরা তন্ময় ছিলেন বিগত যুগের বিদেশী রোম্যান্টিক কাব্যের তলানির নেশায়। এই তলানিতেও অবশ্য যথেষ্ট রস ছিল, আর বেশ ঝাঁঝালোভাবেই তা ফুটেছিল পরিচয়-এর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' নামের কবিতায় :

আজ মাঝরাতে ঠাণ্ডা বাতাস ছুটবে যখন,
ঘুম ফেলে দিয়ে তুমি চলে এসো এখানে ; কেমন ?
মুখোমুখি বসে কবিতা পড়ব আমরা দু'জন।

ভিক্টোরীয় যুগের ইংরেজ কবি ড্যান্টে গেব্রিয়েল রসেটির 'ট্রয় টাউন' থেকে উপকরণ ও 'সকল কালের সব পুরুষের' সম্মিলিত বাসনা থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করে বুদ্ধদেব বসু এর পর লিখেছিলেন শাশ্বত নারী হেলেনের বুকের সোনার বাটির কথা—একেবারে কামিনীকাঞ্চনযোগ :

উতল বাতাস, মাতাল বাতাস, রাতের বাতাস,
বাতাসের ভাষা শুনবে পাতারা শুনবে আকাশ ;
পুরোনো প্রেমের কবিতা পড়বো আমরা দু'জন।

('আমার বুকের ছাঁচে গড়া এই সোনার বাটি
বাসনার রসে আনিয়াছি ভরে সব পুরুষের।'
—গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'লো ট্রয়।)

তারপর :

বই থেকে চোখ তুলে মাঝে-মাঝে তাকাবো তোমার
আলো-ছায়া ভরা চুলে আর চোখে—চোখের তারায়
গভীর কালোয় ; তুমি মুখ তুলে হাসবে—কেমন ?

('ভাখো মোর বুকে দু'টি পাকা ফল ভরেছে রসে—
বাসনার রসে সকল কালের সব পুরুষের।'
—পুড়ে খাক হলো ট্রয়।)

পূবের সবুজে সাদা হ'য়ে ফোটে ভোরের আকাশ,
রাতের, দিনের মাঝখানে এসে ঝিমায় বাতাস।
বই শেষ করে' চুপচাপ বসে' আমরা দু'জন।

(কোথায় ভিনাস। কোথায় বা সেই বুকের বাটি!
বিশাল বাসনা বুকে জ্বলে তবু সব পুরুষের—
পোড়ে লাখো-লাখো ট্রয়!)

লাখো লাখো ট্রয়ের দহনজ্বালার উত্তাপে একদিন বাংলাদেশের লেখকের দল সৃষ্টি করেছিল কল্লোল-এর যুগের সাহিত্য। সেই উত্তাপের খানিকটা আঁচ পাওয়া যায় এই কবিতাটিতে।

রবীন্দ্রনাথকে টেক্কা দিয়ে কল্লোল-এর লেখকগোষ্ঠী চেয়েছিলেন উত্তর-রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা করতে—রবীন্দ্রনাথ যাকে ঠাট্টা করতেন 'গুস্তোর রবীন্দ্র' সাহিত্য ব'লে। কিন্তু রোম্যান্টিসিজম্-এর ঘেরাটোপের মধ্যে যাঁদের আজন্ম বাস ও বিহার—রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে কত দূর আর তাঁরা যাবেন?

ঐ যুগেরই আর-একজন কবি, অন্নদাশঙ্কর রায়, পরিচয়-এর প্রথম সংখ্যায় ছাপা 'সমাপ্তি' কবিতায় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছেন রবীন্দ্রনাথের কাছে:

আমাদের প্রেমে ফুরালো কথার পালা,
মন জানাজানি কিছু না রহিলো বাকী।
বাসনার দীপে নিবিলো নিবিড় জ্বালা,
বাসর-শয়নে নীরবে নমিলো আঁখি।

এবার প্রেমেরে সহজ করিয়া আনা,
অনল হইতে আলোক ছানিয়া তোলা।
এবার প্রেমেরে মনের আড়ালে মানা,
চির চেতনারে চির বেদনারে ভোলা।
আসে ক্লান্তির মৌন গভীর শান্তি,
এতখনে হলো উদ্দামতার ক্ষান্তি।

কল্লোল-এর যুগের সমাপ্তি এই মৌন গভীর শান্তিতে। কিন্তু ঐ যুগের অর্বাচীনতম কবি বিষ্ণু দে এই শান্তিকে উপেক্ষা করে লিখেছিলেন :

দোলরাত্রি নহে. নহে কোজাগরী যামিনী জাগর,
খরসূর্য চক্ষে মোর, রসহীন শাণিত বাতাস
পেশীরূঢ় বাহু দিয়া ভেদি চলে পর্বতের পর।

[অর্ধনারীশ্বর, পরিচয়, প্রথম সংখ্যা

এর পর বজ্রপাণির কঠিন প্রহরণে ট্রয় নয়—তরুণ বাংলার কাব্যকুঞ্জ চুরমার ...ই স্বাভাবিক :

সুগঠিত প্রেম কামনাবিলাস, উপবনপূর্ণিমা
দূর করি দিলে ঘোর ঝঞ্ঝায় চূর্ণ চূর্ণ করি
যে ভুবনে মোরে নিয়ে এলে—কোথা নারীদেহরঙ্গিমা ?
তোমারে আমার বন্ধু করিয়া কি লাভ, বজ্রপাণি ?

[বজ্রপাণি, বিষ্ণু দে, পরিচয়, প্রথম সংখ্যা

ভাবগঙ্গার জলতরঙ্গে শোনা গেল আগামী যুগের বজ্রনির্ঘোষের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি—বাংলা কাব্যে নতুন এক সুরের সামান্য একটু আমেজ।

বাংলা সাহিত্যে নতুন যুগ সৃষ্টির দাবি পরিচয় কোনোদিন করেনি। তার প্রধান লক্ষ্য ছিল এই ভাবগঙ্গার প্রশস্ত বাহন হওয়া। এই উদ্দেশ্য পালনের জন্যে যে পরিচালকবর্গ আয়োজনের ত্রুটি করেন নি তার প্রমাণ প্রথম সংখ্যার সূচীপত্র (পরের পাতায় প্রতিলিপি মুদ্রিত হ'ল) :

মোটা এ্যান্টিক কাগজে ছাপা রয়্যাল সাইজের ১৫৪ পাতা পত্রিকা ত্রৈমাসিক হলেও আকারে যথেষ্ট প্রশস্ত এ-কথা স্বীকার করতে হবে। এর মধ্যে প্রথম ১১৩ পাতা প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প. ছাপা হয়েছিল পাইকা টাইপে। বাকি ৪১ পাতার মধ্যে 'পাঠকগোষ্ঠী' বিভাগের ৫ পাতা বীরবলের পত্র বাদে বাকি ৩৬ পাতা স্মল পাইকায় ছাপা 'পুস্তক পরিচয়'।

পরিচয় যে একেবারে প্রথম থেকে বিশিষ্ট পত্রিকা বলে খ্যাতির পেয়েছিল তা প্রধানত এই 'পুস্তক পরিচয়' বিভাগের জন্যে। এর আগে বাংলা দেশের কোনো পত্রিকা সমালোচনা-সাহিত্যকে এতটা সম্মানের আসন দেয়নি।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনী-লেখক এডওয়ার্ড টম্সন্-এর উক্তি। কথায় কথায় একদিন তাঁর মুখে শুনেছিলাম যে বাংলা সাহিত্যে দুটি জিনিসের অভাব : নাটক ও সমালোচনা। এই প্রসঙ্গটি বিস্তার করে টম্সন্

ত্রৈমাসিক
পত্রিকা

প্রতি সংখ্যা
১৲
বার্ষিক
৪৷৹

প্রথম বর্ষ, ১ম সংখ্যা
শ্রাবণ, ১৩৩৮

বিষয় সূচী

সম্পাদক—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

পরিচয়-এর প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদপটের প্রতিলিপি

বলেছিলেন যে মতভেদ সত্ত্বেও ইংরেজি সাহিত্যের নামজাদা লেখকদের আপেক্ষিক মূল্য সম্বন্ধে ইংরেজ পাঠকদের মনে একটা ধারণা আছে, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে কোনো স্ট্যাণ্ডার্ডই নেই।

আমি প্রায় ত্রিশ বছর আগেকার কথা বলছি। পরিচয়-এর আবির্ভাব হয় এর প্রায় দশ বছর পরে। এই দশ বছরের মধ্যে বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য বিশের কিছু এগোয় নি। লোকের মুখে মুখে, সাহিত্যিকদের আড্ডায়, অধ্যাপক-ছাত্রদের আলাপ-আলোচনায় সাহিত্যবিচার হ'ত অত্যন্ত এলোমেলোভাবে। এর কারণ ছিল খানিকটা বাঙালীর মনের স্বাভাবিক জড়তা আর অনেকটা সুযোগের অভাব। এই অভাব মোচন করল পরিচয়। মনের ও কলমের জড়তা কাটিয়ে একদল মননশীল লেখক পরিচয়-এর পাতায় সাহসের সঙ্গে প্রবৃত্ত হলেন সম-সাময়িক সাহিত্যের মূল্যনিরূপণে।

[ক্রমশ

আসন্নসম্ভবা

নবতেজ
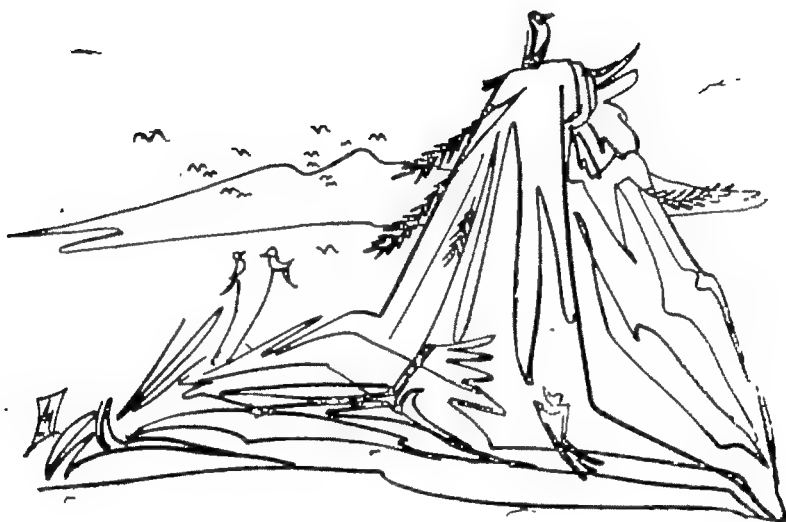
ফসলের মাস বৈশাখ, পুরো দশটি দিন বয়স হয়েছে তার। দিন-কে-দিন এগিয়ে চলেছে গম-কাটার কাজ। বিশাল প্রান্তর জুড়ে সোনালি গমের শিষ সমুদ্রের মতো দুদিন আগেও দুলেছে বাতাসে। আজ এখানে-সেখানে তার মাথা মুড়ানো। খণ্ড-তন্ত্র দ্বীপের মতো নেড়া মাঠের মাঝখানে জমে উঠেছে গুচ্ছ গুচ্ছ গমের পাহাড়।

মৃদু হাওয়ায় টানে গ্রীন ফুলের সৌরভ-মেশানো আম্র-মুকুলের গন্ধ ভেসে এল আমার ঘরে। ঘরের জানালা বেয়ে ব্যুগানভিলার খিলান উঠেছে, সেদিকে তাকাতেই এই উত্তান-শোভার অসংখ্য কপোল লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল, দেখলাম তার দেহে নব-জীবনের মুকুলিত সম্ভাবনা।

আমার স্ত্রী এসে ঘরে ঢুকল। কোকিলের প্রথম কুহুতানে আর আম্র-মুকুলের সৌরভে মুখে তার স্পষ্ট উত্তেজনার ছাপ। যে নতুন জীবন ভূমিষ্ঠ হবার জন্যে তার জঠরে আকুলিবিকুলি করছে, তারই কথা বলতে শুরু করে সে, "কী তুমি সবচেয়ে পছন্দ করবে বল তো?—ছেলে না মেয়ে! আমরা যদি তার নাম রাখি কাকু? নামটা পছন্দ হয় তোমার?" একটা ছোট বালিসের ওয়াড়ে সুতোর কাজ তুলছিল সে। প্রশ্ন করল, "এই পাঁপড়িগুলো কী রঙে তুলব বল তো?"

সম্পূর্ণ এক নতুন সৌরভ স্ত্রীর মধ্যে আবিষ্কার করি। সম্ভবত প্রত্যেকটি নতুন সৃষ্টিরই আছে এক নিজস্ব সৌরভ—পাক-ধরার আগে গমের শিষের সৌরভের মতো নারী-দেহের সৌরভও সৃষ্টির আবেগে কম্পমান।

কিন্তু সৃজনের এই সৌরভ যত দ্রুত উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল আমার কল্পনাকে তেমনই দ্রুত আবার মরণের ছায়ায় তা আচ্ছন্ন হয়ে উঠল। খবরের কাগজ এসেছে। তার অলক্ষুণে শিরোনামা শেলের মতো বুকে বিঁধে আমার শ্বাস-রোধ করে দিল: "কোচবিহারে ভুখ-মিছিলের উপর গুলিবর্ষণ—চাউলের দর সত্তর টাকায় উঠিয়াছে—কন্ট্রোল-দরে চাউলের দাবিতে জনসমাবেশ, জবাবে বুলেট।"

আরো একটা খবর: জালিয়ানওয়ালাবাগে জাঁকালো স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ-কল্পে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। আজকের ও'ডায়াররা জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতিবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছে কোচবিহারে একটি সাত বছরের শিশু, পনের ও ষোল বছরের দুটি কিশোরী, পনের বছর বয়সের একটি কিশোর ও কুড়ির কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে বয়স এমন দুজন যুবককে গুলি করে।

একটু আগেই যে ব্যুগানভিলা ফুলগুলো আমার স্ত্রীর গোপন কথা আড়ি পেতে শুনে হেলে দুলে হেসেছিল, এই ভয়ংকর সংবাদ শুনে সেগুলো কুঁকড়ে কালো হয়ে উঠেছে। আমার স্ত্রী তার সুঁচের কাজ ফেলে দিয়ে আমার গা

ঘেঁসে গায়ের ওপর মাথা এলিয়ে দিল। বারুদের কটুগন্ধ একমুহূর্তে আম্র-মুকুলের সৌরভকে ম্লান করে দিল; সোনালি মঞ্জরী কলঙ্কিত হয়ে উঠল ক্ষুধিত শিশুর রক্তে আর তাদের করুণ আর্তনাদে স্তব্ধ হয়ে গেল কোকিলের কুহুতান।

সুরেশ তালুকদার, তোমার জীবনে মাত্র সাতটি ক্ষুধাক্লিষ্ট পৌষ পার হতে দেখেছ তুমি। খেলনা আর হুটোপাটি খেলাধুলো—সুখের সমস্ত সম্পদ বড় তাড়াতাড়ি কেড়ে নেওয়া হল তোমার কাছ থেকে। চাল দাবি করতে তোমার শহরের এক রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিলে তুমি বড়দের সঙ্গে। আর ওরা বুলেটে বিদ্ধ করল তোমার বুক। তোমার কচি মাথার নীচে আহা কি নরম বালিস এই রাস্তা, যার ইস্পাত-ধূসর আচ্ছাদনে আজ আলপনা আঁকা হয়েছে তোমার খেলার সাথীদের রক্ত দিয়ে।

কবিতা বসু, তোমাকে আমি দেখিনি কখনো। আমার সবচেয়ে ছোট বোন অঞ্জুর বয়সী তুমি। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, তোমার থোলো থোলো চুলগুলো অঞ্জুর চুলের মতোই লম্বা আর তারই মতো কাজল-টানা তোমার বড় বড় চোখ দুটো। এই তো ক'বছর আগে অঞ্জুর মতো তুমি তোমার পুতুল-মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলে বান্ধবীর পুতুল-ছেলের সঙ্গে। আর গত তিন মাস ধরে বিয়ের কথাটি উচ্চারণ করলেই লজ্জায় তোমার কপোল আরক্ত হয়ে উঠেছে। কবিতা, তোমার খিদে পেয়েছিল, তাই মার কাছে কিছু খেতে চেয়েছিলে তুমি, যেমন করে অঞ্জু খেতে চায় আমাদের মায়ের কাছে। আর মার চোখ দিয়ে অশ্রুর ধারা নেমেছিল। রাস্তায় কারা যেন আওয়াজ তুলছিল "খাদ্য দাও, নইলে গদি ছাড়।" সেই আওয়াজ শুনে তুমি আর তোমার মা জনতার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলে। কিন্তু তোমরা খাদ্য পেলে না, পেলে গুলি। আমার বোনের মতো তোমার লম্বা ঘন চুল, মুহূর্তে রক্তের ধারায় ভিজে উঠল। কিন্তু তোমার জীবনের স্ফুলিঙ্গ তখনও একেবারে নিভে যায় নি, তাই বেয়নেটের খোঁচায় খোঁচায় নিভিয়ে দিল তারা। কবিতা, যে বেয়নেট তোমার নরম দেহ বিদ্ধ করল, আমি দেখতে পাচ্ছি তা উদ্যত হয়ে উঠেছে আমার বোনের দিকে, প্রত্যেকের বোনের দিকে। আমরা সকলে যদি এক না হই, যদি না চেপে ধরি অত্যাচারীর হাত, তাহলে ক্ষুধা এসে একদিন ছিনিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের বোনেদের, পুতুলের বিয়ের আনন্দময় পরিবেশ থেকে উপড়ে নিয়ে ফেলবে তাদের শক্ত পাথরে-বাঁধা রাস্তার ওপর। আর আমাদের বোনেদের

বিয়ের চিন্তায় উদ্বিগ্ন মায়েরা দেখবে তাদের মেয়েদের লম্বা কালো চুল রক্তে ভিজে উঠেছে।

ষোড়শী কন্যা বন্দনা তালুকদার, সবে শুরু হয়েছিল তোমার যৌবন। জীবনের মধুরতম মুহূর্তগুলো আর অল্প দিনের মধ্যেই এসে পড়ত তোমার মুঠির ভিতর। কিন্তু তারা গুলি চালাল সেই মহান মুহূর্তগুলোর ওপর, রবীন্দ্রনাথ রাখিবন্ধনের যে আবেগময় গান গেয়েছেন—গুলি চালাল তার ওপর, গুলি চালাল দয়িত-দয়িতার মিলন-বাসরে, তাদের প্রেমবিহ্বল চাহনির ওপর।

সতীশ দেবনাথ, এগিয়ে আসছিল তোমার ষোড়শ জন্মতিথি। তোমার জমিদার এতদিন তোমাকে ক্ষুধার অর্ঘ্য দিতেই অভ্যস্ত ছিল, আজ তার সঙ্গে যুক্ত করেছে একটি বুলেট। এই বুলেট এবং ঐ ক্ষুধা দুই-ই আমেরিকায় তৈরি; সেখান থেকে গমও পাঠাবার কথা চলছে, কিন্তু বর্তমানে ক্ষুধা এবং বুলেটই ত্বরান্বিত করার দরকার ছিল।

বাদল বিশ্বাস আর কনক কাঞ্জিলাল, সব কিছুই বোঝার বয়স হয়েছিল তোমাদের, ভালো করেই তোমরা চিনতে তোমাদের খুনীদের। তারা তোমাদের রাত্রির অন্ধকারে অথবা নির্জন জঙ্গলে সংগোপনে হত্যা করেনি। হত্যা করেছে প্রকাশ্য দিবালোকে, তোমাদের শহরের জনাকীর্ণ রাস্তার ওপর, খবরের কাগজের ফোটোগ্রাফার ও রিপোর্টারদের চোখের সামনে। অপরাধ করে তাদের কোন অনুতাপ হয়নি, সাধারণ খুনীর মতো খুন করে পালিয়েও যায়নি তারা। তারা আশা করেছিল, দেশের সর্বোচ্চ পার্লামেন্টে তাদের সাফল্যের প্রশংসাসূচক উল্লেখ হবে। সেখানে তোমাদের দু'জনকে হত্যার কাহিনী শুধুমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু ফলাও করে বলা হয়েছে পুলিশ ও আমলাদের আঘাতের কথা। বলা হয়েছে যে, তোমরা নাকি ধ্বংসমূলক ধ্বনি দিয়েছিলে, যেমন "খাদ্য দাও নইলে গদি ছাড়", তোমরা তোমাদের দেশের সবচেয়ে যে বড় গৌরব সেই আমেরিকার এবং কোরিয়ার অসম্মান করছিলে, তোমরা চিৎকার করে বলেছিলে চীন ও রুশ যে খাদ্য দিতে চেয়েছে তা অবিলম্বে আমদানি করা হোক, এবং সেই ঘন কালো চুলওয়ালা মেয়ে কবিতা আর সাত বছর বয়সের সুরেশ সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে হিংস্রভাবে আক্রমণ করেছিল। তাই তারা শান্তিরক্ষার জন্য, সিংহাসন অটুট রাখার জন্য—শ্রেষ্ঠ বন্ধু, যে গম দিক আর না দিক, অন্তত বন্ধুত্বের রিক্ত হস্ত প্রসারিত করেছে, তার রক্ষার জন্য তোমাদের বুলেটে বিদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছে।

আর খাদ্যমন্ত্রীও তোমাদের গোটা ব্যাপারটাই ভুলে যেতে চান। মার্কিন দূতাবাসে এক খানাপিনার আসরে যাওয়ার তাড়া আছে যে তাঁর! সেখানে তাঁকে পরিকল্পনা করতে হবে কিভাবে সোমনাথ লিকম পুনর্গঠনের জন্তে আজকের গজনীদের কাছ থেকে চাঁদার তহবিল তোলা যায়। রাত্রে তিনি ব্যস্ত থাকবেন নভেল লিখতে, লিখবেন তাতে আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা—কেননা দরের লেখক তো নন তিনি!

কিন্তু হে আমার বীর শহীদগণ, আমাদের দেশ বলতে তো কেবল ঐ দুজন অদ্ভুত লেখককেই বোঝায় না যারা আজ আর কালিতে কলম ডুবিয়ে লেখে না, লেখে রক্তে বন্দুক ডুবিয়ে। তারা ছাড়াও দেশে আছে মহান জনগণ, আছে মনুষ্যত্ব-বোধসম্পন্ন লেখক, মা ও বোন, বাবা ও ভাই, প্রেমিক ও দয়িতা। দেশের মাঠ থেকে, কারখানা থেকে, নতুন মায়ের মধুর অঙ্ক থেকে, কোকিল-ডাকা আম্রশাখার নবীন মঞ্জরী থেকে বিচ্ছুরিত হয় সৃজনের সৌরভ।

আমরা, তোমাদের প্রিয় সন্তানেরা, আলিঙ্গন করি তোমাদের অমূল্য দেহ। আমরা ভুলব না তোমাদের স্মৃতি। তোমাদের দেশের গোটা সৃষ্টিকেই গিলে খাবার জন্তে যারা বছরের পর বছর ধরে সমস্ত রকমের "পঞ্চপালের ঝাড়" সযত্নে পুষছে, আমরা চিৎকার করে ঘোষণা করব তাদের অন্যায় অপরাধ। তাদের খুনী হাতে যে তোমাদেরই রক্তের চিহ্ন, তা আমরা প্রকাশ করে দেব।

আমরা প্রতিজ্ঞা করছি, ক্ষমা করব না তাদের। আর কখনও সুযোগ দেব না আমরা তাদের অভিশপ্ত বাংলোর বাগানে জন্মানো গমের গুচ্ছের ছবি দেখিয়ে আমাদের প্রবঞ্চিত করতে। তোমাদের জন্তে আমাদের যে শোক, তাকে তারা মার্কিন দূতাবাসের উন্মত্ত ভোজসভা থেকে বিদ্রূপ করবে—এ আমরা হতে দেব না। গমের প্রতিশ্রুতি আর চোখ-রাঙানির জন্তে দেশের স্বাধীনতাকে বন্ধক রাখতেও কিছুতেই আর দেব না তাদের। কোরিয়ার জল্লাদরা তাদের পচা গমের বিনিময়ে আমাদের খনিজ সম্পদ নিয়ে গিয়ে তা দিয়ে এটম বোমা তৈরি করবে—তাও আর হতে দেব না।

সুরেশ, কবিতা ও বন্দনা, সতীশ, বাদল আর মহাবীর, এই অমর পথের উপর তোমাদের শহীদ-রক্ত জলজল করবে ততদিন, যতদিন না তার থেকে সকলের জন্তে প্রাচুর্য, স্বাধীনতা আর শান্তি প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। ততদিন

সতর্ক প্রহরীর মতো আমরা পাহারা দেব এই রাস্তা যেখানে শেষবারের মতো পদক্ষেপ করেছ তোমরা। তোমাদের স্মৃতির প্রতি অর্ঘ্য দেব আমরা আর ক্ষান্ত হব না ততদিন যতদিন না স্তব্ধ করে দিতে পারি সর্বশেষ অত্যাচারী সেই হাতগুলোকে যা তোমাদের নিস্তেজ দেহের উপরও বেয়নেট চালাতে সাহস করেছিল।

অনুবাদ : সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য

[বর্তমান প্রগতিশীল পাঞ্জাবী লেখকদের মধ্যে নবতেজ অগ্রণী। বয়সে তরুণ হলেও নবতেজ এর মধ্যেই পাঞ্জাবী সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। বর্তমানে তিনি প্রগতিশীল পাঞ্জাবী পত্রিকা "প্রীত্‌লারি"-র সহযোগী সম্পাদক। এ ছাড়া তিনি ছোটদের একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তাঁর লেখা ইতিমধ্যেই ইংরেজি, হিন্দী, উর্দু ও রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে।]

এই রচনার ছবিগুলি এঁকেছেন দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

সিবীর-এর উদ্দেশে

পুশ্‌কিন

[ইংরেজি ভাষায় মারফতে আমরা যাহাকে সাইবেরিয়া বলিয়া জানি তাহার রুশ নাম—সিবীর। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে বিপ্লবী অভ্যুত্থান হয় তাহার ব্যর্থতায় নেতৃবৃন্দ নির্বাসিত হন এই অঞ্চলে। পুশ্‌কিনের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। কিন্তু তিনি নির্বাসনদণ্ড হইতে পরিত্রাণ পান প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে। কবিতাটি লিখিয়া পুশ্‌কিন তাঁহার নির্বাসিত বিপ্লবী বন্ধুদের নিকট গোপনে পাঠাইয়া দেন। উত্তরে বিপ্লবী-কবি আর্দোয়েভ্‌স্কি যে কবিতাটি পাঠান তাহাতে ছিল একটি লাইন—"এই স্ফুলিঙ্গ জ্বালাবে আগুন।" বহুকাল পরে, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে যখন রুশ বোলশেভিকদের প্রথম মুখপত্র "স্ফুলিঙ্গ" প্রকাশিত হয় লেনিনের সম্পাদনায়, তখন তিনি ইহার প্রতি সংখ্যায় এই লাইনটিকে মুদ্রণের জন্য গ্রহণ করেন।

অনুবাদে মূলের ছন্দ ও ধ্বনি অনুসরণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু মূলের মিল-পদ্ধতি অনুবাদে সম্পূর্ণ বজায় রাখা সম্ভব হয় নাই। —অনুবাদক]

সিবীর-এর খনির গভীরে
পূর্ণ রেখো শান্ত অহংকার,
নয় বৃথা ক্লান্ত পরিশ্রম,
বৃথা নয় চিন্তা উচ্চাশার।

অভাগ্যের সহোদরা, আশা,
আলো করি ভূগর্ভ-আঁধার
জাগাইবে সাহসের সুখ;
আসিবেই দিন কামনার।

আমাদের প্রীতি ভালোবাসা
পৌঁছাইবে রুদ্ধ তালা ভেদি',
গহ্বরের তমিস্রারে ভেদি'
খুঁজে নেবে মোর মুক্তভাষা।

শৃংখলের তার নত আর
প্রাকার বিচূর্ণ হবে—মুক্তি
জানাইবে যারে স্বাগতোক্তি,
তাই দেবে ফিরে তলোয়ার।

অনুবাদ : নীরেন্দ্রনাথ রায়

আর যেন না দেখি

শামসুর রাহ্‌মান

আর যেন না দেখি কার্তিকের চাঁদ কিংবা
পৃথিবীর কোনো হীরার সকাল,
কোনোদিন আর যেন আমার চোখের কিনারে
আকাশের প্রতিভা, সন্ধ্যানদীর অভিমান আর
রাত্রিরহস্যের গাঢ় ভাষা কেঁপে না ওঠে,
কেঁপে না ওঠে পৃথিবীর দীপ্তিমান দিগন্তের তারা।
আগুনতাতা সাঁড়াশি দিয়ে তোমরা উপড়ে ফেলো আমার দুটি চোখ—
সেই দুটি চোখ, যাদের প্রাজ্ঞ দীপ্তির মৃত্যুহীন, বিদ্রোহী জ্বালায়
দেখেছি নির্মম আকাশের নীচে মানবিক মৃত্যুর তুহিন-স্তব্ধতা,
দেখেছি বাস্তহারা কুমারীর চোখের বাষ্পকণার মতো কুয়াশা-ঢাকা দিন,
দেখেছি মোহাম্মদ, যীশু আর বুদ্ধের-বিদীর্ণ হৃদয়, তাঁদের রক্ত
ঝরে ঝরে পড়ছে শাদা শাদা অসংখ্য দাঁতের কুটিল হিংস্রতায়।
আর যেন না দেখি প্রিয়ার স্বপ্নজড়ানো নরম-সোনালি চুল,
কোনো শ্রাবণরাত্রির জানালায় রাখা তার মুখের গভীরতা,
আর যেন আমার চোখের কিনারে
কেঁপে না ওঠে পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার ঢেউ, আমার দেশের নীরক্ত শরীর॥

তারপরো আমার আত্মার স্বর বীক্ষণের প্রতিভা ছড়াবে
অমাবস্যা-নিমগ্ন প্রাণের শিকড়ে শিকড়ে,

প্রমেথেউসের গানের মতো আমার গলার রৌদ্রোজ্জ্বল চীৎকার
কাঁপিয়ে দেবে এই পৃথিবীর আকাশ্ বাতাস,
ফেটে চৌচির হয়ে যাবে মিশরীয় স্ফিংক্সের স্থবিরতা,
খসে যাবে তোমাদের রাত্রির দীপ্তিমান তারা, দিনের সূর্য ॥

টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলো আমার সূর্যের মতো হৃদপিণ্ড,
যেমন কোনো পেশওয়ারী ফলওয়ালা তার ধারালো
ছুরির হিংস্রতায়
ফালি ফালি করে কেটে ফেলে তাজা, লাল টকটকে একটি আপেল।
কিন্তু শোনো, এক ফোঁটা রক্তও যেন না পড়ে মাটিতে,
কেননা আমার রক্তের কণায় কণায় উজ্জ্বল স্রোতের মতো
বয়ে চলেছে মনসুরের বিদ্রোহী রক্তের অভিজ্ঞান।
তোমরা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলো আমার হৃদ্‌পিণ্ড—
যে হৃদপিণ্ডে ঘন ঘন স্পন্দিত হচ্ছে আমার দেশের গাঢ় ভালোবাসা,
যে হৃদয়—
মা'র পবিত্র আশীর্বাদের মতো
বোনের স্নিগ্ধ, প্রশান্ত দৃষ্টির মতো,
প্রিয়ার হৃদয়ের শব্দহীন গানের মতো
শান্তির জ্যোৎস্না চেয়েছিল পৃথিবীর আকাশের নীচে,
চৈত্রের তীব্রতায়, শ্রাবণের পূর্ণিমায় ॥

দোহাই চেঙ্গিসের উলঙ্গ তরবারির হিংস্রতার,
দোহাই ক্যারাওয়ের ম্যমিগন্ধি বীভৎসতার,
দোহাই তৈমুরের পৈশাচিক রক্ত-নেশার,
তোমরা নিশ্চিহ্ন করে দাও আমার অস্তিত্ব,
পৃথিবী হতে চিরদিনের জন্যে নিশ্চিহ্ন করে দাও
উত্তরাকাশের তারার মতো আমার ভাস্বর অস্তিত্ব,
নিশ্চিহ্ন করে দাও, নিশ্চিহ্ন করে দাও ॥

("একটি এলিজির ভূমিকা"র অংশ)

জানুয়ারি, '৫২

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

পাঁচ-শালা

রাস্তার মোড়ে লালবাতি জেলে
শকুনেরা দেয় সম্ভ্যে
জোড়াবলদকে শূলে লট্‌কিয়ে
ঠোঁট চেটে বলে, ভোট দে—

এ পাঁচ বছরে বাপুরে
মহাশূন্যের পা ফুঁড়ে
করেছি তৈরি স্বর্গের সিঁড়ি
উঠবি আকাশে পা ছুঁড়ে।

ডলারে দেশটা বিকিয়ে
লণ্ডনে নাম লিখিয়ে
শিঙে ফুঁকবার স্বাধীনতাটুকু
কোনমতে রাখ টিঁকিয়ে।

থাকবে জমিতে রক্ষী
পদ্মপালেরা। লক্ষ্মী,
খিদে পেলে ফুটপাথে চিৎ হয়ে
উড়িয়ে দে প্রাণপক্ষী।

যমদূত দেয় চৌকি
সাবধান! বাঁয়ে বাস্‌ কে?
ভাল চাস যদি ভোট দে
ভুঁড়িদাসদের বাক্সে।

মা, তুমি কাঁদো

অন্ধকারের চোখ জলে, চোখে আগুন।
শুকনো পাতায় সাঁই সাঁই করে
দম-আটকানো হাওয়া।

মা তোমার কোলে মরা ছেলে
তুমি কাঁদো
মর্মভেদ চিৎকারে মাগো আকাশ মাথায় করো
বুকচাপা এই দুঃস্বপ্নকে গুঁড়ো গুঁড়ো ক'রে ভাঙো
এ জগদ্দল পাথর সরাও,
স্তব্ধতা ভাঙো, পাষাণ গলাও
কাঁদো।

বনেজঙ্গলে জলায় পাহাড়ে মাঠে জনপদে
হাটে বন্দরে শুকনো ডাঙায়
ডুকরে ডুকরে কাঁদো।
নিথর নিস্তরঙ্গ দীঘিতে নদীকল্লোলে
গাঁ-উজাড় দুর্ভিক্ষে মড়কে অনাবৃষ্টিতে
ঝড়ে বন্যায় দিগ্‌দিগন্তে
পা ছড়িয়ে তুমি কাঁদো।
করাতের দাঁতে লাঙলের-ফালে
আকাশকে চিরে বজ্র বসিয়ে আনো।
শোকের সাগর উথলিয়ে তুমি
কাঁদো।

মা তোমার কোলে মরা ছেলে
তুমি কাঁদো।

শুকনো পাতায় সাঁই সাঁই করে
দম-আটকানো হাওয়া।
অন্ধকারের চোখ জলে, চোখে আগুন।

বাঁয়ে চলো, বাঁয়ে

কোটালের বানে মাথা উঁচু ক'রে
পাথুরে মাটিতে পা টিপে এগোয়
দুর্দমনীয় স্পর্ধা।
দুরন্ত ক্রোধ টান ক'রে বাঁধে
ধনুকের মুখে ছিলা।

বাঁয়ে চলো ভাই, বাঁয়ে—
কালো রাত্রির বুক চিরে, চলো
দুহাতে উপ্‌ড়ে আনি
আমাদেরই লাল রক্তে রঙীন সকাল।

বাঁয়ে চলো ভাই, বাঁয়ে—
পঙ্গপালকে তাড়িয়ে, মাঠের
আমরাই হবো সম্রাট।
দিগ্‌দিগন্ত পাকা ফসলের
সোনা দিয়ে মুড়ে দেবো।

ফাঁসীকাঠ, জেল, গ্যাস, গুলি ঠেলে
অন্ধকারকে দুপায়ে মাড়িয়ে
শকুনের চোখ গেলে দিই, চলো
সুখে শান্তিতে বাঁচি।

কোটালের বানে মাথা উঁচু ক'রে
পাথুরে মাটিতে পা টিপে দৃপ্ত মিছিলে এগোয়
দুর্দমনীয় স্পর্ধা।
দুরন্ত ক্রোধ টান ক'রে বাঁধে
ধনুকের মুখে ছিলা।

যমুনাবতী

শঙ্খ ঘোষ

'One more unfortunate
Weary of breath
Rashly importunate
Gone to her death!' —*Thomas Hood*

নিভন্ত এই চুল্লিতে মা
একটু আগুন দে,
আরেকটুকাল বেঁচেই থাকি
বাঁচার আনন্দে।
নোটন নোটন পায়রাগুলি
খাঁচাতে বন্দী—
দুয়েক মুঠো ভাত পেলে তা
ওড়াতে মন দিই।

হায় তোকে ভাত দেবো কী করে যে ভাত দেবো হায়
হায় তোকে ভাত দিই কী দিয়ে যে ভাত দিই হায়

নিভন্ত এই চুল্লি তবে
একটু আগুন দে,
হাড়ের শিরায় শিখার মাতন
মরার আনন্দে।
দু'পারে দুই রুই কাতলার
মারণী ফন্দী—
বাঁচার আশায় হাত-হাতিয়ার
মৃত্যুতে মন দিই।

বর্গী না টর্গী না কংকে কে সামলায়
ধার চকচকে থাবা দেখছো না হামলায়?
যাস্ নে ও হামলায়, যাস্ নে।

কান্না কন্যার মায়ের ধমনীতে আকুল ঢেউ তোলে—জলে না,
মায়ের কান্নায় মেয়ের রক্তের উষ্ণ হাহাকার মরে না
চললো মেয়ে রণে চললো।
বাজে না ডম্বরু অস্ত্র ঝন্‌ঝন্ করে না জানলো না কেউ তা
চললো মেয়ে রণে চললো।
পেশীর দৃঢ় ব্যথা, মুঠোর দৃঢ় কথা, চোখের দৃঢ় জ্বালা সঙ্গে
চললো মেয়ে রণে চললো।

নেকড়ে-ওজর মৃত্যু এলো
মৃত্যুরই গান গা—
মায়ের চোখে বাপের চোখে
দু'তিনটে গঙ্গা।
দূর্বাতে তার রক্ত লেগে
সহস্র সঙ্গী
জাগে ধক্ ধক্, যজ্ঞে ঢালে
সহস্র মন ঘি।

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে
যমুনা তার বাসর রচে বারুদ বুকে দিয়ে
বিষের টোপর নিয়ে।
যমুনাবতী সরস্বতী গেছে এ-পথ দিয়ে
দিয়েছে পথ গিয়ে।

নিভন্ত এই চুল্লিতে বোন্ আগুন ফলেছে!!

জীবন-নৃত্য

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

সোহার বাসর করে গেল
করেছে সিঁদুর কুমকুম্‌ও,
তোমার হৃদয়ে রয়ে গেল
অনুচ্চারিত সেই চুমো।
নদীর নিদান বাঁকে বাঁকে
মৃত্যুর হানা দেশ জুড়ে,
কালো ঘূর্ণির বেড়াপাকে
সোনার সেদিন গেল উড়ে।
বউ-ঝিরা ঘাটে বসে থাকে
কবে সে নাবিক ফিরে এসে
মশলা দ্বীপের সওদাকে
হাতে তুলে দেবে ভালবেসে।

ওদিকে মৃত্যুমন্দিরে
দুয়ার দেওয়াল যায় টলে
তোমারই মশালে এ-তিমিরে
হৃদয়কূটের চূড়া গলে
ঝিলিমিলি তার স্রোতোধারে
নিয়তির শঠ পরোয়ানা
ভেসেই উধাও কোন পারে
উড়বে মেঘের সামিয়ানা।

নাস্তিক যত দেবতার
স্ফুরিত নাসার সম্মুখে
খোল জীবনের নবদ্বার।
চমকে চমকে আলো-মুখে
নৃত্যের তালে বেঁকে ঝুঁকে

জাগাবে ফোটাবে মন্দার,
তারই জয়মালা দোলে বুকে।
অঘোর শোকের কালিদ'য়ে
জাহাজে আবার সাড়া লাগে,
হু হু মৌসুমী হাওয়া বয়ে
তোমার জীবন অনুরাগে
মৃত মাঠে ওঠে কথা কয়ে।

কন্যা, তুমিই বিজয়িনী
জীবনের জয়সংগীত,
সুঠাম নাচের শিল্পিনী
দেশজোড়া দিশেহারাদের
হৃদয়ে জাগায় সম্বিৎ;
রাঙা বসন্ত ফোটে ফের।

বিভোর নাচের ভরা ছন্দে
মেঘে ঘনঘোর সঙ্গতে,
অস্থির তীর নাচে দ্বন্দ্বে
আমরাও নাচি পথে পথে—

আমরা হাজার রায়বেঁশে
তোমার নাচের সাড়া পেয়ে
আকাশ-কাটানো হাসি হেসে
জড়ো করি বীর ছেলেমেয়ে।
নগরে পাড়ায় ঘুমহারা,
আমরা সকলে আজ রাতে
সাপ-সাপিনীর ঝাড় খুঁজে
হাঁ-করা তাদের বিষদাঁতে
নুড়োর আগুন দোব গুঁজে,
ডগরে কাড়ায় দোব সাড়া॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

সমরেশ বসু

(১৩)

সেদিন ভরদুপুর বেলা পরান এল মহিমকে ডাকতে।

অহল্যা খাওয়া শেষে এঁটো থালা-বাসন নিয়ে ডোবার দিকে যাচ্ছিল। পরানকে দেখে ঘোমটাটা একটু বাঁ হাতে টেনে দিয়ে বলল, 'পরানদা যে।'

পরান বলল, 'হ্যাঁ আসলাম, তোমার দেওরকে ডাকতে। মহি কহঁঠাই ?'

'ঘরেই আছে। কে ডাকল, কর্তা নাকি ?'

'না। ছেলের বউ।'

অহল্যা পরানের দিকে তাকাল। পরানও তাকিয়ে হেসে বলল, 'তোমাদের মতো তো নয়, শহুরে বউ। বাপ তার একেবারে সাহেব। দেখ নাই কভু ছেলের বউকে ?'

অহল্যা বলল, 'দেখছি। বউ ডাকল যে ?'

'সে কথা মুই জানব কি করে বল ? হয়তো ফরমাশ আছে কিছু।' বলেই পরানের মুখে একগাল হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'তোমার দেওর হাওয়ালটি বড় সোজা নয় বউ। দেখলাম ত সেদিন, তারে টলানো বড় কঠিন। ফরমাশ মতো সে কাজ করবে না।'

অহল্যা নীরব রইল।

মহিম বেরিয়ে এল কাদা-মাটি হাতে। 'কি খবর পরানদা ?'

'একবার যেতে হবে ভাই, বউমা ডাকছে তোমারে।'

অহল্যা তাকিয়েছিল মহিমের মুখের দিকে। মহিম ক্ষণকাল নীরব থেকে বলল, 'চল যাই।' তারপর অহল্যাকে বলল, 'তা হইলে একবার ঘুরে আসি বউদি।'

অহল্যা বলল, 'যাও। দেখো আবার খুঁজতে পাঠাতে না হয়।' এবং তার চোরা হাসিটুকু মহিমের চোখ এড়াল না।

মহিম সেদিনের অন্ধকারের যমদূতের মতো ইমারতের মধ্যে আজ দিনের বেলা ঢুকল পরানের সঙ্গে। সেদিন মনে করেছিল রাত্রের রূপের সঙ্গে দিনের তফাত থাকবে। কিন্তু না। কেমন যেন একটা তমসাচ্ছন্ন ভাব নিয়তই এখানে বিরাজ করছে। নিস্তব্ধ খা খা। প্রথম মহলের চত্বরে হাওয়া ঢুকে যায় না। ঘুরপাক খেয়ে উপরে উঠে যায় আবার। আর এক বিচিত্র শব্দ তুলে দিয়ে যায়। সে হাওয়া দেয়ালে খিলানে আঘাত লেগে দীর্ঘনিশ্বাসের মতো হাহাকার শব্দ তোলে।

মহিমের মনে হল, এতবড় প্রাসাদ, কিন্তু কি সাংঘাতিক নীরব। আর যেন প্রতিটি বন্ধ জানালার আড়ালে আড়ালে জোড়া জোড়া চোখ উঠোনের মাঝখানে তাকে উগ্র চোরা দৃষ্টিতে দেখছে। সে তাড়াতাড়ি খোলা আকাশের দিকে তাকাল। তাকিয়ে চমকে দেখল, সেই একেবারে উঁচু আলসে থেকে এক রাশ দীর্ঘ চুল এলিয়ে ঝুলে রয়েছে।

কে ওখানে, কার ওই চুল? মহিম চোখ নামাতে পারল না, তাকিয়ে থাকতেও তার বুকের মধ্যে নিশ্বাস আটকে এল। এখুনি কি চলে যাওয়া যায় না এখান থেকে? পরানদা আসে না কেন?

হঠাৎ চুল নড়ে উঠল আর আলসের মাথায় একখানি মুখ উঁকি মারল। সে মুখের বিশাল দুই চোখের খরদৃষ্টি তারই দিকে। পরমুহূর্তেই সেদিনের মতো নারীকণ্ঠের খিল খিল হাসি শুনে তার কানের পাশ দিয়ে শিরদাঁড়া পর্যন্ত কি একটা সাপের মতো একেঁবেঁকে চলে গেল।

পরান এসে ডাকল, 'কই, আস।' কিন্তু মহিমকে উপরের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে পরান হঠাৎ বাজ-ফাটানো গলায় একটা চিৎকার করে উঠতেই হাসি থেমে গেল, সেই মুখ ও চুল ও হাসি অদৃশ্য হল। মহিম ত্রাসজিজ্ঞাসু চোখে পরানের দিকে তাকাল। পরান শান্ত গলায় বলল, 'পাগল একটা। আস, বউমা বসে আছে।' বলে তার মুখের ভাবটা এমনই হয়ে উঠল যে, মহিমের মনে হল আর দ্বিতীয় প্রশ্ন এখানে নিরর্থক।

সেদিন হেমবাবু যে ঘরে বসেছিলেন, সেই ঘরের ভিতর দিয়েই পরান মহিমকে নিয়ে দোতলায় উঠে এল। মহিম আশ্চর্য হল, ঘরে এত আলোর ছড়াছড়ি দেখে। অথচ বাইরে থেকে মনে হয় এ প্রাসাদের ঘর বুঝি অন্ধকার।

উমার ঘরে মহিমকে পৌঁছে দিয়ে পরান অদৃশ্য হল। একটা অদ্ভুত সুগন্ধ মহিমের নাসারন্ধ্র আচ্ছন্ন করে দিল। এ ঘরটির আসবাবপত্র সব-কিছুই হেমবাবুর ঘরের সঙ্গে মূলত আলাদা। দুটি মস্ত বড় জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে দিগন্তবিসারী মাঠ, খাল, ওপার রাজপুরের সুস্পষ্ট রেখা। আর জানালা যে মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডাক দেয়, তা বুঝি আগে কখনও জানত না মহিম।

মস্তবড় খাটের শিয়রের দিকের রেলিঙে কারুকার্যখচিত কাঠের ফ্রেমে যুগল দম্পতির ফোটো। একজন উমা, পুরুষটি হেমবাবুর ছেলে হিরণ। আরও নানান রকম মস্ত বড় বড় ছবি দেয়ালে রয়েছে। কেউ ঘোড়ায় চড়ে; কেউ রাইফেল হাতে, মাথায় পাগড়ি, বিচিত্র টুপি নানান রকম। তার মধ্যে নবাব সিরাজদ্দৌল্লার চিত্রটিই মহিমের চোখে একমাত্র পরিচিত মনে হল।

উমা এমনটিই আশা করেছিল মহিমের কাছ থেকে, এই বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টি। কিন্তু শিল্পী তো তার দিকে একবারও তাকাল না! এ রুচিবোধের যে অধিকারিণী, ওই দৃষ্টি কি তারও প্রাপ্য নয়? ভাবল, এ হল ময়নপুরের চাষীর ছেলের সংকোচ। কিন্তু সে একবারও এই শিশুসুলভ শিল্পীর দিক থেকে চোখ সরাতে পারল না। শিশু, একেবারেই শিশু। ও চোখেও শিশুরই অতল রহস্য, গভীর দৃষ্টি। ঘাড় অবধি বেয়ে পড়া কোঁচকানো চুলের এখানে ওখানে কাদামাটির দাগ। পরনে একখানি ফতুয়া, মাটির দাগভরা ছোট ধুতি। শ্যামল নরম মিষ্টি শিল্পী। এক বিচিত্র রঙের আঁচ লাগিয়ে দিয়েছে শহরে অভিজাত ঘরের বিদুষী উমার মনে। তবু ওর শিরদাঁড়াটা চোখে যেন বড় লাগে। খাড়া, কঠিন,—যেন নমনীয় হতে জানে না।

উমা বলল, 'বস।'

সম্বোধন শুনে চমকে ফিরল মহিম। সেই বঙ্কিম ঠোঁট, তবু মমতার আভাস, আবেগপ্রদীপ্ত চোখ, অনাড়ম্বর বেশ। উমাও বুঝল সম্বোধনে চমক লেগেছে মহিমের। হেসে বলল, 'তোমাকে 'তুমি' বললাম জমিদারের ছেলের বউ বলে নয়। এত ছেলেমানুষ বলে মনে হয়, কিছুতেই 'আপনি' বলতে ইচ্ছে করে না।'

উমার চোখ দেখে সে কথা বিশ্বাস করল মহিম। সে প্রণাম করতে গেল উমাকে। কিন্তু আজ আবার উমা দু'হাতে তার হাত ধরে ফেলল, বলল, 'ছি, বারে বারে পায়ে হাত দিও না। আমি তো তাবলে তোমার বড় নই।' মহিমের বিস্ময় বেড়েই উঠল। অথচ সেদিন বিদায়ের সময়ে নিঃসংকোচে উমা

প্রণাম গ্রহণ করেছিল। সেটা ভেবেই উমা বলল, 'সেদিন তুমি দুঃখ পাবে ভেবে আর বাধা দিইনি। বস।'

কিন্তু সে বলতে পারল না, সেদিন তার মনে এক বিচিত্র আকাঙ্ক্ষা ও কৌতূহল উদগ্র হয়ে উঠেছিল শিল্পীর হাতের স্পর্শ তার পায়ে লাগার জন্ম।

এ ঘরে খদ্দরের কোন চিহ্ন নেই। মহিম বসল একটি একটি সোফার সংকোচে আর অত্যন্ত লজ্জায়। উমা তার খুব কাছেই একটি সোফায় বসে বলল, 'তোমার কথা সব আমি আমাদের কলকাতার বাড়িতে লিখে দিয়েছি। তোমার কলকাতার কাজের কিছু চিহ্ন আমাদের বাড়িতেও আছে। আমার ভাইবোনেরা সবাই তোমাকে দেখতে চেয়েছে।'

মহিমের চোখে বিস্মিত আনন্দ লক্ষ্য করে উমার চোখেও খুশি ঝলকে উঠল। অভিমানের সুরে বলল, 'আমার শ্বশুর পুজোয় যেতে দিলেন না আমাকে। নইলে আমরা সকলে বিদেশে বেড়াতে যেতাম। তবে পুজোর পর নিশ্চয় যাব। তোমাকে নিয়ে গেলে ওরা ভারি খুশি হবে। বিশেষ, শান্তিনিকেতনে আমার যে বোন থাকে, সে তো লাফাবে।' হঠাৎ একটু থেমে মুখ টিপে হাসল উমা। তার সপ্রতিভ মুখে একটা লজ্জার আভাস দেখা দিল। বলল, 'আমার সে বোনটি বড় ফাজিল। চিঠিতে লিখেছে, তোমার ওই নয়নপুরের শিল্পী আবিষ্কার তোমার জীবনে এক মহান কীর্তি। কামনা করি শিল্পী যেন তার এ একান্ত ভক্তিমতীর প্রাণে আরও সাড়া জাগায়। তবে একলা নয়, ভাগ দিও।'

ভক্তিমূল্য নিঃসন্দেহে, কিন্তু অপরিসীম লজ্জায়, আনন্দে ও কৌতূহলে কেমন আচ্ছন্ন হয়ে রইল সে। কথা বলতে পারল না। ভক্তিমতী কথাটি তার প্রাণে এক নূতন অনুভূতির সৃষ্টি করল; কলকাতার এক আলোকপ্রাপ্ত পরিবারের মধ্যে তার সম্পর্কে আলোচনা ও পত্রবিনিময় গৌরবের নয় কি? তবু আরও কিছু ছিল উমার বোনের পত্রলেখায়, সে কথা উমা মুখে স্পষ্ট না বললেও এক অচেনা প্রতিক্রিয়া হল মহিমের মনে।

উমা তার লজ্জার ভাবটুকু কাটিয়ে খানিকটা উদ্বেগের সঙ্গে বলল, 'সত্যি, সকলে কি মনে করে জানিনে, কিন্তু এতখানি প্রতিভা নিয়ে তুমি নয়নপুরে পড়ে থাকবে, এ ভাবতে আমি কিছুতেই পারিনে। তুমিই বলো, এতবড় দেশে সকলে তোমার কাজের পরিচয় পাবে একি তোমার কামনা নয়?'

অন্যদিকে তাকিয়েছিল মহিম। বলল, 'এমন করে তো ভাবি নাই কোন-দিন।'

'কিন্তু কেন ভাব না?' কেমন যেন উত্তেজনার লক্ষণ দেখা দিল উমার মধ্যে, বলল, 'শুনেছি এ দেশে শিল্পীর দুঃখের শেষ নেই, তাদের প্রতিভা বিকাশের পথ বন্ধ। এ আমি বিশ্বাস করিনে। প্রতিভাবান যে, তার মূল্য মানুষকে দিতেই হবে; কিন্তু শিল্পী নিজে যদি তার পথ করে না নেয় বা চেষ্টা না করে তাহলে কেমন করে তা বিকাশ পাবে। তোমার স্থান হল কলকাতা, তুমি পড়ে রইলে নয়নপুরে, তবে কেমন করে তুমি দশজনের মাঝে ছড়িয়ে পড়বে? আমার কথাগুলো হয়তো একটা বুড়ো মানুষের উপদেশের মতো শোনাচ্ছে কিন্তু তুমি দেখ, যাঁরা বড় হয়েছেন তাঁরা সকলেই আজ রাজধানীর বুকে জমিয়ে বসে আছেন।'

একেবারে অস্বীকার করার মতো কথা নয়; অথচ কী জবাব দিতে হবে এ কথার তা খুঁজে না পেয়ে অসহায়ের মতো উমার দিকে তাকাল মহিম। একটু পরে বলল, 'মোরে-কি করতে হইবে বলেন?'

উমা তার আরও কাছে সরে এল। নিজের এই আবেগকে সে নিজেই বোধহয় চেনে না। বলল, 'তুমি নয়নপুর ছেড়ে চল, চল কলকাতায়।'

উমার নিজের কানেই কথাগুলো ভীষণ ঠেকল। কিন্তু নিজেকে সে কিছুতেই দমিয়ে রাখতে পারল না, চোখ ফেরাতে পারল না মহিমের উপর থেকে।

কিন্তু মহিমের বুকে যেন বাজ পড়ল। 'নয়নপুর ছেড়ে চল।' এ কথার চেয়ে নির্দয় বুঝি আর কিছু নেই। সে আবার অসহায়ের মতো তাকাল উমার দিকে। সেই আবেগদীপ্ত চোখ, সেই বঙ্কিম ঠোঁটে মমতার আভাস শুধু আর নয়। আরও যেন কী রয়েছে। তার শরীর ঝুঁকে পড়েছে। আঁচল খসা, প্রশস্ত কাঁধ ও বুকের অনেকখানি জায়গায় জামা খোলা। সুগঠিত বুকের মাঝখানে এক অদ্ভ রহস্য উঁকি মারছে। হৃৎপিণ্ডের শব্দ বুঝি শোনা যায়। স্পন্দিত সোনার হার।

নয়নপুরের খাল থেকে মাঠের উপর দিয়ে হু-হু করে দমকা হাওয়া ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে। এলোমেলো করে দিল সব।

মহিম মুখ ফিরিয়ে সমস্ত ঘরের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলল, 'মোরে খানিক ভাবতে দেন।'

প্রশান্ত হয়ে উঠল উমার মুখ। ঠিক হয়ে বসে বলল, 'রবীন্দ্রনাথের একখানি মূর্তি তোমাকে আমি গড়তে বলেছি। শান্তিনিকেতনে গেলে তাঁকে দেখতে পাবে। তিনি তোমাকে আশীর্বাদ করবেন।'

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আমাদের ঘরে এমন একটা ছেলে থাকলে তাকে সারা পৃথিবী ঘুরিয়ে আনতাম।'

মহিম বলল, 'আমি তা হইলে যাই ?'

উমা সে কথার জবাব না দিয়ে বোধহয় তার আবেগকে সংশোধন করার জন্ম বলল, 'আমার কথাগুলো তোমার কাছে বড় অদ্ভুত লাগল, না ? আমার শ্বশুরকে ধন্যবাদ, তিনি তোমাকে ডেকে এনেছিলেন।'

এতক্ষণে মহিম জিজ্ঞেস করল, 'কর্তা কই ?'

'তিনি গেছেন কয়েকদিনের জন্ম এক দূরের তালুকে। তিনি তোমাকে এখানে এনে রাখতে চান।' মহিম উঠে দাঁড়াল। কিন্তু সে কিছুতেই উমার চোখের দিকে তাকাতে পারছে না। তার প্রাণে হাওয়া লেগেছে, বুঝি নয়নপুরের তেপান্তরের দমকা হাওয়ার মতো।

উমা জিজ্ঞেস করল, 'গৌরাঙ্গবাবুর সঙ্গে তোমার দেখা হয় ?'

'উনি তো মোর সঙ্গে দেখা করেন না। মোরে বুঝি ভালবাসেন না আর।'

একটা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল উমা, 'সেজন্ম তোমার দুঃখের কিছু নেই। মুখে না বললে কি ভালবাসা হয় না ? আর···আমরা কি ভালবাসি না ?'

বাসেন। কিন্তু সে ভালবাসা মহিমের কাছে অপরিচিত, সংশয়ের জালে তা ঘেরা। সে নীরব রইল।

উমা বলল, 'তুমি এখন কি কাজ করছ, দেখতে ভারি ইচ্ছে হয়। সেই দক্ষ-নিধনের ক্ষিপ্ত শিব নাকি ?'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে মহিম বলল 'হ্যাঁ।' কিন্তু সে যে এখন থেকেই ধর্মঘটের ঘট তৈরি করতে আরম্ভ করেছে, তা বলতে বাধল। অনেকদিনই লাগবে সে ঘট তৈরি করতে, কেন না সে যে হবে অনেক বাহারের, প্রায় তেত্রিশ কোটি দেবতার ছোট ছোট মূর্তি থাকবে সে ঘটের গায়ে।

সে আবার প্রণামের জন্ম ঝুঁকে পড়তেই উমা তার দু' হাত ধরে ফেলল। —'একি, বারণ করলাম না পায়ে হাত দিতে। তাহলে তো দেখছি 'আপনি' করে বলতে হবে তোমাকে।'

বলে সে হাত ছেড়ে না দিয়ে যেন সত্যই ভক্তিমতীর মতো ঈশ্বর অবলোকন করছে এমনিভাবে তাকিয়ে রইল। আর উমার সর্বাঙ্গ থেকে বিচিত্র সুগন্ধ তার অনুভূতিতে এক অদ্ভ আবেগের উন্মাদনা এনে দিল। তার হাত কাঁপল উমার হাতের মধ্যে। এত কাছাকাছি উমার দিকে তাকাতে গিয়ে তার চোখের পাতা যেন অসম্ভব ভারি হয়ে এল।

উমার চোখ উজ্জ্বল, নির্নিমেষ, ঠোঁটে দুর্বোধ্য হাসি। বলল, 'তুমি আমাকে হাত তুলে নমস্কার ক'রো, আমিও তাই করব। ডাকলে এস কিন্তু', হাত ছেড়ে দিল সে।

মহিম দরজার কাছে থম্‌কে দাঁড়াল। সংকোচের সঙ্গে বলল, 'একটা কথা মোরে বলেন।' কাছে এল উমা। মহিম জিজ্ঞেস করল, 'মুই এট্টা হাসি শুনছি এ বাড়িতে, মেয়েমানুষের হাসি। উনি কে?'

বিস্মিত হল উমা। —'তুমি হাসি শুনেছ?'

'হ্যাঁ ওনারে দেখছি আমি।'

'কোথায়?'

'এ মহালের একেবারে উঁচা আলিসের ধারে।'

মুহূর্ত নীরব থেকে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বলল উমা, 'একথা তুমি আমাকে জিজ্ঞেস ক'রো না।' আবার একটু চুপ থেকে বলল, 'যদি তোমাকে কখনো কলকাতায় পাই, তখন বলব।'

কথাটা মহিমকে আর একটা পাকে বাঁধল। বেরিয়ে গেল সে, গেল মনের মধ্যে এক নতুন প্রতিক্রিয়ার ঝড় নিয়ে। প্রথম দিনের চেয়ে আজ তা আরও বিচিত্র। উমার নতুন ভাব এবং এ বাড়ির সমস্ত কিছুই।

[ক্রমশ

সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত লেনিন

★

শিল্পী এ. ইয়েলেমিন

★

টাস্‌-এর সৌজন্যে

মার্ক্সবাদ ও মর্গানবাদ

বিনয় ঘোষ

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সম্প্রতি শ্রীডাঙ্গের "India—From Primitive Communism to Slavery" নামক গ্রন্থের সমালোচনাপ্রসঙ্গে প্রায় দুই সহস্রাধিক শব্দসম্বলিত এক "গৌরচন্দ্রিকায়" মার্ক্সবাদ ও মর্গানবাদ সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রকাশ করেছেন। * ডাঃ দত্ত আমাদের দেশে একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রবীণ মার্ক্সবাদী পণ্ডিত হিসেবে সুপরিচিত। আমরা অনেকেই যখন ভূমিষ্ঠ হইনি তখন থেকে তিনি এদেশে মার্ক্সবাদের অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেছেন। আমাদের মধ্যে প্রগতিশীল ও মার্ক্সবাদী চিন্তাধারার তিনি একজন অন্যতম প্রবর্তক বললেও অত্যুক্তি হয় না। মার্ক্সবাদী রাজনীতিক্ষেত্রে শ্রীডাঙ্গের স্থানও অনেক উচ্চে, কয়েকজন সর্ব-ভারতীয় কর্মীর মধ্যে তিনি একজন প্রবীণতম কর্মী। "তত্ত্বানুশীলন" বা "থিওরি" এবং তার "প্রত্যক্ষ প্রয়োগ ও ব্যবহার" বা "প্রাকটিস্" অভিন্নসত্তা, এই যদি মার্ক্সীয় প্রজ্ঞানতত্ত্বের মূলকথা হয় তাহ'লে "ভারতীয় ইতিহাস" পর্যালোচনা শ্রীডাঙ্গের অধিকার-বহির্ভূত, এমন কথা ডাঃ দত্ত বলতে পারেন না। অবশ্য ডাঃ দত্ত তা বলেননি কোথাও, কিন্তু তবু তাঁর সমালোচনা আদ্যোপান্ত পাঠ করলে মনে হয় যেন এই কথাই তিনি বলতে চান। ডাঃ দত্তের মতন প্রবীণ বিচক্ষণ পণ্ডিতের কাছ থেকে শ্রীডাঙ্গের রচনা সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ পথ-নির্দেশক সমালোচনা আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম, কিন্তু তার পরিবর্তে যা পেয়েছি তাতে আমরা বাস্তবিকই হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়েছি। ক্ষুব্ধ হয়েছি এই জন্য যে সমালোচনাপ্রসঙ্গে তিনি "কমিউনিস্ট পার্টি" ও কমিউনিস্ট সংস্কৃতি-কর্মীদের সম্পর্কে এমন সব ঢালাই মন্তব্য করেছেন যা না করলেও তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনার কোন অঙ্গহানি হ'ত ব'লে মনে হয় না। তা করেও যদি তিনি ক্ষান্ত হতেন তাহ'লেও নতশিরে আমরা তাঁর কটুকথার সুতীব্র বর্ষণ সহ্য করতাম, নিজেদের ত্রুটিবিচ্যুতির কথা স্মরণ ক'রে ভাবতাম যে বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রদ্ধেয় গুরুজনের সমালোচনায় বিচলিত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু তিনি আধুনিক নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার ভিত্তিতে মার্ক্স এঙ্গেল্‌স্-এর মতবাদকে পর্যন্ত "চ্যালেঞ্জ" করেছেন। মার্ক্স ও মার্ক্সবাদ

* "অগ্রণী" কার্তিক সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

সম্বন্ধে তিনি বলেছেন : "মার্ক্সবাদের কোন মত যদি আজ অবৈজ্ঞানিক বলিয়া প্রমাণ হয় তাহা হইলে তাহা ত্যাগ করিব না কেন ?" অনেক জার্মান বামপন্থী সোশ্যালিস্ট বৈজ্ঞানিক তাঁকে ১৯২০ সালে এ-সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা তিনি প্রণিধানযোগ্য ব'লে আমাদেরও শুনিয়েছেন : "কার্ল মার্ক্সও একজন মানুষ এবং Das Kapital পুস্তকও একজন মানুষের লেখা বই। কেহই অভ্রান্ত নয়।" এই ধরনের "বামপন্থী সোশ্যালিস্ট বৈজ্ঞানিক" জার্মানিতে খুব বেশী ছিলেন বলেই কি সেখানে "কমিউনিজমের" ঐতিহাসিক বিপর্যয় ঘটেছিল এবং "ফ্যাশিজমের" অভ্যুদয় হয়েছিল ? জানি না, ডাঃ দত্ত হয়ত আরও ভালভাবে তা জানেন। মার্ক্স এঙ্গেল্স-এর উত্তরসাধক লেনিন, স্টালিন, মাও সে-তুং প্রমুখ মনীষীদের কোন্ রচনায়, কোন্ বিবৃতিতে, কোন্ নীতির মধ্যে তিনি মার্ক্সবাদ যে "সনাতনবাদ" বা "dogma", তার পরিচয় পেয়েছেন ? মার্ক্সবাদ যে গোঁড়ামি বা সনাতনবাদ নয়, ইতিহাসে তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ হ'ল উত্তরকালে লেনিন, স্টালিন ও মাও-এর সাধনা। মার্ক্সবাদ যে "মতামতসমষ্টি" নয়, একটা বৈজ্ঞানিক Methodology—একথা ভুলে গিয়ে, আধুনিক নৃতাত্ত্বিক গবেষণার আলোকে ডাঃ দত্ত মার্ক্সবাদকেই "অবৈজ্ঞানিক" ব'লে উড়িয়ে দিলেন কেন ? বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে কি "বিজ্ঞানবাদ" বা "বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই" ধ্বংস হয়ে যায় ? ডাঃ দত্তের মতে হয়ত যায়, তাই তিনি আধুনিক নৃতাত্ত্বিক গবেষণার অত্যুজ্জ্বল আলোকে ধাঁধিয়ে গিয়ে মার্ক্স এঙ্গেল্স রচিত গ্রন্থ কেন "বেদ, বাইবেল ও কোরাণের" মতন অভ্রান্ত হবে প্রশ্ন করেছেন এবং মর্গানকে "আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ো" ব'লে বিদ্রূপ করেছেন। "বিজ্ঞান" যেমন কেবল কোন বিশেষ যুগের কোন বৈজ্ঞানিকের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালব্ধ মতামত নয়, পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলনের একটা "টেক্নিক", মার্ক্সবাদও তেমনি চিন্তার, যুক্তির ও কাজকর্মের একটা "টেক্নিক"। "টেক্নিক" মাত্রেরই যুগে যুগে উন্নতি হয়, কিন্তু তার জন্য "টেক্নিকটাই" মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় না। কামারের "হাতেগড়া হাতুড়ির" বদলে আজ "বৈদ্যুতিক হাতুড়ি" হয়েছে ব'লে হাতুড়ির "function" মিথ্যা হয়নি, হাতুড়িগত মূল টেক্নিকও বদলায়নি। "টেক্নোলজির" ইতিহাস তাই, বৈজ্ঞানিক "ইডিওলজিরও"। সামাজিক অনুসন্ধানের ফলে মার্ক্সীয় টেক্নিকেরও অনেক উন্নতি হয়েছে, এখনও হ'চ্ছে, কিন্তু তার জন্য মার্ক্সবাদের যে বৈজ্ঞানিক কাঠামো সেটা

ধ'সে পড়বে কেন ? মার্কিন নৃতাত্ত্বিক মর্গান থেকে লাউই পর্যন্ত প্রায় একশ' বছরের ইতিহাস, এর মধ্যে নৃবিদ্যা ও প্রত্নবিদ্যার বৈপ্লবিক অগ্রগতি হয়েছে, তার ফলে মর্গানের অনেক কথাই অর্ধসত্য প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু মর্গানের সমাজবিজ্ঞানের মূল কাঠামো ধূলিসাৎ হয়ে যায়নি।

এইটুকু "গৌরচন্দ্রিকা" ক'রে এইবার ডাঃ দত্তের তথ্য-বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত কিনা বিচার করা যাক। নিজের অক্ষমতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হয়েও এ-কাজে প্রবৃত্ত হচ্ছি শুধু বিষয়ের অত্যধিক গুরুত্বের জন্য। আমি নৃবিজ্ঞান ও প্রাচীন ইতিহাসের একজন অনুসন্ধিৎসু ছাত্র মাত্র, ডাঃ দত্ত এই বিষয়ের পাণ্ডিত্যে ও সাধনায় নিঃসন্দেহে আমার শিক্ষক ও গুরু-স্থানীয়। আদর্শ গুরুর ঐতিহ্য অনুসারে তিনি আমার এই আলোচনার ধৃষ্টতা ও অসতর্ক তীব্রতা ক্ষমা করবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। আর ছাত্রের সমালোচনা যদি সামান্য "যুক্তিসঙ্গত" বলেও গ্রাহ্য হয়, তাহ'লে তার জন্য গুরুরই গৌরববোধ করা উচিত নয় কি ?

আধুনিক নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান

ডাঃ দত্ত বলেছেন যে তিনি "প্রধানত বিজ্ঞানের ছাত্র বলিয়া, মর্গানের অসম্পূর্ণ ও সামান্য ভিত্তির (Data) উপর প্রতিষ্ঠিত মতকে, মর্গানের পরে বিগত শতবর্ষের নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের উপর সম্মান দিতে পারেন না"। মার্কিন নৃতাত্ত্বিক ডাঃ লাউইর বিখ্যাত গ্রন্থ Primitive Society থেকে তিনি আধুনিক নৃতাত্ত্বিক গবেষণার উপাদান ও তার ব্যাখ্যান দুইই অভ্রান্ত ব'লে গ্রহণ করেছেন। শুধু ডাঃ লাউই নন, রিভার্স, ম্যালিনাউস্কি, ব্রাউন, ক্রোয়েবার, হার্স্কোভিটস প্রমুখ এযুগের বিশিষ্ট নৃবিজ্ঞানীরা এবং অধ্যাপক গর্ডন চাইল্ড প্রমুখ প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নবিদ্‌রা মর্গানের উপাদান ও "unilinear evolutionism"-এর ব্যাখ্যান যে অসম্পূর্ণ তা পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন। মর্গানের সমালোচনা সকলেই করেছেন, তবে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ লাউইর সমালোচনা এবং অন্যান্যদের সমালোচনার মধ্যে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য আছে। সেকথা পরে বলব। তার আগে দেখা যাক, যে-লাউইর কথায় ডাঃ দত্ত বিজ্ঞানের ছাত্র ব'লে মর্গানকে নিদারুণ অবজ্ঞায় ইতিহাসের আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করেছেন, আধুনিক নৃবিদ্যার জ্ঞানভাণ্ডারে সেই বিচক্ষণ মার্কিন

অধ্যাপক ডাঃ লাউইর বিশেষ অবদান কি ? লাউই নিজে তাঁর Primitive Socity র ভূমিকায় বলেছেন—"my book inevitably grew into a persistent critique of Morgan"—এবং এই হ'ল লাউইর প্রথম দান। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর নৃবিজ্ঞানীরা কিভাবে তা গ্রহণ করেন সে সম্বন্ধে লাউই বলেছেন :

> The reception accorded to Primitive Society on its appearance varied considerably. Some readers were repelled by the "negativistic" aspects of the book ; others felt swamped by the mass of detail." (Primitive Society—Preface, 1949 ed).

অধ্যাপক লাউইর দ্বিতীয় মূল্যবান অবদান হ'ল এই "negativistic attitude," এবং নঙর্থক দৃষ্টিভঙ্গী নিশ্চয়ই সুস্থ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নয়, সমাজ-বিজ্ঞানীর তো কখনই নয়। আধুনিক নৃবিজ্ঞানের অন্যতম সাধক ও প্রবর্তক ডাঃ রিভার্স "American Anthropologist" পত্রিকায় লাউইর বিখ্যাত গ্রন্থের সমালোচনাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন যে তাঁর বই "will be of greatest value to students as a *record* of early forms of social institution" (Italics লেখকের), কিন্তু তিনি লাউইর "historical pusillanimity" বা "ঐতিহাসিক কাপুরুষতার" বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন। আধুনিক যুগের মার্কিন নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে দিক্‌পালস্বরূপ অধ্যাপক ক্রোয়েবারও উক্ত পত্রিকায় লাউইর "negativistic attitude towards broader conclusions" এবং "comparative sterility" সম্বন্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। লাউইর Primitive Society আদ্যোপান্ত পাঠ করলে (প্রত্যেক সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রের অবশ্য পাঠ করা উচিত) যে-কেউ তাঁর অসাধারণ তথ্যসংকলনশক্তি দেখে মুগ্ধ হবেন, কিন্তু তাঁর ঐতিহাসিক নিটোল দৃষ্টিশক্তির শোচনীয় অভাব ও চিন্তার বন্ধ্যাতা দেখে প্রকৃত বিজ্ঞানী যাঁরা তাঁরা ক্ষুব্ধ হবেন। হয়েছেনও তাই। অধ্যাপক মাইকেল ফস্টারের বিখ্যাত কথা—"hypothesis is the salt of science"—লাউই উপলব্ধি করতে পারেননি বলেই মনে হয়। বিস্তারিত অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ প্রত্যেক বিজ্ঞানীরই কর্তব্য, কিন্তু সেই অনুসন্ধানলব্ধ স্তূপাকার তথ্য যদি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও বিশ্লেষণীশক্তির প্রভাবে সমীকৃত হয়ে নিটোল "জেনারালাইজেশনে" রূপায়িত

না হয়, তাহ'লে সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায়। অধ্যাপক হ্যাডন এই জন্যই তাঁর "History of Anthropology" গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন :

> "It is one of the most important functions of stay-at-home synthetic students laboriously to cull data from the vast literature of anthropology, travel and ancient and modern history and to weld them into coherent hypotheses." (A.C. Haddon : History of Anthropology—Preface).

অধ্যাপক লাউই প্রধানত একজন "রেকর্ডার", "ক্রনিকলার" বা সংকলক, "ওয়েল্ডার" নন্। তাই তাঁর গ্রন্থ পাঠ ক'রে ক্রোয়েবারের ভাষায় খেদোক্তি করতে হয়—"One sometimes sighs regretfully that the honesty of the method which is so successfully exemplified here is not stirred into quicker pulse by *visions* of more ultimate enterprise." (Italics লেখকের)। মার্কিন নৃতাত্ত্বিক ফ্রান্স বোয়াস ও ক্লার্ক উইসলারের উদ্যোগে "কালচারের" যে "trait-complex-pattern" বিশ্লেষণের সূত্রপাত হয়, (যাকে টাইলর-পন্থী বৃটিশ ইভলিউশনিস্ট ও এলিয়ট-পন্থী ডিফিউজনিস্টদেরই একটা নতুন ধারা বলা চলে), লাউই সেই ধারারই প্রশস্ত পথটা ছেড়ে দিয়ে কেবল "ট্রেট" বা বিচ্ছিন্ন উপকরণের অলিগলিতে বিচরণ করেছেন। "বিচ্ছিন্ন" উপকরণের যাইলেন যে বহু চোরাগলি এবং শেষ পর্যন্ত সেই চোরাগলিতে প্রবেশ ক'রে লাউই মানুষের ইতিহাসে যে কোন প্রশস্ত রাজপথের (অবশ্যই আঁকাবাঁকা) হদিশ পাবেন না তা তাঁর গ্রন্থের প্রান্তে পৌঁছলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। অফুরন্ত উপকরণ ও তথ্যের মহারণ্যে ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে, মর্গান টাইলর রিভার্স প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীদের (শুধু মর্গানকে নয়) মতামত খণ্ডন ক'রে, লাউই অন্ধের মতন শেষ পর্যন্ত আর পথের সন্ধান পেলেন না। তথ্যের পর্বতচূড়া থেকে বিরাট "প্রিমিটিভ" গর্তের দিকে তাকিয়ে তিনি দেখলেন "To that planless hodgepodge, that thing of shreds and patches called civilisation, its historian can no longer yield superstitious reverence."[১] আশার কথা যে আজও অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানী মানবসভ্যতাকে "planless hodgepodge" ও "shreds and patches" মনে করেন না এবং সংস্কারের বশবর্তী হয়ে নয়, রীতিমত বৈজ্ঞানিক কারণেই সভ্যতার ভবিষ্যতের উপর তাঁরা এতটুকু আস্থা হারাননি।

এখন কথা হচ্ছে, এ-হেন "হৃদপদ্মপন্থী", "ফ্রেঞ্চ-প্যাচপন্থী" মার্কিন নৃবিজ্ঞানীর অনুরাগী হয়ে উঠলেন কেন ডাঃ দত্ত? আধুনিক নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে লাউই নিঃসন্দেহে অন্যতম, কিন্তু আধুনিক নৃবিদ্যার প্রগতি ও গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনিই একমাত্র অধিবক্তা, এ ধারণা ডাঃ দত্তের কোথা থেকে হ'ল? যেহেতু লাউই সদম্ভে এবং অনেকটা অশ্রদ্ধার সঙ্গে মর্গানকে উড়িয়ে দিয়েছেন, সেই জন্য "মার্কসবাদী" ডাঃ দত্ত তাঁকে "আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ো" বললেন এবং নৃবিজ্ঞানের অগ্রগতিতে বিচলিত হয়ে আরও কয়েকধাপ এগিয়ে গিয়ে মার্ক্স এঙ্গেল্সকেও বাতিল ক'রে দিলেন। "বিজ্ঞানের ছাত্র" হিসেবে মর্গান ও মার্ক্স্ এঙ্গেল্সের গ্রন্থ-সন্নিবেশিত কোন বিশেষ উক্তি তিনি স্বচ্ছন্দে অগ্রাহ্য করতে পারেন, তাকে নতুন অনুসন্ধানলব্ধ তথ্য দিয়ে একশবার পরিপূরণ করতে পারেন, কিন্তু "মার্ক্স্‌বাদকে" বর্জন করতে চান কেন? এটা কি বাস্তবিকই নৃবিজ্ঞানের অগ্রগতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, না বিকৃত বিজ্ঞানে মোহগ্রস্তের দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য উগ্রগতি? দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ডাঃ দত্তের আলোচনার মধ্যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে (থাকাই স্বাভাবিক), কিন্তু বৈজ্ঞানিক "অগ্রগতির" কোন স্বাক্ষর তার মধ্যে নেই, আছে অবৈজ্ঞানিক "উগ্রগতি" ও "উল্লম্ফনের" স্থূল পদচিহ্ন। সমাজবিজ্ঞানের আদি-প্রবর্তকদের তিনি অশ্রদ্ধাভরে পদদলিত করেছেন, কিন্তু শ্রদ্ধাভরে তাঁর সুদীর্ঘ সমালোচনার মধ্যে কিছুই প'ড়ে তুলতে পারেননি। মুক্তচিত্ত মার্ক্স-বাদী ও 'বিজ্ঞানের ছাত্রের' কাছ থেকে কালাপাহাড়ী মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী আশা করা যায় না।

সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসে মর্গানের স্থান ও দান

হ্যাডন তাঁর 'নৃবিজ্ঞানের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন[২] যে বিগত শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজবিজ্ঞানী হলেন মর্গান, এবং তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে (Ancient Society) 'পরিবার ও আত্মীয় সম্বন্ধের' বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পাকাপোক্ত ভিত স্থাপন ক'রে গেছেন। পারিবারিক ক্রমবিকাশের একটা 'স্কীম্' বা ছক্ তিনি তৈরি করেছিলেন 'শ্রেণীবাচক' সম্বোধন-শব্দের (Classificatory Kinship terms) ভিত্তিতে। এই বৈপ্লবিক অনুসন্ধানরীতির আদিপ্রবর্তক ও আবিষ্কর্তা মর্গান। আধুনিককালে ডাঃ রিভার্স এই অনুসন্ধানরীতির আরও অনেক উন্নতিসাধন করেছেন এবং মর্গান-প্রবর্তিত এই পদ্ধতিই

আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীর কাছে অনুসন্ধানের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হাতিয়ার। মর্গান যে-কালে যে অপর্যাপ্ত উপকরণ নিয়ে কাজ করেছিলেন তাতে তাঁর হকটা হয়ত আজ অদলবদল করতে হতে পারে, কিন্তু তবু হ্বাডন বলেছেন যে—'The greater part of Morgan's work is, however, of lasting value' ২ আধুনিককালে মর্গানের অন্যতম উত্তরাধিকারী (অন্ধ ভক্ত নন্) ডাঃ রিভার্স এই জন্যই মর্গানবিরোধীদের লক্ষ্য ক'রে মর্গানের উক্ত 'স্কীম' বা হক্ সম্বন্ধে বলেছেন—

> '...in recent years the scheme has encountered much opposition...the opponents of Morgan have made no attempt to distinguish between different parts of his scheme, but *having shown that some of its features are unsatisfactory, they have condemned the whole.'* (Italics লেখকের)

মর্গান-আবিষ্কৃত অনুসন্ধান-পদ্ধতিই (নৃবিজ্ঞানের ভাষায় 'Geneaological Method' বলা হয়) যে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীর অন্যতম বৈজ্ঞানিক হাতিয়ার, একথা ডাঃ রিভার্স সারাজীবন তাঁর অনুসন্ধান কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন এবং সাম্প্রতিক কালের রেমণ্ড কার্থ প্রমুখ আরও অনেক বিজ্ঞানী এই হাতিয়ারের সাহায্যে আশ্চর্য কাজ করেছেন। ৩ ডাঃ লাউই নিজেও এই পদ্ধতির গুরুত্ব অস্বীকার করতে পারেননি, যদিও মর্গানের কাছে ঋণস্বীকার তিনি করেন নি এবং ডাঃ রিভার্সেরও যথেষ্ট সমালোচনা করেছেন, এমন কি তাঁর 'লেগেটিভ কমপ্লেক্স'-এর জন্য তিনি 'Classificatory' কথার বদলে 'Dakota terminology' (ডেকোটা কৌমের নামানুকরণে) শব্দ ব্যবহার করেছেন।৪ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নৃবিজ্ঞানীরা আজ প্রায় একবাক্যে মর্গান-প্রবর্তিত এই 'Genealogical method'-কে অন্যতম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের হাতিয়ার বলেন : ৫

> The genealogial method has proved of such value in anthropological research that it is now considered an essential technique in sociological investigation.

বৈজ্ঞানিকের কাছে পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের পদ্ধতি বা methodology-টাই বড় কথা, কোন বিশেষ কালে অনুসন্ধানলব্ধ তথ্য বা সেই তথ্যনির্ভর তত্ত্বটা নয়। বিজ্ঞানের অর্থই তাই, মার্কসবাদ ও মর্গানবাদেরও। সেই

কারণেই সমাজবিজ্ঞানী অনুসন্ধানের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি ও হাতিয়ারের আবিষ্কর্তা মর্গান ১৮৭৭ সালে তাঁর 'আদিম সমাজ' গ্রন্থ লিখলেও আজও তিনি 'আদ্যি-কালের বদ্যিবুড়ো' হয়ে যাননি। মর্গানের 'স্কীম' বা ছকের বিভিন্ন অংশ আজ নিশ্চয়ই আরও অনেক পরিপূর্ণ রূপ নিতে পারে, সংশোধিতও হ'তে পারে, কিন্তু আজও তা সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যায় নি। মার্ক্‌সবাদের সঙ্গে মর্গানবাদের যে গভীর যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল তাও 'আকস্মিক' কারণে নয়, 'ঐতিহাসিক' কারণে।

মর্গানবাদ ও মার্ক্‌সবাদ

মার্ক্‌স ও এঙ্গেল্‌স যে মর্গানের 'সামাজিক ক্রমবিকাশে'র স্কীম্ গ্রহণ ক'রে-ছিলেন সে-সম্বন্ধে অধ্যাপক গর্ডন চাইল্ড বলেছেন 'That was no accident'. ১৮৫৯ সালেই মার্ক্‌স তাঁর 'Critique'-এর মধ্যে ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যার ধারা বিশ্লেষণ করেছিলেন—এবং ঠিক সেই বছরেই ডারুইনের 'Origin of of Species" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। মার্ক্‌স ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সভ্য সমাজ থেকে। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যার ধারাগুলি তিনি আদিম মানব-সমাজের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেন, কিন্তু নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর সেরকম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না বলেই তিনি মর্গানের দিকে আকৃষ্ট হন। অধ্যাপক গর্ডন চাইল্ড এসম্বন্ধে বলেছেন :

> 'The latter (মর্গান) had collected data of just the kind suited for illustrating the Materialist Conception of History. The criteria he used for distinguishing between Savagery, Barbarism and Civilisation, if not precisely 'forces of production'—still less, modes of production—at least approximated more closely thereto than the criteria expounded by any other school at that time. ৬

ডাঃ দত্ত নিশ্চয়ই অধ্যাপক গর্ডন চাইল্ডকে এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সমাজ-বিজ্ঞানী ও প্রত্নবিদ্ ব'লে স্বীকার করবেন। মর্গানের 'ছক্' আজও যে "সম্পূর্ণ" সমর্থনযোগ্য, এমন কথা গর্ডন চাইল্ডও বলেন না। তিনি বলেন : "In detail it is untenable. Yet it remains the best attempt of its kind." ৭ তাই প্রত্নবিদ্ হিসেবেও অধ্যাপক গর্ডন চাইল্ড মর্গান-কল্পিত যুগ

কাঠামোটাকে স্বীকার করেন এবং তাঁর What Happened in History গ্রন্থে তিনি মানবসমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাস সেই বৃহত্তর "ছকের" মধ্যেই বর্ণনা করেছেন। প্রধানত মর্গানের উপর নির্ভর ক'রে ১৮৮৪ সালে এঙ্গেলস্ "The Origin of the Family, Private Property and the State" লেখেন এবং আধুনিক অনুসন্ধানের আলোকে মর্গানের ছকের অনেক অংশ যেমন আজ সংশোধন ও পরিপূরণ করা দরকার, এঙ্গেলসের গ্রন্থেরও ঠিক তাই দরকার। বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে, নতুন অনুসন্ধানের ফলে, এই পরিপূরণের কাজ সর্বদাই চলতে থাকে—

That shading out of sharply-drawn lines is an inevitable result of greater knowledge. If you compare the attempts to construct human pre-history of fifty years ago with the attempts to construct the pedigree of human evolution you find the same thing. A great many gaps have been filled in. ৮

ডারুইন্, হাক্সলে ও হেকেলের পর আমরা "Fish" ও "Amphibian", "Reptile" ও "Mammal"-এর মধ্যবর্তী কয়েকটি জীবাশ্মের নমুনা পেয়েছি এবং মেরুদণ্ডী জীবের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের "ধারাবাহিকতা" তার ফলে আরও অনেক সুদৃঢ় ও সুবিস্তৃত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমন কি "এন্থ্রপয়েড এপ্" ও আদিমতম মানব বা মানবসদৃশ জীবের এতগুলি ফসিল আজ পাওয়া গেছে যে মানুষের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আজ প্রায় নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বর্ণনা করা যায়। ৯ কিন্তু তার জন্য কি ডারুইন্, হাক্সলে ও হেকেল আবর্জনাস্তূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন? তা হন নি, সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মর্গান ও এঙ্গেলস্ তাই আজও বর্জনীয় নন। হলডেন বলছেন: ১০

"In spite of that (অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক প্রগতি সত্ত্বেও), however, the principal conclusions at which Huxley and Haeckel arrived *form a starting point* for an account of evolution, and are *still true.* My own view is that the *same holds good to a very large extent for the system laid down by Engels,* though there are certain parts of his scheme (Origin of Family etc. গ্রন্থের) which are obviously doubtful and a few which are probably false." (Italics লেখকের)

মার্কস ও মর্গানের পর জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার ও উন্নতি হয়েছে, কিন্তু তার

জন্য তাঁরা কেউ "বস্তিবুড়ো" হিসেবে বাতিল হয়ে যাননি। তার কারণ তাঁদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ছিল, সমস্ত তথ্য সমীকৃত ক'রে যে সামাজিক বিকাশ-ধারার ছক তাঁরা তৈরি করেছিলেন তা পরবর্তীকালের গবেষণার ফলে সংশোধিত ও সমৃদ্ধ হলেও, মানবেতিহাসের রেখাচিত্ররূপে আজও তা ম্লান হয়ে যায়নি। প্রকৃত মার্কসবাদী মাত্রেই মার্কসবাদ-মর্গানবাদের এই গতিশীলতা সম্বন্ধে সচেতন এবং ডাঃ দত্তের অনেক আগেই মার্কসীয় চিন্তানায়করা মর্গান-এঙ্গেলস্-এর মতামত পরিপূরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন, কিন্তু "বিজ্ঞানের ছাত্র" ডাঃ দত্তের মতন কেউ তাঁদের অবজ্ঞাভরে বর্জনীয় মনে করেন নি। ডাঃ দত্তের "মার্কসবাদের" সঙ্গে হলডেন বা গর্ডন-চাইল্ডের মতন অধিকাংশ বিজ্ঞানী, প্রত্নবিদ্ ও সমাজবিজ্ঞানীর "মার্কসবাদের" মূলগত পার্থক্য এইখানে। জড়বাদী ও নৈরাজ্যবাদীর দৃষ্টিতে মার্কস-এঙ্গেলস্-মর্গানের বৈজ্ঞানিক অবদানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

"আদিম সাম্যবাদ"

ইতিহাসের কোন কালে মানবসমাজ যে "আদিম সাম্যবাদের" স্তরে ছিল, একথা ডাঃ দত্ত আধুনিক নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে অস্বীকার করতে চান্। তিনি লাউইর মত উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন যে: "মানবজাতি (১) Primitive Communism, তৎপর (২) Family Communism, তৎপর (৩) Individualism—এই ছক্ বাঁধিয়া বিবর্তিত হয় নাই। প্রথমোক্তটি কোথাও হয় নাই, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ইহার সঙ্গে বিজড়িত ছিল বা আছে"। প্রথমত বলা দরকার যে "কমিউনিজম্" সম্বন্ধে বিকৃত ধারণার বশবর্তী হয়ে ডাঃ লাউইর মতন কয়েকজন নৃবিজ্ঞানী "আদিম সাম্যবাদকে" অস্বীকার করেন। ডাঃ দত্ত সেই একই ধারণা থেকেই কি তাঁদের মতামত গ্রহণ করেছেন? ব্যবহার্য জিনিসপত্রের উপরেও ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে না, এমন কথা "কমিউনিজম্" কোনকালেই কল্পনা করেনি এবং সেই জাতীয় মালিকানা থাকলেও তা "কমিউনিজমের" পরিপন্থী হয় না। মূল প্রশ্ন হ'ল উৎপাদন-যন্ত্রের (Tools বা Means of Production) স্বত্বাধিকার নিয়ে। অনেক "পণ্ডিত" এইখানেই "আদিম সাম্যবাদের" স্বরূপ বুঝতে গণ্ডগোল করেছেন, ডাঃ লাউইর মতন ডাঃ ডায়মণ্ডও তাঁর Primitive Law গ্রন্থে একই ভুল করেছেন।১১ লাউই বা ডায়মণ্ড মার্কসবাদী নন, "কমিউনিজম্" সম্বন্ধে

বিকৃত রোমান্টিক কল্পনা তাঁদের থাকতে পারে, কিন্তু ডাঃ দত্তের মতন প্রবীণ মার্কসবাদীর এ ধারণা কোথা থেকে হ'ল ? কমিউনিজম সম্বন্ধে ওয়াওয়ার-ম্যাণ্ডের "এলিসের" ধারণা যদি তাঁর না থাকত তাহ'লে তিনি দেখতে পেতেন যে আধুনিক নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে মানবসমাজের ইতিহাসে "আদিম সাম্যবাদের" স্তর আরও বেশী সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ব্যবহার্য দ্রব্যাদির ব্যক্তিগত মালিকানার সঙ্গে কমিউনিজমের কোন বিরোধ নেই, উৎপাদন-যন্ত্রাদির মালিকানার সঙ্গেই তার বিরোধ। ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে যদি অস্থাবর ও স্থাবর এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়, তাহ'লে আদিম মানবসমাজে প্রধানত চার শ্রেণীর অস্থাবর সম্পত্তি দেখা যায় :

(ক) খাদ্যদ্রব্য
(খ) ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিস
(গ) গৃহের আসবাবপত্র
(ঘ) কৃষির যন্ত্রপাতি

ডাঃ ডায়মণ্ড বলছেন : "Perhaps these four classes become important in the order in which they are stated, from the 1st Hunters to the 3rd Agricultural Grade." ১২ তাহ'লে কৃষিসভ্যতার তৃতীয় পর্বে কর্ষণযন্ত্রপাতির মালিকানার বিকাশ হয়েছে দেখা যায়। এ ছাড়াও আদিম সমাজে অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে "পশু" (Cattle) ও "দাস" (Slave) উল্লেখযোগ্য। এ সম্বন্ধে হবহাউস-হুইলার-জিনস্বার্গ বলেছেন যে শিকারযুগের প্রথম পর্বে দাসদের দেখা যায় না। যুদ্ধবিগ্রহের সূত্রপাত হবার পর শিকারযুগের দ্বিতীয় পর্বে তিনভাগের একভাগ শিকারজীবী কৌমের মধ্যে "দাসের" চলন দেখা যায়। পশুপালন ও কৃষিযুগের প্রথম পর্বেই দাসের অস্তিত্ব ছিল ব'লে মনে হয়, কিন্তু কৃষির তৃতীয় পর্ব থেকেই দাসপ্রথার বিস্তার হতে থাকে। ১৩ তারপর জমির (Land) উপর ব্যক্তিগত মালিকানার সম্বন্ধে ডাঃ ডায়মণ্ড বলেছেন : ১৪

"...looking at the general history of property in land, it is of *first importance* to notice that the extent of communal property in land does not vary from the 1st Hunters up to the 3rd Agricultural Grade, and has throughout a *wider field* than what may be called private property." (Italics লেখকের)

ডাঃ ভারমণ্ড এই প্রসঙ্গে হবহাউস-হুইলার-জিন্স্‌বার্গের Statistics উদ্ধৃত করেছেন পাদটীকায়। এই "সমষ্টিগত সম্পত্তির" প্রকৃত স্বরূপ কি ছিল সে-সম্বন্ধে নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে এখনও যথেষ্ট মতভেদ আছে—অর্থাৎ এই সম্পত্তি "tribe", "sib", বা "family"-র ছিল কিনা, বা এর মধ্যেও কোন ধারাবাহিক বিকাশের চিহ্ন পাওয়া যায় কি না, তা নিয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধান ও আলোচনা আজও হয়নি। কিন্তু তা না হলেও, অস্থাবর সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল ব'লে এবং সমষ্টিগত স্থাবর সম্পত্তি (পশু, দাস ইত্যাদি) কোথাও কৌমগত, কোথাও গোত্রগত ('গোত্র' ক্ল্যান্ বা সিব্ অর্থে), কোথাও পরিবারগত ছিল ব'লে, "আদিম সাম্যবাদ"-রূপ কোন সামাজিক স্তর ইতিহাসে কোনকালে কোথাও ছিল না, এত বড় হঠোক্তি করা বিজ্ঞানের ছাত্রের উচিত নয়। ডাঃ লাউই এমন কথা (অর্থাৎ সাম্যবাদ কোথাও ছিল না) নিজেও বলতে সাহস পাননি। "আদিম সমাজ" গ্রন্থে "সম্পত্তির" আলোচনাপ্রসঙ্গে লাউই মেরুবাসী এস্কিমোদের বিষয় বলেছেন যে, "many of their usages smack of communism" এবং তাদের সুপ্ত ব্যক্তিচেতনার কথা উল্লেখ করেও তিনি মেরুবাসীদের আদিম সমাজকে unusually communistic societies" বলেছেন। ১৫ ডাঃ দত্ত প্রথমত "উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে" চাপিয়ে, বিচ্ছিন্ন উপকরণ থেকে 'জেনারালাইজ' ক'রে, এবং দ্বিতীয়ত 'কমিউনিজম' সম্পর্কে বিকৃত কাল্পনিক ধারণার বশবর্তী হয়ে "আদিম সাম্যবাদকে" বাতিল ক'রে দিয়েছেন। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক গর্ডন চাইল্ডের একটি চমৎকার উক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি : ১৬

Private property in weapons, tools and ornaments used and worn by an individual is *quite compatible* with primitive communism and is recognised among even the simplest savages today...But among such savages the hunting-grounds are generally "owned" by the clan collectively and the proceeds of the chase are usually divided among all members of the group.

Property in *means of production* is in a very different position. To barbarians this means primarily land and livestock....The recognition of proprietary rights, such as that of buying and selling land like a commodity, results from a *slow process in historical time. No archaeological data* that could even serve as a basis for discussion on the ownership of farmland are available till late in the Iron Age. (Italics লেখকের)।

শ্রীডাঙ্গে ও ডাঃ দত্ত

শ্রীডাঙ্গের সমালোচনাপ্রসঙ্গে ডাঃ দত্ত যে দীর্ঘ "গৌরচন্দ্রিকা" করেছেন এতক্ষণ তারই আলোচনা করা হ'ল। ডাঃ দত্তের এই গৌরচন্দ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ উক্তি সম্বন্ধেই আমার সামান্য যা বক্তব্য ছিল তা বলেছি। শ্রীডাঙ্গের গ্রন্থ সম্বন্ধে ডাঃ দত্ত যে সমালোচনা করেছেন তার অধিকাংশই আমি সমর্থন করি, যদিও "আর্য", "গণ", "গোত্র" ও "বিবাহ পদ্ধতি" সম্বন্ধে তাঁর অনেক যুক্তির সঙ্গে আমি একমত নই। শ্রীডাঙ্গের গ্রন্থ পাঠ করলে কনরাড শিড্‌টকে একখানি চিঠিতে লেখা এঙ্গেল্‌স্‌-এর একটি কথা খুব বেশী মনে পড়ে: "The materialist conception of history has a lot of friends whom it serves as an excuse for not studying history." ১৭ শ্রীডাঙ্গের মতন একজন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ মার্ক্সবাদী "ইতিহাস" পাঠ করেন নি, এমন কথা বলা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু তবু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে ভারতীয় "প্রাগিতিহাস" ও "প্রাচীন ইতিহাস" সম্বন্ধে আধুনিক প্রত্নবিদ্‌ ও নৃবিদ্‌দের অনুসন্ধানলব্ধ পর্যাপ্ত উপাদানের কোন সাহায্যই গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি গ্রহণ করেন নি। এই দিক দিয়ে ডাঃ দত্তের সমালোচনা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু ডাঃ দত্ত যে নিজের কথা বলেছেন তাতেও উৎসাহিত হবার মতন বিশেষ কিছু নেই। তিনি তাঁর "ভারতীয় সমাজপদ্ধতি" গ্রন্থে বলেছেন: "ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাস পূর্বে বৈদিক যুগ হইতেই ধরা হইত; এখন মহেন্‌-জো-দাড়োর যুগ হইতে ধরা হয়। কিন্তু বৈদিক সময় হইতে ভারতীয় ইতিহাসের ধারা নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় চলিতেছে। এইজন্য সামাজিক ইতিহাসের মূল উৎস সেই সময় হইতেই ধরিতে হইবে।" ১৮ নৃবিজ্ঞানী ডাঃ দত্ত যদি ভারতের সামাজিক ইতিহাসের "মূল উৎস" বৈদিক যুগেই সন্ধান করেন, তাহ'লে বলতে হয় যে ভারতীয় প্রত্নবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের আধুনিককাল পর্যন্ত সমস্ত অনুসন্ধানই ব্যর্থ হয়েছে। একজন প্রবীণ মার্ক্সবাদী ও নৃবিজ্ঞানী "ভারতীয় সমাজপদ্ধতির" ইতিহাস লিখছেন ১৯৪৫ সালে এবং তার মধ্যে আধুনিক নৃবিজ্ঞান ও প্রত্নবিদ্যার অনুসন্ধানলব্ধ কোন উপকরণ নেই, একথা কল্পনাই করা যায় না। জিজ্ঞাসা করতে পারি কি—ভারতের বিবাহ-পদ্ধতি, গোত্র, গণ ইত্যাদির "মূল উৎস" তিনি কোথায় সন্ধান করবেন? ভারতীয় "হিন্দুধর্ম" বা "জাতিপ্রথার" উৎস কোথায়? যে "পুরোহিতদের" (Priests) সম্বন্ধে ডাঃ দত্ত খুবই ক্রুদ্ধ ও সজাগ, তাদের ইতিহাস কি বৈদিক যুগ থেকেই

শুরু হয়েছে? আদিপ্রস্তরযুগ থেকে সিন্ধুসভ্যতার তাম্রপ্রস্তরযুগ পর্যন্ত এবং সেখান থেকে বৈদিকযুগ পর্যন্ত যে সুদীর্ঘ ইতিহাস সেটা কি "ভারতীয় ইতিহাস" নয়? নৃবিজ্ঞানী ও প্রত্নবিজ্ঞানীদের অক্লান্ত অনুসন্ধানের ফলে তার "নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা" যে আজ প্রমাণিত হয়েছে তা কি ডাঃ দত্ত জানেন না, অথবা জেনেও অস্বীকার করতে চান?.১৯ এইজন্যই তাঁর "ভারতীয় সমাজপদ্ধতি" মার্কসীয় বা বৈজ্ঞানিক ইতিহাস হিসেবে অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছে। মার্ক্স নিজে তাঁর ইতিহাসব্যাখ্যা সম্বন্ধে বলেছিলেন যে তাঁর "পদ্ধতির" প্রধান লক্ষ্য হবে—"Studying each form of evolution separately and then comparing them"—এবং এই পদ্ধতিতে একটি জিনিস সর্বদা বর্জনীয়, সেটি হ'চ্ছে—"the universal passpcrt of a general historico-philosophical theory, whose supreme virtue consists in being super-historical." ২০ ডাঃ দত্ত যেভাবে ভারতীয় সমাজপদ্ধতির ইতিহাস আলোচনা করেছেন তাতে তাঁর তথ্যনিষ্ঠার প্রশংসা করেও বলতে হয় তাঁর "supreme virtue consists in being super-historical." তাঁর ত্রুটির একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। তিনি ভারতীয় "পুরোহিত-তন্ত্র" ও "ব্রাহ্মণদের" আলোচনায় আগাগোড়া মারাত্মক sectarian মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন—ঐতিহাসিক কালবোধ পর্যন্ত তাঁর লুপ্ত হয়ে গেছে। ভারতবর্ষে পুরোহিতশ্রেণীর উদ্ভব বৈদিক যুগের অনেক আগেই হয়েছিল, সিন্ধুসভ্যতার যুগে তো নিশ্চয়ই হয়েছিল। অবশ্য পুরোহিতদের "মূল উৎস" সন্ধান করতে হলে তারও আগে আদিম মানবসমাজের দিকে তাকাতে হয়। সেখানকার "জাদুকর", "শমন", "ওঝা" ইত্যাদি থেকেই কি পরবর্তীকালের পুরোহিতদের বিকাশ হয়নি?২১ নৃবিজ্ঞানী হয়েও ডাঃ দত্ত তাঁর উক্ত গ্রন্থে এবং Studies in Indian Social Polity-র মধ্যেও এসব বিষয় কিছুই আলোচনা করেন নি, বোধহয় প্রয়োজনই অনুভব করেন নি। সুমের ও বাবিলন-সভ্যতার কালে এই পুরোহিতশ্রেণী "learned leisured class"-এ পর্যবসিত হয়েছে, আমাদের সিন্ধুসভ্যতার যুগেও তাই হয়েছিল বা হচ্ছিল বলে মনে হয়। শ্রেণীসভ্যতার বনিয়াদের উপরেই যে এদের বিকাশ হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ইতিহাসের সেই যুগে এই পুরোহিতশ্রেণীর একটা ঐতিহাসিক প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল। অধ্যাপক গর্ডন চাইল্ড এই "ভূমিকা" চমৎকার ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন : ২২

"To them (পুরোহিতশ্রেণী) fell the task of translating the practical activities of ritual into conceptual theologies or mythologies, and the traditional lore of craftsmen, surveyors and architects into theoretical sciences. But their societies were already class societies...This was a new stage in human history. Never before had there been a class dedicated to thinking about the environment undistracted by the constant need of getting a living through physical action on the environment."

আমাদের ভারতবর্ষে সিন্ধুসভ্যতার যুগের পুরোহিতদের "প্রারব্ধ" কাজই ('প্রারব্ধ' এইজন্য বলছি যে এ-যুগের ভাষা আজও decipher করা সম্ভব হয়নি, সুতরাং সেই ভাষায় কি লেখা হয়েছে না-হয়েছে জানা যায়নি) উপনিষদ ব্রাহ্মণ ধর্মশাস্ত্র ও সূত্রযুগে পরিপূর্ণ হয়েছে ব'লে মনে হয়। এই যুগ ভারতীয় ইতিহাসেরও একটা "new stage", যখন ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা practical ritual-কে "conceptual theologies" ও "mythologies"-এ রূপায়িত করেছেন। ভারতীয় সমাজের উৎপাদন-পদ্ধতির স্থিতিশীলতার জন্য ব্রাহ্মণরা এই জ্ঞানসমৃদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করবার সুযোগ পেয়েছেন অনেককাল পর্যন্ত, যখন 'আয়ুর্বেদশাস্ত্র' ও 'শিল্পশাস্ত্রের' মধ্যে তাঁরা কারিগর ও ওস্তাদের "traditional lore"কে "theoretical sciences"-এ রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। ভারতীয় ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের এই ঐতিহাসিক ভূমিকা মার্কসবাদী ডাঃ দত্তের দৃষ্টিগোচর হয়নি, তাই তিনি মন্ত্র শ্লোক ও শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত ক'রে ব্রাহ্মণদের শ্রেণীসুলভ শোষণবৃত্তির ব্যাখ্যা করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। ব্রাহ্মণরা "দান" সম্বন্ধে কোথায় কি বলেছেন, তার মধ্যে শোষণের প্রবৃত্তি কতটা প্রকট হয়ে উঠেছে, সেটা তাৎকালিক সামাজিক ইতিহাসের একটা সামান্য দিক মাত্র, "সমগ্র ইতিহাস" নয়।২৩ ডাঃ দত্তের সঙ্গে হের ড্যুরিং-এর চিন্তাধারার অনেক সাদৃশ্য আছে, সেইজন্য তাঁকে নতুন ক'রে (আগে তিনি অবশ্যই পড়েছেন) আর একবার এঙ্গেলস্-এর Anti-Duhring গ্রন্থ পাঠ করতে অনুরোধ করছি। শ্রীভাদের "কল্পনাপ্রধান" কাহিনী রচনা হয়ত মার্জনীয় অপরাধ, কিন্তু ডাঃ দত্তের এই "হের ড্যুরিং-তুল্য মনোভাব" কি বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্মত? একেই কি মার্কসবাদী ইতিহাসব্যাখ্যা বলে, না মার্কসের ভাষায় "Super-historical method' বলে?

পরিশেষে একটি কথা ব'লে আলোচনা শেষ করব। মার্কসীয় বুদ্ধিজীবী

ও সমালোচকদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধার অভাব সত্যই অত্যন্ত পীড়াদায়ক। ডাঃ দত্ত যে-ভাষায় ও ভঙ্গীতে মার্কসবাদী ও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন তা আমাদের মতন অস্থিরবুদ্ধি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে হয়ত বা আশা করা যায়, কিন্তু তাঁর মতন স্থিতপ্রাজ্ঞ পণ্ডিতের কাছ থেকে কখনই তা আশা করা যায় না। আমাদের ভুলত্রুটি তিনি দেখিয়ে দিন, বুঝিয়ে দিন, তার জন্য ভৎ'সনা করুন, শিক্ষার্থীর মতন আমরা তা মাথা পেতে গ্রহণ করব—কিন্তু কার উপর অভিমান ক'রে তিনি "কাকে" নস্যাৎ করলেন? জানি না, আমাদের নিজেদের মধ্যে, অর্থাৎ মার্কসবাদীদের মধ্যে, অন্তত সংস্কৃতিক্ষেত্রের আলোচনাপ্রসঙ্গে, পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভাব কবে ফিরে আসবে! তা যতদিন না আসবে, আমার বিশ্বাস, ততদিন মার্কসবাদী হিসেবে আমরা ব্যক্তিগতভাবে যে যত বড় "পণ্ডিত" হই না কেন, ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে কোন স্থায়ী অবদান আমরা কিছুই দিতে পারব না এবং দেশের নিষ্ঠাবান পণ্ডিতমণ্ডলী ও শিক্ষিতশ্রেণীর কাছে আমরা সকলেই হাস্যাস্পদ হয়ে থাকব।

---

১ R. H. Lowie : Primitive Society (1949) P. 428.

২ A. C. Haddon : History of Anthropology (1945 e)—pp. 127-129.

৩ Dr. W. H. R. Rivers-এর এই সব প্রবন্ধ ও গ্রন্থ দ্রষ্টব্য : 'A Genealogical Method of Collecting Social & Vital Statistics" (J. A. I, xxx, 1900) ; "On the Origin of the Classificatory System of Relationships" (Anthropological Essays—Tylor Volume, 1907); দু'খানি বিখ্যাত গ্রন্থ "Kinship and Social Organisation" (1914) ও "The History of Melanesian Society" (1914) সংশ্লিষ্ট আলোচনার জন্য ডাঃ রিভার্সের 'Social Organisation' গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়' দ্রষ্টব্য। রেমণ্ড ফার্থের 'We, the Tikopia—a Sociological study of Kinship in Primitive Polynesia' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য, বিশেষ ক'রে 'Kinship'-এর বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থের 'ষষ্ঠদশ অধ্যায়' পঠিতব্য। আমাদের দেশে ডাঃ রিভার্সের অন্যতম ছাত্র অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Head of the Anthropology Dept.') এই পদ্ধতিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানের কাজ করেছেন।

৪ R. H. Lowie : Primitive Society (1949 ed) Chap. VI

৫ Notes and Queries on Anthropology (6th Ed. 195

By a Committee of the Royal Anthropological Institute of Gr. Britain & Ireland—P. 50.

৬ Gordon Childe-এর সম্প্রতি প্রকাশিত Social Evolution (1951) গ্রন্থের 'প্রথম অধ্যায়' দ্রষ্টব্য।

৭ Ibid pp 10-11

৮ J.B.S. Haldane : The Marxist Philosophy and the Sciences (1942 ed) p. 158

৯ এ-সম্বন্ধে বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী E. A. Hooton-এর Up From The Ape (Revised ed. 1946) গ্রন্থের "চতুর্থ ভাগ" "Fossil Ancestors and Collaterals" দ্রষ্টব্য—pp. 277-418.

১০ হলডেনের পূর্বোদ্ধৃত গ্রন্থের "Sociology" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১১ A. S, Diamond : Primitive Law (2nd Ed 1950) : ch XXIV.

১২ Diamond : Primitive Law (1950) : p. 264.

১৩ Hobhouse, Wheeler & Ginsbarg ; The Material Cultures & Tribal Institutions of Simpler peoples—p. 236

১৪ ডায়মণ্ডের পূর্বোদ্ধৃত গ্রন্থ : পৃষ্ঠা ২৭০

১৫ Lowie : Primitive Society (1949 ed) : p. 199.

১৬ Gordon Childe : Social Evolution (1951) : pp. 67-69.

১৭ Selected Correspondence—1846-1895 (1943 ed) : pp. 472-473.

১৮ ভারতীয় সমাজপদ্ধতি : পৃঃ ৫৮

১৯ এই ইতিহাস-আলোচনার জন্য কয়েকখানি গ্রন্থ ও নিবন্ধের উল্লেখ করছি ; (১) De Terra & Paterson : Studies on the Ice Age in India and Associated Human Cultures (1939). (২) V. D. Krishna Swamy : Stone Age Ind ia(Ancient India-3). (৩) S. N. Chakravarti : An outline of the Stone Age in India (J.R.A.S.B.—vol X, 1944) ; (৪) S. Piggott : Prehistoric India (৫) R. E. M: Wheeler : Harappa 1946 (Ancient India-3).

২০ Selected Correspondence : p. 355.

২১ এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা G. Landtman-এর সুবিখ্যাত গ্রন্থ The Origin of the Inequality of the Social classes দ্রষ্টব্য—বিশেষ করে "পুরোহিত-শ্রেণীর ক্রমবিকাশ" সম্বন্ধে এই গ্রন্থের (১৯৩৮ সালের সংস্করণ) অষ্টম থেকে দ্বাদশ অধ্যায় (১১১-২২৬ পৃষ্ঠা) পঠিতব্য।

২২ Gordon-Childe : Social Worlds of Knowledge (Hobhouse Memorial Lecture 1949) pp. 20-21. এ সম্বন্ধে Faankforts, Wilson ও Jacobsen-এর Before Philosophy গ্রন্থ বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

২৩ "ভারতীয় সমাজপদ্ধতি" ও Studies in Indian Social Polity" গ্রন্থে মধ্যে ডাঃ দত্ত মার্কসীয় পদ্ধতিতে ভারতের প্রাচীন যুগের ইতিহাস-ব্যাখ্যার যে চেষ্টা করেছেন তা অখণ্ড ধারাবাহিক ইতিহাস নয়। প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে বা ভারতীয় সমাজ সভ্যতা সংস্কৃতির ক্রমিক বিকাশধারা সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা তাঁর গ্রন্থ পাঠ করলে হয় না। তার কারণ বোধ হয়, তথ্যের উপর তাঁর যথেষ্ট দখল থাকা সত্ত্বেও চিন্তাধারার শৈথিল্য ও অসংলগ্নতার জন্যে তথ্য ও তত্ত্বের কোন সমীকরণ তাঁর কোন গ্রন্থেই হয়নি, এবং তার ফলে ইতিহাসের সমগ্রতার রূপটা ধরা পড়েনি। তা হ'লেও ডাঃ দত্ত নিঃসন্দেহে এই জাতীয় ইতিহাস রচনার একজন অন্যতম পথিকৃৎ এবং একালের মার্কসীয় সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকদের পথপ্রদর্শক। আলোচনার মধ্যে আমি বলেছি যে ডাঃ দত্ত "গণ, গোত্র ও বিবাহ-পদ্ধতি" সম্বন্ধে যা বলেছেন আমার কাছে তা সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয় না। কেন হয় না সে সম্বন্ধে কোন বিস্তারিত আলোচনা এই বিতর্কের মধ্যে করা সম্ভব নয়। তবু এ-সম্বন্ধে অনুসন্ধানীরা সম্প্রতি যে আলোচনা করেছেন তার দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ডাঃ ইরাবতী কার্ভে "জেনিওলজিকাল" পদ্ধতি অনুযায়ী 'মহাভারতের' সমাজ ও পরিবার সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য (Karve : "Kinship Terms and Family Organisation in the Critical Edition of Mahabharata",—Bulletin, Deccan College Research Inst., Vol V, 1943-44)। কারাণ্ডিকারের Hindu Exogamy (1929) এবং ডাঃ কাপাডিয়ার Hindu Kinship (1947) গ্রন্থ এই বিষয়ে অবশ্যপাঠ্য বলে মনে হয়। "জাতি" (Caste) সম্বন্ধে ডাঃ হাটনের Caste in India গ্রন্থ ছাড়া ডাঃ ঘুর্যের সম্প্রতি প্রকাশিত Caste and class in India (1950) উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ক্ষিতীশ-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের History of Indian Social Organisation (J.R.A.S. B. Vol I, 1935) নিবন্ধটিও পড়া উচিত। "বিবাহ-পদ্ধতির" ইতিহাস-প্রসঙ্গে অধ্যাপক এরেনফেল্সের Mother-right in India (Oxford, 1941) গ্রন্থ ছাড়াও এই রচনাগুলি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় :

K. P. Chattopadhyay : Satakarni Succession and Marriage Rules (J.R.A.S.B. vol V 1939)
: Korku marriage customs and Some change (J.R.A.S.B. vol XII No 2, 1946)

M. B. Emeneau : Kinship ane Marriage among the Coorgs (J.R.A.S.B. vol IV, 1938)

অন্যান্য ভারতীয় আদিম জাতির "আত্মীয় সম্বোধন রীতি" ও "বিবাহ-পদ্ধতি" সম্বন্ধেও জানা প্রয়োজন—বিশেষ করে সাঁওতাল, ওরাঁও, মুণ্ডা, হো, শবর, জুয়াং, গারো, খাসি, নাগা, আগারিয়া, বাইগা, গণ্ড, মুরিয়া, চেঞ্চু, টোডা, ও ভেদ্দদের সম্বন্ধে। এগুলি এ বিষয়ের সম্পূর্ণ পাঠ্যতালিকা যে নয় তা বলাই বাহুল্য। বিধ্যাত গ্রন্থের কোন তালিকা দেওয়ার প্রয়োজন নেই বলেই দিলাম না। সাম্প্রতিক অনুসন্ধানের ধারা নির্দেশ করবার জন্যে এইটুকু উল্লেখ করলাম, অবশ্য ডাঃ দত্তের জন্যে নয়, অন্যান্য অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের জন্যে।

পারবে না এদের সঙ্গে

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

সতীনাথ ভাদুড়ী

তৃতীয় দৃশ্য

[শেঠজীর অন্দরমহল। রাত্রি। বই হাতে শেঠজী আয়নাতে বলাটের ছবির সহিত নিজের মুখ মিলাইয়া দেখিতেছেন।]

শেঠজী। যত সব বাজে কথা!

(কেকমল ও শেঠগৃহিণীর প্রবেশ)

কেকমল। রামরাম শেঠজী! কি—বেড়াতে বেরুনোর জন্ম তৈরি হচ্ছেন নাকি?

শেঠজী। (চমকিয়া, বই ফেলিয়া) না না, তোমারই জন্ম অপেক্ষা করছিলাম। আজ আমার বেড়াতে যাবার দিনই বটে! জয় গণেশ!

শেঠগৃহিণী। দেখ, বাজে কথা ব'ল না। আমার কেকুকে ভালমানুষ পেয়ে যা তা বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা ক'র না। শালার জন্ম অপেক্ষা করতে হলে কি আয়নার সমুখে দাঁড়িয়ে পাঁচ ঘণ্টা ধরে সাজগোজ করতে হয়?

কেকমল। দিদি, কী তুমি এখন এসব আরম্ভ করলে! বিরজু গেল কোথায়?

শেঠগৃহিণী। তার কি আজ নাওয়া-খাওয়ার সময় আছে! কখনও উকিলের বাড়ি, কখনও খবরের কাগজওয়ালার বাড়ি—সারাদিন পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই তো খানিক আগে বাপবেটায় সলাপরামর্শ হ'ল; ছেলেকে পাঠানো হ'ল সেই হতভাগা কাণীটার কাছে।

কেকমল। কোন্ কাণী?

শেঠগৃহিণী। কাণী আবার কটা আছে! ঐ যে লক্ষ্মীছাড়াটা, গদির লোকদের আচার না বড়ি খাওয়ানোর কথাটা, অন্ম ভাবে নিয়ে, বিরজুর বাপের কাছে চুকলি খেয়েছিল আমার নামে।

কেকমল। সেই কাণীর কাছে আবার কি?

শেঠজী। বিরজুকে পাঠালাম খোঁজ নিতে, যে কাণীকে খুশী করলে, সে এই বইখানা আর ছাপা বন্ধ করতে পারে কিনা।

কেকমল। সে গুড়ে বালি। সে সব খোঁজ কি আর আমি নিইনি—সকালে যখন বইয়ের দোকানে গিয়েছিলাম? গলির মধ্যে এতটুকুনি তো ঘর; তার আবার কি লম্বা লম্বা কথা! বললে যে এ বইয়ের হিন্দী সংস্করণ বার হবে শীগ্‌গিরই। বাংলার নতুন সংস্করণ হয়তো কাল থেকেই ছাপা আরম্ভ হয়ে যাবে। 'হাটে-হাঁড়ি' সিরিজের আরও অনেক বই বার হবে—সব বড় লোকের কেচ্ছা। সেগুলোর মালমশলা যোগাড়ের জন্ত লোক লাগানো হয়ে গিয়েছে। প্রমাণ হাতে রেখে তবে এরা বই লেখে।

শেঠজী। আমার নামে যা কিছু লিখেছে সব কথার প্রমাণ আছে তাদের কাছে?

কেকমল। তাই তো আমার ধারণা।

শেঠজী। তবে উপায়?

শেঠগৃহিণী। ও মুনাফা ঠাকুর! একবার মুখ তুলে চাও, বিরজুর বাপের এই বিপদের সময়!

কেকমল। উপায় আর কি—আইন-আদালত না করে হজম করে যাওয়া; পারলে পর প্রকাশকের কারবারটাকেই কিনে নিয়ে, দোকানটাতে তালা দিয়ে দেওয়া; আর তারা রাজী না হ'লে, যতবার আপনার কেচ্ছার বই ছাপবে, কিনে কিনে পুড়িয়ে ফেলা।

শেঠজী। তাহ'লে যে রাবণের চুলো কখনও নিভবে না। সে যে অনেক টাকার ব্যাপার।

কেকমল। ছাপা বদনামটুকুকে কিনে ফেলতে হলে, ন্যায্য দাম দিতে হবে বই কি।

শেঠগৃহিণী। হ্যারে কেকনা। তুইও সেই হতচ্ছাড়া কাগীটার দিকেই নাকি রে?

শেঠজী। দেখ দেখ, তুমিই দেখ। নাম কেনবার জন্যই বলে একটা পয়সা খরচ করলাম না জীবনে, আজ পর্যন্ত! এ তুমি কী রাস্তা আমাকে বাতলাচ্ছ কেকমল? একবার না হয় বিরজু বৌকের মাথায় আজকে বইগুলোকে কিনে ফেলতে বলেছিল তোমাকে। কিন্তু বারবার কি তা সম্ভব? সরকারী ট্যাক্সের মতো বছর বছর সেই কাগীটাকে ট্যাক্স গুনতে হবে! বিরজুর মা, তুমিই বল, তা কি হয়?

শেঠগৃহিণী। কেকন! আমার বাপের বংশের লোক হয়ে তুই বইয়ের পেছনে এত খরচের মাত্রা বাড়ালি! আর হেঁট করাস না আমার মাথা!

কেকমল। শেঠজী, আমি যা ভাল বুঝলাম, বললাম। ইচ্ছা হয় করবেন, না করতে ইচ্ছা হয় করবেন না। শেষকালে যেন না বলেন যে আত্মীয়স্বজন থাকতে, তারা আপনাকে সুপরামর্শ দেয়নি।

শেঠজী। তোমরা তো পরামর্শ দিয়েই খালাস; কিন্তু তার ম্যাও সামলায় কে? আজ বইয়ের দরুন খরচ হল কত?

কেকমল। ছ' হাজার সাতশ আটত্রিশ টাকা সাড়ে ন আনা।

শেঠগৃহিণী। বলিস কি! ও যে একশ মণ লেবুজারার দাম রে!

কেকমল। বলিস কি মানে? একেবারে আকাশ থেকে পড়লে যে! তুমি কি ভেবেছিলে যে ঐ বইগুলো পয়সায় তিনখানা করে পাওয়া যায়? একেবারে কড়ায় ক্রান্তিতে হিসেব করা আছে আমার। ষোলশ আটানব্বই খানা বই, ছ' টাকা দরে। কত হয়? কুড়ি টাকা ট্রাক ভাড়া; ছ' টাকা সাড়ে ন আনা কুলি; পাইকারী রেটে কেনা বলে অবিশ্যি কমিশন পাওয়া গিয়েছে, শতকরা কুড়ি টাকা করে। হিসেব করে নাও এখন, সব মিলিয়ে কত হ'ল।

শেঠগৃহিণী। তা হ'লে তো দেখছি সত্যিই অনেক!

শেঠজী। তুমি বলছ পাইকারী রেটে বই নিলে কুড়ি টাকা কমিশন। আমি যে আজকে সব প্রকাশকের কাছে ফোনে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সব্বাই বললে যে বেশী টাকার বই নিলে পঁচিশ টাকা করেও কমিশন দিতে পারে।

কেকমল। ধেৎ! কিসে আর কিসে! ও রেট হ'ল যে সব বই বিক্রি হয় না তার। আর এ হচ্ছে আপনার কেচ্ছার বই! কী বিক্রি! পড়তে পাচ্ছে না! পড়তে পাচ্ছে না! বইয়ের দাম ছ' টাকা হলে কি হয়, কাল থেকে এ বই চার টাকা করে বিক্রি হবে। আছেন কোথায় আপনি? ইন্দ্রাণী পাবলিশার্সের লোকরা ঘাস খায় না যে এই বইয়ে পঁচিশ টাকা করে কমিশন দেবে!

শেঠজী। চার টাকা করে দাম হবে কাল থেকে? যাক, যাক,—জয় গণেশ, জয় গণেশ! কিন্তু আমি তো আর ইন্দ্রাণী পাবলিশার্সের একদিনের

খদ্দের নই। আমি যে সারা জীবনের বাঁধা খদ্দের হয়ে থাকলাম। যাই বল বাপু, বিশ টাকা কমিশন আমার কাছে বড় কম মনে হচ্ছে।

কেবল। আচ্ছা, বারো পোলি! যেতে দাও! একশ টাকা কমই দিও। আমি না হয় বুঝবো যে আমার ভগ্নীপতির জন্ম শতকরা পাঁচ টাকা করে আমি ঘর থেকে দণ্ড দিয়েছি।

শেঠজী। (হাসিয়া চোখ টিপিয়া) শালা!

শেঠগৃহিণী। তোমরা তো শালা-ভগ্নীপতিতে মিলে বেশ রঙতামাসা করছ; কিন্তু আমার যাঁতার ঘর যে স্তূপাকার-করা বইয়ে জোড়া থাকল, তার কি হবে? এই বাঁদীর হাতে ভাঙা আটার রুটি না খেলে এদিকে তো একদিনও কারো মুখে রোচে না! খেয়ো এবার থেকে দোকানের কেনা আটা!

কেবল। না না, রোজ রোজ বিশ-ত্রিশখানা করে বই পুড়িয়ে ফেলতে আরম্ভ কর। কদিন আর লাগবে এগুলো শেষ হতে।

শেঠজী। সে তো আমি দুপুরেই বলে দিয়েছি।

শেঠগৃহিণী। কি বলাই বলেছ! চালাও হকুম হয়ে গেল যে আজ থেকে রান্নাঘরের উনুনে কাঠের বদলে বই জ্বালাতে হবে! তুইই বল কেবল, বইয়ের আগুনে কখনও রাঁধা যায়? কাগজ-পোড়ানো আঁচে ছোট ছেলের দুধ গরম করা চলে; কিন্তু তা দিয়ে কি কখনও ডাল গলে?

কেবল। সত্যি শেঠজী, এ আপনার অন্যায়। বই পোড়ানোর জন্ম বরঞ্চ রান্নাঘরের জ্বালানী কাঠের বরাদ্দ আরও বাড়িয়ে দেওয়া উচিত।

শেঠজী। (ভেংচাইয়া) বাড়িয়ে দেওয়া উচিত! খরচটা লাগবে কার— তোমার না আমার? দু' টাকা করে বই কিনে, আবার সেগুলো পোড়ানোর পেছনে পাঁচ টাকা খরচ! যেমন বোন, তেমনি তার ভাই!

শেঠগৃহিণী। কেবল, কেন তুই কথা বলতে যাস এ বাড়ির লোকের সঙ্গে! এরা কি ভদ্রতা জানে, না কোনদিন ভদ্রসমাজে মিশেছে? সেই যবে থেকে এ মানুষের ঘর করতে এসেছি, একেবারে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেলাম! মরণও আমার হয় না রে।...

শেঠজী। এই আরম্ভ হ'ল নাকি কান্না। ভোটে যখন হেরেছি তখন আমি তোমাদের কথা মানতে বাধ্য। রান্নার জন্ম জ্বালানী কাঠ যেমন পাচ্ছিলে তেমনিই পাবে। এইবার হ'লতো? কিন্তু বই পোড়ানোর জন্ম আলাদা

আজামী আমি কিছুতেই দিচ্ছি না। সব জিনিসেরই একটা ন্যায্য অন্যায্য আছে তো। যাই, আমি একবার চট করে গদি থেকে তোমার টাকাটা নিয়ে আসি, ফেকমল। সেখানে টিকমচাঁদকে বসিয়ে রেখে এসেছি।

ফেকমল। তার এখনই কি দরকার ছিল। আমার পাওনা পরে যখন হোক, দিয়ে দিলেই তো হত। বাড়ির লোকের সঙ্গে আবার—

শেঠজী। না না, এসব ব্যাপারে নগদনারায়ণ হয়ে যাওয়াই ভাল। জয় গণেশ। জয় গণেশ।

(শেঠজীর প্রস্থান)

শেঠগৃহিণী। ভাখ্ ফেকনা, তুই নিজেকে বড্ডো বেশী চালাক মনে করিস। না ? তুই চলিস ডালে ডালে তো আমি চলি পাতায় পাতায়।

ফেকমল। কেন ? কী আবার করলাম আমি ?

শেঠগৃহিণী। আবার বাপের বংশের মাথা হেঁট হবে বলে বিরজুর বাপের সমুখে কথাটা আমি বলিনি।

ফেকমল। আমি হেঁট করাবো ? তোমার বাপের বংশের মাথা ?

শেঠগৃহিণী। হ্যাঁ গো হ্যাঁ। তুমি না তো কি আমি ? তুই বিরজুর বাপের কাছে হিসেব দিলি বোলশ আটানব্বই খানা বই কিনেছিস। তুই কি মনে করেছিস আমি বইগুলো না গুনেই উনুনে ফেলে দেব ? কি রে, উনুনের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকলি কেন ? কথা বল্।

ফেকমল। তোমার দুটি পায়ে পড়ি দিদি। তুমি শেঠজীকে একথা বলে দিও না। দশ আনা ছ আনা বখরা থাকল।

শেঠগৃহিণী। তুই দশ আনা ? আর আমি ছ আনা ? এ আর বিরজুর বাপ পাসনি, বুঝেছিস।

ফেকমল। কেন ? রেট খারাপ কি হ'ল ?

শেঠগৃহিণী। (রাগত স্বরে) ভাখ্ ফেকনা। ফের যদি—

ফেকমল। আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। আধাআধি বখরা থাকল। আর দর-কষাকষি করতে পারবে না বলে দিচ্ছি।

শেঠগৃহিণী। আচ্ছা নে, তাই যেন হল। কত টাকা হবে ? তেরশ দশখানা বই আমাদের বাড়িতে পৌঁছেচে।

ফেকমল। একেবারে গুনেগেঁথে তয়ের। সে আমি হিসেব করে দিয়ে দেবখন।

শেঠগৃহিণী। তোর ধর্ম তোর কাছে। বেশিস মেয়েমানুষ পেয়ে ঠকাসনি যেন।

কেকমল। তোমাকে ঠকিয়ে, সেই পয়সা হজম করতে পারবে, এমন লোক ভূভারতে জন্মায়নি। দু'টাকা করে বইয়ের দাম ; বই পিছু এক টাকা করে তোমার পেলেই তো হল।

শেঠগৃহিণী। এক টাকা করে? তবে যে তুই বিরজুর বাপের কাছে বললি দুটাকার বই চার টাকায় পড়তে পাবে না। চারের অর্ধেক হল এক? না হয় তোর মত খাতা লিখতেই শিখিনি, কিন্তু তাই বলে চারের অর্ধেক কত হয় এটাও কি জানি না?

কেকমল। বাগে পেয়ে বেশ মোচড় দিচ্ছ দেখছি। শেঠজীর কাছে আমি যত কথা বলেছি সব কথাই সত্যি নাকি?

শেঠগৃহিণী। তাখ্ কেকনা। ভদ্র লোকের এক কথা। নিজে মুখে তুই বলেছিস মুনাফার আধাআধি বখরার কথা। এমনি করে যদি তুই মুহূর্তের মধ্যে কথা পালটাস, তাহলে বাজারে কেকমলের দেওয়া হুণ্ডি পুছবে কে?

কেকমল। এই বয়সে আর দিদি তোমার কাছ থেকে ব্যবসা শিখতে পারি না। তোমাকে এক টাকার এক পয়সা বেশী দিতে পারবো না। তা হ'লে আমার কিছু থাকে না। সকাল থেকে বইগুলোর জন্য এত যে ছুটোছুটি করলাম, সে সব কি মাগনা?

শেঠগৃহিণী। বাবারে বাবা! কি ছেলেই তুই হয়েছিস কেকন। একবার যে গোঁ ধরবে, তার জি আর একটুও নড়চড় হওয়ার জো আছে। ছোটবেলা থেকে সেই একই রকম জিদী থেকে গেলি। যাক, তোর কথাই থাকলো শেষ পর্যন্ত। (গলা নামাইয়া) তোকে কিন্তু আমি আর একটা রোজগারের রাস্তা বাতলাতে পারি।

কেকমল। খুব গোলমেলে নাকি?

শেঠগৃহিণী। না। শীতকালে একেবারে জলের মতো সোজা।

কেকমল। শীগ্‌গির। আবার শেঠজী হয়তো এসে পড়বে এখনই।

শেঠগৃহিণী। বলছিলাম কি, ওঁর ঘরের ঐ বইগুলোকে উনুনে না ফেলে খানকয়েক খানকয়েক করে রোজ বেচলে হয় না?

কেকমল। মাইরি বলছি দিদি, তুমি যদি বেটাছেলে হতে, তাহ'লে লাট-

সাহেব কেন, ইনকাম ট্যাক্সের হাকিম পর্যন্ত হতে পারতে।—কিন্তু দিদি, যদি ধরা পড়ি…

শেঠগৃহিণী। ধরা পড়বি কেন ?

কেকমল। ধরা পড়লে কিন্তু কেলেঙ্কারির একশেষ হবে।

শেঠগৃহিণী। ছেলেমানুষি করিস না। আলোয়ানের মধ্যে খানকয়েক করে বই রোজ রাতে নিয়ে যাওয়া আবার একটা শক্ত কাজ নাকি ? (কুলুঙ্গীতে গণেশের পিছনের স্তূপীকৃত ফুল সরাইয়া বই বাহির করিলেন) এই নে, সাতখানা বই। পেন্নাম গণেশজী ; পেন্নাম মুনাফাঠাকুর। কেকনের উপর দিষ্টি রেখো। ও নেহাত ছেলেমানুষ। ওর চুলে পাক ধরেছে রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে—তুমি তো ঠাকুর সব জানই।

কেকমল। তোমার হাতযশই আমার ভরসা, দিদি। শুধু বইগুলোকে একবার ঐ মুনাফাঠাকুরে ঠেকিয়ে দাও।—হ্যাঁ—ব্যস। দাও এইবার। বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না তো ? এই ডান হাতের দিকটা একটু আড়ষ্ট আড়ষ্ট লাগছে নাকি দেখতে ?

শেঠগৃহিণী। না না। একেবারে ভয়েই আড়ষ্ট। আমাদের বংশের নাম হাসালি তুই। ছেলেবেলায় ঠাকুরদাকে দেখেছি, দাঁড়িপাল্লা দিয়ে বাজরা ওজন করবার সময়, খদ্দেরের চোখের সমুখে এমন হাতের কেরামতি দেখাতেন, যে সেরে পোয়া সাফ। তুই তখন বোধহয় জন্মাসওনি। তোর মনে না থাকবারও কথা। কিন্তু বাবা যখন শুটগুটিয়াদের গদিতে চাকরি করতেন বছরে বাহাত্তর টাকা মাইনেতে, সে সময়ের কথা তো নিশ্চয়ই মনে আছে ?

কেকমল। তা আর থাকবে না ? খুব মনে আছে।

শেঠগৃহিণী। সে সময় আটা আর ডাল কোনোদিন কিনে খেতে হয়েছে আমাদের ? গ্রীষ্মকালেও নয়। সেই ছেগমলের নাতি, সেথমলের ছেলে তুই। গায়ে আলোয়ান থাকতেও তুই পাবি ভয়। লজ্জায় মরে যাই !

কেকমল। তুমি তো লজ্জায় মরে যাচ্ছ দিদি, কিন্তু আমার যে বুক দুরদুর করছে ভয়ে। লেখমলকে তো আলোয়ানের নীচে লুকিয়ে ছাপা হরফ দিতে হয়নি কোনদিন। দোহাই দিদি, আজকে বইগুলো রেখে দাও। কাল ওভারকোট পরে আসব। তার ভিতরে গোটাকয়েক বেস্পকেট

কালই তয়ের করিয়ে নেব। আজকে ছেড়ে দাও দিদি; তোমার দুটি পায়ে পড়ি।

শেঠগৃহিণী। বৌমার দাইটা আবার বোধহয় নীচে ঝগড়া বাধিয়েছে। একেবারে জ্বালিয়ে খেল দাইটা। ক্ষেকন! তোকে এবার কিন্তু আমি খুব বকবো বলে দিচ্ছি! তুই পাগল না খেপা! তোর আলোয়ানটা কি কাচের, যে তার ভিতর দিয়ে দেখা যাবে? গণেশজীর আর মুনাফা-ঠাকুরের নাম নে। তা হ'লেই বিরজুর বাপের শকুন চোখ এড়াতে পারবি।

ক্ষেকমল। দিদি, গণেশজীতে শানাবে না, এ মা-সরস্বতীর ডিপার্টমেন্টের জিনিস।—ও কি! বিরজু! টিকমচাঁদ —

(বিরিজলাল টিকমচাঁদকে হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে ঘরের ভিতর লইয়া আসিল)

বিরিজলাল। (টিকমচাঁদকে) চোর কোথাকার! আজ তোর আমি মেরে হাড় গুঁড়ো করব! জুতিয়ে সোজা করব! চাবকে পিঠের চামড়া তুলে নেব! ভেবেছিস কি?

শেঠগৃহিণী। কিরে? হয়েছে কি বিরজু?

বিরিজলাল। আমার মুণ্ডু আর মাথা! যত সব চোরের আড্ডা হয়েছে আমাদের গদিটা। বাবা কোথায়?

ক্ষেকমল। (ভয়ে) জয় গণেশ! জয় গণেশ!

শেঠগৃহিণী। তোর বাবা এখানেই তো ছিল। এই তো এখনই গেল গদিতে।

বিরিজলাল। গদিতে? কই গদিতে নেই তো। গদি হয়েই তো আমি আসছি।

শেঠগৃহিণী। তবে কি আজও আতর মেখে বেরুল নাকি? ধন্যি মানুষ তোর বাপ। তা টিকমচাঁদকে ধরে আনলি কেন?

বিরিজলাল। আনলাম, এই ভিজে বেড়ালটাকে আজ বাবার সমুখে পিটিয়ে চিট করব বলে। দরজা দিয়ে ঢুকতেই দেখি এই ধর্মপুত্তুরের বাচ্চা, আলোয়ানের নীচে লুকিয়ে খানকয়েক বই নিয়ে বার হচ্ছেন। নাই দিয়ে দিয়ে এটার মাথা খাওয়া হয়েছে। আজ বাবার সমুখে তাঁর এই পেয়ারের পায়রাটার হাড় আর মাস আমি আলাদা করব।

ক্ষেকমল। জয় গণেশ! জয় গণেশ!

বিরিজলাল। যতক্ষণ বাবা না ফেরেন, ততক্ষণ এটাকে ঐ খাটের পায়ার সঙ্গে বেঁধে রেখে দেব। মা, আমার ঘর থেকে চাবুকখান নিয়ে এস তো।

ফেকমল। জয় গণেশ! জয় গণেশ!

শেঠগৃহিণী। তুই পাগল হলি নাকি বিরজু? তোর বাবাকে ফিরতে দে। তাঁর সঙ্গে সলা-পরামর্শ করে তারপর টিকমচাঁদকে মার, ধর, তাড়িয়ে দে, ছাড়িয়ে দে, যা ইচ্ছে হয় করিস। ফেকন, তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন, এদের পদির ব্যাপারের মধ্যে? বাড়ি যা। যা করবার এরা বাপ-বেটায় বুঝে নেবেখন।

বিরিজলাল। না, না, যেয়ো না মামা। তুমি চুপ কর মা। বললাম ও ঘর থেকে চাবুকখানা এনে দিতে, সে বেলায় পারলে না; লম্বা লম্বা লেকচার দেওয়া হচ্ছে। আনতে হবে না চাবুক। হাত কি আমার নেই? (টিকমচাঁদকে এক চড় মারিয়া) এক চড় মারলে, আর এক চড় রাখবার জায়গা নেই গালে, এসেছে চুরি করতে।

ফেকমল। জয় সরস্বতী! জয় সরস্বতী!

টিকমচাঁদ। দোহাই ছোটমালিক। আর এক গালে মারবার আগে, এক মিনিট সবুর করুন। আমি শেঠজীকে ডাকি।

বিরিজলাল। তোমাকে আমি এক পা-ও নড়তে দেব না এখান থেকে।

টিকমচাঁদ। না, না, এখান থেকেই ডাকব। শেঠজী! শেঠজী! ও শেঠজী! শীগ্‌গির আসুন, এরা যে আমায় মেরে ফেললে। খুড়োর শেঠজী!

(নীচে থেকে শেঠজীর গলা শোনা গেল "আসছি")

শেঠগৃহিণী। তোর বাবা তো দেখছি বেরয়নি।

বিরিজলাল। বাবা-কাবা আমি মানছি না। এ বেটাকে আজ আমি শায়েস্তা করে ছাড়ব।

টিকমচাঁদ। ও শেঠজী! আর কত দেরি করবেন!

(শেঠজীর প্রবেশ)

শেঠজী। ব্যাপার কি? একেবারে শোরগোল পড়ে গিয়েছে বাড়িতে।

বিরিজলাল। দেখুন আপনার বিশ্বাসী আমলার কাণ্ড। এক বোঝা বই নিয়ে পালানো হচ্ছিল।

শেঠজী। বই! ঐ আজকের কেনা বইগুলো? তা আমার বদনামের বোঝা চুরি করে ও করবে কি?

বিরিজলাল। করবে আবার কি—চড়া দামে বিক্রি করবে। আপনি তো আর বইয়ের বাজারের খবর রাখেন না। এখনই দেখে এলাম এ বইয়ের দর চার টাকা উঠেছে।

শেঠজী। বল কি!

শেঠগৃহিণী। সত্যি?

বিরিজলাল। আমি কি নিজের চোখে না দেখেই বলছি? (টিকমচাঁদের কান ধরিয়া) মহাপ্রভু টিকমচাঁদ, আপনি এই বইয়ের দরের খবর পেলেন কি করে বলুন তো।

টিকমচাঁদ। (চটিয়া) শেঠজী, অনেকক্ষণ ধরে মুখ বুঁজে আমি ছোটমালিকের গালমন্দ সহ করছি, শুধু আপনার নিমকের দাম দেওয়ার জন্য। কিন্তু ছিয়াশি টাকা মাইনের মধ্যে তো চড়, কানমলা খাওয়ার শর্ত ছিল না।

শেঠজী। সে তুমি কিছু ভেবো না টিকমচাঁদ। বছরে বারো টাকা করে মাইনে বাড়িয়ে দেব, এবার থেকে। দুঃখ ক'র না তুমি। আর তোমার কিছু বলতে হবে না।

বিরিজলাল। মাইনে বাড়াবেন? এই চোরটার? এটাকে আমি মেরে তাড়াবো গদি থেকে। গদিতে কি আমার অংশ নেই?

শেঠগৃহিণী। এও কি ছিল আমার কপালে! ও মা আমার কি হবে গো। বৌ কানে মন্তর দিয়ে দিয়ে আমার সংসার ভাঙলে গো!

বিরিজলাল। চুপ কর বলছি মা। হতভাগার মাইনে আমি বাড়াচ্ছি!

(পায়ের জুতা খুলিয়া হাতে লইতেই)

টিকমচাঁদ। (চীৎকার করিয়া) ওরে বাবারে! আর আমি চাপতে পারব না। যতই আমার মাইনে বাড়ান শেঠজী, আর আমি সত্যি কথা চাপতে পারব না রে!

শেঠজী। চেঁচামেচি ক'র না বলছি টিকমচাঁদ!

টিকমচাঁদ। এখন না চেঁচালে আর চেঁচানোর সময় পাব না রে! শুনুন ছোটমালিক,—

শেঠজী। টিকমচাঁদ!

টিকমচাঁদ। (কাঁদিতে কাঁদিতে) প্রাণ দিতে পারব না রে! আমার কোনও

কসুর নেই ছোটমালিক। শেঠজী আমায় ঐ বইগুলো দিয়েছিলেন ভাঁড়ার ঘর থেকে। বাজারে বিক্রি করবার জন্ম। রোজ বলছিলেন খানকয়েক করে করে দেবেন। আপনাকে আসতে দেখে উনি ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে থেকে গিয়েছিলেন।

শেঠগৃহিণী। তাই বলো! পেটে পেটে এত!

শেঠজী। কেন? নিজের বাড়ির ভাঁড়াঘরে যেতে হলে, আমায় টিকিট কিনে ঢুকতে হবে নাকি?

শেঠগৃহিণী। আমি জিজ্ঞাসা করি, তুমি ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে এতক্ষণ করছিলে কি?

শেঠজী। বই গুনছিলাম।

কেকমল। (ভীতভাবে) জয় গণেশ! জয় গণেশ!

বিরিজলাল। টিকমচাঁদজী, আপনি এখন বাড়ি যান। আপনার অনেক রাত হয়ে গেল।

টিকমচাঁদ। হ্যাঁ, যাই এইবার। নমস্তে। নমস্তে। রামরাম!

(টিকমচাঁদের প্রস্থান)

শেঠগৃহিণী। কেকনা, তোরও তো রাত হ'ল; তুইও এখন বাড়ি যা না।

বিরিজলাল। না না মামা, যেয়ো না—দরকারী কথা আছে তোমার সঙ্গে।

কেকমল। জয় গণেশ! জয় গণেশ!

বিরিজলাল। (শেঠজীকে) আপনার কি বুদ্ধি, বাবা। বইয়ের ব্যবসা করবেন, তার মধ্যে এত হ্যাচড়ামো কেন? বড়ভাবে ভাবুন, ফলাও কারবার করুন, তা নয় ভাঁড়ার ঘরে লুকিয়ে, অন্ধকারে সাতখানা বই চালান দেওয়া। আমি তো আজ দুপুরেই মন ঠিক করে ফেলেছি। তখনই উকিলের বাড়ি হয়ে, গিয়েছিলাম ইন্দ্রাণী পাবলিশার্সের কাছে, তাদের দোকানটা কততে কেনা যায় দেখতে।

কেকমল। সে তো আমিও গিয়েছিলাম সকালে।

বিরিজলাল। তুমি আর ব'ল না মামা। তুমি গিয়েছিলে দোকানটা কিনে তালা দিয়ে রাখবার জন্ম। আমি গিয়েছিলাম ব্যবসাটা কিনে, আরও বড়ভাবে চালানোর জন্ম।

শেঠজী। তোরা হলি আজকালকার ছেলে। আমরা সেকেলে লোক, তোদের মতো করে ভাবতে পারব কেন! কত দাম বললে?

বিরিজলাল। পঁচিশ হাজার।

শেঠজী। পঁচিশ হাজার !

বিরিজলাল। হ্যাঁ। তাছাড়া হাজার তিরিশেক টাকা দিয়ে আর একটা প্রেস কিনতে হবে। আরও কিছু লেখাপড়া-জানা লোকজন রাখতে হবে, 'হাটে হাঁড়ি' সিরিজের বই মাসে একখান করে বার করবার জন্য—ইংরিজী, হিন্দী, বাংলায়। আইন বাঁচিয়ে লেখাতে হবে বইগুলো। সব বড়লোকের কেচ্ছা থাকবে তাতে। এখন লাখ দুয়েক টাকা ঢালতে হবে। এক কেবল আমাদের গদির কেচ্ছার বইখানা থেকেই, আমি মোচে তা দিয়ে সেই দুলাখ টাকা তুলে নেব।

শেঠজী। অত টাকা ঢালবি নতুন ব্যবসাতে ?'

বিরিজলাল। আপনি আর পুতুপুতু করবেন না।

শেঠজী। তাহলে এক কাজ কর। মাদ্রাজের চামড়ার কারবারটা, আর কুমায়ুনের মদের কারবারটা থেকে টাকা তুলে এটাতে ঢাল।

শেঠগৃহিণী। হাঁ, হাঁ, যে কারবার দুটো তোর নিজের নামে আছে সেই দুটো থেকে।

শেঠজী। আঃ !—তুমি মেয়েমানুষ। তোমার এসবের মধ্যে কথা বলবার দরকার কি ?

শেঠগৃহিণী। ভাল কথা বলতে গেলাম কিনা ! হয়ে গেল দোষ। চল কেকনা, আমরা চলে যাই—আমরা হলাম বাইরের লোক।

বিরিজলাল। না না। মামা, তুমি যদি কিছু টাকা দাও, তাহলে বইয়ের কারবারটায় তোমাকেও অংশীদার করে নিতে পারি।

কেকমল। আগে ভেবে দেখি ভাল করে।

বিরিজলাল। যা ভাবাভাবি, আজকে রাতের মধ্যেই সেরে ফেল। নইলে নিজেই পস্তাবে। ভেবো না যে আমার টাকায় টান পড়েছে। হুগলি-গঞ্জের দেশলাইয়ের কারখানা থেকে আয় হয় মোটে শতকরা সাত টাকা। আমি তো ভেবে রেখেছি, সে কারখানা তুলে দিয়ে সেই পুঁজি এখানে এনে ঢালবো। চিরকাল তুমি দাঁড়িপাল্লার কারবার করলে ; ছাপার অক্ষরের কারবারে পয়সার সঙ্গে সঙ্গে, ইজ্জত যে কতগুণ বাড়বে সেটা তো বুঝছ না।

শেঠগৃহিণী। হাসালি কেকনা তুই। লেখমলের ছেলে হয়ে তুই লেখাপড়ার

ব্যবসাতে ভয় পাচ্ছিস ? তবে নে না কেন, যে এটা ছাপালেখার কারবার নয়, বদনাম বিক্রির কারবার।

শেঠজী। (হাসিয়া) ছেগমলের নাতি হয়ে, তুমি শালা বদনামে ভয় পাও!

শেঠগৃহিণী। কেকন, আমার বাপের বংশকে নিয়ে বিরজুর বাপ ঠাট্টা করলে না কি রে ? মুখে রা কাটছিস না কেন ?

শেঠজী। ঠাট্টা কেন হতে যাবে; আমি তো সুখ্যাত করলাম।

শেঠগৃহিণী। না, তুমি হাসলে কিনা; তাই ভাবলাম বুঝি আমার বাপের বংশকে ঠেস দিয়ে কথা বলা হ'ল। নিন্দে করলেই বা করছি কি।

বিরিজলাল। মা, তুমি চুপ কর। কাজের কথা হতে দাও এখন।

শেঠজী। বিরজু, কাশীটার সঙ্গে বইয়ের দোকানে দেখা হয়েছিল তো ?

বিরিজলাল। হ্যাঁ।

শেঠজী। ওটাকে নতুন কারবারের ম্যানেজার করে দিলে হব না ? এই লেখাহরকের ব্যবসাতে প্যান্টালুন-পরা, চা-খোর লোকদেরই দরকার! কাশীটাকে হাতে রাখতেই হবে।

বিরিজলাল। সে আর আমাকে বলতে হবে না। আমি তাকে কাল সকালে এখানে চা খাওয়ার নেমন্তন্ন পর্যন্ত করে এসেছি।

শেঠগৃহিণী। বাড়িতে ? ঐ মাছখোর লোকটাকে ?

শেঠজী। ঝগড়া করে গিয়েছিল। তার মাইনে বাড়িয়ে দাও যাতে সে হাফপ্যান্টের জায়গায়, ফুলপ্যান্ট পরতে পারে, ফরাসের বদলে চেয়ারে বসতে পারে। বাড়িতে এনে খাওয়ানোর দরকার কি ? হোটেলে খাওয়াও না কেন তুমি তাকে!

বিরিজলাল। বাড়িতে এনে না খাওয়ালে, পর পর ভাবটা কাটে না। আমি আমার নিজের ঘরে চা-খাবার তয়ের করিয়ে খাওয়াব, তাতে আপনাদের আপত্তি করবার কি আছে ? আমার এ বাড়িতে কোনও অংশ নেই ?

শেঠগৃহিণী। এই ভাখো বৌয়ের ফুসলানি! থাকগে থাকগে। বিরজু, তোর বাপের কথাই অমনি; তুই কিছু মনে করিস না। আমি কালকে কাশীবাবুকে নিজে হাতে পাঁপড় ভেজে খাওয়াবো। এই ঘরে আসন পেতে বসিয়ে খাওয়াবো। দেখি কে বারণ করে!

শেঠজী। আচ্ছা যখনই একটা ভোটের ব্যাপার আসবে, তখনই কি তুমি

আমার বিরুদ্ধে চলে যাবে ? যা ভাল বোঝ, কর তোমরা মায়ে বেটায় মিলে। আমার কাছে বলবারই বা কি দরকার ছিল, জিজ্ঞাসা করবারই বা কি দরকার ছিল !

শেঠগৃহিণী। চটো কেন তুমি এত কথায় কথায় ? আমার রোজগেরে ছেলে যা চায় তা' আমি করব না ? কাল থেকে নতুন একটা কারবার ফাঁদছ ; কোথায়—গণেশজী, মুনাফাঠাকুরের নাম নেবে, তা নয় এখন মুখ গোমড়া করে রইলে।

শেঠজী। ঠিকই বলেছ বিরজুর মা। জয় গণেশ ! (প্রণাম করিয়া গণেশের কুলুঙ্গী হইতে একমুঠা ফুল লইয়া) সিদ্ধিদাতা গণেশ ! জয় মুনাফাঠাকুর ! এই নে বিরজু গণেশজীর পুজোর ফুল। বেশ ভাল করে পেন্নাম কর ! আর কেকমল, তুমি এই বইয়ের ব্যবসাতে অংশীদার হতে চাও কিনা, তার চিন্তাটা চট করে শেষ করে ফেল।

কেকমল। সে শেঠজী আমি কাল সকালের আগে বলতে পারব না।

শেঠগৃহিণী। বজ্জি কপাল করে এসেছিল তোর বৌ। দেখুক বিরজুর বাপ তাকিয়ে তাকিয়ে যে আমার বাপের বংশের লোকরা কেমন করে পরিবারকে মাথায় করে রাখে। শিখুক, শিখুক !

শেঠজী। আচ্ছা, পরিবারের বিনা অনুমতিতে দেবতার পুজোর ফুল নিতে তো তোমাদের বংশে কোনও বাধা নেই। নাও কেকমল, গণেশজীর পুজোর ফুল। মঙ্গল হবে। ভাববার সময় বুদ্ধিটা খুলবে ভাল।

কেকমল। (বাঁ হাত পাতিয়া) জয় সরস্বতী ! জয় সরস্বতী !

শেঠজী। ম্লেচ্ছেরও অধম হয়ে গেলে দেখি তোমরা ! বাঁ হাতে করে ঠাকুরের ফুল নিলে ? ডান হাত কি তোমার মা-সরস্বতীর কাছে বাঁধা নাকি ?

শেঠগৃহিণী। দেখ, কেকনকে তুমি অমন করে ঠেস দিয়ে কথা ব'ল না। ছাপা হরফের কারবারে নতুন নামবার কথা ভাবছে। তাই বোধহয় ওর মনে ধারণা জন্মেছে যে মা-সরস্বতীর নামের ধক গণেশজীর নামের ধকের চেয়ে বেশী। যারে কেকনা। বাড়ি যা, রাত হল। কাল সকালেই আসিস ! কাশীবাবুর সঙ্গে বসে দুখানা পাঁপড়ভাজা খেয়ে যাস এখানে।

বিরিজলাল। চল মামা, তোমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

কেকমল। জয় সরস্বতী !

(ফেকমল ও বিরিজলালের প্রস্থান)

শেঠজী। (সহাস্তে) বিরজুর মা, মুনাফাঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও পড় করতে ইচ্ছে করছে। তোমার কাছে অনেক কিছু শেখবার আছে। তুমি আমায় একহাটে কিনে অন্য হাটে বেচতে পার। একটুও বাড়িয়ে বলছি না।

শেঠগৃহিণী। সোহাগ উছলে উঠল দেখছি তোমার! যিনি তোমার লোকসানকে লাভে বদলে দিয়েছেন, সেই মুনাফাঠাকুরকেই আর একটু ভাল করে পড় ক'র।

শেঠজী। মুনাফাঠাকুর কার কাছ থেকে শিখলেন জানি না, আমার কিন্তু ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল খুল আর গণেশজীর পিছনে তোমার রাখা বইগুলো দেখে।

শেঠগৃহিণী। এই মরেছে!

শেঠজী। সাধে কি আর তোমায় প্রণাম করছিলাম!

শেঠগৃহিণী। (সলজ্জে) কি যে বল! তোমার ঐ শকুনে দৃষ্টি কি এড়ানোর জো আছে?

শেঠজী। মহামহিম হেগমলের বংশধর তোমার ভ্রাতার ডান হাতের বইগুলোও আমি দেখেছি!

শেঠগৃহিণী। কি কাণ্ড, কি কাণ্ড! ধন্যি বাবা তুমি! তাই অত ফেকনকে গণেশজীর নির্মাল্য দেওয়া হচ্ছিল?

শেঠজী। ও হচ্ছে, একে শালা, তার উপর তোমার ভাই। ওর সঙ্গে একটু রসিকতা করব না?

শেঠগৃহিণী। যাও, তুমি বড় দুষ্টু! কিন্তু আমার মুনাফাঠাকুরের কাছে মানত কি ছিল মনে আছে তো?

শেঠজী। খুব মনে আছে। ঘরের ও মুড়ো থেকে এই মুনাফাঠাকুরের দেওয়াল পর্যন্ত বুকে হেঁটে আসবে। এখনই ওটা শেষ করে ফেল। উপুড় হয়ে শোও, দেরি ক'র না।

শেঠগৃহিণী। কথা যখন দিয়েছি তখন দেরি নিশ্চয়ই করব না। (উপুড় হইয়া শুইয়া) কিন্তু আমার মানতের আর একটা কথা মনে আছে তো? বলেছিলাম যে ঠাকুরের দেবাক্ষরী কলেবর সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব— সেইটা?

শেঠজী। কি সোনা সে কথাতো বল নি। গিল্টি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিলেই হবে। নাও—তুমি এখন নড়তে আরম্ভ কর।

[যবনিকা]

সমাপ্ত

ফ্রয়েড প্রসঙ্গ

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

দুই : কলাকৌশল

ইতিপূর্বে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অনেকে ফ্রয়েডবাদের সমালোচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। এই সব সমালোচনা-প্রয়াসের মধ্যে কতকগুলি ব্যর্থ হয়েছে। যেগুলি ব্যর্থ হয়েছে সেগুলি প্রধানত দুরকমের। এক হল, ফ্রয়েডবাদের সঙ্গে সম্যক পরিচয়ের অভাবটা সমালোচকেরা অন্ধ আবেগ-উত্তেজনা দিয়ে ভরাবার চেষ্টা করেছেন, ফলে, শেষ পর্যন্ত সমালোচকদের মার্কসীয় দৃষ্টিকোণই ব্যাহত হয়েছে, কেননা মার্কসবাদ অন্ধ আবেগ-উত্তেজনার সঙ্গে আপস করতে নারাজ। আবার অপর পক্ষে, কোন কোন সমালোচকের মনে ফ্রয়েডবাদের প্রতি মোহপ্রবণতা এমনই প্রবল যে তাঁদের সমালোচনা-প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ফ্রয়েডবাদের মধ্যে মার্কসীয় দর্শনের কয়েকটি মূলসূত্র আবিষ্কারের চেষ্টায় পর্যবসিত। (১) যেন, মেহনতকারী জনতার সভায় মার্কসবাদের মুকুট পরিয়ে ফ্রয়েডবাদের নব্য-অভিষেক। শেষ পর্যন্ত উভয় ভ্রান্তিই প্রতিক্রিয়ার সহায়ক : ফ্রয়েডপন্থী প্রথম ভ্রান্তির নমুনা তুলে মার্কসীয় সমালোচনা-মাত্রকেই হেয় প্রতিপন্ন করবার সুযোগ পান, দ্বিতীয় ভ্রান্তির দিকে চেয়ে সুনিশ্চিত সাহস পেতে পারেন। অবশ্য বলাই বাহুল্য, মারাত্মক কুফলের দিক থেকে দ্বিতীয় ভ্রান্তিটি সম্বন্ধে আজকের দিনে অনেক বেশী সজাগ থাকা দরকার। কেননা, আজ মার্কিন দেশের শাসক-মহল থেকে সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন-প্রয়াসে ফ্রয়েডবাদকে প্রচার করবার বহু আয়োজন, (২) তার উপর আজ যদি কোন কোন সমালোচক প্রমাণ করতে চান যে ফ্রয়েড নিজে পাকাপোক্ত ডায়ালেক্টিক্যাল্ মেটিরিয়ালিস্ট-ই ছিলেন তাহলে সংগ্রামী জনতার মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে সাম্রাজ্যবাদের ওই প্রচার-প্রচেষ্টাকেই জোরদার সাহায্য করা হবে।

মনে রাখা দরকার, ফ্রয়েড মাত্র এক-আধখানা বই লেখেন নি, অজস্র বই লিখেছেন। এবং অতো অজস্র লেখার মধ্যে থেকে খণ্ড, বিক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে তাঁকে প্রায় যে-কোন রকম মতাবলম্বী বলেই প্রমাণ করে দেবার ফাঁক থেকে গিয়েছে। তাই মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ফ্রয়েডবাদের সমালো-

চনা করবার সময় অগ্রসর হতে হবে অন্ত দিক থেকে, এতো অজস্র রচনার মধ্যে থেকে ফ্রয়েডবাদের মূল প্রতিপাদ্যকে বেছে নিয়ে। ফ্রয়েডবাদের মার্কসীয় সমালোচনার মধ্যে যেগুলি সত্যিই সার্থক সেগুলির পিছনে এই প্রচেষ্টাই। কিন্তু এখানেও একটা অসুবিধের দিক আছে। ফ্রয়েডের মূল কথা নিয়ে আলোচনা করবার সময় সাধারণত ঝোঁকটা পড়ে ফ্রয়েডের সিদ্ধান্ত-গুলিকে যাচাই করবার দিকে। (৩) অর্থাৎ, ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলকে মার্কস্-বাদের দিক থেকে সম্যকভাবে বিচার করবার উপর ঝোঁকটা তেমন পড়ে না। অবশ্যই এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ফ্রয়েডীয় সিদ্ধান্তগুলিকে যাচাই করাটা সমালোচকের একটি প্রধান দায়িত্ব হবে। কিন্তু ঝোঁকটা যদি শুধুই একদিকে থাকে, অর্থাৎ ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলকে উপযুক্তভাবে বিচার না করে যদি শুধু তাঁর সিদ্ধান্তগুলিকেই বিচার করবার উৎসাহে সমালোচনা করা হয়, তাহলে সে-সমালোচনা পূর্ণাঙ্গ মার্কসপন্থী সমালোচনা হতে পারে না, তাছাড়া ফ্রয়েড-পন্থীর দিক থেকে এই সমালোচনাকে তুচ্ছ করবার অনেক রকম ওজুহাত থেকে যায়। পূর্ণাঙ্গ মার্কসবাদী সমালোচনা হতে পারে না, কেননা মার্কসবাদ প্রয়োগ-মতবাদের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে আস্থাবান; তাই প্রয়োগের দিকটুকু বাদ দিয়ে, ব্যবহারের দিকটুকু বাদ দিয়ে, শুধু মতবাদের উপর নজর রেখে যে-সমা-লোচনা তা পুরোপুরি মার্কসপন্থী সমালোচনা হবে কেমন করে? তাই ফ্রয়েড-বাদের সমালোচনা-প্রসঙ্গে শুধুই ফ্রয়েডীয় থিয়োরির সমালোচনাটুকুই পর্যাপ্ত নয়, সেই সঙ্গেই ফ্রয়েডীয় প্রাক্‌টিসের সমালোচনাও হওয়া দরকার, অর্থাৎ সমালোচনা হওয়া দরকার ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলেরও। তাছাড়া, মার্কসবাদ-বিচ্যুতির সম্ভাবনা ছাড়াও, কলাকৌশলের উপর উপযুক্ত ঝোঁক বাদ দিয়ে ফ্রয়েডবাদের সমালোচনা-প্রচেষ্টায় একটা মস্ত বড় ফাঁক থেকে যায়। কেননা ফ্রয়েড নিজে বার বার জোর দিয়ে বলেছেন, কলাকৌশলটাই তাঁর আসল কথা, সাইকোঅ্যানালিসিস্ বলতে প্রধানত ওই কলাকৌশলই বোঝা উচিত, যদিও প্রায় একটা নিয়তির দরুনই সাইকোঅ্যানালিসিস বলতে শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা পুরোপুরি মতবাদ। (৪) তাছাড়া, ফ্রয়েডের নিজস্ব উক্তি ছাড়াও, আজকের দিনে ফ্রয়েডপন্থীরা বলছেন, তাঁদের সকলের সঙ্গে সকলের মতের মিল নেই, অনেক বিষয়েই পরস্পরের মধ্যে বিরোধ। সাইকো-অ্যানালিসিস বলতে তাই কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তকে না বুঝিয়ে বরং ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলটুকুকেই বোঝা উচিত; তাই মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ফ্রয়েডীয়

মতবাদের যে-কোন সমালোচনাই আপনি করুন না কেন আজকের ফ্রয়েডপন্থী অনায়াসে এই বলে জবাব দেবেন যে এ-সব সমালোচনা ফ্রয়েডবাদকে সত্যিই তেমনভাবে স্পর্শ করে না, কেননা ফ্রয়েডবাদ বলতে প্রধানত বোঝায় একটা টেক্‌নিক্‌, একটা কলাকৌশল।

তাছাড়া, কলাকৌশলকে সম্যকভাবে বিচার না করে ফ্রয়েডবাদের যে সমালোচনা তা পাঠক-সাধারণের কাছেও শেষ পর্যন্ত এক রকম হেঁয়ালি হয়ে থাকবার ভয়। কেননা, ফ্রয়েডপন্থীদের প্রচার-প্রচেষ্টাতেই সাধারণের ধারণায় ফ্রয়েডের এই কলাকৌশল সম্বন্ধে একটা রহস্য সৃষ্টি করবার দিকে ঝোঁক আছে। সমস্ত ব্যাপারটাই তো ঘটে বন্ধ ঘরের মধ্যে, সাধারণের চোখের আড়ালে। আর শোনা যায়, সাইকোঅ্যানালিস্ট কোন একটা আশ্চর্য কৌশলে ওই বন্ধ ঘরটির মধ্যে মানুষের মনের গোপন-গভীর রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারেন! তাছাড়া, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাক্ষ্য তো সত্যিই উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তাই আপনার বিচার-বিশ্লেষণে ফ্রয়েডবাদ প্রগতি-মূলকই হোক আর প্রতিক্রিয়া-মূলকই হোক, পাঠক-সাধারণ নিশ্চয়ই প্রশ্ন তুলবেন, ফ্রয়েডীয় পদ্ধতির প্রয়োগে রোগী সত্যই মনোবিকারের লক্ষণ থেকে মুক্তি পায় কি না? যদি সত্যিই পায় এবং মার্কসবাদ যদি সত্যিই বিজ্ঞান হয়, তাহলে মার্কসবাদের তরফ থেকে সাইকোঅ্যানালিসিসকে খণ্ডন করবার চেষ্টা কেন?

কোন কোন মার্কসপন্থী সমালোচক তাই দুটো কথাকে আলাদা করে নিতে চান। বলতে চান, মার্কসবাদের মধ্যে যেটা কলাকৌশলের দিক আসলে সেই দিকটা নিয়ে আমাদের সমালোচনা নয়। সমালোচনাটা বিশেষ করে ফ্রয়েডীয় সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে, ফ্রয়েডের দার্শনিক মতবাদটা নিয়ে, সমাজ-তত্ত্ব আর রাজনীতির ক্ষেত্রে এই মতবাদের উপসিদ্ধান্তগুলি নিয়ে। এই রকম চেষ্টার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল, কড্‌ওয়েলের রচনা। (৫) কড্‌ওয়েল বলতে চান, ফ্রয়েড আসলে অনেক আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক তথ্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, কিন্তু সেগুলি থেকে যখন তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা করলেন তখন দেখা গেল বিজ্ঞান ছেড়ে তিনি পৌরাণিক কল্পনায় বিভোর হয়ে পড়েছেন।

কিন্তু ফ্রয়েড-প্রসঙ্গে এই রকমের একটা ভঙ্গি নেওয়া ঠিক হবে না। এটা নির্ভুল মার্কসীয় ভঙ্গি হবে না, কেননা এই ভঙ্গির পিছনে মতবাদ আর প্রয়োগের মধ্যে অলীক পার্থক্য-কল্পনা। তাছাড়া, সাধারণের কাছে এটা অত্যন্ত বিভ্রান্তিরই ব্যাপার হবে। কেননা, এর ফলে ব্যাপারটা দাঁড়াবে,

যেন ফ্রয়েডবাদের সদর মহলটায় অনেক রকম গোলযোগ আর ভুলচুক থাকলেও অন্দর মহলে আছে আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক ঐশ্বর্য। সে-ঐশ্বর্য সাধারণের চোখের আড়ালে, কিন্তু সেদিকে চোখ পড়লে চোখ ঝলসে যাবার অবস্থা। অর্থাৎ, এই ভঙ্গির ফলে, ফ্রয়েডবাদ সম্বন্ধে সাধারণের কাছে এক রকম রহস্য সৃষ্টিই করা হবে, ফ্রয়েডবাদের বৈজ্ঞানিক বিচারের দিকে এগুনো যাবে না।(৮)• তাই কলাকৌশলের কথা বাদ দিয়ে ফ্রয়েডবাদের প্রকৃত মার্কসীয় সমালোচনা সম্ভব নয়। প্রশ্ন তুলতে হবে, ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলটা ঠিক কী রকম? প্রশ্ন তুলতে হবে, চিকিৎসা-পদ্ধতি হিসেবে এর ব্যবহারিক মূল্য ঠিক কতোখানি? এবং এই সব বিষয় সম্বন্ধে মার্কসবাদীর মন্তব্য ঠিক কোন্ ধরনের?

অর্থাৎ দেউড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে ফ্রয়েডবাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা নয়। ফ্রয়েডবাদের অন্দর মহলটা তাতে এক রহস্যপুরীই হয়ে থাকবার সম্ভাবনা। তাই, মার্কসবাদীকে প্রবেশ করতে হবে ফ্রয়েডবাদের অন্তঃপুরের মধ্যে।

মার্কসবাদী যদি এইভাবে ফ্রয়েডীয় মতবাদের অন্তঃপুর পর্যন্ত অগ্রসর হন তাহলে দেখতে পাবেন এই অন্তঃপুরের মধ্যে যা-কিছুর আয়োজন তারই উপর পুঁজিবাদী সভ্যতার, পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির নিঃসন্দেহ স্বাক্ষর। অর্থাৎ ফ্রয়েডীয় কলাকৌশল এবং চিকিৎসা-পদ্ধতি বলে ব্যাপারও বুর্জোয়া-সভ্যতার আদর্শ, আকাঙ্ক্ষা আর কায়দাকানুন-বহির্ভূত নির্লিপ্ত বিজ্ঞান নামের অপরূপ আর অপূর্ব কোনো কিছু নয়।

শুরুতে ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া দরকার।

সাইকোএ্যানালিস্ট-এর ঘরটা আধো-অন্ধকার। রোগী ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেবেন; ঘরে কোন তৃতীয় ব্যক্তি থাকা চলবে না, খোলা ঘরে সাইকোএ্যানালিসিস্ চলে না। রোগী একটা শোবার জায়গায় শরীরটাকে সম্পূর্ণ এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে কথা বলে যাবেন: যে-কোন কথা মনে আসবে তাই বলে যেতে হবে, সে-সব কথা যত অবান্তর, আজগুবি, এলোমেলো বা অশ্লীল মনে হোক না কেন কোন রকম বিচার-বিশ্লেষণ করা চলবে না। এই ব্যাপারটার নাম 'অবাধ অনুষঙ্গ' বা ফ্রি-এ্যাসোসিয়েশন। তারপর রোগী চোখ খুলবেন, চিকিৎসক এই সব কথার একটা ব্যাখ্যা দেবেন।

রোগী সেই ব্যাখ্যা শুনে নির্দিষ্ট ফী দিয়ে পরে কোন্‌দিন কোন্‌ সময়ে আবার আসতে হবে তাই ঠিক করে বিদায় নেবেন। এই রকম দিনের পর দিন। তিনশো দিন—কিংবা তারও অনেক বেশি হতে পারে। ফী-এর কথাটা জরুরী ; ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলের একটা অঙ্গ। ফী না হলে চিকিৎসা অসম্ভব, তাছাড়া কাঁচা টাকায় ফী দিতে হবে—নোট চলবে না, চেক চলবে না। দীর্ঘ দিন ধরে চিকিৎসা। এই সময়টার মধ্যে রোগীর মনে কখনো হয়তো চিকিৎসার বিরুদ্ধে, চিকিৎসকের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ। এর নাম রেসিস্‌টেন্স বা 'প্রতিবন্ধ'। কখনো আবার চিকিৎসকের প্রতি গভীর অনুরাগ, সত্যিকারের প্রেম। এর নাম ট্রান্সফারেন্স বা 'সংক্রমণ'। প্রতিবন্ধ বলে ব্যাপারটার ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা হল : রোগী এতদিন পর্যন্ত নিজের মনের কাছ থেকেও যে-সব কথা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছেন চিকিৎসক সেইগুলি প্রকাশ করে দিচ্ছেন, তাই অমন রাগ। সংক্রমণ বলে ব্যাপারটার ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা হল : শৈশব থেকে রোগীর মনে পিতামাতার প্রতি যে-আবেগ-অনুরাগ উপযুক্ত চরিতার্থতা না পেয়ে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে তা চিকিৎসকের প্রতি সংক্রামিত হওয়া। অবশ্য অনেক সময় প্রতিবন্ধকেও নেগেটিভ ট্রান্সফারেন্স বা নেতিমূলক সংক্রমণ বলা হয়, অর্থাৎ পিতামাতার প্রতি শৈশব-আক্রোশটা চিকিৎসকের উপর গিয়ে পড়ে। যাই হোক, চিকিৎসক প্রতিদিনই রোগীর কাছে এই প্রতিবন্ধ ও সংক্রমণের প্রকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে যাবেন। আর তারপর? শেষ পর্যন্ত কী হবে? চিকিৎসার আসল উদ্দেশ্যটা কী? উদ্দেশ্য অবশ্যই রোগীর মনকে সুস্থ স্বাভাবিক করে তোলা। কিন্তু স্বাভাবিক মন বলতে ঠিক কী বোঝায়? ফ্রয়েডীয় মতে অ্যাড্‌জাস্টমেন্ট বা 'উপযোজন'। অর্থাৎ কিনা, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে ঠিকমতো খাপ খাওয়াতে পারা, মানিয়ে নেওয়া।

তাহলে, সংক্ষেপে, ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলের মূল কথা কী কী?

১ : বন্ধ ঘর
২ : প্রতিবন্ধ
৩ : ফী—কাঁচা টাকা
৪ : সংক্রমণ
৫ : উপযোজন
৬ : অবাধ অনুষঙ্গ

একে একে এই কটি কথা নিয়ে আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই বুর্জোয়া মতাদর্শের কী রকম নির্ভুল স্বাক্ষর।

বন্ধ ঘর

খোলা জায়গায় সাইকোঅ্যানালিসিস্ চলবে না। তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি এ-পদ্ধতির পরিপন্থী। তার মানে, চিকিৎসার সময় সামাজিক পটভূমিকে সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলা দরকার, সমাজ-জীবনকে একান্তভাবে পিছনে ফেলে আসা দরকার। বন্ধ ঘর ; রোগীর পক্ষে নিজের হাতে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেওয়াই ভালো, কেননা তাতে সমাজ-জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবার প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়। চিকিৎসকও ক্রমাগতই চেষ্টা করেন রোগী যেন তাঁর ভাব-আবেগকে নিছক, নিরবলম্ব ভাব-আবেগ হিসেবে দেখবার পথে এগুতে পারেন। অর্থাৎ কিনা, রোগীর চেতনাকে, রোগীর চিন্তাপদ্ধতিকে, ক্রমাগতই এমন দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা যে-দিকে কোন রকম সামাজিক বিচার-বিশ্লেষণ নেই, কোন রকম সমাজ-সংস্কার নেই। কিন্তু সমাজ-চেতনাটুকুকে মন থেকে একেবারে মুছে ফেলা তো সহজ কথা নয়। চিকিৎসক তাই একটি কাল্পনিক উদাহরণের সাহায্য নিতে বাধ্য হন ; রোগীকে ভেবে দেখতে বলেন রবিনসন ক্রুশোর মতো রোগী যদি কোন নির্জন দ্বীপের অধিবাসী হতেন তাহলে তাঁর পক্ষে অমুক কাজ করায় বা অমুক ব্যবহার করায় সত্যিই কি কোন বাধা থাকত ?

তার মানে, ফ্রয়েডীয় পদ্ধতির প্রথম ধাপ হল রোগীর মধ্যে থেকে সমষ্টি-চেতনার বিনাশ করে নির্মল ব্যষ্টিচেতনাকে জাগিয়ে তোলা। রোগীর পারি-পার্শ্বিকে যে সমাজ, তার আইন-কানুনে, সংস্কার-বিচারে গ্লানি আছে। সেই গ্লানিগুলি সম্বন্ধে রোগীকে সচেতন করে উন্নততর ও গ্লানিমুক্ত সামাজিক পরিকল্পনার দিকে এগিয়ে যেতে রোগীকে সাহায্য করা নয়, সেই উন্নততর আদর্শের প্রেরণায় রোগীর মনকে সঞ্জীবিত করবার চেষ্টা নয়। সেটা বাস্তবের পথ হতে পারত, হতে পারত প্রকৃত বিজ্ঞানের পথ—দুনিয়াকে বদল করবার পথ। কিন্তু সে-পথ ফ্রয়েডীয় পদ্ধতির পথ হতে পারে না। কেননা, উপযোজন বা অ্যাডজাস্টমেন্ট নিয়ে আলোচনা করবার সময় স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যাবে এ-পদ্ধতির চূড়ান্ত আদর্শ হল বর্তমান বাস্তবটা যতই গ্লানিময় হোক না

কেন, কোনমতে রোগীর চেতনাকে তারই সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা। অর্থাৎ, বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে রোগী যাতে বিনা-দ্বন্দ্বে সহ্য করতে পারেন তারই আয়োজন করা। এবং রোগীর মানসিক চাহিদাকে শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া-বাস্তবের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে বলেই ফ্রয়েডীয় কলা-কৌশলের প্রথম ধাপে বুর্জোয়া আদর্শের মূল ভ্রান্তিকে আশ্রয় করবার ব্যবস্থা। ব্যক্তির মধ্যে যেটা নিছক নিজস্ব দিক, স্বতন্ত্র দিক, ব্যষ্টির দিক, সেই দিকটুকুর উপর দৃষ্টি আবদ্ধ করতে শেখানো, সমাজকে ভুলতে শেখানো, সমষ্টিগত চেতনার সঙ্গে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে শেখানো। সমাজকে ভুলতে পারলেই,—সমাজের বন্ধন ছিঁড়ে পালিয়ে যেতে পারলেই,—বুঝি সমাজের গ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে! এইটেই হল বুর্জোয়া ভাবাদর্শের মূল ভ্রান্তি, রুশোর রচনায় যে-ভ্রান্তির সবচেয়ে চরম প্রচার। রুশো বললেন, ফিরে চলো প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে, স্বাভাবিক মানুষের মতো। দাও ফিরে সে-অরণ্য, লও এ-নগর। কিন্তু মার্কসবাদ নির্ভুল হিসেব করে দেখায় এইভাবে সমাজ-চেতনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবার চেষ্টাটুকু আর কিছুই নয় বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার যে-গ্লানি তারই ফাঁদে পা দেবার ওজুহাত মাত্র। অর্থাৎ, সামাজিক চেতনা থেকে যতই আপনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবার চেষ্টা করবেন আপনার বর্তমান সমাজ ততই আপনাকে পেয়ে বসবে, ততই আপনার ঘাড় ধরে এই সমাজ-ব্যবস্থা আপনাকে দিয়ে তার নিজের চাহিদা মিটিয়ে নেবে। কেননা, এই সমাজব্যবস্থার রূপান্তর আনার ব্যাপারে অনিবার্যভাবেই প্রয়োজন হল সংঘবদ্ধ হবার প্রয়োজন, সমষ্টির মধ্যে ব্যক্তির পক্ষে আত্মসমর্পণ। তা না হলে, বদল হবে না এই সমাজ-বাস্তবের এবং সমাজ-বাস্তবের বদল যদি না হয় তাহলে আপনি নিজের কল্পনায় যেমন ভাবেই এ থেকে মুক্ত হতে চান না কেন এই সমাজ-ব্যবস্থা জোর করে তার ষোলো আনা চাহিদা আপনার কাছ থেকে আদায় করে নেবে।

তাই সমাজ-চেতনা থেকে বিমুক্ত হবার উপদেশটুকু বর্তমান সমাজব্যবস্থার ফাঁদে পা-দেবার আমন্ত্রণই। ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলের প্রথম ধাপে এই আমন্ত্রণেরই পরিচয়: দরজা বন্ধ করে সমাজের কথাটা আড়াল দিয়ে সাইকোঅ্যানালিসিস্ শুরু এবং সাইকোঅ্যানালিস্ট-এর ক্রমাগত চেষ্টা হল রোগীর মন থেকে সমষ্টি-চেতনাকে লোপ করে দেবার, যাতে তার চিন্তা-পদ্ধতিটা হয় রবিন্‌সন্ ক্রুশোর মতো, রুশোর ওই বুনো মানুষের মতো,—

নিঃসঙ্গ, একক, অতএব অসহায়, নিরুপায় ; সামাজিক বাস্তবের সামনে মাথা নোয়াতে সে বাধ্য হবেই, বাধ্য হবেই সমাজের সব রকম গ্লানি মাথা পেতে মেনে নিতে। অর্থাৎ কি না, ফ্রয়েডীয় পরিভাষায় সংযোজন বা এ্যাড্জাস্টমেণ্ট।

প্রতিবন্ধ

ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলের আর একটি খুব জরুরী কথা হল প্রতিবন্ধের কথা : চিকিৎসার বিরুদ্ধে, চিকিৎসকের বিরুদ্ধে, চিকিৎসা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে রোগীর তরফ থেকে অনেক রকম স্থূল ও সূক্ষ্ম ওজর-আপত্তি। রোগী যেন পণ করে বসেছে, রোগমুক্তিকে যেমন করেই হোক রুখতে হবে। ফ্রয়েড বলছেন, আপাতত অদ্ভুত মনে হলেও এর একটা সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে। রোগলক্ষণ থেকে রোগী একরকম কাল্পনিক সুখ পান, রোগমুক্তি মানেই সেই সুখের সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হবার ভয়। উপমা দিয়ে ফ্রয়েড বলেন, কোন কোন ভিখিরী তো হাতে ঘা পোষে : ঘা দেখিয়েই ভিক্ষে জোটে তাই ওই ঘায়ের চিকিৎসা করতে গেলে ভিখিরী বাধা দেবে বই কি। মনোবিকার থেকেও যেন একরকম ভিক্ষে পাওয়া যায়, ফ্রয়েড তার নাম দেন রোগ থেকে পাওয়া মুনাফা। কেবল মনে রাখতে হবে এই মুনাফাটা রোগীর সজ্ঞানে নয়। এর খবরটা রোগী নিজেই নিজের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখেন। তবু, এরই খাতিরে প্রতিবন্ধ। (৭)

অবশ্যই ফ্রয়েড বলেন, এই প্রতিবন্ধের পরিচয় শুধুই চিকিৎসা-প্রসঙ্গে নয়। এই প্রতিবন্ধেরই একটা বৃহত্তর ও ব্যাপকতর সামাজিক সংস্করণ আছে। তার মানে, সাধারণত সামাজিকভাবে ফ্রয়েডবাদের বিরুদ্ধে যে আপত্তি তা ওই প্রতিবন্ধেরই পরিবর্ধিত বিকাশ-মাত্র। (৮)

এবং, প্রতিবন্ধ নিয়ে আলোচনা করবার সময় তার এই পরিবর্ধিত সামাজিক বিকাশটার বিশ্লেষণ থেকেই শুরু করায় সুবিধে। কেননা, বদ্ধ ঘরের আধো-অন্ধকারে ব্যক্তিবিশেষের ব্যবহারের মধ্যে যে-কথাটাকে রহস্যঘন করে তোলবার সুযোগ, বৃহত্তর সামাজিক জীবনে ও দিনের আলোয় যদি তারই পুনঃপ্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় তাহলে তার উপর রহস্যের জাল বোনবার সুযোগ অনেক কম। অর্থাৎ আলোচনার সুযোগ-সুবিধে অনেক বেশী। তাই প্রতিবন্ধের এই সমাজ-রূপটাকে নিয়েই আলোচনা শুরু করা যাক।

এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ফ্রয়েড যখন প্রথম তাঁর মতবাদ পেশ করতে শুরু করলেন তখন সমাজের তরফ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ ও তীব্র বিদ্বেষ দেখা দিয়েছিল। ইতিহাসকে উড়িয়ে দেবার প্রশ্ন ওঠে না। ফ্রয়েডীয় মতবাদেরও একটা ইতিহাস আছে। এবং এই ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ে দেখতে পাওয়া যায় ফ্রয়েড প্রায় একা তুমুল ও তীব্র সামাজিক আপত্তির বিরুদ্ধে মুখোমুখি হয়েছেন। তার কারণ কী? সমাজের তরফ থেকে তখন এত বাধা কেন? কেন এই প্রতিবন্ধ? এর একটা ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা তো আছেই; কিন্তু মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও সাম্প্রতিক মার্কসবাদীরা এই প্রশ্নের একটা জবাব দেন। প্রথমে ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যাটা নিয়ে আলোচনা করা যাক, দেখা যাক তার মধ্যে আসল গলদটা ঠিক কোথায়। তার থেকেই মার্কসীয় সমালোচনার দিকে অগ্রসর হবার সুযোগ পাওয়া যাবে।

ফ্রয়েডের মতে, তাঁর আবিষ্কারটুকুকে ভুলে থাকতে পারলেই মানব-সমাজের পক্ষে নিশ্চিন্ত আরাম। মনোবিকারের রোগী রোগ-মুনাফা নামের যে-রকম আরাম পায় সেই রকমই। কেননা, তিনি এমন কতকগুলি কথা আবিষ্কার করেছেন বলে দাবি করেন যা শুধুই মানবমনের আত্মাভিমানকেই পীড়িত করে না, এমন কি মানবসমাজের বনিয়াদটুকুকেও সংকটাপন্ন করে তোলে। আত্মাভিমানটা পীড়িত হবার কথা কেন? তার কারণ, ফ্রয়েড বলছেন, মানুষের চিরন্তন অভিমান হল সচেতন কীর্তির অভিমান; অথচ তাঁর আবিষ্কার প্রতিপন্ন করছে এই সব সচেতন কীর্তির পিছনে আসল দায়িত্ব হল কতকগুলি অন্ধ, অচেতন এবং সামাজিকভাবে নিকৃষ্ট বাসনার তাগিদ। মানুষের অভিমান এতে আহত হবে না? ফ্রয়েড বলছেন, বিজ্ঞানের ইতিহাসে মানুষের আত্মাভিমান এর আগে আর দুবার এই রকম ভাবে আহত হয়েছিল। এক, কোপার্নিকাস যখন প্রমাণ করলেন আমাদের এই পৃথিবী সত্যিই সৌর-জগতের কেন্দ্র নয়। আর দুই, ডারউইন যখন প্রমাণ করলেন আমাদের এই প্রজাতি আসলে একরকম বনমানুষের বংশধর। আর, মানুষের আত্মাভিমান অমন সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছিল বলেই এই দুটি মতবাদের বিরুদ্ধেও দেখা দিয়েছিল দারুণ সামাজিক প্রতিবন্ধ। (১)

কিন্তু, ফ্রয়েডীয় মতবাদের দরুন মানবসমাজের বনিয়াদটা সংকটাপন্ন হয়ে উঠবে কেন? তার কারণ, ফ্রয়েড বলছেন, সমাজ-সভ্যতা—মানুষ যা-কিছুই গড়ে তুলেছে তাই—নিজের যৌন-চরিতার্থতাকে খর্ব করে, সঙ্কুচিত করে গড়ে

তোলা। যৌন তাগিদটাই যেন ইন্ধন; এই ইন্ধন যোগানো গিয়েছে বলেই সভ্যতার বহ্নি এমন দীপ্ত কিরণে ইতিহাসকে উদ্ভাসিত করতে পেরেছে! মানুষের সভ্যতা তো এমনি গড়ে ওঠেনি, আত্মত্যাগের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে এবং এই আত্মত্যাগটা যৌন চাহিদারই ঘাড়ে। শুধু তাই নয়। ফ্রয়েড মনে করেন, তাঁর নির্মল নিরাসক্ত বিচার অনুসারে বুঝতে পারা যায় সভ্যতা যে বিরাট আত্মত্যাগ মানুষের কাছ থেকে দাবি করে তার অনুপাতে সভ্যতার প্রতিদানটা যৎসামান্যই। অর্থাৎ, আত্মত্যাগটা অনেকাংশে অহেতুক, অর্থহীন। আর এই কথাটা মানুষ যদি স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে শেখে তাহলে সভ্যতার বনিয়াদটুকু কেঁপে উঠবে না কি? সভ্যতার তরফ থেকে এই মতবাদের বিরুদ্ধে অভিযানটা তাই অহেতুক নয়। (১০)

অবশ্যই, ফ্রয়েডের মতে মানুষের আত্মাভিমান আর সমাজ-সভ্যতা সব কিছুই ইতিহাস-উত্তীর্ণ শাশ্বত ও সনাতন ব্যাপার। যুগপরিবর্তনের সঙ্গে এর ইতর-বিশেষে যদিই বা কোন তফাত দেখা দেয় তা হলেও সে-তফাত কোন মৌলিক তফাত নয়। বাইরের দিকে এই রদবদল যাই হোক না কেন ভিতরের চেহারাটা বরাবর একই রকম। মানুষের আত্মাভিমান একটা শাশ্বত সনাতন ব্যাপার, মানুষের সমাজ-ব্যবস্থা একটা শাশ্বত সনাতন ব্যাপার। অর্থাৎ, ফ্রয়েডের চেতনায় ইতিহাস-বোধ-এর একান্ত অভাব। তাঁর সমালোচনা-টাও এইখান থেকেই শুরু হওয়া দরকার। এবং ফ্রয়েড যাকে সামাজিক প্রতিবন্ধ বলছেন তারই দৃষ্টান্ত থেকে শুরু করা যাক।

এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ফ্রয়েড যখন প্রথম তাঁর মতবাদ পেশ করেন তখন এই মতবাদের বিরুদ্ধে তীব্র সামাজিক নিন্দা ও আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে অনেকদিন ধরে অনেকভাবে তাঁকে যুঝতে হয়েছে। কিন্তু তার আসল কারণ যদি এই হত যে তাঁর মতবাদ মানুষের আত্মাভিমানকে আহত করেছে, সংকটাপন্ন করে তুলেছে সমাজব্যবস্থার বনিয়াদকে, তাহলে হঠাৎ আজকের দিনে ব্যাপারটা এমন আশ্চর্যভাবে বদলে গেল কেন? ইংরেজ এবং বিশেষ করে মার্কিন মুলুকের কথা ভেবে দেখুন। সাইকোঅ্যানালিসিস্ নিয়ে কী প্রবল প্রচণ্ড উৎসাহ! কী অজস্র অর্থব্যয়। গল্প-উপন্যাস, দৈনিক-সাপ্তাহিক থেকে শুরু করে সিনেমা-টেলিভিশন পর্যন্ত আধুনিক জগতের যতরকম প্রচার-মাধ্যম আছে তার সাহায্যে সাইকোঅ্যানালিসিসের প্রচণ্ড প্রচার। এই

প্রচার-ব্যবস্থায় খুঁটিয়ে পরিচয় দিতে গেলে অনেকখানি জায়গা যাবে; আধুনিক মার্কিন সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে যাঁর সামান্যতম পরিচয়ও আছে তিনিই জানেন আজকের দিনে ওদেশে সাইকোঅ্যানালিসিস্ প্রচার করা নিয়ে কী ধুমধাম। ফ্রয়েড তাঁর জীবদ্দশায় একবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন, আধুনিক সভ্যজীবন মানুষের উপর অসহ্য বোঝা চাপিয়েছে, এ-সম্বন্ধে একটা সংশোধন-ব্যবস্থার প্রয়োজন; এবং হয়ত কোন একদিন সত্যিই কোন কোটিপতি মার্কিন দাতা কোটি কোটি টাকা দান করে সমাজ-কর্মীর দলকে সাইকোঅ্যানালিটিক্যাল্ কলাকৌশলে দীক্ষিত করে তুলবেন, আধুনিক জীবন যে-বিকারগ্রস্ত অবস্থা সৃষ্টি করেছে তার সঙ্গে এরা সঙ্কটত্রাণ ফৌজের মতো লড়াই করতে পারবেন। (১১) আজকের দিনে ফ্রয়েড যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনি নিশ্চিতই দেখতে পেতেন কোন নির্দিষ্ট মার্কিন দাতা-মহারাজের প্রত্যক্ষ দান হিসেবে না হলেও মার্কিন মুলুকে সত্যিই সাইকোঅ্যানালিসিসের পিছনে কোটি কোটি টাকা খরচ করবার আয়োজন। (একটু পরেই অবশ্য আরো স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যাবে উদ্দেশ্যটা আধুনিক জীবনের গ্লানিকে হালকা করা নয়, আধুনিক সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখবারই ব্যর্থ প্রয়াস, অর্থাৎ এই গ্লানিকে কায়েম করাই।)

তাহলে ফ্রয়েড যে ব্যাপারটাকে সাইকোঅ্যানালিসিসের বিরুদ্ধে মূল প্রতিবন্ধের বৃহৎ সামাজিক বিকাশ বলে বর্ণনা করছেন সেইটের কী হল? সত্যিই কি কোন রকম আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ ওই প্রতিবন্ধটার আত্ম-বদল করে একে অধৈর্য উৎসাহে পরিণত করেছে? কিন্তু তা তো আর বাস্তবিকই সম্ভব নয়। যে-মতবাদ ফ্রয়েডের মতে মানুষের আত্মাভিমানকে নির্মমভাবে আহত করে, আজকের ক্ষয়িষ্ণু পৃথিবীতে সেই মতবাদই মানুষের কাছে এমন প্রিয় হয়ে উঠল কী করে? যে-মতবাদ ফ্রয়েডের মতে সমাজের বনিয়াদটাকেই সংকটাপন্ন করে তোলে সেই মতবাদকেই অমন মরিয়ার মতো আঁকড়ে ধরে আজকের দিনের ক্ষয়িষ্ণু সমাজটা বাঁচবার নিষ্ফল চেষ্টা করছে কী করে? ফ্রয়েডবাদ নিয়ে এই সাম্প্রতিক উৎসাহটুকু থেকেই প্রমাণ হয় প্রতিবন্ধ-সংক্রান্ত ফ্রয়েডীয় মতবাদটার গোড়ায় গলদ রয়েছে। তার মানে, সাইকোঅ্যানালিসিসের বিরুদ্ধে অতীত আপত্তিটার ফ্রয়েড যে-ব্যাখ্যা দিচ্ছেন সেই ব্যাখ্যার বৈজ্ঞানিক মর্যাদা নেই। মানুষের সনাতন আত্মাভিমান আহত হবার কথা, কিংবা সভ্যতার বনিয়াদ সংকটাপন্ন হবার

কথা, কানে শুনতে যতই ভাল লাগুক না কেন, এগুলো তাঁর প্রখর কল্পনা-শক্তিরই পরিচয়, বৈজ্ঞানিক উপসংহার নয়।

তার মানে কি এই যে সমাজের তরফ থেকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিরুদ্ধে বাধা ওঠবার কথাটাই কল্পনা? সামাজিক প্রতিবন্ধ বলে ব্যাপারটাই কি মিথ্যে? নিশ্চয়ই নয়, যদিও সমাজ বলতে একটা সনাতন ও অন্তর্দ্বন্দ্বহীন কিছু বুঝতে গেলে এই সামাজিক প্রতিবন্ধের কথাটা আগাগোড়াই কাল্পনিক হয়ে দাঁড়ায়। কোপার্নিকাস্, গ্যালিলিও, ডারউইন, মার্ক্স্—এঁদের সবাইকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিরুদ্ধেই সামাজিক ভাবে তীব্র ও তুমুল আপত্তি উঠেছে। এমন কি আজকের দিনেও আমাদের চোখের সামনে বৈজ্ঞানিক জোলিও-কুরীর চাকরি গেল। বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিরুদ্ধে সামাজিক ভাবে মাঝে মাঝে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে বই কি। কিন্তু এই বিক্ষোভের উৎসটা ঠিক কোথায়? পুরো সমাজটা? নিশ্চয়ই নয়। মানুষের সনাতন আত্মাভিমান? তাও নয়। তাহলে?

আসলে মার্কসপন্থী বিচার করে দেখান, কোন একটা বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থাকে টিঁকিয়ে রাখবার ব্যাপারে যে-শ্রেণীর স্বার্থ সেই শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে কোন বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার বা দার্শনিক মতবাদ যখন সংঘাত সৃষ্টি করে তখনই কায়েমী স্বার্থের খাতিরে ওই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বা দার্শনিক মতবাদের বিরুদ্ধে সমাজে তীব্র গোলযোগ সৃষ্টি করা হয়। এই কথার মূল তাৎপর্যগুলি একে একে দেখা যাক। প্রথমত, সমাজব্যবস্থা বলে ব্যাপারটা সনাতন বা শাশ্বত কিছু নয়। যুগে যুগে মানব-সমাজে মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত, পুরো সমাজটাকে অন্তর্দ্বন্দ্বহীন সমজাতীয় কোন কিছু বলে কল্পনা করা চলে না। সভ্য সমাজ শুরু হবার মুখোমুখি সময় থেকে ধন-তন্ত্রের চূড়ান্ত বিকাশ পর্যন্ত সমস্ত সমাজব্যবস্থার মূলেই অন্তর্দ্বন্দ্ব বর্তমান; সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের নাম শ্রেণীসংগ্রাম—শোষক আর শোষিতের মধ্যে সংগ্রাম, শাসক আর শাসিতের মধ্যে সংগ্রাম। তৃতীয়ত, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও দার্শনিক মতবাদ বলে ব্যাপারগুলি বিশুদ্ধ, নির্বিকল্প ও নৈর্ব্যক্তিক কিছু নয়, শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে এগুলির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। অর্থাৎ কোন আবিষ্কার বা মতবাদ একটা বিশেষ সমাজের শোষক-শাসক শ্রেণীর স্বপক্ষেও যেতে পারে আবার বিপক্ষেও যেতে পারে। আর চতুর্থত, যে মতবাদ বা যে-

আবিষ্কার সামাজিক ভাবে যে-শ্রেণীর স্বার্থে আসে সেই শ্রেণী ওই মতবাদকে সমর্থন করে, যে-শ্রেণীর বিরুদ্ধে যায় সেই শ্রেণী এর বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টি করে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে ফ্রয়েড উল্লেখ করছেন কোপার্নিকাস আর ডারউইনের কথা। চমৎকার দৃষ্টান্ত, সন্দেহ নেই। এই দুটি নমুনার বিশ্লেষণ থেকেই শুরু করা যাক। কোপার্নিকাসের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি। কিন্তু কোন্ সমাজের কোন্ শ্রেণীর তরফ থেকে আপত্তি? কেন আপত্তি? ইওরোপের সামন্ত যুগটার শেষাশেষি যে-অবস্থা তার পটভূমি মনে না রাখলে এ-আপত্তির তাৎপর্য বোঝা সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে তখনকার দিনে জমিদার আর পাদ্রী শ্রেণীর কথা। তারাই শোষক, তারাই শাসক আর তাদের শাসনের একটা খুব মোক্ষম অস্ত্র হল ধর্মমোহ। সেই ধর্মমোহের বিরুদ্ধে তীব্র আঘাত হানল কোপার্নিকাসের আবিষ্কার। সামন্ত-পাদ্রীর শ্রেণী খাপ্পা হয়ে উঠবে না কেন? কিন্তু সমাজ বদলাল, শেষ হল জমিদার-পাদ্রীদের শোষণ-শাসন আর সেই সঙ্গে শেষ হল কোপার্নিকাসের বিরুদ্ধে ওই তীব্র বিদ্বেষ প্রচার। কেননা, নতুন যে-শ্রেণী প্রভুর আসনে বসল তার স্বার্থের সঙ্গে কোপার্নিকাসের ওই আবিষ্কারের সংঘর্ষ নেই। তাই নেই বিদ্বেষ-প্রচারের অমন উৎসাহ। মানবাত্মার সনাতন অভিমানই যদি ক্ষুণ্ণ করে থাকে তাহলে আজকের দিনে কোপার্নিকাসের আবিষ্কার আমার-আপনার সহজ-বুদ্ধিতে পরিণত হল কী করে? আমাদের এই পৃথিবী যে সত্যিই সৌরজগতের কেন্দ্র নয়, সূর্যের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে,—এ-কথায় আমাদের ইজ্জৎ খোয়া যাবার কোন সম্ভাবনা কল্পনা করাই আমাদের পক্ষে আজ রীতিমত কঠিন। কিন্তু তখনকার দিনের ধর্মমোহের সঙ্গে এ-কথার যে কী দারুণ সংঘর্ষ তা সামান্যমাত্র ঐতিহাসিক-চেতনার বলে আমাদের পক্ষে আন্দাজ করা একটুও কঠিন নয়।

ডারউইনের বেলাতেও একই কথা। কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে তাঁর আবিষ্কারের যতখানি বিরোধ, কায়েমী স্বার্থ সামাজিক ভাবে তাঁর আবিষ্কারের বিরুদ্ধে ঠিক ততখানিই কুৎসা-প্রচার করেছে। ডারউইনের বিরুদ্ধেও সবচেয়ে প্রবল আপত্তি রক্ষণশীল শ্রেণীর তরফ থেকে, কেননা ডারউইনের আবিষ্কার এই রক্ষণশীল শ্রেণীর স্বার্থে আঘাত হেনেছে। তাছাড়া, ডারউইনের ব্যাপারে আরও একটা কথা বিশেষ করে লক্ষ্য করা দরকার। তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে মিশেল হয়ে রয়েছে পুঁজিবাদী নীতিকথার বৈজ্ঞানিকত্ব-নির্লজ্জ প্রচারক ম্যালথাসের মতবাদ। এবং পুঁজিবাদী সভ্যতার পরমায়ু যতই

ফুরিয়ে আসছে ততই পুঁজিবাদী দুনিয়ায় ডারউইনের আসল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারটুকুর উপর থেকে ঝোঁক সরিয়ে (কেননা এ-আবিষ্কার শেষ পর্যন্ত পুঁজিপতিদের কায়েমী স্বার্থেরও সমর্থন করে না) ওই অবৈজ্ঞানিক কল্পনার উপরই ঝোঁক দেবার চেষ্টা। ডারউইনের আবিষ্কার সম্বন্ধে এবং আধুনিক সমাজে ডারউইনের সমালোচনা সম্বন্ধে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সুদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। আপাতত, স্থান-সংক্ষেপের খাতিরে তার সবটুকু উল্লেখ করা গেল না।

ফ্রয়েড নিজের সঙ্গে ডারউইন আর কোপার্নিকাসের তুলনা করছেন। এই তুলনার মধ্যে বাহুল্য থাকলেও এর ভিত্তিতে যে একেবারে কিছুই নেই তা মনে করাও ঠিক হবে না। তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে, ফ্রয়েডের মতবাদও বিজ্ঞানের ইতিহাসে কোপার্নিকাস্ আর ডারউইনের মতোই যুগান্তর এনেছে। তার মানে এও নয় যে, ফ্রয়েড নিজে যে রকম কল্পনা করছেন, তাঁর মতবাদও মানবাত্মার সনাতন আত্মাভিমানকে সমতুল্য ভাবে আহত করেছে বলেই সমজাতীয় প্রতিবন্ধের মুখোমুখি হতে বাধ্য হয়েছে। তার আসল মানেটা এই-ই যে ফ্রয়েড প্রথম যখন তাঁর মতবাদ পেশ করেছিলেন তখন তাঁর মতবাদও একদিক থেকে কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতা করেছিল আর সেই জন্যেই কায়েমী স্বার্থ সামাজিক ভাবে ফ্রয়েডীয় মতবাদের বিরুদ্ধে নানান রকম বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করেছিল। অবশ্যই কোপার্নিকাস আর বিশেষ করে ডারউইন কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে যে আঘাত হেনেছিলেন তা অনেক বেশী গুরুতর, অনেক প্রচণ্ড। তবুও ফ্রয়েডীয় মতবাদও যে সেই সময়ে আপেক্ষিক ভাবে কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়েছিল এই কথাটাও ভোলা ঠিক নয়। তাতে ইতিহাস-বোধ ব্যাহত হবার ভয় এবং ফ্রয়েড যে কেন নিঃসন্দেহেই বুর্জোয়া-শ্রেণীর মতবাদগত প্রচারক সে-কথা স্পষ্ট ভাবে হৃদয়ঙ্গম করবার মধ্যেও ফাঁক থেকে যাবার সম্ভাবনা।

মনে রাখতে হবে, সে-সময়ে ফ্রয়েডীয় মতবাদের মূল আওয়াজ ছিল 'ব্যক্তিগত যৌন-প্রণয়ের' আওয়াজ, যৌন জীবনে মুক্তির আওয়াজ। এবং এঙ্গেলস্ দেখাচ্ছেন, এই আওয়াজ বুর্জোয়া-সভ্যতারই আওয়াজ, বুর্জোয়া-সভ্যতার আগে পর্যন্ত এই দাবি তোলবার মতো বাস্তব পরিস্থিতি মানুষের ইতিহাসে দেখা দেয়নি। ইওরোপীয় সামন্ত যুগেও নয়। সে-যুগে মানুষের যৌন-সম্পর্ককে একেবারে অন্ধ চোখে দেখবার চেষ্টা। তাছাড়া, মনে রাখতে

হবে যে-সমাজে যে-যুগে ফ্রয়েডের মতবাদ দানা বাঁধছে সেই সমাজে, সেই যুগে, ইওয়োপীয় সামন্ত সভ্যতার সমস্ত চিহ্নই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। (১৮৭০-৯৫-এর অস্ট্রিয়া—কায়েমী স্বার্থের মধ্যে তখনও সেখানে সামন্ততন্ত্রের স্পষ্ট ভগ্নাবশেষ। (১২) ফ্রয়েডের মতবাদ তাই এই দিক থেকে কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতা করেছে আর প্রত্যুত্তরে কায়েমী স্বার্থের কাছ থেকে বিরোধিতাও পেয়েছে। অর্থাৎ, তিনি বুর্জোয়া শ্রেণীর নানান দাবির মধ্যেই একটা দাবি তুলেছিলেন বলেই সেই যুগে বুর্জোয়া-বিরোধী রক্ষণশীল শ্রেণী তাঁর বিরুদ্ধে নানান রকম বাধাবিপত্তি সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু সমাজ সচেতন দৃষ্টিতে সেই বাধাবিপত্তির বিশ্লেষণ না করে, বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন এক "বিশুদ্ধ" মনস্তত্ত্ব দিয়ে এই বাধাবিপত্তির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ফ্রয়েড তাঁর ওই আধা-রহস্যময় 'প্রতিবন্ধর'-র মতবাদ সৃষ্টি করলেন।

এইখানে একটা কথা খুব স্পষ্টভাবে মনে রাখা দরকার, নইলে প্রগতির ওজুহাতে ফ্রয়েডীয় মতবাদ নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত উচ্ছ্বাসের অবকাশ থেকে যাবার সম্ভাবনা। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের তুলনায় ধনতন্ত্রর ওই আওয়াজ—যৌন মুক্তির দাবি, ব্যক্তিগত যৌন-প্রণয়ের দাবি—অনেক প্রগতিশীল সন্দেহ নেই। কিন্তু এই প্রগতিটা নেহাতই আপেক্ষিক প্রগতি, কোন চরম প্রগতি নয়। কেননা, সামন্ততন্ত্রের তুলনায় ধনতন্ত্র স্বর্গ হলেও সমাজতন্ত্রের তুলনায় নরকই। যৌন-সম্পর্কের বেলাতেও একই কথা। তাই প্রকৃত প্রগতিপন্থীর পক্ষে, সমাজ-তন্ত্রীর পক্ষে, এই আপেক্ষিক প্রগতিকে চরম প্রগতি মনে করাটা নেহাতই মারাত্মক ভ্রান্তি হবে। মনে রাখা দরকার, মতবাদ এবং প্রয়োগ উভয় দিক থেকেই যৌনমুক্তির এই বুর্জোয়া বা ফ্রয়েডীয় সংস্করণটির মধ্যে ফাঁকি আছে। এঙ্গেলস্-এর মূলসূত্র অনুসরণ করে মতবাদের দিক থেকে যে ফাঁকি তার আলোচনা একটু পরেই তুলব। তার আগে প্রয়োগের দিক থেকে ফাঁকির দৃষ্টান্তটা তোলা যাক। জার্মান বৈপ্লবিক আন্দোলনের একটা যুগে তরুণ সমাজ-তান্ত্রিকদের মনে ফ্রয়েডীয় মতবাদের এই কথাটা একরকম মোহ সৃষ্টি করেছিল, এবং সমাজ-বাস্তবকে পরিবর্তন করবার চেয়ে—যে-পরিবর্তন না হলে প্রকৃত যৌন-মুক্তির কথা আকাশ কুসুমের মতো অলীক হয়েই থাকবে—তাঁরা নিছক এই যৌনমুক্তির আদর্শের উপাসক হতে চাইলেন। ফলে তাঁদের ব্যবহারিক জীবনে প্রকৃত মুক্ত যৌন আদর্শের বদলে ফুটেছিল যৌন-অরাজ-কতার সম্ভাবনা। এ্যানারকিসম্। এবং এ-বিষয়ে লেনিনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে

তিনি এর অত্যন্ত কঠোর সমালোচনা করেন। যে ফ্রয়েডবাদের ঝোঁকে বৈপ্লবিক কর্মীদের মধ্যে এই এ্যানারকিস্‌ম্‌-এর সম্ভাবনা লেনিনের সমালোচনায় সে-সম্বন্ধে তীব্র, তীক্ষ্ণ মন্তব্য। (১৩)

আসলে, বুর্জোয়া সভ্যতা বা ধনতন্ত্র মানুষের সামনে যে-সব রঙিন প্রতিজ্ঞা পেশ করেছিল ধনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে সেগুলির বাস্তব বিফলতা অত্যন্ত করুণ। ব্যক্তিগত যৌন-প্রণয় বা যৌন মুক্তির আওয়াজ সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই। যৌন-মুক্তির ওই আওয়াজ বুর্জোয়া বাস্তবে অবারিত গণিকা-প্রথার গ্লানিতে পর্যবসিত হল। (১৪) এঙ্গেলস্‌ দেখাচ্ছেন, এর আসল কারণ হল প্রকৃত যৌন মুক্তির জন্যে যে সামাজিক প্রস্তুতি প্রয়োজন বুর্জোয়া-সভ্যতার কাঠামোর মধ্যে তা বাস্তবে পরিণত হওয়া সম্ভব নয়। সামাজিক প্রস্তুতিটা হল, মেয়েদের মধ্যে সামাজিক মেহনতের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা, সামাজিক মেহনতের ক্ষেত্রে স্ত্রী পুরুষের সাম্য কায়েম করা। সামন্ততন্ত্রের আওতায় এ-কথা সম্ভাবনা হিসেবেও বাস্তব ছিল না, ধনতন্ত্রের আওতাতেই প্রথম সম্ভাবনা হিসেবে বাস্তব হল। কিন্তু এই সম্ভাবনাকে সত্যিই বাস্তবে পরিণত করতে গেলে ধনতন্ত্রের ভিত্তিই কেঁপে ওঠে—ধনতন্ত্রের পক্ষে আর টেঁকাই সম্ভব হয় না। তাই যৌন মুক্তির যে আদর্শ বুর্জোয়া সমাজে প্রথম শোনা গেল বুর্জোয়া বাস্তবে সেই আদর্শেরই চরম অবমাননা। (১৫)

এই হল এঙ্গেলস্‌-এর বিশ্লেষণ : যৌন মুক্তির আদর্শ পুঁজিবাদী সভ্যতারই আদর্শ অথচ এই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করবার যে অনিবার্য শর্ত—স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সামাজিক মেহনতের সাম্য কায়েম করা—তা ওই বুর্জোয়া সমাজের কাঠামোকেই চৌচির করে দিতে চায়। তাই বুর্জোয়া বাস্তবে বুর্জোয়া আদর্শের অমন করুণ পরাজয়।

কিন্তু ফ্রয়েড প্রসঙ্গে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে না। কেননা, ফ্রয়েডীয় মতবাদ বুর্জোয়া-স্বার্থের সঙ্গে যে কী রকম অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত তার পক্ষে খুবই জরুরী আরও একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। ফ্রয়েড শুধুই যৌন মুক্তির আওয়াজ তোলেন নি, বুর্জোয়া-স্বার্থের সঙ্গে সমান তাল রেখে আপাত-বৈজ্ঞানিক মনস্তত্ত্বের দোহাই দিয়ে প্রমাণ করতে চাইছেন, মেয়েরা সত্যিই ছোট, পুরুষের সঙ্গে সমান-সমান হতেই পারে না। এবং মেয়েরা যে ছোটই তা প্রমাণ করবার আশায় ফ্রয়েড শুধু এইটুকুই বলছেন না যে পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের মধ্যে sublimation বা উৎগতি-র শক্তি অনেক কম (১৬),

নারীচরিত্রের একটি সার্বভৌম লক্ষণ হিসেবে তিনি তাঁর বিখ্যাত penis-envy বা 'লিঙ্গ-ঈর্ষা'-র মতবাদ পেশ করছেন। এই মতবাদের মূল কথা হল, পুরুষ জননঅঙ্গের অনুরূপ একটি অঙ্গ আপন-দেহে নেই বলেই সমস্ত মেয়ে মনে-প্রাণে নিজেকে পুরুষের তুলনায় হীন ও হেয় জ্ঞান করে এবং যদিই বা কোন মেয়ে রোখ করে পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিতে যায় তাহলে বুঝতে হবে তার এই ব্যবহারটা আসলে তার ওই হেয়-বোধের গ্লানি থেকে আত্মরক্ষার প্রয়াস মাত্র (defense reaction)। সাধারণ পাঠকের সহজবুদ্ধির কাছে এই মতবাদটা যতই আষাঢ়ে-কথা হোক না কেন, আধুনিক সাইকোঅ্যানালিটিক্যাল সাহিত্যের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই জানেন এই মতবাদ নিয়ে কতই না গুরুগম্ভীর আলোচনা। আপাতত, সে-আলোচনার খুঁটিনাটি উল্লেখ করবার অবসর নেই ; কিন্তু সমাজ-সচেতন ব্যক্তি মাত্রই অবাক হয়ে স্বীকার করবেন পুরুষ-প্রধান সমাজব্যবস্থার সমর্থনে এমন অভিনব ও ধূর্ত যুক্তি আর কখনো পেশ করা হয়েছে কি না তা অত্যন্ত সন্দেহের কথা। (১৭)

বুর্জোয়া সমাজের দুটো দিকের কথাই ভেবে দেখুন : সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে যৌন-মুক্তির আওয়াজ আবার সমাজতান্ত্রিক আওয়াজের বিরুদ্ধে মেয়েদের হেয় ও হীন প্রতিপন্ন করবার উৎসাহ। এই দুটো কথা স্পষ্টভাবে মনে রাখলে সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েডকে পুঁজিবাদী সভ্যতার অভ্রান্ত প্রচারক বলে সনাক্ত করতে অসুবিধে হবে না। এবং 'প্রতিবন্ধ' নাম দিয়ে ফ্রয়েড যে মতবাদটি পেশ করছেন তার আসল তাৎপর্যটুকুও এই দিক থেকেই বুঝতে পারা যাবে : পুঁজিবাদী সভ্যতার অভ্রান্ত প্রচারক বলেই সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ এককালে তাঁর বিরুদ্ধে বাধা-আপত্তি তুলেছিল। কোন রকম নির্জ্ঞান-রহস্যের কথা বলে ওই 'প্রতিবন্ধ'র ব্যাখ্যা করবার দরকার নেই। আর তাই যদি করতে চান তাহলে আধুনিক দুনিয়ার মুমূর্ষু ধনতন্ত্র কেন অমন মরিয়ার মত ফ্রয়েডবাদ নিয়ে মেতে উঠেছে তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে গোঁজা-মিল চালাতে হয়। আর্নস্ট জোন্‌স্ যেমন প্রায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলছেন, বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে মানুষের সংস্কার দিনের পর দিন দুর্বল হয়ে আসছে। (১৮) তার মানে, মানুষ বলে জীব বুঝি বিজ্ঞানের জন্মশত্রু। কথাটা কিন্তু বাজে কথাই। কেননা বিজ্ঞান তো আর মঙ্গলগ্রহ থেকে কোন রকম বিরুদ্ধ আমদানি নয়, মানুষেরই সৃষ্টি। মানুষ কেন বিজ্ঞানের জন্মশত্রু হবে ? তা যদি হত তাহলে মানুষ হাজার বছর ধরে অমন অক্লান্ত পরিশ্রম আর স্বার্থত্যাগ সহ্য

করে বিজ্ঞানকে গড়ে তুলল কেন? বিজ্ঞান তো মানুষের পরম সুহৃৎ, মানুষকে মুক্তির পথ দেখায়। কোন বিশেষ শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতা করলে পরই সেই শ্রেণী বিজ্ঞানের শত্রু হতে পারে, কিন্তু সমস্ত মানুষ সম্বন্ধে এমনতর কোন কথা বলাটা হল দুনিয়ার কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে ওকালতি করাই। কেননা আজ বিজ্ঞানের অগ্রগতি কায়েমী স্বার্থকে ধ্বংস করার মুখোমুখি হয়েছে।

ফ্রয়েডের ওই তথাকথিত 'প্রতিবন্ধ' সম্বন্ধে মতবাদকে বিচার করতে হলে আরও একটি প্রশ্ন তোলা একান্তই দরকার: আজকের পৃথিবীতে যে-সব দেশে মুমূর্ষু ধনতন্ত্রের পক্ষে বাঁচবার জন্যে সবচেয়ে মরিয়ার মত প্রচেষ্টা সেইসব দেশ-গুলিতেই ফ্রয়েডীয় মতবাদ নিয়ে আজ এমন মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহ কেন? ধনতন্ত্রের নাগপাশ থেকে যে সব দেশ মুক্তি পেয়েছে সেই সব দেশে তো এ-আগ্রহের ছিটে-ফোঁটাও নেই! কোন রকম নির্জ্ঞান-রহস্যের কথা তুলে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া চলে না। কেননা, জবাবটা আসলে সমাজতন্ত্রের কাছ থেকেই পাওয়া সম্ভব। ফ্রয়েডীয় মতবাদ একান্তভাবেই ধনতান্ত্রিক সভ্যতার স্বার্থ-প্রণোদিত, তাই সমাজতন্ত্রের তরফ থেকে কায়েমী স্বার্থ এর বিরুদ্ধে এককালে যে-রকম আপত্তি তুলেছিল আজকের দিনে মুমূর্ষু ধনতন্ত্র সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তার চেয়েও বেশী আগ্রহে এই মতবাদটির উপরই নির্ভর করতে চায়।

ফ্রয়েডীয় মতবাদের সমর্থনে মুমূর্ষু সমাজটার 'প্রতিবন্ধ'র বদলে মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহই। অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ফ্রয়েডীয় মতবাদের তরফ থেকে এই উৎসাহ-প্রাপ্তির প্রত্যুত্তরে একরকম কৃতজ্ঞতাও দিনের পর দিন প্রকট হয়েছে। কৃতজ্ঞতার এই বিকাশটা বিশেষ করে লক্ষ্য করবার মতো। কেননা, ফ্রয়েডীয় মতবাদ এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজটার কাছ থেকে যত বেশী উৎসাহ পেয়ে চলেছে ততই দিনের পর দিন যৌন মুক্তির ওই পুরনো আওয়াজটা বদলে এমন সব নতুন ধরনের আওয়াজ তুলেছে যাতে এই মুমূর্ষু সভ্যতার অনেক প্রত্যক্ষ, অনেক নগদ লাভ। অর্থাৎ, ফ্রয়েডীয় শ্লোগানগুলিরও ইতিহাস আছে। প্রথমে ছিল যৌন মুক্তির শ্লোগান। কিন্তু সে-সময়ে এই শ্লোগান বুর্জোয়া সভ্যতার পক্ষে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে-যতই সুবিধে সৃষ্টি করুক না কেন কিছুদিন পরেই দেখা গেল এই শ্লোগানের উপরই খুব বেশী জোর দিতে থেকে বুর্জোয়া সভ্যতার পক্ষেই চিড় খেয়ে চুরমার হয়ে যাবার ভয়। ফ্রয়েডীয় মতবাদের

স্লোগান তাই বদলাল। Sense of guilt বা 'পাপবোধে'র উপর ঝোঁক, আর তারপর Aggression বা জিঘাংসার উপর ঝোঁক। এই 'পাপবোধ' এবং 'জিঘাংসাবৃত্তির' কথা প্রচার করলে মুমূর্ষু ধনতান্ত্রিক সভ্যতার লাভটা কী বিলক্ষণ তা আন্দাজ করা কঠিন নয়। পাপবোধের কথায় সংগ্রামী মানুষের দীপ্ত চেতনা ঝিমিয়ে আসবে, জিঘাংসাবৃত্তির কথা বলে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে সমর্থন করা চলবে। কিন্তু তারপর আরও আছে। Death-instinct বা মরণ-বৃত্তির কথাও। মানুষ যে শুধুই খুন করতে চায় তাই নয়, মরতেও চায়। ফ্রয়েডের কল্পনাশক্তি বাস্তবিকই দুর্ধর্ষ: এই মরণবৃত্তির কথাটা ব্যাখ্যা করে তিনি বলছেন, এ যেন পঞ্চভূতের পিছুটান। (১৯) শেষ পর্যন্ত পঞ্চভূত থেকেই তো উৎপত্তি, আমাদের মনের কোনায় এই পঞ্চভূতের দিকে ফিরে যাবার একটা আকর্ষণ থাকা আর বিচিত্র কী? জন্মাদস্ত যতঃ অথচ, এই মরণবৃত্তির মহিমা শুনিয়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে কামানের খোরাক জোগাড় করা কত সহজ!

তার মানে, ওই তথাকথিত প্রতিবন্ধের বদলে ফ্রয়েডীয় মতবাদের কপালে যতই জুটেছে রাজসম্মান ফ্রয়েডবাদও ততই পুরনো কাদের আওয়াজ তুলে এমন নতুন নতুন আওয়াজ তুলতে শুরু করেছে যার দরুন এই মুমূর্ষু সমাজটার প্রত্যক্ষ থেকে প্রত্যক্ষতর নগদ বিদায়। ফ্রয়েডবাদের কথা আর এই ধনতান্ত্রিক সভ্যতার কথা তাই আলাদা করে দেখা চলে না।

এই তো ফ্রয়েডের 'প্রতিবন্ধ'-সমাচার। এবং ফ্রয়েডের নিজের মতেই সামাজিক ভাবে ফ্রয়েডীয় মতবাদের বিরুদ্ধে যে 'প্রতিবন্ধ' তা আসলে চিকিৎসা প্রসঙ্গে দেখতে পাওয়া 'প্রতিবন্ধের'ই পরিবর্ধিত সংস্করণ। এই পরিবর্ধিত সংস্করণটিকে যাচাই করবার সুবিধেই বেশী,—শুধুমাত্র বৃহত্তর বলেই নয়, বন্ধ ঘরের কথা তুলে যে-রকম রহস্য-সৃষ্টির সুযোগ এখানে তার অভাব। এবং এই বৃহত্তর সংস্করণটির সম্যক বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যায় এর পিছনে কোন নির্জ্ঞান রহস্যের সন্ধান করার পথটা ভুল পথ, কেননা এর পিছনে যেটুকু যাথার্থ্য তা নিছক একটি সামাজিক যাথার্থ্যই।

(ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলের অন্যান্য দিকগুলি ও চিকিৎসাক্ষেত্রে তার বাস্তব তাৎপর্য নিয়ে আলোচনার জায়গা এই সংখ্যায় পাওয়া গেল না, ভবিষ্যতে সে-আলোচনা তোলবার আগ্রহ রইল: লেখক।)

পাদটীকা

(১) Rouben Osborn (*Freud and Marx* : London, 1937), Jack Rapaport (*Marxism & Psychoanalysis* : Science & Society, 1941), Burrill Freedman & Walton van Clute (*Dialectical Aspects of Psychoanalysis Misunderstood* : Psychoanalytical Review, vol. 31, 1944), ইত্যাদি। এঁরা সকলেই ফ্রয়েডকে পাকাপোক্ত ডায়লেকটিক্যাল মেটিরিয়ালিস্ট বলে প্রতিপন্ন করতে চান।

(২) "Psychoanalysis has provided a pseudo-scientific rationale for every phase of capitalist activity—from selling TV sets to promoting imperialist war." (Lloyd L. Brown : *Masses & Mainstream* : October, 1951).

"Psychoanalysis in 1949, taken as a whole, appears first of all as an ideology which is being spread among the broadest social strata by means of the most varied propaganda techniques" (*Psychoanalysis* : *A Reactionary Ideology*, Eight French Psychiatrists : *La Nouvelle Critique*, June 1949).

সাম্প্রতিক মার্কিন দেশে সাইকোঅ্যানালিসিসের বাজার কী রকম গরম তা বোঝা যায় বেনজিয়ামের অনেক হাস্যরসিকের (কমিউনিস্ট নয়) একটি রসিকতা থেকে। তিনি বলছেন, একজন হয়ত একটা নাপিতের দোকান দিল। দোকানটা চলল না। তাহলে নতুন কোন ব্যবসা ফাঁদা যায় ? এই চিন্তায় সে হয়ত একটা সাইকোঅ্যানালিটিক্যাল পত্রিকা বের করল।

(৩) Jud Marmor (*Psychoanalysis* : The Philosophy of the Future, New York, 1949) ইত্যাদি।

(৪) "By a process of development against which it would have been useless to struggle, the word 'psychoanalysis' has itself become ambiguous. While it was originally the name of a particular therapeutic method, it has now become the name of a Science—the Science of unconscious mental processes." (Freud : *An Autobiographical Study*). তাছাড়াও, *New Introductory Lectures*-এর Lecture XXXV, দ্রষ্টব্য। মনে রাখতে হবে সহজবৃত্তি সংক্রান্ত নিজের মতবাদকে তিনি "mythology of psychoanalysis" বলে বর্ণনা করেছেন (New Introductory Lectures, p. 131).

(৫) Studies in a Dying Culture : Christopher Caudwell (London, 1938).

(৬) "Some of us, together with a number of non-Marxist psychiatrists and psychologists thought at first that a criticism of psychoanalys is would have to lead to a distinction between

certain data of psychoanalysis considered as valid and what is usually called its "metapsychology"......"Nevertheless,......we have become convinced, as a result of our self-criticism, that the *ensemble* of psychoanalytic theories is tainted by what we may call a "mystifying principle" (*La Nouvelle Critique*, June, 1949).

(৭) Problem of Lay Analysis (London, 1928) pp. 121-123.

(৮) Introductory Lectures on Psychoanalysis.

(৯) Ibid pp. 240-241.

(১০) Ibid pp. 16-18.

(১১) Problem of Lay Analysis p. 185.

(১২) Masses & Mainstream, Dec. 1949. p. 13.

(১৩) Reminiscences of Clara Zetkin.

(১৪) The Origin of Family, Private Property and State. (Sec. II, Family দ্রষ্টব্য) ।

(১৫) Ibid.

(১৬) Civilization & its Discontents.

(১৭) এই প্রসঙ্গে ফ্রয়েডীয় নারীত্ব-মনোভাব (concept of femineninety)-র কথাও মনে রাখতে হবে : ভোগযুক্ত (passive), সমর্পণাত্মক (submissive), ইত্যাদিই এই মতে নারীত্বের মূল লক্ষণ ।

(১৮) *Ernst Jones* : Psychoanalysis (Bemis Series) p. 1.

(১৯) *Freud* : Collected Papers, vol. II. p. 255.

যাদু

অরুণ চৌধুরী

"খোদার করে, বাঁটার মোক্তে য্যান্ কোনও বিপদ আপদ না হয়!"

পশ্চিম দিনাজপুর পেছনে ফেলে, রাজশাহী জেলার মধ্যে ঢুকে, খাড়া দক্ষিণে যেতে যেতে, ঠিক যেখানটায় এসে আত্রাই নদী সুস্পষ্টভাবে প্রায় পুব মুখে ঘাড় বাঁকিয়ে চলতে আরম্ভ করেছে, সেই মস্ত বাঁকটার যেখানে আরম্ভ, ঠিক সেই জায়গাটিতেই হচ্ছে কালুকেপুরের ঘাট। এই ঘাট থেকে বের হয়ে, যে-রাস্তাটি পরানপুরের মধ্যে দিয়ে গিয়ে, বউতলীর হাটের পাশ দিয়ে পশ্চিম মুখে বহুদূর চলে গিয়েছে, সেই রাস্তাটি ধ'রে হন্ হন্ করে এগিয়ে চলল মছিরুদ্দিন।

সময়টা তখন উনিশশো পঞ্চাশ সালের শুরু। দিনটা ছিল ফেব্রুয়ারি মাসের শেষাশেষি। বাতাস থেকে পাটপচা জলের বিশ্রী গন্ধের শেষ রেশটুকু বহুদিন আগেই মিলিয়ে গিয়েছিল। তার বদলে তখন, আখের রস আর পাকা ধানের মনমাতানো গন্ধের সৌরভে, সমস্ত গ্রামাঞ্চলটা রম্ রম্ করছে; শীতের দুপুর দেখতে দেখতেই গড়িয়ে যেতে চায়। রোদের কোন তীব্রতা নেই, যা আছে তা-হচ্ছে একটা অতি সুখকর-উষ্ণতা। কিন্তু এই নেশা-ধরানো মিঠে ভাবটুকু উপভোগ করবার মতো একটা শিথিল সহজ মানসিক বিলাসিতার অবকাশ তখন মছিরের মোটেই ছিল না। অন্ততপক্ষে কালামাথার ঘাট পার হয়ে যেতে পারলে, তবেই সে একটু নিশ্চিন্ত হতে পারবে—তার আগে নয়। সেই অক্টোবর মাসের ধরপাকড়ের পর থেকে পুলিশ, টিকটিকি আর জমিদার-জোতদারের দালালদের দৌরাত্ম্যে মছিরের সহজ জীবন তছনছ হয়ে গেছে। তার নিজের গ্রামে তো-বটেই, আশে-পাশের আট-দশখানা গ্রামে দিনের আলোয় তার বের হবার কোনও যো নেই। তাই, রাতারাতি ছয়-সাত মাইল হেঁটে এসে, পরানপুরের কাছে এক জায়গায় তার এক খালাতো ভাইয়ের বাড়িতে সে উঠেছিল। দুপুর-বেলায় খাওয়া-দাওয়া সেরে, সেখান থেকে বের হয়ে বউতলীর হাটের উদ্দেশে

পথ ধরেছে। হাটেই গফুরের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা—কী একটা জরুরী পরামর্শ করবার জন্ত। গফুর লোক মারফত তাকে ঐ তারিখে বউতলীর হাটে উপস্থিত থাকতে জানিয়েছে। গফুরের বর্তমান অবস্থাও তারই মতো।

হাঁটতে হাঁটতে মছির কালামারার ভাঙনার কাছেই এসে পড়েছিল। উত্তরে ছাত্‌রার বিল থেকে একটা খাড়ি বের হয়ে বইতে বইতে ঠিক এই জায়গা দিয়েই গিয়ে পড়েছে মান্দার বিলের মধ্যে। বর্তমানে জলের বেগ নেই। মৃদু একটা স্রোত ঝির ঝির করে চলেছিল শুকিয়ে-যাওয়া লাল খটখটে পাথারের মধ্য দিয়ে মান্দার বিলের সদাজলমগ্ন প্রদেশের দিকে। রাস্তার ঐ ভাঙনধরা অংশটায় জল এখন যা আছে, তার চেয়ে কাদাই বেশি। জল পার হয়ে, হাত পা ধুয়ে, আকাশের দিকে তাকিয়ে সূর্যের অবস্থানটা মছির একবার দেখে নেয়।—'নাঃ, আছেরের বেল হয়নিকো',—সে মনে মনে বলে—'হাটে যাইয়াই নামাজ পড়া হোবেহিনি'।

এবার মছির একটু পা ছেড়ে দিয়েই হাঁটে। এই খাস বরিন্দার লোক কেউ আর তাকে চেনে না! রাশ আলগা পেয়ে এতক্ষণে তার ভাবপ্রবণ মনটা কল্পনায় ভেসে চলল। দূরে ধুলো উড়িয়ে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করতে করতে একটা পর্দা-ঘেরা মোষের গাড়ি চলেছে। বহুদিনের পুরানো একটা স্মৃতি মছিরের মনে পড়ে যায়। একবার তরফদারদের এক কুটুমকে নিয়ে সে এই পথ দিয়ে গাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া, ধান কাটার মরশুমগুলোতে আরো বহুবার সে কাস্তে হাতে করে এই পথে রহনপুর পর্যন্ত গিয়েছে। সে জানে, বহুদূর পশ্চিমে গিয়ে এই পথটা এক জায়গায় মিশেছে দিনাজপুর গোদাগাড়ি সড়কে। সেখান থেকে দক্ষিণে চলে যাও—আমনুরার ইস্টিশানের ওপর দিয়ে চলে যাবে একেবারে গোদাগাড়ি ঘাটে। উত্তরে যাও—পোরশার মধ্য দিয়ে চলে যাবে বরাবর দিনাজপুর পর্যন্ত। তবে মছির নিজে অতদূর যায়নি। ঐদিককার লোকের মুখেই সব শোনা। তার যাওয়া ঐ রহনপুরের আশেপাশেই। ইদানীং ধান কাটতে সে আর ওসব মুলুকে যেত না। কারণ, নবাবগঞ্জ শিবগঞ্জের দিককার দিয়াড়া পাইঠেই ধান কাটার মরশুমটা আজকাল ওখানে গিজগিজ করে। দেহে যে কালে ছিল রক্তের চঞ্চলতা, মনে ছিল সদাই অহেতুক উন্মাদনা, সেই পরিপূর্ণ কৈশোরের সুখ-স্মৃতিতে বুঁদ হয়ে মছির বেশ একটু অন্যমনস্কই হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ পেছন থেকে খট খট শব্দ হতেই, সে চমকে উঠে পেছনে চাইল। তাকিয়ে দেখে

ঘোড়ায় চড়ে কে একটা লোক আসছে। তার বুকটা টিপ টিপ করতে লাগল। যদি কোনও জোতদারের লোক হয়? বেকায়দা কোনও কথা যদি জিজ্ঞাসা করে বসে? না, বাঁচা গেল। লোকটা একটা মশলা-গুড়ি-আলাপাঁতার দোকানদার, হাট করতে চলেছে। মহির একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। কিন্তু, সত্যি! এমনি করে আর থাকা যায় না। খাওয়া নেই, ঘুম নেই, আত্মীয়-কুটুমেরা আশ্রয় দিতে ভয় পায়, রাতদিন দুশ্চিন্তা আর দুশ্চিন্তা—এই কয় মাসেই সে একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছে। কোনও মতে সহজ জীবনযাত্রাটা কি আর ফিরে পাওয়া যায় না?

মহিরের বয়স সম্ভবত বছর চল্লিশ পার হয়ে গেয়ে গেছে। চুলে পাক ধরেছে। মুখে যা সামান্য দাড়ি, তাও নিরঙ্কুশভাবে আর কালো নয়। নিজের জমি মাত্র বিঘা তিনেক। দূর সম্পর্কের এক চাচাতো ভাইকে তা' আধি দিয়ে সে নিজে পাইট খেটে খায়। জীবনে তিন-তিনবার সে অন্যের জমি আধি নিয়ে হাল করবার চেষ্টা করেছিল—কিন্তু তিনবারই শেষ পর্যন্ত তাকে হাল ভাঙতে হয়েছে। দু'বার বলদ মারা যাওয়ার জন্য এবং শেষবার বার বার দু'বছর অজন্মা হওয়ার জন্য। সেই থেকে তারও জীবনস্বপ্নে ফাটল ধরেছিল। সে ফাটলে আর জোড়া লাগে নি। দেনমোহরের জন্য পর্যন্ত টাকার অভাবে প্রথম জীবনে বিয়ে করা হয়নি। বছর পাঁচেক আগে, খুব উঠে পড়ে সে একবার নিকের জন্য চেষ্টা করেছিল, তাও শেষ পর্যন্ত ভেঙে গিয়েছিল। দেহ নিস্তেজ, মন অবসন্ন, বিষাদে জীবনের সমস্ত স্বাদ তেঁতো হয়ে উঠেছে। এমনই সময়ে দক্ষিণ অঞ্চল থেকে বন্যার জোয়ারের মতো কৃষক সমিতির আন্দোলনের ঢেউ উঠে এসে একদিন তাদেরই গ্রামে ধাক্কা মারল। কেমন করে যেন মহির সেই আন্দোলনের সঙ্গে দিনে দিনে নিবিড়-ভাবে জড়িয়ে পড়ল। বিশেষ করে পাশের গ্রামের যুবক সাদেক আলির সংস্পর্শে এসে তার চোখের সামনে এক নতুন দুনিয়ার দরজা খুলে গিয়েছিল। জমিদার-জোতদারদের অত্যাচার-উৎপীড়নের দিন শেষ হয়ে যাবে, কৃষকদের হাতে আসবে জমি। সারা মাঠের ফসল আর গিয়ে উঠবে না বিশ্বাস আর তরফদারদের গোলায় বা ভকতদের খামারবাড়িতে। তার বদলে, কৃষকদের ঘরে ঘরে ফসল। বছরের খোরাকের ভাবনা নেই, নেই ক্ষুধা আর কান্না, পেট ভরে দু'বেলা ভাত। খই চিড়ে মুড়ি মুড়কি পিঠে আর পুলি, ছোট ছোট ছেলেরা খাবে আর আঙিনায় নেচে নেচে বেড়াবে। দেখতে দেখতে গড়ে

উঠবে রাস্তা-ঘাট, এক কোমর জলের মধ্যে দিয়ে বর্ষাকালে খপর খপর করে হাটে যাওয়া-আসা করতে হবে না। তল্লাট জুড়ে খুলবে ডাক্তারখানা, হাসপাতাল, বসবে ইস্কুল। গ্রামে গ্রামে খেলার ময়দান, রাত লাগতেই আলো-ঝলমল নাট্যশালা। ভাবতে ভাবতে মছিরের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠত। কিন্তু সেই সময়ে সে বুঝতে পারেনি এই স্বপ্ন সফল হওয়ার পথ এত রকম কাঁটায় আচ্ছন্ন, ভাবতে পারে নি এই পথ চলায় এতখানি ধৈর্যের প্রয়োজন। ধরপাকড়ের ভয়ে লোকে আজ একেবারে আড়ষ্ট হয়ে আছে। মিটিং-মিছিলের পুরানো জলুস আর নেই। কারো বাড়িতে গেলে সহানুভূতি আজো পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু তারা উপদেশ দেয় যে অবস্থাটা একটু সামাল দেবার জন্যে কর্মীদের পক্ষে দিনকতক ভিন্ন জায়গায় গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকাই ভাল। অন্য তো কিছু নয়, এই লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা যায় না, সদা সর্বদা একটা দুশ্চিন্তা, দিনের বেলা হলেই আশ্রয়ের সমস্যা। এই অবস্থাই মছিরকে পাগল করে তুলেছে।—'দেখা যাক গফুরা কী কয়'। সে জোরে জোরে পা ফেলে।

হাট তখনও জমে ওঠেনি। মছির পুকুরে হাতমুখ ধুয়ে, ওজু করে জুম্মার ঘরে ঢোকে। নামাজ শেষ করে পুকুরের ওপারে যেখানে হাঁস-মুরগীর হাট বসেছে, সেখানে গিয়ে একটু জিরিয়ে নেবার মতলব করে। এমন সময়ে গফুরের দেখা।

"ক্যা চাচা। কত্‌থ্যান্? এক্কেরে এ্যালা'য়ে গেল্যা যে?"

"এখনি আছুরে বাপু।" মছির জবাব দেয়, "কবলই ধমক সারাচ্ছি।"

"তুমি এ'টে থা'কে ন'ইড়ো না য্যান্। হামি চ্যাড্ডা জলপান কিন্তা নিয়্যা আসি। ক্যা'ল আইত থ্যাকা প্যাটে এক্কেরে কিচ্ছুই পড়েনিকো।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই গফুর গামছায় বেঁধে কিছু মুড়িমুড়কি কিনে নিয়ে আসে। দুজনে মুখোমুখি বসে তাই চিবোতে শুরু করে।

"জানে তো আর সয় না চাচা।" গফুর প্রায় ভেঙে পড়ার মতো। "হায়রে আল্লা! কো'টে থ্যাকল হামার বাড়িঘর আর কো'টে হামি! নিদ নাই, গোছল নাই! মাশনা-লাগা মানুষের লাকান্ পাথারে পাথারে ঘুর‍্যা মরিচ্ছি।"

গফুরের বয়স বছর পঁচিশেক হবে। খানিকটা চঞ্চল প্রকৃতির ছেলে সে। কিন্তু সাদেক আলির প্রভাবে আর আন্দোলনের জোয়ারের মুখে সে এসে

এদের দলে যোগ দিয়েছিল। আজ অধৈর্য হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ঘরে-ফেলে-আসা সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীর কথা যখন তার মনে পড়ে যায়, তখন সে প্রায় দিশেহারা হয়ে ওঠে। এমন কি সমস্ত লজ্জা-সংকোচ ত্যাগ করে সেই কথা মুখ ফুটে বলতেও আর তার দ্বিধা হয় না।

হাটের মধ্যে ভালমন্দ নানান রকমের লোকই তো আছে, কে কোথায় শুনে ফেলে, মহির সে জন্যে খুব উদ্বিগ্ন বোধ করে। গলা খাটো করে বলে, "ক' গফুরা"—সে এদিক ওদিক তাকিয়ে একটু নরম স্বরে বলে, "তে কি করবু ক'। খোদায় যদি মারে তে কে ঠেকায় ক' দিনি।"

"হামার জিয়ে আর জি কুলায় না।"

মহিরের মানসিক অবস্থাও তো প্রায় ঐ রকমই। কিন্তু তবুও, অধৈর্য হয়ে চেঁচামেচি করলে তো চলবে না। "তা বুলে তুই পাগলা খ্যাপার মতো চ্যাচাবু কি কাজ্যে', মহির একটু সংযতভাবে বলে, "কোনও বুদ্ধি থাকে তো তাই ক'।"

গফুর অধৈর্য হয়ে বলে, 'হামি বাড়িত্ যামো।"

"অবভাবে, একেরে শউরের বাড়িত নিয়্যা যায়ে যদি তোক্ শিলায় ?"

"হামি আগেই দারগার কাছে যায়ে হা'জর‍্যা দে'মো।"

মনে হল গফুর যেন একটা স্থিরীকৃত সংকল্পকেই ব্যক্ত করল। এ-কথা শুনে মহির প্রথমটা একটু থ হয়ে গেল। সেও অনেক রকম ভাবে অনেক কথা ভেবেছে, কিন্তু আত্মসমর্পণ করে সমস্যা সমাধানের কথাটা একবারও তার মাথায় আসেনি।

"আইতে আঁধারে ঘুর‍্যা ঘুর‍্যা, তোমাক্ হামাক্ দিয়্যা কোন্ কামডা হো'চ্ছে তাই শুনিদিনি চাচা ?"

গফুরই পাল্টা প্রশ্ন করে বসল। প্রকৃত পক্ষে তারা যে বর্তমানে বেফয়দা ঘুরে মরছে, এ কথাটা মহিরেরও মনে হয়েছে। কিন্তু তাই বলে ধরা দিয়ে জেলের মধ্যে বসে বসে পচাতেই বা কি ফয়দা আছে।

"দারগায় যদি তোমাক্ কয়েদ কর‍্যা রাখে ?"

"কান্নাকাটি ক'রমো। হামার ভালমন্দ কোনও আপত্তি যদি নাই-ই শোনে, না হয় দু তিন মাস ফাটকের মো'দ্ধে রা'খবেহিনি। অবভাবে তো খালাস পা'য়ে খ'সে আইসপোই !"

দারোগারা দয়াধর্ম করবে কিনা এ-বিষয়ে মহিরের ঘোর সন্দেহ। কিন্তু

তবুও গফুরের কথাটা সে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারল না। দুতিন মাস আটক থেকেও পরে যদি এসে লোকের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশার সুযোগ পাওয়া যায়, তাহলে কথাটা খুব খারাপ নয়। বিশেষ করে এখন তো আসলে সবাই বেকার—কিছু করা তো হচ্ছেই না, কী আন্দোলন যে করবার আছে না আছে তাও তো সঠিক কেউ বলতে পারছে না।

"য্যাবা তো চলো চাচা।" গফুর একেবারে স্থিরসংকল্প।

"কোঠে ?"

"থানাত্।"

মছির চমকে উঠল। এখুনি? এই মুহূর্তে? এত বড় একটা সিদ্ধান্ত কি হঠাৎ করে নেওয়া সম্ভব?

"ধন্দো মা'রে গেল্যা যে। মত কর, তে হামার সাথ যাঁটা ধর। মত না কর, হামাক্ আর আটকা'য়ে র‍্যাখো না", গফুর তাড়া লাগায়।

"সাদেক আলির সাথ কী একটা কথা বোলা লাগিছিলো না?"

"তে তুমি থাকো। সাদেক আলি নিজেও য্যাবে না—হামাকেরেও যাওয়া মঞ্জুর ক'রবেনানি।

"সাদেক আলিক্ কি খবর করা হোছিলো?"

"হামিই তো দেখা করিছিলাম। অর বিবেচনায়, ইডা করা বুলে ঠিক লয়। আর নিজে তো ঐ কাম ক'রবেই না কো। মানুষে বুলে খারাপ কোবে। কো'লো—হামার বুড়াক তো জানো, উঁই যে সে গোঁয়ার লয়। ই কাম করলে উঁই-ই হামাক আর বাড়ির তি সীমানায় সাঁদাবার দিবেনানি।"

মছির মাথা নাড়ে, "কথাটা মিথ্যা লয়।"

মছির জানে বুড়ো তার বেটা সাদেক আলিকে একথা একদিন বলেও ছিল যে এ সব হচ্ছে মরদের কাজ। মরদের হিম্মত বুকে নিয়ে এসব কাজে নামো তো ভাল। হিম্মত না থাকে, নেমো না। কিন্তু একবার মাথা দিয়ে এসব কাজ থেকে পিছু টান দেওয়া চলবে না। বুড়ো সত্যিই খুব গোঁয়ার'।

গফুর আবার তাড়া লাগায়, "তোমার নিজের মোনডা কি কয়, তাই হামাক বোলো।"

"কিন্তু, যাও তে নগাঁও চলো। ওটি হাকিমের কাছে যা'য়ে সব কথা কওয়া হোক।"

"ক্যান হাঁ-টে ?"

'হাঁটে গেলে অহির বিশ্বাস বা বুদ্ধি দিবেহিনি, দারগার তাই-হ ক'রবেনি। হাম্‌বা অহির বিশ্বাসের ব্যাপার বন্দো করিছি। উই যদি তোমাক্ হামাক্ নাগালের ম'দ্দে পায়, তে জি কী করবে তা আর কওয়া ল্যাগবে না।"

শহরের হাকিম-হুকুমের মন-মেজাজ কি রকম অনুকূল হবে না হবে তা ঠিক ধারণা করতে না পারলেও, পকুরের চোখের সামনে অহির বিশ্বাসের এক হিংস্র চেহারা ভেসে উঠল আর ভেসে উঠল দারোগা-পুলিশের সঙ্গে তার মিল-মুহব্বতের ছবিখানা। কিন্তু সে তো স্বেচ্ছায়ই ধরা দিতে যাচ্ছে! দারোগা কি সে কথাটা বুঝবে না। যাই হোক, অবশেষে মছিরের পীড়াপীড়িতে স্থির হল যে এখানে নয়, ধরা দিতে হলে একেবারে নওগাঁ শহরেই যাওয়া উচিত।

হাট তখন ভাঙা-ভাঙা। মানুষজন অনেক পাতলা হয়ে এসেছে। এবার উঠতে হয়। মছিরের আবার মগরেবের নামাজের সময় হয়ে গেছে। পকুর বিরক্ত বোধ করে, "তোমার লাকান্ মুসল্লী মানুষেক নিয়্যা হাঁটায় বাপ্ জবের মুশকিল।"

মছির একটু কুণ্ঠিতই বোধ করে। দুনিয়ায় হালচাল দেখে-শুনে খোদার ওপর তার আস্থায় কাটল ধরেছিল। কিন্তু তবুও দীর্ঘকালের একটা অভ্যাস, পাঁচ ওখতো নামাজ না পড়লে মনটা তার কেমন যেন একটু খুঁত খুঁত করে। তাছাড়া, সামান্য একটু সময় নামাজের জন্য ব্যয় করা এমন একটা কিছু অসুবিধার নয়। ঈষৎ হেসে, ওজু করবার জন্য সে পুকুরঘাটে যায়।

অনেক মাথা কুটোকুটি করে চুলচেরা বিচার-বিবেচনার পর তারা ঠিক করল যে সন্ধ্যারাতেই তাদের কালুকেপুরের ঘাট পার হয়ে যেতে হবে। রাতটা ওপারে আশেপাশের কোনও গ্রামে কাটিয়ে, ভোর রাতে নদীর ধার দিয়ে হেঁটে, সূর্য ওঠার আগেই যোদ্‌বাজারের বন্দর পার হয়ে যাবে। তার পর সেখান থেকে নৌকো ভাড়া করে নওগাঁ যাবার যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে। প্রকৃতপক্ষে ঘাট পার হতেও বিশেষ কোনও বেগ পেতে হল না। সমস্যা হল তাদের রাত কাটানোর জন্য একটা উপযুক্ত জায়গা পাওয়া নিয়ে। অবশেষে আশাতিরিক্ত একটা উপযুক্ত জায়গাও মিলে গেল। নদীরই ধারে পথের ওপরে একখানা মোষের গাড়ি ধুরি ভেঙে পড়ে ছিল। ছইটাও তার বেশ ভাল। গাড়িওয়ালা সম্ভবত তার মোষজোড়া নিয়ে

রাতের মতো পাশেই গ্রামের ভেতরে কোনও জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে। গফুর আর মছির্দ্দিন পাড়ির মধ্যে খানিকটা ঘুমিয়ে নেওয়া স্থির করল।

ঘুম কি আর আসে? পেটে ভাত নেই। তাতে শীতের রাত্তির। নদীর হাওয়া এক একবার হাড়ের মধ্যে কাঁপুনি তুলে দিয়ে যায়। দুইজনে জড়াজড়ি করে কোনও মতে শুয়ে থাকে। নদীর ওপারে কিছু দূরে এক জায়গায়, খুরশালে আখের রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি করা হচ্ছিল। নতুন গুড়ের সুন্দর একটা গন্ধ—বুভুক্ষু গফুরদের জিভে জল আসবার মতো অবস্থা হয়। লোকজনের হাসি, টুকরো-টুকরো কথাবার্তা মাঝে মাঝে হাওয়ায় ভেসে আসে। কিন্তু সব চাইতে প্রলুব্ধ হয়ে উঠছিল তারা তখনই, যখন চোখ খুললেই খুরশালের সেই অগ্নিময় উষ্ণ পরিবেশটুকুর দূরবর্তী দৃশ্যটা বারে বারে তাদের চোখে পড়ছিল। নদীর কিনারেই পাস্তা খাওয়ার কাছে একখানা ছোট জেলে-ডিঙি রাখা ছিল। গফুর তো একবার প্রস্তাবই করে বসল, ওপারে গিয়ে খুরশালে আশ্রয় গ্রহণ করবার জন্য। কিন্তু মছির কিছুতেই রাজী নয়। সব লোক তো সমান নয়। কাছেই থানা-পুলিশ আছে, কখন কি হয় কেই বা বলতে পারে? গফুর মছিরের এত গোঁয়ার্তুমির যৌক্তিকতা খুঁজে পায় না। যখন পুলিশের কাছে ধরাই দিতে যাওয়া হচ্ছে, তখন এত চুপি চুপি করবার কী মানে হয়?

শেষ রাতে মছির গফুরকে ঠেলে, "ওঠ ওঠ!"

"কি শক্কোক্ হো'ছে?"

"শক্কোক্ হওয়া লাগবে, তে' রওনা হবু?" মছির ধমকে ওঠে, "দেখতুছু না, পোঁহাতি তারা কোনঠাই জলজল করতিছে? শক্কোক হ'বার দেরি আছে ক্যা?"

দুইজনে উঠে নদীর পার দিয়ে রওনা হয়। যোদবাজার বন্দরে পৌঁছানোর আগেই রাত ফর্শা হয়ে গেল। ভাগ্য ভাল, একটা নৌকো পাওয়া গেল। তা, সে নৌকো আবার নওগাঁ যাবে না, যাবে ত্রিমোহিনী পর্যন্ত। হোক্, তাই হোক। ওরা দুইজনে ভাড়া মিটিয়ে নৌকোয় চড়ে বসল।

বাঁদাইঘাড়ার কাছে ঘাটে নৌকো লাগিয়ে, মাঝি যখন জলপান কেনবার জন্য বাজারের মধ্যে গেল, সেই সুযোগে মছির বলে, "এ গফ্রা, কামডা কিন্তক খুব বিবচনার কাম হো'লো না রে বাপু।"

"ক্যা?"

"মানুষে কি কো'বেরে বাপু! পুলিশের খানাতল্লাশীত মানুষের বাড়ি ধ্যা'কা ধরা পনুছনি—ধরা পনুছনি! সী এক সতন্তর কথা। অনাশৃষ্টি, যা'চে বা'য়ে কাঁদেত পড্ডা—"

"মানুষে কোবেনি!" গফুর দাঁতমুখ খিচিয়ে ওঠে, "তে' এখন মানুষে খ্যাবার ভাত দেয় না ক্যা? ও'খ্যার ঠাঁই দেয় না ক্যা?"

'মানুষে তোমাক হামাক বাচাই করে নিবে না?' মহিরদ্দিন ফুঁসে ওঠে, 'বাজারে নিবে না হামরা লোকগুলা খাটি কি মেকি?'

'ওরে হামার বা'জানা আলা রে! বুইছি, সাদেক আলির মন্তর তোমাকে নাগিছে!'

মহির কি যেন একটু প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল। গফুর আবার সেঁটে উঠল, "অর সাথে হামারও নাচা লা'গবে? অর কি? ভাল মানুষ একটা শউর প্যাছে, বৌকোনাক শউর বাড়ি রা'খে দিছে। ভাত-কাপড়ের ভাবনা নাই। নিজিও মোস্তে সোস্তে যা'য়ে দিব্যি আরামে বৌয়ের উশমে উশমে শুয়ে ঘুমায়ে রাত কা'টাচ্ছে! অর কি?'

ঈর্ষায় গফুরের মস্তিকটা যেন শুকিয়ে চড়চড় করে ওঠে।

কিন্তু হঠাৎ মাঝি এসে পড়ায় ওদের কথাবার্তায় ছেদ পড়ল। সাদেক আলির অবশ্য সত্যিই কিছু কিছু সুবিধা আছে। কিছু বাড়াবাড়ি হলেও, গফুরের কথাটাকে মহির একেবারে উড়িয়েও দিতে পারে না।

ত্রিমোহিনী পৌঁছুতে পৌঁছুতে জোহরের বেলা হয়ে গেল। মাঝিকে ভাড়ার পয়সা চুকিয়ে ওরা নৌকা ছেড়ে দেয়। দেশ থেকে এতদূরে কে আর কাকে চিনবে? একটু ছাড়া পেয়ে গফুর বেশ খানিকটা হাল্‌কা বোধ করছে। কতদিন যে, জলে গা ডুবিয়ে ভাল করে স্নান করা হয় নি! চুলকানি-পাঁচড়ায় শরীরটা যেন পচে যাবার উপক্রম হয়েছে। তবনটা ছেড়ে, গামছা পরে জলে নেমে সাঁতার কেটে মনের আনন্দে সে স্নান করতে লাগল। মহির তাড়াতাড়ি স্নান সেরে, সামান্য দূরে একটা জুম্মা-ঘরে নামাজ পড়তে গেল।

নামাজ সেরে, মসজিদ ছেড়ে বড় সড়কের ওপর পা দিয়েই দূর থেকে মহির দেখতে পায়, রাস্তার ধারে শাদা চুল শাদা দাড়িওয়ালা এক বুড়ো দুহাতে মাথা ধরে, মাটিতে বসে পড়ে ওয়াক ওয়াক করে বমি করছে আর মাঝে মাঝে কি যেন সব বলছে। প্রায় দশবারো জন লোক তার চারপাশে ভিড় জমিয়েছে। মহির উদ্বিগ্নভাবে এগিয়ে গেল।

'হা খোদা! হায় আল্লা রসুল! হামার দ্যাশের ই কি হোলো!'

সে এক বুকফাটা আপসোস। দিন কয়েক আগে বৃদ্ধ গিয়েছিল তার মেয়েকে শ্বশুর-বাড়ি রেখে আসতে। জায়গাটা জয়পুরহাট স্টেশন থেকে সামান্য কিছু দূরে। ফিরছিল সকালে, আসাম মেলে। পথে সান্তাহার স্টেশনে ট্রেনের মধ্যেই কাটাকাটি। সে কি একটা দুটো খুনজখম! নিরীহ ধর্মভীরু বুড়ো মানুষ সেই দৃশ্য সহ্য করতে পারেনি। চোখ খুলে থাকলেও সব সময়ে চোখের সামনে ভেসে উঠছে গাদাগাদা লাশ আর খুন। চোখ বুজলেও সেই লাশ আর খুন! দানা মুখে দিতে পারছে না—পানি মুখে দিতে পারছে না! গায়ে জ্বর এসে গেছে—হাঁটতে পর্যন্ত পা থর থর করে কাঁপছে! "হায়রে দিশাহারা মানুষের আত্তনাদ'—বৃদ্ধ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল— 'হায় খোদা! জা'নে শু'নে তো কোনও গোনাহ হামি কোনও দিন করিনিকো, তে' ই কি শাস্তি হোলো হামার। একটা অবলা, দুধের ছাওয়াল, তা'কো অরা।...হায় হায় হায়।'

একটা চাবুক খেয়ে মছির যেন চমকে উঠল। সর্বনাশ! এই তো সেই শয়তানটা আবার ছাড়া পেয়েছে! এই তো সেই উন্মত্ত হিন্দু-মুসলমান কাটাকাটির হাওয়া আবার আরম্ভ হল! ক'দিন আগে গ্রামে মিটিং-ফেরতা লোকের মুখে মুনসীর হিন্দু-বিরোধী বক্তৃতার বিবরণগুলি শুনে, এই রকম একটা আশঙ্কার কথা তার যে একবার মনে না হয়েছিল তা নয়। কিন্তু তখন ব্যাপারটার তাৎপর্য অত গুরুত্ব দিয়ে সে বোঝেনি। একটু ঝিম্ ধ'রে থেকে, হন হন করে সে নদীর ধারে যেখানে গফুর অপেক্ষা করছিল, সেখানে চলে গেল।

"হামার আর যাওয়া হোল্ না রে গফুরা।"

"ক্যা?" গফুর হতবাক্।

"না। চারদিক আবার হেঁদু-মোছলমান কাটাকাটি বা'ধে গিছে। হামারে এখন দ্যাশ আগলান ল্যাগবে।"

"ভাখ চাচা।" গফুর তিরস্কার করে ওঠে,—"তোর অত শত বাহানা হামার পছন্দ হয় না। তুই যে যাবু না—অত খুপুচুপু দেখ্যা ক্যা'লই হামি ঈ কথা টের পাছিলাম।"

মছির উত্তেজিত হল না। শুধু ধীরে আবেগভরা গলায় একবার বলল, "খালি তো মোছলমানই লয়, কত সাঁতাল বুনা, কত হেঁদু গরিব গরবা হামার

সমিতির মেম্বর। হায় খোদা রহমান হামার একতা য্যান না ভাঙে—হামার সমিতির মুখেত য্যান চুনকালি না পড়ে।' একটু থেমে বলল, "তুই যা গফরা। হামার যাওয়া হয় না।"

গফুর বিরক্ত হয়ে একলাই নওগাঁর রাস্তা ধরল।

দিন সাতেক পরের কথা। চৌবাড়ার হাট। সাদেক আলি আর মছিরুদ্দিন এবার একটু বেশি ঝুঁকি নিয়ে হাটে হাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে, উদ্দেশ্য—সমিতির কর্মীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে দলটা একটু ভাল করে গুছিয়ে তুলবার চেষ্টা করা। হঠাৎ গফুরেরই সঙ্গে দেখা।

"ক্যা রে গফরা।" মছির অবাক।

"এই তো, তোমারে কান্যেই, ই হাট থ্যি হাট ঘুর‍্যা ঘুর‍্যা পাঁচটা দিন হয়রান হনু—" গফুরের মুখে হাসি।

"তুমি যোগে নগাঁও গেলেন?' সাদেক আলি কৌতুকের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে।

"হয় বাপু।" গফুর ভঙ্গি করে বলে, "তোমরাই গেলেন না। তোমরা মঞ্জুর না করলে, একা একা থানোথা থ্যি কাম্‌ডা করা যায় ক্যা।"

"বুঝল্যা চাচা।" সাদেক আলির মুখখানা বিজয়ীর মতো একটা তৃপ্তির হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, "হামার সমিতির এই নিশান্‌ডার ক্যাম্‌বা একটা যাদু আছে।"

রামমোহন

[পূর্বানুবৃত্তি]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

চতুর্থ অঙ্ক

—এক—

[হিন্দু কলেজের একটি ঘর। সভা বসেছে। সতীদাহ নিবারণ বিল পাশ হয়ে গেছে, অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে জড়ো হয়েছেন কলকাতার জনকয়েক শ্রেষ্ঠ সমাজপতি। তাঁদের মধ্যে আছেন রামগোপাল মল্লিক, তারিণীচরণ মিত্র, তারাচাঁদ দত্ত, রামকমল সেন, মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, ভৈরব মল্লিক, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরনাথ তর্কভূষণ এবং রাধাকান্ত দেব।

১৮৩০ সালের প্রথম দিক। সময় : সকাল।]

কালীকৃষ্ণ ॥ সতীবিল পাশ হয়েছে বলে সাহেবরা সভা করে বেণ্টিঙ্ককে ধন্যবাদ দিয়েছে। ঠিক। ওরা বিধর্মী, আমাদের ধর্ম নষ্ট করতে পারলেই ওরা খুশি হয়। তাই বলে রামমোহনের এত সাহস যে বাড়ি বয়ে মান-পত্র দিয়ে আসে বেণ্টিঙ্ককে!

ভৈরব ॥ আপনারা মিথ্যেই সমাজপতি বলে গর্ব করেন মহারাজ কালীকৃষ্ণ। সতীবিল তো শেষ পর্যন্ত পাশ করিয়ে নিলেই—আপনারা রুখতে পারলেন? এর পরে রামমোহন রায় হাতে আপনাদের মাথা কাটবে—দেখে নেবেন।

কালীকৃষ্ণ ॥ (সরোষে) হঁ, দেখছি। মানপত্র দিতে কে কে গিয়েছিল হে ভবানীচরণ?

ভবানী ॥ টাকীর কালীনাথ চৌধুরী, বৈকুণ্ঠ রায়, কুমার সত্যকিঙ্কর ঘোষাল—

হরনাথ ॥ কী! ভূ-কৈলাসের সত্যকিঙ্কর ঘোষাল! রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের বংশধর হয়ে শেষ পর্যন্ত সেও ওই ম্লেচ্ছের দলে গিয়ে ভিড়েছে! ধর্ম কি সত্যিই রসাতলে গেল!

রামকমল। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন তর্কভূষণ মশাই। দু' চারটে নাস্তিক পাষণ্ডের জন্তে মনু-পরাশরের ধর্ম ডুবে মরতে পারে না।

কালীকৃষ্ণ। না, কখনোই নয়। কিছুতেই না। হাঁ, আর কে কে ছিল ভবানীচরণ?

ভবানী। রামমোহন তো ছিলই, সঙ্গে সাকরেদ হরিহর দত্ত। কালীনাথ বাংলায় অভিনন্দন দিলে আর হরিহর সেইটে ইংরেজিতে পড়ে শোনাল।

রাধাকান্ত। (তারাচাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন) দত্ত মশাই, শুনলেন তো আপনার ছেলের কাণ্ড।

তারাচাঁদ। (সরোষে চিৎকার করে) ত্যাজ্যপুত্র করেছি হারামজাদাকে—বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছি। ব্যাটা আমার ছেলে হয়ে এমন অধঃপাতে গেল। বলে, সতীদাহ বিল পাশ হয়ে দেশ একেবারে চতুর্ভুজ হয়েছে। নচ্ছার—শুয়োরের বাচ্চা! ফের যদি বাড়ির ত্রিসীমানায় ঢোকে তো ওকে আমি চাকর দিয়ে জুতোব।

তারিণী। মিথ্যে হরিহরকে তাড়িয়ে তো কিছু লাভ হবেনা দত্ত মশাই, বিষের ঝাড়শুদ্ধু উপড়ে ফেলতে হবে। কী বলেন মহারাজা?

কালীকৃষ্ণ। নিশ্চয়। লড়তে হবে—প্রাণপ্রাণ দিয়ে লড়তে হবে। সেই জন্তেই তো আমাদের এই ধর্মসভা। ওহে রামকমল, আমাদের সেই দরখাস্তটার কিছু হল?

রামকমল। ও কিছুই হবে না। এখন প্রিভি কৌন্সিল অবধি লড়া পর্যন্ত ছাড়া আর পথ নেই।

হরনাথ। স্পর্ধা! মহারাজা গোপীকৃষ্ণ থেকে শুরু করে শহরের আটশো লোক তাতে সই দিয়েছেন। নির্ণয়সিন্ধু, শুদ্ধীতত্ত্ব, মনু, দত্তক-চন্দ্রিকা—সব কিছু থেকে শাস্ত্রের প্রমাণ তুলে দিয়েছি। তবু সতী বিল পাশ করাবে? তোমরা কি সব মরেছ?

ভবানী। তর্কভূষণ মশাই, এখনো আশা ছাড়বার কিছু হয়নি। এতবড় অন্যায় দেখে দু' চারজন সায়েবের পর্যন্ত টনক নড়েছে। শুধু আমাদের সমাচার-চন্দ্রিকা'তেই যে আমরা লিখছি তা নয়, 'জন বুলে'র রেভারেণ্ড ব্রাইস্ পর্যন্ত এর প্রতিবাদ করছেন।

কালীকৃষ্ণ। ব্রাইস্কে আমার বিশ্বাস নেই—কী একটা মতলব আছে ওর

তলে তলে। ওই প্রিভি কাউন্সিলেই আপীল করতে হবে। ওহে ভৈরবধর, তুমি তো ধর্মসভার ট্রেজারার—কত টাকা উঠল ?

ভৈরব॥ প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার।

তারাচাঁদ॥ আরো চাই। দরকার হলে আমার সব সম্পত্তি বিক্রি করে দেব। বড় ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করে দিয়েছি—আর আমার কিসের মায়া ? (উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলেন) শুয়োরটাকে একবার হাতের কাছে পাই তো—

তারিণী॥ মিথ্যে উত্তেজিত হবেন না দত্ত মশাই, এখনো সময় আছে। ওহে রাধাকান্ত, তোমার এ্যাটর্নী যে আসবে বলেছিল আজ। কখন আসবে ?

রাধাকান্ত॥ (ঘড়ি দেখে) সাড়ে ন'টায় আসবার কথা—প্রায় সময় হয়ে এল। দু' এক মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে। নীলমণি তাকে আনতে গেছে।

কালীকৃষ্ণ॥ এ্যাটর্নীটা আবার কে ?

তারিণী॥ বেথি সাহেব। ফ্রান্সিস্ বেথি।

তারাচাঁদ॥ সে সায়েব। আমাদের হয়ে লড়বে ?

ভবানী॥ কেন লড়বে না ? সব সাহেবই কি বেণ্টিঙ্ক কিংবা মার্টিনের মতো ? ওদের মধ্যে দু' চারজন ভালো লোকও আছে। যেমন ব্রাইস্ সাহেব, যেমন আমাদের বেথি।

কালীকৃষ্ণ॥ যাই বলো, ব্রাইস্‌কে আমার সুবিধে মনে হয় না। মহা পাজী লোক, তলায় তলায় কিছু একটা মতলব আঁটছে নিশ্চয় !

[ইংরেজ অ্যাটর্নী ফ্রান্সিস্ বেথিকে নিয়ে নীলমণি সে প্রবেশ করলেন]

রাধাকান্ত॥ এসো নীলমণি, এই যে এসো বেথি।

বেথি॥ গুড মর্ণিং !

রাধাকান্ত॥ আলাপ করিয়ে দিই। ইনি মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, ইনি আমাদের ধর্মসভার সম্পাদক বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইনি কোষাধ্যক্ষ ভৈরবধর মল্লিক, ইনি পণ্ডিত হরনাথ তর্কভূষণ—আর বাকি সকলের সঙ্গে তোমার তো পরিচয় আছেই। আর ইনি হলেন এ্যাটর্নী ফ্রান্সিস্ বেথি।

[বেথি করমর্দন শেষ করল, তারপর আসন নিলে।]

কালীকৃষ্ণ॥ আপনি আমাদের ধর্মসভার পক্ষ থেকে সতীদাহ বিলের বিরুদ্ধে আবেদন নিয়ে বিলেতে যেতে প্রস্তুত আছেন ?

বেথি ॥ অবশ্য। মোস্ট গ্ল্যাডলি!

হরনাথ ॥ আপনি কি আমাদের উদ্দেশ্য সমর্থন করেন?

বেথি ॥ কেন করিব না? আমাদের ইংলিশ ল অত্যন্ত লিবারাল্। সেখানে প্রত্যেকেরই ধর্মের স্বাধীনতা আছে। অন্যায়ভাবে অন্যের রিলিজিয়স্ প্র্যাকটিসে কেহই ইন্টারফিয়ার করিতে পারে না।

কালীকৃষ্ণ। তা হলে কি আপনি মনে করেন যে সতীদাহ বিল অন্যায়?

বেথি ॥ অবশ্যই অন্যায়! গুরুতর অন্যায়! ইহার প্রতিবাদ আপনারা নিশ্চয়ই করিতে পারেন।

ভবানী ॥ টাকার ব্যবস্থা আমাদের হয়ে গেছে। আপনি কবে রওনা হতে চান? বেশি দেরি করলে আবার—

বেথি ॥ না, না, দেরি হইবে কেন? আমি খোঁজ করিয়াছি, দুই মাসের আগে জাহাজে প্যাসেজ পাওয়া যাইবে না। ইহার মধ্যে আমরা কাগজ-পত্র সব ঠিক করিয়া লইব।

হরনাথ ॥ বিলেতে গিয়ে আপনি আমাদের জন্যে যথাসাধ্য করবেন আশা করি।

বেথি ॥ নিশ্চয়। You see, I am an Englishman—আমরা সত্যের জন্যে সব সময় লড়িয়া থাকি—to our last drop of blood! আপনারা আমার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন। (ঘড়ি দেখিয়া) কিন্তু মহারাজা, আজ আমাকে একটু তাড়াতাড়ি ছাড়িয়া দিতে হইবে। হাতে ইম্পর্ট্যান্ট কেস্ আছে। আমি পরে আবার আসিব।

রাধাকান্ত ॥ কাজ থাকলে আটকাব না। সকলের সামনে তোমার মতটা জানবার জন্যেই তোমাকে ডেকেছিলাম। আচ্ছা—এসো তুমি।

বেথি ॥ থ্যাঙ্ক ইউ। (উঠে দাঁড়াল) কিছু ভাবিবেন না, Sutee Bill আমি নিশ্চয় রদ করিতে পারিব। আচ্ছা—so long. Good-bye—

[বেথি বেরিয়ে গেল।]

কালীকৃষ্ণ ॥ হুঁ, কাজের লোক মনে হচ্ছে। একে দিয়েই কিছু হবে। তা হলে আমি আজ উঠি রাধাকান্ত। পরে আবার কথা হবে। তর্কভূষণ মশাই, আপনি তো আমাদের ওদিকেই যাবেন বলেছিলেন। আমার গাড়িতেই চলুন।

হরনাথ ॥ চলুন। (ভবানীচরণকে) আসি তা হলে। কিন্তু তোমার ওপরেই সব ভরসা ভবানীচরণ। তোমার বুদ্ধি আর কলমের জোর।

ভবানী ॥ আমরাও যাব। চলুন, একসঙ্গেই বেরুই—

[রাধাকান্ত এবং তারিণীচরণ ছাড়া সবাই বেরিয়ে যাবার উপক্রম করলেন।]

তারাচাঁদ ॥ (থেমে দাঁড়িয়ে) আপনিই বলো আর বেথি সাহেবই বলো—সকলের সেরা হল লাঠৌষধি। ওই রামমোহন রায় আর তার দলবলকে ধরে জুৎমতো ঠ্যাঙাতে পারলেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

রামকমল ॥ (মৃদু হাসলেন) কিছু ভাববেন না দত্ত মশাই। দেশের লোকে যা খেপেছে ও ব্যবস্থাটা তারাই করবে এখন।

(সকলে বেরিয়ে গেলেন। তারিণীচরণও উঠে দাঁড়ালেন। শুধু নিজের আসনে বসে রইলেন রাধাকান্ত।)

তারিণী ॥ কী হল রাধাকান্ত, উঠবে না?

রাধাকান্ত ॥ (একটু হাসলেন) বেথি সাহেবের কথা ভাবছিলাম তারিণীদা।

তারিণী ॥ কী ব্যাপার?

রাধাকান্ত ॥ ইংরেজ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাটা আমার একেবারে নষ্ট হয়ে গেল।

তারিণী ॥ কেন?

রাধাকান্ত ॥ ভেবেছিলাম, ওরা বীরের জাত, ওদের মধ্যে মহত্ত্ব আছে। কিন্তু দেখছি, বেথি সাহেবের মতো ইংরেজের অভাব নেই—ওয়ারেন হেস্টিংসের রক্ত ওরা অনেকেই বয়ে এনেছে। টাকার জন্যে ওরা সব করতে পারে—টাকার বিনিময়ে সত্যকে বিক্রি করতেও ওদের বাধে না। (আবার হাসলেন) থাক সে কথা, চলো এবার যাওয়া যাক্—

—দুই—

[আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতে রামমোহনের বাগান।
বাগানের ভিতরে একটি বেদী। সেই বেদীর উপর পা গুটিয়ে বসে রামমোহন কী একখানা মোটা ইংরেজী বই পড়ছেন। তিনি এখন প্রৌঢ়, কিন্তু তাঁর শক্তিমান দীর্ঘ দেহে বয়সের কোন ছাপই পড়ে নি।
সময় : বিকেল।
ভৃত্য হরি একখানা থালা নিয়ে প্রবেশ করল। থালায় খানকতক রুটি, একটি ছোট বাটিতে কিছু মধু, এক গ্লাস জল]

রামমোহন ॥ রেখে যা হরি।

[হরি থালা নামিয়ে চলে গেল। রামমোহন বইখানা পাশে রাখলেন, মধু দিয়ে একটু রুটি মুখে পুরলেন। এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল দশ বারো বছরের একটি ফুটফুটে ছেলে একবার উঁকি দিয়েই সরে পড়ছে। রামমোহন সকৌতুকে তাকে ডাকলেন :]

কে ও বেয়াদার? পালাচ্ছ কেন? এসো—এসো—

[ছেলেটি ঘিরাভরে ঢুকল ; একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল।]

আরে, এ যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের বংশধরটি দেখছি! তারপর দেবেন্দ্রনাথ কী মনে করে?

দেবেন্দ্র॥ (লজ্জিত) রমাপ্রসাদের সঙ্গে এসেছিলাম।

রামমোহন॥ ওহো—তোমরা তো আবার একসঙ্গেই পড়ো। তা শুধু নিঃস্বার্থভাবেই বেড়াতে এসেছ? যাও, অভিযান কর, লিচু টিচু খাও—

দেবেন্দ্র॥ লিচু এখনো পাকেনি।

রামমোহন॥ সন্ধানটা তবে সেরে এসেছ? কিন্তু কাঁচা বলেই পিছু হটলে? আরে বেয়াদার, পাকা ফল তো পাকা চুলের জন্যে। আর কাঁচাই হল কাঁচার খাদ্য।

দেবেন্দ্র॥ না, অসুখ করবে।

রামমোহন॥ কী সর্বনাশ? এই বয়সেই একেবারে জ্ঞানবৃদ্ধ হয়ে বসেছ! ভাখো বেয়াদার, শক্ত হওয়া চাই। দুর্বলের জায়গা নেই পৃথিবীতে। শরীরকে ভয় করবে না, শরীর যাতে তোমায় ভয় করে, তাই দেখতে হবে। কাঁচা কি বলছ, এই বয়সেও আমি পাহশুদ্ধ চিবিয়ে হজম করে ফেলতে পারি। যাও—যাও। যদি টক লাগে তো নুন নিয়ে যেয়ো সঙ্গে।

দেবেন্দ্র॥ কত্ত কাঠপিঁপড়ে গাছে।

রামমোহন॥ কাঠপিঁপড়েকে ভয় করলে চলে বেয়াদার! বাঘ-সিংহীর সঙ্গে পাল্লা কষতে হবে—তবে তো জীবন। বেশ চলো। তুমি গাছে উঠতে না পারো, আমি উঠছি।

দেবেন্দ্র॥ আপনি গাছে উঠবেন? (অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেল)

রামমোহন॥ বাজী রাখো। তোমার চাইতে ভালো উঠব।

দেবেন্দ্র॥ (ভয় পেয়ে) না, না—থাক।

রামমোহন॥ (দীর্ঘশ্বাস ফেললেন) নাঃ, তোমরা সব ভালো ছেলে হয়ে

যাচ্ছ। তা অতিথি হয়ে এসে একেবারে শুধু মুখে ফিরে যাবে? এসো, কিছু খাও আমার সঙ্গে—

দেবেন্দ্র। না:, থাক।

রামমোহন। এও থাক? মিথ্যেই তুমি বামুনের ছেলে বেরাদার—খাওয়ার নামে ঘাবড়ে যাও? (একটু চুপ করে থেকে) ওহো বুঝতে পেরেছি। লোকে বলে, আমি অখাদ্য-কুখাদ্য খাই, তাই নয়? (হাসলেন) আমার হাতযশ আছে বটে। খাচ্ছি রুটি আর মধু, কোন ভটচাযের চোখে পড়লে বলবে, ম্লেচ্ছটা গো-মাংস সাবাড় করছে! থাক, তা হলে খেয়োনা। মিছেমিছি জাতটা আর খোয়াবে কেন? (দু একটুকরো খেয়ে থালাটা সরিয়ে দিলেন। জল খেলেন হাত ধুলেন। তারপর ডাকলেন) হরি—হরি—

(হরি এসে থালাটা তুলে নিয়ে গেল)

তারপর বেরাদার?

দেবেন্দ্র। বলুন।

রামমোহন। তুমি মাংস খাও?

দেবেন্দ্র। না।

রামমোহন। কেন খাও না? আরে মাংস না খেলে শক্তি আসে? সাহেবদের দেখেছ তো? না খায় এমন মাংস নেই—গায়েও তাই বাঘের মতো জোর। আর আমরা? ঘাসপাতা চিবিয়ে চিবিয়ে প্রায় গোরু-ছাগল বনতে বসেছি! (দেবেন্দ্র চুপ করে রইলেন) মাংস খাবে, নিয়মিত মাংস খাবে। শক্তি চাই। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। হাঁ মনে পড়ে গেল। তুমি দোলনায় দুলতে ভালোবাসো?

দেবেন্দ্র। (মাথা নেড়ে—সাগ্রহে) হাঁ—খুব।

রামমোহন। তবে চলো। বাগানের ওদিকটায় একটা দোলনা টাঙিয়েছি, চলো তোমায় দোল দেব। কিন্তু একটা কথা আছে। শুধু এক তরফা নয়—আমাকেও কিন্তু দোলাতে হবে, এমনি ছাড়ব না।

দেবেন্দ্র। (সোৎসাহে) আচ্ছা—(কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গেই কী দেখে তীরবেগে অদৃশ্য হল)

রামমোহন। আরে আরে কী হল। পালাচ্ছ কেন? (বিপরীত দিক থেকে দ্বারকানাথ ঢুকলেন) ও বুঝেছি। দ্বারকানাথের আবির্ভাব!

(দ্বারকানাথ এসে রামমোহনের পাশে বসলেন)]

সব মাটি করে দিলে হে! সে যাক, খাবে নাকি কিছু? (ডাকলেন) রাধাপ্রসাদ—

দ্বারকানাথ॥ (ভটস্থ) থাক থাক রক্ষা করুন। এখন খাওয়া নয়—গলা পর্যন্ত ঠাসা। কিন্তু কী হল? কী মাটি করলাম?

রামমোহন॥ এমন চমৎকার প্ল্যানটা। তোমার ছেলের সঙ্গে দিব্যি জমে উঠেছিল; তোমাকে দেখে দেবেন পালাতে পথ পেল না।

দ্বারকানাথ॥ ও—দেবেন এসেছে বুঝি? ও তো আবার রমাপ্রসাদের পরম বন্ধু।

রামমোহন॥ হাঁ, বেশ ছেলেটি তোমার। ওকে আমার বড় ভালো লাগে, he is a nice boy! আমারি স্কুলের ছাত্র তো। আমি আশি, বড় হয়ে ও একটা দিকপাল হবে।

দ্বারকানাথ॥ এখন থেকেই দিকপাল করবার প্ল্যান হচ্ছিল বুঝি?

রামমোহন॥ প্রায় তাই। (হাসলেন) ওকে বলছিলাম, আমি ওকে দোলনায় দোল দেব, ও-ও পাল্টা দোলাবে আমাকে।

দ্বারকানাথ॥ এই বুড়ো বয়েসে দুলবেন কি রকম?

রামমোহন॥ তাও তো বটে। বুড়ো হচ্ছি—সে কথা মনেও থাকে না। কিন্তু বয়েস বাড়াটা এমন কি অপরাধ যে তার জন্যে দোলটা অবধি খেতে পাব না! (হেসে) কিন্তু বর্বরতার বিরুদ্ধে লড়তে বিলেত তো যেতেই হবে আমাকে। সমুদ্রের দোলানি শুনেছি সাংঘাতিক। তাই এখন থেকে রপ্ত করে নিচ্ছি—সী-সিক্‌নেসে আর কষ্ট হবে না।

দ্বারকানাথ॥ আশ্চর্য 'উইট' আপনার। সব সময়ে একটা তৈরি জবাব আছেই। ভালো কথা, বিলেত যাওয়ার খরচা বাবদ আমাদের পক্ষ থেকে আমরা আপনাকে পাঁচহাজার টাকা দেবার ব্যবস্থা করছি।

রামমোহন॥ দরকার হবে না। ও টাকা আমি নেব না।

দ্বারকানাথ॥ সে কি কথা! দেশের হয়ে আপনি লড়তে যাচ্ছেন, কেন নেবেন না টাকা!

রামমোহন॥ ও টাকা দিয়ে আরো অনেক কাজ করা যাবে দ্বারকানাথ—দেশের দুঃখের তো অন্ত নেই। আমার জন্যে ভেব না। আমার টাকা

আমি জোগাড় করে নেবই। দিল্লীর বাদশার ব্যাপারটা হয়ে গেলে সেই টাকাতেই আমার সব কুলিয়ে যাবে।

দ্বারকানাথ। হাঁ—হাঁ—ওটা কতদূর এগোল? বাদশার খবর কী?

[রামমোহন কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই বছর বারোর একটি ছেলে ছুটে এসে রামমোহনের পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল।]

রামমোহন। কী বাবা রাজারাম?

রাজারাম। আমার ঘুড়ি ছিঁড়ে গেছে বাবা। জুড়ে দাও।

রামমোহন। আচ্ছা যাও, একটু পরেই আমি যাচ্ছি।

রাজারাম। না, পরে নয়। এক্ষুনি জুড়ে দিতে হবে। আমি ঘুড়ি ওড়াতে পারছি না। এসো-না—

রামমোহন। (সস্নেহে) এই এলাম বলে। তুমি ততক্ষণ আর একটা ঘুড়ি ওড়াও—কেমন?

(রাজারাম ঘাড় নেড়ে দৌড়ে গেল)

দ্বারকানাথ। এইটিই তো আপনার পালিতপুত্র রাজারাম?

রামমোহন। হাঁ। সিভিলিয়ান ডিক্ সাহেব ওকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন হরিদ্বারের মেলায়। বিলেত যাওয়ার সময় আর কার হাতে তুলে দেবেন—আমিই তার নিলাম।

দ্বারকানাথ। শুনেছি, মুসলমানের ছেলে।

রামমোহন। হয়তো! আর এই অপরাধে যাঁরা বাকি ছিলেন, তাঁরাও আমাকে ত্যাগ করেছেন। কিন্তু কে তাঁদের বোঝাবে, শিশুর কোন জাত নেই, সে সব জাতের ঊর্ধ্বে।

দ্বারকানাথ। তা ছাড়া ওই রাজারামকে নিয়ে নানারকম কুৎসা—(দ্বিধাভরে থেমে গেলেন)

রামমোহন। যেতে দাও ওসব। সত্য আমার, নিন্দেটা ওদেরই থাক। (একটু চুপ করে) হাঁ—কী বলছিলে যেন? সেই দিল্লীর বাদশার ব্যাপারটা তো? ওর কেস্‌টা খুবই 'জেন্থইন'। অন্যায়ভাবে কোম্পানি ওঁকে পাওনা থেকে ঠকাচ্ছে। আমাকে দূত করে বিলেতে পাঠাতে পারলে সুবিধে হবে আশা করছেন। আর আমার কথা তো জানোই। ওঁর কাজটা ছাড়াও প্রিভি-কাউন্সিলে সতী-বিল নিয়ে লড়তে হবে। আর

ভালো করে জানতে হবে সভ্যতার তীর্থ ইউরোপকেও। সে আমার কত দিনের স্বপ্ন!

দ্বারকানাথ॥ ধর্মসভার দরখাস্ত নিয়ে বেথি সাহেব বিলেত রওনা হয়ে গেছে।

রামমোহন॥ যাক্। আমিও যাচ্ছি।

দ্বারকানাথ॥ গণ্ডগোলটার কী হল?

রামমোহন॥ কোম্পানির সঙ্গে কোন settlement সম্ভব নয়। তারা এখন দেশের মালিক, বাদশার দূতকে দূত বলেই মানে না। তাছাড়া দ্বিতীয় আকবর আমাকে যে 'রাজা' উপাধি দিতে চাইছেন, তাও তারা স্বীকার করে না।

দ্বারকানাথ॥ তবে তো মুশকিল হল।

রামমোহন॥ (হাসলেন) মুশকিল কিছু নেই! চাল চালতে আমিও জানি। কোম্পানি deny করুক আমার embassy, আমার title—সাধারণ মানুষ হিসেবেই পাস্‌পোর্ট জোগাড় করব আমি। তারপর ইংল্যাণ্ডের মাটিতে পা দিয়েই ঘোষণা করব, আমি শুধু রামমোহন নই—রাজা রামমোহন রায়। দিল্লীশ্বর দ্বিতীয় আকবরের মহামান্য রাজদূত।

দ্বারকানাথ॥ (মুগ্ধকণ্ঠে) ইচ্ছে করলে আপনি সব পারেন দেখছি।

রামমোহন॥ (বিষণ্ণভাবে হাসলেন) সব পারি? না বন্ধু, কিছুই পারিনি। এত কাজ ছিল, এত সমস্যা ছিল! কতটুকু এগিয়েছি সে-সব নিয়ে? 'একমেব অদ্বিতীয়ম্' মন্ত্রে যে মহাজাতি আমি গড়তে চেয়েছিলাম, সে সাধনা আমার কতটা সফল হল? আজও ধর্মভেদ—বর্ণভেদ। আজও অশিক্ষার অন্ধকার! আজও শাসন-পরিষদে আমাদের representation নেই, আজও আমরা জানতে শিখিনি: 'India for Indians!' দ্বারকানাথ, আমার সে Industrial India-র কল্পনা এখনো তো আকাশ-কুসুম! হল না—কিছুই হল না? অথচ জানি, জীবন বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়, শুরুতেই আসে শেষের পালা। যদি সেকালের ঋষিদের মতো আমি শক্তি পেতাম—

(উঠে পায়চারি করতে লাগলেন)

যদি হাজার হাজার বছর বাঁচতে পারতাম, east-এর সঙ্গে west-কে মিলিয়ে সেরা দেশ গড়ে দিয়ে যেতাম আমার ভারতবর্ষকে—!

দ্বারকানাথ। আপনার আদর্শ মিথ্যে হবে না। নতুন কাল আসছে, আপনার অসমাপ্ত সাধনা সে যুগ মাথায় তুলে নেবে।

রামমোহন। জানি। দিকে দিকে তারই সাড়া আমি পেয়েছি। সেই আমার ভরসা। হিন্দু কলেজ হয়েছে, আলো আসছে ইংরেজী শিক্ষার। সরে যাচ্ছে শাস্ত্রের নামে মূঢ়তার জগদ্দল পাথর। হিন্দু কলেজের ছেলেরা ঐ ডিরোজিওকে নিয়ে ইতিমধ্যেই কী সব কাণ্ড বাঁধিয়েছে শুনেছ বোধ হয়।

দ্বারকানাথ। একটু বাড়াবাড়ি করছে না? ডাক্ সাহেবও ওদের বড্ড প্রশ্রয় দিচ্ছে। কৃষ্ণমোহন বাড়ুয্যের মতো আরো গোটাকতক কালা-পাহাড় ছোকরা জুটলে যে দেশকে দেশ ক্রীশ্চান হয়ে যাবে।

রামমোহন। বন্ধ-আঁটুনির ফসকা গেরো এমনিই হয় দ্বারকানাথ। আজ হিন্দু কলেজের ভেতর দিয়ে আসছে নতুনের বিদ্রোহ—সব ভেঙে শেষ করে দেবে। আর ওই ভাঙনের পালা শেষ হলেই শুরু হবে সৃষ্টির নতুন পর্ব। বানের জল থিতিয়ে সরে গেলেই তার ওপর দেখা দেবে পলিমাটির ফসল। সেই সান্ত্বনা নিয়েই পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নেব আমি। (থামলেন—হাসলেন) তারপর, তোমাদের ধর্মসভার নতুন খবর কী? ধর্মচর্চা কেমন চলছে?

দ্বারকানাথ। যেমন চলে। আমাদের মুণ্ডপাত। ব্রহ্মসভায় যারা আসে তাদের একঘরে করার বন্দোবস্ত। তবে বেথি সাহেব ওদের খুব ভরসা দিয়ে গেছে, সেই আশাতেই আছে এখন।

রামমোহন। আশায় ছাই পড়বে। আমিও যাচ্ছি। ডেভিড হেয়ারের ফ্যামিলি, তা ছাড়া তাদের বন্ধু-বান্ধব—সকলেরই সহযোগিতা পাব। দেখা যাক্—ধর্মসভা আর বেথি সাহেবের দৌড় কতটা।

(হঠাৎ নেপথ্য থেকে ছড়া মেশান বিকট চিৎকার)

"জাতের নিকেশ রামমোহন
বিত্তের নিকেশ করেছে,
হদ্দ এক নিকেশের ধুয়ো উঠেছে—"

দ্বারকানাথ। (সভয়ে) এ কী কাণ্ড?

(নেপথ্যে : "হদ্দ এক নিকেশের ধুয়ো উঠেছে।". সেই সঙ্গে মুরগী, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদির মিশ্র রাগিণী।)

রামমোহন ॥ (হাসলেন) হিন্দু জাতির পক্ষ থেকে আমার অভ্যর্থনা হচ্ছে। ধর্মরক্ষার জন্যে বিধর্মীকে যে করে হোক তারা সাবাড় করবে।

দ্বারকানাথ ॥ সাবাড়!

রামমোহন ॥ হাঁ, একেবারে সাফ করে ফেলতে পারলেই তারা নিশ্চিন্ত হয়। ধর্মধ্বজীরা লোক লাগিয়েছে চারিদিকে—আমাকে খুন করবার সুযোগ খুঁজছে তারা। রাতদিন আমার বাড়ির ওপর তারা নজর রাখে, পথে বেরুলে দমাদম ইঁট পড়ে আমার গাড়িতে। জানো বোধ হয় সাময়িক police protection-ও আমার নিতে হয়েছিল। কিন্তু ঘেন্না ধরে গেছে এখন। ওভাবে বাঁচতে আমি শিখিনি। ভেবেছি, আসুক সামনে, নিজেই রুখে দাঁড়াব এবার। শক্তিপরীক্ষা সামনা সামনিই হয়ে যাক।

দ্বারকানাথ ॥ একটু বেশি রিস্‌ক নিচ্ছেন না কি? একদল খ্যাপা লোকের ব্যাপার—

রামমোহন ॥ 'রিস্‌ক'! 'রিস্‌ক' সেদিনই চরম নিয়েছি—যেদিন আমার অমন মায়ের সঙ্গে পর্যন্ত সম্পর্ক আমি রাখতে পারিনি। আজ আমার কাউকেই আর ভয় নেই, দ্বারকানাথ। ক্রীশ্চানেরা গোঁড়ামিকে নিন্দে করেছি—তারা আমাকে সহ্য করতে পারে না, মুসলমানের রক্ষণশীলতাকে ঘা দিয়েছি, তারা আমার শত্রু; হিন্দুদের ভণ্ডামিকে আঘাত করেছি—হিন্দুরা আমার মাথা চায়। তবু যদি পিছু হটে না থাকি, একদল খ্যাপা লোকের কাছে হার মানব? বন্ধু, সত্যের জন্যে দাঁড়াতে যদি আমি শিখে থাকি, তবে সেজন্যে মরতেও আমি জানি—

(আগামীবারে সমাপ্য)

পাঠকদের প্রতি

'পরিচয়' কলাও লাভের ব্যবসা নয়, সাধারণের কাগজ। বহু ত্যাগ স্বীকার করেও দীর্ঘ একুশ বছর ধরে 'পরিচয়' তার সাধ্যানুযায়ী নিঃস্বার্থভাবে বাংলা সাহিত্যের সেবা করে এসেছে। যখনই গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হয়েছে, পাঠকসাধারণের দাক্ষিণ্যের কাছে তখনই অকুণ্ঠিতভাবে সে হাত পেতেছে। সেই রকম এক সংকটে পড়েই আজ আমাদের জরুরী নিবেদন নিয়ে আবার পাঠকদের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে।

গত বৈশাখ মাসে 'পরিচয়ে'র পাঠকদের কাছে পত্রিকার আর্থিক সংকটের কথা আমরা খুলে জানিয়েছিলাম। আমরা বলেছিলাম: কাগজের দাম ও ছাপার খরচ যে-ভাবে বাড়ছে তাতে দাম বাড়ানো অথবা পৃষ্ঠা-সংখ্যা কমানো ছাড়া পত্রিকা টিকিয়ে রাখার আর কোন উপায় থাকছে না; তবে খুব তাড়াতাড়ি গ্রাহক-সংখ্যা যদি বাড়ে, দাম না বাড়িয়েও এবং পৃষ্ঠা-সংখ্যা না কমিয়েও আরও কিছুদিন আমরা চালিয়ে নিতে পারব।

তারপর দীর্ঘ আট মাস কেটে গেছে। পত্রিকা প্রকাশের খরচ একটুকু কমেনি, বরং কাগজের দাম আরও অগ্নিমূল্য হয়ে উঠেছে। নগদ বিক্রি কিছুটা বাড়লেও, গ্রাহক-সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই বাড়েনি। যেসব সহৃদয় পাঠক নিজেরা গ্রাহক হয়ে এবং অন্যদের গ্রাহক করে আমাদের আর্থিক সংকটের বোঝা কিছুদিনের জন্যে হাল্কা করেছেন, তাঁদের আমরা এই প্রসঙ্গে ধন্যবাদ জানাই।

পাঠকদের ওপর আর্থিক চাপ যাতে না পড়ে, তার জন্যে এই আট মাস ধরে আমরা অনেক রকম চেষ্টা করেছি। বিজ্ঞাপন পেলেও এবং কাগজ বিক্রি হলেও বহুক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন-ও বিক্রি-বাবদ টাকা আদায়ের ব্যাপারটা খুবই দুঃসাধ্য—কখনো কখনো অসাধ্য—ও সময়সাপেক্ষ হয়ে পড়ে।

কাজেই, অন্য কোন উপায় না দেখে, বাধ্য হয়ে আগামী সংখ্যা থেকে পরিচয়ের পাতা কিছু বাড়িয়ে দাম দশ আনা করবার কথা আমরা ভাবছি। ২০শে জানুয়ারির মধ্যে আমরা পাঠকদের কাছ

থেকে এ বিষয়ে মতামত চাই। পাঠকদের মতামতের ওপর নির্ভর করে আমরা এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব।

এ পর্যন্ত বহু পাঠক 'পরিচয়ের' লেখা সম্পর্কে মাঝে মাঝে চিঠিতে তাঁদের মতামত জানিয়েছেন। তাঁদের প্রশংসা আমাদের উৎসাহিত করেছে, তাঁদের কঠোর সমালোচনা আমাদের ভুল সংশোধন করতে সাহায্য করেছে। পত্রিকা ও পাঠকদের মধ্যে এভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে না পারলে পত্রিকাকে কিছুতেই উন্নত করা যায় না।

তাই আমরা পত্রিকাকে আরও উন্নত করার জন্যে শুধু দুচারজন নয়, সমস্ত পাঠকদের কাছ থেকেই মতামত আহ্বান করছি। প্রকাশিত লেখার সমালোচনা ছাড়াও পরিচয়ে অন্যান্য কী ধরনের লেখা প্রকাশিত হলে ভাল হয়, সে সম্পর্কেও পাঠকদের মতামত চাই।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপটের ছবি

এবারকার প্রচ্ছদপটে মুদ্রিত ছবিটি এঁকেছেন চিত্তপ্রসাদ। সম্প্রতি 'Angels Without Fairy-tales' নামে ২২টি লিনোকাট-সংযুক্ত একটি চিত্রমালা (অ্যালবাম) তিনি আসন্ন আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা সম্মেলনকে উৎসর্গ করেছেন। ছবিটি সেই অ্যালবাম থেকে নেওয়া।

অবনীন্দ্রনাথের ছবি

এ-সংখ্যায় মুদ্রিত আচার্য অবনীন্দ্রনাথের 'বুদ্ধ ও সুজাতা', 'অভিসার' ও 'কচ ও দেবযানী' নামের তিনখানি ছবির ব্লক 'দেশ' পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত।

প্রকাশের পথে

নতুন আলো

[মার্কসবাদের গোড়ার কথা]

মার্কসবাদের মূল কথাগুলি
সহজ ভাষায় ও জনপ্রিয়
ভঙ্গিতে প্রথম শিক্ষার্থীদের
বোঝার মতো করে লেখা

জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হবে